ভাষাবিদ্যা পরিচয়

অধ্যাপক শ্রীপরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য

জয়দুর্গা লাইব্রেরী
৮এ, কলেজ রো ● কলিকাতা-৭০০ ০০৯

তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকা

গ্রন্থটির আমূল সংস্কার-সাধন এবং বহুল পরিবর্ধনের প্রয়োজনে তৃতীয় সংস্করণ-মুদ্রণ কিছুটা বিলম্বিত হলো, কিন্তু এই বিলম্বিত প্রয়াস যে আগ্রহী পাঠকের স্বার্থের অনুকূলেই —এই বিবেচনায় আশা করি উৎকণ্ঠ পাঠক আমাকে ক্ষমা করবেন।

গ্রন্থটির কলেবর এবং সূচক পত্রের প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করলেই উক্তিটির সত্যতা উপলব্ধ হবে। এবার অনেক নোতুন বিষয়ই সংযোজিত হয়েছে। বিশেষতঃ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর পর্যায়ে 'বর্ণনাত্মক ভাষাবিজ্ঞান'-এর (Descriptive Linguistics) আংশিক এবং আন্তর্জাতিক লিপি ও ধ্বনিলিপির (International script/Phonetic script বা I.P.S/I.P.A.) অন্তর্ভুক্তি ঘটায় গ্রন্থটিতে তাদেরও যথাযোগ্য মর্যাদা দিয়ে একে একটি পূর্ণাঙ্গ শব্দশাস্ত্র-রূপে পরিণত করবার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে। আশা করি, এখন এই গ্রন্থটি যেকোন শব্দবিদ্যা-অধ্যেতার সর্বাধিক প্রয়োজন সাধনে সক্ষম হ'বে।

এতকাল আমার কোন গ্রন্থেই আমি নিজের সম্বন্ধে কিছুই বলিনি। এখন তার প্রয়োজন অনুভব করে আমার কিছু বক্তব্য নিবেদন করছি। আমার পূর্বাচার্যগণ এবং সমকালীন ভাষাবিদ্যা চর্চায় নিরত গবেষকদের প্রায় সকলেই প্রথাগতভাবে ভাষাবিদ্যায় প্রাধীতী। আমি লজ্জার সঙ্গে স্বীকার করছি যে, এ ব্যাপারে আমি একজন অব্যবসায়ী, প্রথাগত ভাবে ভাষাবিদ্যা শিক্ষার সুযোগ আমি পাইনি। স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর পর্যায়ে অধ্যাপনার প্রয়োজনে এবং বাল্যাবধি বিষয়টির প্রতি আমার স্বাভাবিক আগ্রহের কারণেই আমাকে বিষয়টি নিয়ে কিছুটা পড়াশোনা করতে হ'য়েছে এবং ভাবতেও হ'য়েছে। এই ভাবনার ফলে আমার সম্মুখে কিছু মৌলিক সমস্যা দেখা দিয়েছে এবং আমাকেই তার সমাধানও কল্পনা করে নিতে হয়েছে। কোন কোন বিষয়ে (যেমন, 'বাংলা ভাষার উৎপত্তি' এবং আরও কিছু) নিজস্ব অভিমত প্রকাশেও দুঃসাহসী হ'য়েছি। বিজ্ঞজন তা' মেনে নেবেন কিনা জানিনে, তবু তা' প্রকাশে এখন কোন দ্বিধা করিনি।

অবসর-গ্রহণের পরই অধ্যাপিত বিষয়গুলি নিয়ে গ্রন্থ-রচনার পরিকল্পনা করি এবং আলোচ্য গ্রন্থের সংস্করণ ও অপর একটি গ্রন্থের প্রথম সংস্করণও প্রকাশিত হয়। এর পরই দুরন্ত হৃদ্‌রোগের আক্রমণে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ি। ক্রমে সুস্থ হ'য়ে উঠলেও আমার গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত হয়ে পড়াতে বহির্জগতের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ব্যাহত হয়। এরি মধ্যে আরও কয়েকটি গ্রন্থ এবং পূর্বোক্ত গ্রন্থগুলির নব সংস্করণ প্রকাশিত হয়।

১৯৫৮ জানুয়ারি থেকে আমার পারিবারিক জীবনে দেখা দেয় দুর্যোগের ঝড়। পরিবারের অপর দুই সদস্য—গৃহিণী ও কন্যা ক্রমিক পর্যায়ে অসুস্থতার দরুণ

হাসপাতাল, নার্সিং হোম, বাড়ি—এই ভাবে চলতে থাকে ; অবশেষে আমাদের অর্ধ-শতাব্দীকালেরও অধিক কালের দাম্পত্যজীবনে পূর্ণচ্ছেদ পড়ে যায়—আমার সর্বকর্মের প্রেরণাদায়িনী জীবন-সঙ্গিনী কিছুকাল আগে লোকান্তরিতা হলেন। এই সময় আমি আলোচ্য গ্রন্থটির বর্তমান পরিবর্ধিত সংস্করণ প্রস্তুত ব্যাপারে ব্যাপৃত ছিলাম। গ্রন্থটি কোন ক্রমে শেষ ক'রে মুদ্রণ-কার্য আরম্ভ হয়, কিন্তু বড় বিলম্বিত গতিতে। কিন্তু দুর্ভাগ্য আমার, যখন সেই গতি কিছু ত্বরান্বিত হলো, তখন আমি দ্বিতীয়বার হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হ'য়ে পড়ি। এই অবস্থায়ই গ্রন্থের মুদ্রণ-পরীক্ষাও চালাতে হয় ; ফলে প্রমাদের পরিমাণ এবার যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে। তবু যা হোক্ ক'রে শেষ করা গেল।

বর্তমান বঙ্গীয় শতাব্দীর প্রথম প্রহরেই জগতের আলো প্রথম দেখতে পেয়েছিলাম। তারপর দ্বিতীয়, তৃতীয় প্রহর উত্তীর্ণ—চতুর্থ প্রহরও শেষ হ'য়ে এলো, নোতুন শতাব্দীর অরুণ আভাস চোখে এসে পড়েছে।—দৈহিক ও মানসিক সক্ষমতা-সত্ত্বেও নেত্রজ্যোতির ক্রমক্ষীয়মাণতা এবং হৃদয়দৌর্বল্যই আমার এগিয়ে চলার পথে এখন প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করেছে। অথচ অনেক অভীপ্সিত কাজ এখনো অপূর্ণ রয়ে গেছে।

গ্রন্থের স্খলন-পতন-ত্রুটির জন্য সুধীসমাজের নিকট মার্জনা ভিক্ষা করি। এবার বাধ্য হ'য়ে গ্রন্থশেষে একটি বৃহৎ শুদ্ধিপত্র সংযোজন করতে হ'লো, এ ছাড়াও হয়তো কিছু মুদ্রণ-ত্রুটি রয়ে গেল। আমার এবং প্রকাশকের সমবেত চেষ্টাতেও I.P.A লিপির যথার্থ রূপটি হয়তো প্রকাশ করা সম্ভবপর হ'লো না,—এ সমস্ত কারণে লজ্জিত, দুঃখিত এবং ক্ষমাপ্রার্থী,—যদি সম্ভব হয়, ভবিষ্যতে নির্ভুল লিপি এবং বর্ণনাত্মক ভাষাবিজ্ঞানের আরও কিছু আলোচনা অন্তর্ভুক্ত করা হবে। ইতি—

শ্রীপরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

॥ সূচক-পত্র ॥

● প্রথম খণ্ড ●

ভাষাবিজ্ঞান
(Linguistics)

বিষয় পৃষ্ঠা

বিষয় পৃষ্ঠা

● দ্বিতীয় খণ্ড ●

ভাষাতত্ত্ব (PHILOLOGY)

॥ বাঙলা ভাষা পরিচয় ॥

॥ প্রবেশক ॥

[এক] শব্দবিদ্যা ও তার প্রকারভেদ

(ক) ভাষাতত্ত্ব ও ভাষাবিজ্ঞান

ভাষা-বিষয়ক আলোচনা-সম্বন্ধীয় শাস্ত্রকে বলা হয় **ভাষাতত্ত্ব** (Philology) বা **ভাষাবিজ্ঞান** (Linguistics)। সাধারণভাবে কিছুকাল পূর্ব পর্যন্তও শব্দ দুটি প্রায় একার্থবাচক ছিল, কিন্তু সম্প্রতি আলোচ্য বিষয়ের পরিধি বিস্তৃত হ'বার ফলে শব্দ দুটোর সাহায্যে আলোচনার দুটি ধারাকে সীমায়িত ও পৃথক্কৃত করা হ'য়েছে। কোন একটি বিশেষ ভাষা-বিষয়ে যদি আলোচনাকে সীমাবদ্ধ রাখা যায়, তবে তাকে বলা হয় **ভাষাতত্ত্ব** বা Philology, যেমন—'বাঙলা ভাষাতত্ত্ব' বা 'ইংরেজি ভাষাতত্ত্ব'; পক্ষান্তরে, সাধারণভাবে ভাষার তাত্ত্বিক দিক্ বা বিভিন্ন ভাষাবিষয়ে যদি আলোচনা বিস্তৃতি লাভ করে, তবে তাকেই বলা হয় **ভাষাবিজ্ঞান** বা Linguistics, যেমন—'ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞান' বা 'তুলনামূলক ভাষাবিজ্ঞান'। ভাষাতত্ত্ব ও ভাষাবিজ্ঞানের অর্থপার্থক্য এবং ব্যবহারিক পার্থক্যের বিচারে বলা যায় যে, সাম্প্রতিক কালে ভাষাতত্ত্বের আলোচ্য ক্ষেত্রকে অনেকটা সীমায়িত ক'রে প্রধানতঃ প্রাচীন ভাষার অনুশীলনে নিযুক্ত রাখা হয়েছে। যে সমস্ত জাতির লিখিত সাহিত্য রয়েছে সেই সমস্ত সাহিত্যের ভাষার সম্যক্ বিশ্লেষণাদির সাহায্যে জাতির সাহিত্য সংস্কৃতির রহস্যভেদ পর্যন্ত ভাষাতত্ত্বের সীমাধীন। এই অর্থে অবশ্য শুধু সংস্কৃত, গ্রীক, লাতিন ভাষাই আসে না, ইংরেজি, বাংলা প্রভৃতি প্রাগ্রসর প্রাচীন সাহিত্য কীর্তিযুক্ত ভাষাগুলিও ভাষাতত্ত্বের আলোচনা-সীমায় এসে যায়।

পক্ষান্তরে ভাষাবিজ্ঞান শাস্ত্রের অধ্যয়ন অপরাপর বিজ্ঞান-শাখারই অনুরূপ। মূলতঃ এক বা একাধিক ভাষার বিভিন্ন উপকরণ থেকে তথ্য সংগ্রহ ক'রে সেগুলিকে যথাযথভাবে বিশ্লেষণ করে তা' থেকে একটা সাধারণ তত্ত্ব খুঁজে নেওয়া হয় এবং তাকে অপরাপর ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে তার যাথার্থ্য যাচাই করা হয়। সেই বিচারে তত্ত্বটি সমর্থিত হ'লে তাকে ভাষাবিজ্ঞানের 'সাধারণ সূত্রে'র মর্যাদা দান করা হয়। বস্তুতঃ

সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতেই পরিচালিত হয় ভাষাবিজ্ঞান-সম্পর্কিত যাবতীয় পর্যবেক্ষণাদি। বিজ্ঞানের অপরাপর শাখাসমূহ অতিশয় উন্নত হয়ে উঠবার ফলে তাদের সহায়তায় ভাষাবিজ্ঞানও এখন আর শুধু অনুমানসিদ্ধ নয়, প্রমাণসিদ্ধ হয়ে উঠবার অবকাশ পেয়েছে। তবে বিজ্ঞানের কোন সূত্রই যেমন ধ্রুব নয়, অনবরত পর্যবেক্ষণের ফলে প্রাচীন তত্ত্বের পরিমার্জনা বা সংস্কার যেমন বিজ্ঞানে স্বীকৃত, ভাষাবিজ্ঞানেও তেমনি গবেষণা-পর্যবেক্ষণাদির ফলে প্রাচীনতর তত্ত্বসমূহের সংস্কারের অবকাশ রয়েছে।

শুধু ভাষা-বিষয়ক সূত্র আবিষ্কারই নয়, ভাষার বাক্য, পদ/শব্দ, ধ্বনি প্রভৃতির রহস্য ভেদ করাও ভাষাবিজ্ঞানের কাজ, তাই যে-কোন ভাষার আলোচনায়ও এর চর্চা এবং অনুশীলন অত্যাবশ্যক। তাই সাম্প্রতিক কালের ভাষাবিজ্ঞানিগণ তাত্ত্বিক বিচারের প্রয়োজনে ভাষাতত্ত্ব এবং ভাষাবিজ্ঞানের মধ্যে পার্থক্য মেনে নিলেও এদের উভয়ের মধ্যে আভ্যন্তর আদান-প্রদানের কারণে আর দু'য়ের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য বিধান করেন না। বস্তুতঃ এ দু'টির কোনটি বাদ দিলেই ভাষাবিদ্যার আলোচনা অসম্পূর্ণ থাকবে—এরা একে অপরের পরিপূরক। তবে এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে ভাষাতাত্ত্বিক যেমন লিখিত সাহিত্যকেই তাঁর গবেষণা বা আলোচনার ক্ষেত্ররূপে গ্রহণ ক'রে থাকেন, ভাষাবিজ্ঞানীর ক্ষেত্র-নির্বাচন তেমনি হয় প্রধানতঃ কথ্যভাষা-কেন্দ্রিক। একালের বিশিষ্ট ভাষাবিজ্ঞানী মেরিও পেই (Pei, Merio) বলেন: "The problem of linguistics concerns mainly the spoken language though written forms are also considered." কিন্তু এ দু'টি ব্যবধান স্বীকার করে নিলেও কার্যতঃ এখনও এদের ব্যবহার-বিষয়ে যথেষ্ট শৈথিল্য বর্তমান। আমরা নির্বিচারে শব্দ দু'ট ব্যবহার ক'রে থাকি।

প্রাচীনকালে ভাষাবিষয়ক-আলোচনাকে এককথায় **শব্দবিদ্যা** বলা হ'তো। বাংলা গদ্যের প্রাথমিক রূপকার ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এবং অক্ষয়কুমার দত্তও ভাষা-বিষয়ক আলোচনাকে 'শব্দবিদ্যা' বলে অভিহিত করেছেন। এই শব্দটি দ্বারা ভাষা-বিষয়ক আলোচনার দু'টি ধারাই দ্যোতিত হয় বলে আমরা 'ভাষাতত্ত্ব' ও 'ভাষাবিজ্ঞান'—উভয়ক্ষেত্রেই 'শব্দবিদ্যা' শব্দটি প্রয়োগ করতে পারি। অতএব, সংক্ষেপে আমরা বলতে পারি শব্দবিদ্যার দুটি ধারা—একটি 'ভাষাতত্ত্ব', অপরটি 'ভাষা-বিজ্ঞান'। ভারত সরকার-নিয়োজিত 'পরিভাষা আয়োগ'-দ্বারা প্রকাশিত পরিভাষা কোষে Philology বা ভাষাতত্ত্বকে 'বাঙ্মীমাংসা' এবং Linguistics-কে 'ভাষাবিজ্ঞান'-রূপে দেখানো হয়েছে।

(খ) ভাষাবিদ্যা ও ব্যাকরণ

এখানে 'ভাষাতত্ত্ব', 'ভাষাবিজ্ঞান' এবং 'ব্যাকরণের' পারস্পরিক সম্পর্কটি স্পষ্ট করে নেওয়া প্রয়োজন। কারণ 'ভাষাতত্ত্ব' ও 'ভাষাবিজ্ঞান'কে যেমন এককথায় অথবা একত্রে 'শব্দশাস্ত্র' বলা হয়, ব্যাকরণকেও তেমনি 'শব্দশাস্ত্র' নামে অভিহিত করা হয়। ভাষাতত্ত্ব ও ভাষাবিজ্ঞান একালের শাস্ত্র, পক্ষান্তরে আমাদের দেশে ব্যাকরণ রচিত হয়েছিল অন্ততঃ আড়াই হাজার বছরেরও আগে। স্বভাবতঃই একালের বিজ্ঞানবুদ্ধি, সহজলভ্য যান্ত্রিক উপাদান এবং যানবাহনের আনুকূল্যে পৃথিবীর তাবৎ মানবজাতির পারস্পরিক জানাশোনার ফলে ভাষাবিষয়ক আলোচনা ব্যাকরণ অপেক্ষা অনেক বেশি গভীর ও বিস্তৃত হ'বার সুযোগ লাভ করেছে। ব্যাকরণশাস্ত্র অতি প্রাচীন বলেই প্রতি দেশে নিজস্ব নিয়মে ও প্রয়োজনে সেই শাস্ত্রটি গড়ে উঠেছিল। প্রসঙ্গক্রমে দু'টি ভাষার ব্যাকরণগত সম্পর্ক-বিষয়ে একটি বহুমূল্য মন্তব্য উল্লেখ করা চলে। সংস্কৃত ও ইংরেজি ব্যাকরণের সম্পর্কটি মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নিম্নোক্তক্রমে স্পষ্টীকৃত করেছেন ঃ "সংস্কৃত বা বাঙলা ব্যাকরণ ও ইংরেজি grammar এক জিনিষ নয়। Grammar is the art of speaking and writing a language correctly. সংস্কৃত ব্যাকরণের মানে কিন্তু আর কিছু। 'ব্যাক্রিয়ন্তে ব্যুৎপাদ্যন্তে শব্দা অনেন ব্যাকরণং' অর্থাৎ শব্দটি শুদ্ধ করা পর্যন্তই ব্যাকরণের সীমা। ইংরেজিতে গ্রামারের মধ্যে উচ্চারণ পড়ে। উচ্চারণের জন্য সংস্কৃততে একটি স্বতন্ত্র শাস্ত্র আছে—তাহার নাম শিক্ষা। গ্রামারে Etymology থাকে, ইহারই সংস্কৃত নাম ব্যাকরণ। ইংরেজিতে গ্রামারে syntax থাকে—সংস্কৃততে syntax-এর মোটা মোটা গোটাকতক কথা যা নহিলে ব্যাকরণ চলে না, তাহাই ব্যাকরণে থাকে—বাকীটা বাদার্থ-শাস্ত্রে গিয়া পড়ে। ইংরেজি গ্রামারে ছন্দের উপর একটা অধ্যায় থাকে, সংস্কৃততে ছন্দ-শাস্ত্র স্বতন্ত্র। গ্রামারে figures of speech থাকে, সংস্কৃততে অলঙ্কারশাস্ত্র স্বতন্ত্র। সুতরাং ইংরেজি গ্রামার ও সংস্কৃত ব্যাকরণ এক নহে। ইংরেজি গ্রামারকে শব্দশাস্ত্র বলা যাইতে পারে, সংস্কৃত ব্যাকরণ শুধু পদের আকার লইয়া।"

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে স্পষ্টতঃই প্রতীয়মান হয় যে, সংস্কৃত ব্যাকরণ ইংরেজি গ্রামারের একাংশ অর্থাৎ Etymology বা শব্দের ব্যুৎপত্তি ও পদরচনা প্রণালী নিয়ে রচিত হ'য়ে থাকে। বাঙলা ভাষা সংস্কৃত ভাষার সঙ্গে যতই ঘনিষ্ঠ সম্পর্কসূত্রে আবদ্ধ হোক্ না কেন, বাঙলা ব্যাকরণ কিন্তু অনেকাংশে ইংরেজি গ্রামারের আদর্শেই রচিত হ'য়ে থাকে। কাজেই বাঙলা ব্যাকরণের এবং ইংরেজি ব্যাকরণের আলোচ্য বিষয়বস্তু প্রায় এক ও অভিন্ন। অতএব বাঙলা ব্যাকরণের অন্তর্ভুক্ত প্রকৃতিপ্রত্যয়াদি ব্যুৎপত্তি ও

শব্দসাধন সংস্কৃত ব্যাকরণসম্মত ; এতদ্‌তিরিক্ত বিষয়সমূহ ভাষাতত্ত্ব ও ভাষাবিজ্ঞানের তথা শব্দশাস্ত্রের অন্তর্গত। অর্থাৎ একালের বিচারে ব্যাকরণও সামগ্রিকভাবে ভাষা-সম্বন্ধীয় শাস্ত্র, এই বৃহত্তর শাস্ত্রের একটি অংশই **ব্যাকরণ**। ভাষাবিজ্ঞান এবং ব্যাকরণ—উভয়ের আলোচনাই বর্ণনামূলক (Descriptive) হওয়া সত্ত্বেও ব্যাকরণকে **বিধানমূলক** (Prescriptive) বলা হ'য়ে থাকে। ব্যাকরণের এই 'বিধান-মূলক' বা 'বিধিনিষেধ-মূলক' (Prescriptive) কিংবা নামান্তরে 'নির্দেশমূলক' (Normative) রূপ-বিষয়ে একালের ভাষাবিজ্ঞানীদের আপত্তি রয়েছে। মূলতঃ প্রাচীন ভারতে কিংবা গ্রীস দেশেও যে সমস্ত ব্যাকরণ রচিত হয়েছিল, ভাষা-ব্যাকৃত বা বিশ্লেষণ করে তার গঠন-প্রণালী বের করাই ছিল তাদের কাজ বা উদ্দেশ্য। শব্দাদির বিশ্লেষণে তার বাস্তব অবস্থার স্বরূপ-উদ্‌ঘাটনই একালের ভাষাবিজ্ঞানীদের উদ্দেশ্য ব'লে তারা বাস্তব ব্যাকরণের (positive grammar) কথা বলে থাকেন। প্রাচীন ব্যাকরণসমূহ ছিল বস্তুতঃ ঐ জাতীয় বাস্তব ব্যাকরণ। তাঁরা প্রচলিত ভাষা বিশ্লেষণ ক'রে তার স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করতেন। পরবর্তীকালের বৈয়াকরণদের কেবল লক্ষ্য ছিল—কোথাও কেউ পূর্বাগত ভাষা-ব্যবহার থেকে সরে যাচ্ছেন কিনা। ভাষা স্বাভাবিক ধর্ম-অনুযায়ী দেশকালানুযায়ী পরিবর্তিত হয়েই থাকে। মধ্যযুগের বৈয়াকরণগণ তখনই ব্যাকরণের বেড়াজাল তৈরি ক'রে তাদের বিধিনিষেধের আওতায় আনতে চেষ্টা করলেন। এইভাবেই বাস্তব ব্যাকরণ (positive grammar) ক্রমশঃ 'নির্দেশমূলক' (Normative) বা 'বিধিনিষেধমূলক' ব্যাকরণে (prescriptive grammar) পরিণত হয়। একালেও সেই মধ্যযুগের ধারাই প্রবাহিত হবার ফলে প্রচলিত ব্যাকরণগুলি নির্দেশমূলকই হ'য়ে রইল।

একালের শ্রেষ্ঠ ভাষাবিজ্ঞানী আচার্য সুনীতিকুমারও তাঁর 'ভাষাপ্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ' গ্রন্থে ব্যাকরণের যে সংজ্ঞা নির্দেশ করেছেন, সেখানে প্রচলিত রীতি-অনুযায়ী ব্যাকরণকে তার বাস্তব এবং নির্দেশাত্মক (positive and prescriptive) —উভয়বিধ সংজ্ঞার অধীনে দেখিয়েছেন। তিনি বলেন : "যে বিদ্যার দ্বারা কোনও ভাষাকে বিশ্লেষ করিয়া তাহার স্বরূপটি আলোচিত হয়, এবং সেই ভাষার পঠনে ও লিখনে এবং তাহাতে কথোপকথনে শুদ্ধরূপে তাহার প্রয়োগ করা যায়, সেই বিদ্যাকে সেই ভাষার ব্যাকরণ (Grammar) ব'লে।" কিন্তু একালের ভাষাবিজ্ঞানীরা বলেন যে ভাষার শুদ্ধি-অশুদ্ধি-নির্দেশের কোন এক্তিয়ার কোন বৈয়াকরণের নেই। বস্তুতঃ, অনেকেই মনে করেন যে ভাষায় অশুদ্ধ প্রয়োগ বলে কিছু না থাকাই সম্ভব। কারণ যে-কোন ভাষারই এত ঔপভাষিক, আঞ্চলিক, কিংবা ব্যক্তিগত প্রয়োগ হ'তে পারে

যে কথিত অশুদ্ধ রূপটি হয়তো বাস্তবে কোথাও-না-কোথাও প্রযুক্ত হয়। বিশিষ্ট ভাষাবিজ্ঞানী প্লীসন বলেন : "A legislative type of grammar is of very questionable value to a person who speaks the language, and absolutely worthless to a learner." এই কারণে একালে ব্যাকরণকে ভাষার বিশ্লেষণ-শাস্ত্র তথা ভাষাবিজ্ঞানেরই একটি অংশ বলে মনে করা হয়। আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানীদের অনেকেই তাঁদের ভাষাবিজ্ঞান-শাস্ত্রকে 'ব্যাকরণ' নামেই অভিহিত ক'রে থাকেন। কারণ উভয়ের আলোচনাই বর্ণনামূলক (descriptive)।

[দুই] শব্দবিদ্যার শ্রেণীবিভাগ

একালের শব্দশাস্ত্রের আলোচনা চতুর্বিধ উপায়ে সাধিত হয়। যথা—(১) বর্ণনাত্মক ভাষাবিজ্ঞান/ব্যাকরণ (Descriptive Linguistics/Grammar), (২) ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞান/ব্যাকরণ (Historical Linguistics/Grammar), (৩) তুলনামূলক ভাষাবিজ্ঞান/ব্যাকরণ (Comparative Linguistics/Grammar), (৪) দার্শনিক বা মনস্তাত্ত্বিক ভাষাবিজ্ঞান/ব্যাকরণ (Philosophical or Psychological Linguistics/Grammar)।

(১) **বর্ণনাত্মক ভাষাবিজ্ঞান/ব্যাকরণ**—কোন কালে প্রচলিত কোন একটি ভাষার বিচার-বিশ্লেষণ, রীতি ও প্রয়োগ-বিষয়ক আলোচনা এই ধারার উপজীব্য। এখানে ভাষাবিজ্ঞান ও ব্যাকরণের আলোচনায় একটু পার্থক্য রয়েছে। ভাষাবিজ্ঞানের আলোচনা একান্তভাবেই একটা নির্দিষ্ট কালে সীমাবদ্ধ থাকে, কিন্তু ব্যাকরণের আলোচনায় সেই কালসীমা কিছুটা প্রসারিত হয়, ভাষার প্রাচীন ইতিহাসও এখানে আলোচনার অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকে। 'করিতে, করিব, করিয়া' শব্দগুলোকে বর্ণনাত্মক ভাষাবিজ্ঞানে বিশ্লিষ্ট করা হ'বে সম্পূর্ণভাবে তার ব্যবহারিক গঠন-রীতির দিক্ থেকে—'করি+তে, করি+ব, করি+য়া' এমনিভাবে। কিন্তু ব্যাকরণে মূল ধাতুটি খুঁজে বার ক'রে তার প্রকৃতি-প্রত্যয় বিশ্লেষণ করা হ'বে এমনিভাবে—'কর্+ইতে, কর্+ইব, কর্+ইয়া'। একালে বর্ণনাত্মক ভাষাবিজ্ঞানের দু'টি শাখাই মাত্র কল্পিত হয়ে থাকে—(১) ব্যাকরণ, (২) ধ্বনিতত্ত্ব। "Descriptive linguistics is conventionally divided into two parts. *Phonology* deals with the phonomex and sequences of phonomex. *Grammar* deals with the morphomex and their combinations." (H. A. Gleason Jr.)।

সাম্প্রতিককালে বর্ণনাত্মক ভাষাবিজ্ঞানের আলোচনাই সর্বাধিক প্রাধান্য লাভ

করায় বিষয়টির একটি বিশদ আলোচনা প্রয়োজন। এই শাখাটি মূলতঃ কোন একটি ভাষার আলোচনা-সম্বন্ধেই সীমাবদ্ধ। তার আঞ্চলিক, গোষ্ঠীগত কিংবা ব্যক্তিগত প্রয়োগ বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ করে না কিন্তু ভাষাবিজ্ঞানীদের সাম্প্রতিকতম প্রবণতা যে 'সমকালিক' বা 'এককালিক ভাষাবিজ্ঞানে'র (পরপৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য) প্রতি, সেখানে প্রয়োগগত বৈশিষ্ট্যও আলোচিত হয়ে থাকে। চার্লস্ এফ্. হকেট বলেন, "*Descriptive linguistics* deals with the design of the language of some community of a given time ignoring impersonal and inter-group differences··· *Synchronic linguistics* includes *Descriptive linguistics* and also certain further types of investigation, *synchronic dialectology* which is the systemic study of inter-personal and inter-group difference of speech habits."

এই বর্ণনাত্মক ভাষাবিজ্ঞানই ক্রমবিকশিত হ'তে হ'তে বিভিন্ন ধারায় প্রবাহিত হ'চ্ছে। তার মধ্যে একটা বিশেষ উল্লেখযোগ্য ধারা সাম্প্রতিক কালে 'আঙ্গিকবাদ' 'অবয়ববাদ' বা 'গঠনসর্বস্ব' (structuralism) নামে অভিহিত। অতি প্রাচীন-কালেও অনেক মনীষী শব্দ বা বাক্যের গঠন সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে বস্তুতঃ তাদের উপাদান তথা উপাঙ্গের উপরই গুরুত্ব আরোপ করেছেন। কিন্তু একালের 'অবয়ববাদী'গণ দেখাতে চেয়েছেন যে, ধ্বনি, শব্দ, বাক্য সমস্ত মিলিয়ে তবে ভাষা সম্পূর্ণতা লাভ করে—জীবন্ত দেহের মতই ভাষার উপাদানগুলি দেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ মাত্র। তাঁদের মতে, "...language changes occur not in an individual or haphazard fashion but throughout the entire pattern or system of the language with a definite inter-relation linking the changes to one another."—বলেন মারিও পেই (Pei, Mario)।

বর্ণনাত্মক ভাষাবিজ্ঞানীদের সাধনার ধারা এখানেই শেষ হ'য়ে যায়নি, এর অতি-সাম্প্রতিক ধারায় একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন ঘটেছে। ষাটের দশকে নোয়াম চমস্কি গঠন-সর্বস্বতার বিরোধিতায় দাঁড় করালেন নোতুন তত্ত্ব—'রূপান্তরনীয় উৎপাদক ব্যাকরণ', 'রূপান্তরমূলক সৃজনমূলক ব্যাকরণ' বা 'সংবর্তনী সঞ্জননী ব্যাকরণ' (transformational creative grammar) নামক গ্রন্থে তিনি বলেন যে অঙ্গ-সর্বস্বতা কখনো মেনে নেওয়া যায় না—দেহে যেমন প্রাণসত্তার প্রয়োজন, ভাষায়ও তার প্রয়োজন। মানুষ নিজস্ব বোধবুদ্ধির সহায়তায় তার সীমাবদ্ধ জ্ঞানকে ভাষার মূলনীতির যথাযোগ্য প্রয়োগ দ্বারা সৃজনীশক্তির সাহায্যে পরিস্থিতির উপযোগী

ক'রে বাক্যরূপে সৃষ্টি করে থাকে। কাজেই শুধু ধ্বনি, শব্দ-আদি উপাদান নয়, শব্দের অর্থেরও বিশ্লেষণ প্রয়োজন। Manfred Bierwisch বলেন : "The command of language is thus a productive capacity, not merely the knowledge of an extensive nomenclature···The theory···is then, mainly concerned with accounting for how sentences are generated, and is appropriately called 'generative grammar".

(২) **ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞান/ব্যাকরণ**—কোন ভাষার সম্ভাব্য প্রাচীনতম রূপটি থেকে আরম্ভ ক'রে একাল পর্যন্ত তার ধারাবাহিক ক্রমবিবর্তনের ইতিহাস এই আলোচনার অন্তর্ভুক্ত হ'য়ে থাকে। আধুনিক কালে ব্যবহৃত কোন বাঙলা শব্দের আদিরূপ কি ছিল, কেমনভাবেই বা তা' ক্রমিক রূপান্তরের মধ্য দিয়ে এই বিশেষ শব্দটিতে পরিণতি লাভ করলো, ঐতিহাসিক ব্যাকরণের সাহায্যেই তা' দেখিয়ে দেওয়া সম্ভব।

(৩) **তুলনামূলক ভাষাবিজ্ঞান/ব্যাকরণ**—তুলনামূলক ভাষাবিজ্ঞান বা ব্যাকরণের আলোচ্য সীমা আরও বিস্তৃত। কোন বিশেষ ভাষার আলোচনা-প্রসঙ্গে তার দূরে বা নিকট-সম্পর্কিত অপর ভাষার সঙ্গেও তার সম্পর্ক নিরূপণ করা তুলনামূলক ভাষাবিজ্ঞানের কাজ। ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞানে বাঙলা ভাষার আদিরূপের কথা বলা হ'য়েছিল, তুলনামূলক ভাষাবিজ্ঞানে নিকট সম্পর্কিত অসমীয়া, ওড়িয়া, হিন্দী বা মারাঠীর মতোই দূর-সম্পর্কিত ইংরেজি-আদি ভাষার প্রসঙ্গও আসতে পারে।

(৪) **দার্শনিক বা মনস্তাত্ত্বিক বিচারমূলক ভাষাবিজ্ঞান/ব্যাকরণ**—ভাষার অন্তর্নিহিত চিন্তাপ্রণালীটি অবলম্বন করে ভাষার রূপের উৎপত্তি এবং বিবর্তন-বিচারই এই ধারার আলোচ্য বিষয়।

(ক) **চতুর্বিধ ধারার পারস্পরিক সম্পর্ক :** আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় দৃষ্টান্তের সাহায্যে উপর্যুক্ত **চারিটি ধারার সম্পর্ক** বুঝিয়ে দিয়েছেন নিম্নোক্তরূপে :

" বর্ণনাত্মক ব্যাকরণ কেবল এইটুকুই বলিয়া ক্ষান্ত হয় যে, বাংলায় বিশেষ্যের সম্বন্ধ পদে 'র' বা '-এর' বিভক্তি যুক্ত হয়, সর্বনামে উত্তম-পুরুষে একবচনে 'আমি' শব্দ বিদ্যমান, ক্রিয়ার অতীতে '-ইল'-প্রত্যয় যুক্ত হয় এবং ক্রিয়ার বিশেষণে 'যেন, হেন, কেন', প্রভৃতি পদের ব্যবহার আছে ও বিশেষ বিশেষ অর্থে এগুলি প্রযুক্ত হয়। এইপ্রকার উপদেশ বা শিক্ষা, বাঙলা ভাষার প্রয়োগ-শিক্ষার পক্ষে যথেষ্ট। ঐতিহাসিক ও তুলনামূলক ব্যাকরণের প্রসাদে আমরা '-র, -এর', '-ইল-' প্রভৃতি

প্রত্যয়ের উৎপত্তি বুঝিতে পারি,—কেমন করিয়া সংস্কৃতের সম্বন্ধপদ-বাচক বিভক্তি-সমূহের লোপ হইল, কেমন করিয়া প্রাকৃতে 'কার্য' শব্দ হইতে উৎপন্ন '-কের' শব্দের ব্যবহার সম্বন্ধপদে আসিয়া গেল ও কিভাবে এই '-কের' ও '-কর' হইতে বাঙ্‌লায় '-এর '-অর' দাঁড়াইল—কেমন করিয়া সংস্কৃতের অতীতকালের ক্রিয়াপদগুলি লোপ পাইল, 'ইত' বা '-ত' প্রত্যয়-নিষ্পন্ন ক্রিয়াপদ অতীতকালে ব্যবহৃত হইতে লাগিল, প্রাকৃতে এই '-ইত, -ত' প্রত্যয় '-ইঅ, -অ'-তে পরিবর্তিত হইল এবং প্রাকৃতের '-ইল্ল' প্রত্যয় এই '-ইঅ' -অ'-তে যুক্ত হইতে লাগিল, ও পরে '*-ইঅ-ইল্ল' হইতে ক্রমে বাঙ্‌লার অতীতকালের ক্রিয়ার চিহ্ন '-ইল'-প্রত্যয়ের উৎপত্তি ঘটিল (যেমন, 'চলিত—চলিঅ—* চলিঅ-ইল্ল—* চলিল্ল—চলিল'); 'যেন, হেন, কেন' প্রাচীন বাঙ্‌লায় 'কেনহ, এহেন' বা 'জেহেন, এহেন, কেহেন' রূপে ছিল; এবং বাঙলার নিকট-আত্মীয় মৈথিলী ভাষার 'জেহন, এহন, কেহন'-এর সঙ্গে প্রাচীন বাঙ্‌লার রূপগুলির সাদৃশ্য যথেষ্ট বিদ্যমান; ইহাদের মূলরূপ ছিল সংস্কৃতের 'যাদৃশ-' ঈদৃশ-, কীদৃশ-'; এই সমস্ত বিষয়, ঐতিহাসিক ও তুলনামূলক ব্যাকরণে আলোচিত হইয়া থাকে। দার্শনিক বিচারমূলক ব্যাকরণে, সম্বন্ধ পদের বা অতীতকালের ক্রিয়ার অন্তর্নিহিত চিন্তাধারার দার্শনিক আলোচনা করিয়া, ইহাদের যোগ্যতা বিচার হইয়া থাকে।

"বর্ণনাত্মক ব্যাকরণ—অর্থাৎ 'ব্যাকরণ' বলিলে আমরা সাধারণতঃ যাহা বুঝিয়া থাকি—তাহা হইতেছে 'ভাষাশিক্ষার পদ্ধতি বা সাধন' (Art of Language); ঐতিহাসিক ও তুলনামূলক ব্যাকরণ হইতেছে 'ভাষাবিজ্ঞান' (Science of Language); দার্শনিক-বিচারমূলক ব্যাকরণ হইতেছে 'ভাষা-বিষয়ক দর্শন' (Philosophy বা Psychology of Language)।"

[তিন] সমকালিক/ঐককালিক (Synchronic) এবং কালানুক্রমিক (Diachronic) ভাষাবিজ্ঞান

ভাষাবিজ্ঞান-সম্পর্কিত পূর্বোক্ত আলোচনায় দেখা গেছে যে, ভাষার আলোচনা তিনভাবে সম্ভবপর:—(১) ভাষার ঐতিহাসিক কালক্রম-অনুসরণে যে কোন ভাষার উদ্ভব-বিষয়ক আলোচনা 'ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞান':—যথা 'কালানুক্রমিক ভাষা-বিজ্ঞান' (Diachronic linguistics), ও (২) বিভিন্ন ভাষার তুলনামূলক আলোচনার সাহায্যে কোন ভাষার উৎস নির্ণয় ও গঠন-বিশ্লেষণমূলক 'তুলনামূলক ভাষাবিজ্ঞান' (Comparative linguistics)। বর্তমান কালে এটিকে আর ভাষাবিজ্ঞানের কোন পৃথক শাখার অন্তর্ভুক্ত করা হয় না। কারণ ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞানের সঙ্গে যেমন

এর নানাবিষয়ে সামান্যতা আছে, তেমনি রয়েছে নিম্নকথিত বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানের সঙ্গেও। বস্তুতঃ তুলনামূলক আলোচনাকে ভাষাবিজ্ঞানের কোন বিশেষ শাখা-রূপে বিচার না ক'রে তাকে একটি বিশেষ রীতি বা পদ্ধতি-রূপে গ্রহণ করাই সঙ্গত। এবং (৩) কোন একটি বিশেষ ভাষার বিশেষ কালে সীমাবদ্ধ রূপ অবলম্বন ক'রে যে আলোচনা সাধিত হয়, তাকে বলা হয় 'সমকালিক' বা 'এককালিক ভাষাবিজ্ঞান' (synchronic linguistics)। 'কালানুক্রমিক ভাষাবিজ্ঞান'কে যেমন সাধারণভাবে 'ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞান' নামে অভিহিত করা হয়, তেমনি 'সমকালিক ভাষাবিজ্ঞান'কেও 'বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞান' (descriptive linguistics) নামে অভিহিত করা হয়।

সমকালিক ভাষাবিজ্ঞান এবং বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানকে সমার্থক বলে গ্রহণ করা হ'লেও বস্তুতঃ এতদুভয় ভাষার মধ্যে একটু সূক্ষ্ম পার্থক্য বর্তমান রয়েছে। সমকালিক ভাষাবিজ্ঞানের আলোচনাক্ষেত্র অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত। কোন একটি ভাষার সমকালীন তথা একই কালে একাধিক রূপ থাকাই স্বাভাবিক। উপভাষিক, দ্বৈভাষিক এবং আঞ্চলিক রূপভেদ-ছাড়াও গোষ্ঠীগত বা ব্যক্তিগত প্রবণতার ফলেও ভাষার গঠন বা উচ্চারণগত যে সমস্ত বৈলক্ষণ্য দেখা দেয়, সমকালিক ভাষাবিজ্ঞানে সেটিও আলোচনার অন্তর্ভুক্ত হ'বার দাবি রাখে। কিন্তু বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানে কোন বিশেষ ভাষার কোন একটি তাৎকালিক রূপই (বিশেষভাবে কথ্যরূপটিই) আলোচ্য সীমার অন্তর্ভুক্ত হ'য়ে থাকে। এই ভাষার তথা শব্দাদির উদ্ভব বা বিকাশ যেমন আলোচনা-পরিধির বহির্ভূত, তেমনি এর সমকালীন রূপান্তরও আলোচনার বিষয় নয়।

যে কোন ভাষার গঠনগত বিশ্লেষণের সাহায্যে তার স্বরূপ-সন্ধানই বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানের কাজ। আমাদের প্রচলিত ব্যাকরণেও ভাষার গঠন-বিশ্লেষণ রয়েছে, তাই এক অর্থে ব্যাকরণও অনেকাংশে বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানেরই অঙ্গ, কিন্তু সর্বাংশে নয়, কারণ প্রচলিত ব্যাকরণগুলি 'বিধিনিষেধমূলক'' (prescriptive) বলেই ভাষাবিজ্ঞানের সঙ্গে এইখানে পার্থক্য। যথার্থ বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানে শুধু ভাষার গঠনগত বিশ্লেষণটুকুই থাকবে। এর ব্যবহার, সামাজিক মূল্য কিংবা শুদ্ধাশুদ্ধ বিচারের দায় তার নয়। প্রাচীনতম সংস্কৃত বৈয়াকরণ পাণিনির অষ্টাধ্যায়ীকে যথার্থ বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞান-রূপে গ্রহণ করা চলে। ভাষাবিজ্ঞানী গ্লীসন বলেন: "And it should be a source of humility to modern linguists to recognise that the most successful and complete description is very probably still the Sanskrit grammar of Panini and

his associates antedating modern deseriptive linguistics by millenia.".

[চার] শব্দশাস্ত্রের আলোচ্য বিষয়

শব্দবিদ্যার আলোচনার পরিধি এত বিস্তৃত যে, আলোচ্য বিষয়-অনুযায়ী এর বর্গীকরণ প্রয়োজন। অবশ্য বর্গীকরণের ব্যাপারে শব্দশাস্ত্রীরা সব সময় অভিন্নমত হ'তে পারেন না। তথাপি সাধারণভাবে গৃহীত শ্রেণীবিভাগই এখানে অনুসৃত হ'লো। তদনুযায়ী শব্দশাস্ত্রের আলোচ্য বিষয়—(১) পদবিধি বা বাক্যতত্ত্ব (Syntax), (২) রূপতত্ত্ব (Morphology), (৩) ধ্বনিতত্ত্ব (Phonology), (৪) শব্দার্থতত্ত্ব (Semantics)। এতদতিরিক্ত (৫) 'ভাষা-আধারিত প্রত্ন ইতিহাস' (Linguistic Palaeontology) নামক একটি বিষয়কেও অনেকেই শব্দবিদ্যা-আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করে থাকেন. অবশ্য শব্দার্থতত্ত্বের সঙ্গেই এটি বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট।

১. **পদবিধি/বাক্যতত্ত্ব** (Syntax)—ভাষার মূলে ভিত্তি বাক্য। মানুষ বাক্যের সাহায্যেই মনোভাব প্রকাশ ক'রে থাকে বলে বাক্যকেই ভাষার মূল এককরূপে গ্রহণ করা হয়। বাক্যের মধ্যে পদের ক্রম, পদের অবস্থান ও বিশ্লেষণ এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। সংস্কৃত ভাষায় পদসংস্থানের কোন নির্দিষ্ট নিয়ম না থাকায় সংস্কৃত ব্যাকরণে বাক্যতত্ত্ব বিষয়টি তত গুরুত্ব লাভ করেনি। আধুনিক বাক্যতত্ত্বের দুটি বিভাগ কল্পিত হ'য়ে থাকে :—(ক) **ঐতিহাসিক বাক্যতত্ত্ব** (Historical syntax) এবং (খ) **তুলনাত্মক বাক্যতত্ত্ব** (Comparative syntax)। পদবিধির ঐতিহাসিক অধ্যয়নই ঐতিহাসিক বাক্যতত্ত্বের আলোচ্য বিষয়। কিন্তু প্রাচীন জাতির মনস্তত্ত্ব অধিগত না হ'লে তাদের পদবিধি সম্বন্ধে সুনিশ্চিতভাবে কিছু জানা সম্ভব নয়। তুলনাত্মক বাক্যতত্ত্বের অধ্যয়নেও তেমনি এক সমস্যা—প্রায় কোন মানুষের পক্ষেই একাধিক ভাষাকে সমানভাবে আয়ত্ত করা সম্ভব নয় বলেই এখনও পর্যন্ত শব্দবিদ্যার এই শাখাটি যথোপযুক্তভাবে আলোচিত হয়নি। তৎসত্ত্বেও যে কোন ভাষার প্রচলিত বাক্যতত্ত্ব বা পদবিধি বিষয়ে কিছু সাধারণ সূত্র নির্ধারণ খুব অসাধ্য ব্যাপার নয় বলেই, প্রচলিত ব্যাকরণে কিংবা ভাষাবিদ্যা গ্রন্থে এজাতীয় প্রচেষ্টা দুর্লক্ষ্য নয়।

২. **রূপতত্ত্ব** (Morphology)—বাক্যের ভিত্তি পদ বা শব্দ। শব্দের গঠনপ্রণালীর বিশ্লেষণই রূপতত্ত্বের প্রধান আলোচ্য বিষয়। সংস্কৃত ব্যাকরণে রূপতত্ত্বেরই একান্ত প্রাধান্য লক্ষিত হয়ে থাকে। শব্দ ও পদ-সাধন (Etymology/Affixation ও

Inflexion), কৃৎ-তদ্ধিতাদি প্রত্যয় (Primary and Secondary Formative Affixes), সমাস (Compounds), সুপ্-তিঙ্ বিভক্তি (Noun and Verb Inflexion), অব্যয়/নিপাত (Indeclinables, particles) তথা সংস্কৃত ব্যাকরণের বিষয়াবলীই রূপতত্ত্বের বা প্রক্রিয়ার (Accidence) আলোচ্য বিষয়। ইংরেজি বাঙলা প্রভৃতি ভাষায় প্রাচীন প্রত্যয়-বিভক্তিসমূহ বিলুপ্ত হবার ফলে রূপতত্ত্ব অপেক্ষা বাক্যতত্ত্বের আলোচনাই অধিকতর গুরুত্বলাভ করেছে, কারণ এখন বাক্যে পদের অবস্থানের উপর তার অর্থসঙ্গতি অনেকখানি নির্ভর করছে।

৩. **ধ্বনিতত্ত্ব** (Phonology)—শব্দের বিশ্লেষণে পাওয়া যায় কতকগুলো ধ্বনি। ধ্বনিবিষয়ক আলোচনাই ধ্বনিতত্ত্বের উপজীব্য। কোন এক ভাষায় প্রাচীনকাল থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত ধ্বনির বিবর্তন-বিষয়ক আলোচনা ঐতিহাসিক ধ্বনিতত্ত্ব এবং বিভিন্ন ভাষার ধ্বনিসমূহের তুলনামূলক আলোচনাই তুলনাত্মক ধ্বনিতত্ত্ব। ধ্বনিতত্ত্বের সম্পর্কিত অপর দুটি আলোচ্য বিষয় (ক) **ধ্বনিবিজ্ঞান** (Phonetics) ও (খ) **ধ্বনিবিচার** (Phonemics)। বাগ্‌যন্ত্র ও শ্রবণযন্ত্রের শারীর-বিশ্লেষণ এবং ধ্বনির প্রকৃতিবিচার ও শ্রেণীবিভাগও ধ্বনিবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়। সাম্প্রতিক কালে ধ্বনিবিচার শাখাটি যথেষ্ট গুরুত্ব সহকারে অধীত হচ্ছে। কোন ধ্বনির প্রকৃতি এবং অনুরূপ ধ্বনির সঙ্গে তার পার্থক্য-নির্ণয় ধ্বনিবিচারের আলোচ্য বিষয়। কোন বিশেষ ভাষার ধ্বনিসমূহের যথাযথ ব্যবহারিক বিচার-বিশ্লেষণও ধ্বনিবিচারের অন্তর্ভুক্ত। বিভিন্ন যান্ত্রিক পদ্ধতির সহায়তায় এই শাখার সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ এখন সম্ভবপর; বর্তমানে শাখাটি অনেকখানি বিজ্ঞাননির্ভর।

৪. **শব্দার্থতত্ত্ব/বাগর্থ-বিজ্ঞান** (Semantics)—শব্দের অর্থ-পরিবর্তনের ইতিহাসই মূলত শব্দার্থতত্ত্ব বা বাগর্থ-বিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়। শব্দবিদ্যার আলোচনায় প্রথম তিনটি বিষয়কে যদি বলা যায় ভাষার দেহ-বিষয়ক আলোচনা, তবে অর্থকে বলতে হয় ভাষার আত্মা; শব্দার্থতত্ত্বের আলোচনা তাই ভাষাদেহকে অবলম্বন করে নয়, তার আত্মাকে অবলম্বন ক'রে। মানব-মস্তিষ্কের সঙ্গে এর সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর ব'লেই শব্দার্থতত্ত্ব বিষয়টি অতিশয় কৌতূহলোদ্দীপক।

৫. **ভাষা-আধারিত প্রত্ন-ইতিহাস** (Linguistic Palaeontology)—শব্দবিদ্যার ইতিহাসে সম্ভবতঃ এইটি নবীনতম শাখা। এই শাখাটি-বিষয়ে এখনও বহু ভাষায় কোন আলোচনাই শুরু হয়নি, যদিচ এই শাখাটির গুরুত্ব অসাধারণ। কোন জাতির প্রাচীনতম ইতিহাসের সন্ধান পাওয়া যেতে পারে শব্দবিদ্যার এই শাখাটি থেকেই। তুলনামূলক ভাষাবিশ্লেষণ এবং তার অর্থ-পরিবর্তন থেকে যখন কোন জাতির প্রাচীন

ইতিহাসের কোন কোন উপাদান আহরণ করা যায়, তখনই ভাষা-আধারিত প্রত্ন-ইতিহাস আলোচনার গুরুত্ব উপলব্ধি করা যায়।

৬. **অন্যান্য** ঃ ভাষাবিজ্ঞান-বিষয়ক আলোচনা যতই উন্নতি ও ব্যাপকতা লাভ করছে, ততই তার অন্তর্ভুক্ত আলোচ্য বিষয়গুলিও স্বতন্ত্রতা লাভ ক'রে প্রত্যেকেই প্রায় পৃথক শাখার মর্যাদা দাবি করতে চলেছে। ফলতঃ এখন আরও কয়েকটি বিষয়কে ভাষাবিজ্ঞানের বিভাগ বা উপবিভাগ-রূপে স্বীকার ক'রে নিতে হয়। এদের মধ্যে রয়েছে—(ক) উপভাষাতত্ত্ব (Dialectology), (খ) ভৌগোলিক ভাষাতত্ত্ব (Geolinguistics) (গ) লিপিতত্ত্ব (Graphics), (ঘ) পার্থক্যমূলক ভাষাতত্ত্ব (Contrastive grammar), (ঙ) অভিধানবিজ্ঞান (Lexicography) ও (চ) শৈলীবিজ্ঞান (Stylistics) এবং হয়তো বা আরো কিছু।

[পাঁচ] শব্দবিদ্যার সঙ্গে অপর শাস্ত্রসমূহের সম্পর্ক

কোন বিদ্যা বা শাস্ত্রই এককভাবে সম্পূর্ণ নয়; বিদ্যার বহুধাবিভক্ত শাখাসমূহের কোন একটির সঙ্গে অপর কোন এক বা একাধিক শাখার সম্পর্ক অবশ্যই খুঁজে পাওয়া যায়, বিশেষতঃ কোন শাখা যদি মানবজাতির সঙ্গে সম্পর্কিত থাকে। শব্দবিদ্যা একান্তভাবেই মানবজাতি-সম্পর্কিত বলে মানুষের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত অপর অনেক শাস্ত্রের সঙ্গেই শব্দবিদ্যার সহজ সম্বন্ধ খুঁজে পাওয়া যায়। এদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ঃ—(১) সাহিত্য, (২) ইতিহাস, (৩) ভূগোল, (৪) দর্শন, (৫) মনস্তত্ত্ব, (৬) শারীরবিজ্ঞান, (৭) সমাজবিজ্ঞান, (৮) পদার্থবিজ্ঞান, (৯) রাশিবিজ্ঞান প্রভৃতি।

১ **সাহিত্য ও ব্যাকরণ** (Literature and Grammar)—শব্দবিদ্যা সাহিত্যের সঙ্গে অতিশয় ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত। বস্তুতঃ সাহিত্যের সহযোগিতা ছাড়া ঐতিহাসিক ও তুলনাত্মক ভাষাবিজ্ঞান আলোচনার কথা কল্পনাই করা যায় না। প্রাচীন সংস্কৃত ভাষা বা গ্রীক সাহিত্যের সহায়তা ছাড়া এ বিষয়ে আলোচনা আরম্ভ করাই সম্ভব হতো না। আবার বর্ণনাত্মক ভাষাবিজ্ঞানের যথাযথ আলোচনার জন্য জীবিত ও প্রচলিত সাহিত্যের উপযোগিতা স্বীকার করতে হয়। চর্যাপদ না পেলে বাঙলা ভাষার ঐতিহাসিক আলোচনা সম্পূর্ণ হতো না। সঙ্গে সঙ্গে একথাও স্বীকার্য যে ভাষাবিজ্ঞানের সহায়তায়ই চর্যাপদগুলোর যথার্থ পাঠ উদ্ধার ক'রে তাকে সাহিত্যরূপে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। অতএব শব্দবিদ্যা-আলোচনায় যেমন সাহিত্যের উপযোগিতা আছে, তেমনি সাহিত্যও কোন কোন ক্ষেত্রে শব্দবিদ্যার উপর নির্ভরশীল হ'তে পারে—বস্তুতঃ এতদুভয়ের মধ্যে একটা অঙ্গাঙ্গী সম্পর্কের কল্পনা করা চলে। এই প্রসঙ্গে ব্যাকরণের সঙ্গে শব্দবিদ্যার সম্পর্কটির কথাও উল্লেখ

করা চলে। ব্যাকরণ বস্তুতঃ শব্দবিদ্যারই অঙ্গবিশেষ। (পূর্বে এই বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে। তাই এখানে পৃথগ্‌ভাবে ব্যাকরণ-বিষয়ে আর আলোচনা হ'লো না।)

২ **ইতিহাস** (History)—রাজনৈতিক, ধর্মীয় এবং সামাজিক – ইতিহাসের এই তিনটি ধারার সঙ্গেই শব্দবিদ্যার সম্পর্ক বিদ্যমান। ভারতে যে যুগে যুগে বিভিন্ন ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীর আগমন ঘটেছিল এবং এখানে যে দীর্ঘকাল ফারসীভাষী এবং ইংরেজি-ভাষীরা রাজত্ব করে গেছে, শব্দবিদ্যার অধ্যয়নেই সেই ইতিহাস জানা যেতে পারে যদি অন্য ইতিহাস লোপও পায়। প্রাচীন বৈদিক যুগের ইতিহাস জানতে গেলে তৎকাল-প্রচলিত শব্দসমূহের প্রকৃত অর্থ নিরূপণ করা আবশ্যক এবং সে কাজও শব্দবিদ্যারই। প্রাচীন সামাজিক ইতিহাস উদ্ধার করার কাজও তো শব্দবিদ্যারই। প্রাচীন ভারতীয এবং য়ুরোপীয় আর্যভাষায় 'বিধবা' (widow) শব্দের অস্তিত্ব থেকে অনুমান করা চলে যে আদি আর্যসমাজে স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রীকে বৈধব্য জীবনযাপন করতে হ'তো ; পক্ষান্তরে 'বিপত্নীক' শব্দের এরূপ কোন প্রতিশব্দ অন্যান্য ভাষায়ও প্রচলিত না থাকায় অনুমান করা চলে, স্ত্রীর মৃত্যুর পর স্বামীদের পুনর্বিবাহে কোন বাধা ছিল না। 'মাতৃস্বসা, পিতৃস্বসা'-আদি শব্দ থেকে সহজেই বোঝা যায় যে প্রাচীন ভারতীয় সমাজ-ব্যবস্থায় 'মাসী, পিসি' পরিবারের অন্তর্ভুক্ত হ'তে পারতেন, কিন্তু 'মেসো, পিসে' প্রভৃতির কোন প্রতিশব্দ না থাকায় অনুমান করা যায়, পরিবারে তাঁদের কোন ঠাঁই ছিল না। অতএব ইতিহাস এবং শব্দবিদ্যা—এতদুভয়ই যে পরস্পরনির্ভর, তা' প্রমাণিত তথ্য। শব্দবিদ্যার একটি প্রধান শাখাই যে 'ঐতিহাসিক ভাষাতত্ত্ব' রূপে পরিচিত, তা' থেকেই ইতিহাসের সঙ্গে ভাষাবিদ্যার নিগূঢ় সম্পর্কের কথা বোঝা যায়।

৩. **ভূগোল** (Geography)—ভৌগোলিক পরিবেশ যে মানুষের দেহ ও মনের উপর অসাধারণ প্রভাব বিস্তার ক'রে থাকে এবং ফলতঃ তা ভাষায়ও প্রসারিত হয়, একথা অস্বীকার করবার উপায় নেই। ভৌগোলিক পরিবেশের ফলে প্রাচীন গ্রীস খণ্ড ক্ষুদ্র নগররাষ্ট্রে বিভক্ত ছিল এবং প্রতি রাষ্ট্রের প্রাচীন ভাষা পরিবেশ-অনুযায়ী বিবর্তিত হ'তে হ'তে এমনভাবে পরিবর্তিত হয়েছিল যে এথেনীয়গণ ম্যাসিদনীয়দের ভাষাকে 'বর্বর ভাষা' বলে বিবেচনা করতো, অথচ উভয় ভাষাই এক মূল ভাষার সন্তান। আবার ভাষাও ভূগোল পাঠে অনেকখানি সহায়তা করতে পারে। প্রাচীন বৈদিক ভাষা থেকেই আমরা প্রাচীন ভারতের ভৌগোলিক পরিচয় লাভ করতে পারি ;

এ বিষয়ে ভাষা থেকে নির্ভরযোগ্য অপর কোন উপাদান আমাদের হাতে নেই। উপভাষা বিষয়ে আলোচনার ক্ষেত্রে ভূগোলের সহায়তা অপরিহার্য।

৪. **দর্শন** (Philosophy)—বর্ণনাত্মক ভাষাবিজ্ঞানের সঙ্গে দর্শনের কোন প্রত্যক্ষ যোগ না থাকলেও ব্যাখ্যামূলক অংশে তর্কশাস্ত্রের (Logic) উপযোগিতা প্রশ্নাতীত। বস্তুতঃ, যাস্কের 'নিরুক্ত' গ্রন্থে তর্কশাস্ত্রের যথেষ্ট প্রভাব বিদ্যমান। শব্দবিদ্যার যে অংশকে **বাগর্থবিজ্ঞান** বা **শব্দার্থতত্ত্ব** বলা হয়, তার আলোচনা দার্শনিক তত্ত্বের মুখাপেক্ষী। প্রাচীন বাংলার প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক জগদীশ তর্কালঙ্কারের 'শব্দশক্তি-প্রকাশিকা'র কথা এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। ন্যায়শাস্ত্রে 'শব্দ'-বিষয়ে বিশেষ পাঠ গ্রহণ করতে হ'তো।

৫. **মনস্তত্ত্ব** (Psychology)—মানুষের 'কথা বলা' ব্যাপারটা অর্থাৎ ধ্বনির উৎপত্তি একটা দৈহিক ক্রিয়া হ'লেও এর পেছনে যে মস্তিষ্ক তথা মন সর্বাধিক কার্যকর ভূমিকা গ্রহণ করে, তা' একালের বিজ্ঞানীরা স্বীকার করে নিয়েছেন। অতএব ভাষাব্যবহারে মনস্তত্ত্বের ভূমিকা অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ বলেই মানতে হয়। বিশেষতঃ শব্দার্থ-পরিবর্তনের ব্যাপারে মনস্তত্ত্বই সর্বাধিক প্রভাব বিস্তার ক'রে থাকে। আবার মনস্তত্ত্বের উপরও ভাষা ব্যবহারের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। মনস্তাত্ত্বিকগণ ভাষা, শব্দ, উচ্চারণ আদি লক্ষ্য করেই মনোরোগীর চিকিৎসা করে থাকেন। অতএব শব্দবিদ্যা এবং মনস্তত্ত্ব পারস্পরিক সম্পর্কে সম্বন্ধযুক্ত।

৬. **শারীরবিজ্ঞান** (Physiology)—বাগ্‌যন্ত্রের সাহায্যে উচ্চারিত ধ্বনিকে অবলম্বন করেই ভাষাদেহ গড়ে ওঠে। অতএব শব্দের উচ্চারণ, শ্রবণ এবং লিখিত ভাষার দর্শন ও পঠন-আদি যাবতীয় ক্রিয়াই দৈহিক প্রক্রিয়ার বিভিন্ন রূপ, অতএব একান্তভাবেই শারীরবিজ্ঞানের সঙ্গে যুক্ত। আধুনিক কালে ভাষাবিজ্ঞানের পঠন-পাঠনে প্রযুক্তিবিদ্যার যে সহায়তা গ্রহণ করা হয়, অনেক সময় শারীরবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তা' এক ও অভিন্ন হ'য়ে থাকে। অতএব শারীরবিজ্ঞান ও ভাষাবিজ্ঞানের মধ্যে এক অবিচ্ছেদ্য বন্ধন কল্পনা করা যায়।

৭. **সমাজবিজ্ঞান** (Sociology)—সমাজবিজ্ঞান এবং এর শাখা **নৃ-বিজ্ঞানের** (Anthropology) সঙ্গে ভাষাবিজ্ঞানের সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ। ভাষার ইতিহাস যেমন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত, তেমনি মানুষই ভাষার মূল আশ্রয়হেতু মানুষকে অবলম্বন করেই ভাষার উদ্ভব ও বিকাশ ঘটেছে ও ঘটছে। সমাজবিবর্তনের যে সকল সূত্র কালস্রোতে বিলীন হ'য়ে গেছে, ভাষাই সেখানে যোগাযোগ স্থাপনের একমাত্র সেতুরূপে বর্তমান। প্রাচীন মানুষের জাতি-

নির্ণয়েও ভাষার ভূমিকা অপরিহার্য। সিন্ধু সভ্যতা এবং দক্ষিণ আমেরিকার মায়া, আজ্‌তেক প্রভৃতি সভ্যতার যে নিদর্শন তাদের সীলমোহরে আবদ্ধ এবং অপঠিত রয়েছে, তাদের পাঠোদ্ধার সম্ভব হলে তত্রত্য অধিবাসীদের জাতি-নির্ণয়ও সহজসাধ্য হ'তে পারে। অতএব শব্দবিদ্যার সঙ্গে সমাজবিজ্ঞানের সম্পর্কের গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

৮ **পদার্থবিজ্ঞান** (Physics)—পদার্থবিজ্ঞানের একটি শাখা **ধ্বনি** (Sound), বস্তুতঃ এই ধ্বনিই শব্দবিদ্যারও মূল আশ্রয়। অতএব ধ্বনি-বিষয়ক আলোচনা এবং তার প্রয়োগ পদ্ধতিও উভয়ত্র প্রায় সমান। পদার্থবিজ্ঞানের অপর একটি আলোচ্য বিষয় **শব্দ-রাশিবিজ্ঞান** (Accoustics) আবার ধ্বনিবিজ্ঞানেরও একটি আলোচ্য বিষয়। এতএব পদার্থবিজ্ঞানের সঙ্গে শব্দবিদ্যার সম্পর্ক অবশ্যই স্বীকার ক'রে নিতে হবে।

৯. **রাশিবিজ্ঞান** (Statistics)—ভাষাবিজ্ঞানের একটি সাম্প্রতিক শাখা গড়ে উঠেছে, যাকে বলা যায় **শব্দবিজ্ঞান** (Lexico Statistics)—ভাষার পরিবর্তন ও ক্ষতি-নির্ণয়-প্রসঙ্গে এই পদ্ধতিটি ব্যবহৃত হ'য়ে থাকে। বলা বাহুল্য, বিষয়টি রাশিবিজ্ঞানের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত।

প্রথম খণ্ড

ভাষাবিজ্ঞান

LINGUISTICS

প্রথম অধ্যায়

ভাষা

(Language)

[এক] ভাষার সংজ্ঞা ও রূপভেদ

মনুর সন্তান মানব এবং ইংরেজি 'man' একই ধাতুমূলক 'মন্' থেকে উৎপন্ন— যার সঙ্গে যুক্ত রয়েছে মননশীলতার ধর্ম। এই মননশীলতা তথা মনোভাব প্রকাশের বিশেষ ক্ষমতা রয়েছে মানুষের মধ্যে, এই বিচারেই মানুষ অপর সকল প্রাণী থেকে স্বতন্ত্র। সাধারণতঃ তিনপ্রকার উপায়ে মানুষ আপন মনের ভাব প্রকাশ করে থাকে: (ক) সংকেত বা ইঙ্গিত, (খ) ভাষা, (গ) লিপি।

সংকেত বা ইঙ্গিত বিভিন্ন উপায়ে সাধিত হ'তে পারে—যেমন করতালি, চোখের ইশারা, বংশীধ্বনি প্রভৃতি। ইঙ্গিতের সাহায্যে মনোভাবের অংশমাত্রই প্রকাশিত হ'তে পারে, যুক্তি ও বুদ্ধির অধিকারী মানুষের পক্ষে এই সাংকেতিক ভাববিনিময় কখনও যথেষ্ট বলে বিবেচিত হ'তে পারে না, এ নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর।

[স্পষ্ট উচ্চারিত অর্থযুক্ত ধ্বনিসমষ্টি তথা শব্দের সাহায্যে মানুষ যখন পরস্পরের সঙ্গে ভাব-বিনিময় ক'রে থাকে, তখনই তাকে বলা হয় **ভাষা**।] মানুষ ছাড়াও অন্যান্য প্রাণী নানা প্রকার ধ্বনির সাহায্যে ভাবের আদান-প্রদান ক'রে থাকে, কিন্তু তা' এতই যৎ-সামান্য যে এগুলোকে ভাষা বলা চলে না। বস্তুতঃ এগুলো ধ্বনিময় সংকেতের অতিরিক্ত কিছু নয়। সামাজিক জীব মানুষের প্রয়োজনের সীমা নেই, তাই ভাব-প্রকাশের জন্য ভাষার প্রয়োজনও অপরিসীম—বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজনানুরূপ ভাষারও শ্রীবৃদ্ধি এবং বিবর্তন ঘটতে পারে। (স্থানগত ও কালগত ব্যবধানে ভাষার রূপান্তর ঘটে, তাই দেশে দেশে কালে কালে মানবসমাজে বিভিন্ন ভাষার সৃষ্টি হয়ে থাকে।) ভাষার আদান-প্রদান চলে মুখে মুখে, তাই সাধারণভাবে বলা চলে যে ভাষামাত্রই 'মৌখিক ভাষা'। এই হিশেবে ভাষার একটা সীমাবদ্ধতা স্বীকার করে নিতে হয়, কারণ সমকালে এবং সন্নিধানেই শুধু বাগ্-ব্যবহার সম্ভবপর। অবশ্য আধুনিক যুগে বিজ্ঞানের সহায়তা মানুষকে অসাক্ষাতেও মৌখিক ভাষা ব্যবহারের সুযোগ ক'রে দিয়েছে। তাহ'লেও মৌখিক ভাষার ক্ষণস্থায়িত্বকে অস্বীকার করা চলে না। যুক্তি-বুদ্ধিসম্পন্ন মননশীল মানুষ অবশ্যই দীর্ঘকাল তার এই অমূল্য সম্পদ ভাষাকে এমন অবস্থায় রাখেনি।

মানুষ তার ক্ষণস্থায়ী ভাষাকে যে উপায়ে সমস্থানকালাতিশায়ী রূপদান করলো তাকেই বলা হয় '**লিপি**'। মনোভাব-প্রকাশক ক্ষণস্থায়ী ভাষাকে এই লিপির সাহায্যেই

দীর্ঘ জীবন দান করা হয়, যাতে এই ভাষা কাল ও স্থানকে অতিক্রম করে যেতে পারে। এই লিপির কল্যাণেই আমরা হাজার হাজার বছরের পুরাণো মিশর-ব্যাবিলন-আদি দেশের ইতিহাস জানতে পারছি।

মানুষের মুখে মুখে যে ভাষা ব্যবহৃত হয়, তাকে বলা হয় **'মৌখিক ভাষা'** বা **'কথ্যভাষা'**। সমস্থানে ও সমকালে এই ভাষা-ব্যবহারে বিশেষ কোন অসুবিধে না থাকলেও কোন কোন ক্ষেত্রে এর সীমাবদ্ধতা আমাদের পীড়া দেয়। ভাষা নিয়ত পরিবর্তনশীল বলেই কালের ও স্থানের ব্যবধানে তার রূপান্তর ঘটে, ফলতঃ একালের ও এস্থানের ভাষাকে লিপির আকারে স্থায়ী রূপ দেওয়া হ'লেও পরবর্তীকালে ও দূরবর্তী স্থানে এর সহজবোধ্যতা বজায় থাকে না। মৌখিক ভাষায় এই স্থানীয় এবং সমকালীন রূপটিকে কিছুটা স্থায়িত্ব দেবার প্রয়োজনে তার দেহে কিছুটা সংস্কার সাধন করা হয়, যার ফলে এই ভাষা সমস্থান-কালাতিশায়ী হয়ে উঠ্‌তে পারে। মৌখিক ভাষার সংস্কারপূত এই রূপটিকেই বলা হয় **'সাধুভাষা'**—শুধু সাহিত্য-রচনার প্রয়োজনেই এই ভাষা ব্যবহৃত হ'য়ে থাকে। আবার 'মৌখিক' তথা 'কথ্যভাষা'ই শিষ্টজনের মুখে বিশেষ পরিবর্তিত না হয়েও যখন কিছুটা মার্জিত রূপ লাভ করে এবং কখন কখন তা' সাহিত্যেও ব্যবহৃত হয় তখন তাকে বলা হয় 'চলিত ভাষা' বা 'শিষ্ট কথ্যভাষা' (standard colloquial language)। 'মৌখিক' ও 'চলিত-ভাষা'র সঙ্গে 'সাধুভাষা'র কিছুটা পার্থক্য প্রায় সবদেশে সবকালে বিদ্যমান। তবে 'কথ্য ভাষা'ও 'চলিত-ভাষা'র পার্থক্য ততখানি প্রকট নয়।

স্থান ও কালভেদে ভাষায় নিয়ত পরিবর্তন সাধিত হ'চ্ছে বলেই কোন অঞ্চলে ব্যবহৃত কোন বিশেষ ভাষার ক্ষেত্রেও বেশ কিছু বৈচিত্র্য দেখা যায়। এই বৈচিত্র্য সাধারণতঃ ধ্বনিগত, কিছু বা শব্দগত। কখনো কখনো এই ভাষাব্যবহারকারীদের মধ্যেও ভাষার সহজবোধ্যতা বজায় থাকে না। অল্পবিস্তর পার্থক্য থাকা-সত্ত্বেও একই ধ্বনিসমষ্টি ব্যবহারকারী জনসমষ্টিকে বলা হয় **'ভাষা সম্প্রদায়'** (speech community)। কোন এক ভাষা সম্প্রদায়ে যদি লোকসংখ্যা হয় প্রচুর এবং তারা যদি বিস্তৃত অঞ্চলে ছড়িয়ে থাকে, তবে তাদের মধ্যে ভাষাগত কিছু দলের সৃষ্টি হয় এবং সাধারণতঃ এক একটা দল এক একটা অঞ্চলে সীমাবদ্ধ থাকে। এরূপ বিভিন্ন দলে ব্যবহৃত ভাষাছাঁদকে বলা হয় **'উপভাষা'** (Dialect)। ভাষা এবং উপভাষার মধ্যে গুণগত পার্থক্য নেই, পার্থক্য যা' তা' মাত্রাগত। একই ভাষাছাঁদ বৃহদঞ্চলে 'ভাষা' নামে, ক্ষুদ্রাঞ্চলে 'উপভাষা' নামে পরিচিত হ'তে পারে। একটা বাস্তব দৃষ্টান্ত—পূর্ববঙ্গে প্রচলিত ভাষাছাঁদকে 'বঙ্গালী উপভাষা' বলা হয়; এখন বাঙলাদেশী সরকার এবং

বঙ্গালী উপভাষার ব্যবহারকারীরা যদি এই বঙ্গালী উপভাষাকেই সাহিত্যে এবং সর্ববিধভাবে কার্যে ব্যবহার করেন, তবে 'বঙ্গালী' আর উপভাষা থাকবে না, তাকে 'ভাষা' বলেই অভিহিত করা হবে। কোন অঞ্চলবিশেষের উপভাষা যদি সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক বা আর্থনীতিক-আদি কারণে অপর উপভাষাসমূহ থেকে অধিকতর গুরুত্ব অর্জন ক'রে শিষ্টজনসম্মত রূপ লাভ করে, তবে তাকে **'আদর্শ কথ্যভাষা'** (standard colloquial language) বা 'চলিত-ভাষা' বলা হয়। এই আদর্শ কথ্য-ভাষা চলিত-ভাষারূপে সাহিত্যেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে। বাংলা ভাষায় যে কয়টি উপভাষা বর্তমান, তাদের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গীয় তথা রাঢ়ী উপভাষার একটা শিষ্টজনসম্মত রূপ সমগ্র বঙ্গের শিক্ষিত সমাজে প্রচলিত, এমন কি বাংলাদেশেও শিষ্টসমাজে এই ভাষার ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। রাজনৈতিক, আর্থনীতিক, সামাজিক প্রভৃতি কারণে এই আঞ্চলিক উপভাষাটি এক সময় 'কেন্দ্রীয় উপভাষা'র মর্যাদা লাভ করে। ফলে উভয়বঙ্গে সাহিত্যসৃষ্টিতেও এই শিষ্টজনসম্মত রাঢ়ী উপভাষার এই ছাঁদটি অর্থাৎ 'কেন্দ্রীয় উপভাষা' ব্যবহৃত হয়—অতএব এই উপভাষাটিকে **আদর্শ শিষ্ট কথ্যভাষা** বা **চলিত ভাষা** নামে অভিহিত করা হয়। সতর্ক থাকা প্রয়োজন যে এই ভাষা 'মৌখিক ভাষা' থেকে কিছুটা স্বতন্ত্র।

আঞ্চলিক উপভাষা ছাড়াও আর একপ্রকার উপভাষা আছে, যা সাম্প্রদায়িক কারণে স্বাতন্ত্র্য অর্জন করে—এইরূপ উপভাষাকে **সাম্প্রদায়িক উপভাষা** (community dialect) বা **সামাজিক উপভাষা** (social dialect) আখ্যা দেওয়া হয়। লক্ষণীয়, এই 'সাম্প্রদায়িক' বা 'সামাজিক উপভাষা' বলতে আসলে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে যে ভাষাগত পার্থক্য রয়েছে, তাকেই নির্দেশ করা হয়েছে—এর সঙ্গে প্রচলিত অর্থে ব্যবহৃত 'সাম্প্রদায়িকতা'র (communalism) কোন সম্পর্ক নেই। আমাদের ভাবা অথবা অপর যে-কোন ভাষাই যারা ব্যবহার করেন, নানা দৃষ্টিভঙ্গি থেকে তাদের মধ্যে নানা শ্রেণী বা স্তর লক্ষ্য করা যায়। যেমন নারী-পুরুষ, ধনী-দরিদ্র, উচ্চবর্ণ-নিম্নবর্ণ, হিন্দু-মুসলমান প্রভৃতি। এই শ্রেণী বা স্তরভেদেও কিন্তু ভাষাগত বৈষম্য রয়েছে। আবার এক এক স্তরে ব্যক্তি বা গোষ্ঠীভেদেও রয়েছে পার্থক্য। সমাজের ভাষা যেন এক বহুতল প্রাসাদ, তার মধ্যে প্রতি তলেও রয়েছে বহু কক্ষ। এক একটা কক্ষ এক একটা বিশিষ্ট লক্ষণাক্রান্ত ভাষারূপ। বস্তুতঃ এই সামগ্রিক উপভাষাকে তাই 'শ্রেণীভাষা' নামে অভিহিত করাই শ্রেয়। একই অঞ্চলে শিক্ষিত এবং অশিক্ষিত লোকের ভাষায় পার্থক্য থাকতে পারে; উচ্চবর্ণে এবং নিম্নবর্ণের ভাষায় পার্থক্য থাকতে পারে; হিন্দুর ভাষায় সংস্কৃত শব্দের বাহুল্য

এবং মুসলমানের ভাষায় আরবী-ফারসী শব্দের বাহুল্যও ভাষাছাঁদে বেশ পার্থক্য সৃষ্টি ক'রে থাকে। অনুরূপভাবেই শহুরে লোকের সঙ্গে একজন গ্রাম্য ব্যক্তির ভাষাগত পার্থক্যও নিশ্চয়ই যে-কোন সনিষ্ঠ পাঠক লক্ষ্য ক'রে থাকবেন।

* এগুলো ছাড়াও ব্যক্তিবিশেষ বা নানাপ্রকার সম্প্রদায়বিশেষ নিজেদের মধ্যে কথোপকথনে রকমারি মিশ্রভাষা, কৃত্রিমভাষা বা সংকেত ভাষা ব্যবহার ক'রে থাকে। প্রধান ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত না হ'লেও ভাষার বিচারে এদের উপেক্ষা করা চলে না।

(১) **নিজভাষা বা নিভাষা** (Idiolect)—কোন ব্যক্তিবিশেষ বা পরিবারবিশেষের নিজস্ব ব্যবহার্য ভাষাছাঁদে **ধ্বনিগত** বা **শব্দগত** কিছু বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়, একে বলা চলে 'নিভাষা'। রবীন্দ্রনাথের আবৃত্তিতে 'ল'-এর উচ্চারণ এবং প্রথম যুগের শান্তিনিকেতনবাসীদের 'শ'-এর উচ্চারণে অনুরূপ বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়।

(২) **অপভাষা**—মাতৃভাষা-ব্যতিরিক্ত অপর কোন ভাষা বা উপভাষা ব্যবহারে যদি দক্ষতা না জন্মে এবং যদি অনুরূপ অবস্থায়ই ঐ ভাষা ব্যবহার করা যায়, ত'বে তাতে ভ্রমপ্রমাদ এবং উচ্চারণ-বিকৃতি ঘটাতে পারে। এরূপ ব্যবহৃত ভাষা বা উপভাষাকে **অপভাষা** বলা হয়। সংস্কৃতভাষীদের কাছে বিদেশিদের ভাষা ছিল 'অপভাষা' এবং তাদের **'ম্লেচ্ছ'** অর্থাৎ অবোধ্য বাগ্‌ব্যবহারকারীরূপে আখ্যায়িত করা হ'তো। 'গো'-শব্দ থেকে 'গাই' বা 'গোরু' কিংবা কৃষ্ণ > 'কেষ্ট'-কে অপভাষা বলা চলে।

(৩) **অপার্থভাষা ও সংকেতভাষা**—সাধারণতঃ দুর্বৃত্তসম্প্রদায় বা দল প্রকাশ্যে নিজেদের মধ্যে এমন ভাষায় কথা বলে, যার একটা বিশেষ অর্থ দলীয় লোকেরাই শুধু বুঝতে পারে, অপরেরা তাদের এই সাদামাটা কথাবার্তায় কোন অপরাধের সন্ধান পায় না। তাদের এরূপ বাগ্‌ব্যবহারকে **অপার্থভাষা** (Argot) বা **'সংকেত ভাষা'** (Code language) বলা হয়। অপরাধজগতে বিভিন্ন দল বিভিন্ন সংকেতচিহ্ন ব্যবহার করে থাকে। গোয়েন্দাকে 'মামা' বা 'টিকটিকি', পিস্তলকে 'খোকা' বলা—এরূপ দৃষ্টান্ত।

(৪) **আবোল তাবোল ভাষা**—কিশোর-কিশোরীরা খেলাচ্ছলে নিজেদের মধ্যে একপ্রকার ছদ্মবেশী ভাষা ব্যবহার করে থাকে, একে বলা হয়—**আবোল তাবোল ভাষা** (Gibberish/Children's language)। এরূপ ভাষায় কখনও শব্দকে উল্টে ব্যবহার করা হয়, কখনও বা শব্দের আগে পিছে অন্য অক্ষর ব্যবহার করা হয়। যথা—আ (ন্সা)মি তো(ন্সো)মার স(ন্স) ঙ্গে ক(ন্স)থা ব(ন্স)ল্‌বো না(ন্সা)।

(৫) **কৃত্রিম ভাষা বা এস্‌পেরান্তো** (Esperanto)—সংকেত ভাষা ও আবোল-তাবোল ভাষা বস্তুতঃ কৃত্রিম ভাষা। এরূপ ভাষা শুধু নিজেদের মধ্যেই ব্যবহার

করা হয়। এর বাইরেও আছে অন্যবিধ কৃত্রিম ভাষা যাকে সর্বসাধারণের ব্যবহার-যোগ্য প্রকাশ্য ভাষা বলা চলে। পৃথিবীর সমগ্র মানবজাতির ব্যবহারযোগ্য সর্বাধিক প্রচলিত এরূপ একটি কৃত্রিম ভাষার নাম এস্‌পেরান্তো (Esperanto)। লক্ষণীয় এই, এই ভাষাটি কোন দেশীয় বা জাতীয় ভাষার প্রতিস্পর্ধী নয়, বরং সহযোগী বলা চলে। এর প্রচারকগণও এটিকে দ্বিতীয় ভাষার অতিরিক্ত কোন মর্যাদা দিতে চান না। বিশ্ববাসীদের মধ্যে পারস্পরিক ভাবের আদান-প্রদানের জন্যই এই কৃত্রিম ভাষাটির সৃষ্টি ("Esperanto is intended as a simple second language for all mankind, so that each of us may have it within his power to speak to, and to understand, any of his fellowmen throughout the world. It is in no way opposed to the national languages ; on the contrary, it creates in those who learn it an interest in the whole matter, and this very often leads to their learning one or more of the national languages."—*John Cresswell and John Hatley*)। ওয়ার্স-র ডঃ এল্‌. জামেনহফ্‌ (Dr. L. Zamenhof) বিশ্ববাসীর জন্য এই সার্বজনীন ভাষাটির উদ্ভাবন করেন। তিনি য়ুরোপের সব ভাষাই ভালো জানতেন এবং বিভিন্ন ভাষা পর্যালোচনা করে ১৮৮৭ খ্রীঃ এই ভাষার জন্যে ষোলটি মূলসূত্র উদ্ভাবন করেন। তিনি প্রধানতঃ ইন্দো-য়ুরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর লাতিন এবং জার্মানিক ভাষা থেকেই শব্দমূল গ্রহণ করেছেন। এই ভাষার সরলতা, নমনীয়তা এবং নিয়মানুবর্তিতার জন্য এ ভাষা শিক্ষা খুব কঠিন নয়। কিন্তু এ ভাষার একটাই প্রধান দোষ যে, এই ভাষা মৃত এবং এর বিকাশ নেই। এই দোষ উপশমনের নিমিত্ত জামেনহফ্‌ একটি 'আন্তর্জাতিক কেন্দ্রীয় সমিতি' গঠন করেন ; এই সমিতি পূর্বোক্ত ষোলটি নিয়ম অক্ষুণ্ণ রেখে ভাষায় যে কোন যুগোপযোগী পরিবর্তন সাধন করতে পারবে। এই ভাষার একটি প্রধান গুণ এই যে এর শব্দসমূহ উচ্চারিত হয় বানান-অনুযায়ী। এর ব্যাকরণও সহজ—সব দিক থেকেই যতদূর সম্ভব জটিলতা বর্জন করা হ'য়েছে, যেমন—পুরুষ ও বচনভেদে এতে ক্রিয়ার কোন রূপান্তর ঘটে না। পৃথিবীর বহুভাষার শব্দই এর শব্দভাণ্ডারে স্থান লাভ করেছে। এই ভাষায় কয়েক হাজার বই লিখিত ও অনূদিত হয়েছে এবং শতাধিক সংবাদপত্র প্রচারিত হচ্ছে। মূলতঃ এই ভাষায় ২৪টি ব্যঞ্জন এবং ৫টি স্বরধ্বনি ছিল। ৯২১টি শব্দমূল বা root-এর সঙ্গে বিভিন্ন প্রত্যয়/বিভক্তি চিহ্ন যোগ ক'রে এতে নানা ধরনের শব্দ তৈরি করা হয়—এরূপ শব্দের সংখ্যা ৬০০০-এরও বেশি। বিভিন্ন জাতীয় শব্দ তৈরির কিছু নিয়ম রয়েছে, যেমন '—o' যোগে বিশেষ্য পদ,

'—a' যোগে বিশেষণ, '—e' যোগে ক্রিয়াবিশেষণ, '—j' যোগে বহুবচন পদ সৃষ্টি হয়। আবার ক্রিয়ার কাল বোঝানোর জন্য—বর্তমানকালে '—a—', অতীতকালে '—i—', ভবিষ্যৎকালে '—o—' এবং অনুজ্ঞায় '—u—' যোগ করা হয়। এসপেরান্তো ভাষাসৃষ্টির প্রতিক্রিয়া বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন প্রকার পরিলক্ষিত হয়। কোথাও এটিকে রাখা হয়েছে আবশ্যিক পাঠ্যতালিকায়, যেমন—আলবানিয়া বা জার্মানীর ভাইমার প্রজাতন্ত্রের (Weimer Republic) পাঁচটি শহরে; আবার কোথাও এটি নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছে, যেমন—এক সময় রুশিয়ায় এবং জার্মানির থার্ড রাইখে।

এ ছাড়া আরো কয়টি বিশ্বভাষা-সৃষ্টি প্রচেষ্টার কথা জানা যায়। এদের মধ্যে রয়েছে—লুই-দ বোফ্র উদ্ভাবিত 'ইদো' (Ido) এবং রেনে-দ্য-সোস্যুর উদ্ভাবিত 'এসপেরান্তিদো'। এ ছাড়াও রয়েছে 'ইডিয়ম নিউট্রাল' (Idiom Neutral), 'এন্টিডো' (Antido), 'অক্সিডেন্টাল' (Occidental), 'নোবিএল' (Novial) প্রভৃতি। এদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য 'ভোলাপুক' (Volapuk)। অল্পকাল আগে প্রধানতঃ ইংরেজী, লাতিন ও লাতিনজাত ভাষা থেকে গৃহীত শব্দ-সমবায়ে এবং জার্মান ভাষার ব্যাকরণের সহায়তায় পাদ্রী শেলয়ের (Schleyer) **'ভোলাপুক'** নামক এক কৃত্রিম ভাষা উদ্ভাবন করেন। কিন্তু এ ভাষা গঠনে বড় বেশি পরিবর্তন সাধনের ব্যবস্থা থাকায় এবং এর নিয়মনের জন্য কোন কেন্দ্রীয় সংস্থা না থাকায় এ ভাষার প্রচলন ব্যাহত হ'য়েছিল। এরূপ কৃত্রিম ভাষা সৃষ্টির উপযোগিতা-বিষয়ে সর্বপ্রথম দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছিল মনীষী দেকার্তের (Descartes)। তদবধি (১৬২৯ খ্রীঃ) আজ পর্যন্ত শুধু য়ুরোপখণ্ডেই অন্ততঃ ৭০-এর অধিকবার বিভিন্ন কৃত্রিম ভাষা-সৃষ্টির প্রয়াস লক্ষিত হয়।

(৮) **মিশ্রভাষা**—এক ভাষাভাষী জনগোষ্ঠী অপর কোন ভাষা-সম্প্রদায়ের মধ্যে স্থায়িভাবে বসবাস করলে এই অসম্পৃক্ত ভাষার মিলনে কাজ-চালানো-গোছের এক জাতীয় ভাষার সৃষ্টি হয়, তাকে বলে **মিশ্রভাষা** (Jargon, Mixed Language)। এরূপ ভাষাগুলোর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য 'পিজিন্ ইংলিশ' (Pidgin English < Business English), 'বীচ্‌লা-মার' (Beach-La-Mar), 'মরিশাস ক্রেওল' (Mauritius Creole) 'চিনুক অপভাষা' (Chinook Jargon)। এই সব ভাষাই য়ুরোপীয় জাতিদের, বিশেষতঃ ইংরেজ ও ফরাসীদের উপনিবেশ-স্থাপন-চেষ্টা থেকেই উদ্ভূত।

(অ) **পিজিন ইংলিশ** (Pidgin < Business)—অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে এই মিশ্রভাষার উদ্ভব, চীনে এ ভাষা প্রচলনের ব্যাপকতা থাকলেও জাপান এবং

ক্যালিফোর্নিয়াতেও প্রচলিত আছে। চীনা ভাষার সংমিশ্রণ থাকলেও এ ভাষার মূল ভিত্তি ইংরেজি—Do you want me ? বাক্যটির পিজিন রূপ—'You wantchee me no wantchee'। বাক্যের গঠনে আছে চীনাভাষার প্রভাব—'ni yao wo pu yao'। চীনাভাষার 'র' না থাকায় তৎস্থলে 'ল' ব্যবহৃত হয়।

বস্তুতঃ মূল শব্দটি ছিল Business English অর্থাৎ কাজ-চালানো গোছের ইংরেজি। চীনাদের মুখে উচ্চারণ বিকৃতির ফলে তা' 'পিজিন ইংলিশ' হ'য়ে গেছে, কারণ, চীনাভাষায় ইংরেজি 'B' অক্ষরটি 'P' দ্বারা প্রকাশিত হয়। ব্যবসায়িক প্রয়োজনে ইংরেজরা সমগ্র পূর্ব এশিয়ায় ছড়িয়ে পড়লে মালয়েশীয় অঞ্চলে এই ভাষা বিস্তৃত অঞ্চলে পরিব্যাপ্ত হয়। এই মালয়েশীয় পিজিনে ইংরেজিকে অনেকটা সহজ ক'রে নেওয়া হ'য়েছে। মালয়েশীয় উচ্চারণে অনেক ইংরেজি ব্যঞ্জনেরই ধ্বনি পরিবর্তিত হ'য়েছে। রূপতত্ত্বেও তা' ইংরেজির বন্ধন মেনে নেয়নি। প্রয়োজনে নিজস্ব রূপ সৃষ্টি ক'রে নিয়েছে। যেমন—ইংরেজি 'fellow' শব্দের রূপান্তর ঘটিয়ে তাকে প্রত্যয়'-felə' প্রত্যয়টিকে একাক্ষর এবং সংখ্যাবাচক শব্দে বিশেষণ প্রত্যয় রূপে ব্যবহার ঃ

disfelə haws 1-bigfelə—এই বাড়িটি বড়।

tufelə pikinni—দুটি ছেলে মেয়ে।

mi—আমি, আমাকে	mifelə—আমরা আমাদের
ju—তুমি	jufelə—তোমরা

(অ) **বীচ্-লা-মার**—পশ্চিম মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জে ব্যবহৃত এই মিশ্রভাষায় কিছু পর্তুগীজ ও স্পেনীয় ভাষার মিশ্রণসহ ইংরেজি শব্দই প্রাধান্য লাভ করেছে। কর্তা-কর্ম-লিঙ্গ-পুরুষ ও বচনে কোন ভেদ না থাকায় ভাষাটি বেশ সহজরূপে বর্তমান। যেমন,—'me—আমি, plenty me—আমরা, that woman she brother belong me—সে আমার বোন, you not like soup—Don't you like the soup ?'

(ই) **মরিশাস ক্রেওল**—মরিশাস দ্বীপে ফরাসী ভাষার সঙ্গে নিগ্রোভাষার সংমিশ্রণে ক্রেওল ভাষার উৎপত্তি। এই ভাষার ব্যাকরণও খুব সহজ। কারক-বিভক্তি-বচন-ক্রিয়ারূপে কোন পার্থক্য নেই। শব্দসম্ভার অধিকাংশ ফরাসী ভাষাজাত হ'লেও বানানে বৈচিত্র্য রয়েছে।

(ঈ) **চিনুক অপভাষা**—উত্তর আমেরিকায় ইংরেজি ভাষার সঙ্গে আমেরিকার আদিম অধিবাসীদের ভাষার মিশ্রণে এই ভাষার সৃষ্টি। উভয় ভাষার উপরই ধ্বনিগত

দিক থেকে পারস্পরিক প্রভাব লক্ষিত হয়। এই ভাষায় ব্যাকরণের ঝামেলা প্রায় নেই বললেই চলে।

(ঊ) একদল ভারতীয় বহুকাল পূর্বে য়ুরোপে চলে যায় এবং কালক্রমে তারা য়ুরোপের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। এদের বলা হয় **'জিপ্সি'** (Gypsy) এবং এদের ভাষাকে বলা হয় **'রোমানী'** (Romany)। এই রোমানী ভাষাও বস্তুতঃ মিশ্রভাষা।

এককালে কলকাতায় প্রচলিত **'বাবু ইংলিশ'** (Baboo English) মিশ্রভাষার নিদর্শন। —'টেক্ তো টেক্ নো টেক্ তো নো টেক্, একবার তো সী'।

[দুই] ভাষার উৎপত্তি-সম্পর্কিত মতবাদ

মানবজীবনের শ্রেষ্ঠ প্রাপ্তি মন; মানুষ চিন্তা করে, ভাবে; এই চিন্তাভাবনার প্রকাশমাধ্যম ভাষা। অতএব মনের সঙ্গে ভাষার সম্পর্ক যে অতিশয় নিগূঢ়, এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। ভাষা যখন একটা বিশেষ পরিণতির স্তরে এসে পৌঁছেছে, তখনই ভাষাবিষয়ে নানা ভাবনা-চিন্তা শুরু হয়েছে। ভাষার মূল্যের সঙ্গে কোন প্রত্যক্ষ যোগাযোগ সম্ভবপর নয় বলেই অতিশয় কৌতূহলোদ্দীপক এই ভাষার উৎপত্তি-বিষয়ে নানা অনুমান উপস্থাপিত হ'চ্ছে। ভাষার উৎপত্তি-বিষয়ে যে সব মতবাদ বিশেষ প্রাধান্য লাভ করেছে তাদের মধ্যে আছেঃ (১) দৈবী উৎপত্তি, (২) ধাতুসিদ্ধান্ত, (৩) ধ্বন্যাত্মক মতবাদ—(ক) অনুকরণাত্মক মতবাদ, (খ) মনোভাবাভিব্যক্তিবাদ, (গ) অনুরণনমূলকতাবাদ, (ঘ) শ্রমপরিহরণমূলকতাবাদ, (৪) ভাবসংকেতবাদ, (৫) নির্ণয়সিদ্ধান্ত, (৬) বিকাশবাদ, (৭) সমন্বিতরূপ।

১. **দৈবী উৎপত্তি** (Divine theory)—ভাষা ঈশ্বরের দান—পৃথিবীর যাবতীয় ধর্মমতে এটা স্থিরসিদ্ধান্ত। শুধু তাই নয়, যে ভাষায় মূল ধর্মগ্রন্থ রচিত হয়েছে, সেই ভাষাই ঈশ্বর-কর্তৃক সৃষ্টি হয়েছে, এই বিশ্বাসও ধর্মবিশ্বাসীর মনে দৃঢ়মূল। তাই হিন্দুদের নিকট 'সংস্কৃত' দেবভাষা, বৌদ্ধদের মতে পালি মূল ভাষা; জৈনগণ বিশ্বাস করেন যে অর্ধমাগধী শুধু মনুষ্যেরই মূল ভাষা নয়, ইতর জীবজন্তুরও মূল ভাষা। ইহুদী ও ক্যাথলিক খ্রীষ্টানগণ মনে করেন যে হিব্রুই সমস্ত ভাষার জননীস্বরূপা। মুসলমানগণ বিশ্বাস করেন যে খোদা কোরান সৃষ্টি করেন, অতএব কোরানের ভাষা তথা আরবীই আদি ভাষা। কিন্তু এদের কোন একটি ভাষাই আদি এবং সেই ভাষা এত পরিণতরূপেই সর্বপ্রথম পৃথিবীর বুকে আবির্ভূত হয়েছে, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে একথা মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। বস্তুতঃ দৈবী মতবাদ এক অন্ধসংস্কার ছাড়া আর কিছুই নয়।

২. **ধাতুসিদ্ধান্ত** (Root theory)—মানবসৃষ্টির গোড়াতেই মানুষের মনে এক ঐশী শক্তির বলে শুধু কিছু ধাতুমূল সৃষ্ট হয় এবং সেই ধাতুমূলগুলোকে অবলম্বন করেই পরবর্তীকালে ভাষা বিকশিত হয়—এই অভিমতকেই বলা হয় 'ধাতুসিদ্ধান্ত' মতবাদ। স্বয়ং ম্যাক্সমূলরও এই মতবাদের পোষকতা করে গেছেন। সত্য বটে, অনেক ভাষারই মূল বিশ্লেষণে ধাতুমূলের সন্ধান পাওয়া যায়; পাণিনি সমস্ত শব্দকেই ধাতুমূল থেকে উৎপন্ন বলে প্রমাণ করেছেন; একটি মাত্র ধাতুমূল *Bher (=সংস্কৃত 'ভৃ') থেকে ইংরেজি ভাষায় ব্যবহৃত শব্দ ঃ—bear, burden, bier, barrow, barley, beer, barn, bairn, birth, far (=barley), farina, fertile, reference, conference, difference, inference এবং এরূপ আরো অনেক শব্দ হ'য়েছে। একালে 'এস্‌পেরান্তো' নামে যে কৃত্রিম বিশ্বভাষা সৃষ্টি হ'য়েছে, তারও মূল ভিত্তিরূপে গ্রহণ করা হ'য়েছে অনধিক ২০০টি ধাতুমূলকে। তাদের সঙ্গে বিভিন্ন প্রত্যয়াদি যোগে শব্দ সৃষ্টি করা চলছে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও একথা মেনে নেওয়া সম্ভবপর নয় যে মানুষের মনে কোন বস্তু বা ভাবের নামকরণ করবার আগেই ধাতুমূলের চিন্তা জেগেছিল। শুধু ধাতুমূলের সাহায্যে মানুষ মনোভাব প্রকাশে সক্ষম হ'তো, একথাও ভাবা যায় না। বস্তুতঃ এই মতবাদটিও দৈবী-উৎপত্তির মতই পরিহারযোগ্য।

৩. **ধ্বন্যাত্মক মতবাদ**—ধ্বনির (Sound) সঙ্গে ধারণা (concept)-কে যুক্ত করে ম্যাক্সমূলর চারটি মতবাদ গড়ে তুলেছেন, সাধারণভাবে একে 'ধ্বন্যাত্মক মতবাদ' বলা চলে।

(ক) **অনুকরণাত্মক মতবাদ** (Bow-wow theory/Onomatopoetic theory) —বিভিন্ন জীবজন্তুর ডাক বা ধ্বনিকে অনুকরণ ক'রে তাদের নামকরণ করবার ফলে কিছু কিছু শব্দ সৃষ্টি হয়। ইংরেজি cuckoo, চীনা ভাষায় miaou, বাঙলায় 'ঘুঘু, মেউ', শিশুদের দেওয়া কুকুরের নাম 'ভৌ ভৌ' প্রভৃতি অনুরূপ দৃষ্টান্ত।

(খ) **মনোভাবাভিব্যক্তিবাদ** (Pooh Pooh theory/Interjectional theory)—ইন্দ্রিয়জ উপলব্ধি মানুষের মনে বিভিন্ন অনুভূতি সৃষ্টি করে থাকে এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে ধ্বনির সাহায্যে তার প্রকাশ ঘটে—একেই বলা যায় 'মনোভাবাভিব্যক্তিবাদ'; ইংরেজি 'fie, pooh' বাঙলায় 'বাঃ, ছি, আহা' প্রভৃতি এর দৃষ্টান্ত।

(গ) **অনুরণনমূলকতাবাদ** (Ding-dong theory/Pathogenic theory)—ধ্বন্যাত্মক এবং দৃশ্যাত্মক শব্দগুলোকে এই মতবাদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ইংরেজি 'zigzag, jazz', বাঙলায় 'কলকল্‌, মরমর্‌, নির্ঝর' প্রভৃতি বহু শব্দ অনুরণনে সৃষ্ট

হয়েছে। বাঙলায় অনেক নিশ্চয়ার্থবোধক দ্বিত্বশব্দও এভাবে সৃষ্ট হতে পারে— 'গানটান, লাল লাল' প্রভৃতি।

(ঘ) **শ্রমপরিহরণমূলকতাবাদ** (Yo-he-ho theory)—দৈহিক শ্রম অপনোদনের জন্য শ্রমিকরা অনেক সময় সমবেতভাবে কিছু আপাত-অর্থহীন ধ্বনি উচ্চারণ ক'রে থাকে—তাকেই 'শ্রমপরিহরণমূলকতাবাদ' নামে অভিহিত করা হয়। নাবিকদের 'Yo-he-ho', পাল্কিবাহকদের 'হুম্ না হুঁ', অথবা অপর শ্রমজীবীদের "হেঁই ও হো' প্রভৃতি এরূপ দৃষ্টান্ত।

ম্যাক্সমূলের-উদ্ভাবিত উপর্যুক্ত মতবাদগুলো অংশতঃ সত্য; কারণ কিছু কিছু শব্দের উৎপত্তি এই মতবাদের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। কিন্তু এরূপ শব্দের সংখ্যা মোট শব্দের তুলনায় এতই সামান্য যে, এদের উপর গুরুত্বদান নিষ্প্রয়োজন। এই মতবাদের বিরুদ্ধে আর একটা আপত্তি—ইন্দ্রিয়জ উপলব্ধির ফলে মনোভাবে ঐক্য থাকা সত্ত্বও তার ধ্বনিগত প্রকাশ ভাষান্তরে ভিন্নরূপ ধারণ করে। অতএব উক্ত মতবাদের সার্বজনীনতা স্বীকৃত নয়।

৪ **ভাবসংকেতবাদ** (Gesture theory)—আলেকজাণ্ডার জনসন্ আইসল্যাণ্ডিক ভাষার এক বিরাট কোষগ্রন্থে শব্দের ব্যুৎপত্তি নির্দেশ করতে গিয়ে দেখিয়েছেন যে অধিকাংশ ধাতুর ক্ষেত্রেই ধ্বনি বা ক্রিয়ার সঙ্গে অর্থের সামঞ্জস্য রয়েছে। যথা—যে সমস্ত শব্দের আরম্ভ দন্ত্যবর্ণ দিয়ে, তার সঙ্গে স্পর্শ, গ্রহণ, নাশ, পরিত্যাগ-আদির সম্পর্ক বিদ্যমান। ওষ্ঠ্যবর্ণ দ্বারা আরব্ধ শব্দের সঙ্গে কথা বলা, গ্রহণ করা প্রভৃতির ধাতুর যোগ বর্তমান। এ থেকেই সিদ্ধান্ত গৃহীত হ'লো যে, যে-কোন ইন্দ্রিয়জ উপলব্ধির সঙ্গে সঙ্গে একটা দৈহিক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয় এবং তা কোন ভাবসংকেত বা অঙ্গসংকেতের (gesture) মাধ্যমে প্রকাশিত হয়—একেই 'অঙ্গসংকেতবাদ' বা 'ভাবসংকেতবাদ' বলা হয়। এই মতবাদের সারবত্তা একেবারে অস্বীকার করা যায় না। বাঙলা ভাষাতেও বেশ কিছু শব্দকে এই তত্ত্বের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা চলে; যথা—'কাঠিন্য' বোঝাতে কণ্ঠ্য এবং মূর্ধন্যবর্ণের যোগাযোগ—'কাঠ, কঠোর, কঠিন, ঠক ঠক, টিকটিক' প্রভৃতি। রবীন্দ্রনাথ এবং আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর বাংলা ধ্বন্যাত্মক শব্দ-বিষয়ে আলোচনা-প্রসঙ্গে এ জাতীয় বিস্তর নিদর্শন সংগ্রহ ক'রে অনুরূপভাবেই এদের বিশ্লেষণ করেছেন। কিন্তু ভাষার উৎপত্তি নির্ধারণে এতো সিন্ধুতে বিন্দুমাত্র। এই মতবাদে ত্রুটিও আছে; কারণ এটা যদি সত্য হতো, তবে এর সার্বজনীনতা থাকতো, কিন্তু বাস্তবে তা না থাকায় এ মতবাদের অপূর্ণতা স্বীকার করতে হয়।

৫. **নির্ণয় সিদ্ধান্ত**—এই মতানুযায়ী একসময় মানুষেরা একত্র হ'য়ে আলাপ আলোচনার সাহায্যে বিভিন্ন বস্তুর নাম নির্ণয়ের সিদ্ধান্ত করে, তা থেকেই মতবাদটির এবংবিধ নামকরণ। এই মতের অসারতা সহজেই প্রমাণিত হয়, যদি প্রশ্ন তোলা যায়—যারা কথা বলতে পারতো না, তারা কীভাবে বিচার-বিতর্কের সহায়তায় কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হ'লো ?

৬. **বিকাশবাদ**—বিকাশবাদ-অনুযায়ী মানুষ আদিতে ইতর জীবজন্তুর মতোই অর্থহীন ধ্বনি উচ্চারণ করতো। তারপর ক্রমবিবর্তনের পথে স্বাভাবিকভাবেই ধ্বনি অর্থযুক্ত হয়ে শব্দে পরিণত হয়। কিন্তু প্রশ্ন এখানেও ওঠে। কে প্রথম কীভাবে কোন্ শব্দ সৃষ্টি করলো এবং কীভাবেই বা তা' সর্বজনগ্রাহ্য হ'য়ে উঠল ? এর উত্তরে কেউ কেউ বলেন, কোন এক ব্যক্তি হঠাৎ কোন এক বস্তুর নামকরণ করে এবং অপরেরা তা' মেনে নেয়। বলা বাহুল্য, এ উত্তরও সন্তোষজনক নয়।

৭. **সমন্বিত রূপ**—এটি কোন বিশেষ মতবাদ নয়, বহু মতবাদের সমন্বয় মাত্র। পূর্বোক্ত মতবাদগুলোর কোন কোনটির মধ্যে যে আংশিক সত্যতা নিহিত আছে, একথা পূর্বেই স্বীকার করা হয়েছে। আধুনিক কালেও আমরা অনুরণনাত্মক শব্দ সৃষ্টি করে থাকি—দৃষ্টান্ত 'ভট্‌ভটিয়া'। বিভিন্ন মতবাদ-অনুযায়ী কিছু কিছু শব্দ সৃষ্টি হবার পর সেগুলো ক্রমগুণিত হ'য়ে মানুষের প্রয়োজন সিদ্ধ করতো। তারপর যোগ্যতমের উদ্বর্তন-নীতি-অনুযায়ী কতক শব্দ বিলুপ্ত হয়, অপরগুলো ক্রমবৃদ্ধির ফলে বহুগুণিত হয়।

ভাষার উদ্ভবসম্বন্ধীয় মতবাদগুলো আলোচনা ক'রে দেখা গেলো, মূল প্রশ্নের মীমাংসা সূত্র এখনো অনাবিষ্কৃত। বস্তুতঃ শারীর-বিজ্ঞানী, মনোবিজ্ঞানী, দার্শনিক-আদি বহুতর পণ্ডিতজনের সমবেত প্রচেষ্টা ছাড়া এককভাবে ভাষা-বিজ্ঞানীদের দ্বারা এ সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। মানুষ দু'পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াতে শিখলো, সম্ভবতঃ তখনই সর্বপ্রথম ভাষার উদ্ভব ঘটেছিল। তারপর কত শত সহস্র বৎসর অতিক্রান্ত হ'য়েছে। পৃথিবীর অসভ্যতম জাতিও সেই আদিম অবস্থা থেকে অনেকদূর এগিয়ে এসেছে। কাজেই ভাষার উদ্ভবকালের কোন প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য প্রমাণ পাবার আর উপায় নেই। তবে পণ্ডিতগণ এবিষয়ে নিশ্চিত যে, মানুষ বহিরিন্দ্রিয়ের সাহায্যে যা কিছু উপলব্ধি করে, তা তার মনের মধ্যে কোন-না-কোন প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে এবং সেই প্রতিক্রিয়ারই অন্যতম প্রকাশ ভাষার মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত হয়। অর্থাৎ এককথায় বলা চলতে পারে, মানুষের বিচারবুদ্ধির সঙ্গে তার ভাষা ব্যবহারের প্রত্যক্ষ যোগ রয়েছে। পাণিনি-ভ্রাতা

পিঙ্গলকর্তৃক রচিত 'পাণিনীয় শিক্ষা'য় বলা হয়েছে—'আত্মা বুদ্ধ্যা সমেত্যার্থান্ মনো যুঙ্ক্তে বিবক্ষয়া। মনঃ কায়াগ্নিমাহন্তি স প্রেরয়তি মারুতম্'। অর্থাৎ আত্মা বুদ্ধির সহায়তায় অর্থকে উপলব্ধি ক'রে বলবার ইচ্ছায় মনকে প্রেরণ করে, মন দেহের অগ্নি অর্থাৎ শক্তির উপর প্রবল চাপ দেয় এবং উহা বায়ুকে প্রেরণ করে (এবং এইভাবে শব্দের উৎপত্তি ঘটে)। আক্ষরিক ভাবে উক্তিটিকে যথার্থ বলে গ্রহণ করা সম্ভবপর না হ'লেও ভাষার উদ্ভব-বিষয়ক ইঙ্গিতটি সম্ভবতঃ একালেও বিচারযোগ্য বলেই বিবেচিত হবে।

[তিন] ভাষার প্রকৃতি

ভাষার গতি-প্রকৃতি লক্ষ্য করে এ কথা নিঃসন্দেহে বলা চলে, বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ভাষা ক্রমসরলীকরণের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। ধ্বনি, ব্যাকরণ, শব্দ, বাক্য-আদি সর্ববিষয়েই অনুরূপ প্রবণতা দেখা যায়। আমরা প্রাচীন সাহিত্যের ভাষা এবং আদিম অনগ্রসর জাতির ভাষার নিরিখে একালের ভাষাকে বিচার করলেই পূর্বোক্ত সত্যে উপনীত হতে পারি।

আমরা বহির্মুখ শ্বাসের অর্থাৎ নিঃশ্বাসের সঙ্গে ধ্বনি উচ্চারণ করি; আফ্রিকার বুশম্যান ভাষা-পরিবারে অন্তর্মুখ শ্বাসের সঙ্গেও বিচিত্র ধ্বনি উচ্চারণ করা হয়ে থাকে—এরূপ ধ্বনিকে বলা হয় **'ক্লিক'** (clicks)। পণ্ডিতেরা অনুমান করেন, প্রাগৈতিহাসিক কালে ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীতেও অনুরূপ ক্লিক ধ্বনি বর্তমান ছিল। বৈদিক ভাষায় এবং প্রাচীন গ্রীক ভাষায় স্বরের (pitch accent) প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। আধুনিক প্রাগ্রসর ভাষাসমূহে ক্লিক এবং স্বরের প্রাধান্য বর্জিত হওয়ায় ধ্বনির দিক্ থেকে ভাষা অনেকটা সরলতা প্রাপ্ত হয়েছে।

প্রারম্ভিক ভাষায় ব্যাকরণ না থাকায় স্বেচ্ছাচারিতা প্রাধান্য লাভ করে, ফলতঃ ভাষায় পদ ব্যবহারেও তেমন কোন নিয়মশৃঙ্খলা ছিল না। পরবর্তীকালে ধ্বনি-পরিবর্তন, সাদৃশ্য-আদি কারণে অনেক বাহুল্য বর্জিত হয়, ফলে ব্যাকরণও সরলতা লাভ করে। বৈদিক ব্যাকরণের তুলনায় সংস্কৃত ব্যাকরণ, তৎ-তুলনায় প্রাকৃত ব্যাকরণ এবং তার তুলনায় বাংলা ব্যাকরণ যে অধিকতর সরলতা লাভ করেছে, ভাষাবিজ্ঞানে এ সত্য আজ সহজ-স্বীকৃত। এইভাবেই অধিকাংশ প্রাচীন সংশ্লেষাত্মক ভাষা একালে বিশ্লেষাত্মক ভাষায় পরিণত হয়েছে।

শব্দ-ব্যবহারেও ভাষার ক্রমসরলতার পরিচয় পাওয়া যায়। ভাষার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে তার ব্যঞ্জনাশক্তি বৃদ্ধি পায়, ফলতঃ সামান্য (common) এবং সূক্ষ্মভাবনা-প্রকাশক শব্দের উদ্ভব ঘটে। আদিম জাতির ভাষায় এর অভাব থাকায় বস্তুর নামকরণে

জটিলতার সৃষ্টি হয়েছিল। যেমন, তাসমানিয়া মূল ভাষায় বিভিন্ন গাছের পৃথক্ পৃথক্ নাম থাকলেও 'গাছ' এর কোন প্রতিশব্দ ছিল না। 'জুলু' ভাষায় লালগোরু, সাদাগোরু, কালোগোরু বোঝাতে পৃথক্ পৃথক্ শব্দ ছিল, কিন্তু 'গোরু'র কোন প্রতিশব্দ ছিল না। আদিম জাতিদের অন্ধ কুসংস্কারও শব্দবাহুল্যের অন্যতম কারণ। কারণ দেবতা বা অপদেবতার রোষের ভয়ে তারা প্রচলিত শব্দ-ত্যাগে কিছুতেই সম্মত হ'ত না।

ভাষার আদিম অবস্থায় বাক্য আর শব্দে বিশেষ কোন পার্থক্য ছিল না বলেই মনে হয়। শব্দের সাহায্যে বাক্য-বিশ্লেষণ তখন সম্ভবপর হ'ত না। ব্যাকরণের সৃষ্টিও তখন সম্ভবপর ছিল না। শব্দবিদ্যা-সম্পর্কিত বিস্তৃত আলোচনার ফলেই এখন ভাষার অনেক ত্রুটি ও অপূর্ণতা দূরীভূত হ'য়ে ভাষা অনেক সরলতা লাভ করেছে।

ভাষার উদ্ভব-আদি বিচার ক'রে তার কিছু লক্ষণ ও প্রকৃতি নির্ণয় করা চলে। নিম্নে সূত্রাকারে তাদের মধ্য থেকে প্রধানগুলো বিবৃত হ'ল।

১। **ভাষা উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত পৈতৃক সম্পত্তি নয়**—জন্ম-সূত্রে কেউ কোন প্রকার ভাষার অধিকারী হ'তে পারে না। সম্রাট আকবর একবার পরীক্ষামূলকভাবে সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ অবস্থায় একটি শিশুকে দীর্ঘকাল রেখে দিলে পর দেখা গেল, শিশু কোন কথাই বলতে শেখেনি। রামু নামক এক নেকড়ে-পালিত মানবসন্তানের কথা আমরা জানি, যে কিছুটা নেকড়ের মতো চীৎকার করাই শিখেছিল, মানুষের ভাষায় কথা বলতে পারেনি। ভাষা পৈতৃক সম্পত্তি হ'লে যেকোন ব্যক্তি যেকোন স্থানে-কালে মাতৃভাষার অধিকারী হ'তে পারতো।

২। **ভাষা স্বোপার্জিত সম্পত্তি**—শৈশবকালাবধি মানুষ যে-ভাষার সংস্পর্শে আসে, সেই ভাষাই সে সহজে শিখতে পারে। বয়স্ক লোকের পক্ষে কোন ভাষা শিক্ষা কঠিন বলে মনে হ'লেও শিশুর পক্ষে কোন ভাষা আয়ত্ত করাই কঠিন নয়। বস্তুতঃ শুধু মাতৃভাষা শিক্ষাই যে শিশুর পক্ষে তুলনামূলকভাবে সহজ, তা নয়। একটা ভাষাগত পরিবেশই শিশুর ভাষাশিক্ষায় সহায়তা করে।

৩। **ভাষা আদ্যন্ত পারিবেশিক তথা সামাজিক বস্তু**—একক মানুষের পক্ষে ভাষা নিষ্প্রয়োজন। বস্তুতঃ সমাজ-পরিবেশেই ভাষার সৃষ্টি, বিকাশ ও পূর্ণতার পথে অগ্রগতি। যেখানে সমাজ নেই সেখানে ভাষারও কোন স্বাভাবিক সম্বন্ধ থাকবার কথা নয়। অতএব ভাষা সমাজ-সাপেক্ষ।

৪। **অনুকরণ দ্বারাই ভাষা অর্জিত হয়ে থাকে**—প্রখ্যাত দার্শনিক আরিস্ততল অনুকরণ দ্বারা ভাষা শিক্ষাকে মানুষের সবচেয়ে বড় গুণ বলে অভিহিত করেছেন।

অপরের মুখে কথা শুনে শুনে শিশু কথা বলতে শেখে ; কাজেই ভাষা স্বোপার্জিত সম্পত্তি হ'লেও তা' অনুকরণের সাহায্যে অর্জন করতে হয়।

৫. **ভাষা চিরপরিবর্তনশীল**—ভাষা সর্বক্ষণ সর্বজনের মুখে পরিবর্তিত হচ্ছে। এদিক্ থেকে ভাষাকে নদীপ্রবাহের সঙ্গে তুলনা করা চলে। কোন এক দার্শনিক বলেছিলেন যে আমরা এক নদীতে দু'বার স্নান করতে পারিনে—কারণ প্রতিমুহূর্তে নদীপ্রবাহ সরে সরে যাচ্ছে। দীর্ঘ কাল বা স্থানের ব্যবধানেই এই পরিবর্তন আমাদের গোচরীভূত হ'য়ে থাকে। ভাষা-বিষয়েও এই উপমাটি সর্বথা প্রযোজ্য। তাই একই মূল ইন্দো-য়ুরোপীয় ভাষা দীর্ঘ কালের ব্যবধানে এবং সারা পৃথিবীময় বিস্তৃতি লাভ ক'রে শত শত ভাষা-উপভাষায় রূপান্তরিত হ'য়েছে। মানুষের মুখে মুখেও ভাষা পরিবর্তিত হয়, কোন একজনের মুখের ভাষা অপর একজনের মুখের ভাষার সঙ্গে কখনও হুবহু এক হ'তে পারে না। যে দৈহিক ও মানসিক আধারের ওপর ভাষা প্রতিষ্ঠিত, সেই আধারের বিভিন্নতা-হেতু ভাষাও অবশ্যই ভিন্ন হ'তে বাধ্য।

৬. **জীবিত ভাষা কখনও অন্তিম রূপ লাভ করতে পারে না**—পরিবর্তনশীলতা ও অস্থিরতা জীবনের লক্ষণ, অতএব জীবিত ভাষা নিয়ত পূর্ণতার দিকে শুধুই এগিয়ে চলে, তার শেষ বা পূর্ণতা নেই। যে ভাষায় কোন পরিবর্তন নেই, যা পূর্ণতা প্রাপ্ত হ'য়েছে, সে ভাষা মৃতভাষা। অতএব বলা চলে জীবিত ভাষার বিকাশই শুধু সম্ভব, পূর্ণতা নয়।

৭. **ক্রমসরলীভবন ভাষার অন্যতম বিশিষ্টতা**—স্বল্পায়াসে কার্যসাধন-প্রচেষ্টার দিকেই মানুষের সহজ-প্রবণতা। সেইজন্যই সর্বপ্রকার জটিলতা ও কাঠিন্যের বন্ধন থেকে ভাষাকে মুক্ত ও সহজ সরলরূপে প্রতিষ্ঠা করার দিকেই মানুষের চেষ্টা নিয়োজিত হয়। এইভাবেই 'পিতৃষ্বসৃকা' থেকে 'পিসি' এবং 'দুহিতা' থেকে 'ঝি' শব্দের সৃষ্টি। (ভাষার সরলতার বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা প্রথমেই করা হয়েছে)।

[চার] ভাষার বিকাশ ও তার কারণ

যে কোন জীবিত বস্তুর মতই ভাষায়ও নিয়ত পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে, কারণ পরিবর্তনশীলতা জীবনের ধর্ম। ভাষার ক্ষেত্রে এই পরিবর্তনকে বলা যায় ভাষার বিকাশ। ভাষার উন্নতি নেই, অবনতি নেই, বিকাশই তার একমাত্র ধর্ম। এই

পরিবর্তন বা বিকাশ চতুরঙ্গিক—ধ্বনিগত, রূপগত, বাক্যগত এবং অর্থগত। (ধ্বনি-পরিবর্তন এবং শব্দার্থ পরিবর্তন বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা তত্তৎ অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।) স্থান ও কালের ব্যবধানে ভাষাদেহে বিকাশের চিহ্ন প্রস্ফুট হয়। এই বিকাশের জন্যই এক ভাষা থেকে বহু ভাষার সৃষ্টি, এক ভাষার সঙ্গে অপর ভাষার পার্থক্য।

যে সমস্ত কারণে ভাষার বিকাশ ঘটে থাকে তাদের প্রধান দুটি বর্গে বিভক্ত করা চলে :—(ক) আভ্যন্তর বর্গ (খ) বাহ্যবর্গ।

(ক) **আভ্যন্তর বর্গ**—ভাষার নিজস্ব গতি-প্রকৃতি এবং ভাষার নিয়ামক মানুষের মনই ভাষাবিকাশের আভ্যন্তর কারণ রূপে পরিগণিত হয়। মানুষের মন বাগ্‌যন্ত্রের সাহায্যে ভাষা ব্যবহার করে থাকে; এখন মানুষে মানুষে দৈহিক পার্থক্য বিদ্যমান, অতএব অতি সঙ্গত কারণেই মন ও বাগ্‌যন্ত্রেও পার্থক্য থাকবে। অনেকে ভাষা-বিকাশের পক্ষে দৈহিক পার্থক্যকে একটা কারণ রূপে গ্রহণ করলেও এই যুক্তিটি খুব ঘাতসহ নয়। যাহোক আভ্যন্তর বর্গের কারণসমূহের মধ্যে আছে :—(১) অতি-প্রয়োগ, (২) বলপ্রয়োগ, (৩) অনুকরণে অপূর্ণতা, (৪) মানসিক দৃষ্টিভঙ্গি ও (৫) প্রযত্নলাঘব।

১. **অতি-প্রয়োগ**—যে সকল শব্দ বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হয়ে থাকে, প্রয়োগের আতিশয্য-হেতু কালে কালে তা স্বাভাবিকভাবেই জীর্ণতা প্রাপ্ত হয়। এই পরিবর্তন-শীলতা ভাষার স্বাভাবিক নিয়ম। (এর ফলেই তৎসম শব্দগুলো প্রাকৃতের মধ্য দিয়ে তদ্ভব বা খাঁটি বাঙলা শব্দে রূপান্তরিত হয়েছে।)

২. **বলপ্রয়োগ**—শব্দের ওপর প্রবল শ্বাসাঘাতহেতু অথবা শব্দার্থের ওপর গুরুত্ব আরোপ-হেতু যথক্রমে শব্দের ও অর্থের পরিবর্তন সাধিত হয়। অতএব বলও ভাষা-বিকাশের অন্যতম কারণ।

৩. **অনুকরণে অপূর্ণতা**—ভাষা-অর্জনের ক্ষেত্রে অনুকরণের ভূমিকা অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ। কাজেই অনুকরণ যদি ত্রুটিপূর্ণ হয়, তাহলে অতি স্বাভাবিক কারণেই ভাষারও পরিবর্তন সাধিত হতে পারে। বাগ্‌যন্ত্র বা শ্রুতিযন্ত্রের বৈকল্য, অশিক্ষা এবং অমনোযোগিতার কারণেই অনুকরণে অপূর্ণতা আসতে পারে। বাগ্‌যন্ত্রের ত্রুটির জন্য বক্তার উক্তি অস্পষ্ট বা অপূর্ণ হ'তে পারে, শ্রুতিযন্ত্রের ত্রুটির জন্য প্রকৃত উক্তিটি অনুধাবনে অক্ষমতা থাকতে পারে, অশিক্ষাহেতু কঠিন অপরিচিত বিশেষতঃ বিদেশি শব্দ উচ্চারণে অসামর্থ্য দেখা দেখা দেয়, সর্বোপরি মনোযোগের অভাবও অনেক সময় প্রকৃত উক্তির যথার্থ স্বরূপগ্রহণে বাধার সৃষ্টি করে, ফলতঃ শব্দের পরিবর্তন ঘটে যাওয়া বিচিত্র নয়।

৪. **মানসিক দৃষ্টিভঙ্গি**—আমাদের মনই বাগ্‌যন্ত্রের পরিচালক ও নিয়ামক, কাজেই মানসিক অবস্থা যে ভাষার বিকাশে একটা বিরাট ভূমিকা গ্রহণ করে, তা একান্ত স্বাভাবিক ঘটনা। বক্তার মানসিক স্তরে যদি কোন পরিবর্তন দেখা দেয়, তবে তার প্রভাব পড়বে। ফলত শব্দার্থের পরিবর্তন ঘটা একান্ত স্বাভাবিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে যেমন, তেমনি জাতিগত ক্ষেত্রেও এই মানসিক দৃষ্টিভঙ্গি ভাষাবিকাশে বিশেষ সহায়তা করে। জাতির উন্নতি বা অবনতির সঙ্গে তার মানসিক উৎকর্ষ-অপকর্ষেরও যোগ আছে। তার প্রভাবেও ভাষার পরিবর্তন দেখা যায়। জার্মান পণ্ডিতগণ মনে করতেন যে তাঁদের জাতীয় মানসিক উন্নতি এবং প্রগতিই জার্মান ভাষাসৌষ্ঠবের অন্যতম কারণ; আবার ফরাসী জাতির ললিত মানসিক অবস্থার জন্যই ফরাসী ভাষা এত ললিতমধুর। পাঞ্জাবী যোদ্ধাজাতি বলে তাদের ভাষা আমাদের নিকট কর্কশ বলে মনে হয়; পক্ষান্তরে নদীমাতৃক বঙ্গদেশের অধিবাসীদের কোমল স্বভাবের জন্যই বাংলা ভাষায় এত মাধুর্য।

৫. **প্রযত্ন লাঘব**—অল্পায়াসে শব্দ উচ্চারণের প্রবণতা থেকে ভাষাদেহে বিরাট পরিবর্তন সাধিত হয়ে থাকে। যুক্ত ব্যঞ্জনকে বিশ্লিষ্ট করে অথবা একক ব্যঞ্জনে রূপান্তরিত ক'রে উচ্চারণ করা, যুক্ত ব্যঞ্জনকে যুগ্ম ব্যঞ্জন করে নেওয়া অর্থাৎ সমীভবন, পদমধ্যস্থ অল্পপ্রাণ বর্ণের লোপসাধন ও মহাপ্রাণবর্ণের 'হ'-কারে পরিণতি প্রভৃতি পরিবর্তনের মূল কারণ এই প্রযত্নলাঘব বা অল্পায়াসপ্রবণতা। বস্তুতঃ এই প্রযত্ন-লাঘবের কারণেই অনেকগুলো ধ্বনিপরিবর্তন সূত্রের সৃষ্টি হয়েছে। বিভিন্ন স্বরলোপ, স্বরাগম, ব্যঞ্জনলোপ, সমীভবন, স্বরসঙ্গতি, অপিনিহিতি, অভিশ্রুতি, বিপর্যাস, লোকব্যুৎপত্তি-আদি প্রায় সর্ববিধ ধ্বনিপরিবর্তনের মূলেই আছে প্রযত্ন-লাঘব। বস্তুতঃ যে সমস্ত কারণে ভাষার বিকাশ সাধিত হয়, তাদের মধ্যে সম্ভবতঃ প্রযত্ন লাঘবের স্থান সর্বোচ্চে।

(খ) **বাহ্যবর্গ**—আভ্যন্তর কারণ-ব্যতীত অপর যে সমস্ত কারণে ভাষার বিকাশ সাধিত হয়, সে সমস্ত বাহ্যবর্গের অন্তর্ভুক্ত। এদের মধ্যে প্রধান : (১) ভৌগোলিক অবস্থান, (২) জাতিগত প্রভাব ও মিশ্রণ, (৩) সাংস্কৃতিক প্রভাব।

(১) **ভৌগোলিক অবস্থান**—ভাষার বিকাশে ভৌগোলিক অবস্থান একটি অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। ব্যক্তির জীবনে পরিবেশের প্রভাবের মতই জাতীয় ভাষার জীবনে ভৌগোলিক প্রভাব। আবহাওয়ার উষ্ণতা বা শৈত্যের সঙ্গে জীবিকা, স্বভাব আচার-আচরণ-আদির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বর্তমান এবং ভাষা বস্তুতঃ এদের উপরই আধারিত। ভৌগোলিক পরিবেশ ভাষা-বিকাশের ক্ষেত্রে যে অসাধারণ প্রভাব বিস্তার

ক'রে থাকে, তার একটি প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় প্রাচীন গ্রীসের ক্ষেত্রে। পর্বতসঙ্কুল গ্রীসদেশে এক অঞ্চলের সঙ্গে অপর অঞ্চলের যোগাযোগের তেমন কোন সুব্যবস্থা না থাকায় প্রত্যেকটি অঞ্চল ছিল পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন। তার ফলে আঞ্চলিক ভাষাগুলো কালক্রমে এমনভাবে পরিবর্তিত হয় যে এক অঞ্চলের ভাষা অপর অঞ্চলে দুর্বোধ্য বিবেচিত হ'ত এবং একের নিকট অপরের ভাষা বর্বরের ভাষা বলে পরিগণিত হ'ত। প্রাচীন ভারতের ক্ষেত্রেও দেখা যায়, আর্যগণ যতদিন পাঞ্জাব অঞ্চলে বসবাস করতেন ততদিন জীবনযাপনের জন্য তাদের কঠোর সংগ্রামে নিরত থাকতে হতো বলে তাদের ভাষা ও সাহিত্য ছিল অতিশয় তেজঃপূর্ণ। তারপর গঙ্গার দুই তীর ধরে তারা যতই অগ্রসর হ'তে লাগলেন, ততই অনুকূল প্রাকৃতিক অবস্থার মুখোমুখি হলেন এবং তাদের ভাষা-সাহিত্যও হ'য়ে উঠতে লাগল দার্শনিকতাপূর্ণ এবং এমন নমনীয়, যার সাহায্যে মানব-মনের অতি সূক্ষ্ম অনুভূতিও প্রকাশ করা যায়। মরুবাসী আরবদের ধ্বনিগুচ্ছের তুলনায় সুজলা-সুফলা বাংলার ধ্বনি কি অনেক কোমল ও তরল নয়?

(২) **জাতিগত প্রভাব ও মিশ্রণ**—এক একটা বিশেষ ভৌগোলিক পরিবেশে এক-একটা জাতির বিশেষ চরিত্র গড়ে ওঠে। তারপর যখন বিভিন্ন জাতির সংমিশ্রণ ঘটে অথবা একের প্রভাব অপরের ওপর পড়ে, তখন উভয় জাতির চরিত্রেই তার প্রতিফলন দেখা যায়; বলা বাহুল্য, ভাষার ক্ষেত্রেই এই প্রভাব সর্বাধিক স্থায়ী চিহ্ন অঙ্কন করে দেয়। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ভাষা ইংরেজির উপর ভিত্তি করে সৃষ্ট হলেও অপরাপর ভাষার প্রভাবে তা' ইংল্যাণ্ডের ইংরেজি থেকে ভিন্ন। ভারতবর্ষে যুগে যুগে বিভিন্ন ভাষাভাষী জাতির আগমন ঘটেছে, তার পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে ভাষার বুকে। বৈদিক যুগেই আর্যদের সঙ্গে স্থানীয় অধিবাসী দ্রাবিড় ও অস্ট্রীক বা নিষাদজাতির মিশ্রণ ঘটেছিল, তার ফলে বৈদিক ভাষাতেও দ্রাবিড় ও নিষাদভাষার চিহ্ন বর্তমান। পরবর্তী কালে ফারসীভাষী মুসলমান এবং বিভিন্ন ভাষাভাষী য়ুরোপীয়-দের আগমনের ফল বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায়, এমন কি বাঙলা ভাষায়ও চিহ্নিত হ'য়ে আছে।

(৩) **সাংস্কৃতিক প্রভাব**—ধর্ম, শিল্প, সাহিত্য-আদি সাংস্কৃতিক বিষয়সমূহ জাতির জীবনে সর্বাধিক প্রভাব বিস্তার ক'রে থাকে। এতএব অত্যন্ত স্বাভাবিক কারণেই ভাষা-বিকাশেও সংস্কৃতির একটা বিরাট ভূমিকা বর্তমান। পৃথিবীর প্রায় সমস্ত প্রাচীন সাহিত্যই ধর্মীয় উপাদানে সমৃদ্ধ, তাই ধর্মীয় মনোভাব ভাষার উপর সবিশেষ প্রভাব বিস্তার ক'রে থাকে। ভারতীয় মুসলমানগণ তাদের কথোপকথনে

অনেক বেশি আরবী শব্দ ব্যবহার ক'রে থাকেন; আর্যসমাজীদের প্রভাবে হিন্দী ভাষায় অনেক সংস্কৃত শব্দ অনুপ্রবিষ্ট হয়। সাংস্কৃতিক জীবনে রাজনীতির প্রভাবও অপরিমেয়, তাই রাজনৈতিক কারণেও ভাষায় পরিবর্তন সূচিত হয়। দীর্ঘকাল ইংরেজের অধীনে বাস করবার ফলে আমাদের ভাষাতেও প্রভূত পরিমাণে ইংরেজি শব্দের অনুপ্রবেশ ঘটেছে। বর্তমানকালে পৃথিবীর যে কোন এক দেশের সঙ্গে অপরাপর বহু দেশের যোগাযোগ ঘটে থাকে। তার ফলে সাংস্কৃতিক ভাব বা বস্তুবিনিময়-হেতু অন্যান্য বহু ভাষার শব্দই যে কোন ভাষায় আশ্রয় পেতে পারে। রুশ, জাপান, চীন, জার্মানি প্রভৃতি ভাষার কিছু না কিছু শব্দ আমরা নিয়েছি। আবার প্রচুর পরিমাণে ভারতীয় শব্দও ইংরেজি ভাষায় গৃহীত হয়েছে। এই পারস্পরিক যোগাযোগের ফলে শুধু যে বিভিন্ন শব্দই আমরা গ্রহণ করেছি তা নয়, বিভিন্ন ধ্বনিও নোতুনভাবে আমাদের ভাষায় এসে গেছে। ইংরেজী 'z' বোঝানোর জন্য (জ়) ফুটকি-যুক্ত 'জ'-এর ব্যবহার, বা 'F' বোঝানোর জন্য (ফ়) ফুটকিযুক্ত 'ফ'-এর ব্যবহার, আরবী, ক্বাফ (ق) বোঝাতে বাংলায় (ক়, ক্ব) ফুটকি-যুক্ত 'ক়' অথবা, 'ক্ব' ব্যবহারের মধ্য দিয়ে আমাদের ভাষায় নোতুন ধ্বনিরই আমদানি ঘটেছে, কাজেই ভাষাবিকাশে সাংস্কৃতিক প্রভাবের বিশেষ মর্যাদা স্বীকার করতে হয়।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ভাষার বর্গীকরণ

(Classification of Language)

পৃথিবীতে যতপ্রকার ভাষা প্রচলিত আছে এবং এক সময়ে ছিল, বর্তমানে বিলুপ্ত, এদের প্রকৃত সংখ্যা নিরূপণ করা আদৌ সম্ভব নয়। একটা হিশেবে এদের সংখ্যা পাওয়া গেছে ২৮০০। (বলাই বাহুল্য, এদের বৃহত্তম অংশেরই কোন লিখিত রূপ বা সাহিত্য নেই, কাজেই প্রথমেই আলোচনার সীমা থেকে এদের বাইরে রাখতে হয়।) প্রচলিত ভাষাগুলোর মধ্যে এমন কতকগুলো আছে যেগুলো হয়তো বা বিচ্ছিন্নভাবে কোন লোকালয়ে কিংবা পর্বতে-অরণ্যে বর্তমান, এদের সঙ্গে বহির্জগতের কোন সম্পর্ক নেই বললেই চলে। কাজেই এগুলোও থাকে আলোচনার বহির্ভূত। আবার কিছু কিছু ভাষা একই মূলভাষার আঞ্চলিক রূপভেদ মাত্র, মাত্রাগত বৈচিত্র্য থাকা সত্ত্বেও এগুলোকে মূলভাষার অঙ্গীভূত বলে মনে করা হয়। ফলে যে ভাষাগুলো অবশিষ্ট থাকে, তাদের বিষয়ে সুষ্ঠু আলোচনার নিমিত্ত এদের কয়েকটি বর্গে বিভক্ত করা হয়। এই বর্গীকরণের ব্যাপারে অন্ততঃ ছয়প্রকার নীতি অনুসরণ করা চলে ঃ—(১) ভাষার রূপতত্ত্বানুযায়ী বা আকৃতিগত শ্রেণীবিভাগ, (২) গোত্রপট বা বংশানুযায়ী শ্রেণীবিভাগ, (৩) মহাদেশানুযায়ী শ্রেণীবিভাগ, যথা,—এশীয় ভাষাপরিবার, ইউরোপীয় ভাষাপরিবার প্রভৃতি, (৪) দেশ-ভিত্তিক শ্রেণীবিভাগ, যথা—ভারতীয় ভাষা-পরিবার, জাপানী ভাষাপরিবার প্রভৃতি, (৫) ধর্মীয় শ্রেণীবিভাগ, যথা,—হিন্দুভাষা, খ্রীষ্টানী প্রভৃতি এবং (৬) কালগত শ্রেণীবিভাগ, যথা, —প্রাগৈতিহাসিক ভাষা, আধুনিক ভাষা প্রভৃতি।

উপর্যুক্ত বর্গীকরণে শেষ চারটি শ্রেণীবিভাগ নানাকারণে পরিত্যাজ্য বলে বিবেচিত হ'য়ে থাকে। তৃতীয় সংখ্যক মহাদেশীয় শ্রেণীবিভাগ অচল, কারণ এক-একটি মহাদেশে ভাষাগত বৈচিত্র্য অসংখ্য বলেই তাদের কোনভাবেই গোষ্ঠীভুক্ত করা চলে না। চতুর্থ-সংখ্যক দেশ-ভিত্তিক শ্রেণীবিভাগও অচল, কারণ পৃথিবীর অল্প কয়েকটি দেশই ভাষার ভিত্তিতে গঠিত, অধিকাংশ দেশে বহুভাষা প্রচলিত বলেই এ রীতিও গ্রহণযোগ্য নয়। পঞ্চম সংখ্যক ভাষার ধর্মীয় শ্রেণীবিভাগকে কোন ক্রমেই গ্রহণ করা চলে না। কারণ, বাস্তবে এমন কোন ভাষা নেই, যা ওতপ্রোতভাবে ধর্মের সঙ্গেই জড়িত ঃ যেমন, মুসলমানী ভাষা বললে আরবী, ফারসী, তুর্কী, বাংলা,

হিন্দী, উর্দু, তামিল ইত্যাদি যাবতীয় ভাষাই বোঝাতে পারে, কারণ পৃথিবীর প্রায় যে-কোন ভাষাই কোন-না-কোন মুসলমান মাতৃভাষারূপে ব্যবহার করে থাকেন। আবার এই সমস্ত ভাষাই অপর ধর্মীয় ব্যক্তিগণও ব্যবহার করেন, অতএব এই রীতিও পরিত্যাগযোগ্য। সর্বশেষ ষষ্ঠ সংখ্যক কালগত শ্রেণীবিভাগও গ্রহণযোগ্য নয়, কারণ প্রতি যুগেই যুগপৎ বহুভাষার বর্তমানতা লক্ষ্য করা যায়, অতএব কালের হিশেবেও ভাষার বর্গীকরণ সম্ভব নয়। অবশিষ্ট রইল দুটি শ্রেণীবিভাগ—(এক) রূপতত্ত্বানুযায়ী ও (দুই) বংশানুগত শ্রেণীবিভাগ।

[এক] রূপতত্ত্বানুযায়ী বা আকৃতিগত শ্রেণীবিভাগ

(Morphological/Syntactical/Typological Classification)

পৃথিবীর যাবতীয় ভাষার বাক্য ও পদের বিশ্লেষণ ক'রে তদনুযায়ী শ্রেণীবিভাগকেই 'রূপতত্ত্বানুযায়ী' বা 'আকৃতিগত শ্রেণীবিভাগ' বলা চলে। ভাষা মূলতঃ বাক্যকে আধার করে ব্যবহৃত হয়, আর বাক্যের ভিত্তিভূমি পদ ; বাক্যের মধ্যে পদের অবস্থান, উভয়ের পারস্পরিক সম্পর্ক এবং পদের গঠন-প্রকৃতিকে অবলম্বন ক'রেই ভাষার রূপতত্ত্বানুযায়ী শ্রেণীবিভাগ কল্পিত হয়েছে। ব্যবহারিক দিক্ থেকে এ জাতীয় শ্রেণীবিভাগের উপযোগিতা বর্তমান থাকলেও বৈজ্ঞানিক বিচারে কিছু অসুবিধার কারণ রয়েছে। কারণ, অনেক ভাষাই কালক্রমে শ্রেণীপরিবর্তন করতে পারে, আবার অনেক ভাষা আছে যাদের মধ্যে একাধিক শ্রেণীলক্ষণ পরিস্ফুট থাকায় তাদের যথাযথভাবে গুচ্ছবন্ধ করা অসুবিধাজনক হ'য়ে দাঁড়ায়।

রূপতত্ত্বানুযায়ী ভাষাকে দুটি প্রধান গুচ্ছে বিভক্ত করা হয় ঃ—(ক) অসমবায়ী/অযোগাত্মক/আবস্থানিক (Inorganic/Isolating/Positional) এবং (খ) সমবায়ী/যোগাত্মক (Organic/non-Isolating)।

(ক) **অসমবায়ী**—আমরা জানি, শব্দের সঙ্গে বিভক্তি যোগ করলে পদ হয় এবং বাক্যে শুধু বিভক্তিযুক্ত শব্দ বা পদই ব্যবহৃত হ'তে পারে। ক্রিয়া এবং অপর পদগুলো পরস্পরের সঙ্গে নানাভাবে যুক্ত থাকে। 'অসমবায়ী' বা 'অযোগাত্মক' নাম থেকেই বোঝা যায় যে এই গুচ্ছভুক্ত ভাষায় শব্দের সঙ্গে শব্দের বা বিভক্তির এরূপ কোন যোগ নেই। শব্দের সঙ্গে কোন উপসর্গ, প্রত্যয় বা বিভক্তি যুক্ত হয় না, বাক্যের মধ্যে পদেব অবস্থান থেকেই কর্তা-কর্ম-আদি সম্পর্ক নিরূপণ করা হয়। এই কারণে এই গুচ্ছকে 'আবস্থানিক' (positional) বলেও অভিহিত করা যায়। এ জাতীয় ভাষায় শব্দের কোন অবস্থানগত পরিবর্তনও হয় না ; অতএব শব্দরূপ ধাতুরূপ বলেও কিছু নেই। বিশেষ্য, বিশেষণ,

ক্রিয়া-আদি পদও নেই, বাক্যের মধ্যে শব্দের অবস্থান থেকেই এদের পদরূপ বুঝে নিতে হয়। বস্তুতঃ এই জাতীয় ভাষার কোন নির্দিষ্ট ব্যাকরণও থাকে না।

অসমবায়ী ভাষাগুচ্ছের মধ্যে চীনাভাষার নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। চীনাভাষার বৈশিষ্ট্যসমূহের মধ্যে আছে (ক) স্বর (Tone), (খ) শব্দের জোড়াবন্ধন, (গ) প্রতি শব্দের জন্য এক একটি অক্ষর বা প্রতীক (Symbol) ও (ঘ) ব্যাকরণের অভাব।

চীনাভাষায় একই শব্দ স্বরভেদে ভিন্ন ভিন্ন অর্থ প্রকাশ করে থাকে। সাধারণতঃ চার প্রকার স্বর ব্যবহৃত হয়—১. ঊর্ধ্বসম (high level), ২. ঊর্ধ্বগামী (high rising), ৩. নিম্ন থেকে ঊর্ধ্বগামী (low rising) এবং ৪. নিম্নগামী (low falling)।

চীনাভাষায় শব্দ ব্যবহারের দৃষ্টান্ত

ঙো ত নি = আমি মারি তোমাকে।

নি ত ঙো = তুমি মার আমাকে।

আফ্রিকার সুদানী, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মালয়ী, আনামী, বর্মী, শ্যামদেশীয় ভাষা এবং তিব্বতী ভাষাও চীনা ভাষার মতই অসমবায়ী গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। গবেষকগণ বিভিন্ন দিক থেকে ভাষা-বিশ্লেষণ ক'রে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হ'য়েছেন, তাতে দেখা যায় আনামী এবং চীনা ভাষাই সর্বাধিক অসমবায়ী, এতে প্রত্যয়াদি-যোগের নিদর্শন সর্বাপেক্ষা কম ("Annamese, similar in structure to Chinese which Finck used, have the highest ratio for isolation, the lowest for affixes par word."—*W P. Lehman*)।

(খ) **সমবায়ী**—অসমবায়ী ভাষায় শব্দে অর্থতত্ত্ব এবং সম্বন্ধতত্ত্ব অর্থাৎ শব্দ ও বিভক্তি যোগযুক্ত হয় না। পক্ষান্তরে সমবায়ী তথা যোগাত্মক ভাষায় অর্থতত্ত্ব এবং সম্বন্ধতত্ত্বের মধ্যে অর্থাৎ শব্দ ও বিভক্তির মধ্যে যোগ-সম্পর্ক বর্তমান থাকে। যেমন, 'আমি তোমাকে কথাটা বলছি',—এখানে 'আমি' (অর্থতত্ত্ব/শব্দ)+০ (সম্বন্ধতত্ত্ব বা বিভক্তি), তুমি (শব্দ)+কে (বিভক্তি), বলা (শব্দ)+ছি (বিভক্তি)। পৃথিবীর অধিকাংশ ভাষাই এরূপ শব্দ এবং বিভক্তির যোগে গঠিত হয়, অতএব সমবায়ী বা যোগাত্মক গোষ্ঠীভুক্ত বলে পরিগণিত হয়।

সমবায়ী ভাষাগোষ্ঠী বিভিন্ন লক্ষণ-অনুযায়ী তিন শ্রেণীতে বিভক্ত:—(১) সর্ব-সমবায়ী বা প্রশ্লিষ্ট যোগাত্মক (Incorporating) / বহু সংশ্লেষাত্মক (Polysynthetic) / অব্যক্ত-যোগাত্মক (Holophrastic), (২) যৌগিক / অশ্লিষ্ট যোগাত্মক

(Agglutinative) এবং (৩) সমন্বয়ী / শ্লিষ্ট যোগাত্মক (Inflexional, Amalgamating, Synthetic)।

(১) **সর্বসমবায়ী** (Incorporating)—এই গোষ্ঠীভুক্ত ভাষাগুলোর প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, এতে বাক্যের বাইরে শব্দের কোন স্বাধীন সত্তা নেই, বাক্য ও শব্দ একাত্মক। বাক্যে ব্যবহারকালে শব্দের কিছু অংশ বর্জিত হয় এবং বাকি অংশ অপর শব্দের সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে পুরো বাক্য গঠন করে। আমেরিকার চেরোকী-আদি প্রাচীন ভাষা এবং গ্রীনল্যাণ্ডের ভাষা সর্বসমবায়ী ভাষার উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত। গ্রীনল্যাণ্ডের ভাষায়—'অউলিসরিঅর্তোরসুঅর্পোক্' (aulisariartorasuarpok)—এই শব্দ-বাক্য বা বাক্য-শব্দটির অর্থ 'সে মাছ মারতে যাবার জন্য তাড়াতাড়ি করছে'। বিশ্লেষণে পাওয়া যাবে—অউলিসর্—মাছ মারা ; পেঅর্তোব=কোন কাজে নিযুক্ত হওয়া ; পিন্নেসুঅর্পোক্=সে তাড়াতাড়ি করে।

সর্বসমবায়ী ভাষাগোষ্ঠীর মধ্যে এমন কিছু কিছু ভাষার সন্ধান পাওয়া যায়, যেখানে কোন কোন শব্দের, বিশেষতঃ সর্বনাম শব্দের পৃথক্ অস্তিত্ব আছে, এ ছাড়া সর্বভাবেই এরা সর্বসমবায়ী গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। পিরেনিজ পর্বতের পশ্চিমভাগে প্রচলিত 'বাস্ক' (Basque) ভাষা ও আফ্রিকার 'বান্টু' (Bantu) ভাষা-পরিবার এই গোষ্ঠীর মধ্যে পড়ে। একে বলা চলে '**আংশিক সমবায়ী ভাষা** (Partially incorporating language)।

(২) **যৌগিক** (Agglutinative)—যৌগিক বা অশ্লিষ্ট যোগাত্মক ভাষার প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, এতে শব্দের উপাদানগুলো এমনভাবে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হয় যে এদের বিচ্ছিন্ন করলেও এদের অস্তিত্ব বর্তমান থাকে এবং প্রত্যেকটি উপাদানের অর্থবহতা (meaningfulness) রয়েছে। এরা পরস্পর মিলিতভাবে কখনও শব্দ-বাক্য গঠন করে না। তুর্কী ভাষা এই জাতীয় ভাষার উৎকৃষ্টতম দৃষ্টান্ত। আফ্রিকার সোয়াহিলি (Swahili) ভাষাও অনুরূপ লক্ষণ-যুক্ত। এই জাতীয় ভাষার সহজ ব্যবহারযোগ্যতার জন্য বিশ্বভাষা 'এসপেরান্তো'-তে যৌগিক পদ্ধতি অবলম্বিত হয়।

যৌগিক ভাষা চারি শ্রেণীতে বিভক্ত ঃ—(অ) উপসর্গ-যৌগিক, (আ) অনুসর্গ-যৌগিক, (ই) উপসর্গ-অনুসর্গ-যৌগিক, (ঈ) আংশিক যৌগিক।

(অ) **উপসর্গ যৌগিক** (Prefix-agglutinating)—এই ভাষায় প্রত্যয়ের পরিবর্তে উপসর্গ ব্যবহৃত হয়। উপসর্গ বা পদের মূল্যসূচক চিহ্নগুলি অতিশয় শিথিলভাবে পদের আগে যুক্ত হয়। অনেকের মতে আফ্রিকার বান্টু ভাষা পরিবার (জুলু, কাফির প্রভৃতি) এই শ্রেণীভুক্ত।

(আ) **অনুসর্গ যৌগিক** (Suffix agglutinating)—এই ভাষায় পদের মূল্য-সূচক চিহ্ন বা প্রত্যয়-বিভক্তি শব্দের শেষে শিথিলভাবে যুক্ত হয়। পৃথিবীর অনেক ভাষাই এই বর্গের অন্তর্ভুক্ত। এদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য উরাল (Ural), আলতাই (Altai) ও দ্রাবিড় গোষ্ঠীর ভাষাগুলো। বাঙলা ও কন্নড় ভাষার একটা দৃষ্টান্ত থেকে ব্যাপারটি সহজে বোঝা যাবে :

কারক	বাঙলা	কন্নড়
কর্তা	সেবকেরা	সেবক-রু
কর্ম	সেবকদিগকে	সেবক-রন্নু
করণ	সেবকের দ্বারা	সেবক-রিন্দ
সম্প্রদান	সেবকদের উদ্দেশ্যে	সেবক-রিগে
অপাদান	সেবকদের থেকে	(অপ্রাপ্য)
অধিকরণ	সেবকদিগে	সেবক-রল্লি

কন্নড় ভাষায় বহুবচনের চিহ্ন 'র', তৎস্থলে 'ন' বসালেই একবচনের রূপ পাওয়া যায়।

(ই) **উপসর্গ-অনুসর্গ-যৌগিক** (Prefix-suffix agglutinating)—প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল এবং ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলের বিভিন্ন ভাষা এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। শব্দের পূর্বে, পরে এবং মধ্যেও নানাপ্রকার প্রত্যয় অবাধে ব্যবহৃত হয়। মালয়ী ভাষা এই শ্রেণীর অন্যতম নিদর্শন।

(ঈ) **আংশিক যৌগিক** (Partially agglutinating)—পলিনেশীয় ভাষাগুলো এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। এই ভাষাগুলো মূলতঃ যৌগিক ছিল, অপর ভাষার সংস্পর্শে এগুলো আংশিক যৌগিকে পরিণত হয়েছে। নিউজিল্যান্ড তথা হাওয়াই দ্বীপের ভাষা আংশিক যৌগিক।

(৩) **সমন্বয়ী**—সমন্বয়ী তথা শ্লিষ্ট যোগাত্মক ভাষার লক্ষণ এই যে, শব্দের সঙ্গে সম্পর্কজ্ঞাপক চিহ্নগুলি (প্রত্যয়-বিভক্তি) এমনভাবে যুক্ত হয় যে এদের পৃথক অস্তিত্ব আর চোখে পড়ে না। এই চিহ্নগুলোর এককভাবে কোন পৃথক ব্যবহার নেই। হয়তো কোন এক সময় এদের শব্দরূপে স্বাধীন সত্তা বর্তমান ছিল কিন্তু এক্ষণে এগুলো চিহ্নমাত্রই। বর্তমানে পৃথিবীর অধিকাংশ প্রধান ভাষা—সংস্কৃত, বাঙলা, লাতিন, ইংরেজি, আরবী প্রভৃতি এই শ্রেণীভুক্ত।

সমন্বয়ী-ভাষাগোষ্ঠী দুটি উপবর্গে বিভক্ত—(অ) অন্তর্মুখী (Internal inflexion) ও (অ) বহির্মুখী (External inflexion)। আবার এই উভয়

উপবর্গই দ্বিবিধ শ্রেণীতে বিভক্ত হ'য়ে থাকে—১. সংশ্লেষাত্মক (synthetic), ২. বিশ্লেষাত্মক (Analytic)।

(অ) **অন্তর্মুখী শ্লিষ্ট বা সমন্বয়ী**—এই জাতীয় ভাষাদেহে অর্থাৎ শব্দের মধ্যেই সম্পর্কজ্ঞাপক চিহ্ন বা প্রত্যয় যুক্ত হয়ে থাকে। আরবী-আদি সেমেটিক ভাষা এবং হামেটিক বা প্রাচীন মিশরীয় ভাষা এই শ্রেণীভুক্ত। আরবী শব্দ সাধারণতঃ ত্রিব্যঞ্জন-যুক্ত হয়, তার ভিতরে বিভিন্ন স্বরবর্ণের অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে বিভিন্ন অর্থযুক্ত শব্দ তৈরী করা হয়। 'ক্‌ত্‌ল্‌' একটি আরবী ধাতু=এর সঙ্গে বিভিন্ন স্বরবর্ণযোগে গঠিত হয়—'কতল'=সে মারিল, 'কুতিল'=সে মারা পড়িল, 'য়ক্‌তুলু'—সে মারে, 'কিৎল'=শত্রু, 'কাতিল'=হত্যা প্রভৃতি। আরবী ভাষা অন্তর্মুখী ভাষার সংশ্লেষাত্মক রূপ এবং হিব্রু ভাষা বিশ্লেষাত্মক রূপ। সংশ্লেষাত্মক ভাষায় শব্দের পর পৃথক সম্পর্কবাচক শব্দ যোগ করতে হয় না, বিশ্লেষাত্মক ভাষায় পৃথক শব্দ যোগের আবশ্যকতা রয়েছে।

(আ) **বহির্মুখী শ্লিষ্ট বা সমন্বয়ী**—এই গোষ্ঠীভুক্ত ভাষাগুলোতে শব্দের সঙ্গে, প্রধানতঃ পিছনে প্রত্যয় বা সম্পর্কবাচক চিহ্ন অর্থাৎ বিভক্তি যুক্ত হয়। এই ভাষায় শব্দের আভ্যন্তর পরিবর্তন হয় না। ইন্দো-য়ুরোপীয় ভাষা-পরিবারের সব ভাষাই এই বর্গের অন্তর্ভুক্ত। এদের মধ্যে প্রাচীন ভাষাগুলো—সংস্কৃত, আবেস্তীয়, গ্রীক, লাতিন প্রভৃতি সংশ্লেষাত্মক। এ গোষ্ঠীর সর্বাধিক রক্ষণশীল লিথুআনীয় ভাষা এখনও সংশ্লেষাত্মক রূপ বর্তমান রেখেছে। সংশ্লেষাত্মক গোষ্ঠীর শব্দের মধ্যেই প্রত্যয় বিভক্তি যুক্ত থাকে, পৃথক্‌ অনুসর্গ-যোগের প্রয়োজন হয় না। পক্ষান্তরে বিশ্লেষাত্মক ভাষায় বিভক্তি চিহ্নের ব্যবহার কম, পৃথক্‌ শব্দকে অনুসর্গ বা পরসর্গরূপে ব্যবহার ক'রে পারস্পরিক সম্পর্ক বজায় রাখা হয়। বাঙলা, হিন্দী, ইংরেজি-আদি আধুনিক ইন্দো-য়ুরোপীয় গোষ্ঠীর ভাষাগুলো এই বিশ্লেষাত্মক শ্রেণীভুক্ত। বাঙলা ভাষার আদি-রূপ ছিল অপেক্ষাকৃত সংশ্লেষাত্মক, পরে বিশ্লেষাত্মক ভাষায় পরিণতি লাভ করছে। বাক্য মধ্যে পদস্থাপনার কঠোর নিয়ম বিশ্লেষাত্মক ভাষার বিশিষ্ট লক্ষণ।

ভাষার রূপতত্ত্বানুগত বা আকৃতিগত শ্রেণী-পীঠিকা

(Morphological/Syntactical/Typographical Classification Table)
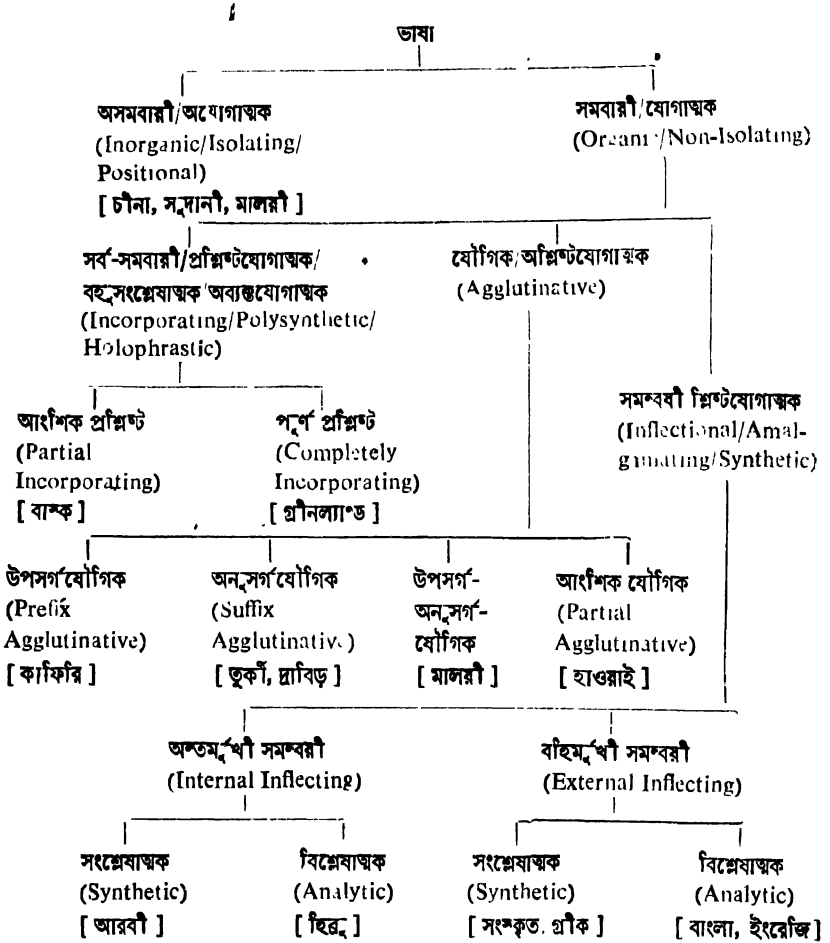
অশ্রেণীভুক্ত ভাষা (Unclassified language): রূপতত্ত্বের দিক্ তথা আকৃতির দিক্ থেকে ভাষার যে বর্গীকরণ করা হ'লো, তাদের কোনোটিরই অন্তর্ভুক্ত হয় না, এরূপ কিছু ভাষাও বর্তমান আছে—এদের বলা হয় 'অশ্রেণীভুক্ত ভাষা'। কোন এক শ্রেণীর লক্ষণ দিয়েই এ ভাষার বিচার চলে না। এরূপ ভাষার নিদর্শনরূপে 'জাপানী' ভাষার নাম উল্লেখ করা চলে।

[দুই] গোত্রানুযায়ী / বংশানুগত শ্রেণীবিভাগ
(Genealogical Classification)

ভাষার বংশানুগত শ্রেণীবিভাগ দৃশ্যতঃ সহজতর মনে হলেও বস্তুতঃ বেশ কষ্টসাধ্য। একালে বিভিন্ন ভাষার পারস্পরিক মিশ্রণ ঘটায় তাদের আদি বা মূল রূপটির সন্ধান অনেক সময়ই পাওয়া যায় না। ব্যাকরণে সাম্য এবং শব্দকোষে ঐক্য থেকেই ভাষার গোত্র নির্ণয় করতে হয়, কিন্তু যেখানে মিশ্রণ ঘটে গেছে, সেখানে ভাষাকে স্বরূপে পাওয়া সম্ভব নয় বলেই তার জাতিনির্ণয়ে অসুবিধে ঘটে। আবার এমন অনেক ভাষা আছে, প্রয়োজনীয় তথ্যের অভাবে, তাদের সঙ্গে অপর ভাষার সম্পর্ক নির্ণয় সম্ভবপর হয় না। কোন কোন ভাষা মৃত, দীর্ঘকাল অব্যবহারের ফলে তাদের সঙ্গে অপর ভাষার সম্পর্ক স্থাপন করা যায় না। বস্তুতঃ ভাষার বংশানুগত বর্গীকরণ ব্যাপারটিও বেশ জটিল এবং ফলতঃ, কখনো কোন কোন ভাষার শ্রেণীবিভাগ-বিষয়ে পণ্ডিতগণও ঐকমত্যে পৌঁছাতে পারেন নি।

পূর্বকথিত কারণসমূহের ফলে কোন কোন ভাষার বর্গীকরণ সম্ভবপর হয়নি। এদের মধ্যে আছে ঃ অতি প্রাচীন 'সুমেরীয় ভাষা' (Sumerian)—খ্রীঃ পূঃ ৪০০০ অব্দে দক্ষিণ মেসোপটেমিয়ায় প্রচলিত। 'এট্রুস্কান' (Etruscan)—খ্রীঃপূঃ শতাব্দীতে লাতিন-ব্যবহারের পূর্ব পর্যন্ত ইতালীতে প্রচলিত। পশ্চিম ঈরানের 'এলামীয়' (Elamite)—৪০০০ বৎসর পূর্বে প্রচলিত। পূর্ব মেসোপটেমিয়ায় খ্রীঃ পূঃ ১৬০০ অব্দে প্রচলিত 'মিটান্নি' (Mitanni) এবং প্রায় সমকালীন 'ক্রীট' দ্বীপের প্রাচীন ভাষা। আধুনিক কালেও প্রচলিত উত্তর স্পেনের 'বাস্ক' (Basque) ভাষারও কোন জ্ঞাতিগোষ্ঠীর সন্ধান পাওয়া যায়নি। পাপুয়া ও অস্ট্রেলিয়ার প্রাচীন ভাষা, দক্ষিণ আমেরিকার আদিম অধিবাসীদের ভাষা অথবা আফ্রিকার ভাষা নিয়ে যথোপযুক্ত বর্ণনাত্মক অধ্যয়ন হয়নি বলেই এ সমস্ত ভাষার শ্রেণীবিভাগে মতপার্থক্য থাকা অসম্ভব নয়। অনেকে 'জাপানী', 'কোরিয়ান্' প্রভৃতি ভাষাকেও কোন গোত্রপটের অন্তর্ভুক্ত করার পক্ষে অসুবিধের কথা উল্লেখ করেছেন।

বিচার-বিশ্লেষণ ক'রে পৃথিবীর যাবতীয় ভাষাকে কয়েকটি বর্গে বিভক্ত করা হ'য়েছে। অবশ্য পূর্বোল্লেখিত ভাষাগুলো শ্রেণীবদ্ধ করা সম্ভব হয়নি। আর এই বর্গীকরণের ব্যাপারে কিছু ভিন্নমতেরও অবকাশ রয়েছে।

(১) ইন্দো-য়ুরোপীয় (২) সেমীয়-হামীয়, (৩) বান্টু, (৪) উরাল বা ফিন্নো-উগ্রীয় (৫) আলতাইক বা তুর্ক-মোঙ্গল-মাঞ্চু, (৬) ককেশীয়, (৭) দ্রাবিড়,

(৮) অস্ট্রীক, (৯) চীনা-তিব্বতীয় বা ভোট-চীনায়, (১০) হাইপারবেরীয়, (১১) আমেরিকার আদিম ভাষাগোষ্ঠী। এ ছাড়াও কোন গোষ্ঠীভুক্ত নয় এমন বেশ কিছু ভাষাকে পৃথিবীর ভাষা-বর্গের মধ্যে স্থান দিতে হয়। এদের মধ্যে রয়েছে জাপানী ও কোরীয়, বুরুশাস্কি, বাস্ক এবং অধুনা-লুপ্ত প্রাচীন সুমেরীয়, এট্রুস্কান, এলামীয়, মিটান্নি প্রভৃতি ভাষা।

১. **ইন্দোয়ুরোপীয় ভাষাগোষ্ঠী** (Indo-European Language Family)—এই ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ভাষাগুলো পৃথিবীতে সর্বাধিক প্রচলিত এবং সম্ভবতঃ সর্বাধিক উন্নতও বটে। বাঙলা-সহ উত্তর ভারতীয় ভাষাগুলো এবং ইংরেজিসহ প্রায় সমস্ত য়ুরোপীয় ভাষা এই গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। অতএব এ বিষয়ে বিশেষ অধ্যয়ন প্রয়োজন বলে এ বিষয়ে পরবর্তী অধ্যায়ে পৃথক্‌ভাবে আলোচনা সন্নিবিষ্ট হ'ল।

২. **সেমীয়-হামীয় ভাষাগোষ্ঠী** (Hamito-Semitic Language Family)—আফ্রিকার উত্তরাংশ ও এশিয়ার পশ্চিমাঞ্চলে বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে এই ভাষাগোষ্ঠীর বিভিন্ন ভাষারূপ প্রচলিত। ইন্দো-য়ুরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর পর এই গোষ্ঠীভুক্ত ভাষা নিয়েই সর্বাধিক আলোচনা হয়েছে। সম্প্রতি এই ভাষাগোষ্ঠীর নোতুন নামকরণ হয়েছে 'আফ্রো-এশীয়' (Afro-Asiatic) ভাষা। এই গোষ্ঠীর পাঁচটি শাখা : ক. মিশরীয় (Egyptian), খ. বের্‌বের (Berber), গ. কুশীয় (Cushitic), ঘ. চাদ (Chad)—এই চরিটি একযোগে 'হামীয়' এবং পঞ্চমটি (ঙ) সেমেটিক। প্রাচীন মিশরীয় ভাষার বংশধর 'কপ্‌টিক' (Coptic), ধর্মীয় ভাষারূপে চতুর্থ শতাব্দী থেকে এখনও প্রচলিত আছে। উত্তর আফ্রিকা এবং সাহারা অঞ্চলে বের্‌বের বহুল প্রচলিত। আফ্রিকার পূর্বাঞ্চলে কুশীয় ভাষাগোষ্ঠীর প্রচলন সর্বাধিক। উত্তর নাইজিরিয়া ও চাদ হ্রদের চতুষ্পার্শ্বে চাদ-গোষ্ঠীভুক্ত অসংখ্য ভাষা বর্তমান : এদের সম্বন্ধে অতি অল্পই জানা যায়। আরবী, হিব্রু এবং ইথিওপিয়ার কিছু কিছু ভাষা সেমীয় গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। এদের মধ্যে আরবী ইস্‌লামের ধর্মীয় ভাষারূপে সমগ্র মধ্যপ্রাচ্যেই বহুল প্রচলিত। আরব-ব্যতীত পার্শ্ববর্তী অনেক দেশেও আরবী ভাষা ব্যবহৃত হয়। হিব্রু ভাষা এক সময় মৃতপ্রায় অবস্থায় উপনীত হলেও স্বাধীন ইজরায়েল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর তার নবজীবন লাভ ঘটেছে। এখন বিভিন্ন দেশের ইহুদীদের মধ্যে এই ভাষার প্রচলন শুরু হয়েছে। আক্কাদীয় ভাষা (Akkadian)—অ্যাসিরীয় (Assyrian)/ব্যাবিলনীয় (Babylonian) নামেও পরিচিত—এবং আরামীয় (Aramaic)-কনানীয় (Canaanite) ভাষাও সেমীয় পরিবারভুক্ত। কনানীয় ভাষাগুচ্ছের মধ্যে অন্যতম প্রধান ফিনীসীয় (Phoenician)। এই

ভাষাগোষ্ঠীর অধিকাংশ ভাষাই অতি প্রাচীন। খ্রীষ্টের জন্মের বহু পূর্ব থেকেই এই সমস্ত ভাষার লিখিত নিদর্শন পাওয়া যায়।

৩। **বান্টু ভাষাগোষ্ঠী** (Bantu Language Family)—সেমীয়-হামীয় গোষ্ঠীর বাইরে সমগ্র আফ্রিকার ভাষাগোষ্ঠীকে 'বান্টু' নামে অভিহিত করা হ'লেও অনেকে এখানে দুটো ভাষাগোষ্ঠীর উল্লেখ করে থাকেন। 'বান্টু' গোষ্ঠীকে 'নাইজার-কঙ্গো' পরিবার (Niger-Congo family) এবং অপর গোষ্ঠীকে 'চারি-নাইল' পরিবার (Chari-Nile) নামে অভিহিত করেন। বিষুবরেখার দক্ষিণে এবং সমগ্র পশ্চিম আফ্রিকায় 'নাইজার-কঙ্গো' বা 'বান্টু' গোষ্ঠীর বিভিন্ন ভাষা ব্যবহৃত হয়। এই গোষ্ঠীভুক্ত ভাষা-উপভাষার সংখ্যা এত অধিক যে এদের বর্গীকরণে ভিন্ন-মতেরই প্রাধান্য। সোয়াহিলি (Swahili), কঙ্গো (Kongo), লুবা (Luba), নিয়াঞ্জা (Nyanja), জুলু (Zulu) এবং আরও অসংখ্য ভাষা এই গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। উত্তর নীল নদীর উপত্যকায় 'চারি-নাইল' পরিবারের বিভিন্ন ভাষা প্রচলিত। এই গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ভাষা দিন্‌কা (Dinka), মাসাই (Masai), নুবা (Nuba), মোরু (Moru) প্রভৃতি। খোইসান (Khoisan)-পরিবারভুক্ত বুশম্যান (Bushman) ও হটেন্‌টট (Hottentot), ভাষা নাইজার-কঙ্গো পরিবারের দক্ষিণ-সীমান্তে অবস্থিত।

৪। **ফিন্নো-উগ্রীয় ভাষাগোষ্ঠী/উরাল** (Finno-Ugric Language Family)—সমগ্র য়ুরোপব্যাপী ইন্দো-য়ুরোপীয় ভাষাসমূদ্রের মাঝখানে ফিন্নো-উগ্রীয় ভাষা-গোষ্ঠী যেন একটা দ্বীপের মত। হাঙ্গেরীর ভাষা মাজ্যর (Magyar) বা হাঙ্গেরীয় (Hungarian), স্ক্যান্ডিনাভিয়ার যাযাবরদের ভাষা লাপ্পীয় (Lappish), ফিনল্যাণ্ডের ভাষা ফিন্নীয় (Finnish) এবং এস্তোনিয়ার ভাষা এস্তোনীয় (Esthonian) এই গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। সাইবেরিয়ায় প্রচলিত সামোয়েদে (Samoyede)-সহ ফিন্নো-উগ্রীয় ভাষাগোষ্ঠীকে একসঙ্গে 'উরাল' (Uralic) ভাষা-পরিবার নামেও অভিহিত করা হয়।

৫। **তুর্ক-মোঙ্গল-মাঞ্চু ভাষাগোষ্ঠী** (Turk-Mongol-Manchu Language Family)—এই ভাষাগোষ্ঠী একসঙ্গে 'আলতাই' (Altaic) ভাষাগোষ্ঠী নামেও পরিচিত হয়ে থাকে। তুর্কী ভাষাপরিবারে ওসমানলি (Osmanli) সর্বাধিক প্রচলিত। মঙ্গোলিয়ায় খুব অল্পসংখ্যক লোকই মোঙ্গল ভাষা ব্যবহার ক'রে থাকে। মাঞ্চুরিয়া এবং সাইবেরিয়ার অংশবিশেষে প্রচলিত মাঞ্চু ভাষারও ব্যাপকতা নেই।

তুর্কী শাখায় তাতার (Tatar), উজবেগ (Uzbeg), কিরগিজ (Kirghiz) এবং মোঙ্গল মাঞ্চু শাখায় তুঙ্গুজী (Tungus) ভাষা উল্লেখযোগ্য।

ফিন্নো-উগ্রীয় তথা উরাল ভাষাগোষ্ঠী এবং তুর্ক-মোঙ্গল-মাঞ্চু তথা আলতাই ভাষাগোষ্ঠীর মধ্যে কিছু সমধর্মী গঠনগত বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করে একদল ভাষাবিজ্ঞানী উভয় ভাষাগোষ্ঠীকে একসঙ্গে 'উরাল-আলতাই' (Ural-Altaic) ভাষাগোষ্ঠী নামে অভিহিত ক'রে থাকেন। কেউ কেউ আবার এই গোষ্ঠীর সঙ্গে 'জাপানী' (Japanese) এবং 'কোরীয়' (Korean) নামক বিচ্ছিন্ন ভাষাপরিবার দুটিকেও জুড়ে দিতে চান।

৬. **ককেশীয় ভাষাগোষ্ঠী** (Caucasian Language Family)—কৃষ্ণসাগর এবং কাস্পিয়ান সাগরের মধ্যবর্তী ভূ-ভাগে প্রচলিত ককেশীয় ভাষাগোষ্ঠীর দুটি শাখা, উত্তর ককেশীয় (North Caucasian) এবং দক্ষিণ ককেশীয় (South Caucasian)। ব্যঞ্জনবাহুল্য এবং স্বরস্বল্পতার জন্য উত্তর ককেশীয় ভাষা অতিশয় আগ্রহোদ্দীপক। দক্ষিণ ককেশীয় শাখার জর্জীয় (Georgian) ভাষা একমাত্র উন্নত ও উল্লেখযোগ্য ভাষা।

৭. **দ্রাবিড় ভাষাগোষ্ঠী** (Dravidian Language Family)—প্রধানতঃ দক্ষিণ ভারতে ও বিক্ষিপ্তভাবে উত্তর ভারতের স্থানে স্থানে এবং সিংহলের উত্তরাংশে এই ভাষাপরিবারের বিভিন্ন ভাষারূপ প্রচলিত আছে। এদের মধ্যে প্রধান চারটি দক্ষিণ ভারতেই সীমাবদ্ধ। তামিল (Tamil), তেলুগু (Telugu), কন্নড় বা কানাড়ী (Canarese) এবং মালয়ালী বা মালয়ালম্ (Malayalam)। তামিল ভাষা সিংহলের উত্তরাংশে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। বেলুচিস্তানের একটি বিচ্ছিন্ন অঞ্চলে ব্রাহুই (Brahui) ভাষা প্রচলিত। এই গোষ্ঠীর অন্যান্য ভাষার মধ্যে আছে টুলু বা টুডু (Tudu), কোডাগু (Kodagu), টোডা (Tudu), কোটা (Kota), গোণ্ডী (Gondi), কন্ধী বা কুই (Kandhi/Kui), মালতো বা মালপাহাড়ি (Malto) প্রভৃতি। [বিস্তৃত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য: 'আর্যেতর ভাষাগোষ্ঠী' (পঞ্চম অধ্যায়)।]

৮. **অস্ট্রীক ভাষাগোষ্ঠী** (Austric Language Family)—পূর্ব ভারত এবং দূরপ্রাচ্যে অস্ট্রীক ভাষাগোষ্ঠীর দু'টি প্রধান শাখা প্রচলিত, একটি অস্ট্রো-এশিয়াটিক (Austro-Asiatic) এবং অপরটি মালয়-পলিনেশীয় (Malayo-Polynesian)। অস্ট্রো-এশিয়াটিক গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ভাষাগুলোর মধ্যে প্রধান মুণ্ডা (Munda), মোন-খমের (Mon-Khmer) এবং অনাম মুঅঙ্ (Annam-Muong)। মুণ্ডা বা কোল (Kol) গোষ্ঠীর ভাষাগুলো মধ্য ভারত ও পূর্ব

ভারতের আদিবাসীরা ব্যবহার করে থাকে। এদের মধ্যে আছে সাঁওতালি, মুণ্ডারি, ভূমিজ, কোডা হো, কুরকু, খড়িয়া, শবর প্রভৃতি ভাষা [দ্রঃ পঞ্চম অধ্যায়]। উত্তর-পূর্ব ভারতের খাসী ভাষা (Khasi)-ও এই গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। অনেকে খাসী ও নিকোবরী ভাষাকে এই গোষ্ঠীরই একটি পৃথক শাখা বলে গণ্য করে থাকেন। মোন্-খ্মের গোষ্ঠীর ভাষা মালয় ও ব্রহ্মদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত। এর মধ্যে মোন্ বা পেগুয়ান (Peguan) এবং খ্মের বা কাম্বোডিয়া (Cambodian)। মালয়-পলিনেশীয় পরিবারের চারটি প্রধান—ইন্দোনেশীয় (Indonesian), মেলানেশীয় (Melanesian), মাইক্রোনেশীয় (Micronesian) এবং পলিনেশীয় (Polynesian)। ইন্দোনেশিয়ার ভাষা 'বাহাসা ইন্দোনেশীয়' (Bahasa Indonesian) মালয়ী ভাষার উপর ভিত্তি করে গঠিত। মালয় এবং পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জগুলোতেই শুধু নয়, এই গোষ্ঠীরই বিভিন্ন ভাষা-মাদাগাস্কার থেকে ঈস্টার দ্বীপপুঞ্জ এবং হাওয়াই থেকে নিউজিল্যাণ্ড পর্যন্ত বিস্তৃত।

৮. **ভোট-চীনীয় ভাষাগোষ্ঠী** (Sino-Tibetan Language Family)—তিনটি প্রধান ভাষাগুচ্ছ নিয়ে ভোট-চীনীয় ভাষাগোষ্ঠী গঠিত—ইয়েনিসেই-ওস্টিয়াক (Yenisei-Ostyak), তিব্বতী-বর্মী (Tibeto-Burman) এবং (থাই) চীনা (Thai-Chinese)। ইয়েনিসেই-ওস্টিয়াক উত্তর সাইবেরিয়ায় প্রচলিত। তিব্বতী-বর্মী ভাষা প্রধানতঃ তিব্বত এবং ব্রহ্মদেশে ব্যবহৃত হলেও তার অপর একটি শাখা বোডো (Bodo) পূর্ব ভারত ও হিমালয়ের পাদদেশে বহুল প্রচলিত ; এদের মধ্যে আছে লেপচা, কিরান্তি, আবর, ডাফলা, গারো, টিপরাই, নাগা, কাচিন, কুকী, মেইথেই প্রভৃতি [দ্রঃ পঞ্চম অধ্যায়]। থাই-চীনা গোষ্ঠীর প্রধান দুটি শাখা—একটি থাইল্যাণ্ডে ব্যবহৃত থাই ভাষাগুচ্ছ, শ্যামী বা সিয়ামি, অপরটি সমগ্র চীনে প্রচলিত চীনাভাষা। অনেকেই চীনাভাষার সঙ্গে থাইভাষার গুচ্ছবন্ধনকে অস্বীকার ক'রে লাউসিয়ান (Laotian) এবং শান (Shan) ভাষার সঙ্গে থাই ভাষাকে একশ্রেণী করে থাকেন এবং মালয়ী-পলিনেশীয় গোষ্ঠীর সঙ্গে এদের সম্পর্কযুক্ত করেন। সমগ্র চীনদেশে একই প্রকার লিপি ব্যবহৃত হয় বলে অনেকের ধারণা চীনে একটি ভাষাই প্রচলিত। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে চীনা ভাষাগুচ্ছ নিম্নোক্ত ভাষাসমূহে বিভক্ত : ক্যাণ্টনী (Cantonese), কান-হাক্কা (Kan-Hakka), আময়-সোআতো (Amoy-Swatow), ফুচৌ (Foochow), উও (Wu), সিয়াং (Hsiang) এবং মান্দারিনের (Mandarin) তিনটি উপভাষা। সমগ্র চীনে মান্দারিন ভাষাই সর্বাধিক লোক ব্যবহার করে থাকে। খ্রীস্টপূর্ব ২০০০ অব্দের চীনালিপির

নিদর্শন পাওয়া যায়, অতএব চীনাভাষা যে অতিশয় প্রাচীন এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

১০. **হাইপারবোরীয় ভাষা পরিবার** (Hyperborean/Palaeo-Asiatic Language Family)—সাইবেরিয়ার পূর্বাংশে অর্থাৎ এশিয়ার উত্তর-পূর্ব সীমান্ত অঞ্চলে হাইপারবোরীয় গোষ্ঠীর ভাষাসমূহ প্রচলিত। চুকচী (Chukchi) এই গোষ্ঠীর প্রধান ভাষা। অনেকে অনুমান করেন, জাপানের আদি ভাষা আইনুর (Ainu)-সঙ্গে এর সম্পর্ক থাকতে পারে।

১১. **আমেরিন্দ বা আমেরিকান ভাষাপরিবার** (American-Indian / American Language Family)—উত্তর আমেরিকা এবং দক্ষিণ আমেরিকার সুবিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে এককালে যে আদিম অধিবাসীরা বাস করত তাদের ব্যবহৃত ভাষার সংখ্যা এবং জাতিনির্ণয়ে ভাষাবিজ্ঞানীরা স্পষ্টতঃই বহুধা বিভক্ত। ভাষার নামকরণ এবং ভাষাকে গুচ্ছবন্ধ করার রীতিতে প্রায় কেউই একমত হ'তে পারেন না। উত্তর-আমেরিকায় অন্ততঃ ৫৪টি ভাষা পরিবার, মেক্সিকো এবং মধ্য আমেরিকায় ২৩টি ভাষা পরিবার এবং দক্ষিণ আমেরিকায় অন্ততঃ ৭৫টি ভাষা পরিবারের কথা কেউ কেউ অনুমান করেন। এতগুলো ভাষা পরিবারের অন্তর্ভুক্ত ভাষার সংখ্যা যে অগণিত, তা' সহজেই অনুমেয়। যাহোক প্রধান ভাষাগুলোকে নিম্নোক্তক্রমে শ্রেণীবন্ধ করা

.) উত্তর আমেরিকা : আলগোঙ্কিন (Algonkin), হোকা (Hoka), Iroquois), আথাবাস্কান (Athabaskan), হাইডা (Haida), ɔux) ; (খ) মেক্সিকো ও মধ্য আমেরিকা : মায়া (Mayan), শোশোন ı), আজটেক (Aztec) ভাষাগুচ্ছের নহুৎল (Nahutl) ও নহুআৎ) ; (গ) দক্ষিণ আমেরিকায় : আরোআক (Arwak), চিবোচা ıa), জে (Ze), গুআইকুরু (Guaykuru), কুইচুআ (Quichua), য় (Patagonian) ও ফুয়েজিয় (Fuegian)।

অগোষ্ঠীভুক্ত ভাষাসম্প্রদায় (Unclassified Languages) : বহুধাবিভক্ত িচিত্র ভাষাসমূহের যথাযথ বর্গীকরণে অসুবিধার কথা পূর্বে বলা হ'য়েছে ীয় কিছু কিছু ভাষার নামও উল্লেখ করা হ'য়েছে। এই ভাষাসম্প্রদায়কে ভাবে দু'টি পর্বে বিন্যস্ত করা যেতে পারে। প্রাচীন পর্বের ভাষাগুলি , ফলতঃ এদের 'লুপ্ত-ভাষা'-রূপেও উল্লেখ করা যেতে পারে।

বা লুপ্ত অশ্রেণীভুক্ত ভাষাসমূহের মধ্যে সর্বপ্রাচীন সম্ভবতঃ প্রাচীন াষা (আ' খ্রী' পূর্ব ৪০০০ অব্দ)। প্রাচীন সুমের রাজ্যে ব্যবহৃত লিপি পাওয়া গেছে, এবং পাঠোদ্ধার করাও সম্ভবপর হয়েছে।

পরবর্তী ব্যাবিলনীয়দের উপরও এই ভাষার যথেষ্ট প্রভাব ছিল। ২০০০ খ্রীঃ পূর্বাব্দেই ভাষাটি লুপ্ত হ'য়ে গেলেও আ' ৩০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত সম্ভবতঃ 'পবিত্র ভাষা' রূপে প্রাচীন সুমেরীয় ভাষা পণ্ডিত-মহলে ব্যবহৃত হ'তো।

আ' ২৫০০ খ্রীঃ পূর্বাব্দে ব্যবহৃত এলামীয় (Elamite) বা সুসীয় (Susian) ভাষারও নিদর্শন পাওয়া গেছে। ভাষাটি এলাম অর্থাৎ বর্তমান লুরিস্তান ও খুজি-স্তাম অঞ্চলে ব্যবহৃত হ'তো। এটি প্রাচীন পারসিক বা ব্যাবিলনীয় ভাষার সঙ্গে যে যুক্ত ছিল না, তা নিশ্চিতভাবে বলা যায়।

খট্টি (Katti/Pıoto-Khatti) ভাষা ছিল এশীয় মাইনরের মূল অধিবাসীদের ভাষা, পরবর্তীকালে বিজেতা হিত্তিদের দ্বারা দেশ অধিকৃত হ'লে ভাষাটিও কালে লুপ্ত হয়। সন্নিহিত অঞ্চলে একসময়ে প্রচলিত ছিল মিটান্নি (Mitanni) ভাষা। নৃপতি দুশরত্ত (Dusharatta—দশরথ ?) কর্তৃক খ্রীঃ পূর্ব ১৪০০ অব্দে মিশর রাজকে লিখিত একটি পত্রই এই ভাষার প্রাপ্ত একমাত্র নিদর্শন। আশ্চর্যের বিষয় এই পত্রে অনেক ভারতীয় দেবতার নাম ও শব্দ পাওয়া যায়। আ' খ্রীষ্টপূর্ব সপ্তদশ শতকে ব্যাবিলনে কাসাক (Kassite) ভাষা ব্যবহৃত হ'তো এবং খ্রীঃ পূঃ তৃতীয় শতক পর্যন্ত তা বর্তমান ছিল। এ ছাড়াও বান্নিক (Vannic) ভাষা (খ্রীঃ পূঃ নবম/অষ্টম শতাব্দী), কারীয় (Karian) ভাষা (খ্রীঃ পূঃ সপ্তম শতক) ও ঐ সময়কার লীডীয় ভাষার নাম উল্লেখ করা চলে। এদের সম্বন্ধে বেশি কিছু জানা যায় না।

ক্রীট দ্বীপে যে প্রাচীন লেখসমূহ পাওয়া গেছে, তা' সাধারণভাবে প্রাচীন ক্রীটীয় (Old Cretan) বা মিনোয়ান (Minoan) নামে পরিচিত, ঐ লিপি-সমূহের সম্পূর্ণ পাঠোদ্ধার হ'য়েছে, এমন কথা বলা না গেলেও এটি যে ইন্দো-য়ুরোপীয় বা সেমীয়—কোন গোষ্ঠীভুক্ত নয়, তা নিশ্চিতভাবেই বলা যায়। প্রাচীন মিশরীয়গণ ভাষাটিকে 'কেফ্‌তিউ' (Keftiu) নাম জানতো। গ্রীক ভাষা এই ভাষা থেকে প্রচুর শব্দ আহরণ করেছে। এই লিপি-পাঠে অনুমান করা হয় যে, প্রাচীন ক্রীটীয় জাতি সভ্যতার অতি উচ্চস্তরে আরোহণ করেছিল।

ভারতবর্ষের একটি গুরুত্বপূর্ণ সুপ্রাচীন লুপ্ত ভাষা হ'লো মোহেন্‌-জো-দড়ো তথা প্রাচীন সিন্ধুকূলের ভাষা। ঐ অঞ্চলে প্রাপ্ত অসংখ্য লেখচিত্রে যে-সমস্ত লিপি খোদাই করা আছে, তার পাঠোদ্ধার না হওয়াতে ভাষার স্বরূপটি আজও অজ্ঞাত। পণ্ডিতদের কেউ কেউ অনুমান করেন, এর ভাষা দ্রাবিড়, আবার অপর কেউ কেউ এটিকে বৈদিক ভাষা বলে মত প্রকাশ ক'রে থাকেন। তবে য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ

অনুমান ক'রে থাকেন যে, বৈদিক যুগেরও পরে ভারতে লিপি উদ্ভূত হ'য়েছিল, তা যে সত্য নয়, সহস্রাধিক বর্ষ পূর্বেকার এই লিপিই তার প্রমাণ।

এই পর্বের শেষ উল্লেখযোগ্য ভাষা এট্রুস্কান (Etruscan) ইতালীতে আ' খ্রীঃ পূঃ ১৭০০ অব্দ থেকে ব্যবহৃত হ'তো—লাতিন ভাষা এসে একে স্থানচ্যুত করে। এতে বেশ কিছু প্রাচীন লিপির পাঠোদ্ধার করা সম্ভবপর হলেও ভাষা-বিষয়ক যাবতীয় তত্ত্ব ও তথ্য জানা গেছে, এমন কথা বলা চলে না। তবে ভাষাটি যে ইন্দো-য়ুরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীভুক্ত নয়, এটি নিশ্চিত। কেউ কেউ অনুমান করেন এট্রুস্কান অস্ট্রীক গোষ্ঠীভুক্ত হ'তে পারে।

অধুনা প্রচলিত অগোষ্ঠীভুক্ত ভাষাগুলির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য জাপানী ভাষা (Japanese)। কারো কারো মতে এটি আলতাই গোষ্ঠীভুক্ত বলে অভিহিত হ'লেও, গঠনগত দিক থেকে উক্ত ভাষার সঙ্গে এর যেমন সাদৃশ্য আছে, তেমনি বৈষম্যও যথেষ্ট রয়েছে বলে আলোচ্য অভিমতটি গ্রহণযোগ্য নয়। জাপানী ভাষার সাধুরূপ এবং কথ্যরূপের মধ্যে যেমন বিস্তর পার্থক্য, তেমনি উচ্চবর্গের অভিজাত-দের সঙ্গে নিম্নবর্গের সাধারণ লোকের ভাষার পার্থক্যও যথেষ্ট। জাপানী ভাষা যথেষ্ট সমৃদ্ধ হ'লেও তাতে চীনা সংস্কৃতি, ভাষা এবং লিপির প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

কোরীয় (Korean) ভাষা-বিষয়েও অনেকে অভিমত প্রকাশ করেন যে এটিও আলতাই ভাষা-গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু এই সিদ্ধান্তটিও সংশয়জনক। বরং এর উপর পার্শ্ববর্তী মোঙ্গল-মাঞ্চু ভাষার প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। কোরিয়ায় বৌদ্ধধর্ম বিস্তারের পর সেখানে চীনাভাষা 'সরকারী ভাষা' রূপে এবং চীনা লিপিও গৃহীত হয়। পরে পঞ্চদশ শতাব্দীর দিকে এখানে ব্রাহ্মীলিপির উপর ভিত্তি ক'রে কোরীয় ভাষার পক্ষে উপযোগী এক লিপি উদ্ভাবন করা হয় এবং তদবধি এই লিপিতেই কোরীয় ভাষা লিপিবদ্ধ হয়।

স্পেন দেশের পশ্চিম পিরানিজ জেলায় বাস্ক (Basque) ভাষা প্রচলিত—এর আটটি ঔপভাষিক রূপ আছে। ভাষাগত বিচারে এটি আমেরিন্দ (রেড্ইণ্ডিয়ানদের) ভাষা ও উগ্রীয় ভাষার মাঝামাঝি স্তরে অবস্থিত। ভাষায় শব্দ-দৈন্য রয়েছে, সাধারণ বস্তু বা ভাব-বোধক শব্দের অভাব দেখা যায়। যেমন 'ভগিনী'র কোন প্রতিশব্দ নেই—পুরুষের বোন্=arriba, স্ত্রীলোকের বোন=utizper।

ভারতীয় উপমহাদেশে প্রচলিত অশ্রেণীভুক্ত ভাষাসমূহের মধ্যে রয়েছে বুরুশাস্কি (Burushaski) বা খজুনা (Khajunā)—এটি উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে প্রচলিত। আন্দামানে প্রচলিত আন্দামান (Andaman) ভাষায় বক্তব্য পরিবেশনের সময় অঙ্গ-ভঙ্গি যোগ করতে হয়। মায়ানমা (বার্মা) দেশে প্রচলিত কারেন্ (Karen) ও মন্ (Man) ভাষার সঙ্গে চীনা ভাষার যোগ থাকতে পারে।

তৃতীয় অধ্যায়

ইন্দো-য়ুরোপীয় ভাষা পরিবার

(Indo-European Language Family)

[এক] ইন্দো-য়ুরোপীয় ভাষার পরিচয়

পূর্ব সীমায় ভারত এবং পশ্চিম সীমায় য়ুরোপের পশ্চিম সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত বিরাট ভূখণ্ডে প্রচলিত আধুনিক ভাষাগুলোর ঐতিহাসিক অধ্যয়ন এবং প্রাচীন ভাষাগুলোর তুলনামূলক অধ্যয়নের সাহায্যে ভাষাবিজ্ঞানী পণ্ডিতগণ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হ'য়েছেন যে ভারত-ঈরান ও য়ুরোপের প্রায় সমস্ত ভাষাই এক মূল ভাষা থেকে উৎপন্ন হ'য়েছে—এই ভাষার সর্বাধিক পরিচিত নাম **'ইন্দো-য়ুরোপীয় ভাষা'** (Indo-European Languages)। এককালে জার্মান ভাষাবিজ্ঞানীরা এর নাম দিয়েছিলেন **'ইন্দো-জার্মান ভাষা'** (Indo-Germanic), কিন্তু একদেশদর্শিতার জন্য এই নাম পরিত্যক্ত হ'য়েছে। বাইবেলোক্ত হজরত নোহ্-এর দুই পুত্র সেম এবং হ্যাম-এর নামে 'সেমীয়' ও 'হামীয়' নামে দু'টি ভাষাগোষ্ঠীর নামকরণ হওয়াতে, তার তৃতীয় পুত্র 'জ্যাফ'-এর নামে ইন্দো-য়ুরোপীয় ভাষার **'জ্যাফাইট'** নামের একটা প্রস্তাব থাকলেও তা গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হয়নি। এই ভাষা পরিবারের অপর একটি সাধারণ প্রচলিত নাম 'আর্য' কিন্তু এই মূল ইন্দো-য়ুরোপীয় ভাষার একটি শাখার নাম 'আর্য' (ইন্দো-ঈরানীয়) থাকায় অর্থবিভ্রাটের আশঙ্কায় এই নামও গ্রহণ করা সমীচীন নয়। কেউ কেউ 'ভারোপীয়' (ভারত-ইউরোপীয়) নামে একে অভিহিত করলেও বাংলায় এর প্রচলন নেই বললেই চলে। ব্যবহারিক সুবিধের জন্যে আমরা একে 'আদি আর্য' (Proto Aryan) অথবা সংক্ষেপে 'ই য়ু' (I. E.) বলেও অভিহিত করতে পারি।

আনুমানিক খ্রীঃ পূঃ ২৫০০-৩০০০ অব্দে ইন্দো-য়ুরোপীয় ভাষাভাষী জনগোষ্ঠী সম্ভবতঃ মধ্য য়ুরোপে অথবা উরাল পর্বতের দক্ষিণাংশে বসবাস করত। অতি সাম্প্রতিক গবেষণায় অপর একটি অভিমত উপস্থাপিত হ'য়েছে যে, ঐ জনগোষ্ঠী সম্ভবতঃ টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস্ নদীদ্বয়ের অন্তর্বর্তী দোয়াব অঞ্চলের সন্নিহিত কোন স্থানে বাস করত। অনেকে এদের 'আর্যজাতি' বলে অভিহিত করলেও প্রয়োগটি ভ্রমাত্মক, কারণ 'আর্য' শব্দ জাতিবাচক নয়, ভাষাবাচক। ভাষাবিজ্ঞানিগণ এদের পরিচায়ক একটা নাম দিয়েছেন 'বীর' (*wiros)। এই বীর জাতি সম্ভবতঃ ছিল

যাবাবর এবং এরা অশ্বকে পোষ মানিয়েছিল। আদি নিবাস থেকে তারা ক্রমশঃ ছড়িয়ে পড়তে থাকে। তাদের একটি প্রধান শাখা পশ্চিমদিকে এবং কালক্রমে তা সমগ্র য়ুরোপে ছড়িয়ে পড়ে এবং অপর একটি শাখা ঈরান হ'য়ে ভারত পর্যন্ত বিস্তারলাভ করে।

আলোচ্য প্রাচীন ইন্দো-য়ুরোপীয় ভাষার কোন প্রমাণ অথবা লিখিত নিদর্শন নেই, একে অনুমানসিদ্ধ অথবা পুনর্গঠিত ভাষা বলে গ্রহণ করা চলে। আলোচনা-প্রসঙ্গে এই ভাষা-সম্বন্ধে যা কিছু বলা হ'য়ে থাকে, সবই আনুমানিক। সাধারণতঃ তারকাচিহ্ন (*) দ্বারা এই ভাষার পুনর্গঠিত শব্দগুলোর স্বরূপ বোঝানো হয়।

(ক) ইন্দো-য়ুরোপীয় ভাষার প্রধান বৈশিষ্ট্য এবং লক্ষণসমূহ

১. রূপতত্ত্বানুগত বিচারে ই-য়ু ভাষা সমন্বয়ী বা শ্লিষ্ট যোগাত্মক (Suffix-inflecting)। শব্দের সঙ্গে প্রত্যয়-বিভক্তি যুক্ত হ'ত। কোন এক সময় প্রত্যয়গুলোর অর্থ এবং স্বাধীন অস্তিত্ব থেকে থাকলেও পরে সেগুলো শুধুই সংকেত চিহ্নে পর্যবসিত হয়।

২. আরবী-আদি সেমীয়-হামীয় গোষ্ঠীর ভাষায় প্রত্যয় যেমন অন্তর্মুখী, ই.-য়ু. ভাষায় সেরূপ নয়, প্রত্যয় এখানে বহির্মুখী।

৩. মূলতঃ সংশ্লেষাত্মক হ'লেও ক্রমবিবর্তনের ফলে মূল ভাষা থেকে উদ্ভূত বিভিন্ন ভাষাগোষ্ঠীর একালে বিশ্লেষাত্মক রূপে পরিণতি। ধাতুমূলের সঙ্গে প্রত্যয় ও বিভক্তি ছিল অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত। পরিবর্তন-কালে ধাতুমূলটি অক্ষুণ্ণ থাকলেও বিভক্তিগুলো ক্রমশঃ ক্ষয়িত অথবা বিলুপ্ত-হ'য়ে যায়, ফলে বাক্যে পদের আবস্থানিক গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়।

৪. ধাতুমূলগুলো আদৌ ছিল একাক্ষর (mono-syllabic); এদের সঙ্গে কৃৎ প্রত্যয় (Primary suffix) এবং তদ্ধিত প্রত্যয় (Secondary suffix) ও বিভিন্ন বিভক্তি যুক্ত হয়ে পদ গঠন করত এবং ঐ পদই বাক্যে ব্যবহৃত হ'ত।

৫ শব্দের পূর্বে উপসর্গ যুক্ত হ'লেও তা অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধযুক্ত ছিল না এবং অপরিত্যাজ্যও ছিল না। সংস্কৃত, গ্রীক, লাতিন প্রভৃতি ভাষায় অর্থপরিবর্তনের জন্যই উপসর্গ যুক্ত হ'ত এবং সে উপসর্গের স্বাধীন ব্যবহারও অজ্ঞাত ছিল না।

৬. সমাসবন্ধন ই.-য়ু ভাষার অপর এক লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। দুই বা ততোধিক শব্দের সমাসবন্ধনের ফলে তার যে অর্থ দাঁড়াত, তা' বিচ্ছিন্ন শব্দগুলোর অর্থসমষ্টি-মাত্র নয়। সমাসবদ্ধ শব্দে বিভক্তি চিহ্ন লোপ পেত। সংস্কৃত ভাষায় এরূপ সমাসবদ্ধ

পদের আয়তন কয়েক পঙ্‌ক্তি-ব্যাপীও হয়ে থাকে। ওয়েল্‌স্‌ ভাষায়ও দীর্ঘ সমাসবদ্ধ পদের অস্তিত্ব বর্তমান। (একটি ওয়েল্‌স্‌ গ্রামের নামে ৫৮টি অক্ষর আছে: Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrob-wll-llantisiliogogoch, এর অর্থ—'The church of St. Mary in a hollow of white hazel, near to the rapid whirlpool, and to St. Tisilio church, near to a red cave'.—গ্রামের নামটি একটি সমাসবদ্ধ শব্দ।)

৭. অপশ্রুতি (Ablaut) বা স্বরক্রমের পরিবর্তন (Vowel-gradation) এই ভাষার অপর বৈশিষ্ট্য। অপশ্রুতি (Ablaut) বা স্বরক্রমের (Vowel gradation) পরিবর্তনে বিশেষ সূত্রানুসারে শব্দমধ্যে স্বরবর্ণের পরিবর্তন ঘটে। যেমন, 'যজ্‌' ধাতু থেকে উৎপন্ন শব্দগুলোর মধ্যে আছে 'যজ্ঞ, যাজন, ইষ্ট';—এই আভ্যন্তর পরিবর্তন ইংরেজী শব্দেও লভ্য—eat, ate ; buy, bought প্রভৃতি। আদৌ ভাষায় প্রস্বর (accent) ছিল এই অপশ্রুতির মূলে; পরে প্রত্যয়বিভক্তি লোপ পাওয়াতে শুধু ঐ স্বরক্রমের পরিবর্তনের মধ্যেই তাদের বিলুপ্তিচিহ্ন রয়ে গেছে।

৮. প্রত্যয়-বিভক্তির বৈচিত্র্য ও প্রাচুর্য ইন্দো-য়ুরোপীয় ভাষাগুলোর আর এক বৈশিষ্ট্য। মূল ভাষা থেকে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে প্রত্যেক ভাষা নিজস্ব উপায়ে বিকাশ লাভ করেছে। মূল ভাষার ধাতুমূলগুলো অক্ষুণ্ণ থাকলেও পরিবর্তিত অবস্থায় প্রত্যেকেই স্বাধীনভাবে প্রত্যয়বিভক্তি যোগ করে নিয়েছে। এই কারণেই ই-য়ু. ভাষার শাখা ভাষাগুলোতে প্রত্যয়-বিভক্তিতে সাদৃশ্যের একান্ত অভাব এবং সব মিলিয়ে বিভিন্ন ভাষায় এদের বৈচিত্র্য এবং প্রাচুর্যও যথেষ্ট।

১. **ধ্বনি**—বিভিন্ন ইন্দো-য়ুরোপীয় ভাষার তুলনামূলক আলোচনায় অনুমান করা হয়েছে যে নিম্নোক্ত ধ্বনিগুলো আদি আর্যভাষায় বর্তমান ছিল:

(ক) স্বরবর্ণ—অতি হ্রস্ব অ (ə)—এটি 'Schwa'-রূপে পরিচিত।

হ্রস্ব—অ (a), ই (i), উ (u), এ (e), ও (o)।

দীর্ঘ—আ (ā), ঈ (ī), ঊ (ū), এ (ē), ও (ō)।

(খ) অর্ধস্বর—য় (y), ব (w)।

(গ) অর্ধব্যঞ্জন—হ্রস্ব ঋ (ṛ), হ্রস্ব ঌ (ḷ), দীর্ঘ ৠ, দীর্ঘ ৡ ; হ্রস্ব ও দীর্ঘ ন্ (ṇ), ম্ (ṃ)।

(ঘ) স্পৃষ্ট ব্যঞ্জন—

১. পুরঃকণ্ঠ্য/তালব্য (Palatal)—ক্' খ্' গ্' ঘ্' ঙ্' (k̂ k̂h, ĝ, ĝh, ṅ̂)

২. পশ্চাৎকণ্ঠ্য কণ্ঠ্য (Velar)—ক্ খ্ গ্ ঘ্ ঙ্ (k, kh, g, gh, n)

৩. কণ্ঠৌষ্ঠ্য/(Labio-velar)—ক্ব্, খব্, গব্, ঘব্ (qw, qwh, gw, gwh)

৪. দন্ত্য / দন্ত্যমূলীয় (Dental / Alveolar)—ত্ থ্ দ্ ধ্ ন্ (t, th, d, dh, n)

৫. ওষ্ঠ্য (Labial)—প্ ফ্ ব্ ভ্ ম্ (p, ph, b, bh, m)

(ঙ) কম্পিত—র্ (r)

(চ) পার্শ্বিক—ল্ (l)

(ছ) উষ্ম—স্ (s)। এতদ্ব্যতীত সর্বপ্রকার কণ্ঠ-জাত ধ্বনি এবং দন্ত্যধ্বনিরও অতিশয় সংকীর্ণ ক্ষেত্রে উষ্মপ্রয়োগ ছিল। x, z, θ, δ ধ্বনিরও ক্বচিৎ ব্যবহার ছিল।

২. **ব্যাকরণগত বৈশিষ্ট্য ঃ**

১. অর্ধব্যঞ্জন ন ও ম্ যে কোন ব্যঞ্জনের সঙ্গে যুক্ত হ'য়ে অনুনাসিক ব্যঞ্জনের কাজ করত।

২. শব্দগঠনের নিমিত্ত একাধিক ব্যঞ্জন একসঙ্গে যুক্ত হ'তো, কিন্তু একাধিক মূল স্বর একসঙ্গে কখনও যুক্ত হ'তো না।

৩. স্বরধ্বনির সানুনাসিকতা ছিল না।

৪. ধাতুমূলের সঙ্গে বিভিন্ন প্রত্যয়-বিভক্তি জুড়ে পদ রচনা করা হ'ত।

৫. উপসর্গ কখনও শব্দের অঙ্গ ছিল না, এর পৃথক্ ব্যবহারও চালু ছিল।

৬. শব্দের অভ্যন্তরে প্রত্যয় (infix) যুক্ত হ'তো না।

৭. বিশেষ্য, ক্রিয়া ও অব্যয় ছিল, বিশেষণ ও সর্বনাম বিশেষ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল ; অব্যয়েরও পরিবর্তন হ'ত।

৮. তিনপ্রকার বচন ছিল, তিনপ্রকার লিঙ্গ ছিল।

৯. ক্রিয়া ও সর্বনামের তিনপ্রকার পুরুষ ছিল।

১০. ক্রিয়ার কাল ছিল ৪ প্রকার।

১১. আত্মনেপদ ও পরস্মৈপদ বর্তমান ছিল।

১২. বিশেষ্যের আটপ্রকার বিভক্তি ছিল।

১৩. সুরের (Pitch accent) প্রয়োগ ছিল এবং ভাষা ছিল সঙ্গীতাত্মক।

আদি আর্যভাষা থেকে পৃথক্ হ'য়ে স্বতন্ত্র ভাষারূপে গড়ে উঠবার পথে প্রত্যেক ভাষাতেই ব্যাকরণগত অনেক পরিবর্তন সাধিত হওয়ায় অধুনা-প্রচলিত ভাষাগুলোতে অনেক বৈচিত্র্য সৃষ্টি হয়েছে।

ইন্দো-য়ুরোপীয় আর্যভাষায় মূলতঃ যে ধ্বনিগুলো বর্তমান ছিল, কালক্রমে তার পরিবর্তন ঘটে। এক এক ভাষায় ধ্বনির এক এক রকম পরিবর্তন সাধিত হয়। এই পরিবর্তন সাধনের ব্যাপারে একটা মূলনীতি লক্ষ্য করা যায় যে, ধ্বনি পরিবর্তন এক-মুখী এবং নিয়মিত। অর্থাৎ কোন এক ভাষায় ধ্বনিতাত্ত্বিক প্রক্রিয়ায় পরিবর্তন শুরু হ'লে তা চলতেই থাকে, তা আর কখনও বিপরীতমুখী হয় না। এবং এক ধ্বনিগুচ্ছে যে পরিবর্তন দেখা দেয়, প্রায় সঙ্গে সঙ্গে অপর সমধ্বনিগুচ্ছেও অনুরূপ পরিবর্তন আরম্ভ হয়ে যায়। অর্থাৎ কোন ভাষায় যদি 'ক' ধ্বনিটি 'গ'-এ পরিবর্তিত হয় তবে 'ত'-ও 'দ'-এ পরিণত হ'বে। অন্যান্য প্রাকৃতিক নিয়মের মতই ধ্বনি পরিবর্তনও কতকগুলো নিয়ম ধরে অগ্রসর হয় বলেই শব্দবিদ্যার এই শাখাটি বিজ্ঞানশাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হ'য়ে থাকে। এই নিয়মের অনুসরণে কখনো ব্যতিক্রম ঘটে না বলেই ভাষার আলোচনায় যেখানে উপাদানের অভাব ঘটে, সেখানে বিজ্ঞানসম্মতভাবেই সেই ফাঁক পূরণ কববার অবকাশ পাওয়া যায়।

ভাষাবিকাশসূত্রে মূল ভাষা থেকে যে সব ধ্বনি যেভাবে পরিবর্তিত হয়েছে, নিম্নে তাদের কতক পরিচয় দেওয়া হ'লো।

১. অতি হ্রস্ব অ (ə) ভাষাবিকাশে বিভিন্ন ভাষায় বিভিন্ন রূপ লাভ করেছে, আদিরূপ কোথাও অক্ষুণ্ণ নেই। কোথাও 'অ'-কার, কোথাও 'ই'-কারে পরিণত হ'য়েছে। যথা—ই-য়ু * Pəter>সং পিতা; লা Pater, গ্রী Patēr, আবেস্তা Pitā।

২. আর্যভাষা বা ইন্দো-ঈরানী ভাষায় 'অ' এবং হ্রস্ব 'এ', 'ও' এই তিনটি 'অ' কারে এবং 'আ', দীর্ঘ 'এ', 'ও' তিনধ্বনি 'আ'কারে পরিণত হয়েছে। ইন্দো-য়ুরোপীয় ভাষার অন্যান্য শাখায় এই স্বরধ্বনিগুলো প্রায় অপরিবর্তিত অবস্থায় বর্তমান রয়ে গেছে। যথা—* মেধু (medhu)>সং মধু, গ্রী মেথু; * দোনোম্ (dōnom)<সং দানম্, লা. দোনুম্; * ভ্রাতের্ (bhrāter),>সং ভ্রাতর্, গ্রী. লা. ফ্রাতের্, ইং ব্রাদার।

৩. হ্রস্ব ও দীর্ঘ ই, উ প্রায় সব শাখাতেই মোটামুটি অক্ষুণ্ণ রয়েছে। যথা, *ইধি>সং ইহি, গ্রী ইথি; * গ্বীবোস>সং জীবস্, লা বীবুস্; * এভূৎ>সং অভূৎ, গ্রী এফু।

৪. দীর্ঘ ঋ, ৯ কোন ভাষায় অক্ষুণ্ণ নেই, এগুলো হ্রস্ব 'আ'কার লাভ করেছে ; আর্যশাখায় '৯'ও 'ঋ'কারে পরিণত হয়েছে। যথা—ম৯গতোস্ (mlgtos)>সং মৃষ্টস্, লা' মুল্ক্তুস্, ইং milk।

৫. দীর্ঘ ও হ্রস্ব অর্ধব্যঞ্জন 'ন্ ম্' কোন শাখাতেই অবশিষ্ট নেই, আর্য ও গ্রীক শাখায় যথাক্রমে 'আ' ও 'অ'-কারে পরিণত হয়েছে। যথা—*দেক্ম্ (dekm)>সং দশ, গ্রী দেক, লা' দেকেম্, তেখুন্, ইং-ten ; *ন্তিস্ (ntis)>সং আতিস্।

৬. অর্ধস্বর 'য়্, ব্' সব শাখাতেই মোটামুটি অক্ষুণ্ণ আছে, গ্রীক ভাষায় 'ব্' সম্পূর্ণভাবে এবং 'য়্' অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিনষ্ট হয়েছে। যথা—*য়ুগোম্ (Yugom)>সং য়ুগম্, গ্রী জুগোন্, লা য়ুগুম্, গ য়ুক, ইং yoke ; * ৱোইকোইস্ (woikois)>সং বেশস্, গ্রী' ওইকোস্, লা' বীকুস্।

৭. পুরঃকণ্ঠ্য স্পৃষ্ট্য ধ্বনিগুলোর ব্যবহারের ওপর নির্ভর ক'রে ইন্দো-য়ুরোপীয় ভাষা পরিবারকে দুটি প্রধান শাখায় বিভক্ত করা হয়। যে সমস্ত ভাষায় এই ধ্বনিগুলো পশ্চাৎকণ্ঠ্য ধ্বনিতে পরিণত হ'য়েছে, সেগুলোকে 'কেন্তুম্' (centum) গুচ্ছ এবং যে সমস্ত ভাষায় 'শ' বা 'স' ধ্বনিতে পরিণত হ'য়েছে, তাদের বলা হয় 'শতম্' বা 'সতম্' (satəm) গুচ্ছ। প্রধানতঃ পশ্চিম য়ুরোপীয় ভাষাগোষ্ঠী—গ্রীক, ইতালীয়, টিউটোনিক, কেল্টিক এবং এশীয় তুখারী ভাষা কেন্তুম্ গোষ্ঠীভুক্ত এবং পূর্ব য়ুরোপীয় ভাষাসমূহ—বাল্তোস্লাব, আল্বানীয় এবং আর্মানীয় ও আর্য শাখা অর্থাৎ ইন্দো-ঈরানী ভাষা সতম্ গোষ্ঠীভুক্ত। যথা—'শত'বাচক ক্ম্তোম্ (kmtom)>লা কেন্তুম্, গ্রী হে-কতোন্, প্রাচীন আইরিশ কেৎ, গথিক হুন্দ্ (ইং-তে hundred), তুখারীয় কন্ধ্ ; সং শতম্, আ সতম্, লিথুআনীয় শিম্তাস্ (szimtas), রুশস্তো, স্লাব সুতো। *গেনোস্ (genos)>সং জনস্, লা গেনুস্, ইং kin ; * এগোম্ eg(h) o(m)>সং অহম্ আ অজম্, গ্রীক এগো, লা এগো, ইং I।

৮. পশ্চাৎকণ্ঠ্য ধ্বনি সব শাখাতেই অক্ষুণ্ণ রয়েছে।

৯. কণ্ঠৌষ্ঠ্য ধ্বনি সাধারণতঃ কয়েকটি কেন্তুম্ গোষ্ঠীর ভাষায় স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেছে, অন্য সমস্ত ভাষায় পশ্চাৎকণ্ঠ্য ধ্বনিগুলোর সঙ্গে মিশে গেছে। যথা—*গ্বোউস্ (gwous)>সং গৌস্, গ্রী' বোউস লা' বোস, ইং cow ; * ঘ্বেরমোস (gwhermos)>সং ঘর্ম, আ' গরম, গ্রীক থের্মোস্, লা' ফোর্মুস, ইং warm।

১০. দন্ত্যবর্ণ সব ভাষাতেই অক্ষুণ্ণ রয়েছে।

১১. ওষ্ঠ্যবর্ণ সব ভাষাতেই অক্ষুণ্ণ রয়েছে।

১২. র্, ল্ সব শাখাতেই বর্তমান ; তবে আর্য শাখায় 'ল'কার অনেক সময় 'র'কারে পরিণত হ'য়েছে। যথা—* লেউক-(Leuq-)>সং রোচস্ ; গ্রীক লেউকোস্, লা' লুক্স্, ইং light।

১৩. উষ্মধ্বনি 'স' প্রায় সব ভাষাতেই আছে। তবে গ্রীক ও ঈরানী ভাষায় স্বর-মধ্যগত 'স' কার 'হ' কারে পরিণত হয়েছে। যথা—* এস্তি (esti)>সং অস্তি, আবে অস্তি, গ্রীক অস্তি, লা' এস্ত, গ ইস্ৎ ইং is ; * সেনোস্ (senos) >সং সনস্, গ্রীক হেনোস্ লা সেনেস্, ইং hen।

(ক) **ধ্বনি-পরিবর্তন সূত্র ঃ**

মূল ভাষা থেকে বিভিন্ন ভাষার বিকাশপথে কোন কোন বিশেষ ক্ষেত্রে কোন কোন বিশেষ ধ্বনির একটা বিশেষ পরিবর্তন ঘটেছে। এ বিষয়ে আলোচনা করে ভাষাবিজ্ঞানিগণ কয়েকটি ধ্বনি. পরিবর্তন. সূত্র আবিষ্কার করেছেন। বলা বাহুল্য, প্রত্যেকটি সূত্র কোন বিশেষ সময়ে বিশেষ ধ্বনির ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, প্রাকৃতিক নিয়মের মতো এদের কোন সার্বভৌমত্ব বা সার্বজনীনত্ব নেই।

১. **কোলিৎসের সূত্র** (Collitz's Law)—ভারতীয় আর্যভাষার (সংস্কৃতের) মূলধ্বনিগুলির উদ্ভব রহস্য ব্যাখ্যাত হয়েছে কোলিৎসের ধ্বনি সূত্রের সাহায্যে। আদি আর্য ভাষার কোন পশ্চাৎকণ্ঠ্য বা কণ্ঠৌষ্ঠ্য ধ্বনির অব্যবহিত পরেই যদি কোন তালব্য স্বরধ্বনি (ই, ঈ, এ) বর্তমান থাকে, তবে পূর্বোক্ত কণ্ঠ্য ধ্বনি আর্য অর্থাৎ ইন্দো-ঈরানী ভাষায় তালব্য স্পৃষ্ট ধ্বনিতে (নবসৃষ্ট 'চ'- বর্গে) পরিণত হয়। এই ধ্বনিপরিবর্তনসূত্রটিকে 'কোলিৎসের সূত্র' বলা হয়। * ক্বে (que)>সং চ, আ' চ, কিন্তু গ্রী' তে, লা' ক্বে ; * গ্বীৱোস (gwiwos)>সং জীবস্, প্রাচীন পারসিক জীব, কিন্তু গ্রী বিওস্, লা. বীবুস্। অর্থাৎ '*q/q^w, g/g^w, g^h/g^{w}h'—এই কণ্ঠ্য তথা পশ্চাৎকণ্ঠ্য ও কণ্ঠৌষ্ঠ্য ধ্বনিগুলির পর যদি তালব্য স্বরধ্বনি 'i, e, y' থাকে তবে পূর্বোক্ত কণ্ঠ-জাত ব্যঞ্জনধ্বনিগুলি যথাক্রমে সংস্কৃতে c (চ), j (জ) ও h (হ) ধ্বনিতে পরিণত হয়, অপর স্বরধ্বনির ক্ষেত্রে তা হয় না। পরিবর্তিত রূপের দৃষ্টান্ত পূর্বে দেওয়া হয়েছে। যেখানে পরিবর্তন হয় না, তার দৃষ্টান্ত ঃ—*qwos (ক্বোস্) >সং কঃ., * gw̄ous (গ্বোউস্) >সং গৌস্, ইং—cow, * gwhormos (ঘোর্মোস)> সং ঘর্মঃ।

২. **গ্রিমের সূত্র** (Grimm's Law)—আদি আর্যভাষা থেকে জার্মানিক ভাষায় রূপান্তরের ক্ষেত্রেই শুধু সূত্রটি প্রযোজ্য হয়ে থাকে। মূল ভাষার বর্গস্থ চতুর্থ বর্ণ জার্মান ভাষায় তৃতীয় বর্ণে, তৃতীয় বর্ণ প্রথম বর্ণে এবং প্রথম বর্ণ দ্বিতীয় বর্ণে রূপান্তরিত হয়। রাস্ক (R. Rask) সূত্রটির প্রথম উদ্ভাবক হলেও গ্রিমই

এটাকে একটা সুবিন্যস্ত রূপদান করেন বলে এটাকে 'গ্রিমের সূত্র' বলা হয়। সূত্রটি এরূপ ঃ

চতুর্থ বর্ণ —→তৃতীয় বর্ণ (ঘ>গ)
তৃতীয়বর্ণ—→প্রথম বর্ণ (গ>ক)
প্রথম বর্ণ—দ্বিতীয় বর্ণ (ক>খ)

দ্বিতীয় বর্ণটি আর পুরোপুরি স্পৃষ্ট থাকতো না, উষ্ম উচ্চারিত হ'ত, সম্ভবতঃ তৃতীয় বর্ণের ক্ষেত্রেও তাই ঘটত। যথা ঃ * bhers>গ' baira, ইং bear ভ>র ; * dekm>গ. তেখুন, ইং Ten (দ>ত); * Pəter>ইং father (প>ফ); * genos (গেনোস) > সং জনঃ (সংস্কৃতে পরিবর্তন হয়নি, তৃতীয় বর্ণই রয়েছে); কিন্তু জার্মানিক ভাষা ইং-kin ; (গ>ক) * ghanso (ঘন্‌সো) >সং হংসঃ (এখানেও সংস্কৃতে ভিন্নজাতীয় পরিবর্তন) কিন্তু ইং—goose (খ>গ)।

৩. **বেরনের সূত্র** (Verner's Law)—গ্রিমের সূত্রের প্রয়োগের পরও কিছু কিছু ধ্বনি পরিবর্তন অব্যাখ্যাত রয়ে গেল। যেমন * Pəter>ইং father (এখানে p>f হ'লেও t কিন্তু θ হলো না, 'n' হ'লো)। এরকম p>b এবং k>ক্ব-ও পাওয়া যায়। কার্ল বেরনের ধ্বনি পরিবর্তনের ক্ষেত্রে প্রস্বরের (accent) ভূমিকা-বিষয়ে অবহিত হয়ে নিম্নোক্ত সূত্র উদ্ভাবন ক'রে এই সমস্ত সমস্যা সমাধান করলেন। সূত্রটি এই ঃ আদি আর্যভাষায় শব্দটি যদি একাধিক অক্ষরময় হয় এবং ব্যঞ্জনধ্বনির অব্যবহিত পূর্ববর্তী অক্ষরে যদি প্রস্বর (accent) না থাকে, তবে জার্মানিক শাখায় বর্গের প্রথম ধ্বনিটি তৃতীয় ধ্বনিতে এবং 'স' (s) অক্ষর 'জ়' (z) অক্ষরে রূপান্তরিত হয়। গ্রিমের সূত্রানুযায়ী বর্গের প্রথম ধ্বনি অর্থাৎ অঘোষ অল্পপ্রাণ, দ্বিতীয় উষ্মধ্বনি অর্থাৎ সোষ্ম অঘোষ মহাপ্রাণ ধ্বনিতে পরিণত হবার কথা ছিল, কিন্তু বেরনের প্রস্বরের তত্ত্বটি আবিষ্কার ক'রে ব্যতিক্রমের ব্যাখ্যা দিলেন। যথা—* কৃম্‌তোম্‌ (k̂mto'm)>গ খুন্দ্‌ ; * কস (kasa')>* haza>ইং hare, কিন্তু সং শশ।

লক্ষণীয়, শব্দের আদিস্থিত দ্বিতীয় বর্ণ কিন্তু সোষ্ম দ্বিতীয় বর্ণে পরিণত হয়। * Pettu>গ faihu, কিন্তু সং পশু। বেরনের সূত্র থেকেই 'রকারীভবনে'র (Rhotacism) নিয়মটিও পাওয়া গেল—'স' (s) প্রথমে 'জ়' (z)-এ পরিবর্তিত হয় এবং পরে 'র' (r) হয়। সং স্নুষা (Snuṣā) গ্রীক nuos (*<snuseos) প্রাচীন জা snura ; * Ausosa>*Auzoza>ইং Aurora, কিন্তু সং উষা (uṣas)।

৪. **গ্র্যাসম্যানের সূত্র** (Grassman's Law)—পূর্বোক্ত সূত্রগুলি সাধারণতঃ মেনে নেওয়া গেলেও এর সাহায্যে সব পরিবর্তন ব্যাখ্যা করা যেতো না, বেশ কিছু

ব্যতিক্রম থেকে গিয়েছিল। পরবর্তীকালে গ্রাসম্যানের নতুন সূত্র আবিষ্কারের ফলে পূর্বোক্ত ব্যতিক্রমগুলোও ব্যাখ্যা করা সম্ভবপর হ'ল। গ্র্যাসম্যানের সূত্রটি এই : আদি আর্য ভাষায় যদি দুটো মহাপ্রাণ ধ্বনি পাশাপাশি অবস্থান করে, তবে প্রথমটি গ্রীক ও আর্য অর্থাৎ ইন্দো-ঈরানী ভাষায় অল্পপ্রাণ-ধ্বনিতে পরিণত হয়। যথা—সং বভূব (<* ভভূব)-; গ্রীক শেফুক (<* কেফুক)—একই ঘোষ মহাপ্রাণ বর্ণের পরিণতি; * ভেন্ধ্ (bhendh) >সং বন্ধ, গ্রী পেন্থ্, কিন্তু ইং bind।

[চার] ইন্দো-য়ুরোপীয় ভাষার বর্গীকরণ :
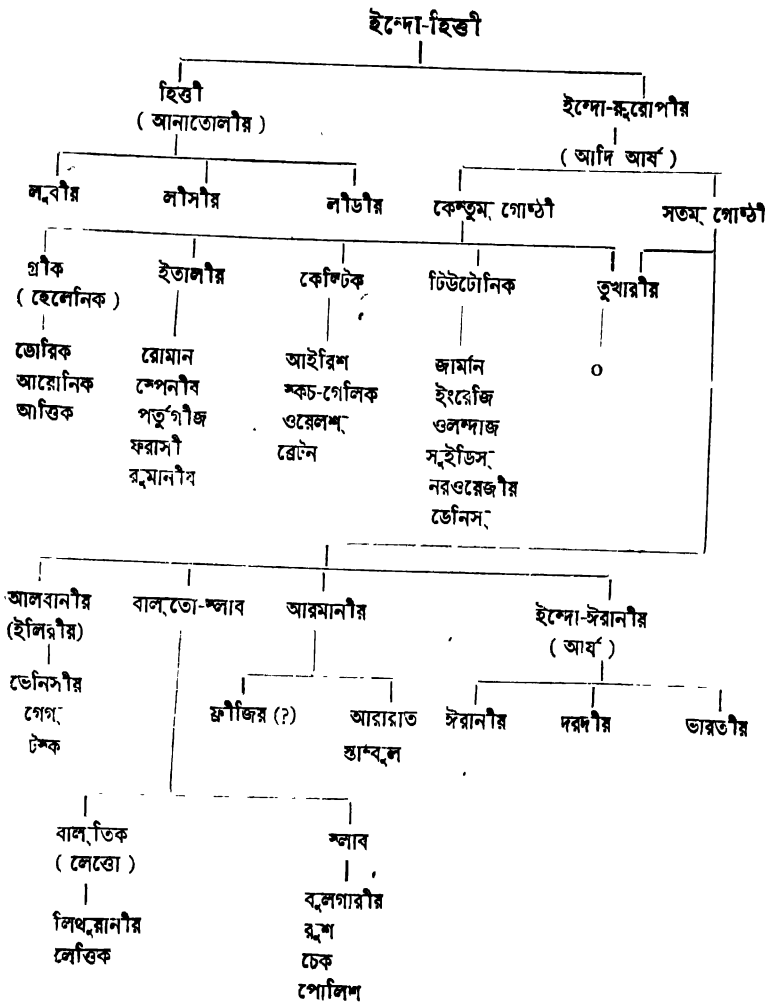
(ক) হিত্তী ভাষা (Hittite)

ইন্দো-য়ুরোপীয় ভাষাপরিবারের বর্গীকরণ করতে গিয়ে প্রথমেই একটি সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। বর্তমান শতকের গোড়ার দিকে বোগাজকোয় (Bogaz Koy) নামক একটি তুর্কী গ্রামে প্রাচীন হিত্তী সাম্রাজ্যের (Hittite Empire) ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয় এবং হিত্তী ভাষার প্রচুর নিদর্শন পাওয়া যায়। সমস্যা এই হিত্তী ভাষাকে নিয়ে।

হিত্তী-সাম্রাজ্যের যে ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে তার জীবৎকাল আনুঃ খ্রীঃ পূঃ ১৭০০ থেকে খ্রীঃ পূঃ ১২০০ অব্দ। প্রধানতঃ বাণমুখ লিপিতে লিখিত যে সকল নিদর্শন পাওয়া গেছে, তাদের পাঠোদ্ধার এবং অর্থগ্রহণ করা গেছে। এই ভাষার নামকরণ করা হ'য়েছে 'হিত্তী' বা 'হিট্টাইট' (Hittite)। অনেকে এই নামকরণকে অসমীচীন মনে করে একে 'আনাতোলীয়' (Anatolian) নামে অভিহিত করেন। বাণমুখ লিপিতে লিখিত হিত্তী ভাষার সঙ্গে লুবিয়ান (Luwian) এবং প্যালীয় (Palaic) ভাষায় চিত্রলিপিতে লিখিত কিছু নিদর্শনও পাওয়া গেছে। এ দুটি ভাষা হিত্তী ভাষার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। লিসীয় (Lician) এবং লিডীয়ান নামক স্বল্পপরিচিত ভাষা দুটিও আনাতোলীয় ভাষা পরিবারের অংশ।

ভাষাবিজ্ঞানীরা হিত্তী ভাষাকে ইন্দো-য়ুরোপীয় ভাষা-পরিবারের সঙ্গে সম্পর্কযুক্তই মনে করেন। একদল মনে করেন যে, যেহেতু ইন্দো-য়ুরোপীয় ভাষার সঙ্গে এই ভাষার যথেষ্ট মিল আছে অতএব হিত্তী ভাষা ই-য়ু ভাষারই একটি শাখা এবং কণ্ঠৌষ্ঠ্যধ্বনিগুলো কণ্ঠ্যধ্বনিরূপেই বর্তমান থাকায় এটি কেন্তুম্ গোষ্ঠীভুক্ত। আর একদল মনে করেন যে, নানাদিক্ থেকেই মূল ভাষার সঙ্গে এর বিস্তর পার্থক্য থাকায় অনুমিত হয় যে, এই হিত্তী ভাষা মূলভাষার কোন শাখা নয়, সমগোত্রীয় এবং ভগিনীস্থানীয়া। তাঁদের মতে ভাষার বর্গীকরণ নিম্নোক্ত প্রকারে হওয়া সঙ্গত।
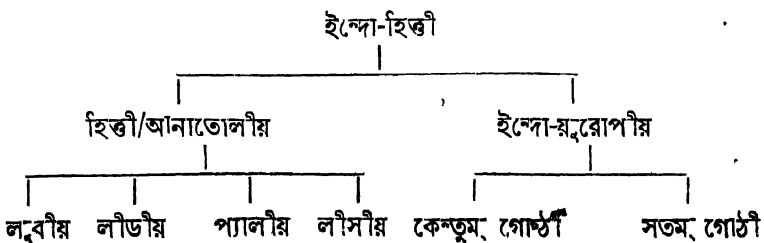
হিত্তী ভাষায় দ্বিবিধ কণ্ঠনালীয় (laryngeal) ধ্বনি বর্তমান ছিল। বর্গের দ্বিতীয় ও চতুর্থ বর্ণ অর্থাৎ মহাপ্রাণ ধ্বনি হিত্তী ভাষায় অনুপস্থিত ছিল। স্বরধ্বনিতে a, e, i, u থাকলেও o ছিল না। গ্রীক এবং ইন্দো-ঈরানী ভাষা অপেক্ষা হিত্তীভাষার ব্যাকরণ ছিল সহজতর। বিশেষ্য, বিশেষণ এবং সর্বনাম পদের দু'টি লিঙ্গ ছিল, ই-য়ু ভাষার স্ত্রীলিঙ্গ হিত্তী ভাষায় না থাকাটা বিস্ময়কর। হিত্তী-ভাষায় ৬টি কারক ছিল, অধিকরণ ছিল না। সর্বনামের দিক্ থেকে লাতিন ভাষার সঙ্গেই এর সাদৃশ্য সর্বাধিক। ক্রিয়ারূপে এর অনেক সংক্ষিপ্ততা লক্ষ্য করা যায়। কাল দু'টি, ভাবও দু'টি। হিত্তী লিপিতে 'ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ, নাসত্য' প্রকৃতি বৈদিক দেবতাদের নাম পাওয়া গেছে।

হিত্তীভাষার সঙ্গে ইন্দো-য়ুরোপীয় ভাষার সম্পর্ক যতই ঘনিষ্ঠ হোক না কেন, এই ভাষার ওপর যে সুমেরীয় ও আক্কাদীয় ভাষার বিস্তৃত প্রভাব পড়েছিল, এ বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।

(খ) কেন্তুম্ ও সতম্ ভাষাগোষ্ঠী

আদি আর্যভাষা-ভাষী জনগোষ্ঠী ছিল যাযাবর; প্রধানতঃ খাদ্য ও শিকারের সন্ধানে তারা মূল বাসভূমি থেকে ক্রমশঃ দূরতর স্থানে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। এইভাবে দীর্ঘদিন অতিক্রান্ত হ'লে পর দেশ-কালোচিতভাবে তাদের ব্যবহৃত ভাষা নানাবিধ রূপান্তর লাভ করে। এই রূপান্তরিত ভাষাসমূহের অধ্যয়ন ও বিশ্লেষণের ফলে দেখা যায়, মূল ভাষাটি প্রধান দু'টি ভাষাগোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়েছে। একালের ভাষাবিজ্ঞানীরা উক্ত দু'টি ভাষাগোষ্ঠীকে যথাক্রমে 'কেন্তুম্' (Centum) এবং 'সতম্' (Satəm) ভাষাগোষ্ঠীরূপে অভিহিত ক'রে থাকেন। 'শত' বাচক শব্দটি ইন্দো-য়ুরোপীয় ভাষায় কম্‌তোম্ (k̂mtom) রূপে প্রচলিত ছিল বলে পণ্ডিতগণ অনুমান করেন। শব্দটির আদি ব্যঞ্জন 'ক্' (k̂) ধ্বনিটির উচ্চারণ কোন কোন অঞ্চলে ছিল অবিকৃত এবং কোথাও কোথাও 'স' (s) ধ্বনিতে রূপান্তরিত হয়েছিল। ফলে 'k̂mtom' শব্দটি এক অঞ্চলে 'Centum' (কেন্তুম্—লাতিন ভাষায় 'C'-এর উচ্চারণ ছিল 'ক') রূপে এবং অন্যত্র 'Satəm'-রূপে উচ্চারিত হ'তো। এই উচ্চারণ-বৈষম্যের উপর ভিত্তি করেই ই-য়ু ভাষার 'কেন্তুম' ও 'সতম্' দুটি আদি বিভাজন কল্পনা করা হয়।

মূল শব্দটি সং S'atam (শতম্), আবেস্তায় 'সতম্' (Satəm) লিথু szimtas, প্রাচীন চার্চ স্লাভ suto, রুশ sto, লাতিন Centum (কেন্তুম্), গ্রীক

he-katon, প্রা' আই' cet (কেৎ) জার্মান hund (+ red=ইং hundred), এবং তুখারীয় বা তুষার kandh/ka'nt প্রভৃতি। এই নিদর্শনগুলিতে দেখা যাচ্ছে, ইন্দো-য়ুরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর বিভিন্ন ভাষায় kmtom শব্দের আদি ব্যঞ্জন কোথাও 'k' (ক) এবং কোথাও 'শ' বা 'স'-ধ্বনি-রূপে বর্তমান।

প্রাগুক্ত দৃষ্টান্তগুলি বিশ্লেষণে দেখা যায়, একমাত্র 'তুখারীয়' ভাষা-ব্যতীত অপর সব 'কেন্তুম্' গোষ্ঠীর ভাষাই পশ্চিম য়ুরোপ অঞ্চলে সীমাবদ্ধ, পক্ষান্তরে 'সতম্'/'শতম্' গোষ্ঠীর সব ক'টি ভাষাই পূর্বয়ুরোপ ও এশিয়া অঞ্চলে ছড়িয়ে আছে। তুখারীয় ভাষার নিদর্শন পাওয়া গেছে এশিয়া মাইনরে।

'কেন্তুম্' ভাষাগোষ্ঠী প্রধান পাঁচটি ভাষাগুচ্ছে বিভক্ত: (১) গ্রীক (Greek) বা হেলেনিক (Hellenic), (২) লাতিন (Latin) বা ইতালীয় (Italian)—ফরাসী, স্পেনীয়, পর্তুগীজ-আদি ভাষা এই গুচ্ছের অন্তর্ভুক্ত, (৩) কেলটিক (Celtic), (৪) টিউটোনিক (Teutonic) বা জার্মানিক (Germanic)—ইংরেজি, দিনেমার, ওলন্দাজ-আদি এই গুচ্ছভুক্ত এবং (৫) তুষার/তোখারীয় (Tokharian)।

'সতম্'/'শতম' ভাষাগোষ্ঠীও ৪টি প্রধান ভাষাগুচ্ছে বিভক্ত হয়েছে। (১) আলবানীয় (Albanian) বা ইলিরীয় (Illyrian), (২) আর্মানীয় (Armenian), (৩) বাল্‌তো-শ্লাব (Balto-slav) বা লেত্তোস্লাব (Letto-slav), এর দুটি প্রধান গুচ্ছ—বাল্টিক বা লেটিস্‌গুচ্ছে লিথুআনীয় বিশেষ উল্লেখযোগ্য এবং দ্বিতীয় স্লাব গুচ্ছে রুশ, পোলিশ. চেক্ প্রভৃতি (৪) ইন্দো-ঈরানী (Indo-Iranian) বা আর্য (Aryan)—এই গুচ্ছে ভারতীয় আর্য, ঈরানী ও দরদী ভাষা রয়েছে।

১. **গ্রীক (Greek) বা হেল্লেনিক (Hellenic)**: ভাষাব্যবহারকারীর সংখ্যা খুব বেশি না হলেও গুরুত্বের দিক্ থেকে গ্রীক ভাষা কেন্তুম্ গোষ্ঠীর ভাষাগুলোর মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য। খ্রীঃ পূঃ দ্বাদশ শতাব্দীতে গ্রীস দেশে ডোরিক অনুপ্রবেশ ঘটে এবং সমকালে অনুষ্ঠিত ট্রয় যুদ্ধের উপর ভিত্তি ক'রে হোমার-কর্তৃক রচিত ইলিয়াড্ মহাকাব্যে আমরা খ্রীঃ পূঃ সপ্তম শতাব্দীর গ্রীক ভাষার নিদর্শন পাচ্ছি। ক্রীট দ্বীপে প্রাপ্ত কিছু প্রাচীন লিপির পাঠোদ্ধারের ফলে জানা গেছে, অন্ততঃ খ্রীষ্টপূর্ব ১৪৫০ থেকে খ্রীষ্টপূর্ব ১২০০ অব্দের মধ্যে এই লিপি প্রস্তুত হ'য়েছিল। তাহলে এর ভাষা বৈদিক ভাষারও পূর্ববর্তী এবং একেই বলা চলে ইন্দো-য়ুরোপীয় ভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন।

গ্রীক ভাষার প্রধান শাখা দু'টি—পশ্চিম গ্রীক ও পূর্ব গ্রীক। পশ্চিম গ্রীকের একটি প্রধান ভাষা ডোরিক (Doric)। পূর্ব গ্রীকের তিনটি শাখা—আত্তিক

আইয়োনীয় (Attic-Ionic), এওলিও (Aeolio) ও আর্কাদো-সাইপ্রীয় (Arcado-Cyprian)। ঐতিহাসিক দিক্ থেকে আত্তিক গ্রীক এবং তজ্জাত উপভাষা 'কোইনে'-ই (Koine) সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য। বর্তমান কালে গ্রীস দেশে প্রচলিত ভাষা-উপভাষা প্রধানতঃ এই ভাষারই বিবর্তিত রূপ।

গ্রীক ভাষার অতিশয় প্রাচীন রূপের নিদর্শন পাওয়াতে সংস্কৃত ভাষার সঙ্গে তার অনেক সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়। উভয় ভাষাই মূলতঃ সঙ্গীতাত্মক এবং স্বরপ্রধান ছিল, কালক্রমে প্রস্বর প্রাধান্য লাভ করে। উভয় ভাষাতেই শব্দের বহুরূপতা ছিল; সংস্কৃতে বিশেষ্য ও সর্বনামের বৈচিত্র্য বেশি, গ্রীক ভাষায় ক্রিয়া ও অব্যয়ের বৈচিত্র্য বেশি। উভয় ভাষাতেই দ্বিবচন ছিল। সংস্কৃতে ব্যঞ্জনের প্রাধান্য ও গ্রীকে স্বরের প্রাধান্য। এই ভাষায় ব্যঞ্জন পরিবর্তিত হলেও প্রাচীন স্বর সুরক্ষিত ছিল।

২। **ইতালীয়** (Italic) **বা লাতিন** (Latin)—ইতালীর লাতিউম্ (Latium) প্রদেশের ভাষা লাতিন এক সময় প্রাধান্য লাভ ক'রে রোমের ভাষায় পরিণত হয়। এই ভাষার প্রধান শাখা দুটো—ওস্কান-উম্ব্রীয় (Oscan-Umbrian) ও লাতিন-ফালিস্কান (Latin-Faliscan)। পূর্বোক্ত শাখার ভাষাগত নিদর্শন পাওয়া যাচ্ছে খ্রীষ্টপূর্ব শতাব্দীতেই। পরবর্তী শাখার সঙ্গে শব্দ সম্ভারের বিরাট পার্থক্যের জন্যে এদের দুটি শাখাতে বিভক্ত করা হ'য়েছে। ওস্কান ভাষা প্রাচীন ধ্বনি বজায় রাখার ব্যাপারে অতিশয় রক্ষণশীল। ফালিস্কান ভাষার সামান্যই নিদর্শন পাওয়া যায়।

লাতিন ভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন খ্রীঃ পূঃ ষষ্ঠ শতকের। সমগ্র পশ্চিম য়ুরোপব্যাপী রোমক সাম্রাজ্য বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে লাতিন ভাষাও বিস্তৃতিলাভ করতে থাকে। এই কথ্য লাতিন ভাষা থেকেই পশ্চিম য়ুরোপীয় রোমান্স (Romance) ভাষাগুলোর উদ্ভব ঘটেছে। দশম শতাব্দীতে ইতালীয় (Italian), একাদশ শতাব্দীতে প্রভেন্শাল (Provencal), নবম শতাব্দীতে ফরাসী (French), দ্বাদশ শতাব্দীতে স্পেনীয় (Spanish), পর্তুগীজ (Portuguese) ও কাতালান (Catalan) এবং ষোড়শ শতাব্দীতে রুমানীয় (Rumanian) ভাষার প্রমাণ পাওয়া যায়। এগুলো ছাড়া কয়েকটি গৌণ ভাষারও ব্যবহার বর্তমান। এদের মধ্যে আছে—সার্দিনীয় (Sardinian), রেতোরোমান্স্ (Raeto-Romance) বা লাডিন (Ladin) এবং ডালমেসীয় (Dalmatian)।

সাহিত্যিক লাতিন (Classical Latin) ধর্মীয় ভাষারূপে এখনও সমগ্র য়ুরোপে অধীত ও অধ্যাপিত হ'য়ে থাকে। অতি প্রাচীনকাল থেকেই এ ভাষায় অনেক সাহিত্য রচিত হয়ে আসছে। খ্রীষ্টান রোমান ক্যাথলিক সম্প্রদায় এখনও নিয়মিতভাবে এ ভাষার চর্চা ক'রে থাকেন।

ইতালীয় ভাষার দু'শাখার দুটি বৈশিষ্ট্য প্রধানঃ ওস্কান-উম্ব্রীয় শাখাটি 'প'-প্রধান এবং লাতিন শাখাটি 'ক'-প্রধান। মূল ভাষার 'প' বর্গ ওস্কান শাখায় রক্ষিত হলেও লাতিন শাখায় 'ক' বর্গে রূপান্তরিত হয়েছে। যথা—* Penque > ওস্কান Pumperius, লা quinque।

৩. **কেল্টিক** (Celtic)—কেল্‌টিক ভাষার সঙ্গে ইতালীয় ভাষার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক এবং সাদৃশ্য বিদ্যমান থাকায় অনেকেই দু'টিকে মিলিয়ে ইতালো-কেল্টিক (Italo-Celtic) বর্গভুক্ত ক'রে থাকেন। ইতালীয় ভাষার মতো কেল্টিক ভাষারও একটি শাখায় 'ক' প্রাধান্য, অপরটিতে 'প'-প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। 'ক'-প্রধানের নাম 'গয়ডেলিক' (Goidelic) এবং 'প'-প্রধানের নাম 'ব্রিটনিক' (Brythonic)। ব্রিটনিক ভাষার একটা অতি প্রাচীন অথচ অধুনালুপ্ত শাখা ছিল 'গলীয়' (Gaulish)। রোমান্ আক্রমণের পূর্ব পর্যন্ত ইংল্যাণ্ডে ওয়েল্‌শ্ (Welsh), করনিশ (Cornish) ও ব্রেটন (Breton) শাখাত্রয় প্রচলিত ছিল। বর্তমানে শুধু ওয়েলশ ভাষাই সীমাবদ্ধভাবে বর্তমান আছে। ব্রিটানীতে (Brittany) ব্রেটন ভাষা কোনপ্রকারে বেঁচে আছে। গয়ডেলিক শাখার ম্যান্‌ক্স্ (Manx) বহু পূর্বেই লুপ্ত, শুধু আইরিশ (Irish) এখনও বর্তমান। আইরিশেরই স্কটল্যাণ্ডে প্রচলিত রূপকে বলা হয় স্কটস্‌গ্যালিক (Scots-Gaelic)।

এক সময় মধ্যয়ুরোপ, উত্তর ইতালী, ফ্রান্স (তৎকালে 'গল' নামে পরিচিত), স্পেন, এশিয়া মাইনর এবং গ্রেট ব্রিটেনে বিস্তৃত কেল্টিক ভাষা অপর ভাষাগোষ্ঠীর চাপে পশ্চাদপসরণ করতে করতে বর্তমানে শুধু আয়ারল্যাণ্ডেই আইরিশ ভাষারূপে কোনক্রমে টিঁকে আছে। খ্রীঃ পূঃ শতাব্দীতে কেল্টিক ভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন পাওয়া যায়।

৪. **টিউ'টনিক** (Teutonic) **বা জার্মানিক** (Germanic)—সমগ্র ইন্দো-য়ুরোপীয় ভাষা পরিবারের এই শাখাটিই সম্ভবতঃ সর্বাধিক বিস্তৃতি এবং গুরুত্ব লাভ করেছে। প্রাগৈতিহাসিক কালেই বোধ হয় এই শাখায় ধ্বনিপরিবর্তন শুরু হ'য়েছিল, যে কারণে এর সঙ্গে ইং-য়ু গোষ্ঠীর অপর শাখাগুলোর কিছু মৌলিক পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। জার্মানিক শাখার প্রাচীনতম নিদর্শন পাওয়া যায় চতুর্থ শতাব্দীতে সম্ভবতঃ

ও ডেনমার্কে রুনী (Runic) লিপিতে লিখিত কিছু অনুশাসনে। মূলতঃ ভাষাগুচ্ছ সংশ্লেষাত্মক ছিল, ক্রমপরিবর্তনে বিশ্লেষাত্মক রূপে পরিণত হয়েছে। চতুর্থ শতাব্দীতে জার্মানিক ভাষার এক অতি প্রাচীন শাখা 'গথিক' (Gothic) ভাষায় লিখিত উলফিলার (Wulfila) অনূদিত বাইবেল ভাষাতাত্ত্বিক আলোচনায় অতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। গথিক ভাষা বর্তমানে লুপ্ত।

জার্মানিক ভাষার তিনটি প্রধান শাখা : পশ্চিম জার্মানিক এবং পূর্ব ও উত্তর জার্মানিক। মৌলিক লক্ষণের দিক্ থেকে পূর্ব ও উত্তর জার্মানিককে একই বর্গের অন্তর্ভুক্ত করা হয় ; এর মূল লক্ষণ—'ww' ও 'jj' যথাক্রমে 'ggw' এবং 'ddj' বা 'ggj'-তে রূপান্তরিত হয়। পক্ষান্তরে পশ্চিম জার্মানিক ভাষায় মূল ধ্বনিগুলো অক্ষুণ্ণ থাকে। পূর্বশাখার একটি ভাষা অধুনালুপ্ত 'গথিক'। উত্তর শাখার দুটি ভাগ—পূর্বী নর্স (Norse) এবং পশ্চিমী নর্স। ডেনিস্ (Danish) ও সুইডিস্ (Swedish) পূর্বী নর্স এবং নরওয়েজীয় (Norwegian) ও আইসল্যান্ডীয় (Icelandish) পশ্চিমী নর্সের অন্তর্ভুক্ত। আইসল্যান্ডীয় ভাষায় রচিত এড্ডা (Edda) নামক গ্রন্থে প্রাচীন জার্মানীর অনেক কাহিনী বিবৃত হয়েছে। পশ্চিম জার্মানিক ভাষা প্রধান ৫টি বর্গে বিভক্ত—উচ্চ জার্মান (High German), নিম্ন জার্মান (Low German), ফ্রাঙ্ক (Franconian), ফ্রীজীয় (Frisian) ও ইংরেজি (English)।

উচ্চ জার্মান থেকে আলেমান্নিক (Alemannic) ও ব্যাভেরীয় (Bavarian) ভাষার সৃষ্টি। এই শাখা থেকে আধুনিক জার্মান ভাষার সৃষ্টি। য়িড্ডিশ (Yiddish/Jewish) ভাষাও এই শাখা থেকে উদ্ভূত। ফ্রাঙ্ক ভাষা থেকে সৃষ্টি হয়েছে ওলন্দাজ (Dutch) এবং তার উপভাষা ফ্লেমিশ (Flemish)। নিম্ন জার্মানের আধুনিক রূপ প্রচলিত আছে ; এর একটি শাখা প্রাচীন স্যাক্সন ভাষা (Old Saxon)। ফ্রীজীয় ভাষা কথ্যভাষারূপে স্বল্পসংখ্যক লোকের মধ্যেই প্রচলিত।

ইংরেজি ভাষার প্রাচীনতম উল্লেখ পাওয়া যায় সপ্তম শতকে। নবম শতকের সাহিত্য পশ্চিমী স্যাক্সন ভাষায় রচিত। প্রাচীন ইংরেজি 'অ্যাংলো স্যাক্সন' (Anglo-Saxon) নামে এককালে অভিহিত হ'ত। মধ্যযুগের ইংরেজি চারটি আঞ্চলিক ভাষায় বিভক্ত। লন্ডনের উপভাষা মার্জিত হয়ে সাহিত্যিক ইংরেজিতে পরিণতি লাভ করেছে। মাতৃভাষা এবং দ্বিতীয় ভাষারূপে ইংরেজিই এখন পৃথিবীতে সর্বাধিক প্রচলিত ভাষা—বস্তুতঃ এই ভাষাটি এখন বিশ্বভাষার মর্যাদা লাভ করেছে।

দ্রঃ—জার্মানিক ভাষার কিছু ধ্বনিপরিবর্তনের ইতিহাসের জন্য আলোচ্য অধ্যায়ের 'ধ্বনিপরিবর্তন সূত্র' দ্রষ্টব্য।

৫. **তুষার বা তোখারীয় (Tokharian)**—বর্তমান শতাব্দীর গোড়ার দিকে কিছু পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতের প্রচেষ্টায় চীনা তুর্কীস্থানের তুরফান প্রদেশে ব্রাহ্মী ও খরোষ্ঠী লিপিতে লিখিত বৌদ্ধধর্মসম্বন্ধীয় কিছু প্রাচীন গ্রন্থ ও পত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। ভাষাতাত্ত্বিক পণ্ডিতগণ গ্রন্থের ভাষাকে ইন্দো-য়ুরোপীয় ভাষার শাখা বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। মহাভারতে এবং গ্রীক পুরাণে প্রাপ্ত প্রাচীন 'তুষার' বা 'তোখরাই' জাতির নাম-অনুযায়ী এই ভাষার 'তুষার' বা 'তোখরীয়' নামকরণ করা হয়। অনেকে মনে করেন, নামটি ভ্রমাত্মক, কারণ এখানে দু'প্রকার ভাষার সন্ধান পাওয়া গেছে। তাদের একটিকে বলা হয়েছে 'অগ্নীয়' (Agnian) বা তোখারীয় 'ক', অপরটি 'কুচীয়' (Kuchean) বা তোখারীয় 'খ'। এই ভাষার বিশেষ লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য যে, এতে পুরঃকণ্ঠ্যধ্বনি পূর্বাঞ্চলের ভাষাগুলোর মত 'শ/স'-এ পরিণত না হয়ে পশ্চাৎ-কণ্ঠ্য ধ্বনিতে পরিণত হ'য়েছে, ফলতঃ একে 'কেন্তুম্' বর্গভুক্ত করা হয়েছে। এ ভাষায় স্বরের জটিলতা কম, সংস্কৃতের মত সন্ধির ব্যবহারও বর্তমান। এতে আট প্রকার বিভক্তি আছে।

খ্রী. ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শতকের মধ্যে তোখারীয় গ্রন্থগুলো রচিত হয়েছিল। যারা ঐ ভাষা ব্যবহার করত তাদের সম্বন্ধে কিছুই জানবার উপায় নেই, কারণ সম্ভবতঃ খ্রীঃ দশম শতকের দিকেই এই ভাষার ব্যবহার লোপ পায়।

কেউ কেউ মনে করেন, হিত্তী ভাষা তোখারীয় ভাষা একই সঙ্গে মূলভাষা থেকে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে বেরিয়ে আসে, এই কারণে তাঁরা এ দুটিকে একশ্রেণীভুক্ত করতে চান।

(আ) সতম্ ভাষাগোষ্ঠী—এই গোষ্ঠীর ভাষাগুলোর প্রধান বৈশিষ্ট্য-সম্বন্ধে বলা যায় যে মূল ভাষার পুরঃকণ্ঠ্য ধ্বনিগুলো এই গুচ্ছে 'শ' বা 'স' ধ্বনিতে পরিণত হয়েছে, এবং এই ভাষাগুলো প্রধানতঃ পূর্বাঞ্চলে প্রচলিত।

১. **আলবানীয়** (Albanian) **বা ইলিরীয়** (Illyrian)—একদা বহুবিস্তৃত ইলিরীয় ভাষার একটি শাখাই একাল পর্যন্ত টি'কে আছে, তার নাম 'আলবানীয়'। আলবানীয় ভাষার খুব প্রাচীন কোন নিদর্শন পাওয়া না যাওয়াতে ভাষাটি সম্বন্ধে বিশেষ অধ্যয়ন সম্ভবপর হয়নি। চতুর্দশ শতাব্দীতে এর সামান্য নিদর্শন এবং সপ্তদশ শতক থেকেই যথার্থ নিদর্শন পাওয়া যাচ্ছে। এই ভাষার ওপর বিভিন্ন স্লাব, গ্রীক, তুর্কী-আদি ভাষার প্রভাব পড়ায় ভাষাটি অতিশয় বিকৃতি লাভ করেছে। একসময় আলবানীয় ভাষাকে পৃথক্ ভাষারূপেও গণ্য করা হ'ত না। অনেকেই একে 'ইলিরীয়' (Illyrian) এবং অপরেরা 'থ্রেসিয়ান' (Thracian) ভাষারই

আধুনিক রূপ বলে মনে করেন। বস্তুতঃ এর প্রাচীন রূপের পুনর্গঠন, অথবা প্রাচীনতর সাহিত্যের আবিষ্কার ব্যতীত ভাষাটির স্বরূপ উদ্ধার সম্ভবপর নয়। আলবানীয় ভাষায় দুটি রূপ বিশেষভাবে প্রচলিত—উত্তরাঞ্চলে 'গেগ' (Geg) এবং দক্ষিণাঞ্চলে 'টোস্ক' (Tosk)।

২. **আর্মানীয়** (Armenian)—দক্ষিণ ককেশাস ও পশ্চিম তুরস্কে প্রচলিত আর্মানীয় ভাষা কিছুকাল পূর্ব পর্যন্তও ঈরানী ভাষার শাখারূপে বিবেচিত হ'ত। ঈরানের এক যুবরাজ আর্মানিয়ায় রাজত্ব করবার ফলে এই ভাষায় প্রভূত ঈরানী শব্দের সন্ধান পাওয়া যায়। কেউ কেউ এ ভাষাকে ফ্রীজীয় (Phrygian) ভাষার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বলে মনে করেন; কেউ বা হিত্তী ভাষার সঙ্গে এর সাদৃশ্য লক্ষ্য করে থাকেন। বস্তুতঃ এই ভাষার ওপর ককেশীয় এবং সেমীয় ভাষার প্রভাব পড়লেও ভাষাটি যে ইন্দো-য়ুরোপীয় ভাষারই একটি শাখা এ বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।

আর্মানীয় ভাষার নিদর্শন পাওয়া যাচ্ছে খ্রীঃ পঞ্চম শতক থেকে। তবে রচনার বিষয় সবই খ্রীষ্টানধর্ম-বিষয়ক। প্রাচীনতম লিপি বাণমুখ অক্ষরে লিখিত। প্রাচীন আর্মানীয় ভাষা সংস্কৃত এবং লাতিনের মত এখনও ধর্মীয় প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয়। আধুনিক আর্মানীয় ভাষার দুটো রূপ প্রচলিত আছে—এশীয় অঞ্চলে ভাষা 'আরারাত' (Ararat) এবং য়ুরোপ-অঞ্চলে ব্যবহৃত ভাষা 'স্তাম্বুল' (Stambul)।

৩. **বাল্‌তো-স্লাব** (Balto-Slavic) **বা লেত্তোস্লাব** (Letto-Slavic)—বাল্‌তোস্লাব বা লেত্তোস্লাব ভাষা দুটি প্রধান উপশাখায় বিভক্ত—একটি বাল্‌তো (Baltic) বা লেত্তো (Lettish), অপরটি স্লাব (Slavic)। কোন কোন ভাষাবিজ্ঞানী এ দু'টি উপশাখাকে সম্পূর্ণ পৃথক শাখার মর্যাদা দিয়ে থাকেন।

বাল্‌তো উপশাখায় দু'টি ভাষাই প্রধান—'লিথুআনীয়' (Lithuanian) এবং লেট্ (Lettish)। লিথুআনিয়ায় প্রচলিত লিথুআনীয় ভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন পাওয়া যায় ষোড়শ শতাব্দীতে, সেই হিশাবে ভাষাটি অপেক্ষাকৃত আধুনিক। অথচ সংরক্ষণশীলতার জন্যে এই ভাষাতেই ইন্দো-য়ুরোপীয় মূল ভাষার প্রাচীনতম উচ্চারণ অব্যাহত আছে। বৈদিক যুগের মত এখনও ভাষায় স্বর বর্তমান, সংস্কৃতের মত এখনও ভাষায় দ্বিবচন বর্তমান; অপাদান ব্যতীত অপর সমস্ত কারকও ভাষায় বিদ্যমান। ধ্বনি পরিবর্তনও এই ভাষায় সবচেয়ে কম হয়েছে বলে ভাষাবিজ্ঞানীদের

নিকট এই ভাষার গুরুত্ব অপরিসীম। এই উপশাখার অপর ভাষা সেল্ট, লাটভিয়ায় প্রচলিত। এই ভাষারও প্রাচীনতম নিদর্শন ষোড়শ শতকের।

স্লাব উপশাখার বিস্তৃতি অনেকখানি। প্রায় সমগ্র পূর্ব য়ুরোপে এ ভাষা প্রসারিত। খ্রীঃ নবম শতাব্দীতে স্লাব ভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন পাওয়া যায়। বাইবেলের অনুবাদেই সেই নিদর্শন বর্তমান। এই ভাষার নাম ছিল প্রাচীন বুল্‌গার (Old Bulgarian)—ধর্মযাজকগণ এই ভাষাকে লাতিন ভাষার তুল্য জ্ঞান করতেন। স্লাব ভাষা তিনটি উপশাখায় বিভক্ত :—দক্ষিণ, পশ্চিম এবং পূর্ব স্লাব। বুল্‌গার (Bulgarian), সার্বোক্রোটীয় (Serbo-Croatian) এবং স্লোবেনীয় (Slovenian) দক্ষিণ স্লাবের অন্তর্ভুক্ত। পশ্চিম স্লাব ভাষায় আছে—চেক (Czech), স্লোবাক (Slovak), পোল (Polish) এবং ওয়েণ্ডিস্ (Wendish)। পূর্ব স্লাবের অন্তর্ভুক্ত ভাষা—গ্রেট্ রুশ (Great Russian), শ্বেত রুশ (White Russian) বা বাইলোরুশ (Byelorussian) এবং উক্রেনীয় (Ukranian)। স্লাব ভাষায় বিভিন্ন শাখার মধ্যে পার্থক্য এত অল্প যে মনে হয়, এদের পৃথক্‌করণ ব্যাপারটি খুব প্রাচীন নয়।

বালতো-স্লাব ভাষার গুরুত্ব রয়েছে নানাদিক থেকে। এক বৃহৎ জনসমষ্টি (প্রায় ৩৫ কোটি লোক) এই গোষ্ঠীর কোন-না-কোন ভাষা ব্যবহার ক'রে থাকেন। ধ্বনিতে এবং রূপতত্ত্বে এই গোষ্ঠী ভাষায় প্রাচীনত্ব অনেকাংশে বর্তমান। কোন কোন ভাষায় ৭টি কারক ও কোথাও কোথাও দ্বিবচনও বর্তমান। কাজেই ভাষাবিজ্ঞানীর নিকট গুরুত্বে এর স্থান আর্যভাষা এবং গ্রীকভাষার পরই।

৪. ইন্দো-ঈরানী (Indo-Iranian) বা আর্য (Aryan) :

(ক) **বৈশিষ্ট্য :** ইন্দো-য়ুরোপীয় ভাষার যে শাখাটি এই ভাষা-সাম্রাজ্যের পূর্ব সীমান্তে অবস্থিত, সেই শাখাটির নাম 'ইন্দো-ঈরানী ভাষাগুচ্ছ'—বস্তুত এখানে দু'টি প্রধান ভাষার নাম গুচ্ছবদ্ধ রয়েছে, একটি 'ভারতীয়' (Indic), অপরটি 'ঈরানী' (Iranian) ভাষা। এই উভয় শাখার ভাষা ব্যবহারকারকরাই নিজেদের 'আর্য'/অর্য'' (Aryan) বলে অভিহিত করত বলেই এ ভাষাগুচ্ছের বিকল্প নাম 'আর্য ভাষা'। এই আর্যভাষা মূল ই-য়ু ভাষা থেকে কবে বিচ্ছিন্ন হয়েছিল, তা' জানা না গেলেও অনুমান করা যায় যে, অন্ততঃ খ্রীঃ পূঃ ২০০০ অব্দের পরে নয়। খ্রীঃ পূঃ চতুর্দশ শতাব্দীর হিত্তী প্রত্নলেখে কিছু কিছু ভারতীয় দেবতার নাম ('নশাত্তিয়ন'=নাসত্যনাম্, ইন্দর'=ইন্দ্র, 'মি-ইৎ-র'=মিত্র, 'উরুবন'=বরুণ প্রভৃতি), ব্যক্তিনাম ('শুবন্দু'=সুবন্ধু, 'অর্তমনিঅ'=ঋতমন্য প্রভৃতি) এবং

সংস্কৃতের তুল্য শব্দ ('অইকবর্তন'=একবর্তন') পাওয়া যাওয়াতে অনুমান হয় যে এইকালের পূর্বেই ভারতীয় ভাষা এবং ঈরানী ভাষার বিচ্ছেদ ঘটে গিয়েছিল। তা'ছাড়া খ্রীঃ পূঃ পঞ্চদশ শতাব্দী অথবা আরো পূর্বেই ঈরান থেকে আর্য ভাষাভাষীদের এক শাখা ভারত-অভিমুখে যাত্রা করেছিল। কাজেই অন্ততঃ এর পাঁচশত বৎসর পূর্বে আর্যভাষা মূল ভাষা থেকে বিচ্ছিন্ন হ'য়েছিল বললে কমই বলা হয়।

মূল ভাষা থেকে বিচ্ছেদের পর আর্যভাষা যখন স্বাতন্ত্র্য লাভ করল, তখন নিম্নোক্ত লক্ষণগুলো তার বিশিষ্ট পরিচায়ক চিহ্ন হ'য়ে দাঁড়াল।

১. ই.-য়ু. হ্রস্ব ও দীর্ঘ অ, এ, ও আর্যভাষায় যথাক্রমে হ্রস্ব অ ও দীর্ঘ আ ধ্বনিতে পরিণত হয়েছে। যথা—* নেভোস্>সং নভঃ, আবেস্তা' নবো, কিন্তু লা' নেবুলা ; * অপো>সং অপ, আ' অপ।

২. মূল ভাষার অতি হ্রস্ব অ (ə) আর্য ভাষায় 'ই'কারে পরিণত হয়। যথা—*পতের>সং পিতা, আ' পিতা, কিন্তু গ্রী' ও লা' পতের্।

৩. মূল ভাষার 'র, ল, ঋ, ৯' আর্য ভাষায় বিপর্যস্ত হয়েছে। যথা—*উল্কুওস্>সং বৃক, আ' বহ্র্কো ; * রুনক্>সং লুঞ্চামি।

৪. মূল ক এবং র-এর পরবর্তী 'স' আর্যভাষায় 'শ' এবং পরে ভারতীয় ভাষায় 'ষ'-রূপে পরিবর্তিত হয়। যথা—* স্হিস্হামি>আ' হিশ্তৌতি, সং তিষ্ঠামি।

৫. মূল ভাষার পুরঃকণ্ঠ্যধ্বনি আর্যভাষায় উষ্মধ্বনিতে পরিণত হ'য়েছে। বস্তুতঃ মূল ভাষার * k̂m̥tom>সং শতম্, আ. সতম—পরিবর্তন থেকে যে 'শতম্/সতম্' গোষ্ঠীর নামকরণ করা হয়েছে, তা এই আর্য ভাষার দৃষ্টান্ত থেকেই নেওয়া হয়েছে।

৬. মূল ভাষার কণ্ঠ্য ও কণ্ঠৌষ্ঠ্য ধ্বনির পর পর 'ই' বা 'উ' থাকলে তা' আর্য-ভাষায় তালব্য ধ্বনিতে অর্থাৎ চ-বর্গে পরিণত হয়েছে। যথা—* ক্বে>সং চ, আ' চ ; * গ্বীবোস্>সং জীবস্, প্রা' পারসিক' জীব।

৭. আর্যভাষায় স্বরান্ত শব্দরূপের ষষ্ঠী বিভক্তির বহুবচনে-'নাম্' যুক্ত হয়।

৮. লটের (বর্তমান কাল) উত্তম পুরুষের এক বচনে বিভক্তি'-মি'।

৯. লোট্-এর প্রথম পুরুষের একবচন ও বহুবচনের বিভক্তি-'উ'(তু)।

(খ) ভারতীয় আর্য ও ঈরানীর ভাষাগত পার্থক্য নির্দেশ

ইন্দো-ঈরানী বা আর্যভাষার তিনটি শাখা : ১. ঈরানী (Iranian), ২. দরদীয় (Dardic), ৩. ভারতীয় (Indic)। এদের মধ্যে অনেকেই দরদীয়কে পৃথক্ শাখা-

রূপে গ্রহণ করতে চান না। অপর দুই প্রধান শাখা—ঈরানী ও ভারতীয় আর্যভাষার মধ্যে কালে কালে পার্থক্য সৃষ্টির ফলে এরা স্বতন্ত্র ভাষারূপে পরিগণিত হয়; নিম্নে উভয়ের ভাষাগত পার্থক্যের পরিচয় দেওয়া হ'ল। [ভারতীয় বোঝাতে সং (সংস্কৃত) ও ঈরানী বোঝাতে আ' (আবেস্তা) ব্যবহৃত হয়েছে।]

১. সম্ভবতঃ দ্রাবিড় প্রভাববশতঃ অথবা স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভারতীয় আর্যভাষায় মূর্ধন্য বর্ণের (ট-বর্গের) আগম ঘটে, ঈরানী ভাষায় ট বর্গ নেই।

২. স্পৃষ্ট মহাপ্রাণ ব্যঞ্জনের অস্তিত্ব ভারতীয় আর্যে থাকলেও ঈরানী ভাষায় তাদের একান্ত অভাব। অর্থাৎ ঈরানী ভাষায় বর্গের দ্বিতীয় (খ, ছ, থ, ফ) বর্ণ এবং চতুর্থ বর্ণ (ঘ, ঝ, ধ, ভ) নেই।

৩. অপর ব্যঞ্জনের সঙ্গে যুক্ত অবস্থায় ঈরানী ভাষায় স্পৃষ্ট অঘোষ অল্পপ্রাণ ক, ত, প ঘৃষ্টবর্ণ খ., থ., ফ. (x, θ, f)-রূপে উচ্চারিত হয়। কখন কখন এগুলো অঘোষ মহাপ্রাণরূপেও উচ্চারিত হয়। যথা—সং ক্রতু=আ 'খ্র তুস্'। সং গাথা=আ' গাথা।

৪. বর্গের চতুর্থ বর্ণের স্থলে ঈরানীতে তৃতীয় বর্ণ ব্যবহৃত হয়। যথা—সং ভূমি=আ' বুমি; সং ধারয়ৎ=আ' দারয়ৎ।

৫. আদি 'স' ঈরানীতে 'হ'-তে পরিণত হয়। যথা—সং-সিন্ধু=আ' হিন্দু; সং সপ্ত=আ' হপ্ত।

৬. ভারতীয় আর্য 'হ' স্থলে ঈরানী ভাষায় জ. (z) বা ঝ. (z) ব্যবহৃত হয়—এই ধ্বনিগুলো ভারতীয় ভাষায় নেই। যথা—সং হস্ত=আ' জ' স্তো; সং দহতি=আ' দজ. ইতি।

৭. ঈরানীতে এমন অনেক স্বরধ্বনি আছে, যেগুলো ভারতীয় আর্যে নেই—. ভারতীয় ভাষায় তৎস্থলে 'অ' বা 'আ' ব্যবহৃত হয়।

৮. ভারতীয় 'এ'-স্থলে ঈরানীতে 'অএ' বা 'ওই' ব্যবহৃত হয়। যথা—সং সেনা =আ' হএনা; সং গবে=আ' গবোই।

৯. ভারতীয় 'ও'-স্থলে ঈরানীতে 'অও' বা 'অউ' ব্যবহৃত হয়। যথা—সং হোতা =আ' জ. ওতা।

১০. ভারতীয় 'ঋ' ঈরানীতে 'অর' বা 'অরে' উচ্চারিত হয়।

১১. ঈরানীতে 'ল' একেবারেই নেই, তৎস্থলে 'র' ব্যবহৃত হয়। যথা—সং শ্রীল =আ' শ্রীরো।

১২. ঈরানীতে অপিনিহিতির ব্যবহার অতিশয় ব্যাপক। যথা—ভবতি=ববইতি।

(গ) ঈরানী ভাষার পরিচয়

ঈরানী শাখায় দুটো প্রধান ভাষার পরিচয় পাওয়া যায়—একটি জরথুশ্ত্র-পন্থীদের ধর্মশাস্ত্র 'জেন্দ্ আবেস্তা' তথা 'গাথার' ভাষা, অপরটি প্রাচীন পারস্যদেশের বিভিন্ন শিলালিপিতে প্রাপ্ত ভাষা। গাথার ভাষাকে আগে 'জেন্দ' বা 'ব্যাকট্রীয়' (Bactrean) বলা হ'ত, এখন বলা হয় 'আবেস্তীয়', আর শিলালিপির ভাষাকে বলা হয় 'প্রাচীন পারসিক'। উত্তর ঈরানের কথ্যভাষার ওপর প্রতিষ্ঠিত আবেস্তার ভাষা। পক্ষান্তরে প্রাচীন পারসিক ভাষার প্রচলন ছিল ঈরানের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল পারস্ প্রদেশে। খ্রী. পূ. সপ্তম-অষ্টম শতকের দিকে ঋষি জরথুশত্র আবেস্তার সর্বপ্রাচীন অংশ 'গাথা' রচনা করেন। পরবর্তী শতাব্দীগুলোতে আবেস্তার অর্বাচীন অংশ রচিত হয়। ম্যাসিডনের রাজা আলেকজান্ডারের আক্রমণে প্রথমবার এবং বিজিগীষু আরবী মুসলমানদের আক্রমণে দ্বিতীয়বার ধর্মগ্রন্থগুলোর বিরাট অংশ বিধ্বস্ত হয়। যে স্বল্পমাত্র অংশ অবশিষ্ট আছে, তার ভাষার সঙ্গে বৈদিক ভাষার যথেষ্ট সাদৃশ্য পাওয়া যায়। স্বল্পমাত্র ধ্বনিতাত্ত্বিক পরিবর্তনেই এক ভাষাকে অর্থসহ অপর ভাষায় রূপান্তরিত করা চলে।

'হাবনীম্ আ রতূম্ আ / হওমো উপাইৎ জরথুশ্ত্রম্।

আত্রম্ পইরি-য়ওজ্দথন্তম্ / গাথাস্-চ স্রাবয়ন্তম্।'—আবেস্তা।

'সবনিম্ আ ঋতুম্ আ / সোম উপেৎ জরথুষ্ট্রম্।

অগ্নিম্ পরি-থোস্-দধন্তম্ / গাথাশ্চ (অপি) শ্রাবয়ন্তম্।—(পুনর্গঠিত সংস্কৃত)

আবেস্তা সঙ্কলিত হয় খ্রীঃ চতুর্থ থেকে সপ্তম শতকের মধ্যে। এই সময় ঈরানী ভাষার মধ্যযুগ চলছে ; অতএব সংকলনের ভাষায় প্রচুর ধ্বনিতাত্ত্বিক পরিবর্তন ঘটে যাওয়ায় ভাষাবিচারের ক্ষেত্রে আবেস্তার ভাষা নির্ভরযোগ্য নয়। তবে গাথার ভাষায় প্রাচীনত্ব অক্ষুণ্ণ রয়েছে।

পারস্যের শিলালিপির ভাষাও যথেষ্ট প্রাচীন। হখামনীয় (Achaemenian) রাজবংশের সম্রাট্ দারয়বহুশ্ (Darius=ধারয়দ্বসুঃ) ও তৎপুত্র খ্শয়র্শা (Xerxes=ক্ষয়ার্ষা) খ্রীঃ পূঃ ষষ্ঠ থেকে চতুর্থ শতকের মধ্যে যে শিলালিপি খোদাই করিয়েছিলেন, প্রাচীন পারসিকের ঐগুলোই প্রাচীনতম নিদর্শন। ঐ প্রাচীন পারসিক ভাষার সঙ্গেও আমাদের প্রাচীন ভারতীয় আর্য সংস্কৃতের যথেষ্ট মিল রয়েছে। তবে লক্ষণীয় এই যে প্রাচীন পারসিকের জন্য যে লিপি গ্রহণ করা হয়েছিল, তা' সেমেটিক ব্যাবেলনীয়দের বাণমুখ লিপি, তাদের স্বর প্রণালী ভিন্নতর

হওয়াতে আবেস্তার সঙ্গে প্রাচীন পারসিকের স্বরবর্ণের ব্যবহারে কিছুটা পার্থক্য ঘটেছে।

'বগ বজ়ক' অউরমজ়্দ্ হ্য ইমাম্ বুমিম্ অদা, হ্য অবম্ অস্মানম্ অদা, হ্য মর্তিয়ম্ অদা, হ্য সিয়াতিম্ অদা, মর্তিয়হ্যা, হ্য দরয়বউম্ খ্শায়থিয়ম অকুনউশ্ অইবম্ পরুবনাম্ খ্শায়থিয়ম্ অইবম্ পরুবনাম্ ফ্রমাতরম্।'—দারয়বহুশ্-এর শিলালিপি।

'ভগঃ বুজুর্গঃ অহুরমজ্দঃ যঃ ইমাম্ ভূমিম্ অধাৎ যঃ অবম্ অশ্মানম্ অধাৎ, যঃ মর্ত্যম্ অধাৎ, যৎ শাদিম্ অধাৎ মর্ত্যস্য য ধারয়দ্বসুম্ ক্ষয়ন্তম্ অকৃণোৎ একম্ পুরুণাম্ ক্ষয়ন্তম্ এবং পুরুণাম্ প্রমাতরম্।' পুনর্গঠিত সংস্কৃত।

খ্রীঃ পূঃ ৩০০ থেকে ৯০০ খ্রীঃ পর্যন্ত ঈরানী ভাষার মধ্যযুগ। এই যুগের ভাষার সাধারণ নাম 'মধ্যপারসি' বা 'পহ্লবী ভাষা'। ভারতীয় ভাষার ইতিহাসে প্রাকৃতের যে স্থান, ঈরানী ভাষার ইতিহাসে পহ্লবীরও সেই স্থান। এই পহ্লবী ভাষা থেকেই আধুনিক **ফারসী*** ভাষার উদ্ভব। পূর্বাঞ্চলে ঈরানী ভাষার একটি শাখা ছিল 'সোগ্দীয়ান্' (Sogdian); উত্তরাঞ্চলে শক ভাষা (Saka/Scythian) কথিত হ'ত। খুব সম্প্রতি এ সমস্ত ভাষার প্রাচীন পুথি আবিষ্কৃত হওয়াতে এদের সম্বন্ধে বহু তথ্যই এখন জানবার সুযোগ উপস্থিত হয়েছে। সাসানীয় ঈরানের রাজভাষা ছিল পহ্লবী। এক সময় পহ্লবী ভাষায় সেমীয় বিশেষতঃ আরবী ভাষার প্রভাব এত বেশি হ'য়ে দাঁড়ায় যে পহ্লবী আর্য ভাষা অথবা সেমীয় ভাষা, এ নিয়ে বিতর্কের সৃষ্টি হয়। পরবর্তীকালে পহ্লবীর অনেক সংস্কার সাধিত হয় এবং বহু সেমীয় শব্দের বহিষ্কার সাধন করে তৎস্থলে আর্যশব্দ ব্যবহার করা হয়। এই ভাষাকে 'পাজন্দ' বা 'পারসি' ভাষা বলা হয়।

আধুনিক ইরানী ভাষা পরিবারে 'ফার্সি' (Farsi) বা 'ঈরানী'ই (বর্তমানে এই নামেই চলছে) সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ভাষা। ঈরানের বাইরেও এই ভাষার যথেষ্ট ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। বালুচিস্তানে ব্যবহৃত 'বালুচ' (Balochi), আফগানিস্তানে ব্যবহৃত আফগান (Afghan) বা পশ্তু (Pastu), পশ্চিম ঈরান ও তুর্কী অঞ্চলে ব্যবহৃত 'কুর্দ' (Kurdish) এবং উত্তর ককেসাস্ অঞ্চলে ব্যবহৃত

---

* ঈরানের অন্তর্গত পারস্-প্রদেশের নাম অনুযায়ী 'পারস্যদেশ' ও 'পারসিক জাতি' ও 'পারসি' ভাষার নাম হয়েছে। আরবের মুসলমানরা পারস্য দেশ জয় করার পর থেকেই 'পারসি' 'ফারসি' হ'য়ে যায়, কারণ আরবী ভাষায় 'প' না থাকায় 'ফ' দিয়ে শব্দগুলো লিখতে হ'তো।

'ওসেটিক' (Ossetic) ঈরানী ভাষার শাখা-প্রশাখারূপে আধুনিক কালে বর্তমান রয়েছে।

(ঘ) দরদীয় উপশাখা

পাঞ্জাবের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল ও পামীর মালভূমির অন্তর্বর্তী পর্বতময় ভূখণ্ডের নাম দরদীস্তান, সংস্কৃত পুরাণ-মহাকাব্যে দরদ জাতির উল্লেখ রয়েছে। দরদী ভাষা ভারতীয় আর্যভাষা ও ঈরানী ভাষার মাঝামাঝি স্তরে অবস্থিত। অনুমিত হয়, আর্যদের ভারত আক্রমণকালে ভারতে প্রবেশের পূর্বেই এই শাখাটি বিচ্ছিন্ন হ'য়ে পড়ে, ফলে দরদী ভাষায় কিছু কিছু প্রাচীনতর লক্ষণও রক্ষিত হ'য়েছে। যেমন, ইং য়ু ভাষা * ĝhian>আর্য * zhima>সং hima, কিন্তু দরদীয় zim এবং আবেস্তায় zima। দরদী ভাষার মধ্যযুগে যে ভাষারূপ প্রচলিত ছিল, তাকেই সম্ভবতঃ ভারতীয়গণ 'পৈশাচী প্রাকৃত' নামে অভিহিত করতেন। গুণাঢ্য-কৃত 'বড্ডকহা' (বৃহৎকথা) পৈশাচী প্রাকৃতে লিখিত ছিল কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে গ্রন্থটি লোপ পেয়েছে। দরদী ভাষার আধুনিক রূপের মধ্যে আছে 'চিত্রালি, কাফিরি, শীনা, কাশ্মীরী ও কোহিস্তানী'; এদের মধ্যে একমাত্র কাশ্মীরী ভাষাতেই লিখিত সাহিত্য বর্তমান। এগুলোর মধ্যে একমাত্র কাশ্মীরী ভাষাতেই ভারতীয় প্রভাব অধিকতর মাত্রায় লক্ষিত হয়, অপরগুলোতে ঈরানী ভাষার প্রভাবই বেশী।

(ঙ) ভারতীয় আর্যভাষা

ভারতীয় আর্যভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন পাওয়া যায় ঋগ্বেদে, রচনাকাল আনুমানিক ১২৫০—১০০০ খ্রীঃ পূর্বাব্দ। এই যুগের ভাষাকে বলা হয় প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা—বিস্তৃতি খ্রীঃ পূঃ ৬০০ অব্দ পর্যন্ত। এই ভাষার দুটো প্রধান রূপ—একটা বৈদিক সংস্কৃত, অপরটি লৌকিক সংস্কৃত, এছাড়াও ছিল কথ্য সংস্কৃত।

ভারতীয় আর্যভাষার দ্বিতীয় স্তরকে বলা হয় মধ্যভারতীয় আর্যভাষা বা প্রাকৃত। এই যুগের বিস্তৃতি—খ্রীঃ পূঃ ষষ্ঠ শতক থেকে খ্রীঃ দশম শতক পর্যন্ত। প্রাকৃতের তিনটি স্তর। আদি স্তরের নিদর্শন পাওয়া যায় বৌদ্ধদের ধর্মগ্রন্থের ভাষা পালিতে এবং অশোক ও সমসাময়িক কালের বিভিন্ন শিলালিপির ভাষা প্রাচীন প্রাকৃতে। মধ্যস্তরের ভাষাকে সাধারণভাবে বলা হয় 'সাহিত্যিক প্রাকৃত'। এদের মধ্যে প্রধান—শৌরসেনী প্রাকৃত, মাহারাষ্ট্রী প্রাকৃত, মাগধী প্রাকৃত, পৈশাচী

প্রাকৃত, অর্ধমাগধী প্রভৃতি। সংস্কৃত নাটকের নারী ও অশিক্ষিত পুরুষের মুখে বিবিধ প্রাকৃতের ব্যবহার দেওয়া হয়েছে। মাহারাষ্ট্রী প্রাকৃতে প্রচুর কাব্য-মহাকাব্যও রচিত হয়েছে। জৈনগণ তাদের অসংখ্য ধর্মগ্রন্থ রচনা করেছেন অর্ধমাগধী ভাষায়। তৃতীয় স্তরের ভাষা অপভ্রংশ ও অপভ্রংশের শেষ পর্ব অবহট্ঠ। শৌরসেনী অবহট্ঠ এককালে গোটা উত্তর ভারতের শিষ্ট ভাষারূপে প্রচলিত ছিল।

খ্রীঃ দশম শতাব্দী থেকে নব্য ভারতীয় আর্যভাষার যুগ। এই সময় থেকেই অধুনা প্রচলিত আঞ্চলিক ভাষাগুলোর যাত্রা শুরু। আধুনিক ভাষাগুলোর মধ্যে প্রধান: বাঙলা, ওড়িয়া, অসমীয়া, হিন্দী, পাঞ্জাবী, সিন্ধী, মারাঠী, গুজরাটী, নেপালী, মৈথিলী, ভোজপুরিয়া, কোংকনী প্রভৃতি। শ্রীলংকায় প্রচলিত 'সিংহলী' এবং য়ুরোপে জিপ্সীদের মধ্যে ব্যবহৃত 'রোমানী' ভাষাও নব্য ভারতীয় আর্য ভাষারই শাখাবিশেষ।

[ভারতীয় আর্যভাষা সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা পরবর্তী অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।]

ইন্দো-ঈরানীয়/আর্য
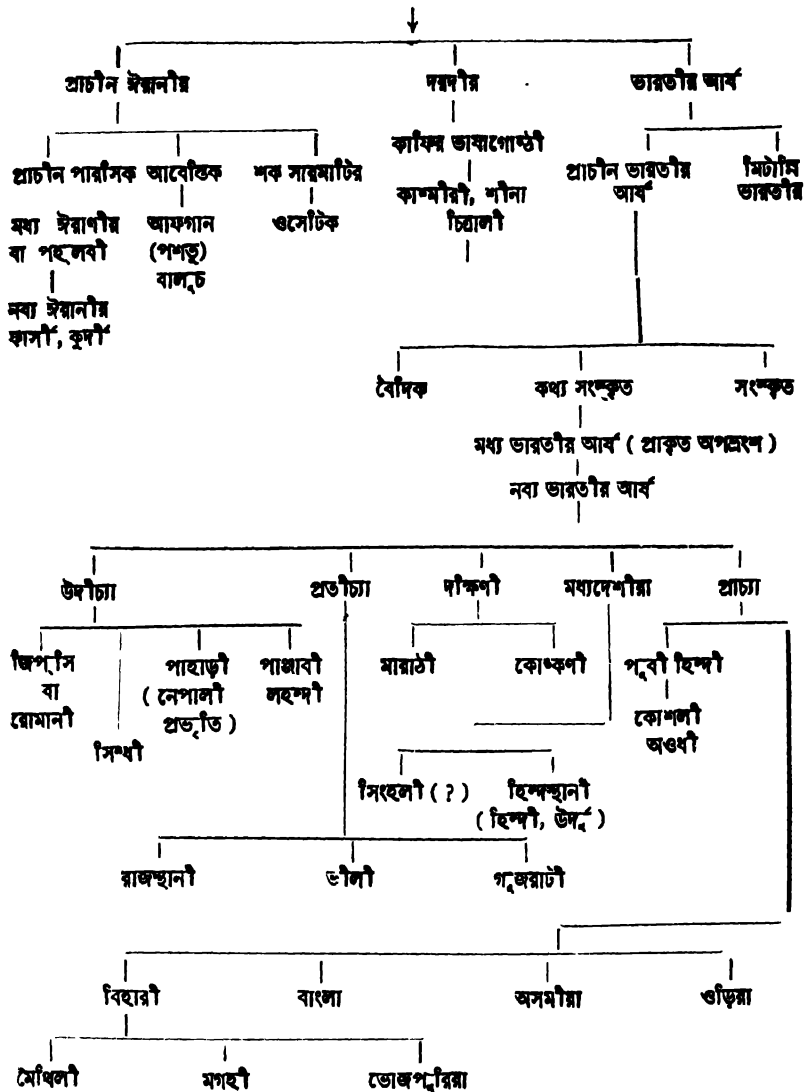
* মিটানি ভাষাকে কেহ কেহ ইন্দো-ঈরানীয় বা আর্য ভাষার শাখা বলে মনে করলেও একে ভারতীয় আর্য ভাষার শাখা বলে মনে করবার পেছনেও যথেষ্ট যুক্তিসঙ্গত কারণ রয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়

ভারতীয় আর্যভাষা

(Indo-Aryan Language)

আঃ খ্রীঃ পূঃ পঞ্চদশ শতকের দিকে অথবা সম্ভবত তৎপূর্বেই আর্য ভাষাভাষী জন-সমষ্টির এক বা একাধিক ধারা ঈরান থেকে ভারত অভিমুখে যাত্রা করে। ভারতে নবাগত এই জনসমষ্টির ভাষাই 'ভারতীয় আর্যভাষা' নামে অভিহিত হয়। মূলতঃ ইন্দো-ঈরানীয় তথা আর্য ভাষার একটি প্রধান শাখা এই ভারতীয় ভাষা। আর্যদের ভারত-আগমনের পূর্বেই ঈরানী ভাষার সঙ্গে এই বিচ্ছেদ সাধিত হয়েছিল। বোগাজকোয়তে প্রাপ্ত হিত্তী-মিটান্নি পত্রে ভারতীয় দেবতাদের নামের উল্লেখ থেকে অনুমিত হয় যে খ্রীঃ পূঃ অষ্টাদশ শতাব্দীতে অথবা তৎপূর্বেই ভারতীয় আর্যভাষা স্বতন্ত্র রূপ পরিগ্রহ করতে আরম্ভ করে।

ভারতে আগত আর্যদের প্রধান সাহিত্যকীর্তি 'বেদ'। বেদের রচনা শুরু হয় সম্ভবতঃ খ্রীঃ পূঃ ত্রয়োদশ শতাব্দীতেই। তারপর থেকে এই সুদীর্ঘ সাড়ে তিনহাজার বছর ভারতের বুকে (এবং অন্যত্রও) এই ভারতীয় আর্যভাষা রূপ থেকে রূপান্তরের মধ্য দিয়ে আধুনিক কালে উপনীত হয়েছে। এই সুদীর্ঘকালের পথ-পরিক্রমা সুস্পষ্ট তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত, এই অনুযায়ী ভারতীয় আর্যভাষাকে তিনভাগে বিভক্ত করা হয়ঃ ১. প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা, ২. মধ্য ভারতীয় আর্যভাষা, ৩. নব্য ভারতীয় আর্যভাষা।

[এক] প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা (Old Indo Aryan)

প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার সর্বপ্রাচীন নিদর্শন বর্তমান বৈদিক সাহিত্যে, বিশেষতঃ ঋগ্বেদে। ভারতে আর্যদের কথ্যভাষায় কিছুটা আঞ্চলিকতার বৈচিত্র্য ছিল। বৈদিক সাহিত্যে তারই মার্জিত প্রকাশ। ঋগ্বেদোত্তর বিভিন্ন সংহিতায় (যজুঃ, সাম ও অথর্ব) এবং ব্রাহ্মণ-আরণ্যক-উপনিষদাদি গ্রন্থের ভাষায় ভাষা-পরিবর্তনের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়। লৌকিক ভাষায় পরিবর্তন ছিল অনেক বেশি ; এত বেশি যে তার সংস্কার সাধনের প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল। অতএব সমকালে 'আঞ্চলিক কথ্য সংস্কৃত' ভাষাকেও স্বীকার ক'রে নিতেই হয়। এবং এর সংস্কার-কৃত ভাষারই নাম 'সংস্কৃত' বা পারিভাষিক নাম 'লৌকিক সংস্কৃত'

(Classical Sanskrit)। প্রধানতঃ প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা বলতে **'বৈদিক সংস্কৃত'** এবং **'লৌকিক সংস্কৃত'**কে বোঝালেও ঐকালের ভাষাকে আরও কতকগুলি সূক্ষ্ম পর্যায়ে বিভক্ত করা চলে, কারণ তৎকালে অঞ্চলবিশেষে কথ্য সংস্কৃতেরও প্রচলন ছিল। যাহোক, খ্রীঃ পূঃ পঞ্চম শতাব্দীতে মহামুনি পাণিনি **'অষ্টাধ্যায়ী'** নামে যে সংস্কৃত ব্যাকরণ রচনা করেন, তাকেই সংস্কৃত ব্যাকরণের মূল ভিত্তি বলে গ্রহণ করা হয়। পাণিনির পূর্বেও যে অনেক বৈয়াকরণ বর্তমান ছিলেন স্বয়ং পাণিনি তার উল্লেখ করে গেছেন। অতএব খ্রীঃ পূঃ ষষ্ঠ শতাব্দী থেকে লৌকিক সংস্কৃত ভাষার উদ্ভব হয়েছিল বলে ধরে নেওয়া চলে। এই প্রসঙ্গে বলা চলে যে সংস্কৃত ভাষার উদ্ভব কাল ঐ সময় হলেও অপরিবর্তিতভাবেই এই ভাষা চলেছে একাল পর্যন্তও। বস্তুতঃ সংস্কৃত ভাষায় রচিত শ্রেষ্ঠ সাহিত্য কীর্তিগুলো সবই রচিত হয়েছে খ্রীষ্টোত্তর কালে। প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের অপর একটি উল্লেখযোগ্য ধারা—**'বৌদ্ধ সংস্কৃত'** বা **'মিশ্র সংস্কৃত'**। মহাযানপন্থী বৌদ্ধগণ প্রাকৃত মিশিয়ে সংস্কৃতকে সহজ তথা যুগোপযোগী করে নিয়ে নিজেদের কার্য সাধন করেছিলেন। (এ ইঙ্গিতটি গ্রহণ করে ভারতের বর্তমান রাষ্ট্রভাষা সমস্যার একটা সমাধান-সূত্র রচনা করা চলতে পারে।)

প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার লক্ষণ

প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার বিস্তৃতিকাল খ্রীঃ পূঃ ত্রয়োদশ শতক থেকে খ্রীঃ পূঃ ষষ্ঠ শতক পর্যন্ত। এই বিস্তৃত কালসীমায় ধৃত ভাষাদেহে নানাপ্রকার পরিবর্তন ঘটাই স্বাভাবিক। তৎসত্ত্বেও তার মধ্যে কতকগুলো সাধারণ লক্ষণ পাওয়া যায়, যার সাহায্যে আমরা প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার স্বরূপ নির্ণয় করতে পারি। নিম্নে প্রধান লক্ষণগুলো বিবৃত হলো।

১. মূল আর্যভাষা থেকে প্রাচীন ভারতীয় আর্য তথা সংস্কৃততে স্বরের সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে। অতি হ্রস্ব স্বর (ə) এবং হ্রস্ব 'এ', 'ও' সংস্কৃতে নেই, ঌ-এর ব্যবহারও সীমিত। আর্যভাষার 'অই' এবং 'অউ' সংস্কৃতে যথাক্রমে 'এ' এবং 'ও'-তে পরিণত হলো। যথা—দইব>দেব, রউচ>রোচ। তবে বৈদিক ভাষার প্রথম যুগে হ্রস্ব 'অই' ও হ্রস্ব 'অউ' ধ্বনির বর্তমানতা সম্ভবপর। শ্রেষ্ঠ>শ্রইষ্ঠ রূপে (ত্র্যক্ষর) উচ্চারিত হ'তো ভারতীয় আর্যে তথা সংস্কৃতে।

২. আর্যভাষাতেই তালব্য ধ্বনি 'চ'-বর্গের উদ্ভব ঘটেছিল, ভারতীয় আর্যে তথা সংস্কৃতে মূর্ধন্য ধ্বনি ট-বর্গও গৃহীত হ'লো। কিন্তু কতকগুলো ঘৃষ্ট ধ্বনি (ৼ, থ., ফ.) এবং উষ্মবর্ণ (জ., জ', ঝ., ঝ') সংস্কৃতে পরিত্যক্ত হ'লো।

৩. মূল ভাষার তিনপ্রকার কণ্ঠাশ্রিত ধ্বনি সংস্কৃতে একমাত্র পশ্চাৎকণ্ঠ্যকে আশ্রয় করে উচ্চারিত হয়।—ক, খ, গ, ঘ, ঙ।

৪. সংস্কৃতে প্রতি বর্গেরই একটি ক'রে অনুনাসিক রূপ বর্তমান।—ঙ, ঞ, ণ, ন, ম।

৫. তিনপ্রকার শিস্ ধ্বনিরই (শ, ষ, স) এবং হ-কারের বহুল ব্যবহার সংস্কৃতে সুলভ।

৬. শব্দে ধাতুর অর্থ মোটামুটি সুরক্ষিত রয়েছে, পরের দিকে অর্থ পরিবর্তন আরম্ভ হ'য়েছে।

৭. বৈদিক সাহিত্য ছিল সঙ্গীতাত্মক, স্বরের (pitch accent) ব্যবহার ছিল আবশ্যিক, পরবর্তীকালে স্বরের ব্যবহার লোপ পায়। লৌকিক সংস্কৃতে সম্ভবতঃ প্রস্বর (stress accent) প্রবর্তিত হয়েছিল।

৮. স্বরবর্ণের গুণ-বৃদ্ধি-সম্প্রসারণ তথা অপশ্রুতি বা স্বরক্রম সংস্কৃতের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। যেমন, 'যজ্' ধাতুর—'যজ্ঞ, যাগ, ইষ্ট' ত্রিবিধ রূপ।

৯. যুক্ত ব্যঞ্জনের ব্যবহার ছিল যথেষ্ট।

১০. তিন লিঙ্গ, তিন বচন এবং আট প্রকার কারক এবং তদনুযায়ী শব্দের রূপভেদ এবং ফলতঃ শব্দরূপে অসাধারণ বৈচিত্র্য।

১১. ধাতুরূপেও বিরাট বৈচিত্র্য ছিল, তিন পুরুষ (উত্তম, মধ্যম, নাম), দুই পদ (আত্মনেপদ, পরস্মৈপদ), দুই বাচ্য (কর্তৃবাচ্য, কর্ম-ভাববাচ্য), পাঁচ কাল (অতীত ছিল তিন প্রকার—লঙ্, লুঙ্, লিট্ এবং বর্তমান ও ভবিষ্যৎ) এবং পাঁচ ভাব।

১২. উপসর্গ, ধাতু বা শব্দের আদিতে যুক্ত হলেও তাদের স্বাধীনভাবেও যথেষ্ট ব্যবহার ছিল। বৈদিক পর্বে এদের স্বাধীন ব্যবহারই বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

১৩. সন্ধির ব্যবহার ছিল, সমাসেও যথেষ্ট বৈচিত্র্য ছিল। সন্ধির ক্ষেত্রে বৈদিক স্তরে ও লৌকিক সংস্কৃত স্তরে অনেক পার্থক্য দেখা যায়। বৈদিক সবর্ণে সন্ধি প্রায় হতো না (মনীষা+অগ্নি=মনীষা অগ্নি), এমন কি অনেক সময় পূর্ববর্তী দীর্ঘ সবর্ণ হ্রস্ব হ'য়ে যেতো (মা আপেঃ=ম আপেঃ)। ব্যঞ্জনসন্ধির ক্ষেত্রেও উভয়ের মধ্যে পার্থক্য দেখা যায়। সমাসের ক্ষেত্রে বৈদিক সাধারণতঃ দুটি পদেই সীমাবদ্ধ থাকতো, কিন্তু সংস্কৃতে কোন সীমার বন্ধন নেই।

১৪. ধাতুর সঙ্গে কৃৎ-প্রত্যয় এবং শব্দের সঙ্গে তদ্ধিত প্রত্যয় যোগে যথেচ্ছ শব্দ গঠন করা যেতো।

১৫. বাক্যে পদবিন্যাসের কোন নির্দিষ্ট নিয়ম ছিল না।

১৬. ছন্দঃ-পদ্ধতি ছিল অক্ষরমূলক।

(খ) বৈদিক সংস্কৃত ও লৌকিক ধ্রুপদী সংস্কৃতে পার্থক্য

প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা বল্‌তে বৈদিক 'সংস্কৃত' লৌকিক এবং ধ্রুপদী 'সংস্কৃত' —উভয় ভাষাকেই বোঝালেও এ দু'য়ের মধ্যে কিছু পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। আর্যগণ ভারতের উত্তরাঞ্চল অর্থাৎ পাঞ্জাব এবং সন্নিহিত অঞ্চলে বসবাসকালেই বেদ রচনা করেছিলেন বলে বৈদিক ভাষায় উদীচী অর্থাৎ উত্তরাঞ্চলের ভাষার প্রভাব বিদ্যমান। পক্ষান্তরে উত্তর-পশ্চিম ভারতে পাণিনির জন্ম হ'লেও তিনি পাটলিপুত্রবাসী ছিলেন বলে তাঁর ব্যাকরণে এবং ফলতঃ সংস্কৃত সাহিত্যে মধ্যদেশীয় ভাষার প্রভাবই ছিল অধিকতর। বৈদিক এবং সংস্কৃত ভাষার মধ্যে ব্যাকরণগত পার্থক্যের এটা একটা বড় কারণ। অবশ্য কালগত পার্থক্যও অপর একটি প্রধান কারণ।

১. ধ্বনির দিক্ থেকে বৈদিক এবং সংস্কৃতের মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য ছিল না। তবে বৈদিকের প্রথম স্তরে সম্ভবতঃ 'এ' উচ্চারিত হ'তো হ্রস্ব 'অই' এবং 'ও' হ্রস্ব 'অউ'—রূপে ; প্রাতিশাখ্যে 'এ' এবং 'ও'-কে সন্ধ্যক্ষর বলা হ'য়েছে। মনে হয় বৈদিকে একটি 'মূর্ধন্য ল' (ল়) ধ্বনি ছিল, যা সংস্কৃতে বর্জিত হয়েছে। সংস্কৃতে তৎপরিবর্তে কোথাও 'ল' কোথাও 'ড়' ব্যবহৃত হয়। তাই ঋগ্বেদের প্রথম ঋক্‌টির দুরকম পাঠ পাওয়া যায় —'অগ্নিমীলে', 'অগ্নিমীড়ে' ('মূল—অগ্নিমীল়ে')।

২. বৈদিকে, বিশেষতঃ ঋগ্‌বেদে স্বর (Pitch accent) ছিল অপরিহার্য ; স্বরের পরিবর্তনে অর্থ পরিবর্তনও ঘটতে পারতো, কিন্তু সংস্কৃতে স্বরের কোন স্থান নেই। কালে সেই স্থানটি অধিকার ক'রে নিয়েছিল সম্ভবতঃ প্রস্বর (stress accent)।

৩. সংস্কৃতে সম্ভাব্য ক্ষেত্রে সন্ধি যেমন অবশ্য বিধেয়, বৈদিকে তেমন ছিল না। সেখানে সন্ধিক্ষেত্রেও নানাবিধ ব্যতিক্রম দেখা যায়।

৪. সংস্কৃতে শব্দরূপ যেমন আছে, বৈদিকে তার অতিরিক্ত কিছু পদ ছিল, অন্য বিশেষ কোন পার্থক্য নেই। বৈদিকে 'নর' শব্দের প্রথমা বহুবচনে অতিরিক্ত পদ 'নরাসঃ'।

৫. সংস্কৃতে ভাব (mood) ছিল দু'টি—অনুজ্ঞা (লোট্) ও সম্ভাবক বা বিধি (লিঙ্) ; বৈদিকে অতিরিক্ত ভাব—অভিপ্রায় (লিট্) এবং নির্বন্ধ (Injunctive)। সংস্কৃতে নির্বন্ধ ভাবের প্রয়োগ শুধু একটিমাত্র ক্ষেত্রেই বিহিত ছিল—'মা' এই নিষেধার্থক অব্যয়ের যোগে।

৬. বৈদিকে বর্তমান, সামান্য অতীত, সম্পন্ন অতীত এবং ভবিষ্যৎ—এই চার কালের বিভিন্ন ভাবের রূপ হতে পারতো, কিন্তু সংস্কৃতে শুধু বর্তমান কাল এবং কখনো কখনো সামান্য অতীতের ভাবান্তর হয়।

৭. বৈদিকে বহু বিচিত্র উপায়েই নামধাতু গঠন করা হ'তো, স্বরান্ত শব্দে যেমন হ'তো, ব্যঞ্জনান্ত শব্দেও তেমনি হ'তো। এমন কি, এমন অনেক নামধাতু পাওয়া যায়, যার নাম কিংবা শব্দমূলের কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। পক্ষান্তরে সংস্কৃতে প্রধানতঃ 'অ'-যুক্ত পদেই এর ব্যবহার প্রায় সীমাবদ্ধ।

৮. বৈদিকে ক্তবাচ্-ল্যপ্, তুম্-তবৈ, ত্বায়-ত্বী,. ত্বীনম্ প্রভৃতি অসমাপিকা পদের এবং শতৃ-শানচ্, ক্বসু-কানচ্, স্যতৃ-স্যমান প্রভৃতি ক্রিয়াজাত বিশেষণের বহুল প্রয়োগ ছিল, সংস্কৃতে এই বাহুল্য কমে গিয়ে অল্প কয়েকটিতে পর্যবসিত হ'য়েছে।

৯. বৈদিকে কয়েকটি উপসর্গের স্বাধীন এবং স্বতন্ত্র ব্যবহার ছিল, সংস্কৃতে এদের প্রায় সব কটিই শব্দের আগে যুক্ত হয়, শুধু 'আ, অনু, প্রতি' প্রভৃতি ক্বচিৎ পরসর্গরূপে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

১০. বৈদিকে দু'য়ের অধিক পদে সমাস হ'তো না, সংস্কৃতে বহুপদী সমাসের ব্যবহার যথেষ্ট।

১১. অতীতকালে সমাপিকা ক্রিয়ার অর্থে 'ক্তবতু' প্রত্যয়ের প্রয়োগ সংস্কৃতে নোতুন এসেছে, বৈদিকে ছিল না।

১২. বৈদিকে ছিল না এমন বহু শব্দ এবং ধাতু সংস্কৃত ভাষায় গৃহীত হয়েছে, এবং বৈদিকের বিপুল শব্দভাণ্ডারের একটা বড় অংশ সংস্কৃতে পরিত্যক্ত হয়েছে। বৈদিকে আদি আর্যভাষার এবং আর্যভাষারও বেশ কিছু শব্দ বর্তমান ছিল, সংস্কৃতে এরকম বহু শব্দই বর্জিত হ'য়েছে।—'অম' (=শক্তি, আবেস্তায় 'অম'), 'আপি' (=বন্ধু). 'তিতউ' (=ছাকনি), 'দম' (=গৃহ ; ইংরেজি—domestic, রুশ 'দোম্), 'রোদসী' (=স্বর্গ ও পৃথিবী) প্রভৃতি। বৈদিকে কিছু

কিছু সমরূপ শব্দ পৃথক্ পৃথক্ অর্থে ব্যবহৃত হ'তো, সংস্কৃতে তাদের একটি প্রচলিত আছে, অপরটি পরিত্যক্ত হয়েছে। যেমন—'অরি' (মহৎ), 'পরুষ' (=হাল্কা ধূসর বর্ণ), 'অসুর' (প্রভু), প্রভৃতি ; অবশ্য এদের অপর অর্থটি প্রচলিত আছে।

১৭. বেদের প্রাচীন স্তরে যৌগিক ক্রিয়ার (periphrastic verb) ব্যবহার দেখা যায় না। সংস্কৃতে এর বহুল ব্যবহার।

১৮. বৈদিকে ছন্দ সম্পূর্ণই অক্ষরমূলক, সংস্কৃতে প্রথমে অক্ষর-মূলক হ'লেও পরে মাত্রামূলক ছন্দও ব্যবহৃত হ'তে থাকে।

(গ) প্রাচীন ভারতীয় আঞ্চলিক উপভাষা

কয়েক শতাব্দীব্যাপী (খ্রী' পূ. পঞ্চদশ থেকে খ্রী' পূ. ষষ্ঠ) প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার বিস্তৃতিকাল। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চল থেকে আরম্ভ ক'রে গঙ্গা যেখানে দাক্ষিণবাহিনী হয়েছে, সম্ভবতঃ সেই পর্যন্ত আর্যবসতিরও বিস্তার ঘটেছিল সে যুগে। অতএব দীর্ঘ কাল ও স্থানের ব্যবধানে ভাষার যে পরিবর্তন ঘট্‌বে, এটাই একান্ত স্বাভাবিক। এই হিশেবে প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার কয়েকটি উপভাষাই ছিল কাঙ্ক্ষিত। কিন্তু 'বৈদিক সাহিত্য' এবং 'সংস্কৃত সাহিত্য'—উভয় সাহিত্যের ভাষাই কথ্যভাষার মার্জনা ও সংস্কার সাধন দ্বারা সৃষ্ট হ'য়েছিল বলেই আমরা তৎকালীন ঔপভাষিক নিদর্শন থেকে বঞ্চিত হ'য়েছি। তা' সত্ত্বেও প্রাচীন বৈদিক ভাষার সঙ্গে অর্বাচীন বৈদিক ভাষার এবং সংস্কৃত ভাষার পার্থক্য এবং অপর কতকগুলো পরোক্ষ প্রমাণ থেকে প্রায় নিশ্চিতভাবেই অনুমান করা চলে যে সেই প্রাচীন যুগে ভারতীয় আর্যভাষার অন্ততঃ তিনটি উপভাষারূপ প্রচলিত ছিল। এদের বলা চলে—১. উদীচ্যা, ২. মধ্যদেশীয়া, ৩. প্রাচ্যা।

পঞ্চনদীর কূলেই আর্যগণ প্রথম বসতি স্থাপন করলেও তাঁরা যে ক্রমশঃ গঙ্গা-যমুনার উভয় কূল অবলম্বন করে ক্রমশঃ পূর্বদিকে অগ্রসর হচ্ছিলেন, তার প্রমাণ তাঁরাই উপনিষদ্‌-আদি গ্রন্থে লিখে রেখে গেছেন। আর্যদের পূর্বে পঞ্চনদী তথা সপ্তসিন্ধুর কূলে বিরাট্ সভ্যতার সৃষ্টি করেছিল দ্রাবিড় জাতি অথবা আর্যদেরই একটি প্রাচীন গোষ্ঠী তথা আল্পীয় আর্যগণ ; মধ্যদেশে বসবাস ছিল প্রধানতঃ অস্ট্রীক বা নিষাদ জাতির এবং পূর্বাঞ্চলে বাস করতো কিরাত বা ভোট-বর্মী জাতি। বৈদিক আর্যগণ কোন কোন ক্ষেত্রে তাদের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হ'লেও যে কালে কালে পারস্পরিক মিশ্রণের ফলে একটা সমন্বয়প্রাপ্ত ভারতীয় জাতির সৃষ্টি হয়েছিল, তার প্রমাণ রয়েছে আমাদের ভাষায়, সংস্কৃতিতে, দেহের আকৃতিতে, গাত্রবর্ণে, আমাদের রক্তে। আমাদের

প্রাচীন সাহিত্যেও এর স্বীকৃতি রয়েছে। কাজেই ভারতের তিন অঞ্চলে, ভিন্ন ভিন্ন তিন ভাষাভাষী জাতির সহস্র বৎসরের মেলামেশার ফলে ভাষাগত দিক্ থেকে তিনটি পৃথক্ ধারারও সৃষ্টি হ'বে, এও অত্যন্ত সহজ স্বাভাবিক ব্যাপার।

উদীচ্য—ভারতের উত্তরাঞ্চল, যেখানে বৈদিক সভ্যতার পত্তন, সেখানকার লোকভাষাকেই 'উদীচ্য' বলা হয়। এই প্রাচীন উদীচ্যারই সাহিত্যিক রূপের সন্ধান পাওয়া যায় বৈদিক সাহিত্যের প্রাচীনতর অংশে, অর্থাৎ চার সংহিতা এবং সম্ভবতঃ ব্রাহ্মণ সাহিত্যের গোড়ার দিকে : মুখের ভাষা উদীচ্যার বিবর্তিত রূপ, তথা অর্বাচীন উদীচ্যার সাহিত্যিক রূপ রক্ষিত হয়েছে নবীনতর বৈদিক সাহিত্যে অর্থাৎ উপনিষদে। উদীচ্যার যে পৃথক্ ভাষারূপ সেকালেই বর্তমান ছিল, তার সাক্ষ্য পাওয়া যায় কৌষীতকী ব্রাহ্মণে। সেখানে উদীচ্যার ভাষাকে 'প্রজ্ঞাততর' বলে অভিহিত করা হয়েছে এবং এই সঙ্গেই অপর একটি ভাষার অস্তিত্বকেও স্বীকার করতে হ'চ্ছে ; সম্ভবতঃ সেই অপর ভাষাটিই ছিল মধ্যদেশীয়া।

মধ্যদেশীয়া—মধ্যদেশীয়া নামে কোন ভাষার উল্লেখ না থাক্‌লেও মনে হয়, এই ভাষাকেই মূল ভাষা বলে গ্রহণ করা হয়েছিল এবং এইজন্যই এর পৃথক্ নামকরণের প্রয়োজন ছিল না। আর্যগণ উত্তরাঞ্চল থেকে ক্রমশঃ পূর্বাঞ্চলের দিকে সরে আসেন ; গঙ্গার উর্বর কূলের প্রাকৃতিক পরিবেশ সম্ভবতঃ তাঁদের নিকট উত্তরাঞ্চল থেকে আবেদনপূর্ণ মনে হওয়ায় ক্রমশঃ তাঁরা এই অঞ্চলের উপরই অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করেন এবং এই অঞ্চলটিই তাঁদের সভ্যতা-সংস্কৃতির কেন্দ্রভূমি হ'য়ে দাঁড়ায়। কালাতি-ক্রমণে এবং স্থানীয় প্রভাবে এখানকার ভাষা উত্তরাঞ্চলের ভাষা থেকে অনেকটা পৃথক্ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এখানকার অর্থাৎ মধ্যদেশীয় কথ্যভাষার সংস্কার সাধন করেই সম্ভবতঃ সৃষ্টি হ'য়েছিল সাহিত্যিক ভাষা সংস্কৃতের। এর সমর্থনে একটা বড় যুক্তি আছে। সংস্কৃত ব্যাকরণের মূল পুরুষ মহামুনি পাণিনি উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে জন্মগ্রহণ করলেও তাঁর কর্মক্ষেত্র ছিল মধ্যদেশ পাটলিপুত্রে। বিশেষতঃ, তিনি তাঁর মহাগ্রন্থ 'অষ্টধ্যায়ী'তে ভাষার ব্যতিক্রমরূপে যখন 'উদীচাম্' বা 'প্রাচাম্' বলে উল্লেখ করেছেন, তখনি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা চলে যে তিনি যে ভাষায় এবং যে ভাষার ব্যাকরণ লিখছেন, সেটা উদীচ্যাও নয় প্রাচ্যাও নয়, তদতিরিক্ত অপর কোন ভাষা। অতএব নিঃসন্দেহে অনুমান করা চলে, এই ভাষা ছিল মধ্যদেশীয়া। উপনিষদ্ আলোচনার কেন্দ্রভূমি ছিল মধ্যদেশ, এই কারণেই মধ্যদেশীয়া সাহিত্যিক ভাষা সংস্কৃতের সঙ্গে উপনিষদের ভাষার অনেক সাদৃশ্য।

প্রাচ্যা—পূর্বাঞ্চলের কথ্যভাষা প্রাচ্যা, এর কোন সাহিত্যিক রূপ না পাওয়া গেলেও

প্রাচ্যার অস্তিত্ব সম্বন্ধে সংশয় প্রকাশের কোন অবকাশ নেই। পূর্বাঞ্চল অনার্য-অধ্যুষিত ছিল, সেখানকার লোকেরা 'আসুরী ভাষা'য় কথা বলতো—তারা ব্রাত্য ছিল—অদীক্ষিত হ'য়েও দীক্ষিতের মত কথা বলতো, 'হে অরয়'-স্থলে 'হেলবো' বা 'হেলয়' উচ্চারণ করতো—প্রাচ্যার এ সমস্ত পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে শতপথ ব্রাহ্মণ, তাণ্ড্যব্রাহ্মণ এবং পতঞ্জলির মহাভাষ্যের মতো অতিশয় প্রাচীন ও গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থগুলোতে। প্রাচ্যার ভাষা অপর ভাষাভাষীদের নিকট অশুদ্ধ বিবেচিত হ'তো, কারণ এখানে বাস করতো মিশ্র জাতি, তাদের ভাষা তো বিকৃত হ'বেই। তবে এই বিকৃত প্রাচ্য ভাষারও প্রভাব যে অনেক সাহিত্যে, এমন কি সম্ভবতঃ বেদেও পড়েছিল, এরকম অনুমান করা চলে। প্রাচ্যার একটি বৈশিষ্ট্য ছিল—'র' স্থলে 'ল'-এর ব্যবহার—রোহিত>লোহিত। এরূপ ব্যবহার অধিকাংশ গ্রন্থেই পাওয়া যায়। বেদে বা সংস্কৃতে না থাকলেও মূল আর্যভাষার কিছু কিছু শব্দ পরবর্তী স্তরে বজায় রয়েছে। অনুমান করা চলে যে, উদীচ্যা বা মধ্যদেশীয়ায় নয়, প্রাচ্যাতেই এগুলো ধারাবাহিক-ক্রমে চলে আসায় এখনো শব্দগুলো বেঁচে বর্তে আছে। বাংলায় 'আছে' শব্দটির সংস্কৃত হওয়া উচিত ছিল 'অচ্ছতি', কিন্তু সংস্কৃতে নেই; অথচ গ্রীক ভাষায় এর অনুরূপ শব্দ বর্তমান থাকায় ('গ্রীক esketi) এবং প্রাকৃতেও থাকায় ('অচ্ছই')—অনুমান করা যায় যে, মূল ভাষায়ও শব্দটি ছিল (*'অচ্ছতি')। বৌদ্ধসংস্কৃত এবং পরবর্তী প্রাকৃতে এরূপ প্রচুর শব্দের সন্ধান মেলে, একমাত্র প্রাচ্য ভাষার স্বীকৃতি দ্বারাই যাদের অস্তিত্ব-সমস্যার সমাধান করা চলে। অতএব প্রাচীন ভারতীয় আর্য-ভাষার তৃতীয় উপভাষা প্রাচ্যার অস্তিত্বও স্বীকার করতে হয়।
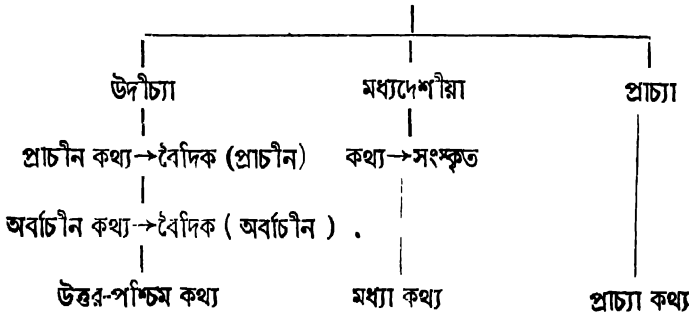
[দুই] মধ্যভারতীয় আর্যভাষা
(Middle Indo-Aryan Languages)

প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার কথ্যরূপগুলো ক্রমশঃ মধ্যভারতীয় আর্যভাষায় রূপান্তরিত হ'লো। ভাষার স্বাভাবিক প্রবণতা-বশেই প্রা' ভা' আ' ভাষা কালক্রমে মধ্যভারতীয় আর্যভাষায় রূপান্তরিত হ'লেও সম্ভবতঃ বুদ্ধদেবই মধ্যভারতীয় আর্য-ভাষার বিকাশের ব্যাপারে এক বিরাট ভূমিকা গ্রহণ করছিলেন। সেকালের ভাষা বৈদিক তথা 'ছান্দস' থেকে ক্রমশঃ দূরে সরে যাচ্ছিল বলে তাঁর শিষ্যেরা যখন ভাবছিলেন, কীভাবে সেই ভাষাকে বৈদিক ভাষায় পরিবর্তিত করবেন, তখন বুদ্ধদেব তাদের নির্দেশ দিয়েছিলেন—'ন ভিক্খবে বুদ্ধবচনং ছন্দসো আরোপেতব্বং… অনুজানামি ভিক্খবে সকায় নিরুত্তিয়া বুদ্ধবচনং পরিয়া পুণিতুন্তি'—অর্থাৎ 'ভিক্ষুগণ বুদ্ধবচনকে ছন্দে আরোপ করা উচিত নয়…আমি এই অনুজ্ঞা দিচ্ছি যে বুদ্ধবচনকে নিজের ভাষাতেই গ্রহণ করবে।' বস্তুতঃ বুদ্ধদেবের এই নির্দেশের ফলেই বৌদ্ধগণ ধর্মদেশনা এবং বুদ্ধের বাণী প্রচার করবার জন্য তৎকাল-প্রচলিত লোকভাষা তথা মধ্যভারতীয় আর্যভাষাকেই সাদরে গ্রহণ করলো। তদবধি এই ভাষার জয়জয়কার। এখানে একটু সমস্যা দেখা দিয়েছে। বুদ্ধদেব যে 'সকায় নিরুত্তিয়া' অর্থাৎ 'নিজের ভাষার' কথা বলেছেন, সেটি কার নিজের? বুদ্ধদেবের নিজের ভাষা অথবা ভিক্ষুদের নিজের ভাষা? যাহোক, বুদ্ধবচন-রূপে এবং ধর্মদেশনারূপেই হোক অথবা বুদ্ধ-ভক্তদের দ্বারা রচিত সাহিত্য-রূপেই হোক, ভাষারূপ সর্বত্র এক হওয়াতে বিশ্বাস করতে হয় যে বৌদ্ধদের যাবতীয় সাহিত্যই অনুমিত বুদ্ধদেবের ভাষায় রচিত হ'য়েছিল। অবশ্য পরবর্তী বৌদ্ধসাহিত্যে ভাষাগত কিছু বৈলক্ষণ্য-দৃষ্টে অনেকে অনুমান করেন, বুদ্ধ-শিষ্যগণ নিজেদের ভাষাই ব্যবহার করেছেন। এ বিষয়ে সর্বজনসম্মত কোন সিদ্ধান্ত নেই।

প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষাকে যেমন সাধারণভাবে 'সংস্কৃত' নামে অভিহিত করা হয়, তেমনি মধ্যভারতীয় আর্যভাষার প্রচলিত নাম 'প্রাকৃত'। অতি সুদীর্ঘকাল এই প্রাকৃত ভাষার স্থায়িত্ব, অতএব কাল-ব্যবধানে ভাষার মধ্যেও বিস্তর বৈচিত্র্য সৃষ্টি হয়েছিল। এই ভাষাগত বৈচিত্র্যের পরিপ্রেক্ষিতেই মধ্যভারতীয় আর্যভাষার তিনটি যুগ (একটি যুগসন্ধিকালসহ) কল্পিত হয়েছে। মধ্যভারতীয় আর্যভাষার ব্যাপ্তিকাল খ্রীঃ পূঃ ষষ্ঠ শতক থেকে খ্রীঃ দশম শতক পর্যন্ত। যুগবিভাগ এরূপ ঃ (১) আদি স্তর (আ' খ্রীঃ পূঃ ৬০০—খ্রীঃ পূঃ ২০০ অব্দ); (২) যুগসন্ধিকাল বা ক্রান্তিকাল (আ' খ্রীঃ পূঃ ২০০—খ্রীঃ ২০০ অব্দ); (৩) মধ্যস্তর (আ' ২০০ খ্রীঃ—

৬০০ খ্রীঃ); অন্ত্যস্তর (৬০০ খ্রীঃ—১০০০ খ্রীঃ)। আদিস্তরে ভাষার সাধারণ প্রচলিত নাম 'প্রাচীন প্রাকৃত' ও 'পালি'; দ্বিতীয় স্তরে ভাষা 'সাহিত্যিক প্রাকৃত' এবং তৃতীয় স্তরে ভাষা 'অপভ্রংশ' ও 'অবহট্‌ঠ' নামে পরিচিত।

একটি সাধারণ নামে পরিচিত হ'লেও প্রকৃতপক্ষে তিন স্তরে ভাষায় বিস্তর ব্যবধান। তৎসত্ত্বেও মধ্যভারতীয় আর্যভাষা তথা প্রাকৃতের নিম্নোক্ত সাধারণ লক্ষণগুলোর জন্যই বিচিত্র ভাষাপরিবারকে একই সংজ্ঞার অধীনে আনা হয়েছে।

(ক) মধ্যভারতীয় আর্যভাষা বা প্রাকৃতের সাধারণ লক্ষণ

প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা তথা সংস্কৃত ভাষা মধ্য ভারতীয় স্তরে অর্থাৎ প্রাকৃতে রূপান্তরিত হলে তার মধ্যে যে পরিবর্তন দেখা যায়, তাকে তিনদিক্ থেকেই বিচার করা চলে: ধ্বনিগত, রূপগত এবং পদগতভাবে।

ধ্বনিগত পরিবর্তন:

১. 'ঌ' ধ্বনিটির ব্যবহার সংস্কৃতেও ছিল সীমাবদ্ধ, প্রাকৃতে 'ঌ'-কারের সঙ্গে সঙ্গে 'ঋ'-কারও সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত হ'লো। ঋ-কার স্থলে অপর কোন একক স্বর অথবা র-যুক্ত স্বর ব্যবহৃত হ'তো। যথা—মৃগ>মগ, মিগ, মুগ, ম্রিগ, ম্রুগ; মুঅ, মিঅ। বৃক্ষ>রুক্খ, রুচ্ছ, লুচ্ছ, ব্রচ্ছ, ব্রুচ্ছ। ঋষি>ইসি।

২. 'ঐ'কার এবং 'ঔ'কার-স্থলে প্রাকৃতে যথাক্রমে 'এ'-কার এবং 'ও'কার হতো। যথ—তৈল>তেল, তেল্ল; বৈদ্য>বেজ্জ। পৌর>পোর; কৌমুদী>কোমুই, কোমুদী।

৩. 'অয়্' এবং 'অব্' যথাক্রমে 'এ' এবং 'ও'-তে পরিণত। কথয়তু<কথেতু; পূজয়তি>পূজেতি, পুজেই। ভবতি>ভোদি, হোতি, হোই; লবণ>লোণ।

৪. যুগ্ম ব্যঞ্জনের পূর্বস্থিত হ্রস্ব 'এ', 'ও' (ĕ, ŏ)--ধ্বনির নোতুন আবির্ভাব ঘটে প্রাকৃতের যুগে।

৫. যুক্ত ব্যঞ্জনের এবং পদান্ত অনুস্বারের পূর্বস্থিত দীর্ঘস্বরের হ্রস্বতাপ্রাপ্তি। যথা—মার্জার>মজ্জার, কান্তাম্>কন্তং।

৬. পদান্তে 'ম্'-জাত এবং ক্বচিৎ 'ন্'-জাত অনুস্বার ছাড়া অপর সকল ব্যঞ্জন ধ্বনির লোপ। যথা—নরান্>নরা, পুত্রাৎ>পুত্তা।

৭. পদান্তস্থিত বিসর্গ-স্থানে 'এ' বা 'ও' হতো অথবা বিসর্গ লোপ পেতো। যথা—জনঃ>জন, জনে, জনো; মুনিঃ>মুনি।

৮. তিনটি শিস্‌ধ্বনির মধ্যে মাগধীতে 'শ', অন্যত্র 'স' বর্তমান রইলো। যথা—দ্বাদশ>দুবাদস ; তিষ্ঠন্ত>তিসঠন্তো, তিট্ঠন্ত ; সুতনুকা>শুতনুকা।

৯. দন্ত্যবর্ণের স্বতঃস্ফূর্তভাবে অথবা 'ঋ, র, শ, ষ'-যোগে মূর্ধন্যীভবন। যথা—বিকৃত>বিকট ; দ্বাদশ>দুবাডস।

১০. পদের আদিতে যুক্তব্যঞ্জন বিশ্লিষ্ট অথবা একক ব্যঞ্জনে পরিণত হয়েছে এবং পদ-মধ্যে বিশ্লিষ্ট অথবা সমীভূত হ'য়ে যুগ্মব্যঞ্জনে পরিণত হয়েছে। যথা—দ্বাদশ>দুবাদস ; ত্রীনি>তিন্নি ; কল্যাণম্>কল্লাণং ; ব্রাহ্মণ>ব্রহ্মণ, বম্বন।

১১. আদিযুগের পরবর্তীকালে পদমধ্যস্থ একক ব্যঞ্জন অল্পপ্রাণ হ'লে লুপ্ত হয়েছে, মহাপ্রাণ হ'লে 'হ্'-কারে পরিণত হ'য়েছে। যথা—লোক>লোঅ, হৃদয়>হিঅঅ ; লঘু>লহু, শেফালিকা>সেফালিকা>সেহালিআ। কিন্তু অনেক সময় সংস্কৃত 'ট'-বর্গের ও 'প'-বর্গের প্রথম দু'টি বর্ণ যথাক্রমে তৃতীয় ও চতুর্থ বর্ণে পরিণত হয়েছে। যথা—পঠতি>পঢই ; কোপ>কোব।

১২. কোন কোন উপভাষায় কিছু কিছু বিচিত্র ব্যবহার রয়েছে, সেগুলোকে সাধারণ লক্ষণের অন্তর্ভুক্ত করা চলে না।

রূপগত পরিবর্তন

১. পদান্তস্থিত ব্যঞ্জন লোপের ফলে প্রায় সব ব্যঞ্জনান্ত শব্দই স্বরান্ত শব্দে পরিণত হয়েছে এবং তাদের অধিকাংশের রূপ ছিল 'অ'-কারান্ত শব্দের মত। কর্মণে>কম্মায়। তবে অ-কারান্ত, ই-কারান্ত এবং উ-কারান্ত রূপও বজায় ছিল। যথা—মহিলাঃ<মহিডায়ো।

২. দ্বিবচন লুপ্ত হ'লো, তৎস্থলে বহুবচন ব্যবহৃত হতো।

৩. অন্ত্যবঞ্জনধ্বনির বিলোপসাধনের ফলে প্রথমা ও দ্বিতীয়া বিভক্তির বহুবচনে পুংলিঙ্গ ও ক্লীবলিঙ্গের ভেদ রইলো না। যথা—ফলানি>ফলা, নরাঃ, নরান্>ণরা। পুংলিঙ্গের দ্বিতীয়ার বহুবচন-স্থলে প্রথমার বহুবচন অথবা ক্লীবলিঙ্গের ১মা/২য়ার বহুবচন যুক্ত হ'তো। যথা—প্রাণাঃ>পাণানি, প্রণানি। পঞ্চমীর একবচনে 'তস্' প্রত্যয় যুক্ত হতো এবং সপ্তমীর একবচনে সর্বনামের 'স্মিন্' বিভক্তি প্রায় নির্বিশেষে ব্যবহৃত হতো।

৪. সর্বনামের প্রথমার বহুবচনের 'এ' বিভক্তি দ্বিতীয়ার বহুবচনেও ব্যবহৃত হ'তো। '—ভিস্'-জাত 'হি' বিভক্তির তৃতীয়ার সঙ্গে সঙ্গে চতুর্থী এবং পঞ্চমীতেও ব্যবহার ছিল।

৫. ধাতুরূপে সংস্কৃতের যে বৈচিত্র্য ছিল, প্রাকৃতে তার অধিকাংশই লোপ পেল। আত্মনেপদ পরস্মৈপদে পরিণত হলো এবং দশটি গণের মধ্যে ভ্বাদিগণই বজায় রইল। অতীতকালের ক্রিয়ারূপে লিট্-এর আর অস্তিত্ব রইলো না ; লঙ্ এবং লুঙ একসঙ্গে মিশে গেল। অসমাপিকা ক্রিয়ার বৈচিত্র্য হ্রাস পেলো। বর্তমান কালের নির্দেশক (লট্), অনুজ্ঞা (লোট্), সম্ভাবক (বিধিলিঙ্) এবং ভবিষ্যৎ কালের (লৃট্) শুধু বেঁচে রইলো। নিষ্ঠান্ত (ক্ত-প্রত্যয়ান্ত) পদকে অতীতকালের অর্থে সমাপিকা ক্রিয়ারূপে ব্যবহার করা হ'তো।

পদগত পরিবর্তন :

১। পদ-গঠন নাম-মূলক (nominal), ক্রিয়ামূলক (verbal) নয়।

২। অধিকাংশ বিভক্তি লোপ পাবার ফলে বিভিন্ন শব্দকে অনুসর্গ (post-position)-রূপে ব্যবহার করা হ'তো।

৩। বিভক্তি লোপের ফলে পদস্থাপনরীতিতে কঠোরতা এলো।

(খ) মধ্যভারতীয় আর্যভাষার আদিযুগ

মধ্যভারতীয় আর্যভাষার আদিযুগের সীমাকাল খ্রীঃ পূঃ ৬০০ থেকে ২০০ খ্রীঃ পর্যন্ত। এই পর্যায়ের ভাষার নিদর্শন পাওয়া যায় হীনযানী বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের ব্যবহৃত পালি ভাষায় এবং অশোকের ও খ্রীঃ পূঃ শতাব্দীর বিভিন্ন শিলালিপিতে।

১. পালিভাষা

হীনযানী বৌদ্ধগণ বুদ্ধদেবের নির্দেশমতো 'সকায় নিরুত্তিয়া' (=স্বকীয় নিরুক্ত্যা) অর্থাৎ নিজের ভাষায় ধর্মদেশনা ও বুদ্ধের বাণী প্রচার করেন। এই ভাষাকে বলা হয় 'পালিভাষা'। অবশ্য পালি যে কোন বিশেষ অঞ্চলের কথ্যভাষা ছিল, তা' নয়। পালিও একপ্রকার মার্জিত সাহিত্যিক ভাষা। কিন্তু কোন্ প্রাকৃত ভাষার আধারে এই সাধু রীতিটি গৃহীত হ'য়েছিল, সে-সম্বন্ধে নিশ্চিতভাবে কিছু বলা সম্ভব নয়—কারণ এ বিষয়ে মতান্তর বিদ্যমান। কেউ কেউ অনুমান করেন, বুদ্ধদেব যেহেতু মগধের অধিবাসী ছিলেন, অতএব তাঁর মাতৃভাষা মাগধী প্রাকৃতকে ভিত্তি করেই পালি ভাষা গড়ে উঠেছে। অর্ধমাগধী থেকে পালি-ভাষার উৎপত্তির কথাও অনেকে বলে থাকেন। আবার ভাষাগত সাদৃশ্য লক্ষ্য করে কেউ কেউ মনে করেন যে দক্ষিণ পশ্চিমা ও প্রাচ্যমধ্যার মিলনেই পালিভাষার উদ্ভব। যাই হোক, পালিভাষার বিশিষ্ট লক্ষণগুলোর মধ্যে একটা প্রধান লক্ষণ এই যে,

প্রাকৃতের বিভিন্ন স্তরে যেমন পদমধ্যস্থ অল্পপ্রাণবর্ণের লোপ এবং মহাপ্রাণবর্ণের 'হ'-কারে রূপান্তর ঘটতো, সেই ভাষাতাত্ত্বিক পরিবর্তন পালিতে দেখা যায়নি।

পালিভাষায় রচিত নিদর্শনের মধ্যে আমরা পাই বিভিন্ন বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্র,—এদের মধ্যে 'ত্রিপিটকে'র নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এছাড়া বুদ্ধদেবের পূর্ব জীবনের কাহিনী-অবলম্বনে রচিত 'জাতকে'র ভাষাও পালি।

পালি ভাষার বৈশিষ্ট্য ঃ মধ্যভারতীয় আর্যভাষারই একটি বিশিষ্ট রূপ হিসেবে পালিও সাধারণভাবে উক্ত ভাষার লক্ষণসমূহের অধিকারী ; কিন্তু একটি বিশেষ কালে এবং একটি বিশেষ ধর্মীয় গোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল বলে পালির মধ্যে কিছু বিশিষ্ট লক্ষণও দেখা দিয়েছে। প্রধান লক্ষণগুলি নিম্নে প্রদত্ত হ'লো।

সাধারণ প্রাকৃতের মতোই পালিতেও অ, আ, ই, ঈ, উ, ঊ এবং হ্রস্ব ও দীর্ঘ রূপে 'এ' 'ও' বর্তমান ছিল। 'ঋ' পালিতে অপর কোন হ্রস্ব স্বরে কিংবা 'রি'-তে পরিবর্তিত (কৃত>কত, ঋণ>ইন, পৃচ্ছতি পুচ্ছতি) এবং 'ঐ' ও 'ঔ' যথাক্রমে 'এ' ও 'ও'-তে পরিণত হয়েছে (বৈদ্য>বেজ্জ, পৌর>পোর)। 'অয়' 'অব' যথাক্রমে 'এ' 'ও' তে রূপে পরিবর্তিত, কচিৎ অপরিবর্তিত রয়েছে।

ব্যঞ্জনধ্বনিগুলি মোটামুটি অব্যাহত থাকলেও 'শ, 'ষ'-স্থলে 'স' এবং মূর্ধন্য ল়-এর বিদ্যমানতা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পদমধ্যস্থ অল্পপ্রাণ ধ্বনি প্রাকৃতে লুপ্ত এবং মহাপ্রাণ ধ্বনি 'হ'-কারে পরিণত হলেও পালিতে সাধারণতঃ অপরিবর্তিত। পালিতে কচিৎ সংস্কৃত অপেক্ষাও প্রাচীনতর রূপ দেখা যায় (ইহ>ইধ)।

পদান্তে-'অ' স্থলে 'ও' এবং অনুনাসিক ব্যঞ্জনের স্থলে '—ং' ব্যবহৃত হয় (পুরুষঃ>পুরিসো, দেবম্>দেবং)।

পালিতে পদমধ্যস্থ যুক্তব্যঞ্জন সমীভূত হ'য়ে যুগ্ম ব্যঞ্জনে পরিণত হ'য়েছে এবং পূর্ববর্তী দীর্ঘস্বর হ্রস্ব হয়েছে (কাশ্মীর>কস্মীর, গ্রীষ্ম>গিম্হ, রাজ্ঞা<রঞ্ঞ, আশ্চর্য<অচ্ছের, অচ্ছরিয়, অক্ষি>অক্খি, অচ্ছি)

বিভিন্ন সূত্রে ধ্বনি-পরিবর্তনও যথেষ্ট হয়—স্বরভক্তি (কৃষ্ণ>কসিন্), অপিনিহিতি (আশ্চর্য<অচ্ছরিয়), স্বতোনাসিক্যীভবন (মৎকুণ>মংকুণ), বর্ণলোপ (অপি> পি, উদক>ওক), সমাক্ষর লোপ, বর্ণবিপর্যয় (হ্রদ>দহ), বিষমীভবন (পিপীলিকা>কিপিল্লিকা), মূর্ধন্যীভবন (প্রতি>পটি), সমীভবন (ইক্ষু> উচ্ছু), মহাপ্রাণতা (কুব্জ>খুজ্জ) প্রভৃতি ছাড়া আরো রয়েছে। স্বরসন্ধি আবশ্যিক ছিল না, কখনো পূর্বস্বর বর্তমান থাকতো।

অপরাপর ক্ষেত্রে পালির আচরণ সাধারণ প্রাকৃতের মতোই, একজাতীয় প্রাকৃতের সঙ্গে অপরজাতীয় প্রাকৃতের যেমন পার্থক্য, তেমনি পালির সঙ্গেও অপরাপর প্রাকৃতের কোন কোন ক্ষেত্রে পার্থক্য এবং কখনো বা সাধর্ম্য দেখা যায়। পালির সাধারণ লক্ষণ এই: শব্দরূপে বিশেষ বৈচিত্র্য ছিল না, পদান্ত ব্যঞ্জনের লোপে স্বরান্ত শব্দগুলিও অ-কারান্ত শব্দের প্রভাবাধীন ছিল। লিঙ্গ-পার্থক্য সুস্পষ্ট নয়, ক্লীবলিঙ্গও পুংলিঙ্গের বিভক্তি গ্রহণ করেছে। দ্বিবচন লোপ পেয়েছে। আত্মনেপদ প্রায় লোপ পেয়েছে, ক্রিয়ার কাল-সংখ্যা কমে গেছে। পালিস্তরেই 'তুমর্থক' এবং 'ল্যবর্থক' অসমাপিকা ক্রিয়ার মিশ্রণ দেখা দিয়েছে।

২. প্রাচীন প্রাকৃত

প্রাচীন প্রাকৃত বলতে বোঝায় প্রধানতঃ খ্রীঃ পূঃ শতাব্দীতে রচিত বিভিন্ন শিলালিপির ভাষা। এদের মধ্যে আছে (অ) অশোক অনুশাসন, (আ) খারবেল অনুশাসন, (ই) সুতনুকা প্রত্নলেখ, (ঈ) হেলিওদোরের গরুড়স্তম্ভ-লিপি। এ ছাড়া (উ) বৌদ্ধসংস্কৃত বা মিশ্রসংস্কৃত নামে পরিচিত প্রাকৃতমিশ্রিত সংস্কৃত ভাষাকেও এই পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এছাড়াও কিছু শিলালিপি রয়েছে, যেগুলিকে গৌণ বলেই বিবেচনা করা হয়।

(অ) অশোক অনুশাসন

মহামতি অশোক ধর্মীয়, সামাজিক, রাজনৈতিক বা অন্যবিধ প্রয়োজনে আদেশ-নির্দেশবহ যে সকল বাণী বিভিন্ন পৃষ্ঠ-ভূমিতে খোদিত ক'রে তাঁর সাম্রাজ্যের সুবিস্তৃত অঞ্চলে প্রচার করেছিলেন, তা' 'ধর্মলিপি' (ধম্মলিপি, ধম্মদিপি) নামে আখ্যাত হলেও সাধারণভাবে এগুলোকেই 'অশোক অনুশাসন' বলা হয়ে থাকে।

খ্রীঃ পূঃ তৃতীয় শতকে অশোক দেশের সর্বত্র বিভিন্ন পৃষ্ঠপটে—গিরিগাত্রে, স্তম্ভে প্রভৃতিতে—যে সকল অনুশাসন-লিপি খোদাই করিয়েছিলেন, তাদের মধ্যে ভাষাগত পার্থক্য ছিল যথেষ্টই। অশোক যথাসম্ভব বাস্তব বুদ্ধির পরিচয় দিয়ে আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহার করেছিলেন। তার ফলেই আমরা খ্রীঃ পূঃ শতাব্দীতে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত আঞ্চলিক ভাষার পাথুরে প্রমাণ হাতের কাছে পেয়ে যাচ্ছি। এ থেকে তৎকাল-প্রচলিত চারিপ্রকার আঞ্চলিক ভাষার পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে: (১) শাহ্‌বাজগঢ়ী ও মানসেরা অনুশাসনে 'উত্তর-পশ্চিমা', বা 'উদীচ্যা' (২) গিরনার-অনুশাসনে দক্ষিণ-পশ্চিমা, বা প্রতীচ্যা (৩) কালসীতে 'প্রাচ্যমধ্যা' এবং (৪) ধৌলি-জৌগড় অনুশাসনে 'প্রাচ্যা'। উত্তর-পশ্চিমা ভাষার নিদর্শন উৎকীর্ণ হয়েছে খরোষ্ঠী

লিপিতে—এ লিপি ডানদিক থেকে বাঁ দিকে লেখা হয়। অপরগুলো সব ব্রাহ্মী লিপিতে—প্রচলিত বাঁদিক থেকে ডাইনে এবং এ লিপি থেকেই ভারতের সমস্ত লিপি উদ্ভূত হয়েছে। সম্প্রতি আফগানিস্তানের কান্দাহার শহরের নিকট প্রাপ্ত একটি গিরিলিপিতে আরামীয় (Aramic) এবং গ্রীকভাষা ও লিপি ব্যবহৃত হয়েছে। আরামীয় ভাষায় লিখিত অনুশাসন অন্যত্রও পাওয়া গেছে।

মোটামুটি একই বক্তব্য আঞ্চলিক ভাষাভেদে কতখানি পরিবর্তন লাভ করেছে, নিম্নে তার দৃষ্টান্ত দেওয়া হ'লো।

'উদীচ্য' বা উত্তর-পশ্চিমা—(শাহ্‌বাজগঢ়ী)—'সো ইদনি যদ অয় ধ্রমদিপি লিখিত তদ ত্রয়ো রো প্রণ হংঞংতি মজুর দুবি মুগো (একো)।

(মানসেহ্‌রা)—সে ইদনি অয়ি ধ্রমদিপি লিখিত তদ তিনি য়েব প্রণনি অরভিয়ংতি দুবে মজুর একে মৃগে।

'প্রতীচ্য' বা দক্ষিণ-পশ্চিমা—সে অজ য়দা অয়ম্ ধংমলিপী লিখিতা তী এব প্রাণা আরভরে.সুপাথায় দ্বো মোরা একো মগো।

'মধ্যপ্রাচ্য'—সে ইদানি য়দা ইয়ং ধংমলিপি লেখিতা তদা তিংনি য়েব পাণানি আলভিয়ংতি দুবে মজুলা একে মিগে।

'প্রাচ্য'—সে অজ অদা ইয়ং ধংমলিপী লিখিতা তিংনি য়েব পাণানি আলভিয়ংতি দুবে মজুলা একে মিগে।

অর্থ—[এখন যখন এই ধর্মলিপি লিখিত হচ্ছে, তখন তিনটি প্রাণী হত্যা করা হ'চ্ছে—দুটি ময়ূর একটি মৃগ।]

অশোক-অনুশাসনে ব্যবহৃত আঞ্চলিক রূপের প্রধান ভাষাগত বৈশিষ্ট্য এরূপ ঃ

১. **'উদীচ্য' বা উত্তর-পশ্চিমা**—র্-যুক্ত (প্রিয়) এবং স্-যুক্ত (অস্তি) ব্যঞ্জনের যুক্ত-উচ্চারণ বজায় ছিল। য-ফলাযুক্ত ব্যঞ্জন (কল্যাণম্) সমীভূত হ'তো (কল্যাণং>কল্লাণং>কলণং), 'শ'-কার এবং 'ষ'-কার ক্বচিৎ ব্যবহৃত হতো। 'স্ব' এবং 'স্ম'-স্থলে 'স্প'-এর ব্যবহার ছিল (স্বামিকেন>স্পামিকেন)। উদ্ধৃত দৃষ্টান্তে নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলো পাচ্ছি—ধর্ম>ধ্রম, ময়ূরৌ>মজুর, দ্বৌ>দুবি, দুবে, মৃগঃ>ম্রুগো, মৃগে। খরোষ্ঠী লিপিতে দীর্ঘস্বরের অভাব বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

২. **'প্রতীচ্য' বা দক্ষিণ-পশ্চিমা**—সর্বপ্রকার শিস্‌ধ্বনি শুধু 'স'-য় পরিণত হ'লো এবং 'য'-ফলাযুক্ত ব্যঞ্জন সর্বত্র সমীভূত অর্থাৎ যুগ্ম ব্যঞ্জনে পরিণত হয়েছে। 'ব' এবং 'স'-যুক্ত ব্যঞ্জন ক্বচিৎ বর্তমান। অন্তস্থ 'ব' প্রায়শঃ বর্গীয় 'ব' বা 'প'-রূপ

লাভ করেছে (আত্ম>আৎপ, দ্বাদশ>দুবাদস)। 'অয়্', 'অব্' এবং 'আত্মনেপদে'র ব্যবহার একেবারে লোপ পায়নি। সপ্তমী বিভক্তির চিহ্ন '-স্মিন্' অন্যত্র '-সি' বা '-ম্পি' হলেও এখানে হয়েছে '-ম্হি'। সংস্কৃতের সঙ্গে এই উপভাষারই সর্বাধিক সাদৃশ্য বর্তমান ছিল। উদ্ধৃত দৃষ্টান্ত থেকে নিম্নোক্ত বিশিষ্টতা লক্ষ্য করা যায়ঃ ধর্ম>ধংম, দেবো>দেবা, ময়ূরো>মোরা, মৃগঃ>মগো।

৩. **'প্রাচ্যমধ্যা'**—'র'-এর 'ল'-এ পরিণতি প্রাচ্যমধ্যার বিশিষ্ট লক্ষণ (করোতি> কলেতি)। পদমধ্যস্থ 'ও' এবং পদান্তস্থিত বিসর্গের 'এ'-কারে পরিণতি। 'স'-এর প্রাধান্য থাকলেও 'শ' একেবারে বিলুপ্ত হয়নি। সমীভবন-রীতি প্রায় সার্বিক হয়ে দাঁড়িয়েছে (অস্তি>অথি, অদ্য>অজ্জ, কয্যাণ>কল্যাণ, সত্য>সচ্চ, *দৃক্ষতি> দখতি=দক্খতি)। কখন কখন যুক্ত ব্যঞ্জনের বিশ্লেষ ঘটেছে (কর্তব্য>কটৰিয়, অপত্য>অপতিয়, দ্বাদশ>দুবাদস)। উদ্ধৃত দৃষ্টান্তে আমরা বিশেষত্ব পাচ্ছি— ধর্ম>ধংম, ত্রয়ঃ>তিংনি, প্রাণাঃ>পাণানি. দেবো>দুবে, ময়ূরো>মজুলা, মৃগঃ>মিগে।

৪. **প্রাচ্য**—প্রাচ্যার লক্ষণ অনেকাংশে প্রাচ্যমধ্যার অনুরূপ। 'র'-স্থলে 'ল', শিস্‌বর্ণগুলোর মধ্যে শুধুই 'শ', পদমধ্যে '-ও-'-স্থলে '-এ-' এবং পদান্ত আ-কার-যুক্ত বিসর্গের 'এ'-কারে পরিণতি। 'অহং'-স্থলে 'হকং'-এর প্রয়োগ অন্যতম বৈশিষ্ট্য। উদ্ধৃত উদাহরণে বিশিষ্টতা পাচ্ছি—ধর্ম>ধংম, ত্রয়ো>তিংনি, প্রাণাঃ>পাণানি, দেবো—দুবে, ময়ূরো>মজুলা, মৃগঃ>মিগে।

অশোকের অনুশাসনগুলোকে পৃষ্ঠভূমির উপকরণ-বৈচিত্র্যহেতু নিম্নোক্ত চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়ঃ (১) গিরিলিপি বা প্রস্তরলিপি (Major Rock Edict), (২) ক্ষুদ্র গিরিলিপি (Minor Rock Edict), (৩) স্তম্ভলিপি (Pillar Inscription) এবং (৪) গুহালিপি (Cave Inscription)। গিরিলিপির সংখ্যা চৌদ্দটি, এগুলো দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। ক্ষুদ্র গিরিলিপিগুলো প্রধানতঃ সাম্রাজ্যের মধ্যভাগে এবং দক্ষিণাঞ্চলে কেন্দ্রীভূত। স্তম্ভলিপিগুলোতে মোট ছয়টি অনুশাসন রক্ষিত হয়েছে, এদের পাঠ প্রায় সর্বত্র এক। বিহারের বরাবর পাহাড়ের তিনটি গুহায় অশোক-অনুশাসন উৎকীর্ণ রয়েছে।

(আ) **খারবেল লিপি**—খ্রী. পূ. প্রথম শতাব্দীতে উড়িষ্যার উদয়গিরি পাহাড়ের হাতিগুম্ফায় কলিঙ্গরাজ খারবেল-কৃত অনুশাসন পাওয়া যায়। আশ্চর্যের বিষয়, উড়িষ্যায় প্রাপ্ত অশোক-অনুশাসনের প্রাচ্য ভাষার সঙ্গে এর সাদৃশ্য কম, বরং দক্ষিণ-পশ্চিমা-ভাষার সঙ্গেই এর মিল বেশি। অশোকের গিরনার অনুশাসন এবং পালিভাষার

সঙ্গে এর সাদৃশ্যই বিশেষভাবে লক্ষণীয়। খারবেল-লিপিতে সংস্কৃত পদরীতির প্রভাব তথা সাধুরীতির প্রভাবই লক্ষিত হয়। ভাষার নিদর্শন ঃ 'দুতিয়ে চ বসে অচিতয়িতা সাতকংকিং পছিম দিসং হয়গজনরধবহুলং দংডং পঠাপয়তি।' অর্থাৎ 'দ্বিতীয় বর্ষে সাতকর্ণিকে অগ্রাহ্য ক'রে পশ্চিমদিকে বহু হয়-গজ-নর-রথ-সমেত যুদ্ধযাত্রায় পাঠান।'

(ই) **সুতনুকা (শুতনুকা) লিপি**—উত্তরপ্রদেশের রামগড় পাহাড়ের যোগীমারা গুহায় তিনপংক্তির একটি প্রত্নলিপি পাওয়া গেছে। লিপির প্রথম শব্দটি 'শুতনুকা' (=সুতনুকা)—এ থেকেই লিপির নামকরণ হয়েছে 'শুতনুকা'/ 'সুতনুকা' লিপি। এটা কোন রাজা-রাজড়াদের ব্যাপার নয়, একজন সাধারণ নাগরিক তার কামনা লিপিতে ব্যক্ত করেছে। লিপিটি এই—

শুতনুক নম দেবদশিক্যি
তং কময়িথ বলনশেয়ে
দেবদিনে নম লুপদখে।

অর্থাৎ 'সুতনুকা নামে দেবদাসী, তাকে কামনা করেছিল বারাণসীবাসী দেবদিন্ন (দেবদত্ত ?) নামে রূপদক্ষ।' লিপিটি প্রাচ্য অঞ্চলে অবস্থিত হলেও অশোক-অনুশাসনের প্রাচ্যা থেকে এ ভাষা পৃথক্। পরবর্তী কালের মাগধী প্রাকৃতের কয়েকটি বিশিষ্ট লক্ষণ এখানে উপস্থিত থাকায় এর ভাষাকে 'পূর্বপ্রাচ্যা' নামে অভিহিত করা হয়। বিশিষ্ট লক্ষণগুলো এই ঃ 'ষ, স'-স্থলে 'শ', 'র'-স্থলে 'ল' এবং পুংলিঙ্গ প্রথমার একবচনে 'এ-' বিভক্তির প্রয়োগ। কোন কোন ভাষাবিজ্ঞানী এটিকে 'প্রাচীন মাগধী' রূপে অভিহিত ক'রে থাকেন।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা চলে যে এই ভাষাই রূপান্তর ও ক্রমবিবর্তনের মধ্য দিয়ে বাংলা তথা পূর্বভারতীয় ভাষাগুলোর জন্মদান করেছে, এরূপ অনুমান অতিশয় যুক্তিনির্ভর।

(ঈ) **হেলিওদোরের গরুড়স্তম্ভলিপি**—খ্রী° পূ° শতাব্দীতে ভারতীয় বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত হেলিওদোর (Heliodoros)-নামক একজন যবন (গ্রীক)—পিতা যবনরাজ অন্তলিখিতের (Antialkidas) দূত তক্ষশিলাবাসী দিওন—বেসনগরে (প্রাচীন বিদিশায়) একটি গরুড়স্তম্ভ স্থাপন করে তাতে একটা লিপি উৎকীর্ণ করেছিলেন। লিপির ভাষা প্রাচীন প্রাকৃত।

(ঊ) পূর্বোক্ত কয়টি শিলালিপি ছাড়াও অশোকের সমকালে অর্থাৎ খ্রী' 'পূ' শতাব্দীগুলিতেই খোদাই করা আরো অনেক শিলালিপি তথা প্রত্নলেখ আবিষ্কৃত হ'য়েছে এবং হ'য়ে চলছে। এদের মধ্যে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য নাম: বাংলার বগুড়া জেলার অন্তর্গত 'মহাস্থানগড় শিলালিপি', বিহারের 'সোহগৌরা তাম্রলিপি', উঃ পঃ ভারতে খরোষ্ঠী লিপিতে লিখিত 'শিনকোট পেটিকা লিপি' প্রভৃতি।

(ঊ) **বৌদ্ধসংস্কৃত বা মিশ্র সংস্কৃত**—উত্তর ভারতের মহাযানপন্থী বৌদ্ধগণ দক্ষিণ ভারতের হীনযানপন্থী বৌদ্ধদের পালিভাষাকে শাস্ত্রীয় ভাষারূপে গ্রহণ না ক'রে কথ্য সংস্কৃত ভাষার সঙ্গে প্রাকৃতের মিশেল দিয়ে এই বৌদ্ধ (মিশ্র) সংস্কৃত ভাষা সৃষ্টি করেন। এই ভাষাকে **'গাথা ভাষা'** নামেও অভিহিত করা হয়। প্রধানতঃ বৌদ্ধ শাস্ত্রের জন্য রচিত হলেও এই ভাষা কোন কোন অনুশাসনেও ব্যবহৃত হয়েছে।

(গ) **মধ্যভারতীয় আর্যভাষার যুগসন্ধিকাল** (Transitional Period)

খ্রী' পূ' ২০০ অব্দ থেকে ২০০ খ্রী' অব্দ পর্যন্ত বিস্তৃতকালকে কেউ কেউ অতি সঙ্গত কারণেই মধ্যভারতীয় আর্যভাষার যুগসন্ধিকাল বা ক্রান্তিপর্ব নামে অভিহিত করেন। এই কালে লিখিত কিছু কিছু রচনা আবিষ্কৃত হবার ফলে মধ্যভারতীয় আর্যভাষা বিবর্তনের একটা লুপ্ত ইতিহাসের সন্ধান পাওয়া গেছে। ভাষা-পরিবর্তনের ক্ষেত্রে যে একটা ফাঁক অনুমানের সাহায্যে পূরণ করা হতো, তার সমর্থনে যথাযোগ্য প্রমাণও পাওয়া গেছে। এই কারণেই ইতিহাসের এই পর্বটিকে 'ক্রান্তিপর্ব' বা 'যুগসন্ধিকাল' নামে অভিহিত করা হয়।

'গান্ধারী প্রাকৃত' ও **'নিয়াপ্রাকৃত'**—ক্রান্তিপর্বে রচিত সাহিত্যের প্রায় যাবতীয় নিদর্শনই আবিষ্কৃত হ'য়েছে মধ্য এশিয়ায়। সংস্কৃত নাটকের আদি নাট্যকার অশ্বঘোষের নাটকের কিছু অংশ তালপাতায় লিখিত পাণ্ডুলিপি আকারে পাওয়া গেছে ঐ অঞ্চলে। তাতে তিন জাতীয় চরিত্রের মুখে তিন জাতীয় প্রাকৃতের ব্যবহার পাওয়া যায়—প্রাচীন মাগধী বা প্রাচ্য-প্রাকৃত, প্রাচীন শৌরসেনী বা প্রতীচ্য প্রাকৃত এবং প্রাচীন অর্ধ-মাগধী বা প্রাচ্য-মধ্যা প্রাকৃত। এ ছাড়া খরোষ্ঠী লিপিতে রচিত 'খোটানী ধম্মপদ' নামক বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ এবং অন্যত্র একই লিপিতে রচিত কিছু পত্রাবলী ও প্রতিবেদন, যা স্থান নামানুযায়ী 'নিয়া প্রাকৃত' নামে পরিচিত।

অশ্বঘোষের নাটকে ব্যবহৃত ত্রিবিধ প্রাকৃতে তাদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য মোটামুটিভাবে অক্ষুণ্ণ রয়েছে (মাগধী, শৌরসেনী ও অর্ধমাগধীর বৈশিষ্ট্য 'সাহিত্যিক প্রাকৃত' শিরোনামে দ্রষ্টব্য। তবে অব্যবহিত পূর্ববর্তী কালের অশোক-শিলালিপিতে

যে সমস্ত আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহৃত হ'য়েছে, তাদের সঙ্গে এই নাটকের তিন ভাষার সাধর্ম্য অনেকাংশে বর্তমান রয়েছে।

কিছুকাল পূর্বে ভারতের বাইরে কিছু ভারতীয় রচনা আবিষ্কৃত হয়। মধ্য এশিয়ার খোটানে আবিষ্কৃত হয় খরোষ্ঠী লিপিতে লিখিত **'খোটানী ধম্মপদ'**। রচনাকাল—আ. খ্রী. পূ. ১০০—১০৯ খ্রী.। খরোষ্ঠী লিপিতে লিখিত আরও কিছু রচনা আবিষ্কৃত হয় চীনা-তুর্কীস্তানের নিয়া নামক স্থানে—**'নিয়াপ্রাকৃত'** নামেই এর প্রসিদ্ধি। আ' খ্রী' তৃতীয় শতকে ব্যবসা-বাণিজ্য এবং রাজকার্য-সংক্রান্ত চিঠিপত্র কিংবা প্রতিবেদনই এখানে রচনার বিষয়। পূর্বোক্ত খোটানী ধম্মপদ এবং নিয়াপ্রাকৃতের ভাষায় কিছু নিজস্বতা থাকলেও উভয়ের মধ্যে সাদৃশ্যও বড় কম নয়। ভারতের তৎকাল-প্রচলিত ভাষারীতির সঙ্গে এই ভাষার সাধর্ম্য লক্ষ্য করে এর নাম দেওয়া হয়েছে **'গান্ধারী প্রাকৃত'**—বস্তুতঃ ক্রান্তিপর্বে এইটিই একমাত্র উল্লেখযোগ্য ভাষা।

'গান্ধারী প্রাকৃতের তথা যুগসন্ধিকালের ভাষাগত প্রধান বৈশিষ্ট্য এই ঃ স্বরমধ্যগত অল্পপ্রাণ অঘোষ ব্যঞ্জন ঘোষবৎ হ'তো, কখনও বা উষ্মীভূত হ'তো। শিস্‌ধ্বনিও ঘোষবর্ণে পরিণত হতো।

ভারতীয় আর্যভাষার বিবর্তনে এই স্তরটি লক্ষ্য করবার মতো। প্রাকৃতের সাধারণ লক্ষণ হিশেবে বলা হয়, স্বরমধ্যগত অল্পপ্রাণ বর্ণ লোপ পেতো—এই গান্ধারী প্রাকৃতে তার অন্তর্বর্তী অবস্থার পরিচয় পাওয়া যায়। অল্পপ্রাণ অঘোষ বর্ণ প্রথমে ঘোষ হয়েছে, তারপর উষ্মীভূত এবং সবশেষে লোপ পেয়েছে। ঘৃত>ঘ্রি>ঘিদ.>ঘিঅ। পরিবর্তনের একটা সুসঙ্গত ব্যাখ্যা পাওয়া যাছে।

নিয়াপ্রাকৃতের একটা বিশেষ রীতি দেখা যাচ্ছে যা মধ্যভারতীয় আর্যভাষায় প্রবল প্রতাপে বিরাজ করছে।

'ক্ত'-প্রত্যয়ান্ত কৃদন্ত পদের সঙ্গে 'অস্' ধাতুর যোগে যৌগিক অতীতকালের (compound verb) পদ গঠন। মধ্যমপুরুষ—'দিতেসি'।

নিয়াপ্রাকৃতের ভাষা সরকারী কাজে ব্যবহৃত হ'লেও এর ভাষা কৃত্রিম নয়, সহজ স্বাভাবিক। পরবর্তীকালের সাহিত্যিক প্রাকৃতের তুলনায় অনেক বেশি প্রগতিশীল ছিল এই গান্ধারী প্রাকৃত। অপর কোন প্রাকৃত অপেক্ষা অপভ্রংশ অথবা নব্যভারতীয় আর্যভাষার সঙ্গেই যেন এর সাধর্ম্য বেশি।

(ঘ) মধ্যভারতীয় আর্যভাষার মধ্যস্তর ঃ 'সাহিত্যিক প্রাকৃত'

আ. ২০০ খ্রী. থেকে ৬০০ খ্রী. পর্যন্ত বিস্তৃত কালকে মধ্যভারতীয় আর্যভাষার দ্বিতীয় স্তর রূপে মেনে নেওয়া হয়। এই স্তরের ভাষার প্রচলিত নাম **'সাহিত্যিক**

প্রাকৃত'। সাধারণভাবে 'প্রাকৃত' বলতেও এই স্তরের ভাষা এবং সাহিত্যকেই বুঝিয়ে থাকে। এই স্তরেই প্রথম প্রাকৃত ভাষাকে সজ্ঞানে সাহিত্য রচনার কার্যে ব্যবহার করা হয়।

ডঃ সুকুমার সেন পূর্বালোচিত 'ক্রান্তিপর্ব' বা যুগসন্ধিকালের পৃথক্ অস্তিত্ব স্বীকার না করে ঐ স্তরের ভাষা ও সাহিত্যের নিদর্শনকে এই মধ্যস্তরের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। এই হিসেবে, ভাষা বিবর্তনের একটা প্রধান দিঙ্‌নির্দেশক চিহ্ন (অল্পপ্রাণবর্ণের লোপ এবং মহাপ্রাণবর্ণের 'হ'-কারে পরিণতি) এই স্তরের বিশিষ্ট লক্ষণ বলেই স্বীকৃত হ'য়ে থাকে।

প্রাকৃতের প্রাচীনতম সাহিত্যিক প্রয়োগ পাওয়া যাচ্ছে অশ্বঘোষের নাটকে, পরে ভাসের এবং কালিদাসাদির নাটকে। নাটকের বাইরেও বহু কাব্য-মহাকাব্য রচিত হয়েছে প্রাকৃতে। জৈনদের ধর্মীয় ভাষাই প্রাকৃত—তাঁদের সর্বপ্রকার ধর্মশাস্ত্রই প্রাকৃত ভাষায় রচিত।

প্রাকৃত বৈয়াকরণগণ যে সমস্ত প্রাকৃতের উল্লেখ করেছেন, তাদের মধ্যে আছে 'মহারাষ্ট্রী, শৌরসেনী, মাগধী, অর্ধমাগধী, পৈশাচী এবং অপভ্রংশ'। কেউ কেউ অতিরিক্ত 'চূলিকা' বা 'চূলিকা পৈশাচী'র কথা উল্লেখ করেছেন। এদের মধ্যে, আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানীদের মতে, অপভ্রংশ এই স্তরের প্রাকৃত নয়; এই স্তরের বিভিন্ন প্রাকৃত ক্রমবিবর্তনের সূত্রে পরবর্তী স্তরে যে পরিণতি লাভ করেছে, তাকেই অপভ্রংশ বলা হয়েছে।

প্রাকৃত ভাষার আরও বিভিন্ন রূপান্তর অথবা উপভাষার নামও বিভিন্ন প্রাকৃত বৈয়াকরণগণ উল্লেখ ক'রে গেছেন। খ্রী. একাদশ শতকে পুরুষোত্তম নিম্নোক্ত উপভাষাগুলির নাম উল্লেখ করেছেনঃ শৌরসেনীর সঙ্গে সাদৃশ্যযুক্ত 'প্রাচ্যা', 'আবন্তী', মাগধীর বিভাষা 'শাবরী', টক্কদেশীয় বিভাষা 'টক্কী', অপভ্রংশের প্রধান উপভাষা 'নাগরক', উপনাগরক, ব্রাচড়ক এবং আঞ্চলিক বিভাষা—বৈদর্ভী, লাটী, ঔড্রী, কৈকেয়ী, গোড়ী ; এ ছাড়া রয়েছে আঞ্চলিক বিভাষা—টক্ক, বর্বর, কুন্তল, পাণ্ড্য, সিংহল প্রভৃতি। বৈয়াকরণ মার্কণ্ডেয় তাঁর 'প্রাকৃতসর্বস্বে' কয়েক প্রকার প্রাকৃতের কথা—প্রাচ্যা, আবন্তী, শাবরী, চাণ্ডালী, শাকারী, আভীরিকা, ঢক্কী, নাগর, ব্রাবড়, উপনাগর, কৈকেয়, পাঞ্চাল প্রভৃতি।

সংস্কৃত নাটকে ব্যবহৃত প্রাকৃত বলতে প্রধানতঃ বোঝায় মহারাষ্ট্রী, শৌরসেনী ও মাগধী প্রাকৃত এবং অর্ধমাগধী পরবর্তী কোন কোন নাটকে অপভ্রংশও ব্যবহৃত হ'য়েছে। নাটকের বাইরে স্বাধীন ব্যাপক ব্যবহার পাওয়া যায় মহারাষ্ট্রী প্রাকৃতে এবং জৈনগণ তাঁদের রচনায় ব্যবহার করেছেন অর্ধমাগধী।

সাহিত্যিক প্রাকৃতগুলো প্রকৃতই সাহিত্যিক অর্থাৎ সাধুভাষার নিদর্শনরূপেই পরিগণিত হ'য়ে থাকে। কথ্য আঞ্চলিক ভাষার আধারে হয়তো সংস্কার-মার্জনা ক'রে সাহিত্যে এদের ব্যবহার করা হয়েছিল। কথ্যভাষা নয় বলেই সম্ভবতঃ অব্যবহিত পূর্ববর্তী অনুশাসন-কালের অর্থাৎ আদিস্তরের আঞ্চলিক প্রাকৃতের সঙ্গে এদের অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক পাওয়া যায় না। প্রাকৃত বৈয়াকরণরাও সংস্কৃত ব্যাকরণের ধাঁচে প্রাকৃত ব্যাকরণ রচনা করেছেন।

১. **মাহারাষ্ট্রী প্রাকৃত**—দণ্ডিন্-প্রমুখ বৈয়াকরণগণ মাহারাষ্ট্রীকে আদর্শ প্রাকৃত-রূপে অভিহিত করলেও ভাষারূপে সাহিত্যে এর ব্যবহার অপর প্রাকৃতগুলোর পরে। অশ্বঘোষের রচনায় শৌরসেনী, মাগধী এবং অর্ধমাগধীর ব্যবহার থাকলেও মাহারাষ্ট্রীর ব্যবহার নেই। প্রাকৃত ব্যাকরণে মাহারাষ্ট্রী-সম্বন্ধেই আলোচনা, শুধু ব্যতিক্রম-স্থলে অপর প্রাকৃতের উল্লেখ আছে। সংস্কৃত নাটকে অধিকাংশ নারীকণ্ঠের গীত কিংবা কবিতাগুলো মাহারাষ্ট্রী প্রাকৃতে রচিত। এ ছাড়াও বহু কাব্য-মহাকাব্য মাহারাষ্ট্রীতে রচিত হয়েছে। এদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য—প্রবরসেনের 'রাবণবহো' (রাবণবধঃ), বপ্পইরাঅ-কৃত (বাক্‌পতিরাজ) 'গউড়বহো' (গৌড়বধঃ), হালের কবিতা-সংকলন 'গাহা-সত্তসঈ' (গাথাসপ্তশতী) প্রভৃতি। অনেকেই মনে করেন যে, কালগতভাবে অর্বাচীন হ'লেও মাহারাষ্ট্রী প্রাকৃত অপেক্ষাকৃত প্রগতিশীল এবং সম্ভবতঃ এই প্রাকৃতটিই দেশময় ব্যাপ্তিলাভ করেছিল। প্রধানতঃ ধর্মশাস্ত্রের বাইরে সমগ্র দেশের প্রাকৃত ভাষায় যারা সাহিত্যচর্চা করেছেন, তারা ঐ মাহারাষ্ট্রী প্রাকৃতেরই শরণ নিয়েছেন।

মাহারাষ্ট্রীতে স্বরমধ্যগত ব্যঞ্জনধ্বনি সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হয়েছে; অল্পপ্রাণ ধ্বনি লোপ পেয়েছে (প্রাকৃত>পাউঅ) এবং মহাপ্রাণ ধ্বনি 'হ্' ধ্বনিতে পরিণত হয়েছে (কথম>কহং)। ক্বচিৎ অল্পপ্রাণ ধ্বনি লোপের পূর্বে মহাপ্রাণে পরিণত হ'তো (ভরত>ভরথ)। কোন কোন ক্ষেত্রে 'স্' 'হ্'-য়ে পরিণত হয়েছে (তস্য>তাহ); সংস্কৃত 'ত্ম'-স্থানে 'প্প' হয় (আত্মন্>অপ্পা), অন্যত্র 'ত্ত' হয় প্রভৃতি। সং 'ক্ষ'-স্থলে মাহা 'চ্ছ' (ইক্ষু>উচ্ছু), শৌর 'ক্খ; সপ্তমী বিভক্তির এক বচনে 'স্মিন্' স্থলে-'স্মি' মাহা- অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ল্যবর্থক অসমাপিকার '-উণ' প্রত্যয়টি মাহা পেয়েছে বৈদিক '-ত্বান' প্রত্যয় থেকে।

২. **শৌরসেনী প্রাকৃত**—শৌরসেনী প্রাকৃত সম্ভবতঃ শূরসেন অর্থাৎ মথুরা অঞ্চলের ভাষা ছিল। শুধুমাত্র সংস্কৃত নাটকেই প্রধানতঃ নারী, আর বিদূষক ও অশিক্ষিত পুরুষের মুখেও শৌরসেনী প্রাকৃত ব্যবহৃত হয়েছে; অবশ্য প্রাকৃত নাটক 'কর্পূর-

'চ্ছ'>মাগ' 'শ্চ (পৃচ্ছতি>পুশ্চদি), 'ক্ষ'>শ্‌ক, স্ক (পক্ষ>পশ্‌ক)। 'অস্মদ্' শব্দের একবচনে মাগধীতে 'হগে'<অহম্ (* অহকম্>* হকম্)। মাগ' পদমধ্যস্থ 'দ্' রক্ষিত হয়েছে (বিহশ্‌পদি)। অপর অনেক দিকে মাগধী শৌরসেনীর মতোই।

৪ **অর্ধমাগধী**—ব্রাহ্মণ্যধর্মাবলম্বীদের যেমন সংস্কৃত, হীনযানী বৌদ্ধদের পালি এবং মহাযানী বৌদ্ধদের মিশ্রসংস্কৃত তাদের শাস্ত্রীয় ও ধর্মীয় ভাষা বলে পরিগণিত হ'তো, তেমনি জৈনদের নিকট ছিল অর্ধমাগধী প্রাকৃত। জৈনগণ তাঁদের ঋষিদের দ্বারা ব্যবহৃত এ ভাষাকে বলতেন **'আর্ষ প্রাকৃত'**। বিশেষভাবে জৈনদের দ্বারা ব্যবহৃত হ'তো বলে কেউ কেউ একে **'জৈনপ্রাকৃত'** নামেও অভিহিত করে থাকেন। অবশ্য জৈনরা শুধু যে অর্ধমাগধীই ব্যবহার করতেন তা নয়, তারা মাহারাষ্ট্রী এবং শৌরসেনী ভাষাও ব্যবহার করেছেন। জৈনদের ব্যবহৃত এই ভাষা যথাক্রমে 'জৈন মাহারাষ্ট্রী' এবং 'জৈন শৌরসেনী', এ দুই ভাষায় লিখিত গ্রন্থের নাম যথাক্রমে 'পউমচরিয়' এবং 'পবয়ণসার'। অশ্বঘোষের নাটকে অর্ধমাগধীর ব্যবহার পাওয়া যায়। এর প্রাচীনত্ব এবং লক্ষণ-বিচারে কেউ কেউ মনে করেন অর্ধমাগধী প্রাকৃত মাহারাষ্ট্রী প্রাকৃতের প্রাচীন রূপ। অর্ধমাগধীতে সংস্কৃতের প্রভাব প্রচুর। বড় বড় সমাসবদ্ধ পদ এ ভাষায় দেখা যায়।

অর্ধমাগধীতে মাগধী এবং শৌরসেনীর লক্ষণ যেমন রয়েছে, তেমনি পশ্চাংশে মাহারাষ্ট্রীর লক্ষণই বেশি স্পষ্ট। অর্ধমাগধীতে 'ল' [illegible] আছে, 'র' এবং 'ল' দুই-ই আছে, শব্দান্তে বিসর্গযুক্ত 'অ'কার যেমন 'এ' [illegible], তেমনি 'ও'-ও পাওয়া যাচ্ছে। স্বরমধ্যগত লুপ্ত ব্যঞ্জনের স্থলে য-শ্রুতির প্রভাব ([illegible])। অন্য প্রাকৃতের তুলনায় মূর্ধন্যীভবনের পরিমাণ বেশি (উষ্ম>ঊসভ)। ব্যাকরণিক অসমাপিকার বৈচিত্র্য অনেক। যুগ্ম ব্যঞ্জনের সরলতা ও পূর্বস্বরের ক্ষতিপূরক দীর্ঘতা (compensatory lengthening) মাঝে মাঝে দেখা যায় (বর্ষ >[illegible]বস্‌স>বাস)। সং [illegible] অর্ধমাগধীতে '[illegible]' (আস্ম>[illegible]), '[illegible]' প্রত্যয়ের ব্যবহার প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

৫. **পৈশাচী প্রাকৃত**—[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

এক [illegible]। ভাষা'র মধ্যস্তরের রূপ বলে অনুমান করা। [illegible], পৈশাচী ভাষায় রচিত কোন সাহিত্যের নিদর্শন এখনো পাওয়া যায় না, যদিও এককালে লোক-সাহিত্যের ভাষারূপে এর যথেষ্ট সমাদর ছিল। গুণাঢ্য-রচিত 'বড্ডকহা' (বৃহৎকথা)

পৈশাচী ভাষাতেই রচিত হয়েছিল বলে জানা যায়। কিন্তু গ্রন্থটি বিলুপ্ত, শুধু বিভিন্ন গ্রন্থকারদের বিভিন্ন উদ্ধৃতি থেকেই এর যা কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। ক্রান্তিপর্বের গান্ধারী-প্রাকৃতের সঙ্গে পৈশাচীর অনেক সাদৃশ্য পাওয়া যায়। এই ভাষার মূলকেন্দ্র ছিল সম্ভবতঃ উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল, যদিও এর ব্যাপকতা অস্বীকার করা যায় না। এর বিশিষ্ট লক্ষণঃ পদমধ্যে ঘোষবত্তার বিলোপ (নগর>নকর) ও স্বরমধ্যগত ব্যঞ্জনের অপরিবর্তনীয়তা।

(ঙ) মধ্যভারতীয় আর্যভাষার অন্ত্যস্তরঃ অপভ্রংশ-অবহট্‌ঠ (৬০০ খ্রী—১০০০ খ্রী)

মধ্যভারতীয় আর্যভাষার তথা প্রাকৃতের অন্ত্যস্তরের ভাষাকে বলা হয় **'অপভ্রংশ'**। কিন্তু প্রাকৃত বৈয়াকরণগণ অপভ্রংশকে অপর সমস্ত প্রাকৃতের মতোই একপ্রকার প্রাকৃত বলে গ্রহণ করেছিলেন। একালের ভাষাবিজ্ঞানীরা প্রাকৃত এবং নব্যভারতীয় আর্যভাষার অন্তবর্তী স্তররূপে অপভ্রংশের অস্তিত্ব স্বীকার করেন। সেই হিশেবে প্রত্যেক প্রাকৃতেরই একটি অপভ্রংশ স্তরের বিদ্যমানতা স্বীকার করতে হয়। কার্যতঃ শৌরসেনী অপভ্রংশের নিদর্শনই আমরা পেয়েছি, মাহারাষ্ট্রী অপভ্রংশ এবং মাগধী অপভ্রংশের কথা আমরা শুধু কল্পনা করে নিয়েছি, কারণ এদের কোন নিদর্শন পাওয়া যায়নি। অবশ্য প্রাকৃত ব্যাকরণকার শ্রেষ্ঠ অপভ্রংশরূপে **নাগরক অপভ্রংশের** কথা বিচার-বিবেচনা করেছেন এবং অপর অপভ্রংশগুলোকে বিভাষা (বিমিশ্র ভাষা) নামে উল্লেখ করেছেন। যথা—ব্রাচড়ক, উপনাগরক, বৈদর্ভী, লাটী, গৌড়ী, ঢক্কী, পাঞ্চালী, সিংহলী প্রভৃতি। এগুলো সম্ভবতঃ ছিল আঞ্চলিক কথ্যভাষা, পক্ষান্তরে নাগরক তথা শৌরসেনী অপভ্রংশ ছিল শিষ্টজনসম্মত সাহিত্যিক ভাষা।

অপভ্রংশ প্রাকৃতের অন্ত্যস্তরের ভাষা হ'লেও বৈয়াকরণগণ কিন্তু প্রাকৃতের অনেক পূর্বেই অপভ্রংশের কথা বলে গেছেন। পতঞ্জলির মহাভাষ্যে অপভ্রংশের উল্লেখ আছে—সম্ভবতঃ সাধারণ কথ্যভাষা সংস্কৃত থেকে অনেকটা সরে গিয়েছিল বলে প্রাকৃতকেই অপভ্রংশ নামে অভিহিত করেছেন। পরবর্তীকালে 'প্রাকৃত, অপভ্রংশ, অপভ্রষ্ট, বিভ্রষ্ট, দেশীয়, লৌকিক' প্রভৃতি শব্দ প্রায় নির্বিচারে ব্যবহৃত হয়েছে।

অপভ্রংশ-অবহট্‌ঠ-সম্বন্ধে একটি দ্বিতীয় মতও প্রচলিত আছে এবং তার পশ্চাতেও রয়েছে যথেষ্ট যুক্তি-প্রমাণ। অপভ্রংশ যে শিষ্ট কথ্যভাষা তথা সাহিত্যের ভাষা এবং শৌরসেনী প্রাকৃত-ব্যতীত যে অপর কোন প্রাকৃতের অপভ্রংশ অবহট্‌ঠ রূপের নিদর্শন পাওয়া যায়নি, এই তথ্য সর্বজনস্বীকৃত। অতএব সঙ্গত প্রশ্ন দাঁড়াচ্ছে—শৌরসেনী-বহির্ভূত অঞ্চলে জানপদভাষা তথা জনগণের কথ্যভাষা কী ছিল? এর একটা সম্ভাব্য উত্তর পাওয়া যাচ্ছে বিভিন্ন বৈয়াকরণদের রচনায়। তাঁদের অনেকেই (হেমচন্দ্র,

Jacobi প্রভৃতি) 'দেশী' নামক অপর একটি লৌকিক ভাষার উল্লেখ করেছেন, যাতে দেশজ শব্দ (দ্রাবিড়-মুণ্ডা ও ধ্বন্যাত্মক শব্দ) যথেষ্টই ব্যবহৃত হ'তো। মূলতঃ শৌরসেনী প্রাকৃত থেকে উদ্ভূত শৌরসেনী-অপভ্রংশ-অবহট্‌ঠ ভাষা যেমন প্রায় সর্বদেশেই সাহিত্য-কর্মে নিয়োজিত হ'তো, তেমনি বিভিন্ন আঞ্চলিক প্রাকৃত থেকে কালধর্মে বিবর্তিত বিভিন্ন দেশীয় ভাষাও লৌকিক বা জানপদভাষা-রূপে কথোপকথনে ব্যবহৃত হ'তো—এ জাতীয় অনুমানের পশ্চাতে যুক্তির ভার অনেক বেশি। কারণ অবহট্‌ঠ ভাষার বিবর্তনে নব্যভারতীয় আর্যভাষার উদ্ভব কল্পনায় কল্পনাকে বড় বেশি সদূরপ্রসারী করতে হয়। উদাহরণ-স্বরূপ বলা যায়, 'শুতনুকা লিপি'র পূর্বীপ্রাচ্য, মাগধী প্রাকৃত ও বাংলা ভাষার মধ্যে যে একটা ধারাবাহিকতা রয়েছে, প্রাপ্ত অবহট্‌ঠকে তার মধ্যে খাপ খাওয়ানো যায় না। তা' ছাড়া যে অপভ্রংশ ভাষা একান্তভাবেই সাধু ও শিষ্টজনসম্মত ভাষা (ভামহ, দণ্ডী, ধারাসেন-রচিত তাম্রশাসন, রাজশেখর, ধনঞ্জয়, নমিসাধু, বাগ্‌ভট্ট, পুরুষোত্তম, হেমচন্দ্র প্রভৃতি দ্বারা এ অভিমত সমর্থিত) তার বিবর্তনে কখনো নোতুন ভাষার উদ্ভব ঘটে না। অতএব মাগধী প্রাকৃত এবং বাংলা-আদি নব্যভারতীয় আর্যভাষার অন্তর্বর্তী স্তরে কথ্যভাষারূপে একটি 'দেশী ভাষা'র (বাংলার ক্ষেত্রে তাকে 'গৌড়ী প্রাকৃত' কিংবা 'প্রত্ন-বাংলা'—যে নামই দেওয়া হোক না কেন) বর্তমানতা স্বীকার ক'রে নিতেই হয়।

এ ছাড়াও অপভ্রংশ-অবহট্‌ঠকে একান্তভাবেই প্রাকৃতের তথা মধ্যভারতীয় আর্য-ভাষার অন্ত্যস্তরের ভাষা-রূপে গ্রহণ করাতেও ইতিহাসের বিকৃতি ঘটে। কারণ অপভ্রংশের উল্লেখ পাওয়া যায় আরও প্রাচীনতর কাল থেকে। সম্ভবতঃ মধ্যভারতীয় আর্যভাষার আদিস্তরেই সংস্কৃত ভাষার বিকৃতি ও পরে প্রাকৃতের বিকৃতিকেই অর্থাৎ অসাধু তথা জানপদ প্রয়োগকেই অপভ্রংশ নামে অভিহিত করা হয়েছিল। এক্ষেত্রে এটিই হয়তো ছিল 'দেশী ভাষা'। মধ্যস্তরে এই 'অপভ্রংশ' সাহিত্যিক ভাষার মর্যাদা লাভ ক'রে যে সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষার সঙ্গে সমান্তরালভাবে প্রবাহিত হ'তো, তার সাক্ষ্য দিয়েছেন ভামহ, দণ্ডী প্রমুখ আলঙ্কারিকগণ। হয়তো এই কারণেই প্রাকৃত বৈয়াকরণ যে 'ষড়্‌ভাষা'-রূপে সাহিত্যে ব্যবহৃত ছয় প্রকার প্রাকৃতের উল্লেখ করেছেন, তাতে 'অপভ্রংশে'রও নাম রয়েছে। হয়ত এই সময় থেকেই অপভ্রংশ শুধু সাহিত্যের খাতেই বইতে থাক্‌লো আর 'দেশী ভাষা' কথ্যভাষা আশ্রয় ক'রে আপন স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখলো। মধ্যভারতীয় আর্যভাষার অন্ত্যস্তরে অপভ্রংশ-অবহট্‌ঠ ভাষাই প্রাকৃতের স্থান অধিকার করে। বিদ্যাপতির ভাষায়—'সক্কঅ বাণী বুহজন ভাবই। পাউঅ রসকো মম্ম ন পাবই।' সংস্কৃত ভাষায় পণ্ডিতেরা ভাবনা করেন, প্রাকৃতের রসের

মর্ম কেউ পায় না; অতএব 'দেসিল বচন' সবচেয়ে মিষ্ট বলে তিনি অবহট্‌ঠ ভাষাতেই জল্পনা করছেন। তিনি অবশ্য অবহট্‌ঠকে দেশি ভাষারূপেই গ্রহণ করেছেন।

কালিদাসের 'বিক্রমোর্বশী' নাটকে অপভ্রংশ ভাষায় রচিত কয়েকটি গান আছে. সম্ভবতঃ অপভ্রংশের এইটিই প্রাচীনতম প্রয়োগ। পরবর্তীকালে অপভ্রংশ ভাষায় রচিত কিছু কিছু কাব্য সাহিত্যের সন্ধান পাওয় যায়। খ্রীঃ ষষ্ঠ থেকে দশম শতাব্দীর মধ্যে জৈনগণ প্রধানতঃ ধর্মীয় আবেদন-সমৃদ্ধ কিছু সাহিত্য রচনা করেন অপভ্রংশ ভাষায়। ধর্মভাবমুক্ত সাহিত্যেও অপভ্রংশ ভাষায় রচিত হয়েছে, তাদের মধ্যে আছে ধনপালের 'ভবিসত্তকহা', আবদুল রহমানের (অদ্দহমান<আবদুর্‌রহমান ?) দূতকাব্য 'সংনেহয়রাসয়' (<সংস্নেহকরাসক) বা 'সন্দেশরাসক', চান্দ বরদাই-রচিত 'পৃথ্বীরাজরাসো', পিঙ্গলাচার্য-রচিত প্রাকৃত ছন্দঃশাস্ত্র 'প্রাকৃতপৈঙ্গল' এবং বিদ্যাপতি-রচিত 'কীর্তিলতা'।

অর্বাচীন অপভ্রংশ তথা অপভ্রংশের শেষস্তরকে বলা হয় 'অবহট্‌ঠ' বা 'অপভ্রষ্ট'। এর ব্যাপ্তিকাল খ্রীঃ অষ্টম থেকে খ্রীঃ চতুর্দশ শতাব্দী। পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদে দৃষ্টান্তরূপে যে গ্রন্থগুলোর নাম উল্লেখ করা হয়েছে তাদের অনেকগুলোই আসলে অবহট্‌ঠ ভাষায় রচিত। খ্রীঃ দশম শতাব্দীর দিকে যখন নব্যভারতীয় আর্যভাষার উদ্‌গম হয় তখন এবং আরও কিছুকাল-পর্যন্ত সমগ্র উত্তর ভারতে শিষ্টজনসম্মত সাধুভাষারূপে প্রচলিত ছিল অবহট্‌ঠ ভাষা। ব্রাহ্মণ্যধর্মাবলম্বী পণ্ডিতগণ অবশ্য বরাবরই সংস্কৃতের পৃষ্ঠপোষকতা ক'রে এসেছেন। কাজেই সংস্কৃত ছিল অবহট্‌ঠের প্রতিদ্বন্দ্বী, আবার নব্যভারতীয় আর্যভাষাসৃষ্টির পর তার সঙ্গেও অবহট্‌ঠের প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখা যায়। বাংলা ভাষার উদ্ভব যুগে একই ব্যক্তিকে প্রাচীন বাংলায় চর্যাপদ এবং অবহট্‌ঠ ভাষায় দোহা রচনা করতে দেখা যাচ্ছে। অবহট্‌ঠ-ভাষার শেষ উল্লেখযোগ্য কবি বিদ্যাপতি। তিনি অবহট্‌ঠের গুণকীর্তন করতে গিয়ে বলেছিলেন—

'সক্কয় বাণী বহুজন ভাবই।
পাউঅ রসক মম্ম ন পাবই॥
দেসিল বঅণা সবজন মিট্‌ঠা।
তে' তইসন জম্পঞো অবহট্‌ঠা॥'

অর্থাৎ 'সংস্কৃত বাণী পণ্ডিতজন ভাবেন, প্রাকৃত রসের মর্ম পাওয়া যায় না। দেশী বচন সর্বজনের নিকট মিষ্ট, তাই অবহট্‌ঠ ভাষায় জল্পনা করি।'

অপভ্রষ্ট ভাষার প্রধান লক্ষণ

১. অধিকাংশ বিভক্তিচিহ্ন লোপ পাবার ফলে বাক্যমধ্যে পদসংস্থানের গুরুত্ব অনেকখানি বৃদ্ধি পেলো। বাক্যে পদের অবস্থান এবং ক্রিয়াপদের অর্থ থেকে কারকের বোধ জন্মায়।

২. সাধারণভাবে শব্দরূপে এবং ক্রিয়ারূপে বচনভেদ প্রায় লুপ্ত হ'লো। শব্দরূপে লিঙ্গভেদও ছিল না, তবে স্ত্রীপ্রত্যয় ছিল 'ই / ঈ'।

৩. অপভ্রংশে কারক ছিল তিনটি, (ক) মুখ্য কারক—কর্তা ও কর্ম, (খ) গৌণ কারক—অন্য সমস্ত কারক, (গ) সম্বন্ধ পদ।

৪. দীর্ঘস্বরস্থলে হ্রস্বস্বরের [illegible] (মালা>মাল, বাণিজ্য >বণিজ্জ)।

৫. উদ্বৃত্ত স্বরের লোপ ও স্বরান্তর সন্ধি (মৃত্তিকা >মট্টিআ>মাটী, অন্ধকার>অন্ধআর>আঁধার)।

৬. নব্য ভারতীয় আর্যের মতোই অপভ্রংশেও কোন কোন যুগ্মব্যঞ্জনের সরলতা লাভ ও পূর্ববর্তী স্বরের দীর্ঘত্ব (সহস্র>সহাস)।

৭. পদান্তে বা পদমধ্যে সানুনাসিকতা (উভয় [illegible]>[illegible]উ, কমল>কঁবল)।

৮. পদান্তে অনেক সময় 'উ'/'ও'-স্থলে 'ব' (অন্তঃস্থ ব)-এর আগম এবং কখন কখন 'ব'-স্থলে 'উ'-র আগম (সত>সব, সঅ ; স্বভাব>সহাউ)।

৯. 'স'-স্থলে 'হ'-এর ব্যবহারে ব্যাপকতা (দ্বাদশ >দুবাডস >বারহ ; পাষাণ>পাহাণ)।

১০. অনেক বিভক্তিচিহ্ন লোপ পাবার ফলে ব্যাপকভাবে অনুসর্গের ব্যবহার (অপাদানে—হোন্ত, হোন্তি ; করণে—তণ- ; সম্বন্ধে কেরঅ, কের)।

১১. ধাতুরূপেও অনেক সরলতা দেখা দিয়েছে।

১২. 'অ,-ড,-উল্ল'—এই স্বার্থিক প্রত্যয়গুলির ব্যাপক ব্যবহার (দোষ>দোষড)।

১৩. ছন্দে অন্ত্যানুপ্রাস ও বৈচিত্র্য সৃষ্টি হয় এবং শব্দভাণ্ডারে দেশীয় শব্দের অনুপ্রবেশ ঘটে।
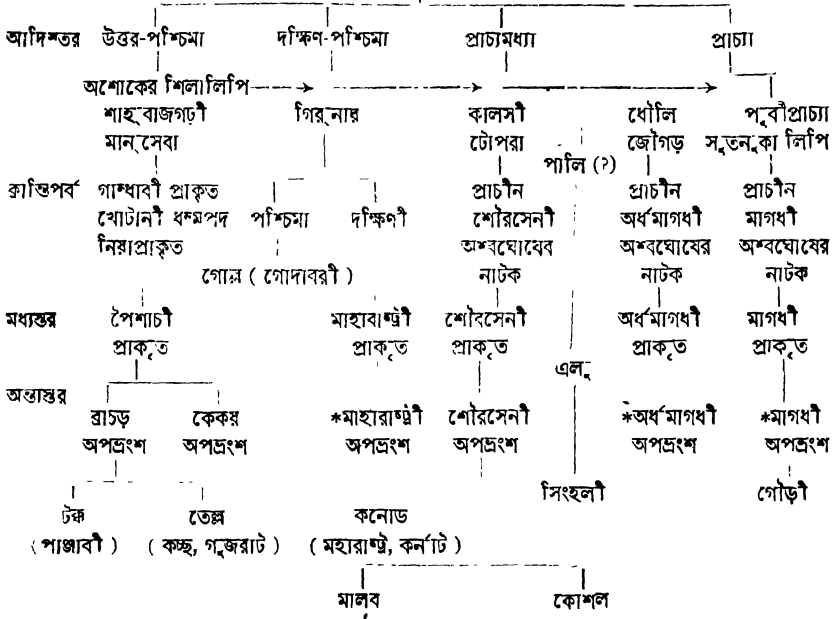
[তিন] নব্যভারতীয় আর্য ভাষা

(New Indo-Aryan Languages)

আ' খ্রী' দশম থেকে দ্বাদশ শতকের মধ্যে মধ্যভারতীয় আর্যভাষার অন্ত্যস্তরের অর্থাৎ অবহট্‌ঠ অথবা লৌকিক ভাষার খোলস ছেড়ে বেরিয়ে এলো নব্যভারতীয় আর্যভাষা তথা আধুনিক ভারতীয় আঞ্চলিক ভাষাসম্প্রদায়। ভাষাবিজ্ঞানীরা অবহট্‌ঠের সমকালে সমান্তরালভাবে প্রচলিত কথ্যভাষারূপে 'দেশী' তথা লৌকিক ভাষারূপে এ জাতীয় ভাষার কথা অনুমান ক'রে থাকেন। অবহট্‌ঠ এবং নব্যভারতীয় আর্যভাষার অন্তর্বর্তীকালে সম্ভবতঃ এই দেশী / লৌকিক ভাষার দেশকালোচিত রূপ তথা কথ্য প্রাকৃতের সর্বশেষ রূপটিই বর্তমান ছিল। ভাষাবিজ্ঞানী পণ্ডিতগণ তার নাম দিয়েছেন **'প্রত্ন-নব্যভারতীয় আর্যভাষা'** (Proto New Indo Aryan Language)।

(ক) **প্রত্ন-নব্যভারতীয় আর্যভাষা** (Proto New Indo-Aryan Language) :

নব্যভারতীয় আর্যভাষাগুলোর মধ্যে যে সাধারণ লক্ষণ বর্তমান ছিল, তার দিকে লক্ষ্য রেখেই নব্যভারতীয় আর্যের ধাত্রীস্বরূপা এই ভাষাসম্প্রদায়ের কথা কল্পনা করা

হয়েছে। এই ভাষাটি অবহট্‌ঠ ভাষারই সমকালীন কথ্যভাষা, অবহট্‌ঠের সঙ্গে এর পার্থক্য খুব বেশী নয়। যেটিকে মৌলিক পার্থক্য বলে নির্দেশ করা চলে, তা' প্রয়োগগত। অবহট্‌ঠ বা অপভ্রষ্ট ছিল শিষ্টজনসম্মত সাধুভাষা তথা সাহিত্যের ভাষা। সাধুভাষা বা সাহিত্যের ভাষা লিপির বন্ধনে আবদ্ধ থাকায় তা থেকে নবজীবনের কোন ধারায় উদ্ভব সম্ভব ছিল না। জীবন থেকেই জীবনের সৃষ্টি, তাই জীবন্ত ভাষা নব্যভারতীয় আর্যের জন্মের জন্য অপর একটি জীবন্ত ভাষার প্রয়োজন—'প্রত্ন-নব্যভারতীয় আর্যভাষা'ই সেই জীবন্ত 'দেশী' বা 'লৌকিক' ভাষা অর্থাৎ সাহিত্যিক ভাষা অবহট্‌ঠের পাশাপাশি প্রচলিত আঞ্চলিক ভাষা। তাত্ত্বিক বিচারে এই ভাষা থেকেই নব্যভারতীয় আর্যভাষাগুলোর উদ্ভব।

প্রত্ন-নব্যভারতীয় ভাষার একটি মাত্র নিদর্শন এ যাবৎকালের মধ্যে পাওয়া গেছে। প্রাচীন ধারা রাজ্যে প্রাপ্ত একটি শিলালিপিতে (রাউলবেল প্রত্নলিপি) একটা দাসী-বাজারে দাসী কেনা-বেচার প্রসঙ্গে দাসীদের গুণপনার বর্ণনা দেওয়া আছে। যারা দাসী বিক্রয় করতে এসেছে তারা যার যার আঞ্চলিক ভাষায় কথা বলাতে আমরা একটিমাত্র শিলালিপিতেই অনেকগুলো আঞ্চলিক ভাষারূপের নিদর্শন পেয়েছি। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে শিলালিপিটি ভাঙ্গা বলে কোন ভাষারই পরিপূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায়নি। যাহোক, এই লিপিতে যে সমস্ত ভাষার পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে তার সংখ্যা সাত: (১) গোল্ল, (২) কনোড়, (৩) তেল্ল, (৪) টক্ক, (৫) গৌড় এবং অপর দুটির নাম দেওয়া যায় (৬) মালব, (৭) কোশল।

১. **গোল্ল**—গোদাবরী তীরবর্তী অঞ্চলের ভাষা বলে অনুমিত হয়। যুক্ত ব্যঞ্জনের সরলতা, সানুনাসিক যুক্ত ব্যঞ্জনের পূর্বস্বরের দীর্ঘতা, অনুসর্গের ব্যবহার, বর্তমান কালে প্রথম পুরুষের বহুবচনে '-থি' বিভক্তির প্রয়োগ, 'ভাল (=উত্তম), বেটিয়া (=কন্যা), বিণু, জা (=যাহা)' প্রভৃতি শব্দের প্রয়োগ এই ভাষার বৈশিষ্ট্য।

২. **কনোড়**—মহারাষ্ট্র ও কর্ণাট অঞ্চলের ভাষা, এটিকে 'প্রত্ন মারাঠী' ভাষারূপে অভিহিত করা চলে। সানুনাসিক-যুক্ত ব্যঞ্জনের পূর্বস্বরের দীর্ঘতা, সম্বন্ধ পদে '-হ,-হঁ' বিভক্তি, এবং বিশেষভাবে '-চা, -চেঁ, -চি, -চী' বিভক্তিগুলোর সম্বন্ধ পদে ব্যবহার, গৌণ কারকে '-কু' বিভক্তি, 'আনি (=অন্য), আতু (=মধ্যে), থাঢ় (=স্তব্ধ), লোণ (=লাবণ্য), রীঠে (=আংটি) প্রভৃতি শব্দের ব্যবহার এই ভাষার বৈশিষ্ট্য।

৩. **তেল্ল**—পশ্চিম প্রান্তীয় গুজরাট-কচ্ছ অঞ্চলের ভাষা, এটি 'প্রত্ন গুজরাটি' ভাষা। সানুনাসিক-যুক্ত ব্যঞ্জনের পূর্ববর্তী হ্রস্ব স্বরে দীর্ঘতা, সম্বন্ধ পদে '-হ, -হঁ' বিভক্তি, '-কী' বিভক্তি, গৌণ কারকে '-কু' বিভক্তি, বর্তমান কালের প্রথম পুরুষের বহুবচনে '-হি, -হিঁ', বিভক্তি, 'আথি (=অস্তি), ঝুনি (=মধুর ধ্বনি), নিউরানী (=নূপুর), অম্হাণউ (=অস্মাকম্)' প্রভৃতি শব্দের ব্যবহার তেল্ল ভাষার বৈশিষ্ট্য।

৪. **টক্ক**—পঞ্চনদ অঞ্চলের, বাহীকের ভাষা, এটিকে 'প্রত্ন পাঞ্জাবী' নামে অভিহিত করা চলে। যুগ্ম ব্যঞ্জনের সরলতা, সম্বন্ধ পদে '-হ, -হঁ' বিভক্তি, বর্তমান কালে প্রথম পুরুষে বহুবচনে '-হি, -হিঁ' বিভক্তি, 'গন্ন (=কণ্ঠ বা গণ্ড), দেত্তা (=প্রদত্তা), কাংঠি (=কাষ্ঠ), কেশু-পাশু (=কেশপাশ), প্রভৃতি শব্দের ব্যবহার এ ভাষার বিশিষ্ট লক্ষণ।

৫. **গৌড়ী**—এই ভাষাটিকে 'প্রত্ন বাংলা' নামে অভিহিত করা চলে। পূর্ব ভারতীয় অন্যান্য ভাষা—অসমিয়া, ওড়িয়া ভাষার সঙ্গে এর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বর্তমান।

নাসিক্যযুক্ত ব্যঞ্জন ধ্বনির পূর্বস্বরের দীর্ঘতা (চান্দ <চন্দ্র), সম্বন্ধ পদে '-হ, -হঁ' বিভক্তি এবং তৎসহ বিশিষ্ট বিভক্তি '-র'-এর প্রয়োগ ('তাড়ের পাত'), সম্বন্ধ পদে অনুসর্গীয় বিভক্তি '-কর', '-কের', '-করী' ('গউড়িনহু কেরউ—গৌড়ী নারীর), বর্তমান কালের প্রথম পুরুষের বহুবচনে '-থি' বিভক্তি (ভাবংথি<ভাবয়ন্তি), '-অল, -ল'-যুক্ত কৃদন্ত বিশেষণের ব্যাপক প্রয়োগ (পসারল=প্রসারিত), পহ্নিলে (=পরিহিত), তোহরউ (=তোমার), তাড়ের (=তাদের), উঢ়অল (=উর্ধ্বাঙ্গে পরিহিত), ঘেতলে (=গৃহীত), এবং গুআরাংগ (=গুয়া-রাঙ্গা), আংটকুডী-পুতু (=আঁটকুড়ীর পুত), কোঁছা=কাছা, কোঁচা প্রভৃতি শব্দ-ব্যবহার গৌড়ী তথা প্রত্ন বাংলার বিশেষ লক্ষণ।

৬. **মালবী**—মধ্যদেশের পশ্চিমাঞ্চলের ভাষা। এর বিশিষ্ট লক্ষণগুলোর মধ্যে আছে—যুগ্ম ব্যঞ্জনের সরলতা, সানুনাসিক যুক্ত ব্যঞ্জনের পূর্বস্বরের দীর্ঘতা, সম্বন্ধ পদে '-হ, -হুঁ' বিভক্তির এবং '-র' বিভক্তির প্রয়োগ, সম্বন্ধ পদে অনুসর্গীয় '-কের' বিভক্তি, বর্তমানে প্রথম পুরুষে বহুবচনে '-হি, -হিঁ' বিভক্তি, সহু (=সহিত), সারিকখে (=সদৃশে), ভালি (=উত্তম), হাথিআর (=হাতের অস্ত্র), কেতউ (=কত), ইত্যাদি শব্দের প্রয়োগ।

৭. **কোশলী**—মধ্য অঞ্চলের পূর্বাঞ্চলের ভাষা বলে অনুমিত। এর বিশিষ্ট লক্ষণ যুগ্ম ব্যঞ্জনের সরলতা, সম্বন্ধ পদে '-হ,-হ' বিভক্তি এবং অনুসর্গীয় '-কেরউ'

প্রত্যয়, বর্তমান কালে প্রথম পুরুষে বহুবচনে '-হিঁ,-হিঁ' বিভক্তি, সনাহ (=সন্নাহঃ), আলবালু (=আলবালে), রত্তুপল (=রক্তোৎপল), মাঝু (=মধ্যম), বুঝই (=বুধ্যতে) প্রভৃতি শব্দের প্রয়োগ।

(খ) নব্যভারতীয় আর্যভাষার লক্ষণ

বিভিন্ন অপভ্রংশ থেকে নব্যভারতীয় আর্যভাষাগুলোর উদ্‌গম হলেও প্রারম্ভিক স্তরে তাদের মধ্যে নানা বিষয়ে প্রভূত পরিমাণ ঐক্য বর্তমান ছিল, কারণ অপভ্রংশ স্তরেও পারস্পরিক দূরত্ব খুব বেশী ছিল না। এই কারণেই কালের গতিতে প্রত্যেকটি নব্যভারতীয় আর্যভাষা আঞ্চলিক ভাষারূপে স্বতন্ত্রতা লাভ ক'রে স্ব স্ব বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হলেও মূলতঃ তাদের মধ্যে এমন কতকগুলো লক্ষণ বর্তমান ছিল, যা' তাদের মধ্যভারতীয় আর্যভাষা থেকে বিচ্ছিন্ন করেছে। সামান্য ইতর-বিশেষ সহ এই লক্ষণগুলো নব্যভারতীয় ভাষাগুলোর দেহে আজো বর্তমান ছিল। নিম্নে ঐরূপ প্রধান লক্ষণগুলো দিতে হলো।

১. মূলতঃ সংশ্লেষাত্মক ভাষা ক্রমিক বিভক্তি লোপের ফলে বিভিন্ন অনুসর্গের সাহায্যে এবং আবস্থানিক রূপ লাভ ক'রে বিশ্লেষাত্মক হয়ে দাঁড়ালো।

২. পদমধ্যস্থ যুগ্মব্যঞ্জন একক ব্যঞ্জনে পরিণত হ'লো এবং তৎপূর্ববর্তী হ্রস্ব স্বর সম্পূরক দীর্ঘস্বরে (compensatory lengthening) পরিণত হ'লো।—কার্য> কজ্জ>কাজ, কক্ষ>কক্‌খ, কচ্ছ>কাখ, কাছ। সিন্ধীতে পূর্বস্বর দীর্ঘ হয়নি। পাঞ্জাবী এবং পশ্চিমা হিন্দীতে কখন কখন যুগ্ম ব্যঞ্জনও বজায় রয়েছে।

৩. যে যুক্ত ব্যঞ্জনের প্রথমটি কোন নাসিক্য ধ্বনি, সেটি লুপ্ত হয়ে পূর্ববর্তী স্বরধ্বনিকে সানুনাসিক ধ্বনিতে পরিণত করেছে। যথা—সন্ধ্যা>সঞ্ঝা>সাঁঝ; কম্প>কাঁপ। সিন্ধী এবং অপর কোন কোন ভাষায় এরূপ হয়নি।

৪. পদমধ্যস্থ দ্বিস্বরধ্বনির (ইঅ, উঅ, ঈআ, উআ প্রভৃতি) শেষটি 'অ' কিংবা 'আ' হ'লে সেটি লুপ্ত হ'লো। যথা—মৃত্তিকা>মট্টিআ>মাটি।

৫. মারাঠী-গুজরাটী ভিন্ন অপর সকল ভাষায় ক্লীবলিঙ্গ লোপ পেয়েছে। সিংহলী ভাষায় সপ্রাণ ও অপ্রাণ দুজাতীয় লিঙ্গ নোতুন সৃষ্টি হ'লো। যে সকল ভাষায় লিঙ্গভেদ রইলো, সেগুলো সংস্কৃত নিয়ম মানলো না, যেমন হিন্দী ভাষায় বিদেশী শব্দমাত্রই স্ত্রীলিঙ্গ।

৬. প্রাচীন বিভক্তিচিহ্ন অধিকাংশই লোপ পেলো, প্রাচীন বিভক্তিচিহ্নগুলোর মধ্যে ছিল প্রথমার '-ই,-উ,-এ', তৃতীয়ার '-এ-এঁ' এবং সপ্তমীর '-ই,-এ'। নোতুন

শব্দ, শব্দজাত প্রত্যয় অথবা অনুসর্গের সাহায্যে অন্যান্য কারক-বিভক্তি বোঝানো হতো।

৭. কারক বলতে ছিল মুখ্যতঃ দুটিই—একটি মুখ্যকারক বা কর্তা এবং অপরটি গৌণ বা তির্যক কারক। গৌণ কারকের মধ্যে পড়ে করণ, সম্প্রদান ও অধিকরণ কারক। এর জন্যে প্রধানতঃ অনুসর্গজাত বিভক্তি ব্যবহৃত হতো।

৮. পশ্চিমা হিন্দী, মারাঠী এবং সিন্ধী ছাড়া অপর সমস্ত ভাষায় বহুবচনের বিভক্তি চিহ্ন লুপ্ত হয়েছে। সম্বন্ধ পদের সাহায্যে (বাংলায়—'লোকেরা') অথবা বহুত্ববাচক শব্দ যোগে (অসমীয়ায়—'বোর'<বহুল) ঐ সমস্ত ভাষায় বহুবচন প্রকাশ করা হয়।

৯. কাল (Tense) এবং ভাবের (Mood) মধ্যে কর্তৃবাচ্য এবং কর্মভাব-বাচ্যে বর্তমানের রূপ, অনুজ্ঞার এবং ক্বচিৎ ভবিষ্যৎকালের রূপ বর্তমান রয়েছে। অতীত-কালের জন্য নিষ্ঠাপ্রত্যয় (ক্ত) এবং ভবিষ্যৎ কালের জন্য কৃত্য ('তব্য') ও শতৃ প্রত্যয় ব্যবহৃত হয়। পশ্চিমা পাঞ্জাবী এবং গুজরাটীতে ভবিষ্যৎ কালের প্রাচীন রূপ বর্তমান আছে।

১০. শতৃ বা নিষ্ঠা প্রত্যয়জাত মূল ধাতুর অসমাপিকার সঙ্গে 'অস্, ভূ', বা 'স্থা' ধাতু যোগ করে যৌগিক নিষ্পন্ন এবং অসম্পন্নকাল সৃষ্টি হ'লো নব্যভারতীয় আর্য-ভাষার মধ্যস্তর থেকে। যথা—গত (>গঅ) + অস্ (>আছে)=গিয়াছে।

১১. 'ঋ'-কারের উচ্চারণ 'রি' এবং 'ষ'-র উচ্চারণ 'শ'-বৎ হয়েছে, কোন কোন স্থলে 'ঋ' হয়েছে 'রু' এবং 'ষ' হ'য়েছে 'খ'। যথা—দক্ষিণাঞ্চলে 'অমৃত'>অম্রুত; উত্তরাঞ্চলে—'ভাষা'>ভাখা।

১২. উচ্চারণ সৌকর্যের জন্য য়-শ্রুতি এবং -বশ্রুতির আগম ঘটলো।

১৩. প্রচুর পরিমাণ বিদেশি শব্দ (আরবী, ফারসী, তুর্কী, পর্তুগীজ, ইংরেজি প্রভৃতি) প্রত্যেক আঞ্চলিক ভাষার শব্দসম্ভার বৃদ্ধি করেছে।

১৪. বিদেশি শব্দের আগমনে এবং তাদের প্রভাবে অনেক নোতুন ধ্বনির সৃষ্টি হয়েছে, যথা—ক়, খ়, গ়, জ়, ফ়, প্রভৃতি।

(গ) অন্তরঙ্গ এবং বহিরঙ্গ বর্গীকরণ / অন্তর্বর্গীয় ও বহির্বর্গীয় বিভাগ-মতবাদ (Inner Aryan and Outer Aryan Theory)

হোর্নলে (R. Hoernle) অভিমত প্রকাশ করেছিলেন যে আর্যদের দুটি ধারা দুই পৃথক্ কালে ভারতে প্রবেশ করে। প্রথম দল সিন্ধু ও গঙ্গার কূলে বসতি স্থাপন করে—সম্ভবতঃ এদেরই গোলমুণ্ড আল্পীয় আর্য (Alpine Aryan) বলে অনুমান

করা হয়। এরপর আসে দীর্ঘমুণ্ড অপর এক দল—সম্ভবতঃ উদীচ্য বা নর্ডিক আর্য (Nordic Aryan)—এরা প্রথম দলকে স্থানচ্যুত করে মধ্য ভারতে নিজেদের অধিকার স্থাপন করে এবং প্রথম দলটি চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। পরবর্তীকালে গ্রীয়ারসন (Grierson) ভাষাতত্ত্বের সাহায্যে প্রমাণ করতে চেষ্টা করলেন যে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়া গোষ্ঠীদের ভাষায় একটি সাধর্ম্য বর্তমান, আবার মধ্যাঞ্চলের ভাষাগুচ্ছেও অনুরূপ সাদৃশ্য রয়েছে। তাঁর এই সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করেই 'হোর্নলে-গ্রীয়ার্সন-বর্গীকরণ মতবাদ' (Hoernle-Grierson Classification Theory) গড়ে ওঠে। এই মতবাদের মূল বক্তব্য নব্যভারতীয় আর্যভাষা প্রধান দুটি উপাভাষাগুচ্ছে বিভক্ত—একটি বহির্বর্গীয়, এতে আছে উত্তরাঞ্চলীয় কাশ্মীরী, সিন্ধী, পশ্চিম পাঞ্জাবী, দক্ষিণাঞ্চলীয় মরাঠী ও সিংহলী এবং পূর্বাঞ্চলীয় বাংলা, অসমীয়া, ওড়িয়া ও বিহারী। অপরটি অন্তর্বর্গীয়—তার মধ্যে পড়ছে মধ্যভারতীয় হিন্দীভাষাগুচ্ছ, উত্তরাঞ্চলীয় পাহাড়ী ভাষাগুচ্ছ এবং পশ্চিমাঞ্চলীয় গুজরাতি ও রাজস্থানী ভাষাবর্গ। গ্রীয়ার্সনের মতে বহির্বর্গীয় ভাষাগুচ্ছের মধ্যে নিম্নোক্ত সাধারণ লক্ষণগুলো বর্তমান ঃ

১. পদান্তে 'ই-কার, উকার এবং এ-কার'-এর বর্তমানতা।

২. অপিনিহিতির উপস্থিতি।

৩. 'ই'কারের 'এ'-কার রূপে এবং 'উ'-কারের 'ও'-কার রূপে উচ্চারণ-প্রবণতা।

৪. 'উ'-কারের 'ই'-কারে পরিবর্তন।

৫. দ্বিস্বর 'ঐ'-এর 'অই'-রূপে এবং 'ঔ'-এর 'অউ' রূপে পরিণতি।

৬. চ-কারের 'স'-রূপ এবং 'জ'-কারের 'জ়' (z) রূপে উচ্চারণ।

৭. 'ঙ' এবং 'ঞ' উচ্চারণের বর্তমানতা।

৮. ড>ড়, দ ; দ>ড, জ ; ব>ব ; ল>র ; স্বরমধ্যবর্তী-'র'-এর লোপ এবং স্বরমধ্যবর্তী স>হ ও স (ষ)>শ।

৯. মহাপ্রাণবর্ণের অল্পপ্রাণতা।

১০. যুগ্মবর্ণের সরলীকরণ বা একক ব্যঞ্জনে পরিণতি।

১১. স্ত্রীলিঙ্গে 'ঈ' প্রত্যয়ের ব্যবহার।

১২. অপাদানের অর্থপ্রকাশে 'ভূ' ও 'স্থা' ধাতু থেকে উদ্ভূত শব্দের ব্যবহার।

১৩. বহুবচনের পদগঠনে অনুসর্গ-স্থানীয় শব্দ ব্যবহার।

১৪. অতীতকালে সকর্মক ধাতুর কর্তায় ও কর্মের বিশ্লেষণরূপে নিষ্ঠান্ত (ক্ত-প্রত্যয়ান্ত) শব্দের ব্যবহার।

১৫. তদ্ধিত '-ল' প্রত্যয়ের যোগ।

১৬. 'আছ্' ধাতুর ব্যবহার।

আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এই বর্গীকরণের বিরোধিতা করে দেখিয়েছেন যে, যে সমস্ত লক্ষণ বহির্বর্গীয় ভাষাগুলোর সাধারণ লক্ষণ বলে অভিহিত করা হয়েছে, তাদের সব লক্ষণ সব বহির্বর্গীয় ভাষায় বর্তমান নেই, কোন কোন ভাষায় কোন কোনটি মাত্র আছে। আবার বহির্বর্গীয় ভাষার লক্ষণ বলে কথিত অনেক লক্ষণই অন্তর্বর্গীয় ভাষায়ও দেখা যায়। নিম্নে তাদের কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হ'লো।

মরাঠী ও সিন্ধীতে অপিনিহিতি নেই। উ>ই, ঐ>অই, ঔ>অউ ধ্বনি-পরিবর্তনরীতি পশ্চিমা হিন্দীতেও বর্তমান। পূর্বাঞ্চলীয় ভাষাগুলোতেই শুধু চ>স, জ>জ় দেখা যায়। স্বরমধ্যবর্তী 'র'-এর লোপ পশ্চিমা হিন্দীতেও বর্তমান। তিনটি শিস্‌ধ্বনির মধ্যে 'শ'-এর বর্তমানতা শুধু পূর্বাঞ্চলীয় ভাষার বৈশিষ্ট্য। মহাপ্রাণধ্বনির অল্পপ্রাণতা বাংলার বিশিষ্ট লক্ষণ হ'লেও অন্য বহির্বর্গীয় ভাষায় ব্যবহার কম, আবার পশ্চিমা হিন্দীতেও আছে। দ্বিত্বব্যঞ্জনের একক ব্যঞ্জনে পরিণতি অন্তর্বর্গীয় ভাষাতেও সমভাবে বর্তমান।

এগুলো ছাড়াও কয়েকটা প্রতিকূল যুক্তি আছে। আর্যেরা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হ'য়ে ভারতে এসেছিলেন, একথা মানা যেতে পারে, কিন্তু তাঁরা যদি সুস্পষ্ট দুটি ভাষাগুচ্ছে বিভক্ত থাকতেন তবে তার পরিচয় প্রাচীন ও মধ্যভারতীয় আর্যভাষায়ও প্রকাশিত হ'তো—কিন্তু বাস্তবে সে ধরনের কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি। মধ্যভারতীয় আর্যভাষাগুলো সরাসরি বৈদিক-সংস্কৃত ভাষা থেকে উৎপন্ন হয়নি এবং এদের কোন কোনটির উপর ঈরানী-ভাষার প্রভাবেরও প্রমাণ পাওয়া যায়, কিন্তু ভারতীয় আর্য-ভাষায় বহির্বর্গীয় ও অন্তর্বর্গীয় দুটি মাত্র ভাষাগুচ্ছের সমর্থনে কোন যুক্তি পাওয়া যায় না। অতএব এগুলো বিচার-বিবেচনা না করেই নব্যভারতীয় আর্যভাষার বর্গীকরণ যুক্তিসঙ্গত নয়।

এই সমস্ত দিক্ বিচার-বিবেচনা ক'রে ভারতীয় ভাষাবিজ্ঞানিগণ আচার্য সুনীতি-কুমারের বক্তব্যের সারবত্তা স্বীকার করে নিয়েছেন এবং হোর্নলে-গ্রীয়ার্সন-বর্গীকরণ মতবাদ প্রত্যাখ্যান করেছেন। তবে আর্যভাষাভাষী জনগোষ্ঠীর দুটি ধারা পর পর ভারতে এসেছিল, এ সম্ভাবনাকে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। প্রথমাগতগণ গোলমুণ্ড আলপীয় আর্য—হয়তো এরাই সিন্ধু সভ্যতার পত্তন করেছিলেন এবং পরে চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছিলেন। এঁরা অবৈদিক, ব্রাত্য, এমন কি 'অসুর' সংজ্ঞকও হ'তে

পারেন। পরবর্তীকালে আগত 'নর্ডিক' বা উদীচ্য আর্যগণই বৈদিক আর্য। এই মতবাদটি ক্রমশঃ জোরালো হ'য়ে উঠছে।

(ঘ) নব্য ভারতীয় আর্যভাষার বর্গীকরণ বা ভৌগোলিক শ্রেণীবিভাগ

ঐতিহাসিক এবং ভৌগোলিক দিক থেকে প্রাচীন এবং মধ্য ভারতীয় আর্যভাষার যেমন বর্গীকরণ করা হ'য়ে থাকে তেমনি নব্যভারতীয় আর্যভাষার বর্গীকরণও সম্ভবপর। নব্যভারতীয় আর্যভাষাকেও উদীচ্য, প্রতীচ্য, অবাচ্য বা দাক্ষিণী, মধ্যদেশীয় ও প্রাচ্য—এই পাঁচটি প্রধান ধারায় ভাগ ক'রে আধুনিক ভারতীয় আর্য-ভাষাগুলোর বর্গীকরণ করা যায়। অবশ্য এরূপে বর্গীকরণে মতদ্বৈধতার অস্তিত্বকে অস্বীকার করা চলে না। যেমন কোন পণ্ডিতের বিবেচনায় সিন্ধী ভাষা উদীচ্যার অন্তর্গত, আবার কেউবা একে প্রতীচ্যা গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত বলে মনে করেন।

১. **উদীচ্যা**—উদীচ্যা গোষ্ঠীর ভাষাকে দু'টি প্রধান উপশ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়। একটি উত্তর-পশ্চিমা: এর মধ্যে আছে সিন্ধী ও পাঞ্জাবী এবং অপরটি পাহাড়ী ভাষাগুচ্ছ: এর মধ্যে আছে কুমায়নী, গাড়োয়ালী, নেপালী প্রভৃতি।

(অ) **সিন্ধী**—সিন্ধু ও কচ্ছ অঞ্চলে ব্যবহৃত সিন্ধী ভাষায় অনেক প্রাচীনত্ব বর্তমান। আবার প্রধানতঃ মুসলমানদের ভাষা বলে এতে আরবী-ফারসী শব্দের আধিক্যও লক্ষ্য করা যায়। অনেকে মনে করেন 'ব্রাচড় অপভ্রংশ' থেকে সিন্ধী ভাষার উৎপত্তি। এ ভাষায় দন্ত্যবর্ণ-স্থানে মূর্ধন্যবর্ণের প্রবণতা (তাম্র>টামো) এবং সঘোষ মহাপ্রাণ ধ্বনিগুলির (ঘ, ঝ, ধ, ভ) কণ্ঠনালীয় উচ্চারণ (গ', জ', দ', ব') বিশিষ্ট লক্ষণ। শেষোক্ত লক্ষণটি পূর্ববঙ্গের তথা বঙ্গালী ভাষায়ও লক্ষ্য করা যায়। একক ব্যঞ্জনে পরিণত যুগ্ম ব্যঞ্জনের পূর্বস্বর এতে দীর্ঘ হয়নি। সপ্তদশ শতক থেকে এ ভাষায় সাহিত্যের সন্ধান পাওয়া যায়। 'শাহজী রিসালো' উল্লেখযোগ্য রচনা। পাঞ্জাবী ভাষার সঙ্গে সিন্ধী ভাষার নিকট সম্পর্ক বর্তমান।

(আ) **পঞ্জাবী**—পঞ্জাবী ভাষার দুটি প্রধান শাখা—একটি **পশ্চিম পঞ্জাবী** বা লহন্দী, অপরটি **পূর্বী পঞ্জাবী** বা হিন্দকী। উভয় শাখাই 'কেকয় অপভ্রংশ' থেকে উৎপন্ন বলে অনেকে মনে করেন। কিন্তু পশ্চিমী শাখায় ফারসী ভাষার বিশেষ প্রভাব অনুভূত হয়। এই ভাষাটি শারদা লিপি থেকে উদ্ভূত 'লণ্ডা' লিপিতে অর্থাৎ ফারসীতে লিখিত হয়। শিখ সম্প্রদায়ের 'জনমসাখি' বা 'প্রানগীতি'র অতিরিক্ত কোন সাহিত্য এই ভাষায় রচিত হয়নি। **লহন্দা, মুলতানী, পটোয়ারী ও ধন্নী**—এই চারটি এর উপভাষা। হিন্দকী লেখা হয় গুরু অঙ্গদ সিং-প্রবর্তিত নাগরী-

প্রভাবিত 'গুরুমুখী লিপি'তে। **'টক্ক অপভ্রংশ'** থেকে এ ভাষার উৎপত্তি বলে কেউ কেউ অনুমান করেন। ষোড়শ শতাব্দীতে সংকলিত শিখদের প্রধান ধর্মগ্রন্থ 'আদিগ্রন্থ' বা 'গ্রন্থসাহেব'-ই এ ভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন। পঞ্জাবীর উভয় শাখাতেই একটি প্রাচীন বৈশিষ্ট্য বর্তমান রয়েছে—স্বরমধ্যবর্তী যুগ্ম ব্যঞ্জন একক ব্যঞ্জনে পরিণত হয়নি (রক্ত<রত্ত)।

(ই) **পাহাড়ী**—হিমালয়ের মধ্য ও পশ্চিমাংশে প্রচলিত ভাষাকে সাধারণভাবে 'পাহাড়ী' ভাষা বলা হয়। 'খশ্ অপভ্রংশ' থেকে পাহাড়ী ভাষাগোষ্ঠীর উৎপত্তি বলে অনুমান করা হয়। এর তিনটি প্রধান শাখা : **পূর্বী পাহাড়ী, মধ্য পাহাড়ী ও পশ্চিমা পাহাড়ী**। পূর্বী পাহাড়ীর প্রধান ভাষা **নেপালী**। **খশ্‌কুরা বা গুরখালি** নামেও এ ভাষা প্রচলিত। এ ভাষায় আধুনিক কালে সাহিত্য রচিত হচ্ছে, পূর্বে এ অঞ্চলে মৈথিলি, পূর্বী হিন্দী এবং বাংলা ভাষারও প্রচলন ছিল। মধ্য পাহাড়ীর অন্তর্গত দু'টি ভাষা—**কুমায়নী ও গাড়োয়ালি**। এতে আধুনিক কালে সাহিত্য রচিত হচ্ছে। পশ্চিমা পাহাড়ী গুচ্ছে অন্ততঃ ৩০টি ভাষারূপ প্রচলিত আছে। এদের মধ্যে প্রধান—**চম্বলী, জৌনসারি** প্রভৃতি।

২. **প্রতীচ্যা**—প্রতীচ্যার দু'টি প্রধান শাখা—এক শাখায় রাজস্থানী ভাষাগুচ্ছ, অপর শাখায় গুজরাটী প্রধান। রাজস্থানী গুচ্ছের অন্তর্গত ভাষা **জয়পুরী, মারোয়াড়ী**, মেবারি, মালবী প্রভৃতি। "নাগর অপভ্রংশ" থেকে রাজস্থানী এবং তার পশ্চিমী রূপ থেকে **গুজরাটীর** উদ্ভব বলে অনুমান করা হয়। উভয়ের প্রাচীনতর এবং সাধারণ রূপ ছিল প্রাচীন পশ্চিমা রাজস্থানী। মারোয়াড়ি ভাষায় লিখিত প্রাচীন সাহিত্য বর্তমান। **নাগরী** এবং **মহাজনী** দু'প্রকার লিপিই এখানে প্রচলিত। রাজস্থানীর একটি উপভাষা **'খান্দেশী'**—এই ভাষায় রচিত লোকসাহিত্যের সন্ধান পাওয়া যায়। খ্রীঃ চতুর্দশ শতক থেকে গুজরাটি সাহিত্যকীর্তির পরিচয় পাওয়া যায়। এই ভাষার প্রাচীন প্রসিদ্ধ কবি নরসি মেহতা। **ভীলী** গুজরাটের একটি উপভাষা। এই ভাষায় কিছু লোকসাহিত্যের সন্ধান পাওয়া যায়।

৩. **অবাচ্যা বা দাক্ষিণী**—এই শাখার উল্লেখযোগ্য ভাষা একটিই মাত্র—**মরাঠী**। মাহারাষ্ট্রী অপভ্রংশ থেকে এই ভাষার উৎপত্তি অনুমান করা হয়। ১২৯১ খ্রীঃ রচিত জ্ঞানদেবের 'জ্ঞানেশ্বরী' (গীতার টীকা) মরাঠী ভাষায় রচিত সর্বপ্রাচীন গ্রন্থ। মরাঠী ভাষায় ক্লীবলিঙ্গের প্রয়োগ বর্তমান। মরাঠীর দুটি উপভাষা—**'কোংকণী' ও 'বরারী'**। অবশ্য কেউ কেউ কোঙ্কণীকে মরাঠী ভাষার উপভাষা না বলে স্বতন্ত্র শাখা বলে চিহ্নিত করতে চান। গোয়াস্থিত খ্রীষ্টান পাদ্রীরা সর্বপ্রথম কোঙ্কণী

ভাষার চর্চা শুরু করেন। দ্রাবিড়মিশ্রিত অপর একটি মরাঠী উপভাষা '**হলবী**'—বস্তার জেলায় ব্যবহৃত হয়। শিবাজীর মন্ত্রী বালাজী আওয়াজী-কর্তৃক আবিষ্কৃত 'মোড়ী' নামক লিপি এই ভাষায় ব্যবহৃত হয়। মরাঠীতে নাগরী লিপি ব্যবহৃত হয়।

৪. **মধ্যদেশীয়া (ক)**—এই ভাষার সাধারণ প্রচলিত নাম **হিন্দী** বা **হিন্দুস্থানী** হলেও এর ভাষাতাত্ত্বিক নাম '**পশ্চিমা হিন্দী**'—শৌরসেনী অপভ্রংশের বংশধর। এর দু'টি প্রধান শাখা—একটি মথুরা অঞ্চলের তথা ব্রজমণ্ডলের ভাষা 'ব্রজভাখা' (=ব্রজভাষা ; এর সঙ্গে 'ব্রজবুলি'র কোন সম্পর্ক নেই), অপরটি '**খড়ী বোলী**'। ব্রজভাষার সঙ্গে কনৌজি ভাষার নিকট সম্পর্ক। মধ্যযুগে ব্রজভাষায় সুমধুর সাহিত্য রচিত হয়েছিল। খড়ীবোলীই প্রকৃত হিন্দী ভাষা। এর দুটি রূপ—একটি নাগরী লিপিতে লিখিত সংস্কৃতবহুল '**হিন্দী**', অপরটি ফারসী অক্ষরে লিখিত আরবী-ফারসীবহুল 'উর্দু'। প্রসিদ্ধ দক্ষিণী কবি আমীর খস্‌রো-রচিত দখ্‌নী ভাষায় কিছু প্রাচীন হিন্দী কবিতা রয়েছে। এই দখ্‌নী ভাষা থেকেই বস্তুতঃ উর্দুর উদ্ভব। ব্রজভাষায় রচিত সাহিত্য ছাড়া হিন্দী ভাষায় রচিত প্রাচীন সাহিত্য বিশেষ কিছু নেই। হিন্দী ভাষা রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা লাভ করাতে সরকারী সহায়তায় আধুনিক কালে সাহিত্যের বিভিন্ন শাখা বেশ সমৃদ্ধি লাভ করে চল্‌ছে। পশ্চিমী হিন্দীর উপভাষাগুলোর মধ্যে আছে '**হরিয়ানী** বা **বঙ্গারু, বুন্দেলী, কথ্য হিন্দুস্থানী** প্রভৃতি।

হিন্দী ভাষায় স্বরধ্বনিগুলির উচ্চারণ মোটামুটি অক্ষুণ্ণ রয়েছে ; হ্রস্বস্বর ও দীর্ঘস্বর—উভয়ই উচ্চারণেও বর্তমান। 'অ'-এর উচ্চারণ বিবৃত অর্থাৎ 'হ্রস্ব আ'। বাংলা অথবা কাশ্মীরী ভাষার মতো হিন্দীতে এত ধ্বনি-পরিবর্তন নেই বলে হিন্দী উচ্চারণ অনেক সহজসাধ্য, লেখায় ও উচ্চারণে বিশেষ পার্থক্য নেই। হিন্দী ব্যঞ্জন-ধ্বনির উচ্চারণও সুস্পষ্ট। ঘোষ মহাপ্রাণ ধ্বনি যথাযথ উচ্চারিত ; পাঞ্জাবী, গুজরাতি বা পূর্ববঙ্গীয় ভাষার মতো কণ্ঠনালীয়ভবন হয় না। দন্ত্য এবং মূর্ধন্য ধ্বনির পার্থক্যও স্পষ্ট। অধিকন্তু ফারসী ও আরবীর সংস্পর্শে হিন্দীতে কিছু নোতুন ধ্বনির আগম ঘটেছে—f, z, ŝ, প্রভৃতি। হিন্দী ভাষার যাবতীয় রূপান্তরের মধ্যে কতকগুলি সাধারণ বিভক্তি রয়েছে : সম্বন্ধ পদে '-কা' (স্ত্রীলিঙ্গে '-কী'), করণ ও অপাদানে '-সে', অধিকরণে '=মেঁ' এবং '-পর'। হিন্দী ক্রিয়া-বাচক বিশেষণে (Participle) বর্তমান কালে '-তাঁ', অতীতকালে '-আ', ভবিষ্যৎ কালে '-গা' ; তির্যক সর্বনামীয় রূপ-'ইস্‌, উস্‌, জিস্‌', কিস্‌' অসমাপিকা ক্রিয়া-বিভক্তি '-না' ব্যবহৃত হয়। সাধারণভাবে হিন্দী ব্যাকরণে ভিন্ন ভাষাভাষীরা যে

বিশেষ অসুবিধা বোধ করেন, সেই ক'টি বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বহুবচনের ক্ষেত্রে ক্রিয়ারূপেরও পরিবর্তন সাধিত হয়, পুরুষের ক্ষেত্রে তো হয়ই। যেমন—'মই জাওঙ্গা' কিন্তু 'হাম্ জাএঙ্গে', 'তু জাএগা' কিন্তু 'তুম্ জাওগে'। বহুবচনের বিভক্তিতেও বৈচিত্র্য আছে, যেমন—'ঘোড়া>ঘোড়ে, বাৎ>বাতেঁ, স্ত্রী> 'স্ত্রীয়াঁ'। হিন্দীতে স্ত্রীলিঙ্গের ব্যবহার লিঙ্গগত নয়, ব্যাকরণগত এবং সেই ব্যাকরণের নিয়মও সর্বজনমান্য নয়। তবে সাধারণতঃ বিদেশি শব্দমাত্রই স্ত্রীলিঙ্গ ('গোঁফওয়ালী পুলিস্ আতী হৈ'), এবং তদ্ভব শব্দের ক্ষেত্রে মূল তৎসম শব্দের লিঙ্গই বিবেচ্য হয়ে থাকে। সেই বিশেষ্য পদের বিশেষণ এবং ক্রিয়াপদটিও বিশেষ্যের লিঙ্গ গ্রহণ করে। যেমন—'নয়ী কিতাব', 'গোরা লড়কা', কিন্তু 'গোরী লড়কী', 'ভাত অচ্ছা বনা মগর ডাল অচ্ছী নহীঁ বনী'। কর্তৃকারক ভিন্ন অপর কারকে একবচনে সম্বন্ধ পদে বিভক্তি '—কে' (কর্তৃকারকে '—কা') এবং বহুবচনে সর্বত্র '-কে' হয়—'উন্-কা ঘোড়া খাড়া হৈ' কিন্তু 'উন্-কে ঘোড়ে পর মৎ চড়ো', 'সেঠজী-কে তীন ঘোড়োঁ-মেঁ এক ভী অচ্ছা নহীঁ।' হিন্দীতে অপর একটি বিশিষ্ট প্রয়োগ—কর্তৃকারক-স্থানীয় করণকারক (Agentive Case); সকর্মক ক্রিয়ার অতীত কালে কর্তায় '-নে' বিভক্তি দ্বারা এটি প্রকাশিত হয়। যেমন চলতি হিন্দীতে 'হম্ রোটী খায়া, হর্ম্ ভাত খায়া'—স্থলে হ'বে 'হম্-নে (মৈ-নে) রোটী খাঈ, ভাত খায়া'। অকর্মক ক্রিয়া-স্থলে ক্রিয়াটি কর্তার সঙ্গেই অন্বিত হয়—'তু চলা, তুম্ চলে।' আচার্য সুনীতিকুমার বলেন: "Grammatical gender and the passive construction for the Past Tense of the transitive verb... make the language difficult."

মধ্যদেশীয়া (খ)—সাধারণভাবে **পূর্বী হিন্দী** নামে পরিচিত হলেও ভাষাতাত্ত্বিক দিক্ থেকে এ ভাষা পশ্চিমী হিন্দী থেকে জাতিগোত্রে পৃথক। এই ভাষাগুচ্ছকে **'কোশলী'** নামে অভিহিত করা চলে। এই গুচ্ছের অন্তর্গত তিনটি ভাষা প্রধান—**অওধী, বাঘেলী ও ছত্তিশগড়ী**। এদের মধ্যে অওধী ভাষা প্রাচীন ঐশ্বর্যে অনন্যা। খৃঃ দ্বাদশ শতক থেকে এই ভাষায় সাহিত্য রচিত হ'য়ে আসছে। উল্লেখযোগ্য সাহিত্যকীর্তি—চতুর্দশ শতাব্দীতে দাউদের 'চান্দায়ন', ষোড়শ শতকের গোড়ার দিকে কুতবনের 'মৃগাবতী', ঐ শতকের মধ্যভাগে মালিক মুহম্মদ জায়সীর 'পদ্মাবতী' এবং শতকের শেষভাগে মহাকবি তুলসীদাসের সুবিখ্যাত 'রামচরিতমানস'। পূর্বী হিন্দী পশ্চিমা হিন্দীর দাপটে আপন স্বাতন্ত্র্য হারিয়ে ফেলছে, এখন পশ্চিমা হিন্দীই ঐ অঞ্চলে সাহিত্যের ভাষারূপে একাধিপত্য বিস্তার করছে। পূর্বী হিন্দী 'অর্ধমাগধী অপভ্রংশ' থেকে উৎপন্ন বলে অনুমান করা হয়।

৫. **প্রাচ্য**—প্রাচ্য ভাষাগোষ্ঠী 'মাগধী অপভ্রংশ' থেকে জাত বলে **অনুমান** করা হয়। এর দুটি প্রধান শাখা—একটি পশ্চিমী প্রাচ্য বা **বিহারী**—এতে আছে **মৈথিলী, মগহী** এবং **ভোজপুরিয়া**। অপরটি পূর্বীপ্রাচ্য—এর অন্তর্গত **অসমীয়া, ওড়িয়া ও বাংলা**। মাগধী ভাষাগুলোর প্রধান বৈশিষ্ট্য—অতীতকালে '-ল' বিভক্তি, ভবিষ্যৎকালে '-ব' বিভক্তির প্রয়োগ এবং অতীতকালের প্রথম পুরুষে সকর্মক-অকর্মক ক্রিয়ার রূপভেদ।

বিহারী ভাষাগুলোর মধ্যে প্রধান ভাষা **মৈথিলী**। চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথম পাদে উমাপতি ওঝার 'পারিজাতহরণ' নাটকের পদাবলী, জ্যোতিরীশ্বর ঠাকুরের 'বর্ণরত্নাকর' মৈথিলী ভাষার প্রাচীন নিদর্শন। মহান্ কবি বিদ্যাপতি মিথিলারই কবি। মিথিলার তথা বিহারী সাহিত্যের প্রাচীন ঐতিহ্য রাজনৈতিক পাকে-চক্রে হিন্দীর আওতায় বিনষ্ট হ'তে বসেছিল। সম্প্রতি মৈথিলী সাহিত্যে নবজাগরণের লক্ষণ দেখা দিয়েছে। কবীর সম্ভবতঃ ভোজপুরিয়াতেই তাঁর অধিকাংশ গান রচনা করেছিলেন। মগহী ভাষায় কোন লিখিত সাহিত্য পাওয়া যায়নি।

মৈথিলী ভাষায় একসময় 'তিরহুতি' ও 'কাইথি' লিপি ব্যবহৃত হ'তো। এক্ষণে দেবনাগরী লিপি ব্যবহৃত হবার ফলে অনেকের ধারণা—এই ভাষা তথা ভাষাগোষ্ঠী হিন্দী ভাষার সঙ্গে যুক্ত। কিন্তু এটি যে একান্ত ভ্রান্ত ধারণা, তার বড় প্রমাণ—এই ভাষাগোষ্ঠীতে এখনো পূর্বাঞ্চলের বাংলা-অসমীয়া-ওড়িয়া ভাষাগোষ্ঠীর মতোই অতীতকালে '-ল' প্রত্যয় ('ভৈল'='হইল', কিন্তু হিন্দীতে 'হুয়া থা') এবং ভবিষ্যৎ কালে '-ব' প্রত্যয় ('যাওব'-'যাব', হিন্দীতে 'জাওঙ্গা') ব্যবহৃত হয়। মৈথিলীতে 'অ'কারের বিবৃত উচ্চারণ (হিন্দীর মতো) এবং সংবৃত উচ্চারণ (বাংলার মতো)—দুই-ই প্রচলিত আছে। বিভক্তি রূপে ষষ্ঠীতে যেমন '-কা, -কো' প্রভৃতি ব্যবহৃত হয়, তেমনি রয়েছে '-র'-এরও প্রয়োগ। বহুবচন পদ-গঠনে 'সব্' এবং 'লোকনি' প্রভৃতি সমষ্টিবাচক শব্দ যোগ করা হয়। হিন্দীর মতোই লিঙ্গ-বিচারে যেমন কঠোরতা মানা হয়, তেমনি আবার বাংলার মতো শিথিল প্রয়োগও যথেষ্টই রয়েছে ('তোর/তোরী বেটী')। বাংলার মতোই বিভিন্ন কারকে বিভক্তি-স্থলে অনুসর্গের ব্যবহারও এই গোষ্ঠীতে প্রচলিত। যৌগিক কাল বোঝাতে 'আছ' (বাংলায়ও একই প্রকার) এবং 'রহ্' ধাতুর (বাং-'থাক্') প্রয়োগ ('দেখইতছথি'/ 'অবইত রহব') প্রভৃতি মৈথিলী ভাষার বৈশিষ্ট্য।

পূর্বী প্রাচ্যের তিন ভাষা—অসমীয়া-ওড়িয়া ও বাংলা প্রায় দ্বাদশ শতক পর্যন্ত একই ধারায় প্রবাহিত হচ্ছিল। দ্বাদশ শতকের তাম্রশাসনে 'ওড়িয়া ভাষা'র নিজস্ব

পরিচয় পাওয়া যায়। ষোড়শ শতকে চৈতন্যদেবের প্রভাবে ওড়িয়া ভাষার শ্রীবৃদ্ধি হয়। ধ্বনি পরিবর্তনের দিক্ থেকে ওড়িয়া ভাষা বাংলা অপেক্ষা অধিকতর রক্ষণশীল। তবে ওড়িয়া ভাষায় কিছুটা দ্রাবিড় এবং মরাঠী প্রভাবের পরিচয় আছে। পূর্বাঞ্চলীয় অপর ভাষাগুলির তুলনায় 'ওড়িয়া ভাষা' অধিকতর রক্ষণশীল, তাই ভাষাবিদ্যার অনুশীলনে এই ভাষার গুরুত্ব অপরিসীম। ওড়িয়া ভাষায় পদমধ্যস্থ ও পদান্তে 'অ' ধ্বনি বর্তমান রয়েছে (বাংলায় পদ-মধ্যে 'ও' এবং পদান্তে লুপ্ত হয়েছে)। 'ঋ'-কারের উচ্চারণ 'রু', মূর্ধণ্য 'ণ'-এর উচ্চারণ 'ড়' এবং মূর্ধণ্য ল-এর উচ্চারণে দ্রাবিড় প্রভাবের পরিচয় বর্তমান। দীর্ঘস্বরের উচ্চারণ এবং স্বরসঙ্গতির অভাবহেতু অপর সমস্ত স্বরধ্বনির উচ্চারণও অনেকটা অব্যাহত রয়েছে। কাজেই বানানে আর উচ্চারণে ওড়িয়ায় পার্থক্য কম। ওড়িয়া ভাষায় বহুবচনে-'মান' বিভক্তি, অপাদান কারকে '-রু' বিভক্তি, সম্বন্ধ পদের বহুবচনে '-ঙ্কর' বিভক্তি এবং 'ভূ' ধাতুর 'হে' পরিণতি বিশেষ ভাবে লক্ষণীয়।

খৃষ্ট পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীর দিক থেকেই **'অসমীয়া ভাষা'**ও স্বাতন্ত্র্য লাভ করে। চৈতন্যদেবের সমসাময়িক শংকরদেবের প্রভাবে অসমীয়া ভাষার শ্রীবৃদ্ধি সূচিত হয়। নব্য ভারতীয় আর্যভাষাগুলোর মধ্যে অসমীয়া ভাষাতেই সম্ভবতঃ সর্বপ্রথম নাটক ও গদ্য-সাহিত্য রচিত হয়। বাংলা ভাষার যে শাখাটি 'কামরূপী' নামে পরিচিত, সম্ভবতঃ সেই শাখাটিই দেশকালোচিত রূপান্তরে আ' পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীর দিকে অসমীয়া ভাষায় পরিণতি লাভ করেছে। বাংলার সঙ্গে অসমীয়া ভাষার প্রধান পার্থক্য শব্দ ব্যবহারে। ভোট-চীনী ভাষার, বিশেষতঃ বোড়ো ভাষার ক্রমবর্ধমান শব্দ-প্রবেশই অসমীয়া ভাষাকে বাংলা থেকে দূরতর স্থানে নিয়ে যাচ্ছে। উভয় ভাষার মধ্যে ব্যাকরণগত পার্থক্য খুব বেশি নয়; লিপিবিধি প্রায় এক, দু' একটি মাত্র ব্যতিক্রম রয়েছে; তবে উচ্চারণে পার্থক্য কিছু বেশিই। মূর্ধণ্য ধ্বনির প্রবণতা অসমীয়া ভাষায় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য—'ত' বর্গের স্থলে 'ট' বর্গের উচ্চারণ বিশেষ-ভাবে লক্ষণীয়। তালব্য বর্গের ধ্বনিগুলির উচ্চারণও উষ্মীভূত, অর্থাৎ 'চ'-স্থলে 'স' (s) এবং 'জ'-স্থলে 'জ' (z) উচ্চারণ এর অন্যতম বৈশিষ্ট্য। 'স্'-এর উচ্চারণ অনেকটা 'হ্' (কণ্ঠনালীর সঙ্কোচনে অনেকটা 'খ্')-এর মতো। এ ছাড়া বিভক্তি ব্যবহারেও কিছু বৈচিত্র্য আছে, যেমন সপ্তমীতে 'ৎ' বিভক্তির প্রয়োগ।

পূর্বীপ্রাচ্যার তৃতীয় শাখা **'বাঙলা'** সর্বভারতে সর্বাধিক উন্নত ভাষা বলে স্বীকৃত। নব্যভারতীয় আর্যভাষায় রচিত প্রাচীনতম গ্রন্থ চর্যাপদ খৃষ্ট দশম থেকে দ্বাদশ শতকের

মধ্যে বাঙ্‌লা ভাষাতেই রচিত হয়। মধ্যযুগে চৈতন্যদেবের প্রভাবে এবং আধুনিক-কালে রবীন্দ্রনাথের প্রভাবে বাঙ্‌লা ভাষা ও সাহিত্য বিশ্বের দরবারেও উচ্চ মর্যাদায় আসীন।

[বাংলা ভাষা-বিষয়ে বিস্তৃততর আলোচনার জন্য গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ড দ্রষ্টব্য।]

৬. **বিবিধ**—নব্যভারতীয় আর্যভাষাগোষ্ঠীর আলোচনায় আরও তিনটি ভাষা অন্তর্ভুক্ত হ'বার দাবি রাখে, যদিও এদের অধিকার পূর্বোক্তগুলোর মতো নয়। এদের মধ্যে আছে—(ক) কাশ্মীরি, (খ) সিংহলী, (গ) জিপ্সি বা রোমানী।

কাশ্মীরি—ভাষাবিজ্ঞানীদের অনেকেই কাশ্মীরি ভাষাকে দরদীয় ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত বলে বিবেচনা করেন। সেই হিশেবে কাশ্মীরিকে ভারতীয় আর্যভাষা-পরিবারের অধীনে আনা যায় না, যদিও এটি একটি ভারতীয় ভাষা এবং দরদী আর্য ভাষার সন্তান হলেও প্রভূত পরিমাণে ভারতীয় আর্যভাষা দ্বারা প্রভাবান্বিত। আবার কেউ কেউ কাশ্মীরি ভাষাকে ঈরানী-প্রভাবান্বিত ভারতীয় আর্যভাষা বলেই মনে করেন। সেইক্ষেত্রে ভাষাটি 'পৈশাচী প্রাকৃত' থেকে জাত অনুমিত হয়। কাশ্মীরি ভাষায় প্রাচীন কালে অনেক সাহিত্য রচিত হয়েছে। চতুর্দশ শতকে লল্লের কয়েকটি কবিতাই কাশ্মীরি ভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন। **কোহিস্থানী, শীনা, চিত্রালি** প্রভৃতি এই গোষ্ঠীর অপর প্রধান ভাষা। ব্রাহ্মী থেকে উদ্ভূত শারদা লিপিতে আগে কাশ্মীরি ভাষা লিখিত হতো, বর্তমানে ফারসী লিপি সেই স্থান অধিকার করেছে।

(খ) **সিংহলী**—সিংহলী ভাষা ভারতের বাইরে প্রচলিত থাকলেও এই ভাষাটি ভারতীয় আর্যভাষার সন্তান। সম্ভবতঃ খ্রী' পূ' চতুর্থ শতকে এই ভাষা ভারতীয়দের দ্বারা সিংহলে নীত হয় এবং কালে স্বাধীনভাবে বিকশিত হয়। অবশ্য পরবর্তীকালে এই ভাষার উপর তামিল ভাষার প্রভাব পড়ে। সিংহলী ভাষার উৎপত্তি-বিষয়ে মতভেদ আছে। কেউ বলেন প্রাচ্যা প্রাকৃত থেকে, কারো মতে পাশ্চাত্ত্য প্রাকৃত থেকে, আবার কোন কোন মতে পালি থেকে সিংহলী ভাষার উৎপত্তি। সিংহলের প্রাচীনতম ভাষা 'এলু' (Elu) অবহট্‌ঠের পর্যায়ভুক্ত। মহাপ্রাণ বর্ণের অল্পপ্রাণতা এবং তিন শিস্‌ধ্বনির মধ্যে শুধু 'স'-এর অস্তিত্ব এর বিশিষ্ট লক্ষণ। অষ্টম শতকে সিংহলী ভাষায় রচিত প্রাচীনতম সাহিত্যের নিদর্শন পাওয়া যায়। মালদ্বীপে প্রচলিত '**মালী**' ভাষা সিংহলী ভাষারই একটি শাখা।

(গ) **জিপ্সি / রোমানী**—প্রায় দেড় হাজার বছর ধরে জিপ্সি নামে যে যাযাবর জাতি পশ্চিম এশিয়া এবং সমগ্র য়ুরোপে যাযাবর জীবন যাপন করছে, তাদের ভাষা 'জিপ্সি' বা 'রোমানী' যে মূলতঃ ভারতীয়, ঐ কথা ভাষাবিজ্ঞানিগণ প্রায়

ভারতীয় আর্যভাষা
দরদী
উদীচ্য
প্রতীচ্য (পশ্চিমা)
অবাচ্য (দক্ষিণী)
মধ্যদেশীয়া
প্রাচ্য
বহির্ভারতে
কাশ্মীরি
শীনা
চিত্রালি
উত্তরপশ্চিমা
পাহাড়ী
গুজরাটি
ভীলী
রাজস্থানী
মরাঠী
ব্রজভাখা
কনৌজি
খড়ীবোলী
হিন্দী
উর্দু
বুন্দেলী
বঙ্গারু
সিংহলী
রোমানী
সিন্ধী
পঞ্জাবী
পূর্বী
মধ্য
পশ্চিমী
কোঙ্কনী
হলবী
পশ্চিমী
পূর্বী
লহন্দী
হিন্দকী
নেপালী
কুমায়ুনী
গাড়োয়ালী
বাংলা
অসমীয়া
ওড়িয়া
কোশলী
(পূর্বী হিন্দী)
চম্বলী
জৌনসারী
ছাত্রিশগড়ী
বঘেলী
অবধী
মগহী
ভোজপুরিয়া
মৈথিলী
জয়পুরী
মারোয়াড়ী
মেবারী
খান্দেশী
মালবী
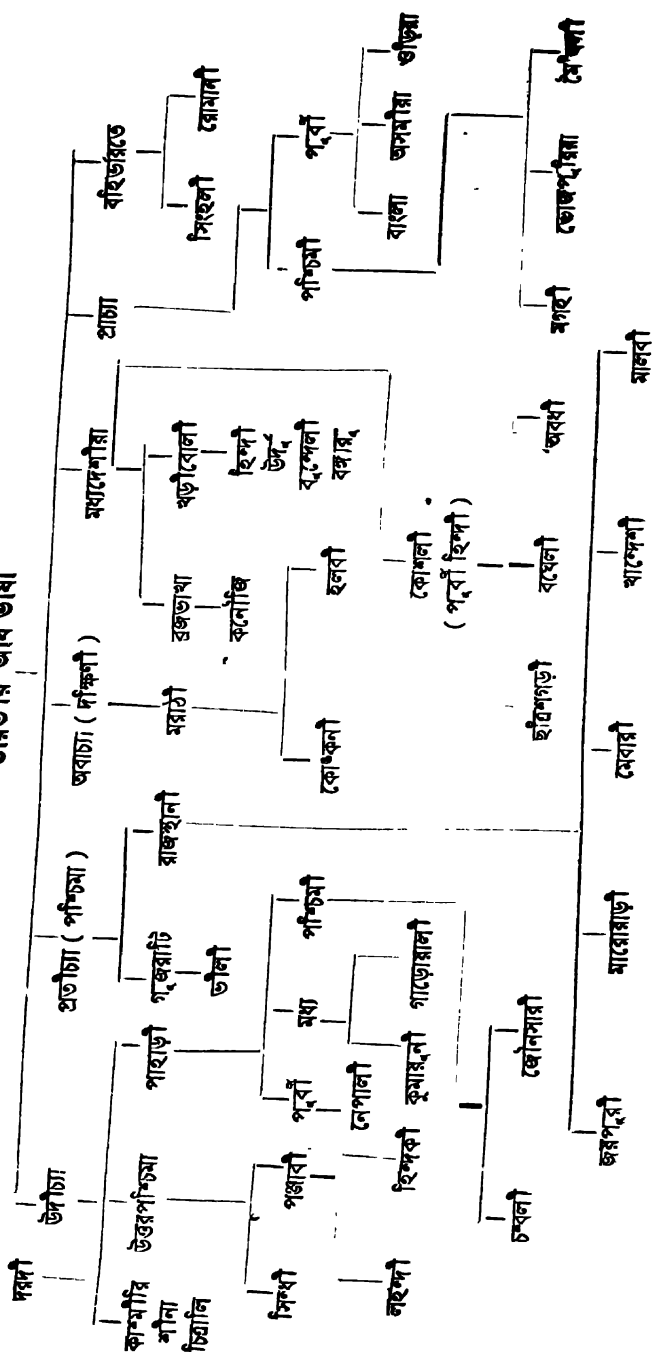
সকলেই স্বীকার করে থাকেন। সম্ভবতঃ খ্রী. তৃতীয় থেকে পঞ্চম শতকের মধ্যে উত্তর-পশ্চিম ভারত থেকে এদের পূর্বপুরুষ পশ্চিমে যাত্রা করে। পুরুষানুক্রমে এরা দেশ থেকে দেশান্তরে যাত্রাপথে বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন শব্দ ও বাগ্‌ভঙ্গি আয়ত্ত করে নিজেদের ভাষার সঙ্গে মিশিয়ে ফেলে। ফলতঃ রোমানী ভাষা এক্ষণে এক মিশ্রভাষায় পরিণত হ'য়েছে। তারা যে দেশে বাস করে, সেই দেশের ভাষার সঙ্গেই ভারতীয় ভাষার মিশ্রণ ঘটে। একটা দৃষ্টান্ত—the tatcho (তচ্চো = সত্য > সাচ্চা) drom (পথ) to be a jinnimengro (জ্ঞানী মানুষ) is to shun (শোনা), dik (দেখা) and rig (রাখা) in zi (ধী = মন)। বাংলা ভাষার সঙ্গেও রোমানী ভাষার বেশ সাদৃশ্য পাওয়া যায়। যেমন—'রা কের' (= রা কাড়া), 'দুই দিবেসা গিলে' (= দুই দিবস গেলে) 'তুম দুই' (তোমরা দু'জন)।

পঞ্চম অধ্যায়

ভারতের আর্যেতর ভাষাগোষ্ঠী

(Non Aryan Language of India)

সমগ্র ভারতে আর্যভাষার প্রাধান্য থাকলেও আর্যগণ ভারতের আদিম অধিবাসী নয়, আর্যভাষাও ভারতের আদি ভাষা নয়। ঐতিহাসিকগণ ভারতে প্রধান চারটি জাতিগোষ্ঠীর অস্তিত্ব অনুমান করলেও ভারতের আদিম জাতিরূপে তাঁরা 'নিগ্রোবটু'র (Negrito) কথা উল্লেখ করেছেন ; কিন্তু বর্তমান কালে মূল ভারত ভূখণ্ডে তাদের চিহ্নমাত্রও নেই। অনেকে অনুমান করেন, আন্দামান-নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে এখনও তাদের শেষ চিহ্ন বর্তমান রয়েছে।

বর্তমান কালে ভারতে যে সব জাতি স্থায়িভাবে বসবাস করছে, তাদের মধ্যে সম্ভবতঃ অস্ট্রীক বা নিষাদ জাতিই সর্বপ্রথম আগন্তুক। তারপরই সম্ভবতঃ দ্রাবিড় জাতি। আদৌ হয়তো দ্রাবিড় জাতি উত্তর-পশ্চিম ভারতেই বসবাস করতো। এরপর আর্যগণ উত্তর-পশ্চিম ভারতে উপনিবিষ্ট হলে দ্রাবিড়গণ ক্রমশঃ দক্ষিণ দিকে সরে যেতে থাকে। ভারতে সম্ভবতঃ সর্বশেষ আগন্তুক মঙ্গোলয়েড্ বা কিরাত জাতি। হয়তো বা তারা আর্যদের সমকালে কিংবা কিঞ্চিৎ আগেও এসে থাকতে পারে। অতএব ভারতের আর্যেতর জাতি বলতে বোঝায় (১) অস্ট্রীক বা নিষাদ, (২) দ্রাবিড়, (২) মঙ্গোল বা কিরাত জাতি।

[এক] অস্ট্রীক (Austric) / নিষাদ

(ক) **পরিচয়**—কোন্ সুদূর প্রাগৈতিহাসিক যুগে অস্ট্রীক জাতি ভারতে এসেছিল, তার সন্ধান পাওয়া সম্ভব নয়। তবে ভারতে অবস্থিত বিভিন্ন জাতি-সমষ্টির মধ্যে এরাই যে প্রাচীনতম, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এই অস্ট্রীক জাতির মূল বাসস্থান কোথায় ছিল এবং কোন্ পথ দিয়ে ভারতে তাদের অনুপ্রবেশ ঘটেছিল এ বিষয়ে পণ্ডিতমহলে মতান্তর লক্ষ্য করা যায়। সারা পৃথিবীতে অস্ট্রীক জাতির লোকসংখ্যা খুবই কম, কিন্তু অপর কোন জাতিই এমন বিস্তৃত এলাকা নিয়ে বসবাস করে না। একদিকে পশ্চিমে আফ্রিকার মাদাগাস্কাব থেকে পূর্বে ঈস্টার দ্বীপ পর্যন্ত, অন্যদিকে উত্তরে পাঞ্জাব থেকে দক্ষিণে নিউজিল্যাণ্ড পর্যন্ত এদের বিস্তৃতি। মিখাইল নেস্তুর্খ মনে করেন যে এশিয়া মহাদেশের দক্ষিণ-পূর্ব কোণই ছিল অস্ট্রেশীয় এবং মেলানেশীয়দের আদি বাসস্থান। ইন্দোচীন থেকে আদি প্রস্তর

যুগেই তারা চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। ডঃ বিরজাশংকর গুহ মনে করেন যে দক্ষিণ ভারত থেকেই অস্ট্রালয়েড্‌রা অস্ট্রেলিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জে অনুপ্রবিষ্ট হয়। আচার্য সুনীতিকুমার অনুমান করেন যে প্রোটো-অস্ট্রালয়েড্‌রা মধ্য এশিয়ার সম্ভবতঃ প্যালেস্টাইন থেকে সুপ্রাচীনকালে ভারতে প্রবেশ করে। সুমেরীয় ভাষার সঙ্গেও অস্ট্রীক ভাষার সাদৃশ্য কেউ কেউ লক্ষ্য করেছেন।

অস্ট্রীক ভাষার যে বহুধাবিভক্ত শাখাটি ভারতবর্ষে প্রচলিত সেটা সাধারণতঃ **কোল** (Kol) বা **মুণ্ডা** (Munda) ভাষা নামেই পরিচিত। মুণ্ডা ভাষার দুটি শাখা—পশ্চিমা শাখার অন্তর্গত '**শবর**, কোরকু, খাড়িয়া' প্রভৃতি এবং পূর্বী শাখার অন্তর্ভুক্ত 'সাঁওতালী, মুণ্ডারি, হো, কোডা, ভূমিজ' প্রভৃতি। অস্ট্রীক গোষ্ঠীর আর একটি শাখা 'মোন্‌-খ্‌মের'—এই ভাষারই অপর একটি শাখা মায়ানমা (বার্মা) ও ইন্দোচীনে, নিকোবর দ্বীপে এবং আসামেও 'খাসি' ভাষা-রূপে বর্তমান।

আকৃতিগত দিক থেকে মুন্ডা ভাষা অশ্লিষ্ট যোগাত্মক। শব্দের আদিতে, অন্তে এবং মধ্যেও প্রত্যয় যুক্ত হয়ে থাকে। ভারতীয় আর্যভাষার মতো এই ভাষাতেও অঘোষ, ঘোষ, অল্পপ্রাণ এবং মহাপ্রাণ ধ্বনির অস্তিত্ব বর্তমান। অর্ধস্বর, স্বর এবং ব্যঞ্জনের অতিরিক্ত একপ্রকার অর্ধব্যঞ্জন ধ্বনিও এই ভাষায় শ্রুত হয়। শব্দগুলো অধিকাংশ ক্ষেত্রে দু' অক্ষরবিশিষ্ট। ভাষায় তিন বচন ও দুই লিঙ্গ। শব্দে গুরুত্ব আরোপের জন্য শব্দদ্বিত্বের প্রয়োগ বহুলপ্রচলিত।

(খ) আর্যভাষায় অস্ট্রীক ভাষার প্রভাব

মুণ্ডা ভাষা অতিশয় প্রাচীন এবং বহুবিস্তৃত হ'লেও সাম্প্রতিক কালের পূর্বে এই ভাষায় কোন সাহিত্য রচিত হয়নি। দীর্ঘকাল বিভিন্ন আর্য ও দ্রাবিড় ভাষার ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে থাকবার জন্যে পারস্পরিক প্রভাবের পরিমাণ নগণ্য নয়। অবশ্য মুণ্ডাভাষার কোন প্রাচীন রূপের নিদর্শন না পাওয়াতে প্রভাবের পরিমাণ নির্ণয় করা সহজ নয়। তবে এই ভাষার উপর যে আর্যভাষার প্রবল প্রভাব পড়েছে তা' নিঃসন্দেহে বলা চলে। আবার ভারতীয় আর্যভাষার উপরও মুণ্ডাভাষার প্রচুর প্রভাবের পরিচয় বিদ্যমান। শুধু ভাষার ক্ষেত্রেই নয়, ভারতীয় জীবনযাত্রা, আচার-অনুষ্ঠান ইত্যাদি অনেক কিছুর উপরই মুণ্ডাপ্রভাবের পরিচয় পাওয়া যায়।

অতি প্রাচীনকাল থেকেই পারস্পরিক যোগাযোগের ফলে বেশ কিছু মুন্ডা শব্দ সংস্কৃত ভাষাতেও অনুপ্রবিষ্ট হয়। বৈদিক যুগেও যে সংস্কৃত ভাষার উপর অস্ট্রীকের প্রভাব পড়েছিল, কোন কোন শব্দ-ব্যবহারে তা' অনুমান করা চলে, 'শম্বর, অর্বুদ' প্রভৃতি অসুরের নাম, 'দণ্ড, অন্ড' প্রভৃতি শব্দ বেদে সম্ভবতঃ নিষাদ ভাষা থেকেই

গ্রহণ করা হয়েছে। 'অলাবু, কদলী, কার্পাস, তাম্বুল. নীর, ফল, লাঙ্গল, গুবাক, নারিকেল, সর্ষপ, উন্দুরু (>ইঁদুর)' প্রভৃতি শব্দ মুণ্ডা ভাষা থেকেই সংস্কৃত ভাষায় গৃহীত হয়েছে বলে অনুমিত হয়। এরূপ. অনেক শব্দ এখন তৎসম শব্দ রূপে পরিগণিত হয়েছে এবং অনেক শব্দের তদ্ভব রূপেও প্রচলিত আছে। 'দেশী' বলে অভিহিত এবং 'অজ্ঞাতমূল' অনেক শব্দই মুণ্ডাভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। 'খোকা, খড়, খুঁটি, ডাঙ্গা, ডিঙ্গা, ঝিঙ্গা, ঢিল, ঝাউ, মুড়ি, হুড়ুম' প্রভৃতি শব্দ মুণ্ডা ভাষারই দান। এছাড়া প্রচলিত বাংলায় 'উচ্ছে, ঠোঙ্গা, ঢেঁঙ্গা, চিংড়ি, চুলা, ঢিপি, ঢেঁকি, তোতলা, ঘুড়ি প্রভৃতি শব্দও সরাসরি মুণ্ডা ভাষা থেকেই এসেছে বলে অনুমান করা হয়। 'গঙ্গা, গোদাবরী'-আদি নদীর নাম, 'বঙ্গ' দেশের নাম—এদের মূলেও মুণ্ডা প্রভাব থাকার কথা পণ্ডিতেরা অনুমান ক'রে থাকেন। 'কুড়ি' শব্দটি এবং কুড়ি-হিশেবে গণনা-পদ্ধতি (দু'কুড়ি, তিনকুড়ি) ঐ ভাষা থেকেই নেওয়া হয়েছে। বিহারী ভাষায় ক্রিয়ারূপের জটিলতার পিছনে মুণ্ডাপ্রভাবই বর্তমান। মধ্যভারতের কোন কোন ভাষায় উত্তম পুরুষের বহুবচনে যে দ্বিবিধ রূপের (একটি, যার সঙ্গে কথা হ'চ্ছে তাকে নিয়ে, অপরটি, তাকে বাদ দিয়ে) পরিচয় পাওয়া যায়; তাও মুণ্ডা ভাষার প্রভাব-জাত। বাংলা ক্রিয়াপদের লিঙ্গহীনতা মুণ্ডাভাষার সাদৃশ্যজনিত হওয়া সম্ভব। বাঙলা ভাষায় শব্দদ্বৈত অর্থাৎ জোড়া শব্দের ব্যবহারে ঐ ভাষার প্রভাব রয়েছে।
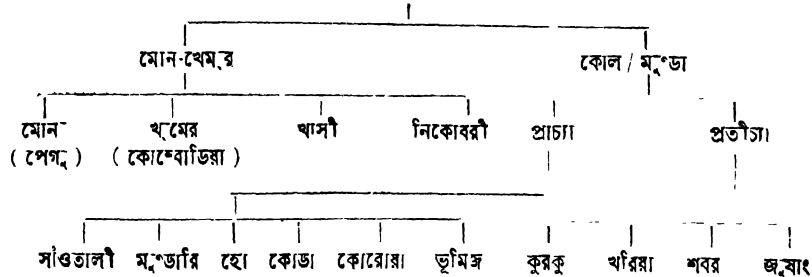
[দুই] দ্রাবিড়

(ক) পরিচয়--প্রাগৈতিহাসিক কালেই ভারতের বুকে দ্রাবিড় জাতির আগমন ঘটে, সম্ভবত অস্ট্রিক জাতির পর এরা এসেছিল। দ্রাবিড় জাতির প্রাচীন পরিচয় নিয়ে বিভ্রান্তির সুযোগ রয়েছে—এ বিষয়ে পণ্ডিতগণ নানাপ্রকার সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করেছেন। বিশপ কল্ডওয়েল (Bishop Coldwell) দ্রাবিড় ভাষাকে 'তুরানীয়' তথা 'উরাল-আলতাই' ভাষাগোষ্ঠীর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত মনে করেন। ও

স্রাডের (Prof. O. Schrader) অনুমান করেন যে এই ভাষাটি 'ফিন্নো-উগ্রীয়' ভাষাপরিবারের অন্তর্ভুক্ত। স্মিট্ (Pater W. Schmidt) অস্ট্রেলীয় ভাষার সঙ্গে দ্রাবিড় ভাষার নিকট সম্পর্ক খুঁজে পেয়েছেন। কেউ কেউ দ্রাবিড় জাতিকে সুমেরীয় জাতির শাখা বলেও মনে করেন। অপর একটি যুক্তিনিষ্ঠ অভিমত এই যে, দ্রাবিড় জাতি ঈজিয়ান ও আর্মেনয়েড্ জাতির সংমিশ্রণে উৎপন্ন।

আর্যজাতির ভারত-আগমনের বহু পূর্বেই দ্রাবিড়রা ভারতে এক নাগরিক সভ্যতার সৃষ্টি করেছিল, যার ধ্বংসাবশেষ হরপ্পা-মহেন্জোদড়োতে পাওয়া গেছে—এইটি একটি অতিপ্রচলিত অভিমত। বৈদিক সাহিত্যে এবং মহাকাব্যে-পুরাণে সম্ভবতঃ দ্রাবিড়-দেরই দাস-দস্যু-অসুর-দৈত্য-আদি বলে অভিহিত করা হয়েছে। তবে দ্রাবিড়দেরই একটি শাখা—অন্ধ্রদের উল্লেখ প্রাচীন ব্রাহ্মণ গ্রন্থে পাওয়া যায়। গোড়ার দিকে অথবা দীর্ঘকাল আর্যদের সঙ্গে এরা সংঘর্ষে লিপ্ত থাকলেও পরবর্তীকালে যে উভয়ের মধ্যে সমন্বয় সাধিত হয়েছিল, তার প্রমাণ গোটা হিন্দুজাতির সভ্যতা-সংস্কৃতি এবং পুরাণে বর্তমান। দ্রাবিড় ও আর্য নিকট প্রতিবেশীরূপে দীর্ঘকাল থাকবার ফলে পরস্পরের দ্বারা বহুল পরিমাণে প্রভাবান্বিত হয়েছে, যার পরিচয় শুধু জাতীয় ভাবধারায় নয়, ভাষার ক্ষেত্রেও সুস্পষ্ট।

কুমারিল ভট্ট দ্রাবিড় ভাষার দু'টি শাখার কথা উল্লেখ করেছেন। সূক্ষ্মবিচারে আরও ক'টি গৌণ শাখার অস্তিত্ব স্বীকার করলেও স্থূল বিচারে এই সিদ্ধান্ত সমীচীন। দ্রাবিড় শাখায় আছে তামিল, মলয়ালম্ ও কন্নড় ভাষা, অন্ধ্র শাখায় তেলুগু ভাষা। বস্তুতঃ এই চারটিই উল্লেখযোগ্য দ্রাবিড় ভাষা। এ ছাড়াও আছে দ্রাবিড় গোষ্ঠীতে 'তুল, কোডগু, তোডা, কোটা' প্রভৃতি। মধ্যবর্তী গোষ্ঠীতে 'গোণ্ডী, ওরাওঁ, মালতো, কুই, কোলামী' এবং বিচ্ছিন্নভাবে আছে 'ব্রাহুই' ভাষা।

সম্ভবতঃ উত্তর ভারত থেকে আর্যদের দ্বারা বিতাড়িত হ'য়ে দ্রাবিড়গণ বিন্ধ্য পর্বতের দক্ষিণে দাক্ষিণাত্যে নিশ্চিন্ত আশ্রয় লাভ করেছিল। বর্তমানে সমগ্র দাক্ষিণাত্যে দ্রাবিড় ভাষাই প্রধান; এই পরিবারের গৌণ এবং অনুন্নত কিছু ভাষা পূর্ব ও মধ্য ভারতেও প্রচলিত আছে।

তামিলঃ তামিলনাড়ুতে এবং শ্রীলঙ্কার উত্তরাঞ্চলে **তামিল ভাষা** প্রচলিত। খ্রী' পূ' তৃতীয় শতকে তামিল ভাষার সর্বপ্রাচীন নিদর্শন পাওয়া যায়। প্রাচীন তামিলের নিজস্ব বর্ণমালা ছিল (বট্টেলেত্তু)। তামিলের দুটি রূপ—সংস্কৃত শব্দবহুল **'শেন'** ভাষা কাব্য রচনায় ব্যবহৃত হয়; কথোপকথনের ভাষা **'কোড্ডুন'** (=গ্রাম্য)। তামিল ভাষায় সংস্কৃতের প্রভাব অপেক্ষাকৃত কম।

প্রাচীন তামিলের বৈশিষ্ট্য এই ভাষাতেই সর্বাধিক সংরক্ষিত। তামিলে ব্যবহৃত স্বরবর্ণের সংখ্যা ১২টি ; সংস্কৃত 'ঋ, ৯' তামিলে নেই, তবে 'এ' এবং 'ও'—হ্রস্ব ও দীর্ঘ দ্বিবিধ। তামিলে ব্যঞ্জনের সংখ্যা মাত্র ১৮টি ; বর্গের প্রথম ও পঞ্চম বর্ণ আছে, মহাপ্রাণ ও ঘোষবর্ণ নেই, মহাপ্রাণ ধ্বনিও নেই, ঘোষধ্বনি থাকলেও অবস্থানের সুনির্দিষ্টতা-হেতু অঘোষ বর্ণ দ্বারাই তা' বোঝানো যায়। এইজন্য তামিল অক্ষরে সংস্কৃত লেখা যায় না, তার জন্য পৃথক 'গ্রন্থলিপি'র সৃষ্টি হ'য়েছে। সংস্কৃতের প্রয়োজনে 'জ ষ স হ ক্ষ' বর্ণ কয়টি তামিল ব্যাকরণে গৃহীত হ'লেও তামিল বর্ণমালার অন্তর্ভুক্ত হয় নি। তামিল লিপিতে সংস্কৃতের লিপ্যন্তর সাধারণ পাঠকের মনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে পারে। যেমন—'রবীন্দ্রনাথ'='ইররীন্‌তিরনাত', 'ভাগ্য'= 'পাকিকিয়ম'। তামিলের সাধু ও কথ্য রূপে বিস্তর ব্যবধান। কথ্যভাষায় আঞ্চলিক বৈচিত্র্য ছাড়াও রয়েছে সাম্প্রদায়িক ভেদ। তামিলের অপর লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য—এর লিপিতে যুক্তব্যঞ্জনের ব্যবহার নেই।

মলয়ালম্‌ বা মলয়ালী ভাষা : কেরল অঞ্চলে প্রচলিত। খ্রীঃ নবম শতাব্দীতে তামিল ভাষা থেকে এর উদ্ভব এবং ত্রয়োদশ শতকে স্বাধীন আত্মপ্রকাশ। লাক্ষাদ্বীপের ভাষাও মলয়ালম্‌। এই ভাষায় সংস্কৃতের প্রভাব সর্বাধিক। কিন্তু মুসলমান অধিবাসী মোপলা (<মাপিল্লাই)-দের ভাষায় সংস্কৃতের প্রভাব কম।

মলয়ালম ভাষা মূলতঃ তামিল ভাষা থেকে উদ্ভূত বলেই এর প্রাচীন ঐতিহ্য তামিলেরই তুল্য। শঙ্করাচার্য এই কেরলের অধিবাসী ছিলেন বলেই সম্ভবতঃ দ্রাবিড়ী ভাষাসমূহের মধ্যে মলয়ালম্‌ ভাষায় সংস্কৃত শব্দের পরিমাণ অপেক্ষাকৃত বেশি, তা' ছাড়া সংস্কৃত রীতি 'মণিপ্রবালম্‌' এই ভাষার অপর এক বৈশিষ্ট্য। তামিল-প্রভাবযুক্ত একটি রীতি এবং তামিল-প্রভাব-বর্জিত 'পরব মলয়ালম্‌' নামে খাঁটি মালয়ালী লৌকিক রীতিতেও সাহিত্য রচিত হয়। এই তিন রীতির সাহিত্যের ভাষাতেও অনুরূপ পার্থক্য রয়েছে। মলয়ালমের লিপি অপরাপর দ্রাবিড় ভাষার মতোই ব্রাহ্মী লিপি থেকেই উদ্ভূত এবং এই ভাষায় যাবতীয় সংস্কৃত অক্ষরই প্রচলিত আছে।

কন্নড় : কন্নড় ভাষার অধিকারভুক্ত অঞ্চল মহীশূর। প্রাচীন সাহিত্যের ভাষা অতিশয় কৃত্রিম ও আলঙ্কারিক। প্রাচীনতম (৪৫০ খ্রীঃ) দ্রাবিড়ী শিলালিপি কন্নড় ভাষাতেই লিখিত হয়েছিল। এর ভাষা তামিল ভাষার এবং লিপি তেলুগু ভাষার সমীপবর্তী। এই ভাষায় প্রাচীনতম সাহিত্য রচিত হয় সম্ভবতঃ ৮৫০ খ্রীঃ। তবে তার পূর্বেও সাহিত্য রচিত হয়েছিল বলে এই গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে। কন্নড় ভাষার একটি

উপভাষা '**তুলু**'—দ্রাবিড়ী ভাষাসমূহের মধ্যে এটি সর্বাধিক উন্নত হলেও এই ভাষার কোন সাহিত্য রচিত হয়নি। কুর্গে প্রচলিত ভাষা '**কোডগু**' কন্নড় এবং তুলু ভাষার মধ্যবর্তী পর্যায়ে অবস্থিত।

কন্নড় বা কানাড়ী ভাষা কর্ণাটকের ভাষা হলেও এটি শুধু কর্ণাটকেই সীমাবদ্ধ নয়, সন্নিকটস্থ মহারাষ্ট্র, অন্ধ্র এবং কেরলের অঞ্চল-বিশেষেও এর প্রচলন আছে। কন্নড় সাহিত্যের ও উচ্চবর্গের শিক্ষিতদের ভাবের বাহন-রূপে যে ভাষা প্রচলিত, তার সঙ্গে কথ্যভাষার বিরাট্ পার্থক্য। সাহিত্যাদির ভাষা বস্তুতঃ সাধুভাষা অনেকটা বাংলারই মতো ঃ কথ্যভাষার মধ্যেও রয়েছে নানাপ্রকার শ্রেণীগত এবং আঞ্চলিক বিভেদ। তেলুগু লিপি থেকে এ লিপি গৃহীত বলে কন্নড় লিপিতে তেলুগু ও উত্তর ভারতে প্রচলিত সব কয়টি অক্ষরই বর্তমান, কিন্তু উচ্চারণগত পার্থক্য রয়েছে। কন্নড়ে ১০টি স্বরধ্বনি—'অ, ই, উ, এ, ও —প্রত্যেকটি হ্রস্ব এবং দীর্ঘ দুইরূপেই বর্তমান। আবার এর একটি উপভাষা গোওড়ায় ১২টি স্বরধ্বনি এবং ১০টি মাত্র স্পর্শ ব্যঞ্জন রয়েছে। কারণ এতে তামিলের মতোই ঘোষবর্ণ এবং মহাপ্রাণ বর্ণ নেই, কিন্তু সাধু কন্নড়ে ২৫টি স্পর্শধ্বনিই বর্তমান। কন্নড়ের তিনটি আঞ্চলিক উপভাষা প্রধান—বাঙ্গালোরের কন্নড়, ম্যাঙ্গালোরের কন্নড় ও ধারওয়ারের কন্নড়—কন্নড়ে দ্রাবিড় ভাষার মূর্ধন্য ল় এবং মূর্ধণ্য-প্রবণতা বর্জিত হ'য়েছে এবং মূল-দ্রাবিড়ে নেই, এমন মহাপ্রাণ ধ্বনি সংস্কৃত প্রভাবে অন্তর্ভুক্ত হ'য়েছে।

নীলগিরি পার্বত্য অঞ্চলে ব্যবহৃত '**টোডা**' এবং '**কোটা**' অতি অল্পসংখ্যক আদি-বাসীদের দ্বারা ব্যবহৃত হয়ে থাকে। টোডা জাতির ক্ষীয়মাণতার সঙ্গে সঙ্গে টোডা ভাষারও অপমৃত্যু আশঙ্কা করা যায়।

তেলুগু ঃ দ্রাবিড়ী ভাষাসমূহের মধ্যে সর্বাধিক ব্যবহৃত ভাষা '**তেলুগু**' এবং এই ভাষাটিই সর্বপ্রথম মূল দ্রাবিড় ভাষা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বাতন্ত্র্য লাভ করে। এই কারণে ভাষাটি অপর সকল দ্রাবিড় ভাষা-ভাষীদের নিকট অপেক্ষাকৃত দুর্বোধ্য বলে মনে হয়। তেলুগু লিপিতে সংস্কৃত সকল বর্ণই উপস্থিত, এইদিক থেকে তামিল-ব্যতীত অপর দ্রাবিড়গুলিও অভিন্নপন্থী। তেলুগুর ব্যাকরণগত বৈশিষ্ট্যের মধ্যে অন্যতম—নাম পুরুষের ক্ষেত্রে ক্লীবলিঙ্গ দ্বারা স্ত্রী লিঙ্গ-বোধক শব্দ প্রকাশ করতে হয়, স্ত্রী লিঙ্গ-বোধক শব্দের একান্ত অভাব। আবার নামপুরুষের ক্রিয়াপদেও পুরুষ, কাল ও বচন ভেদে কখনো কখনো স্ত্রী-প্রত্যয় যুক্ত হয় না। খ্রী একাদশ শতক থেকে 'আন্ধ্র' বা তেলুগু ভাষার চর্চা শুরু হয়। এই ভাষা সংস্কৃত থেকে

অবাধে শব্দ গ্রহণ করেছে। এই ভাষার প্রতিটি শব্দ স্বরান্ত বলে অতি শ্রুতিমধুর। শব্দটির শেষ 'অ-কারান্ত' হ'লে সেইক্ষেত্রে 'উ' যোগ করা হয়। এই ভাষায় সংস্কৃত শব্দের প্রাচুর্য অপর এক লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। মধ্যপ্রদেশ এবং বোম্বাই অঞ্চলে এই ভাষার বহু উপভাষা রূপ প্রচলিত থাকলেও মূল ভাষার প্রচার ও প্রসার অন্ধ্রপ্রদেশ তথা হায়দরাবাদ অঞ্চলে।

প্রধান চারটি ভাষা ব্যতীত সাহিত্যবিহীন অনেক দ্রাবিড় ভাষা পূর্ব ও মধ্য ভারতে প্রচলিত আছে। বিন্ধ্য পর্বতাঞ্চলে **'গোণ্ডী'** ভাষা প্রচলিত, তামিলের সঙ্গে এই ভাষার কিছু সাদৃশ্য রয়েছে। প্রধানতঃ অরণ্যবাসীরাই এই ভাষা ব্যবহার করে থাকে। উড়িষ্যার পাহাড়ী অঞ্চলে স্বল্পসংখ্যক লোক **'কোড'** ভাষা ব্যবহার করে থাকে।

বিহার-উড়িষ্যা এবং মধ্যপ্রদেশের প্রান্তসীমায় বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে **'ওরাও'** ভাষা ব্যবহৃত হয়। এই ভাষার সাদৃশ্যও তামিল ভাষার সঙ্গে। বাংলা-বিহার সীমায় রাজমহল পাহাড়ে **'মালতো'** বা **'মালপাহাড়ী'** ভাষা প্রচলিত। এই ভাষাটি **'ওরাও'** ভাষার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। উড়িষ্যার অরণ্য অঞ্চলে **'কুঁই'** বা **'কন্ধী'** ভাষা প্রচলিত।

পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত ঈরানী ভাষা-বেষ্টিত বেলুচিস্তানের এক সীমাবদ্ধ অঞ্চলে দ্রাবিড় ভাষায় একটি শাখা **'ব্রাহুই'** বর্তমান। বর্তমানে এই ভাষার উপর ঈরানী, পশ্তু ও বালুচ ভাষার প্রভাব বিদ্যমান। অনুমান, সিন্ধু অঞ্চল থেকে আর্যদের তাড়া খেয়ে দ্রাবিড়রা যখন প্রধানতঃ দক্ষিণ দিকে ধাবিত হয়েছিল, তখন তাদের একটি ক্ষুদ্র শাখা মূল শাখা থেকে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে পশ্চিমদিকে আশ্রয় লাভ করেছিল। এ ছাড়া 'ব্রাহুই'-এর অস্তিত্বের অপর কোন সঙ্গত ব্যাখ্যা নেই।

(খ) দ্রাবিড়ী ভাষার বৈশিষ্ট্য

দ্রাবিড়ী ভাষা তুর্কী-আদি ভাষার মত অশ্লিষ্ট অন্তযোগাত্মক বা অনুসর্গযৌগিক ভাষা। প্রত্যয় বিভক্তি ভাষাদেহে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত থাকে না। এরূপ যোগকে 'তিলতণ্ডুল' যোগ বলা যায়।

অনুরূপ সংযোগের ফলে বড় বড় সমাসবদ্ধ পদও সরল ও সহজবোধ্য হয়ে থাকে।

অন্তব্যঞ্জন ধ্বনির পর কোন কোন ভাষায় স্বর সংযুক্ত হ'য়ে উচ্চারিত এবং লিখিত হয়।

স্বর-সঙ্গতি এই ভাষার অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

শব্দের আদিতে অনেক ভাষাতে, বিশেষতঃ তামিলে ঘোষ ব্যঞ্জন ব্যবহৃত হয় না। তামিল বর্ণমালায় প্রতি বর্গের শুধু প্রথম ও পঞ্চম বর্ণ রয়েছে।

মূর্ধন্য ধ্বনি অর্থাৎ ট-বর্গের প্রাধান্য প্রতি ভাষায় বিদ্যমান।

বচন দু'টি—একবচনের সঙ্গে প্রত্যয় যোগ ক'রে বহুবচন পদ সাধিত হয়। উত্তম পুরুষের বহুবচনে দু'টি রূপ—একটি শ্রোতাসহ, অপরটি শ্রোতাকে বাদ দিয়ে।

অপ্রাণিবাচক ক্লীবলিঙ্গ সাধারণতঃ শুধু একবচনেই ব্যবহৃত হয়।

দ্রাবিড়ী ভাষায় কর্মবাচ্যের অভাব। আত্মনেপদের চিহ্ন মাত্র কোন কোন শব্দে বর্তমান।

দ্রাবিড় ভাষায় বিশেষ্য ও সর্বনাম পদ অব্যয়ের সাহায্যে যুক্ত হ'লেও সমাপিকা ক্রিয়া কখনও যুক্ত হয় না। সমগ্র বাক্যে একটি মাত্র সমাপিকা ক্রিয়া ব্যবহৃত হয় বাক্যের শেষে ; এই ক্রিয়াটিই সমস্ত বাক্যকে নিয়ন্ত্রিত করে। ফলতঃ বাক্য শেষ না হওয়া পর্যন্ত অর্থবোধের জন্য আকাঙ্ক্ষা থেকে যায়।

(গ) আর্যভাষায় দ্রাবিড় প্রভাব

বৈদিক যুগ থেকেই দ্রাবিড়দের সঙ্গে যে ভারতীয় আর্যদের সংমিশ্রণ শুরু হয়েছিল তার পরিচয় ভারতীয় হিন্দুর জীবনযাত্রার প্রতিটি পর্যায়ে মুদ্রিত হ'য়ে রয়েছে। ভাষাতাত্ত্বিক দিক থেকে এই পারস্পরিক প্রভাবের স্বরূপ অনেকটা নির্ণীত হ'য়েছে। নিম্নে ভারতীয় আর্যভাষায় দ্রাবিড় প্রভাবের প্রধান কয়েকটি পরিচয়চিহ্ন প্রদত্ত হ'লো।

ঋগ্বেদের যুগ থেকে শুরু ক'রে একাল পর্যন্ত ভাষার প্রতিটি পর্যায়ে প্রচুর দ্রাবিড় শব্দ ভারতীয় ভাষায় অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে। ঋগ্বেদে 'ময়ূর, খল, বিল, কুণ্ড, দণ্ড' প্রভৃতি, ব্রাহ্মণ গ্রন্থগুলোতে 'অলস, অর্ক, পণ্ডিত, শব' প্রভৃতি, সংস্কৃত ভাষায় 'অণু, অরণি, কপি, কলা, কাল, গণ, নীল, পুষ্প, পূজা, ফল, বীজ, রাত্রি, সায়ম্' এবং পরবর্তীকালে 'অটবী, আড়ম্বর, খড়্গ, তণ্ডুল' প্রভৃতি শব্দ দ্রাবিড় ভাষা থেকে গৃহীত বলে পণ্ডিতেরা অনুমান করেন। বলা বাহুল্য, এগুলো এখন সবই তৎসম শব্দরূপে পরিচিত ; এ জাতীয় অনেক শব্দেরই তদ্ভব বা অর্ধতৎসম রূপ ভারতের বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষায়ও প্রচলিত আছে। পালিপ্রাকৃতে এবং বাংলাতেও বেশ কিছু দ্রাবিড় শব্দ সরাসরি প্রবেশ লাভ করেছে। বাংলায় ছেলেপিলের 'পিলে, উলু, খাল, গুড়ি, জোলা' প্রভৃতি শব্দ দ্রাবিড় ভাষাজাত।

বৈদিক সংস্কৃতে ধ্বন্যাত্মক শব্দ নেই। বাংলায় বহু ধ্বন্যাত্মক শব্দ (টুং টাং, ঢক্ ঢক্ প্রভৃতি) এবং দৃশ্যাত্মক শব্দ (ধব্‌ধবে, টুকটুকে) গঠনের পশ্চাতে দ্রাবিড় প্রভাব সক্রিয়। বাংলায় 'অনুকার-শব্দ'গুলোও (ঘোড়া-টোড়া, জাত-টাত) দ্রাবিড়ী

প্রভাবজাত। ভিন্ন শব্দের সাহায্যে বহুবচন পদ-গঠন (পাখিসব, মানুষগুলো) দ্রাবিড়ী পদগঠনেরই অনুরূপ।

বাংলা স্থানের নামের শেষে যে 'ভিটা, হিটি, গন্ডা, গুড়ি, জোলা' প্রভৃতি শব্দ যোগ করা হয় তাও দ্রাবিড় প্রভাবজাত। রিষড়া, চুঁচুড়া, বাঁকুড়া প্রভৃতি নামের পিছনেও দ্রাধিড় প্রভাব অনুমান করা হয়।

বাংলা শব্দের আদিস্বরে শ্বাসাঘাত রীতি দ্রাবিড় ভাষা থেকে এসেছে। বাংলা বাক্যরীতিতে ক্রিয়াপদ উহ্য থাকে—তুমি (হও) ভাল ছেলে—তা দ্রাবিড় ভাষার অনুকরণ-জাত।

স্বরভক্তি, স্বরসঙ্গতি ও আদি স্বরাগমের পিছনে দ্রাবিড় প্রভাব রয়েছে বলে পণ্ডিতগণ অনুমান করেন।

সংস্কৃতে ল্যবর্থক অসমাপিকা ক্রিয়ার প্রয়োগ, 'কৃ' ধাতুর সহযোগে যৌগিক ক্রিয়াপদের গঠন, প্রাকৃতে মহাপ্রাণ বর্ণের 'হ'কারে রূপায়ণও দ্রাবিড় প্রভাবজাত।

'চ'-বর্গের আদি উচ্চারণ ছিল স্পৃষ্ট, দ্রাবিড় প্রভাবে প্রাকৃতের যুগে তা' ঘৃষ্ট হ'য়ে দাঁড়ায়।

বিশেষণের তারতম্য বুঝানোর জন্যে বাংলার 'তর, তম' ব্যবহার না ক'রে 'সবচেয়ে ভালো' প্রভৃতি প্রয়োগে দ্রাবিড় প্রভাব সম্ভব।

দ্রাবিড় প্রভাবের ফলেই বাংলায় করণ, অপাদান ও অধিকরণ কারকের মিশ্রণ এবং এক কারকের বিভক্তি অন্য কারকে প্রয়োগ সম্ভবপর।

ভারতীয় ধ্বনিমালায় মূর্ধন্য ধ্বনি প্রবর্তনের মূলে দ্রাবিড় ভাষার প্রভাবের কথা অনেকেই বলে থাকেন! একমাত্র সুইডিশ ভাষা ছাড়া অপর কোন ইন্দো-য়ুরোপীয় ভাষায় মূর্ধন্য ধ্বনি নেই।
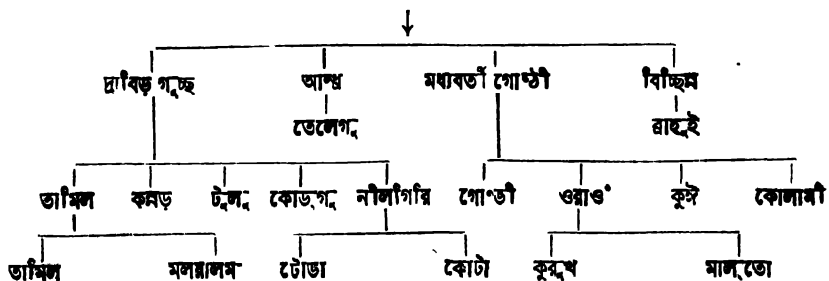
[তিন] ভোট-চীনী ভাষা / কিরাত ভাষা

(Sino-Tibetan Languages)

ভোট-চীনী ভাষাগোষ্ঠীর তিনটি প্রধান শাখার একটি তিব্বতী-বর্মী বা ভোটবর্মী, এই ভাষার অনেকগুলো উপশাখা ভারতবর্ষে প্রচলিত। অপর একটি শাখা 'চীনা-থাই' বা 'শ্যামী-চীনা' ভাষার মাত্র একটা শাখাই ভারতে প্রচলিত। তৃতীয় 'য়েনিসি' (Yenissi) শাখার সঙ্গে ভারতের কোন সম্পর্ক নেই।

ভোটবর্মী শাখার তিব্বতী লেপচা, কিরান্তি এবং গুরুং শাখাকে একসঙ্গে 'ভোটপাহাড়ী' নামে অভিহিত করা হয়। সিকিমে লেপ্‌চা ভাষা প্রচলিত। তিব্বতী বা ভোট ভাষায় বহু সংস্কৃত, এমন কি প্রাচীন বাংলা গ্রন্থেরও অনুবাদ রয়েছে, যার ফলে আমরা অনেক লুপ্ত গ্রন্থের সন্ধান পেয়েছি। এই শাখার অপর একটি গোষ্ঠী সাধারণতঃ আসামের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত বলে এককথায় 'আসামী ভাষা' ('অসমীয়া' নয়) নামেও অভিহিত হয়। এর মধ্যে আছে 'কাছাড়ী' এবং তার শাখা 'বড়ো, নাগকুকি, গারো ও টিপ্‌রা', 'নাগা', 'কুকিচীন' এবং তার শাখা 'মেইথেই' (মণিপুরী) ও 'লুসাই' এবং 'অহোম' ভাষা—আর রয়েছে ব্রহ্মদেশে প্রচলিত 'বর্মীভাষা'। এদের মধ্যে মণিপুরে প্রচলিত 'মেইথেই' সাহিত্যসম্পদে সমৃদ্ধ। অহোম্‌ ভাষাভাষীরা উত্তর-পূর্ব ভারতের প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর, কামরূপ-আদি অঞ্চল জয় করে এবং তাদের নাম থেকেই দেশের নাম হয় 'অহোম্‌' বা 'আসাম'। জাতিগত দিক থেকে অহোম্‌দের প্রাধান্য থাকলেও অসমীয়া ভাষার উপর 'অহোম্‌' ভাষার বিশেষ কোন প্রভাব নেই। তবে দিনলিপির আকারে লিখিত সমসাময়িক কালের ইতিহাস 'বুরুঞ্জি' তাদের মহৎকীর্তি।

থাইচীনা শাখার 'খাম্‌তি' ভাষা এখনও পূর্ব আসামে বর্তমান। এই শাখার 'শান্‌' ভাষারই একটি ধারা 'অহোম্‌'—এরূপ একটি অভিমতও প্রচলিত আছে। তাহ'লেও 'অহোম' ভাষা আর এখন কোথাও ব্যবহৃত হয় না।

চীন তিব্বতের সঙ্গে প্রাচীন ভারতের যোগাযোগ থাকলেও তখন ভারতের ভূমিকা ছিল দাতার বা মহাজনের। ভারত থেকে চীন ও তিব্বত অনেক নিয়েছে, কিন্তু তাদের কাছ থেকে ভারত ভাষার দিক থেকে বিশেষ কিছু নিয়েছে বলে মনে হয় না—কারণ সংস্কৃতে চীনা বা তিব্বতী ভাষার কোন প্রভাবের পরিচয় পাওয়া যায় না। অথচ দ্রাবিড় এবং অস্ট্রীক বা নিষাদ ভাষার প্রচুর শব্দ সংস্কৃত ভাষায় গৃহীত হয়েছে। এর একটা সম্ভাব্য কারণ এই হ'তে পারে যে সংস্কৃত ভাষা পরিপূর্ণভাবে গড়ে

ওঠবার পরই চীনা ও তিব্বতী ভাষার সঙ্গে তার যোগাযোগ ঘটে—তখন সংস্কৃতের আর ঋণ গ্রহণের প্রয়োজন ছিল না। যাহোক, এতৎসত্ত্বেও সংস্কৃতে দু'চারটে শব্দের মূলে চীনা ভাষা রয়েছে, কোন কোন ভাষাতাত্ত্বিক পণ্ডিত এরূপ সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করেছেন। এরূপ শব্দ :—'কীচক, তসর, তোয়া, সিন্দুর, শ্লেচ্ছ' প্রভৃতি। আধুনিক বাংলায় তিব্বতী-চীনা গোষ্ঠীর কিছু কিছু শব্দ নেওয়া হ'য়েছে। যেমন—বর্মী ভাষা থেকে 'লুঙ্গী, ফুঙ্গি, ঞাপ্পি' প্রভৃতি, চীনাভাষা থেকে 'চা, লিচু, চঙ্গ' প্রভৃতি। 'মহানদী', নামটি লেপচা 'মহালদী'-র সংস্কৃত রূপ বলে অনুমিত হয়।

এ ছাড়াও কিছু ভাষাতাত্ত্বিক প্রভাব সম্ভাবনার পর্যায়ে পড়ে। 'চ'-বর্গের পূর্ববঙ্গীয় উচ্চারণে উষ্মতা ভোটবর্মী ভাষারও বৈশিষ্ট্য। পূর্ববঙ্গের অর্ধ-বিবৃত 'এ'-কার (=অ্যা) ভোটবর্মী ভাষার প্রভাবজাত হতে পারে। চট্টগ্রাম-নোয়াখালি অঞ্চলের স্বতোনাসিক্যীভবন ও উষ্মীভবনের প্রাধান্য উক্ত প্রভাবজাত হওয়া সম্ভব।

ষষ্ঠ অধ্যায়
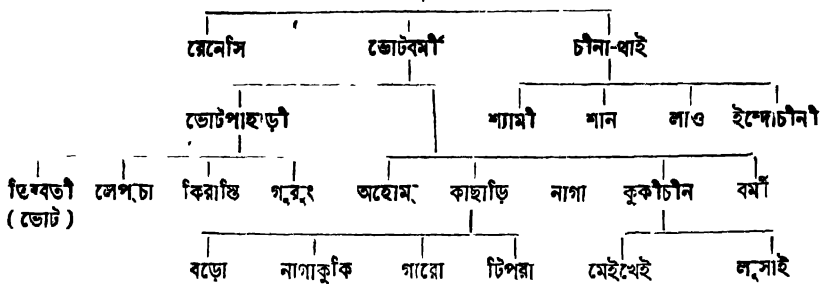
লিপি
(Graphemics)

মনোভাব প্রকাশের শ্রেষ্ঠ উপায়-স্বরূপ মানুষ প্রথম আবিষ্কার করেছে ভাষাকে। কিন্তু যতদিন মানুষ স্বকালে এবং স্বস্থানে অবস্থিত থেকেই সন্তুষ্টি লাভ করতো, ততদিন বাগ্-ব্যবহারেই তাদের সর্ব-প্রয়োজন সিদ্ধ হতো। কিন্তু মননশীল মানুষের আকাঙ্ক্ষা কোন সীমার বাঁধন মানে না, তাই কিছুদিন বাদেই তার মনোভাব দূরদেশে এবং দূরকালে পাঠানোর তাগিদ বোধ করলো। তারই বিশেষ প্রচেষ্টার নিদর্শন লিপির আবিষ্কারে পাওয়া যাচ্ছে। বর্তমান কালে আমরা সারা পৃথিবীতেই যে সব লিপি ব্যবহার করি তাদের প্রত্যেকটিকেই কয়েকটা পর্যায় অতিক্রম ক'রে তবে বর্তমান কালে উপনীত হ'তে হয়েছে।

[এক] লিপির (Graphemic system) উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ

প্রাগৈতিহাসিক যুগেই, এখন থেকে অন্ততঃ দশ বারো হাজার বছর আগে মানুষের মনে দেখা দিয়েছিল **চিত্রাংকন-প্রবৃত্তি**। আপন মনোভাবকে স্থায়িত্ব দানই ছিল এর উদ্দেশ্য। এই চিত্রাংকন চলতো পাহাড়-পর্বতের গুহায়। এর ফলে কালের ব্যবধান লঙ্ঘিত হ'লো, কিন্তু সমকালেই দূরবর্তী স্থানে মনোভাব বা বার্তা প্রেরণ সম্ভব হলো না। আমেরিকার আদিম অধিবাসীরা এই উদ্দেশ্যে ব্যবহার করতে লাগলো **'গ্রন্থিলিপি'** (Quipe)। আসলে এটা কোন লিপি বা লিখন নয়—নানাপ্রকার রাঙন্ দড়ি-দড়ার গিঁট দিয়ে সেগুলো তারা দূরস্থানে প্রেরণ করতো। সম্ভবতঃ এই নীতি মানবসমাজ থেকে এখনো একেবারে বিলুপ্ত হ'য়ে যায় নি। চিত্রাঙ্কন এবং গ্রন্থিলিপিকেই লিপির উদ্ভবের প্রথম পর্যায় বলে অভিহিত করা চলে, এর নাম দেওয়া হয় **আলেখ্য ও স্মারকচিত্র পদ্ধতি**।

লিপির ক্রমবিকাশে দ্বিতীয় পর্যায়ের নাম দেওয়া চলে **ভাব-চিত্র পদ্ধতি** (Picto-ideographic method)। প্রাচীনতর রীতিতে ভাব বা ক্রিয়াকে গোটা চিত্রের সাহায্যে পরিস্ফুট করার চেষ্টা হ'তো। এই পর্যায়ে বস্তু বা ভাবের গুণ ও বিমূর্ত-ভাব কোন প্রচলিত প্রতীক বা বস্তুর চিত্ররূপের মাধ্যমে প্রকাশিত হতো। একে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে **চিত্রলিপি** (Pictogram) ও **ভাবলিপি** (Ideogram) নামেও বোঝানো হয়। এতে পরিপূর্ণ চিত্র ব্যবহার না করে চিত্রের রেখা বা প্রতীক মাত্র ব্যবহার দ্বারা বস্তু বা ভাবের প্রতিরূপ অঙ্কন করা হ'তো। যেমন, 'রাত্রি'

বুঝাতে 'আকাশ' ও 'চাঁদ-তারা' এবং 'তীর-ধনু' দ্বারা শিকারের সংকেত দ্যোতিত হ'তো। এই পর্যায়ের লিপিকে এক্ষণে 'Logographic' নামে অভিহিত করা হয়।

তৃতীয় পর্যায়ে **শব্দলিপি** (Phonogram)। **চিত্রপ্রতীক** (Hieroglyph)-এর সাহায্যে লেখার কাজ সম্পন্ন হ'তো। এই পর্যায়েই চিত্র-রূপ বা প্রতীকের সহায়তায় ধ্বনির রূপায়ণের প্রচেষ্টা লক্ষিত হয়। চিত্রিত বস্তু বা প্রতীক দ্বিতীয় পর্যায়ে বস্তুটিরই নির্দেশ দান করতো, কিন্তু এই পর্যায়ে তা শব্দ বা ধ্বনিগুচ্ছে পরিণত হ'লো। মিশরের চিত্রপ্রতীক এই শব্দলিপিরই নিদর্শন। চীনা ভাষায় এখনও পর্যন্ত প্রধানতঃ এই রীতিই প্রচলিত আছে। চিত্র-ভাবরীতি এবং ধ্বনি-প্রতীকের সমন্বয়ে এই রীতি গড়ে উঠেছে বলে একে **মিশ্ররীতি** আখ্যাও দেওয়া চলে।

শব্দলিপি থেকে চতুর্থ পর্যায়ে সৃষ্ট হ'লো **অক্ষর লিপি** (Syllabic script)। শব্দলিপির সাহায্যে চিত্রপ্রতীক দ্বারা যে শব্দটাকে বোঝাতো, এই পর্যায়ে আর সেই শব্দটাকে না বুঝিয়ে সম্ভবতঃ শব্দের আদি অক্ষর, অর্থাৎ শীর্ষকে নির্দেশ করে বলে এই ব্যাপারকে **শীর্ষনির্দেশ** (Acrology) বলা হয়। যেমন—ব্রাহ্মী অক্ষরে 'গ' বোঝাতে যে চিহ্নটি (⌒) ব্যবহৃত হয়, তা' 'গগন' বা আকাশের প্রতীক—যেন উবুড়, করা একটা কড়াই। শব্দলিপিতে এটাকে সম্ভবতঃ 'গগন' পড়া হ'তো, অক্ষরলিপিতে এটা একটা অক্ষরে (Syllable) রূপায়িত হ'লো (গ্+অ=গ)। এই চিহ্নটিই লিপি-বিবর্তনে বাংলায়ও 'গ' হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। ভারতবর্ষে প্রচলিত বিভিন্ন লিপি এই পর্যায়ভুক্ত।

অক্ষরলিপির পরবর্তী স্তরে বা পঞ্চম পর্যায়ে **ধ্বনিলিপির** (Alphabetic script) বিকাশ। ইংরেজি-ফরাসী প্রভৃতি ভাষায় ব্যবহৃত 'রোমক লিপি' (Roman script) এই বর্গের অন্তর্ভুক্ত। এই প্রকার লিপিতে প্রতিটি ধ্বনির জন্য এক একটি বর্ণ (letter) নির্দিষ্ট আছে।

পূর্বোক্ত আলোচনায় লিপিপদ্ধতির (graphemic system) পরিচয় পাওয়া গেছে, তাদের কোনটিই আদর্শ লিপি নয়, প্রত্যেকটিরই কিছু না কিছু সীমাবদ্ধতা রয়ে গেছে। মুখের কথার যথাযথ রূপদানের জন্যই লিপির আবশ্যক। কিন্তু কোনজাতীয় লিপির সাহায্যেই বাস্তবে তা' সম্ভবপর হয় না। আপাতত-আদর্শ-রূপে মান্য হলো। ধ্বনিলিপি (Alphabetic Script)-এর নিদর্শন আমরা পাই ইংরেজি ভাষার জন্য ব্যবহৃত রোমক লিপিতে। অথচ ইংরেজিতে একটি বর্ণে ধ্বনি বোঝাতে যেমন নানাপ্রকার বর্ণ ব্যবহৃত হয়, যেমনি একটি বর্ণে একাধিক ধ্বনিও বুঝিয়ে থাকে। কিন্তু আদর্শে ব্যবস্থা হওয়া উচিত—প্রতিটি ধ্বনির

জন্য একটিমাত্র বর্ণ এবং প্রতি বর্ণ দ্বারা একটিমাত্র ধ্বনিরই প্রকাশ। অক্ষরমূলক লিপি (syllabic script) বাংলা প্রভৃতিরও অনেক অসম্পূর্ণতা। অনেক ধ্বনির সঙ্গেই অক্ষরের মিল নেই, আবার একই অক্ষরের একাধিক উচ্চারণ (যেমন—'সহ্য=স-হ্-য়' কিন্তু উচ্চারণে 'স' জর্)। এ ছাড়া প্রায় কোন লিপিতেই ভাষার ধ্বনিতা (supra-segmental phoneme), সুরতরঙ্গ (pitch), প্রস্বর (stress accent), যতি (juncture) প্রভৃতিও প্রায় কোন লিপিতেই ধরা পড়ে না। বহু লিপিতে দীর্ঘস্বর বোঝানোরও ব্যবস্থা নেই। অর্থাৎ প্রচলিত লিপি-পদ্ধতির অসম্পূর্ণতা স্বীকার ক'রে নিতেই হয়। এর ফলে আমাদের আরও একটা অসুবিধার সম্মুখীন হ'তে হয়—প্রাচীন লিপি থেকে আমরা-তৎকালিক উচ্চারণটির অর্থাৎ যথাযথ ধ্বনি-প্রকৃতির স্বরূপও অনুধাবন করতে পারিনে। ধ্বনিতা পদ্ধতির সঙ্গে (phonemic system) সঙ্গে সঙ্গতি বজায় রেখে চলাই হ'লো লিপি-পদ্ধতির আদর্শ ব্যবস্থা।

প্রতিটি লেখন-রীতি বা লিপি পদ্ধতি আশ্রয় ক'রে থাকে একগুচ্ছ 'বর্ণ' (letter =alphabetie script) বা 'অক্ষর'কে (syllabic script)। একটু লক্ষ্য করলেই বোঝা যায়, এই 'বর্ণ' বা অক্ষর অপর বর্ণ বা অক্ষরের সান্নিধ্যে কিংবা ভিন্ন পরিবেশ-গত কারণে কিছুটা রূপান্তর লাভ করে। অর্থাৎ একই বর্ণ বা অক্ষরের একাধিক রূপ থাকলেও এদের কিন্তু ভিন্ন বর্ণ বা অক্ষর বলে বিবেচনা করা হ'বে না—এরা একই বর্ণ বা অক্ষরের সাপেক্ষ রূপান্তর মাত্র। লিপিবিদ্যা তথা ভাষাবিদ্যায় ধ্বনি-প্রকাশক বা অক্ষরটিকে বলা হয় 'Craphemic' এবং রূপান্তরিত রূপটিকে বলা হয় 'Allographs'—আমরা বাংলায় এদের বলতে পারি যথাক্রমে **'লিপিতা বা লিপিমূল'** (Graphemic) এবং 'উপলিপি' (Allographs)। ধ্বনিতত্ত্বে (Phonology) ধ্বনির ক্ষেত্রে **ধ্বনিতা** (Phoneme) এবং **উপধ্বনিই** (Allophone) যে সম্পর্ক। লিপির ক্ষেত্রেও 'লিপিতা' এবং 'উপলিপির'র সেই সম্পর্ক। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ বাংলা লিপির দিকেই তাকাতে হয়। 'ই, উ' প্রভৃতি স্বরবর্ণের একক-ভাবে এই রূপ, কিন্তু ব্যঞ্জনের সঙ্গে যুক্ত হ'লেই তাদের আকৃতির রূপান্তর ঘটে, যেমন 'উ'কার—'কু, গু, রু' —এগুলি উপলিপি, অপর অক্ষরের সান্নিধ্যে পাল্টে যায়। এরকম ব্যঞ্জনও হয়—যুক্তাক্ষরে অধিকাংশ অক্ষরের রূপই পাল্টে যায়, কখনও ছোট-বড় ক'রেও দেখা হয়, কখনও শুধু চিহ্ন (রেফ্, র-ফলা)। আবার পরিবেশগত কারণেও অক্ষরের পরিবর্তন ঘটে। যেমন, 'ড' সর্বদাই শব্দের আদিতে ; 'ড়' মধ্যে বা শেষে লিপিতা (Grapheme) বোঝানোর জন্য ( ) প্রথম বন্ধনী চিহ্নটি ব্যবহৃত হয়।

[দুই] বিভিন্ন লিপির পরিচয়

প্রাচীন এবং বর্তমান পৃথিবীতে যত রকম লিপির নিদর্শন পাওয়া যায় তাদের শ্রেণীবিভাগ করার ব্যাপারে পণ্ডিতবর্গ অভিন্নমত হতে পারেন নি। কোন কোন লিপির উৎস-সম্বন্ধে এবং জাতি-নির্ণয় ব্যাপারে কিছু মতান্তর সত্ত্বেও লিপিগুলোকে পাঁচটি বা ছয়টি শ্রেণীতে বিভক্ত করা চলে।

(১) **সুমেরীয় লিপি**—বর্তমান মেসোপটেমিয়ায় এক সময় সুমের জাতির বাস ছিল। তাদের পাশাপাশি বাস করতো আসিরীয় এবং আক্কাদীয়গণ। এরা সকলেই সেমীয় জাতির অন্তর্ভুক্ত ছিল। অন্ততঃ ছ' হাজার বছর আগে সুমের-জাতি যে চিত্রলিপি উদ্ভাবন করে, পৃথিবীতে সম্ভবতঃ ঐটেই প্রাচীনতম লিপি। সুমেরীয়রা শর বা কাঠ দিয়ে লিখ্‌তো বলে অক্ষরগুলো 'বাণমুখ' বা 'কীলকরূপ' লাভ করতো বলে একে **'বাণমুখ লিপি** বা **'কীলকাক্ষর লিপি'** (Cuneiform) বলে অভিহিত করা হয়। আক্কাদীয়রাও সুমেরীয়দের কাছ থেকে এই লিপি গ্রহণ করে। তবে তার কিঞ্চিৎ সংস্কার সাধন করে প্রতীক চিত্রের সংখ্যা কমিয়ে আনে। মূলতঃ ছিল শব্দলিপি, পরে তা' অক্ষরলিপিতে পরিণত হয়। পারস্যে হখামনীয় নৃপতিরা যে সমস্ত শিলালিপি খোদাই করিয়েছিলেন, তাতে বাণমুখ লিপি ব্যবহৃত হয়েছে। সেমীয় জাতীয় লোকেরাই সর্বপ্রথম এই লিপির উদ্ভাবন ও ব্যবহার ক'রে বলে একে 'সেমীয় লিপি' বলেও অভিহিত করা হয়। মূলতঃ সম্ভবতঃ চিত্রলিপি থেকেই বাণমুখ লিপির উদ্ভব হয়েছিল।

বাণমুখ/কীলকাক্ষর লিপি

প্রাচীন পারসিক লিপি : 'খ্‌শয়ারশা'

(২) **মিশরীয় লিপি :** খ্রী' পূর্ব' ৩০০০ অব্দের দিকে মিশরীয় লিপির উদ্ভব ঘটে। কোন সেমীয় লিপি থেকেই এ লিপির সৃষ্টি বলে পণ্ডিতগণ অনুমান করেন। মিশরীয় লিপিতে চিত্র, ভাব এবং ধ্বনির সমন্বয় ঘটেছে। মিশরীয় লিপির তিনটি ধারা ছিল—(ক) **হায়ারোগ্লিফ** (Hieroglyph), (খ) **হিয়ারাটিক** (Hieratic) ও (গ) **ডেমোটিক** (Demotic)। প্রস্তরে খোদিত চিত্র-প্রতীকযুক্ত রীতিই ছিল হায়ারোগ্লিফ বা পবিত্রলিপি। একজন উপবিষ্ট ব্যক্তির মুখে হাত—এরূপ চিহ্নের অর্থ 'খাওয়া' (wnm)। প্রচুর এবং দ্রুত লিখন-প্রয়োজনে এই লিপির পরিবর্তন সাধিত হয়। পুরোহিতরা 'প্যাপিরাস'-এর উপর টানা লিখে যেতেন, তা হ'লো

'হিরাটিক', আর সাধারণ লোকের ব্যবহারযোগ্য অধিকতর টানা লেখা ছিল 'ডেমোটিক'। বলা বাহুল্য সুদর্শন হায়রোগ্লিফ লিপি থেকে পরবর্তী লিপিদ্বয় পৃথগ্‌জাতীয়। হায়ারোগ্লিফে ২৪টি মাত্র ধ্বন্যাত্মক বর্ণ বা প্রতীক চিহ্ন বর্তমান ছিল।

৩. (ক) **ফিনিসীয় লিপি**—খ্রী° প্রথম শতকের শেষদিকে ট্যাকিটাস (Tacitus) বলে গেছেন যে, লিপির উদ্ভাবক মিশরীয়দের কাছ থেকে ফিনিসীয়গণ লিপিবিদ্যা গ্রহণ করে এবং তা' গ্রীসদেশেও প্রচলিত করে। অতএব ফিনিসীয় লিপি মিশরীয় লিপি থেকেই উদ্ভূত ; তবে ফিনিসীয়গণ এই লিপির কিছু সংশোধন ক'রে মোট ২২টি অক্ষরে নিয়ে আসে। খ্রী° পূ° নবম শতাব্দীর মোয়াবাইট লিপিতে ফিনিসীয় লিপির (Phoenician) প্রাচীন নিদর্শন পাওয়া যায়। কিন্তু এই লিপির উদ্ভব ঘটেছিল সম্ভবতঃ অনেক পূর্বেই। এই ফিনিসীয় বণিকরাই সম্ভবতঃ পৃথিবীর নানাস্থানে এই লিপি প্রচার করেছিল।

ফিনিসীয় লিপির চরম বিকাশ ঘটে গ্রীকদের হাতে। গ্রীকরাই এই লিপিকে পুরো ধ্বনিতত্ত্বের ভিত্তিতে ধ্বনিলিপিতে রূপান্তরিত করে। গ্রীক লিপির উপর ভিত্তি করে খ্রী° পূ° চতুর্থ শতকে **গথিক লিপির** সৃষ্টি হয় এবং সত্বরই বিলুপ্ত হয়। **সিরিলিক** (Cyrillic) এবং **গ্ল্যাগোলিটিক** (Glagolitic) নামে গ্রীক লিপিরই দু'টি শাখা স্লাব দেশগুলোতে প্রচলিত। গ্রীক বর্ণমালার প্রধান উত্তরসূরী **লাতিন** বা **রোমক** বর্ণমালা। এ থেকেই য়ুরোপের যাবতীয় বর্ণমালার উদ্ভব।

গ্রীকরা ফিনিসীয় লিপি গ্রহণ করলেও লেখার ব্যাপারে তারা অনেকটা স্বাধীনতা গ্রহণ করেছিল। সেমীয় রীতির মতো ডানদিক থেকে বামে, আবার বামদিক থেকে ডাইনে, কখনও বা হলাবর্ত রীতিতে (boustrophedon) অর্থাৎ বাঁ থেকে ডাইনে আবার ডান থেকে বামে—লেখবার ফলে অক্ষরের চেহারা অনেক সময় উল্টে যেতো—ফলে অক্ষরের আকারে পরিবর্তন ঘটে।

৩. (খ) **আরামীয় লিপি**—সেমীয় তথা মিশরীয় লিপির আর একটি ধারা আরামীয় লিপি (Aramaic script)। এই লিপি ডানদিক থেকে বামদিকে লিখিত হয়। **হিব্রু**, পারস্যের **পহ্লবী**, **আরবী**, **সিরিয়াক**, আধুনিক মিশরীয় লিপি এবং মধ্য এশিয়ার মঙ্গোল, সোগ্‌দি-আদি লিপি এই আরামীয় থেকেই উদ্ভূত হয়েছে। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে প্রাচীন ভারতে অশোকের অনুশাসনে ব্যবহৃত **খরোষ্ঠী লিপি** এই আরামীয় লিপিরই একটি শাখা।

(৪) **চীনা লিপি**—সুমেরীয় বাণমুখ লিপি এবং মিশরীয় হায়রোগ্লিফ্ লিপির মতই চীনা লিপিও মূলতঃ চিত্র থেকেই উদ্ভূত এবং ভাব-চিত্র-লিপির স্তর পার হ'য়ে এ লিপি কখনও ধ্বনিলিপিতে রূপান্তরিত হ'তে পারে নি। চীনাভাষা মূলতঃ একাক্ষর বলে তাদের শব্দ আর অক্ষর এক হ'য়ে গেছে। অর্থাৎ চীনা ভাষায় প্রতিটি শব্দের জন্য এক একটি অক্ষর নির্দিষ্ট রয়েছে। যেমন—'পূর্বদিক' বোঝাতে 'গাছের আড়াল থেকে সূর্য উঠেছে' এরকম একটি চিত্রপ্রতীক বা অক্ষর ব্যবহার করা হয়। এরূপ অক্ষরের সংখ্যা ৫০ হাজারের অধিক। চীনা লিপিকে জাপানীরা গ্রহণ করলেও তারা এই লিপিকে ধ্বনিলিপিতে পরিণত ক'রে নিয়েছে। জাপানী লিপিতে অক্ষর সংখ্যা মাত্র ৪৭টি।

চীনালিপি	উচ্চারণ	অর্থ
馬	মা	ঘোড়া
媽	মা̄	মা
麻	মা̗	একটা কাপড়
罵	মা̀	গালি বিশেষ

(৫) **ভারতীয় লিপি**—বর্তমান কালে ভারতবর্ষে প্রচলিত সব লিপিরই মূল উৎস 'ব্রাহ্মীলিপি'। খ্রী° পূ° তৃতীয় শতকে অশোকের বিভিন্ন অনুশাসনে এই লিপির প্রাচীনতম নিদর্শন পাওয়া যায়। ব্রাহ্মীলিপির উদ্ভব-সম্বন্ধে তিনটি অভিমত প্রচলিত আছে। (ক) আরামীয় / ফিনিসীয় লিপির অর্থাৎ কোন-না-কোন সেমীয় লিপির বিকারেই এই লিপির উদ্ভব। পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতদের মধ্যে এই অভিমতের পোষকতা থাকলেও ভারতীয়গণ এই অভিমত স্বীকার করেন না। (খ) মোহেন্‌জোদড়ো-হরপ্পার সীলমোহরে যে সকল অক্ষর খোদাই করা আছে, তা' সিন্ধুলিপি নামে পরিচিত। এই সিন্ধুলিপি থেকে ব্রাহ্মীলিপির উদ্ভব হ'তে পারে—কিন্তু সিন্ধুলিপির পাঠোদ্ধার না হওয়া পর্যন্ত এ বিষয়ে নিশ্চিতভাবে কিছুই বলা যায় না। (গ) ব্রাহ্মীলিপি স্বতঃস্ফূর্ত, অর্থাৎ ভারতেই পূর্বকালে এর উদ্ভব ঘটেছে এবং

অশোকের শিলালিপিতে এর পূর্ণ বিকশিত রূপ পাওয়া গেছে। ভারতের বিভিন্ন আর্যভাষা (উর্দু, সিন্ধী ও কাশ্মীরি বাদে), দাক্ষিণাত্যের চারটি দ্রাবিড়ী ভাষা, শ্রীলংকা, তিব্বত, ব্রহ্মদেশ, থাইল্যান্ড, ইন্দোনেশিয়া, ভিয়েৎনাম, ফিলিপাইন এবং কোরীয় ভাষা এই ব্রাহ্মী লিপিরই কোন-না-কোন বিকশিত রূপে লিখিত হ'য়ে থাকে। অশোকের অনুশাসনে ও সমকালের অন্যান্য শিলালিপিতে ব্রাহ্মীলিপির যে পূর্ণ-বিকশিত রূপ দেখা যায়, তাতে অনুমিত হয় এই লিপির উদ্ভব ঘটেছিল অনেক পূর্বেই।

(৬) **অপঠিত লিপি**—পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে এখনও এমন অনেক লিপির সন্ধান পাওয়া গেছে, এখন পর্যন্ত যাদের পাঠোদ্ধার সম্ভব হয়নি এবং ফলতঃ এদের জাতি-গোত্র নির্ণয়ও সম্ভবপর নয়। এদের মধ্যে তিনটি লিপিই বিশেষ উল্লেখযোগ্য—(ক) **সিন্ধুলিপি**, (খ) **মিনোয়ান লিপি**, (গ) **মায়ালিপি**।

(ক) **সিন্ধুলিপি**—মোহেন্-জো-দড়ো, হরপ্পা প্রভৃতি অঞ্চলে প্রাগার্য যুগের যে সমস্ত সীলমোহর উদ্ধার করা হয়েছে তাতে অন্ততঃ ৪০০টি প্রতীক চিহ্ন পাওয়া গেছে, যাদের পণ্ডিতেরা ভাবচিত্রলিপি এবং ধ্বনিমূলক চিহ্ন বলে মনে করেন। খ্রী° পূ° তৃতীয় বা চতুর্থ সহস্রাব্দের এই লিপিগুলোর পাঠোদ্ধার এখনও পর্যন্ত সম্ভবপর না হওয়াতে পরবর্তী কালের ব্রাহ্মী লিপির সঙ্গে এর কোন যোগ ছিল কি না, তা-ও অনুমান করা যায় না। ক্রীট দ্বীপে প্রাপ্ত মিনোয়ান লিপির সঙ্গে এর কিছু কিছু সাদৃশ্য বর্তমান।

(খ) **মিনোয়ান লিপি**—ক্রীট দ্বীপে খ্রী° পূ° তৃতীয় সহস্রাব্দের মিনোস্ রাজাদের প্রাসাদে অসংখ্য প্রাচীন লিপিযুক্ত ফলক আবিষ্কৃত হয়েছে, যাদের '**ক্রীটান**' বা '**মিনোয়ান লিপি**' (Cretan/Minoan script) নামে অভিহিত করা হয়। এই লিপির পাঠোদ্ধার সম্ভব না হলেও পণ্ডিতগণ অনুমান করেন যে এই লিপি সুমেরীয় এবং মিশরীয় লিপি দ্বারা প্রভাবিত।

ৎজেক
[একটি মাসাধ্যায়ের প্রতীক]

লামাৎ
[একটি সূর্যদিনের প্রতীক]

(গ) **মায়া-লিপি** (Mayan script)—আমেরিকার আদি অধিবাসীরা মায়া সভ্যতা, আজ্‌তেক সভ্যতা প্রভৃতি বিভিন্ন সভ্যতা গড়ে তুলেছিল। প্রাচীন ধ্বংসাবশেষের মধ্যে মায়া-লিপি, আজ্‌তেক-লিপি (Aztec) প্রভৃতি আবিষ্কৃত হয়েছে; কিন্তু এদের পাঠোদ্ধার কার্য আরম্ভ হ'লেও এখনও পূর্ণ সাফল্য অর্জিত না হওয়ায় এদের জাতিনির্ণয় সম্ভবপর হয়নি।

[তিন] বঙ্গলিপির উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ

ভারতের প্রাচীনতম গ্রন্থ বেদকে বলা হয় 'শ্রুতি'। পণ্ডিতেরা অনেকে অনুমান করেন যে বৈদিক যুগে কোন লিপি বা লেখার পদ্ধতি আমাদের দেশে প্রচলিত ছিল না, কারণ তজ্জাতীয় কোন শব্দও বেদে পাওয়া যায় না। অথচ বৈদিক যুগের বহু পূর্বেই সিন্ধু সভ্যতার যুগে অনেক লিপির সন্ধান পাওয়া গেছে। কিন্তু দুর্ভাগ্য-ক্রমে এ লিপির পাঠোদ্ধার না হওয়ায় এর সঙ্গে প্রাচীন ভারতীয় লিপির কোন সম্পর্ক ছিল কি না জানবার কোন উপায় নেই। ভারতে প্রাপ্ত প্রাচীনতম লিপির সন্ধান পাওয়া যায় অশোকের বিভিন্ন অনুশাসনে। তবে নেপালের তরাই-এ পিপ্রাওয়া নামক স্থানে একটি স্তূপে বুদ্ধদেবের অস্থির সঙ্গে প্রাপ্ত একটা পাত্রে কিছু লিপি খোদিত দেখা যায়। ঐ লিপিকে খ্রী' পূ' পঞ্চম শতকের লিপি বলে অনুমান করা হয়। এই অনুমান সত্য হ'লে, এইটিই ভারতের প্রাচীনতম লিপি।

অশোকের অনুশাসনে দু'প্রকার লিপি পাওয়া যায়—একটি 'ব্রাহ্মী' অপরটি 'খরোষ্ঠী'। খরোষ্ঠী লিপিটি বিদেশীয় আরামীয় লিপি থেকে উদ্ভূত, এইটি ডানদিক

দে বা ন পি য়ে ন পি য় দ সি ন লা জি ন বী স তি ব সা ভি সি তে ন

(অশোকের শিলালিপি - ব্রাহ্মী অক্ষরে)

থেকে বাঁদিকে লিখিত হয়। ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে ঐ লিপি ব্যবহৃত হ'তো। পরবর্তী কালে ঐ লিপিটি লুপ্ত হ'য়ে যায় এবং কোন ভারতীয় লিপিব সঙ্গে এর যোগ নেই। অশোকের 'মান্‌সেরা' ও 'শাহ্‌বাজগঢ়ী' অনুশাসনে এই লিপি ব্যবহৃত হয়েছে। পক্ষান্তরে ব্রাহ্মী লিপির নিদর্শন পাওয়া গেছে সারা ভারত জুড়ে এবং এই লিপি থেকেই বাংলা আদি তাবৎ ভারতীয় লিপির উদ্ভব।

এই ব্রাহ্মী লিপির উদ্ভব বিষয়ে মতান্তর রয়েছে। একদল পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিত প্রচার করেন যে কোন-না-কোন লিপি থেকেই ক্রমবিবর্তনের পথে এই ব্রাহ্মী লিপির উদ্ভব

ঘটেছে। কিন্তু ভারতীয় লিপিতত্ত্ববিদ্গণ এই অভিমতে আস্থা স্থাপন করেন না। তাঁদের একদল অনুমান করেন যে সিন্ধুলিপি থেকেই ভারতীয় লিপির উদ্ভব। বস্তুতঃ কোন কোন ব্রাহ্মী লিপির সঙ্গে সিন্ধুলিপির কোন কোন প্রতীকচিহ্নের সাদৃশ্যও পাওয়া যায়। কিন্তু সিন্ধুলিপির নিশ্চিত পাঠোদ্ধার না হওয়া পর্যন্ত এ বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ যুক্তিযুক্ত নয়। অপর একদল অনুমান করেন, ব্রাহ্মী লিপি স্বাধীনভাবেই ভারতে উদ্ভূত এবং বিকশিত হয়েছে। হয়তো অপরাপর লিপির মতোই এরও মূলে ছিল চিত্র-প্রতীক। তবে এ বিষয়ে কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। বস্তুতঃ, ব্রাহ্মী লিপির উদ্ভব এখনও পর্যন্ত একটি সমস্যাই রয়ে গেছে।

জৈন ধর্মীয় গ্রন্থ 'ভগবতীসূত্রে' প্রথমেই ব্রাহ্মা লিপির (বম্ভী লিবি) উল্লেখ রয়েছে। 'ললিতবিস্তর' গ্রন্থে ৬৪ প্রকার লিপির উল্লেখ আছে, তাতে আছে 'ব্রাহ্মী লিপি' ও 'বঙ্গলিপি'র নাম। খ্রী' পূ' পঞ্চম শতক থেকে খ্রী' তৃতীয় শতক পর্যন্ত 'ব্রাহ্মী লিপি'র যুগ। শুধু অশোকের শিলালিপিতেই নয়, ঐ সময়কার যে কোন শিলালিপিতেই ব্রাহ্মী লিপির নিদর্শন পাওয়া যায়। কালে কালে এই লিপি উত্তর ও দক্ষিণভেদে দুটি ধারায় বিভক্ত হয়ে যায়।

কোন কোন স্তম্ভ বা গিরিগাত্রে অশোকের অনুশাসন ছাড়াও আরো কিছু কিছু লিপি খোদিত হয়েছে। বঙ্গদেশে প্রাপ্ত প্রাচীনতম লিপি খ্রী' পূ' তৃতীয় শতকের **মহাস্থানগড় লিপি**। এদের সহায়তায় লিপি-বিবর্তনের ইতিহাসও অনেকটা স্পষ্ট ওঠে। হ'য়ে কুষাণরাজ কণিষ্ক (খ্রী' প্রথম শতক) এবং শকক্ষত্রপ রুদ্রদামনের (খ্রী' দ্বিতীয় শতক) লিপির সঙ্গে প্রাচীন ব্রাহ্মী লিপির বিশেষ পার্থক্য নেই। খ্রী' চতুর্থ শতক থেকে গুপ্ত রাজত্বকালে লিপির ভিন্ন রূপের পরিচয় পাওয়া যায়। এই কালের লিপিকে তাই **'গুপ্তলিপি'** নাম অভিহিত করা হয়। এই সময়ই প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্ত্য-ভেদে লিপি আবার দু'টি ধারায় বিভক্ত হ'য়ে যায়। 'ল, ষ, হ' এবং 'ম' অক্ষরগুলোতে এই ভেদ সুস্পষ্ট। গুপ্তলিপির প্রসারকাল ষষ্ঠ-সপ্তম শতক পর্যন্ত।

আ' ৫২০ খ্রী' বোধিধর্ম নামক একজন ভারতীয় ভিক্ষু 'প্রজ্ঞাপারমিতাহৃদয়সূত্র' এবং 'উষ্ণিষবিজয়ধারিণী' নামক দু'খানি পুথি-সম্বলিত একটি গ্রন্থ ভারত থেকে চীনদেশে নিয়ে যান; শেষ পর্যন্ত বইখানি জাপানের 'হরিয়ুজি' নামক এক বৌদ্ধমঠে আশ্রয় পায়। এই গ্রন্থে ব্যবহৃত লিপির সঙ্গে পূর্বাঞ্চলীয় লিপির ঐক্য পাওয়া যায়।

গুপ্তযুগের পর খ্রী' সপ্তম থেকে নবম শতকের মধ্যে বর্ণের উপর মাত্রাদানের রীতি প্রবর্তিত হয়। এই সময় বর্ণের, বিশেষতঃ স্বরের মাত্রার আকৃতি কুটিল ছিল বলে এই

ব্রাহ্মী	খরোষ্ঠী	বঙ্গলিপি	নাগরী	ব্রাহ্মী	খরোষ্ঠী	বঙ্গলিপি	নাগরী
		অ	अ			ত	त
		আ	आ			থ	थ
		ই	इ			দ	द
		উ	उ			ধ	ध
		এ	ए			ন	न
		ও	ओ			প	प
		ক	क			ফ	फ
		খ	ख			ব	ब
		গ	ग			ভ	भ
		ঘ	घ			ম	म
		ঙ	ङ			য	य
		চ	च			র	र
		ছ	छ			ল	ल
		জ	ज			ব	ब
		ঝ	झ			শ	श
		ঞ	ञ			ষ	ष
		ট	ट			স	स
		ঠ	ठ			হ	ह
		ড	ड				
		ঢ	ढ				
		ণ	ण				

লিপিকে **কুটিল লিপি** বলা হয়। পূর্বাঞ্চলীয় এই কুটিল লিপির নামান্তর **সিদ্ধমাতৃকা** লিপি। লিপির বিবর্তনে উত্তরাঞ্চলে **শারদা-লিপি** ও মধ্য-পশ্চিমাঞ্চলে **নাগর-লিপির** উদ্ভব ঘটে।। শারদা-লিপি থেকে পঞ্জাবের গুরুমুখী বর্ণমালা এবং নাগর-লিপি থেকে নাগরী (দেবনাগরী) লিপির সৃষ্টি হয়। কুটিল-লিপি থেকেই বঙ্গলিপির উদ্ভব ঘটে। অতএব বঙ্গলিপি ও নাগরলিপি ভগিনী-স্থানীয়া।

নবম শতাব্দীতে রচিত 'নারায়ণ পালের তাম্রশাসনে' বাঙ্‌লা-লিপির সর্বপ্রাচীন রূপের সন্ধান পাওয়া যায়। খ্রী' ৮৫২ অব্দ থেকে ৯০৭ খ্রী. পর্যন্ত পালবংশীয় নরপতি নারায়ণ পাল রাজত্ব করেছিলেন।, এই কালের লিপিকে তাই 'পাল-লিপি' বলে অভিহিত করা চলে। অতঃপর সেনবংশের রাজত্বকালে বিজয়সেনের (১১শ শতক) দেওপাড়া লিপিতে আধুনিক বঙ্গাক্ষরের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। এদের মধ্যে 'এ খ ঞ ত ম র ল ষ' প্রভৃতি অক্ষরগুলো প্রায় একালের মতই, অন্যগুলোতে কিছু পার্থক্য রয়েছে। লক্ষ্মণসেনের 'অর্পণদীঘি'র লেখায় এবং বৈদ্যদেবের কসৌলি প্রাপ্ত (১২শ শতক) লিপিতে বাঙ্‌লা লিপির নিদর্শন পাওয়া যায়।

বাঙলা ভাষায় রচিত''চর্যাপদে'র যে পুথি পাওয়া গেছে, তার রচনাকাল খ্রী' দশম থেকে দ্বাদশ শতকের মধ্যে হ'লেও পুথির লিপিকাল সম্ভবতঃ চতুর্দশ থেকে ষোড়শ শতকের মধ্যে। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'র পুথির লিপিকালও ঐ সময় বলে অনুমিত হয়। এগুলোতে কোন কোন সংযুক্ত বর্ণের আকার বর্তমানকাল থেকে পৃথক্‌। এর পরবর্তীকালে বাঙ্‌লার বিভিন্ন অঞ্চলে যে সমস্ত পুরনো হাতের লেখা পুথি পাওয়া গেছে তাদের মধ্যে মোটামুটি অক্ষরসাদৃশ্য থাক্‌লেও অঞ্চলভেদে ও ব্যক্তিভেদে কিছুটা বৈচিত্র্যেরও সন্ধান এতে পাওয়া যায়। বস্তুতঃ মুদ্রণের ব্যবস্থা না হওয়া পর্যন্ত লিপির কোন সুনির্দিষ্ট মান স্থাপিত হ'তে পারেনি।

বাঙ্‌লা লিপির মুদ্রিত রূপের প্রাচীনতম নিদর্শন ১৬৯২ খ্রী' লিখিত একখানি গ্রন্থে পাওয়া যায় বলে ফাদার হস্টেন উল্লেখ করেছেন। ১৭২৫ খ্রী' জার্মানিতে মুদ্রিত Urent Szeb নামক গ্রন্থে কয়েকটি বাঙলা সংখ্যা এবং 'শ্রীসরজন্ত বলপকাং মার' (Sergeant Wolfgang Meryer)—এই নামটি বাঙলা অক্ষরে মুদ্রিত আছে।

ভারতবর্ষে মুদ্রিত প্রথম গ্রন্থ ন্যাথানিয়েল ব্রাসি হ্যালহেড-রচিত (১৭৭৮ খ্রী') 'A Grammar of the Bengal Language'। এর বাঙলা অক্ষরের ছাঁচ তৈরি করেছিলেন পঞ্চানন কর্মকার ও তাঁর জামাতা মনোহর কর্মকার। ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হুগলী কুঠীর এক, ইংরেজ রাইটার চার্লস্‌ উইলকিন্স প্রাচীন পুথির

অক্ষরের সঙ্গে কালীকুমার রায় ও খুশমৎ মুন্সী দুই ব্যক্তির হস্তাক্ষর মিলিয়ে যে বাঙলা অক্ষরের কাঠামো করে দেন, তাকেই আদর্শরূপে গ্রহণ করে মুদ্রণের অক্ষর তৈরি হয় এবং এখন পর্যন্ত মোটামুটিভাবে বাঙলা অক্ষরের এই আদল চলে আসছে। বিদ্যাসাগর মহাশয় এর কিছুটা সংস্কার সাধন করেছিলেন বলে জানা যায়।

সংবাদপত্র দ্রুত এবং অধিক সংখ্যক মুদ্রণের প্রয়োজনে কিছুকাল পূর্বে লিপির ক্ষেত্রে 'লাইনোটাইপ' এবং 'মনোটাইপ' প্রথা প্রবর্তনে বাঙলা লিপির ধাঁচ আবার কিছুটা পরিবর্তিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের হস্তাক্ষরের অনুকরণে বাঙলা হাতের লেখার একটা অভিনব সুদর্শন রূপ বহুল প্রচলিত। মুদ্রণেও এর কাছাকাছি একটা রূপ আনবার চেষ্টা চলছে। এক্ষণে সংবাদপত্রের বাইরে বহু বাঙলা গ্রন্থও লাইনো এবং মনোটাইপে মুদ্রিত হ'চ্ছে।

অতি সাম্প্রতিক কালে যুক্তাক্ষরকে ভেঙে ব্যবহার করবার একটা প্রবণতা দেখা যাচ্ছে।

সপ্তম অধ্যায়

ধ্বনিবিজ্ঞান

(Phonetics)

ভাষা বাক্যভিত্তিক। কিন্তু ভাষার সংজ্ঞায় তার মূলে পাওয়া যাচ্ছে ধ্বনিকে। স্পষ্ট উচ্চারিত অর্থযুক্ত ধ্বনিসমষ্টি তথা শব্দের সাহায্যে মানুষ যখন পরস্পরের সঙ্গে ভাব বিনিময় ক'রে থাকে তখন তাকে বলা হয় 'ভাষা'। অতএব কয়েকটি গুণযুক্ত অথবা শর্ত-সাপেক্ষ ধ্বনিসমষ্টিই ভাষা। ভাষার আলোচনায় তাই ধ্বনির গুরুত্ব অসাধারণ। ধ্বনি-সম্পর্কিত আলোচনার তিনটি ধারা। একটিতে আছে ধ্বনির শারীবতত্ত্ব বিশ্লেষণ, শ্রেণীবিভাগ ইত্যাদি, একে বলা হয় **ধ্বনিবিজ্ঞান**, অপরটিতে কোন বিশেষ ভাষার ধ্বনির ব্যবহারিক বিচার-বিশ্লেষণ করা হয় তাকে বলা হয় **ধ্বনি-বিচার** বা **ধ্বনিতা-বিজ্ঞান** এবং শেষ ধারায় ধ্বনি-পরিবর্তনই প্রধান আলোচ্য বিষয় —একে বলা হয় **ধ্বনিতত্ত্ব**।

কোন ভাষায় ব্যবহৃত ধ্বনি-সমষ্টির শারীর-বিশ্লেষণ, ধ্বনির প্রকৃতিবিচার এবং শ্রেণীবিভাগ ধ্বনিবিজ্ঞানের (Phonetics) আলোচ্য বিষয়। শারীর-বিশ্লেষণ বলতে বোঝায় ধ্বনির আচরণ এবং শ্রবণের নিমিত্ত মানবদেহের যে সকল প্রত্যঙ্গ বা যন্ত্র ব্যবহৃত হয় তাদের ক্রিয়া পর্যবেক্ষণ। অতএব এটি বিজ্ঞান শাখারই অন্তর্ভুক্ত হওয়া সঙ্গত। বিভিন্ন উন্নত দেশে Kymograph, Palatograph, Spectrograph প্রভৃতি যন্ত্রের সাহায্যে ধ্বনিবিজ্ঞানের অধ্যয়ন-অধ্যাপনা হ'য়ে থাকে। এই ব্যবহারিক বিজ্ঞানকে **নিরীক্ষামূলক** বা **'যন্ত্রাত্মক ধ্বনিবিজ্ঞান** (Experimental বা Instrumental Phonetics) বলা হয়।

আমরা যখন কথা বলি, তখন ফুসফুস থেকে নিঃশ্বাসবায়ু শ্বাসনলীর ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হ'বার সময় স্বরতন্ত্রীতে, (vocal chord) মুখ ও নাসিকার কোন অংশে পূর্ণতঃ অথবা আংশিক বাধাপ্রাপ্ত হ'য়ে যে বায়ু-তরঙ্গের সৃষ্টি করে, তাকে বাহন ক'রে তথায় উৎপন্ন ধ্বনিও নানাবিধ তরঙ্গের আকার ধারণ করে—একে বলা হয় **ধ্বনিতরঙ্গ (sound wave)**। এই ধ্বনিতরঙ্গ বায়ুতে প্রবাহিত হ'য়ে, কখনো বা বৈদ্যুত-চুম্বক তরঙ্গ-রূপে শ্রোতার কর্ণমূল পর্যন্ত পৌঁছায়। অতঃপর সেই ধ্বনি-তরঙ্গ শ্রোতার কর্ণপটহে আঘাত করার পর তা' স্নায়ুতন্ত্রীর মাধ্যমে স্নায়ু-তরঙ্গ-রূপে শ্রোতার মস্তিষ্কে প্রবেশ করলেই শ্রোতা আমাদের কথা শুনতে পান। অতএব এই

যে তিনটি স্তরের মধ্য দিয়ে বক্তার বক্তব্য উচ্চারিত ধ্বনি (Articulated sound)-রূপে, ধ্বনি-তরঙ্গ রূপে এবং শ্রুতি (Audition)-রূপে শেষ পর্যন্ত শ্রোতার কানে পৌঁছলো, সেই তিনটি শ্রবণ-প্রক্রিয়া 'উচ্চারণমূলক ধ্বনি-বিজ্ঞান' (Articulatory Phonetics), 'ধ্বনি-তরঙ্গ বিজ্ঞান' (Accoustics) এবং শ্রুতিমূলক 'ধ্বনিবিজ্ঞান' (Auditory Phonetics) সাধারণভাবে যথাক্রমে 'ভাষাবিজ্ঞান' (Linguistics), পদার্থবিজ্ঞান (Physics) এবং শারীরবিজ্ঞানের (Physiology) অন্তর্ভুক্ত। অতএব যথার্থ বিচারে ধ্বনিবিজ্ঞানে উচ্চারণমূলক আলোচনাটুকুই শুধু ভাষাবিজ্ঞান-চর্চার অধিকারভুক্ত-রূপে বিবেচিত হ'য়ে থাকে।

[এক] বাগ্‌যন্ত্র

দেহের যেসকল প্রত্যঙ্গ বা যন্ত্রের সাহায্যে আমরা কথা বলি, তথা নানাপ্রকার ধ্বনি উচ্চারণ করে থাকি, তাকে বলা হয় **'বাগ্‌যন্ত্র'** (vocal organ)। ফুসফুস, স্বরযন্ত্র, স্বরতন্ত্রী, কণ্ঠ, জিহ্বা, ওষ্ঠ সক্রিয়ভাবে এবং নাসিকা, তালু ও দন্ত নিষ্ক্রিয়-ভাবে ধ্বনি উচ্চারণে সহায়তা করে, অতএব এ সকলই বাগ্‌যন্ত্রের অঙ্গীভূত। এদের কোন এক বা একাধিক যন্ত্রের সহায়তা-ব্যতীত কোন ধ্বনি উচ্চারিত হ'তে পারে না।

ফুসফুস থেকে নিঃশ্বাস বায়ু যখন নির্গত হয়, তা' **শ্বাসনালীর** (trachoea/ windpipe) ভিতর দিয়ে আসবার পথে প্রথম বাধা পায় **স্বরযন্ত্রে** (Larynx)। শ্বাসনালীর খানিকটা অংশ যেখানে স্ফীত হ'য়ে সামনের দিকে একটু উদ্‌গত হ'য়ে আসে, যাকে বলা হয় **কণ্ঠমণি** (Adam's apple)—ঐটেই স্বরযন্ত্র। এখানে আছে একজোড়া **কণ্ঠতন্ত্রী** (Glottis), **স্বরতন্ত্রী** বা **ঘোষতন্ত্রী** (vocal chords)। দু'টো পাতলা অথচ মজবুত স্থিতিস্থাপক ঝিল্লি সামনের দিকে জোড়া লাগানো, পিছনের দিকটা খোলা—এরই নাম স্বরতন্ত্রী। যখন নিঃশ্বাসবায়ু বহির্গত হয়, তখন কোন বাধা পায় না। কিন্তু প্রয়োজনে স্বরতন্ত্রীর খোলা মুখটা ক্রমে সঙ্কুচিত হ'তে হ'তে একেবারে বায়ুনির্গমনের পথ বন্ধ ক'রে দিতে পারে। উর্ধ্বগামী বায়ুর চাপে স্বরতন্ত্রীর মুখ সামান্য ফাঁক হ'লে বায়ুর সঙ্গে সংঘর্ষে তন্ত্রীতে কম্পন দেখা দেয়। এই কম্পনের ফলেই বিচিত্র ধ্বনির সৃষ্টি হ'য়ে থাকে।

শ্বাসনালীর পিছনেই আছে **খাদ্যনালী** বা **গল** (Gullet)। উভয়ের মুখের উপরই আছে একখণ্ড মাংসপিণ্ড, এর নাম আলজিভ, পারিভাষিক নাম **অলিজিহ্বা, উপজিহ্বা** বা **অধিনালিকা** (Epiglottis)। খাদ্যবস্তু গ্রহণের সময় এই আলজিভ স্বরযন্ত্রের মুখটা ঢেকে দেয়, যাতে খাদ্যবস্তু স্বরযন্ত্রের ভিতর প্রবেশ করতে না পারে। অন্যমনস্কভাবে খেতে খেতে যে আমরা 'বিষম খাই', তার কারণ,

অলিজিহ্বারই সাময়িক দায়িত্বহীনতা। শ্বাসনালী এবং খাদ্যনালীর উপরে একটাই নালী—একে বলা হয় **গলমুখ** বা **কণ্ঠাগ্র** (Pharynx)। এই পথেই মুখবিবর বা নাসিকাবিবর দিয়ে বায়ু যাতায়াত করে।

মুখবিবরে আছে সর্বাধিক সক্রিয় **জিহ্বা** (Tongue), **কণ্ঠনালী** (Glottis), **তালু** (Palate), **দন্ত** (Tooth) ওবং **ওষ্ঠ** (Lip)—এছাড়া আছে **নাসিকা-বিবর** (Nasal cavity)। প্রত্যেক ধ্বনির উচ্চারণেই কখনো-না-কখনো কোনা-না-কোন যন্ত্রের আবশ্যক। ধ্বনির উচ্চারণে পূর্বোক্ত যন্ত্রগুলোর অঙ্গবিশেষও অংশগ্রহণ করে। **জিহ্বাগ্র, কণ্ঠ, দন্তমূল, অগ্রতালু, পশ্চাত্তালু, অধর, ওষ্ঠ** প্রভৃতি সকলেরই ধ্বনি-উচ্চারণে ব্যবহার হ'তে পারে। অতএব ফুস্‌ফুস্‌ থেকে আরম্ভ ক'রে অধরোষ্ঠ পর্যন্ত পূর্বোক্ত প্রতিটি প্রত্যঙ্গই বাগ্‌যন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত। এদের মধ্যে প্রত্যক্ষভাবে যেগুলি উচ্চারণে অংশগ্রহণ ক'রে **উচ্চারকের** ভূমিকা গ্রহণ করে, তাদের সব কয়টির অবস্থান অধরোষ্ঠ থেকে আরম্ভ ক'রে কণ্ঠ পর্যন্ত মুখবিবরে। এদের মধ্যে কতক মুখ-বিবরের উর্ধ্বাংশে—উর্ধ্বকণ্ঠ, আলজিহ্বা, স্নিগ্ধ/পশ্চাত্তালু, মধ্যতালু, শক্ত/অগ্রতালু, মাড়ি/দন্তমূলোধর্ব, দন্তমূল, উর্ধ্বদন্ত ও উর্ধ্বওষ্ঠ—এগুলি **উর্ধ্বস্থ উচ্চারক** এবং **নিষ্ক্রিয়** এদের ভূমিকা। পক্ষান্তরে মুখবিবরের নিম্নাংশে অবস্থিত উপাঙ্গসমূহ—জিহ্বামূল, পশ্চাদ্‌জিহ্বা, সম্মুখজিহ্বা, জিহ্বাফলক, জিহ্বাগ্র এবং নিম্নওষ্ঠ—এগুলি **নিম্নস্থ উচ্চারক** এবং **সক্রিয়** এদেরই ভূমিকা।

আগেই বলা হয়েছে, নিঃশ্বাস-বায়ু বহির্গমনের পথে প্রথম বাধাপ্রাপ্ত হয় স্বরযন্ত্রে—এখানে বাধার প্রকৃতি-অনুসারে ধ্বনি **ঘোষ** বা **নাদ** (voiced) ও **অঘোষ** (unvoiced) হ'য়ে থাকে। স্বরযন্ত্রে বাধাপ্রাপ্ত হ'য়ে নিঃশ্বাসবায়ু যখন সবেগে বেরিয়ে আসতে চায়, তখনই স্বরতন্ত্রী অনুরণিত হয়ে একপ্রকার ধ্বনিতরঙ্গ সৃষ্টি করে, ফলে উৎপন্ন হয় **ঘোষবৎ** বা **সঘোষ** ধ্বনি, সংক্ষেপে **ঘোষধ্বনি**। বাংলা স্বরবর্ণগুলো এবং বর্গের তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চমবর্ণ ঘোষবৎ। যে-সকল ধ্বনি স্বরযন্ত্রে বাধাপ্রাপ্ত না হ'য়ে অবাধে চলে এসে মুখবিবরের কোথাও বাধা পায়, তাদের বলা হয় **অঘোষ ধ্বনি**। বর্গের প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ণ, তিনটি শিস্‌ধ্বনি এবং বিসর্গ—এগুলো অঘোষ। এছাড়া সবই ঘোষ। এই বিচারে ধ্বনি দ্বিবিধ—ঘোষ ও অঘোষ।

স্বরযন্ত্র থেকে বেরিয়ে আসবার পর যদি নিঃশ্বাস বায়ু মুখবিবরে আর কোথাও বাধাপ্রাপ্ত না হয়ে কোন ধ্বনি উচ্চারণ করে, তবে তাকে বলে স্বরধ্বনি (Vowel) এবং কোথাও বাধাপ্রাপ্ত হ'য়ে ধ্বনি উচ্চারিত হ'লে তাকে বলা হয় ব্যঞ্জনধ্বনি (Consonant)। অতএব মুখাভ্যন্তরে বাধা-প্রাপ্তির বিচারে ধ্বনি দ্বিবিধ—স্বরধ্বনি ও ব্যঞ্জনধ্বনি।

স্বরযন্ত্র থেকে বেরিয়ে আসবার পর নিঃশ্বাসবায়ু দ্বিতীয় বার বাধা পেতে পারে মুখবিবরে—সে বাধা হ'তে পারে আংশিক অথবা সম্পূর্ণ। যখন বায়ু আংশিক বাধাপ্রাপ্ত হয় অর্থাৎ যখন কোন সংকীর্ণ পথ দিয়ে বায়ু বেরিয়ে আসে, তখন শিস্ দেবার মত একপ্রকার ধ্বনি নির্গত হয়, তাকে বলা হয়—'**শিস্ধ্বনি**' (Sibilant), বা **উষ্মধ্বনি** (Breathsound spirants)। এই ধ্বনি উচ্চারণে স্বরধ্বনির প্রয়োজন হয় না। 'শ, ষ, স'—শিস্ধ্বনির উচ্চারণ অঘোষ; এর ঘোষ উচ্চারণও আছে, তবে বাংলা বা সংস্কৃতে নেই। ইংরেজী 'Z' (zero), 'zh' (Pleasure) এবং কোন কোন আরবীফার্সী ধ্বনির উচ্চারণ ঘোষবৎ। বিসর্গ-ধ্বনিকেও এই বর্গের অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

বাঙলা এবং অন্যান্য ভারতীয় ভাষায় 'চ'-বর্গের ধ্বনিগুলির উচ্চারণ-কাজে জিহ্বা ও তালুর স্পর্শের পরেই উভয়ের মধ্যে বায়ুর ঘর্ষণ সৃষ্টি হয়, এই কারণে 'চ'-বর্গীয় ধ্বনিগুলিকে '**ঘৃষ্টধ্বনি**' (Affricates) বলা হয়।

স্বরযন্ত্র থেকে বেরিয়ে আসবার পথে নিঃশ্বাসবায়ু কখন কখন সম্পূর্ণভাবে বাধাপ্রাপ্ত হ'য়ে একেবারে থেমে গিয়ে পরে বিস্ফারিত হয়; মুখের ভিতরে কোন এক অঙ্গ অপর এক অঙ্গকে স্পর্শ করে বলেই সম্পূর্ণ বাধার সৃষ্টি হয়—এরূপে উচ্চারিত ধ্বনিকে বলা হয় **স্পৃষ্টধ্বনি** (Plosiv es/Stops/Occlusives)। বাংলা ও সংস্কৃতে 'ক' থেকে 'ম' পর্যন্ত ধ্বনিগুলো এরূপ স্পর্শজাত ধ্বনি। ধ্বনির উচ্চারণ-কালে মুখের যে অংশ প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করে, তার নাম-অনুযায়ী ধ্বনির বর্গীকরণ হ'য়ে থাকে।

কণ্ঠকে আশ্রয় ক'রে উচ্চারিত ধ্বনি '**কণ্ঠ্যধ্বনি**' (Velar)—সংস্কৃত 'ক' বর্গের ধ্বনিগুলো; বাংলায় 'ক' বর্গের ধ্বনিগুলির প্রকৃত উচ্চারণ-স্থান জিহ্বামূল। অতএব এগুলিকে বলা চলে জিহ্বামূলীয় ধ্বনি। কণ্ঠমূলের সাহায্যে উচ্চারিত ধ্বনি **কণ্ঠমূলীয়** (Uvular)—আরবী 'ক্বাফ্'; কণ্ঠনালীর আশ্রয়ে উচ্চারিত ধ্বনি **কণ্ঠনালীয়** (Laryngeal/Glottal)—বাংলা 'ঃ' ইংরেজি 'h'।

জিহ্বা তালু স্পর্শ ক'রে যে ধ্বনি উচ্চারণ করে, তা' '**তালব্য**' (Palatal) ধ্বনি—বৈদিক 'চ' বর্গ ও 'শ'। সংস্কৃতে ও বাংলায় 'চ'-বর্গের উচ্চারণ যথার্থ স্পৃষ্ট নয়। ঘর্ষণ-জাত বলে, তাকে বলা হয় 'ঘৃষ্টধ্বনি' (Affricates)।

জিহ্বা মূর্ধা স্পর্শ করে ধ্বনি উচ্চারণ করলে হয় '**মূর্ধন্য ধ্বনি**' (Cerebrals)—সংস্কৃত 'ট'-বর্গের ধ্বনি ও 'ষ'; মূর্ধন্য ধ্বনির উচ্চারণে জিহ্বাকে উল্টিয়ে মূর্ধা স্পর্শ করতে হয় বলে তাদের **প্রতিবেষ্টিত ধ্বনি** (Retroflex)-ও বলা হয়। দন্তমূলে

স্পর্শে উচ্চারিত ধ্বনি দন্তমূলীয় (Alveolar), বাংলা—'ন, র, ল'; বাংলায় উচ্চারিত 'ট'-বর্গের ধ্বনিও দন্তমূলীয়। জিহ্বাশিখর দন্ত স্পর্শ করে যে ধ্বনি উচ্চারণ করে, তাকে বলে দন্ত্য (Dental)—সংস্কৃত ও বাংলা 'ত, থ, দ, ধ' এবং সং 'স'।

অধর ও ওষ্ঠের স্পর্শে উচ্চারিত ধ্বনি ওষ্ঠ্য (Labial)—'প'-বর্গের ধ্বনিগুলো। উপর পাটির দন্তের সঙ্গে নিম্ন ওষ্ঠের স্পর্শ ঘটলে হয় দন্তৌষ্ঠ্য ধ্বনি (Labio dental)—সংস্কৃত 'অন্তঃস্থ ব' (ব), ইংরেজি 'f', 'v'।
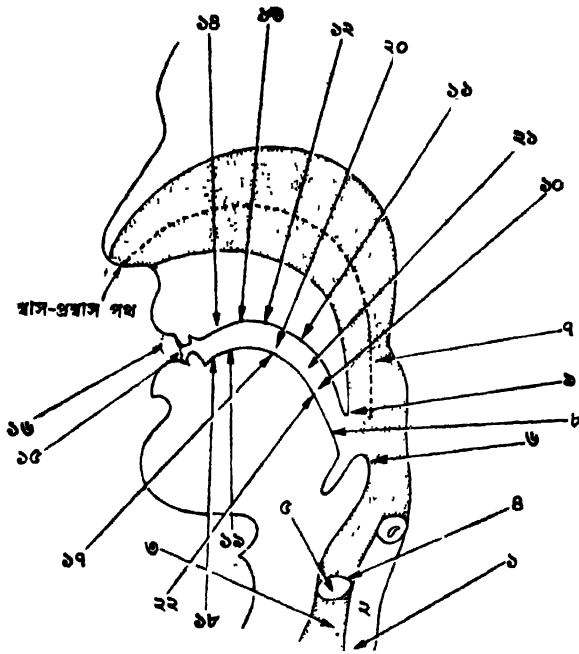
১ শ্বাসনালী (wind-pipe) ২. অন্ননালী (Gullet) ৩. স্বরযন্ত্র (Larynx) ৪. স্বরযন্ত্রমুখ (Glottis) ৫ স্বরতন্ত্রী / কণ্ঠতন্ত্রী (Vocal chord) ৬. অধিজিহ্বিকা (Epiglottis) ৭. নাসাবিবর (Nasal cavity) ৮. মুখবিবর (Mouth cavity) ৯. আলজিহ্বা / শুন্ডিকা (Uvula) ১০. কণ্ঠ (Gutter) ১১. কোমলতালু (Soft palate) ১২. মূর্ধা (Cerebral) ১৩. কঠিন তালু (Hard palate) ১৪. দন্তমূল (Alveola) ১৫. দন্ত (Tooth) ১৬. ওষ্ঠ (Lip) ১৭. জিহ্বা (Tongue) ১৮. জিহ্বামুখ (Tip of the Tongue) ১৯. জিহ্বাগ্র (Front of the Tongue) ২০. জিহ্বা মধ্য (Middle of the Tongue) ২১. পশ্চাৎ জিহ্বা (Back of the Tongue) ২২. জিহ্বা মূল (Root of the Tongue)।

মুখবিবরে বিভিন্ন অঙ্গের বিচিত্র প্রক্রিয়ায় আরও নানাপ্রকার ধ্বনি উৎপন্ন হ'য়ে থাকে। তাদের প্রধান কয়েকটি দেওয়া হলো।

প্রতিবেষ্টিত ধ্বনি (Retroflex)—খাঁটি মূর্ধন্য ধ্বনির উচ্চারণকালে জিহ্বাগ্র পিছনে বেঁকে মূর্ধা স্পর্শ করে, তাই এগুলোকে বলা হয় প্রতিবেষ্টিত ধ্বনি। —সংস্কৃত ও (বাংলা-বহির্ভূত) অপরাপর ভারতীয় ভাষার মূর্ধন্য ধ্বনিগুলি।

রণিত ধ্বনি (Resonant)—নাসায় বা মুখগহ্বরে প্রতিধ্বনিত হয়ে যখন বায়ু নিঃসৃত হয়, তখন তাদের রণিত ধ্বনি বলে।—প্রতি বর্গের পঞ্চম বর্ণ।

ধ্বনির উচ্চারণ-কালে জিহ্বার পার্শ্ব দিয়ে বায়ু বহির্গত হ'লে **পার্শ্বিক ধ্বনি** (Lateral), জিহ্বাগ্র কম্পিত হ'লে **কম্পিত ধ্বনি** (Trilled) এবং জিহ্বাগ্র দ্বারা দন্তমূল তাড়িত হ'লে **তাড়িত ধ্বনির** (Flapped) সৃষ্টি হয়। বাঙ্‌লায় 'ল' পার্শ্বিক, 'র' কম্পিত এবং 'ড়, ঢ়' তাড়িত ধ্বনি।

নাসিক্য ধ্বনি—নাসাপথ দিয়ে ধ্বনি বহির্গত হ'লে **নাসিক্য ধ্বনি** (Nasal) হয়।—বর্গের পঞ্চমবর্ণগুলো নাসিক্য ধ্বনি।

অর্ধস্বর (Semivowels)—কোন স্বরধ্বনির উচ্চারণ-কালে যদি ভিতরে কোন অবরোধের সৃষ্টি হয় এবং ধ্বনিটি ঈষৎ উষ্ম উচ্চারিত হয়, তবে তাহা অর্ধস্বরে পরিণত হয়।—ই>য়্, উ>ব্ ইংরেজি y, w।

অর্ধব্যঞ্জন (Sonant)—যে ব্যঞ্জন ধ্বনিগুলো স্বয়ং অথবা অপর ব্যঞ্জন ধ্বনির বাহক-রূপে অক্ষর (Syllable) সৃষ্টি করতে পারে, তাদের বলে অর্ধব্যঞ্জন। 'ন্, ম্, র্, ল্'—এরূপ অর্ধব্যঞ্জন।

মহাপ্রাণ (Aspirates)—কোন ধ্বনির উচ্চারণ-কালে কণ্ঠনালীর আকুঞ্চনে যদি অতিরিক্ত বাধার সৃষ্টি হয়, তাকে বলে মহাপ্রাণ ধ্বনি। অতিরিক্ত বাধার সৃষ্টি না হ'লে ধ্বনিগুলো হয় **অল্পপ্রাণ** (Unaspirates)। বাংলায় বর্গের দ্বিতীয় ও চতুর্থ বর্ণ অর্থাৎ যাদের উচ্চারণের সঙ্গে একটা 'হ্' (ক্+হ্=খ্) যুক্ত হয়, ঐগুলি মহাপ্রাণ এবং বর্গের প্রথম ও তৃতীয় বর্ণ অল্পপ্রাণ।

দ্বিব্যঞ্জন ধ্বনি—দু'টি ব্যঞ্জন ধ্বনি যদি যুগপৎ একটি ধ্বনির উচ্চারণকাল মধ্যে উচ্চারিত হয়, তবেই দ্বিব্যঞ্জন ধ্বনি হ'তে পারে। সাধারণতঃ একটি স্পৃষ্ট ব্যঞ্জন-ধ্বনি যখন মহাপ্রাণিত হয়, তখন তার সঙ্গে কণ্ঠ্য 'হ্' ধ্বনি যুক্ত হওয়াতে তা' দ্বিব্যঞ্জন হয় (-'ক্+হ্'='খ্', 'দ্+হ্'='ধ') এবং কোন স্পৃষ্ট ব্যঞ্জনধ্বনি যদি উষ্মধ্বনির সঙ্গে যুক্ত হয়, তখনই 'ঘৃষ্ট ধ্বনি'র সৃষ্টি হয়, এই ঘৃষ্টধ্বনিও দ্বিব্যঞ্জন ধ্বনি—

'ক্+শ্=চ'—এটি 'তালব্য ঘৃষ্ট', বাংলায় ও নব্যভারতীয় আর্যে এটি বর্তমান ; 'ৎ+স্=চ'—এটি 'দন্ত্যঘৃষ্ট', পূর্ববঙ্গীয় উচ্চারণে বর্তমান এবং 't+s'=ts ইংরেজি উচ্চারণে 'চ'—এটি 'দন্তমূলীয় ঘৃষ্ট'।

[দুই] ধ্বনির শ্রেণীবিভাগ

বিভিন্ন পদ্ধতিতে ধ্বনির শ্রেণীবিভাগ সম্ভবপর হ'লেও সাধারণতঃ স্বরধ্বনি এবং ব্যঞ্জনধ্বনির ভিত্তিতে গঠিত বিভাগই বহু প্রচলিত।

(ক) স্বরধ্বনির শ্রেণীবিভাগ

অপর ধ্বনির সহায়তা ব্যতীতই যে ধ্বনি স্বয়ং পূর্ণ ও পরিস্ফুটরূপে উচ্চারিত হতে পারে এবং যাকে আশ্রয় করে অপর ধ্বনি উচ্চারিত হয়, তাকে বলা হয় **'স্বরধ্বনি'**। মোট মৌলিক স্বরধ্বনির সংখ্যা আট। এগুলো কোন নির্দিষ্ট ভাষার স্বরধ্বনি নয়, মোটামুটিভাবে সব ভাষায় যত স্বরধ্বনি প্রচলিত আছে, তাদেরই মোট-সংখ্যা এটি। এগুলিই মুখ্য মৌলিক স্বরধ্বনি, এ ছাড়া গৌণ স্বরধ্বনিও কোন কোন ভাষায় প্রচলিত আছে। পৃথিবীর বহুভাষাতেই এদের সবগুলো নেই, কোন কোন ভাষায় কোন কোনটি আছে।

স্বরধ্বনির শ্রেণীবিন্যাসে বিবিধ উপায় অবলম্বন করা হয় ;

(১) জিহ্বার অবস্থান-অনুযায়ী শ্রেণীবিভাগ।

(২) ওষ্ঠাধরের আকৃতি-অনুযায়ী শ্রেণীবিভাগ।

(৩) মুখবিবরের অবস্থান-অনুযায়ী শ্রেণীবিভাগ।

(৪) স্বরের মাত্রাগত শ্রেণীবিভাগ।

(১) 'জিহ্বার অবস্থান-অনুযায়ী শ্রেণীবিভাগ :

স্বরধ্বনির উচ্চারণে স্বরযন্ত্র কিছুটা বাধার সৃষ্টি করলেও মুখবিবরে কখনও বাধার সৃষ্টি হয় না। তৎসত্ত্বেও যে স্বরধ্বনি-বৈচিত্র্য পরিলক্ষিত হয়, তার কারণ—জিহ্বার অবস্থানগত পার্থক্য এবং ওষ্ঠের আকুঞ্চন-প্রসারণ। যে স্বরধ্বনির উচ্চারণকালে জিহ্বার অগ্রভাগ সম্মুখবর্তী হয়, তাকে বলে **সম্মুখ স্বরধ্বনি** (Front vowels) এবং জিহ্বা পশ্চাৎদিকে আকৃষ্ট হ'লে তাকে বলে **পশ্চাৎ স্বরধ্বনি** (Back vowels)। —বাংলা 'ই, এ, অ্যা, অা'—এগুলো সম্মুখ স্বরধ্বনি এবং 'আ, অ, ও, উ' পশ্চাৎ স্বরধ্বনি।

মুখবিবরে জিহ্বার অবস্থান অনুযায়ী এদের শ্রেণীবিন্যাস নিম্নোক্তরূপে হতে পারে :—'ই (i), এ (e), অ্যা (æ), আ (a), আ (ɑ), অ (ɔ), ও (o), উ (u)'।

জিহ্বা সামনের দিকে উঁচুতে তুলে উচ্চারণ করা হয় 'ই', তারপর জিহ্বা ক্রমশঃ নীচে নামিয়ে 'এ', তারপর 'অ্যা'—জিহ্বা সমতলে রেখে 'আ', আ' এবং এর পরই জিহ্বার গোড়ার দিকটা ক্রমশঃ উঁচুতে তুলে 'অ', 'ও' এবং সর্বোচ্চে 'উ'। অতএব এখানে উচ্চাবস্থ স্বরধ্বনি—'ই, উ', মধ্যোচ্চ—'এ, ও', মধ্যনিম্ন—'অ্যা, অ' এবং নিম্নাবস্থ 'আ', 'আ'। আবার সম্মুখ স্বরধ্বনি—'ই, এ, অ্যা, আ' এবং পশ্চাৎ স্বরধ্বনি—'উ, ও, অ, আ'।

অতএব জিহ্বার অবস্থান অনুযায়ী স্বরধ্বনিগুলির পরিচয় ঃ

সম্মুখ স্বরধ্বনি উচ্চ-'i' (বাং—ই, ঈ)' মধ্যোচ্চ—'e' (বাং-এ), মধ্যনিম্ন—'æ' 'ɛ' (বাং-অ্যা), নিম্ন—'a' (বাং-আ'-এটি আঞ্চলিক ভাষায় ব্যবহৃত হয়) [কেন্দ্রীয়-'a' (বাং-আ)]। পশ্চাৎ স্বরধ্বনি (বা কেন্দ্রীয়)-'a' (বাং-আ), মধ্যনিম্ন-'ɔ' (বাং-অ), মধ্যোচ্চ-'o' (বাং-ও) এবং উচ্চ-'u' (বাং-উ, ঊ)।

স্বরধ্বনি	সম্মুখাবস্থ প্রসারিত	কেন্দ্রীয়	পশ্চাদবস্থ কুঞ্চিত
উচ্চ ও সংবৃত	i—ই, ঈ		u—উ, ঊ
মধ্যোচ্চ ও অর্ধসংবৃত	e—এ		o—ও
মধ্যনিম্ন ও অর্ধবিবৃত	ɛ æ—অ্যা		ɔ—অ
নিম্ন ও বিবৃত	a—আ	*a*—আ	a—আ

(২) 'ওষ্ঠাধরের আকৃতি-অনুযায়ী শ্রেণীবিভাগ ঃ

সম্মুখ স্বরধ্বনির উচ্চারণ কালে ওষ্ঠদ্বয় প্রসারণ ঘটে বলে এদের **প্রসারিত স্বরধ্বনি** (Retracted vowels)-ও বলা হয়। যে স্বরধ্বনির উচ্চারণে ওষ্ঠদ্বয় কুঞ্চিত হয়, তাদের বলে **কুঞ্চিত স্বরধ্বনি** (Rounded vowels)। যথা—'অ, ও, উ'। যে স্বরধ্বনির উচ্চারণ-কালে মুখবিবর সঙ্কুচিত বা সংবৃত থাকে, তাদের বলে **সংবৃত স্বরধ্বনি** (Closed vowels)।—'ই, উ'। উচ্চারণ-কালে মুখ-বিবর প্রসারিত বা বিবৃত থাকলে বলা হয় **বিবৃত স্বরধ্বনি** (Open vowels)—'আ, আ'। এইভাবে মুখবিবর যখন প্রায় সংবৃত থাকে, তখন যে স্বরধ্বনি উচ্চারিত হয়, তাকে বলে 'অর্ধসংবৃত' (Half-closed) স্বর—'এ' এবং 'ও'; আর যে স্বরের

উচ্চারণকালে মুখ-বিবর প্রায় বিবৃত থাকে তাকে বলা হয় 'অর্ধবিবৃত' (Half-open) স্বর—'অ্যা' এবং 'অ'।

(৩) 'মুখবিবরের অবস্থানুযায়ী শ্রেণীবিভাগ' ঃ

বিভিন্ন স্বরধ্বনির উচ্চারণ-কালে মুখবিবরের অভ্যন্তর ভাগের অবস্থা-অনুযায়ীও স্বরধ্বনির শ্রেণীবিভাগ কল্পিত হয়।

স্বরধ্বনির উচ্চারণ-কালে মুখবিবর সঙ্কুচিত হ'লে 'সংবৃত স্বরধ্বনি' (closed vowel) (ই, উ), প্রসারিত হ'লে 'বিবৃত স্বরধ্বনি' (Open vowel) (আ, আ), প্রায়-সংবৃত হ'লে 'অর্ধ-সংবৃত' (Half-closed) ধ্বনি (এ, ও), এবং প্রায়-বিবৃত হ'লে 'অর্ধ বিবৃত' (Half open) ধ্বনি (অ্যা, অ) হয়।—এগুলো স্বরধ্বনির প্রকৃতিগত শ্রেণীবিভাগ (Qualitative classification) নামে অভিহিত হয়।
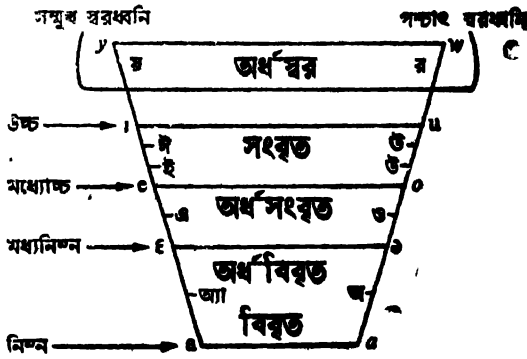
হিজ্বার অবস্থান ও মৌলিক স্বরধ্বনি

মৌলিক স্বর	বাংলা স্বরধ্বনি
i, e, æ, a, u, o, ɔ, ɑ	ই, এ, অ্যা, (আ'), উ ও, অ, আ, (আ'-বাংলায় নেই)

মৌলিক স্বরধ্বনির তুলনায় বাংলা স্বরধ্বনির উচ্চারণস্থান জিহ্বা-উন্নমন-বিন্দুর কিঞ্চিৎ নিম্নে—শুধু কেন্দ্রীয় স্থানে অবস্থিত বাংলা-আ (ɑ)-মৌলিক আ'-র (a) মতো সম্মুখে নয়, বরং একটু পশ্চাতে এবং বিবৃত নয়, প্রায় অর্ধাবিবৃত।

(৪) **স্বরধ্বনির পরিমাণগত বা মাত্রাগত শ্রেণীবিভাগ** (Quantitative classification) করা হয় স্বরধ্বনির মাত্রা-পরিমাণ নির্ধারণ করে। বিভিন্ন ভাষায় এই স্বরধ্বনিগুলোর হ্রস্ব-দীর্ঘভেদে মাত্রাভেদ হ'য়ে থাকে—সাধারণতঃ হ্রস্বস্বর এক-মাত্রা, দীর্ঘস্বর দুই মাত্রা বলে হিশেব করা হয়—অবশ্যই এ বিষয়ে ব্যতিক্রমও যথেষ্ট। তবে বাংলায় দীর্ঘস্বর-রূপে কতকগুলি স্বর নির্দিষ্ট হ'লেও এদের প্রকৃত উচ্চারণ দীর্ঘ বা দ্বিমাত্রক নয়। সংস্কৃতে প্লুতস্বরের জন্য তিনমাত্রা বিহিত আছে।

'দূরাহ্বানে তথাগানে রোদনে চ প্লুতস্বরে।' কোন স্বরধ্বনির পরই একই সঙ্গে যদি ব্যঞ্জনধ্বনিও উচ্চারিত হয়, তাকে বাংলায় বলা হয় 'রুদ্ধাক্ষর'; 'রাম' 'জল্'—এই উভয় ক্ষেত্রেই রুদ্ধাক্ষর দ্বিমাত্রক। পক্ষান্তরে যে সমস্ত অক্ষর স্বরান্ত (তা' দীর্ঘ-স্বর হ'লেও), '**মুক্তাক্ষর**' এবং একমাত্রাযুক্ত। আবার বাংলা কথ্যভাষার একটা সাধারণ প্রবণতা এই যে, বহু অক্ষরময় বা ধ্বনিযুক্ত শব্দও সাধারণত দু'টি মাত্রাযুক্ত বা দ্বিমাত্রকগুচ্ছ হ'য়ে দাঁড়ায়—এই প্রক্রিয়াকে বলা হয় **দ্বিমাত্রিকতা** (Bi-morism)। যথা—যেমন=যে-মন্, পাগল=পা-গল্. পাগলা=পাগ্+লা, যাইতেছি=যাচ্ছি।

একাধিক স্বরধ্বনিকে যদি একটিমাত্র প্রচেষ্টায় উচ্চারণ করা যায়, তবে **যৌগিক স্বর** বা **সন্ধিস্বর** হয়। সন্ধিস্বর নানাবিধ হ'তে পারে, যেমন—'দ্বিস্বর' (dipthong)—'ঐ, ঔ, ইএ, উও' প্রভৃতি; 'ত্রিস্বর' (tripthong)—'আইও, উআই' প্রভৃতি; 'চতুঃস্বর' (tetraphthong)—'আওআই' প্রভৃতিরূপে যৌগিক স্বরের নানাপ্রকার বিভাগ হ'তে পারে।

স্বরধ্বনির উচ্চারণ-কালে নিঃশ্বাসবায়ু নাসাবিবরে অনুরণিত হ'লে **সানুনাসিক** স্বরধ্বনির (nasalised vowel) সৃষ্টি হয়।—বাঁশ, হাঁস।

স্বরধ্বনির উচ্চারণ-কালে মুখবিবরে কোন অঙ্গ অপর অঙ্গকে স্পর্শ করে না সত্য, তবু বিশেষ বিশেষ ধ্বনির উচ্চারণে কোন কোন অঙ্গের সহায়তা আবশ্যক। সেই হিশেবে প্রকৃতিগতভাবে স্বরধ্বনিগুলোর আর একপ্রকার বর্গীকরণ সম্ভবপর:

কণ্ঠ্যধ্বনি—অ, আ। **তালব্য ধ্বনি**—ই, ঈ, এ, ঐ। **কণ্ঠ তালব্য ধ্বনি**—অ্যা। **দন্ত্য ধ্বনি**—ঋ, ঌ। **ওষ্ঠধ্বনি**—উ, ঊ, ও, ঔ।

(খ) ব্যঞ্জন ধ্বনি

স্বরধ্বনির সহায়তা-ব্যতিরেকে যে ধ্বনি স্বয়ং স্পষ্টরূপে উচ্চারিত হ'তে পারে না এবং অপর ধ্বনিকে আশ্রয় করেই সাধারণতঃ যে ধ্বনি উচ্চারিত হয়, তাকে বলা হয় '**ব্যঞ্জনধ্বনি**'। ব্যঞ্জনধ্বনির উচ্চারণ-কালে বাগ্‌যন্ত্রের একটি অঙ্গ অপর কোন অঙ্গের সাহায্যে শ্বাসবায়ুর নির্গমন পথকে পূর্ণতঃ অথবা আংশিকভাবে রুদ্ধ ক'রে দিয়ে পর মুহূর্তেই মুক্ত ক'রে দেয়। যখন ধ্বনি পূর্ণতঃ রুদ্ধ হয়, তখন তাকে বলা হয় '**স্পর্শধ্বনি**' বা '**স্পৃষ্টধ্বনি**' (stops/plosives) এবং যখন অংশতঃ রুদ্ধ হয় ও কিছু উষ্মা বা শ্বাস বেরিয়ে আসে, তখন তাকে বলা হয় '**উষ্মধ্বনি**' (spirants)। ব্যঞ্জনধ্বনির রূপ এবং সংখ্যা নির্ণয় সম্ভব নয়। পৃথিবীর কোন ভাষাতেই সব ব্যঞ্জন ব্যবহৃত হয় না। এখানে সাধারণভাবে সংস্কৃত ও বাঙলা ভাষায় ব্যবহৃত ব্যঞ্জনের পরিচয় দেওয়া হ'লো।

'ব্যঞ্জনধ্বনির বর্গীকরণ'

ব্যঞ্জনধ্বনিগুলোর বর্গীকরণে পৃথিবীর কোন ভাষাতেই সংস্কৃতের মত বিজ্ঞানসম্মত নিয়মনিষ্ঠা অনুসৃত হয়নি। উচ্চারণস্থান ও উচ্চারণ-প্রকৃতি-অনুসারে স্পর্শবর্ণগুলি অতি সুশৃঙ্খল ও ক্রমবিন্যস্ত, পৃথিবীর অপর কোন ভাষায় এর তুলনা নেই। সংস্কৃত ভাষায় যেভাবে ব্যঞ্জনবর্ণমালা সাজানো আছে, তাতে এই নিয়মনিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া যায়। বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত ব্যঞ্জনবর্ণসমূহও সংস্কৃত বর্ণমালার অনুসরণে কল্পিত হ'য়েছে। ফলতঃ ব্যঞ্জনধ্বনির বর্গীকরণ পদ্ধতিটিও হয়েছে অতীব বিজ্ঞানসম্মত। এই বর্গীকরণে দ্বিবিধ উপায় অবলম্বিত হয়ঃ (১) উচ্চারণ-স্থান-অনুযায়ী ও (২) উচ্চারণ-প্রকৃতি-অনুযায়ী।

"উচ্চারণ স্থান-অনুযায়ী বর্গীকরণ"ঃ স্বরযন্ত্র থেকে নিঃশ্বাস বায়ু স্বরতন্ত্রীকে অনুরণিত ক'রে মুখবিবর দিয়ে বেরিয়ে আসবার পথে যে সকল স্থানে বাধাপ্রাপ্ত হ'য়ে থাকে, তাদের ক্রম-অনুযায়ী সংস্কৃত ও বাংলা বর্ণমালাকে সাজানো হয়েছে। প্রথমে কণ্ঠ্যবর্ণ ('ক' বর্গ), তারপর যথাক্রমে তালব্য বর্ণ ('চ'-বর্গ), মূর্ধন্য বর্ণ ('ট'-বর্গ), দন্ত্যবর্ণ ('ত'-বর্গ) ও ওষ্ঠ্যবর্ণ ('প'-বর্গ)। এখানে শুধু মূর্ধন্য বর্ণের ব্যাপারে ক্রম ভঙ্গ হ'য়েছে বলে কেউ কেউ মনে করেন। সম্ভবতঃ পরবর্তীকালে মূর্ধন্য ধ্বনির উচ্চারণ পরিবর্তিত হওয়ায় স্থানসন্নিবেশে বিপর্যয় ঘটে থাকবে। প্রাগুক্ত পাঁচটি বর্গের পঁচিশটি বর্ণকে **স্পর্শবর্ণ** (Stops) বলা হয়। কারণ এদের উচ্চারণ-কালে মুখ-বিবরেব কোন এক অঙ্গের সঙ্গে অপর অঙ্গের পূর্ণ স্পর্শ ঘটে। ব্যঞ্জনবর্ণমালার সর্ব-শেষে আছে **উষ্মধ্বনি** (Fricative) 'শ ষ স হ'—যাদের উচ্চারণকালে স্পর্শ হয় আংশিকমাত্র এবং দুই অঙ্গের মাঝখানে একটু ফাঁক থাকে, যেদিক দিয়ে কিছুটা উষ্মা বা শ্বাস বেরিয়ে আসতে পারে। এই স্পর্শবর্ণ এবং উষ্মবর্ণের অন্তে অর্থাৎ মধ্যে অবস্থান করছে যে বর্ণগুলো—'য র ল ব' তাদের বলে **অন্তঃস্থ বর্ণ**। বস্তুতঃ এদের কোনটাই পুরো ব্যঞ্জন নয়। 'য' (য়=y) এবং 'ব' (ব=w) 'অর্ধস্বর' রূপে এবং 'র' ও 'ল' তরলবর্ণ দুটো 'অর্ধব্যঞ্জন' রূপেও পরিচিত। অতএব স্বর ও ব্যঞ্জনের অন্তর্বর্তী বলেও এদের অন্তঃস্থবর্ণ বলা যায়।

(ক) 'কণ্ঠ্যধ্বনি (Velar), 'কণ্ঠমূলীয়' (Uvular), কণ্ঠনালীয়' (Glottal/ Laryngeal) ধ্বনিঃ—কণ্ঠকে আশ্রয় ক'রে বিভিন্ন ভাষায় যে কণ্ঠাশ্রিত ধ্বনি উৎপন্ন হয়, তাদের মধ্যে উচ্চারণ-স্থান-ভেদে ধ্বনিগত কিছু পার্থক্য রয়েছে এবং তদনুযায়ী তাদের নামকরণ করা হয়। জিহ্বার পশ্চাদ্‌ভাগ দ্বারা তালুর নীচের অংশ স্পৃষ্ট হ'লে 'কণ্ঠ্যধ্বনি' উৎপন্ন হয়। যেমন বাংলা 'ক, খ' ইত্যাদি। অনেকের মতে জিহ্বামূল

এর উৎপত্তিস্থান বলে এদের 'জিহ্বামূলীয় ধ্বনি' বলাই বিধেয়। যথার্থ কণ্ঠ্যধ্বনি কণ্ঠকে স্পর্শ করেই উচ্চারিত হয়, যেমন—সংস্কৃত 'ক' বর্গ। কণ্ঠমূলীয় ধ্বনির উৎপত্তি হয় অলিজিহ্বা কিংবা তার সংলগ্নস্থান স্পর্শকালে। যথা,—আরবী ভাষার (q=কাফ্) ধ্বনি। আর কণ্ঠনালীয় ধ্বনির উচ্চারণকালে কণ্ঠনালীর পেশী-আকুঞ্চনের ফলে কিঞ্চিৎ বাধার সৃষ্টি হয়ঃ 'হ', ঃ (বিসর্গ)।

(খ) 'তালব্যধ্বনি' (Palatal)ঃ জিহ্বার পশ্চাদ্ভাগ তালুর পশ্চাৎ অংশ স্পর্শ করলে তালব্যধ্বনি উৎপন্ন হয়। বৈদিক যুগে 'চ' বর্গের ধ্বনিগুলি ছিল যথার্থ স্পৃষ্ট তালব্যধ্বনি, উচ্চারণ ছিল 'ক্য, খ্য্-র মতো। কিন্তু পরবর্তী সংস্কৃত এবং বাংলা ও অপরাপর ভারতীয় আর্যভাষায় এই বর্গের ধ্বনিগুলি জিহ্বা ও তালুর ঘর্ষণে উৎপন্ন হয় বলে এদের 'তালব্য ঘৃষ্ট ধ্বনি' (Palatal affricate) নামে অভিহিত করা চলে।

(গ) 'মূর্ধন্যধ্বনি' (Cerebral/Retroflex)ঃ যে ধ্বনির উচ্চারণকালে জিহ্বাগ্রভাগ প্রতিবেষ্টিত হ'য়ে মূর্ধা অর্থাৎ তালুর শীর্ষদেশ স্পর্শ করে তাকে 'মূর্ধন্যধ্বনি / 'প্রতিবেষ্টিত' ধ্বনি বলা হয়। সংস্কৃত, রাজস্থানী, পাঞ্জাবী, দক্ষিণ ভারতীয় ভাষাসমূহে 'ট'-বর্গের উচ্চারণে এই ধ্বনি বজায় আছে। কিন্তু বাংলা উচ্চারণে জিহ্বাগ্র বস্তুতঃ দন্তমূলের খানিকটা উপরে শক্ত তালুর অর্থাৎ তালুর সম্মুখ-ভাগ (Pre-palate) স্পর্শ ক'রে থাকে। তাই বাংলায় 'ট'-বর্গীয় ধ্বনিকে 'পশ্চাৎ-দন্তমূলীয় (Post-Alveolar) বা 'অন্ততালব্য' ধ্বনি বলাই সঙ্গত।

(ঘ) 'দন্ত্যধ্বনি' (Dental)—জিহ্বাগ্র দ্বারা দন্ত-স্পর্শে যে ধ্বনি উচ্চারিত হয়, তা' দন্ত্যধ্বনি। 'ত'-বর্গীয় ধ্বনিগুলি দন্ত্যধ্বনি হ'লেও 'ন' উচ্চারণ কালে দন্তমূল স্পৃষ্ট হয় বলে তাকে 'দন্তমূলীয় ধ্বনি' বলা হয়।

(ঙ) 'ওষ্ঠ্যধ্বনি' (Labial)ঃ উপর ও নীচের ঠোঁটের (অধর ও ওষ্ঠের) স্পর্শে যে ধ্বনি উৎপন্ন হয়, তাকে বলা হয় ওষ্ঠ্যধ্বনি। 'প'-বর্গীয় ধ্বনিতে যথার্থ ওষ্ঠ্যধ্বনি-রূপ বজায় আছে।

'উচ্চারণ-প্রকৃতি অনুযায়ী বর্গীকরণ'ঃ

ঘোষ-অঘোষ ভেদে বিভিন্ন ধ্বনির একপ্রকার শ্রেণীবিভাগ করা হয়। স্বরধ্বনি-গুলো সর্বদাই ঘোষ, ব্যঞ্জনের মধ্যে বর্গের তৃতীয়, চতুর্থ এবং পঞ্চমবর্ণ ঘোষ, অন্তঃস্থবর্ণগুলো ঘোষ এবং 'হ' **ঘোষবর্ণ**। এছাড়া যাবতীয় বর্ণ অর্থাৎ বর্গের প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ণ, তিনটি শিস্ ধ্বনি এবং 'ঃ' বিসর্গ ধ্বনি **অঘোষ**।

বর্গের পঞ্চমবর্ণগুলো নাসাবিবরের সাহায্যে উচ্চারিত হয় বলে তাদের বলা হয় **নাসিক্য ধ্বনি** বা **অনুনাসিক ধ্বনি**।

কোন কোন ধ্বনির উচ্চারণে কণ্ঠনালীর পেশী আকুঞ্চিত হয় বলে একটা অতিরিক্ত বাধার সৃষ্টি হয়, ফলে ধ্বনিগুলোর সঙ্গে একটা 'হ' যুক্ত হয়, এদের বলা হয়, **'মহাপ্রাণ বর্ণ'**—বর্গের দ্বিতীয় ও চতুর্থ বর্ণ মহাপ্রাণ, 'ঃ' এবং 'হ'-ও মহাপ্রাণ বর্ণ। বর্গের প্রথম ও তৃতীয় বর্ণ এবং তিনটি শিস্ ধ্বনি **অল্পপ্রাণ**। এই শিস্‌ধ্বনিগুলোর মহাপ্রাণিত রূপ ইংরেজি, আরবী প্রভৃতি ভাষায় আছে, যেমন—ইং 'z'।

(স্পর্শবর্ণগুলোর উচ্চারণকালে যদি দুই অঙ্গের মাঝখানে একটু ফাঁক থাকে, তবে একটা ঘর্ষণের সৃষ্টি হওয়ায় ধ্বনিগুলো ঘৃষ্ট উচ্চারিত হয়, তাই এগুলোকে **'ঘৃষ্ট ধ্বনি'** বলা হয়। সংস্কৃতের এবং বাঙলার চ-বর্গের উচ্চারণ ঘৃষ্ট। এগুলোকে **'দ্বিব্যঞ্জন'ও** বলা হয়, কারণ স্পর্শবর্ণ ও উষ্মধ্বনির যুগপৎ উচ্চারণেই এগুলোর সৃষ্টি হয়ে থাকে। উল্লেখযোগ্য যে, মহাপ্রাণবর্ণগুলোকেও দ্বিব্যঞ্জন বলা চলে, কারণ এখানে স্পর্শবর্ণের সঙ্গে 'হ্' যুগপৎ উচ্চারিত হয়।)

'ড' এবং 'ঢ' শব্দের মধ্যে থাক্‌লে এদের উচ্চারণ হয় 'ড়' এবং 'ঢ়'—জিহ্বার অগ্রভাগ দ্বারা দন্তমূলে তাড়না দ্বারা এই ধ্বনির উচ্চারণ হয় বলে এদের বলা হয় **'তাড়িত ধ্বনি'**।

অন্তঃস্থ বর্ণগুলোর মধ্যে 'য়' এবং 'ব' যথাক্রমে 'ইঅ' এবং 'উঅ'-বৎ উচ্চারিত হওয়ায় এদের **'অর্ধস্বর'** বলা হয় এবং 'র' ও 'ল'-কে বলা হয় **'তরল ধ্বনি'**। 'ল' এবং 'র' স্বরধ্বনির মত স্বাধীনভাবে উচ্চারিত হতে পারে বলেই এদের তরল ধ্বনি বলা হয়। 'ল'-এর উচ্চারণকালে জিহ্বার পার্শ্ব দিয়ে বায়ু নির্গত হয় বলে একে **পার্শ্বিক ধ্বনি** এবং 'র'-এর উচ্চারণে জিহ্বাগ্র কম্পিত হয় বলে একে **কম্পিত ধ্বনি** বলা হয়।

নাসিক্যধ্বনি (ঙ, ঞ, ণ, ন, ম,), উষ্মধ্বনি (শ, ষ, স, হ), অর্ধস্বর (য়, ব) এবং তরলধ্বনি (র, ল)—এগুলোর উচ্চারণকালে নিঃশ্বাস বায়ুর প্রবহমাণতা বজায় থাকে বলে এদের **প্রবহমাণ ধ্বনি** (Continuant) বলা হয়।

[বাঙলা ধ্বনির উচ্চারণ-বৈশিষ্ট্যের জন্য গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ড দ্রষ্টব্য।]

বাঙলা স্বর ও ব্যঞ্জন ধ্বনির শ্রেণী-বিভাগ

	ব্যঞ্জন ধ্বনি (Consonants)						অন্তঃস্থ ধ্বনি	স্বরধ্বনি (Vowels)
উচ্চারণ প্রকৃতি-অনুযায়ী →	স্পর্শধ্বনি (Stops/Plosive)					উষ্মধ্বনি (Fricatives)	অর্ধস্বর (Semi vowel) তরল ধ্বনি (Liquids)	
	অঘোষ ধ্বনি (Unvoiced sounds)		ঘোষ ধ্বনি (Voiced sound)					
উচ্চারণ স্থান-অনুযায়ী ↓	অল্পপ্রাণ (Unaspirate)	মহাপ্রাণ (Aspirate)	অল্পপ্রাণ	মহাপ্রাণ	অনুনাসিক (nasals)			
কণ্ঠ্য / পশ্চাৎ জিহ্বাজাত (Velar)	ক	খ	গ	ঘ	ঙ	ঃ, হ		অ, আ
তালব্য ধ্বনি (দন্তমূলীয় ঘৃষ্ট) ধ্বনি (Alveolar Affricate)	চ	ছ	জ	ঝ	ঞ	শ জ়	য়	ই, ঈ এ, ঐ
মূর্ধন্য ধ্বনি (অগ্রতালব্য / দন্তমূলীয়) (Retroflex/cerebrals)	ট	ঠ	ড ড়	ঢ ঢ়	ণ	ষ		
দন্ত্য ধ্বনি (Dental)	ত	থ	দ	ধ				
দন্ত্যমূলীয় ধ্বনি (Alveolar)					ন	স	র, ল	
ওষ্ঠ্য ধ্বনি (Labial)	প	ফ	ব	ভ	ম		ব	উ, ঊ ও, ঔ

অষ্টম অধ্যায়

ধ্বনিতত্ত্ব
(Phonology)

ধ্বনির উৎপত্তি, প্রয়োগ ও কার্যকলাপ-আদি ধ্বনিবিজ্ঞানে বর্ণিত হয়ে থাকে ; কোন বিশেষ ভাষার ক্ষেত্রে যখন ধ্বনিবিজ্ঞানের নিয়মাবলী বা কার্যাবলী প্রয়োগ করা হয়, তখন তাকে সাধারণ ধ্বনিতত্ত্ব (General Phonology) বলে অভিহিত করা হয়। সাধারণ ধ্বনিতত্ত্বের দুটি শাখা—একটি **ধ্বনিতা বিজ্ঞান** বা **ধ্বনি বিচার** কিংবা **ধ্বনিমিতি** (Phonemics) এবং অপরটি **ধ্বনিতত্ত্ব** (Phonology)। কোন বিশেষ ভাষায় ব্যবহারিক বিচার-বিশ্লেষণ ধ্বনিতাবিজ্ঞানের এবং কোন বিশেষ ভাষার ধ্বনি-পরিবর্তন, তার কারণ, প্রকৃতি ও ধারাবাহিক আলোচনা ধ্বনিতত্ত্বের বিষয়ীভূত।

[এক] ধ্বনিতাবিজ্ঞান/ধ্বনিবিচার/ধ্বনিমিতি (Phonemics)

(ক) ধ্বনিতা / স্বনিম / ধ্বনিমান (Phoneme)

প্রত্যেক ভাষায় নিজস্ব কিছু ধ্বনি আছে এবং সাধারণতঃ প্রতিটি ধ্বনির জন্য থাকে এক একটা বর্ণ। কথাটা সাধারণভাবে বলা হ'লেও অনেক ভাষাতেই এর ব্যতিক্রম দেখা যায়। তবে সংস্কৃতের ক্ষেত্রে উক্তিটি যথাযথভাবেই প্রযোজ্য। L. Bloomfield সংস্কৃত বর্ণমালা-সম্বন্ধে আলোচনা-প্রসঙ্গে বলেছেন, "In this way they arrived at a system which recorded their speech-form with entire accuracy." বাঙ্‌লা বর্ণমালা সেই সংস্কৃত বর্ণমালারই উত্তরাধিকারী, কিন্তু ধ্বনির ক্ষেত্রে উভয়ের মধ্যে বেশ তারতম্য ঘটে গেছে। তাহ'লেও সাধারণতঃ প্রতিটি ধ্বনির একটা সুনির্দিষ্ট উচ্চারণ-রীতির অস্তিত্ব স্বীকার করতে হয়। কিন্তু অনেক সময় দেখা যায়, অপর বর্ণের সান্নিধ্যে অথবা আবস্থানিক কারণে একই বর্ণের একাধিক ধ্বনি-রূপ বর্তমান, কিন্ত সে পার্থক্য এত সূক্ষ্ম যে এদের ভিন্ন ধ্বনি বলেও গ্রহণ করা যায় না। কোন একটি বিশেষ অবস্থায় ধ্বনির যে রূপ থাকে, অপর কোন বিশেষ অবস্থায়ই শুধু তার পরিবর্তন ঘটে। এরূপ ক্ষেত্রে অবস্থান্তর-সহ ধ্বনিটিকে তথা ধ্বনিগুচ্ছকে বলা হয় **ধ্বনিতা** বা **স্বনিম** (Phoneme)। কেউ কেউ একে 'ধ্বনিমান' বলেও অভিহিত করেন।

ধ্বনিতার প্রকৃত স্বরূপ বোঝাতে গিয়ে H. A. Gleason অন্ততঃ তিনটি সংজ্ঞা ব্যবহার করেছেন : (১) "The Phoneme is the minimum feature of the expression system of a spoken language by which one thing that

may be said is distinguished from any other thing which might have been said. We will find that *bill* and *pill* differ in only one phoneme. They are therefore a *minimal pair*'.—অর্থাৎ কথ্যভাষার প্রকাশ-পদ্ধতির একটা ন্যূনতম বৈশিষ্ট্য হ'চ্ছে ধ্বনিতা, যার সাহায্যে একটা বিষয়, যা বলা হয়েছে, তা থেকে অন্য একটা বিষয় যা বলা হ'তে পারতো, তাকে পৃথক্ করা যায়। 'bill' এবং 'pill' শব্দ-যোটকের মধ্যে আমরা একটিমাত্র 'phoneme'/ধ্বনিতার পার্থক্য দেখতে পাই। অতএব তারা হলো **ন্যূনতম শব্দযোটক**। (২) দ্বিতীয়টি হ'চ্ছে—'A Phoneme is a class of sounds which : (1) are phonetically similar and (2) show certain characteristic patterns of distribution in the language or dialect under consideration'—অর্থাৎ ধ্বনিতা হচ্ছে এক শ্রেণীর ধ্বনিগুচ্ছ বা (i) ধ্বনিতাত্ত্বিক দিক থেকে সম এবং (ii) আলোচ্য ভাষার বা উপভাষার বিভাজনের কিছু বিশিষ্ট রূপকল্প বা নক্সা তৈরী করে। (২) তৃতীয়টি—'a phoneme is one element in the sound system of a language having a characteristic set of inter-relationships with each of the other elements in that system.' অর্থাৎ—কোন ভাষার ধ্বনিপ্রণালীতে ধ্বনিতা এমন একটি উপাদান যা ঐ প্রণালীর অন্য সকল উপাদানের সঙ্গে অন্তঃ-সম্পর্কের বিশেষ নিয়মে আবদ্ধ।—সদ্য-কথিত এই তিনটি সংজ্ঞার কোনটিই ধ্বনিতা বোঝানোর পক্ষে যথেষ্ট নয়। অতএব তিনটিকে পরস্পরের পরিপূরক বলে গ্রহণ করা চলে। কিন্তু তবু ধ্বনিতার সংজ্ঞা এখানে খুব স্পষ্ট হ'য়ে ফুটে ওঠেনি। Daniel Jones বিষয়টিকে সহজভাবে বুঝিয়ে বলেছেন—'A phoneme is a family of sounds in a given language which are related in character and are used in such a way that no one member ever occur in a word in the same phonetic context as any other member.'—ধ্বনিতা হচ্ছে কোন ভাষার এক ধ্বনিগুচ্ছ যা প্রকৃতির দিক থেকে নিকট-সম্পর্কযুক্ত এবং এগুলো এমনভাবে ব্যবহৃত হয় যাতে কোন শব্দে একটি ধ্বনি ব্যবহৃত হলে ঐ গুচ্ছের অপর কোন ধ্বনি ব্যবহৃত হবে না।—যেমন, বাঙলায় শব্দের আদিতে 'য'-এর উচ্চারণ 'জ', কিন্তু মধ্যে বা শেষে সর্বদাই 'য়'; ('যোগ' কিন্তু 'বিয়োগ'); ধ্বনিটি শব্দের আদিতে কখনও 'য়' এবং মধ্যে বা শেষে 'জ' উচ্চারিত হয় না—অতএব 'য' একটি ধ্বনিতা, যার মধ্যে আছে 'য়' এবং 'জ' দুটি ধ্বনি। অনুরূপ আর একটি আবস্থানিক দৃষ্টান্ত বাঙ্‌লা ভাষায় বর্তমান, ভারতের অপর কোন ভাষায় এরূপ নেই—এটি মূর্ধন্য বর্ণের তৃতীয় ও চতুর্থ ধ্বনি 'ড' ও 'ঢ'। শব্দের আদিতে 'ড' ও 'ঢ',

উচ্চারিত হলেও শব্দের মধ্যে ও শেষে 'ড়'-রূপে বা '-ঢ়'-রূপে উচ্চারিত হয়। এইটি সাধারণ নিয়ম, সাধারণতঃ এর কোন ব্যতিক্রম হয় না ('ডম্বর' কিন্তু 'আড়ম্বর')। তবে পরিবেশগত কারণে এর পরিবর্তন হ'তে পারে। সমাসবদ্ধ শব্দ অথবা দেশি, বিদেশি শব্দের ক্ষেত্রে এই নিয়মটি প্রয়োজ্য নয় (আড্ডা)। অতএব 'ড' একটি ধ্বনিতা। অনুরূপভাবে দেখানো যায় যে বাংলায় 'ঢ'-ও একটি ধ্বনিতা।

ধ্বনিতা প্রত্যেক ভাষার নিজস্ব ব্যাপার, এক ভাষার ধ্বনিতাকে অপর কোন ভাষায় আরোপ করা যায় না। যেমন ধ্বনি-রূপে 'P/প' ইংরেজিতেও আছে, বাঙলাতেও আছে। ইংরেজির ধ্বনিতা তার নিজস্ব, বাঙলার ধ্বনিতা বাঙলার নিজস্ব—একটিকে অপরটির ক্ষেত্রে যথাযথভাবে প্রয়োগ করা যাবে না। যেমন—ইংরেজি 'P'-এর পর যদি স্বরবর্ণ থাকে, তবে তার উচ্চারণ হ'বে একটু মহাপ্রাণিত অর্থাৎ 'ফ'-এর মতো, কিন্তু বাঙলায় এরূপ কখনও হয় না। যেমন—Pan=phan (fan নয়)। অনুরূপ অবস্থা ইংরেজি 'c'-এর ক্ষেত্রেও হ'চ্ছে—cat=খ্যাট্। এই উচ্চারণগত পরিবর্তনের ফলে শব্দটির অর্থ পরিবর্তন ঘটে না বলেই 'ইংরেজি 'c'-এর 'ক' এবং 'খ'-এর উচ্চারণ সত্ত্বেও এর একই ধ্বনিতা। কিন্তু বাংলায় 'কাল -কে যদি 'খাল' বা 'গাল্' উচ্চারণ করা যায়, তাহ'লে অর্থ-পরিবর্তন ঘটে যাবে। কাজেই 'ক' ও 'খ' কে কিংবা 'p' ও 'প'-কে একই ধ্বনিতা বলে গ্রহণ করা যায় না।

এখানেই গ্লীসন-কথিত (১) সংখ্যক সূত্রে উল্লেখিত 'minimalpair' তথা 'ন্যূনতম শব্দযোটকে'র প্রসঙ্গটি আসছে। ধ্বনিতা বিশ্লেষণে ও বিচারে এটি অত্যন্ত আবশ্যকীয় বিষয়। স্বল্পতম তথা ন্যূনতম ধ্বনিগত ব্যবধান থাকবে, এমন দু'টি কিংবা ততোধিক শব্দের বিচার দ্বারাই ধ্বনিতার স্বরূপ নির্ণয় করা সম্ভবপর। পূর্বোক্ত দৃষ্টান্তে 'কাল', 'খাল্' কিংবা 'কাল' 'গাল' অথবা 'খাল' 'গাল্' শব্দযোটকগুলির মধ্যে প্রতিটি ক্ষেত্রেই ব্যবধান একটিমাত্র ব্যঞ্জনধ্বনির—'ক', 'খ' কিংবা 'গ'-এর ; শব্দগুলির বৃহদংশ 'আল্' সর্বত্র এক। এখানে একক ব্যঞ্জনগুলির যে কোনটির 'পরিবর্তনেই শব্দের অর্থ পরিবর্তিত হয়, এতএব 'ক্', 'খ্' ও 'গ্' প্রত্যেকেটিই 'স্বতন্ত্র ধ্বনিতা' বা স্বনিম। তবে এইভাবে 'ন্যূনতম' শব্দযোটকের দ্বারা বিচারিত ও বিশ্লেষিত না হ'লে যে কোন স্বতন্ত্র ধ্বনিকে ধ্বনিতা-রূপে স্বীকার করা যাবে না, এমন কোন আবশ্যিক শর্ত নেই। কারণ অনেক ভাষায় অনেক ক্ষেত্রে অনুরূপ শব্দযোজকের সন্ধান না-ও পাওয়া যেতে পারে। বিশেষতঃ কোন বিদেশির পক্ষে এরূপ শব্দের সন্ধান না পাওয়াই স্বাভাবিক। তাই 'ন্যূনতম শব্দযোটক /minimal pair-সম্বন্ধে গ্লীসন বলেন : 'They are by no means necessary, but merely the most definite

evidence when they can be found'. তিনি এদের উপযোগিতা বিষয়ে বলেন : 'Minimal pairs afford more direct proof because they show the two sounds occurring the identical environments. The more nearly similar the words are which we base over arguments the more direct-and conclusive it is.' যে ক্ষেত্রে ন্যূনতম শব্দযোটক পাওয়া যায় না, সেই ক্ষেত্রে প্রায় তদনুরূপ অর্থাৎ 'ন্যূনতমকল্প শব্দযোটক' (sub-minimal pair/ near-minimal pair) হ'লেও চলে বলেছেন দুই ভাষাবিজ্ঞানী : 'Often, near-minimal pairs present enough proof for phonemic status.'*

সকল ধ্বনিরই যে এরূপ একাধিক রূপ আছে তা নয় ; শুধু কোন কোন ধ্বনিরই একাধিক রূপবিশিষ্ট ধ্বনিতা, অপর সকল একক ধ্বনিই ধ্বনিতারূপে গণ্য হ'য়ে থাকে। তবে এ বিষয়ে একটু সতর্কতা অবলম্বন প্রয়োজন। কারণ আমাদের বাগ্‌যন্ত্র যতই সূক্ষ্ম হোক্ না কেন, তা' একেবারে নিখুঁত নয়। তাই যে কোন একটি শব্দ যদি আমরা অসংখ্যবার উচ্চারণ করি, তবে প্রতিবারই কিছু না কিছু পার্থক্য ধরা পড়বে। এ সূক্ষ্ম পার্থক্য কানে ধরা না পড়লেও যান্ত্রিক পরীক্ষায় তা ধরা পড়ে : তবে হয়তো সে পার্থক্য তেমন গণনীয় নয় এবং তা' প্রায় সব সময়ই একটা নির্দিষ্ট মানের কাছাকাছি থাকে। অনুরূপ ক্ষেত্রে ধ্বনিগুচ্ছের সন্ধান অকারণ। কিন্তু যদি উচ্চারণ-পার্থক্য সহজেই ধরা পড়ে এবং সে পার্থক্য যদি কোন বিশেষ রীতিমাফিক চলে তবে তাকে বলা হয় **গ্রহণীয় বৈষম্য** বা free variation (f. v.) এবং এক্ষেত্রে ধ্বনিতায় ধ্বনিগুচ্ছের বর্তমানতা স্বীকার করে নিতে হয়। যেমন, বাঙলায় শব্দের অন্তে মহাপ্রাণ বর্ণগুলো যথাযথ মহাপ্রাণ-রূপে উচ্চারিত হয় না, অথচ পুরো অল্পপ্রাণও নয়—এরূপ ক্ষেত্রে গ্রহণীয় বৈষম্য স্বীকার্য—দুধ>দুদ,' মাছ>মাচ্', সাথ্>সাত্'।

দুই বা ততোধিক সমতুল্য ধ্বনি যদি বিশেষ রীতি-অনুযায়ী বিশেষ সংস্থানে ব্যবহৃত হয় এবং একটির সংস্থানে যদি অপর কোনটি কখনও ব্যবহৃত না হয়, তবে একে বলা হয় **প্রতিযোগী ব্যবহার** (Complementary Distribution)। Gleason-এর ভাষায় : 'Sounds are said to be in complementary distribution when each occurs in a fixed set of contexts in which none of the other occurs.' যুক্ত ব্যঞ্জনে বা সন্ধিক্ষেত্রে 'শ'-র সঙ্গে 'চ' বর্গের, 'ষ'-র সঙ্গে 'ট' বর্গের এবং 'স'-র সঙ্গে 'ত'-বর্গের সংযোগ বস্তুতঃ প্রতিযোগী ব্যবহার।—নিঃ+চল= নিশ্চল, ধনুঃ+টঙ্কার=ধনুষ্টঙ্কার, ষষ্ঠ, নিঃ+তেজ=নিস্তেজ, স্থাপনা।

* Agwed, Frederick B. and Pietro, Robert J. D.

প্রতিযোগী ব্যবহার রয়েছে এমন দুই বা ততোধিক ধ্বনির প্রত্যেকটিকে বলে **পূরকধ্বনি** বা **উপধ্বনি বা পূরকস্বর** (Allophone) এবং সমষ্টিগতভাবে এদের বলে ধ্বনিতা : 'Any sound or subclass of sounds which is in complementary distribution with another so that the two together constitute a single phoneme is called an Allophone of the phoneme, (Gleason)। বাঙলায় 'ড' ও 'ড়' এবং 'য' ও 'য়' এরূপ পূরকধ্বনি। বাঙলায় বিশেষ প্রয়োজনবশতঃ একই ধ্বনিতার জন্য দু'টি করে বর্ণ শুধু এই দু'টি ক্ষেত্রেই রয়েছে। অন্যত্র, একই বর্ণদ্বারা একাধিক পূরকধ্বনি প্রকাশিত হয়। 'উল্‌টা' এবং 'আল্‌তা'—এ দুটি শব্দে 'ল'-এর উচ্চারণে পার্থক্য রয়েছে। প্রথম 'ল'-এর উচ্চারণে জিহ্বা মূর্ধার অনেকটা কাছাকাছি যায়, দ্বিতীয় 'ল'-এর ক্ষেত্রে জিহ্বা দাঁতে ঠেকে। প্রথম শব্দের শেষ বর্ণটি মূর্ধন্য বর্ণ ('ট') হওয়াতে পূর্ববর্তী 'ল'-এর মূর্ধন্য উচ্চারণ এবং দ্বিতীয় শব্দের শেষ বর্ণটি দন্ত্য বর্ণ ('ত') হওয়াতে তৎপূর্ববর্তী 'ল'-এর দন্ত্য উচ্চারণ হ'লো। বিশেষ পরিবেশেই ধ্বনির এরূপ রূপান্তর ঘটলো এবং অনুরূপ সর্বক্ষেত্রেই এরূপ ঘটে থাকে। অতএব প্রতিযোগী ব্যবহার হওয়াতে দুটো 'ল'-ই হ'লো পূরকধ্বনি। 'কণ্টক' এবং 'দন্ত' শব্দদ্বয়েও ঠিক একই অবস্থা ঘটেছে, অতএব এক্ষেত্রে 'ণ' এবং 'ন'-এর প্রতিযোগী ব্যবহার হওয়াতে এরাও পূরকধ্বনি।

পূরকধ্বনি বা উপধ্বনি দু'ধরনের হয়ে থাকে—একটি অপর বর্ণের সান্নিধ্যে, অপরটি অবস্থানগত কারণে। অপর কোন বর্ণের সান্নিধ্যে কিংবা পরিবেশগত কারণে যদি কোন ধ্বনি একাধিক উপধ্বনির সৃষ্টি ক'রে তবে তাদের বলা হয় **পারিবেশিক উপধ্বনি** (Allophones in different environments)। মূর্ধন্য বর্ণের সংযোগে অথবা প্রভাবে 'ল'-এর মূর্ধন্যরূপ এবং দন্ত্যবর্ণের সহযোগে বা প্রভাবে দন্ত্যরূপের যে দৃষ্টান্ত আগে উল্লেখ করা হয়েছে, তাকে পারিবেশিক উপধ্বনির দৃষ্টান্তরূপেও গ্রহণ করা হয়। আবার বাঙলা বর্ণমালায় তিনটি শিস্‌ধ্বনি (শ, ষ, স) থাকলেও অসংযুক্ত অবস্থায় এদের উচ্চারণ সর্বত্র (বিদেশি শব্দ বাদে) 'শ', কিন্তু দন্ত্যবর্ণ অথবা 'র', 'ল'-যোগে সংযুক্ত অবস্থায় এদের উচ্চারণ 'স', যথা—'সবিশেষ> শোবিশেশ', কিন্তু 'স্তবক, স্থির, স্নান, শ্রী' প্রভৃতি, সর্বত্র 'স'। অতএব 'শ, ষ ও স' —একই ধ্বনির তিনটি পারিবেশিক উপধ্বনি মাত্র।

অবস্থানগত কারণে যখন একই ধ্বনি একাধিক রূপ গ্রহণ করে তখন তাকে বলা চলে **আবস্থানিক পূরকধ্বনি** বা **অনুপূরক উপধ্বনি**। শব্দের আদিতে 'ড, ঢ,

য' এবং শব্দের মধ্যে বা শেষে যথাক্রমে 'ড়, ঢ়, য়'—একই ধ্বনির আবস্থানিক উপধ্বনি মাত্র। বিদেশি শব্দ, সমাসবদ্ধ শব্দ এবং অপর বিশেষ ক্ষেত্রে অবশ্য এর ব্যতিক্রম দেখা যায়, শব্দের মধ্যে বা শেষেও 'ড' বা 'য' থেকে যাচ্ছে, যথা—রড্, সোডা, উপঢৌকন, আড্ডা, অন্ড ; অযান্ত্রিক, নির্যাতিন প্রভৃতি।

(খ) বিভাজ্য/বিভাজিত ধ্বনিতা (Segmental Phonemes) ঃ

বর্ণনাত্মক ভাষাবিজ্ঞানে বাক্‌প্রবাহকে বিভাজন করে ধ্বনির বিশিষ্টতা নির্ণয় করা হয়। মুখপ্রযত্নে পরম্পরাক্রমে যে ধ্বনিগুলো উৎপন্ন হয়, তাদের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী ধ্বনির প্রভাবে মূলধ্বনির রূপান্তর ঘটে কিনা, ঘট্‌লে কীরকম ঘটে থাকে এবং ফলতঃ বিভিন্ন শ্রেণীর ধ্বনির যে ব্যবহার-বৈচিত্র্য দেখা যায়, তৎ-সম্বন্ধীয় আলোচ্য বিষয়কে বলা যায় **বিভাজ্য ধ্বনিতা** বা **বিভাজিত ধ্বনিতা** (Segmental phonemes)। একক ব্যঞ্জন, যুক্ত ব্যঞ্জন এবং স্বরধ্বনির যতরকম ব্যবহার হতে পারে, তার সবরকম দৃষ্টান্ত সঙ্কলন করে ঐরূপ বিভাজিত ধ্বনিতার স্বরূপ নির্ণয় করতে হয়। বাংলা ভাষায় শিষ্ট কথ্যরূপে নিম্নোক্ত ব্যঞ্জন ধ্বনিতা সম্ভবপর। ন্যূনতম শব্দযোটকের সাহায্যে তা' দৃষ্টান্তসহ উল্লেখ করা হচ্ছে ঃ—(১) ক্ (কোল্), (২) খ্ (খোল্), (৩) গ্ (গোল্), (৪) ঘ্ (ঘোল্), (৫) চ্ (চাল্), (৬) ছ্ (ছাল্), (৭) জ্ (জাল্), (৮) ঝ্ (ঝাল্), (৯) ট্ (টক্), (১০) ঠ্ (ঠক্), (১১) ড্ (ডক্), (১২) ঢ (ঢক্), (১৩) ত্ (তান্), (১৪) থ্ (থান্), (১৫) দ্ (দান্), (১৬) ধ্ (ধান্), (১৭) প্ (পট্), (১৮) ফ্ (ফট), (১৯) ব্ (বট্), (২০) ভ্ (ভট্), (২১) ঙ্, ং (রাঙ্, রাং), (২২) ন্ (রান্), (২৩) ম্ (রাম্)—অনুনাসিক, (২৪) শ্ (শুল্), (২৫) হ্ (হুল্)—উষ্মবর্ণ (২৬) য়্ (পায়া), (২৭) ব্ (পাবা=পাওআ)—অন্তঃস্থ (অর্ধস্বর) (২৯), র্ (রাগ্), (৩০) ল্ (লাগ্)—অন্তঃস্থ (অর্ধ ব্যঞ্জন)।

বাংলা লিপিমালার কতকগুলি বর্ণের কোন স্বতন্ত্র ধ্বনিতা-গৌরব নেই ঃ—ঞ (=ন্), ণ (=ন), ষ ও স্ (=শ)। এ ছাড়াও ড় (=ড্), ঢ় (=ঢ্) এবং য (=জ),—এগুলি শব্দের আদিতে বন্ধনীভুক্ত ধ্বনিতে অর্থাৎ মূল ধ্বনিতায়ই পরিণত হয়।

বাংলা স্বর স্বনিমগুলিকেও এইভাবে ন্যূনতম শব্দযোটকের সাহায্যে শনাক্ত করা চলে ঃ এদের সংখ্যা ৭টি। যথা—(১) অ (চর), (২) আ (চার), (৩) ই (চির), (৪) উ (চুর), (৫) এ (চের-আট=চরাট), (৬) অ্যা (চ্যার+চ্যারান), (৭) ও (চোর)। এ ছাড়া সানুনাসিক স্বরধ্বনি-যোগে শব্দার্থ পরিবর্তিত হ'য়ে যায় বলে সানুনাসিক

স্বরধ্বনিগুলিরও পৃথক্ ধ্বনিতামূল্য রয়েছে। অতএব পূর্বোক্ত ৭টি স্বরস্বনিমের সঙ্গে আরো ৭টি যোগ হয়ে মোট ১৪টি।—(৮) অঁ (কঁড়ে—আঙুল), (কড়ে= আঙুলের সন্ধিস্থলে), (৯) আঁ (ছাঁদ, ছাদ), (১০) ইঁ (বিধি, বিঁধি), (১১) উঁ (ধুঁয়া=ধূম, ধুয়া=ধ্রুবপদ, (১২) এঁ (কেঁচো, কেচো=কাচিও), (১৩) অ্যাঁ (ট্যাঁক, ট্যাক=টিকে থাক), (১৪) ওঁ (ধোঁয়া, ধোয়া)।

শুধু তাই নয়, পদের আদিতে, মধ্যে ও অন্তে অপর ধ্বনির সংস্পর্শে কোন ধ্বনির কিরূপ রূপান্তর ঘটতে পারে, তাও এই পদ্ধতিতে বিশ্লেষণ ক'রে দেখতে হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ আমরা 'প' ধ্বনিটি গ্রহণ করে ব্যবহার-বৈচিত্র্যের সাহায্যে তার বিভাজিত ধ্বনিতার স্বরূপটি বিশ্লেষণ ক'রে দেখতে পারি। যেমন—পদের 'প' ধ্বনিটির পর অনুনাসিক-বর্জিত ক-বর্গ, চ-বর্গ ও ট-বর্গের সব ধ্বনি, অনুনাসিকসহ ত-বর্গের ধ্বনি, প, ম, র, ল, শ যুক্ত হ'তে পারে।

টপকানো	সাপখোপ	গপ্‌গপ্	কোপঘর
লেপ্‌চা	ধূপছায়া	বাপজান	ঝোপঝাড়
ছিপ্‌টি	বাপঠেঙে	পিপড়ে	কোপতা
ছিপথেকে	ধূপদান	ধুপধাপ	আপনি
ধাপ্‌পা	শাপমন্যি	চাপরাশ	শাপ্‌লা
ধূপশলা।			

উপরের দৃষ্টান্তটিকে 'প'-এর বিভাজিত ধ্বনিতার পূর্ণ বিবরণ বলে গ্রহণ করা না গেলেও এ থেকে অনুমান করা যায় বিভাজিত ধ্বনিতার রূপ কত বিচিত্র হ'তে পারে। প্রতিটি ক্ষেত্রেই হয়তো উচ্চারণ-গত অতি সূক্ষ্ম পার্থক্য রয়েছে, কিন্তু তা' আমাদের কাছে ধরা পড়ে না, ক্বচিৎ কোনটি ধরা পড়েও বা (যেমন—'গপ্‌গপ্' —'গব্‌গপ্', 'আপনি'='আমনি')।—উপরের দৃষ্টান্তে শুধু পদমধ্যস্থ 'প'-এর ব্যবহার দেখানো হ'লো, পদের আদিতে ও অন্ত্যে বিভিন্ন স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণের সংযোগে এর যে বিভাজিত ধ্বনিতা প্রকাশিত হয় তাও ধ্বনি-বিচারের বিচার্য বিষয়।

(গ) অবিভাজ্য/বিভাজনাতিরিক্ত ধ্বনিতা (Supra-segmental phoneme)

পরম্পরাক্রমে বিশ্লেষণযোগ্য নয় অথচ ধ্বনির উচ্চারণে মুখপ্রযত্নের বহুতা রয়েছে, এমন ধ্বনিতাকে বলা হয় **বিভাজনাতিরিক্ত ধ্বনিতা** বা **অবিভাজ্য ধ্বনিতা** (supra-segmental phoneme)। বিভাজনাতিরিক্ত ধ্বনিতার কোন রূপ নেই, তার রঙ্ আছে—সম্ভবতঃ এইভাবে বললেই ব্যাপারটা বুঝানো যাবে। অর্থাৎ এ-ও একপ্রকার ধ্বনিতা, কিন্তু কোন রূপের মধ্যে ধরা পড়ে না, কিন্তু তার নিজস্ব চরিত্রের জন্য অবশ্যই অনুভবগম্য। যেমন সাধারণভাবে বলা একটা কথাকে

আমরা লিখে দেখাতে পারি—'হ্যাঁ, তুমি যাবে।' এই বাক্যে যে অর্থ প্রকাশ পায় তার সম্পূর্ণ বিপরীত অর্থও প্রকাশ পাবে এই বাক্যেই, যদি এতে একটা বিশেষ সুর আরোপ করা যায়। অতএব বিশেষ বিশেষ উচ্চারণ-বৈশিষ্ট্যও ধ্বনিতা-রূপে গৃহীত হ'তে পারে, তা' বোঝা যায়। বাংলার নিজস্ব উচ্চারণ-ভঙ্গির অনুসরণে আমরা নিম্নোক্ত পঞ্চবিধ অবিভাজ্য ধ্বনিতার স্বরূপ বিশ্লেষণ করতে পারি। বলা বাহুল্য, এই তালিকা দীর্ঘতরও হতে পারে। (i) মাত্রা বা স্বরের দীর্ঘত্ব (length) (ii) প্রস্বর, ঝোঁক বা শ্বাসাঘাত (Stress accent) (iii) স্বরাঘাত বা সুর-তরঙ্গ (Intonation), (iv) যতি বা অবকাশ (Juncture) এবং (v) অনুনাসিকতা (Nasalisation)—এগুলোকে অবিভাজ্য বা বিভাজনাতিরিক্ত ধ্বনিতার অন্তর্ভুক্ত করা চলে।

(i) **মাত্রা** (Mora)ঃ যে সকল ভাষার লিখিত রূপ আছে তাদের প্রায় প্রতিটি ধ্বনির জন্য এক একটি বর্ণ নির্দিষ্ট করা আছে। কিন্তু এমন অনেক বর্ণ আছে, যেগুলোকে এককভাবে অর্থাৎ অপর বর্ণের সহায়তা ছাড়া উচ্চারণ করা যায় না। কাজেই উচ্চারণের জন্য অনেক সময় একাধিক বর্ণের সংযোজন প্রয়োজন হয়। বাগ্‌যন্ত্রের স্বল্পতম প্রচেষ্টায় আমরা একবারে যতটুকু উচ্চারণ করতে পারি, তাকে বলা হয় '**দল**' বা '**অক্ষর**' (Syllable)। এইরূপ অক্ষরে একটি মাত্র বর্ণ (letter) থাকতে পারে ('অ, আ, ই, এ' প্রভৃতি স্বরবর্ণ), আবার অক্ষর একাধিক বর্ণময়ও হতে পারে (ক্+অ=ক, অ+ক্=অক্)। বাঙলায় যে অক্ষরের শেষে স্বরধ্বনি থাকে (ক্+অ=ক) তাকে বলা হয় **বিবৃত** বা **মুক্ত অক্ষর** (Open Syllable) আর শেষে ব্যঞ্জন থাকলে (অ+ক্=অক্) হয় **সংবৃত** বা **রুদ্ধ অক্ষর** (Closed Syllable)। এই মুক্ত অক্ষর এবং রুদ্ধ অক্ষরের মূল্যমান সমান নয়। ধ্বনির উচ্চারণ-কালের একককে বলা হয় **মাত্রা** (mora)। সাধারণতঃ মুক্ত অক্ষরে একমাত্রা এবং রুদ্ধ অক্ষরে দু' মাত্রা হয়। সংস্কৃত, হিন্দী প্রভৃতি বাংলার সম্পর্কিত ভাষাসমূহে সাধারণতঃ হ্রস্বস্বরে একমাত্রা এবং দীর্ঘস্বরে দুইমাত্রা হয়। সাধারণ নিয়মে বাংলায়ও তাই হওয়া সঙ্গত ছিল, কিন্তু বাস্তবে তা' হয় না। তবে কার্যতঃ দেখা যায় রুদ্ধদলে অর্থাৎ হ্রস্ব কিংবা দীর্ঘ, যে কোন স্বরধ্বনির অব্যবহিত পরবর্তী ধ্বনিটি যদি ব্যঞ্জন হয় (বিশেষতঃ শব্দের মধ্যে) তবে সেটি দীর্ঘ-রূপে উচ্চারিত হয়। যেমন—'জলা' শব্দে 'জ' কিংবা 'রামু' শব্দে 'রা' একমাত্রা হ'লেও 'জল্'-উচ্চারণে 'জ' 'রাম্'-উচ্চারণে 'রা' দুই মাত্রা হ'চ্ছে। কখন কখন মুক্ত অক্ষর দীর্ঘস্বরযুক্ত হ'লেও দু' মাত্রা হয়। মাত্রাভেদে শব্দের ও বাক্যের অর্থ পরিবর্তিত হ'তে পারে। যথা—'তুমি কি খেয়েছো?' এবং 'তুমি কী খেয়েছো'—এ দু'টি বাক্যের প্রথমটিতে 'কি'

শব্দে একমাত্রা এবং প্রশ্ন করা হ'য়েছে, সে খেয়েছে কি না। দ্বিতীয় বাক্যে 'কী' শব্দে দুইমাত্রা এবং সে কোন্ বস্তু খেয়েছে, তাই জানতে চাওয়া হয়েছে। বাঙলা শব্দে মাত্রা-ব্যবহারের ক্ষেত্রে একটা প্রবণতা দেখা যায় যে অধিকাংশ শব্দকেই দুই মাত্রা অথবা দুই-এর গুণিতক কোন সংখ্যায় নিয়ে আসা হয়। যেমন—গামোছা>গাম্‌ছা; করিতেছি>কর্‌ছি। ধ্বনি সংক্ষেপের এই প্রবণতাকে 'দ্বিমাত্রিকতা' (bimorism/dimetrism) বলা হয়।

পূরক দীর্ঘতা / মাত্রাপূরক দীর্ঘতা (Compensatory Lengthening): যে কোন ভাষায়ই স্বাভাবিক ধ্বনি-পরিবর্তনের ফলে শব্দ দেহে অনেক পরিবর্তন সাধিত হয়, তার ফলে মূলশব্দের মাত্রাসংখ্যারও পরিবর্তন ঘটা সম্ভব। কিন্তু সাধারণতঃ দেখা যায় শব্দের কোন অংশে মাত্রার ন্যূনতা ঘটলে অপর অংশে তার আধিক্য ঘটিয়ে মূল মাত্রাসংখ্যার সমতা আনবার একটা প্রবণতা থাকে। এই প্রবণতা **পূরক দীর্ঘতা / মাত্রাপূরক দীর্ঘতা** (Compensatory Lengthening) নামে অভিহিত হয়। ধ্বনি-হানি-জনিত ক্ষতি পূরণ করবার জন্য হ্রস্বস্বরকে দীর্ঘ ক'রে মাত্রাবৃদ্ধি ঘটানো হয় বলেই একে **ক্ষতিপূরক দীর্ঘতা** ও বলা হয়। যেমন—'হস্ত' শব্দে ছিল ৩ মাত্রা, 'কিন্তু এটি 'হত্থ' হ'য়ে পরবর্তী স্তরে 'হত্থ' না হ'য়ে হ'লো 'হাথ'—আদি অক্ষরে এই আকারটা এলো যুগ্ম বর্ণ সরল হবার ফলে যে একটি ধ্বনি লোপ পেলো, সেই ক্ষতি পূরণ করতে, তার সমান ১ মাত্রা মূল্য নিয়ে। কাজেই 'হাথ'-এর মাত্রাও হলো ৩। এইরূপ 'অদ্য>অজ্জ>আজ', 'কল্য>কল্ল>কাল' প্রভৃতি। মাত্রাপূরণের নিয়মটি দাঁড়ালো এই—যুগ্ম ব্যঞ্জন যখন সরল হ'বে, তখন তার পূর্ববর্তী হ্রস্বস্বর দীর্ঘ হ'বে।

(ii) **প্রস্বর শ্বাসাঘাত/ঝোঁক/বল** (Stress accent): কোন কোন ভাষায় শব্দের মধ্যে কোন কোন নির্দিষ্ট স্থানে উচ্চারণ কালে বিশেষ জোর দেওয়া হয়, ফলতঃ ঐ স্থানের অক্ষরটির উচ্চারণ তুলনামূলকভাবে তীব্রতর হয়। এই উচ্চারণগত বল প্রয়োগকে বলা হয় **প্রস্বর, শ্বাসাঘাত, ঝোঁক** বা **বল**। অবশ্য অনেকে একে 'স্বরাঘাত' বলে অভিহিত করেন, কিন্তু আলোচ্য গ্রন্থে 'স্বরাঘাত' বলতে 'সুর' (pitch accent/musical accent)-কেই বোঝানো হয়েছে। আধুনিক বাংলা ভাষায় সাধারণতঃ বিচ্ছিন্নভাবে প্রতি শব্দের আদি স্বরটি শ্বাসাহত হয়, এরূপ মন্তব্য আচার্য সুনীতিকুমার ক'রে গেলেও বাস্তবে অন্যরকমও দেখা যায়। সাধারণতঃ বাঙালী অভ্যাসানুসারেই শব্দের বিশেষ বিশেষ স্থানে শ্বাসাঘাত ব্যবহার করে। সাধারণ পর্যবেক্ষণে দেখা যায়, কোন শব্দের আদিতে যদি স্বরান্ত দল অর্থাৎ মুক্তদল থাকে, তবে সাধারণতঃ আদি স্বরটি শ্বাসাহত না হয়ে দ্বিতীয় স্বরটি শ্বাসাহত হয়।

যেমন—বা`তাস, রা`জা, ত`বে, অ`সাধারণ, র`বীন্দ্রনাথ, য`থার্থ প্রভৃতি। তবে যদি শব্দের আদিতে হসন্ত তথা রুদ্ধদল থাকে, তবে ঐটিই শ্বাসাহত হয়। যেমন—`তৎপর, `কিঞ্চিৎ `যন্ত্র, `বাগ্‌যন্ত্র, `উচ্চারণ প্রভৃতি। কিন্তু শব্দগুলি যখন বাক্যে ব্যবহৃত হয়, তখন প্রতি শব্দে শ্বাসাঘাত পড়ে না। একটি বাক্য সাধারণতঃ কয়েকটি 'শ্বাসগুচ্ছে' বা 'অর্থগুচ্ছে' বিভক্ত থাকে—এই অবস্থায় প্রতি গুচ্ছের আদিস্বরে শ্বাসাঘাত প'ড়ে থাকে যেমন—`প্রজ্ঞারূপ/`সূর্যের উদয়ে/`চিত্তরূপ কমল/`বিকশিত হয়।—এখানে বাক্যটি চারটি গুচ্ছে বিভক্ত এবং প্রতি গুচ্ছের আদিস্বর শ্বাসাহত হয়েছে; অথচ বিচ্ছিন্নভাবে উচ্চারণ করলে বাক্যের প্রতিটি শব্দের আদিস্বরেই শ্বাসাঘাত পড়ে। পৃথিবীর বহু ভাষাতেই এই শ্বাসাঘাত-প্রক্রিয়া বর্তমান এবং কোন কোন ভাষায় শ্বাসাঘাতের স্থান পরিবর্তনে শব্দের অর্থেরও পরিবর্তন ঘটে। যেমন, ইংরেজি `pre-sent-শব্দের আদিস্বরে শ্বাসাঘাত, অর্থ—উপহার; pre`sent—এখানে অন্ত্যস্বরে শ্বাসাঘাত, অর্থ—উপস্থিত। প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার বৈদিক যুগে শ্বাসাঘাত ছিল না, ছিল স্বরাঘাত—এই স্বরাঘাতের স্থান-পরিবর্তনে শব্দার্থেরও পরিবর্তন ঘটতো। পরবর্তী সংস্কৃতে এবং প্রাকৃতে যে শ্বাসাঘাত প্রচলিত ছিল, তার প্রমাণ পাওয়া যায় বিভিন্ন শব্দে ধ্বনি-লোপ থেকে। বৈদিক 'অলাবু' শব্দে পরবর্তীকালে অনাদ্যস্বর শ্বাসাহত হওয়াতে আদিস্বর দুর্বল হ'য়ে প্রাকৃত স্তরেই তা লোপ পেয়ে 'লাবু'-তে পরিণত হয়েছিল। সংস্কৃত ও প্রাকৃতে শ্বাসাঘাত প্রচলিত হ'লেও তা কোথায় কীভাবে ব্যবহৃত হ'তো তা' নিশ্চিতভাবে জানা যায় না। বাঙলা ভাষার আদিযুগে 'চর্যাপদে'ও শ্বাসাঘাতের ব্যবহার পাওয়া যায়। আদিস্বরে শ্বাসাঘাতের ফলে অনেক 'অ' ধ্বনি 'আ' হয়েছে (অইস / আইস, আণুতু), কিন্তু সাধারণ শ্বাসাঘাতের স্থান ছিল ভারতীয় আর্য ভাষার অন্যান্য শাখার মতোই শব্দের উপান্ত স্বরে অর্থাৎ শেষ স্বরের পূর্ববর্তী স্বরে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের যুগেই আদি স্বরে শ্বাসাঘাতের প্রবণতা দেখা দেয় এবং ক্রমে তা স্থায়ী ও স্বাভাবিক হ'য়ে ওঠে।

বাঙলা আদিস্বরে শ্বাসাঘাতের ফলে অনেক সময় আদি স্বর অকারণ দীর্ঘতা লাভ করে, যেমন—অকাল>আকাল, অলুনি>আলুনি।

আদিস্বর শ্বাসাহত হওয়াতে মধ্যস্বর ও অন্ত্যস্বর দুর্বল হ'য়ে পড়ে এবং স্বরধ্বনি লোপ পায়। যথা—গামোছা>গামছা পাগল+আ>পাগলা, জল>জল্, আগি>আগ।

শ্বাসাঘাত ও উচ্চারণ-দ্রুতির ফলে শব্দসঙ্কোচ বা বাক্য সঙ্কোচ ঘটে। যথা—কোথায় যাবে>কোজ্জাবে, কতদূর>কদ্দূর, যা-ইচ্ছে-তাই>যাচ্ছেতাই, নিয়া আসিস গিয়ে যা>নেসগেযা।

শ্বাসাঘাতের ফলে কখন কখন ব্যঞ্জনধ্বনি দ্বিত্ব লাভ করে। যথা—সকলে>সক্ক:লে, ছোট>ছোট্ট।

শ্বাসাঘাতের স্থান পরিবর্তনের ফলে বাঙলায় শব্দার্থ পরিবর্তনেরও যথেষ্ট দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। যেমন—'কড়া—আদিস্বরে শ্বাসাঘাত, অর্থ 'কঠিন', ক'ড়া, অন্ত্যস্বরে শ্বাসাঘাত, অর্থ—'কড়াই', 'ডাল=শাখা, ডা'ল=দ্বিদল ; 'পড়া=পাঠ করা, প'ড়া=পতিত হওয়া।

অনাদ্যস্বরে শ্বাসাঘাত-হেতু শব্দের আদিস্বর বহু স্থলেই লোপ পেয়েছে। যথা—উরুমাল>রুমাল, উধার>ধার, উপানৎ>পানাই, অতসী>তিসি, আছিল>ছিল, এরণ্ড>রেড়ি, এহেন>হেন।

পূর্বোক্ত দু'টি সূত্র থেকে দেখা যায় যে বাঙলায় আদিস্বরে শ্বাসাঘাত আবশ্যিক নয়, কখন কখন অনাদ্যস্বরও শ্বাসাহত হয়।

বৈদিকোত্তর যুগে শ্বাসাঘাত-প্রবর্তনের পশ্চাতে বিভিন্ন অনার্য ভাষার প্রভাব বর্তমান ছিল বলে মনে করা হয়।

সাধু বাঙলা এবং পশ্চিমবঙ্গের রাঢ়ী উপভাষা তথা শিষ্ট বাঙলা ছাড়া অন্যত্র অর্থাৎ বিভিন্ন আঞ্চলিক উপভাষায় শ্বাসাঘাতের যেমন কোন নির্দিষ্ট স্থান নেই, তেমনি অনেক স্থানে এর প্রবলতাও তেমন নেই।

(iii) **সুরতরঙ্গ** (Intonation) **বা স্বর** (Pitch Accent) ঃ পদের কোন অক্ষর যখন উচ্চ বা নিম্ন গ্রামে ধ্বনিত হয়, তখন তার স্বরতন্ত্রী দ্রুত বা ধীর বেগে কম্পিত হয় এবং তার ফলে একটা সুরের সৃষ্টি হয়। এরূপ সুরকে বলা হয় **স্বর** বা **স্বরাঘাত** (Pitch Accent) বা **সুরতরঙ্গ** (Intonation)। বৈদিক ভাষায় এরূপ সুরতরঙ্গের ব্যবহার ছিল আবশ্যিক। সুর যখন উঁচুতে ওঠে তখন 'উদাত্ত', নিচে নামলে 'স্বরিত' এবং একটানা থাকলে 'অনুদাত্ত' নামে অভিহিত হ'তো। স্বরের স্থান পরিবর্তনে ব্যাকরণগত আচরণের এবং শব্দার্থেরও পরিবর্তন হ'তো। যেমন, 'রক্ষস্=রাক্ষস (ক্লীবলিঙ্গ), কিন্তু রক্ষ'স্=পরিত্রাতা (পুং)। লিঙ্গ নির্ণয়েও স্বরের উপযোগিতা ছিল,—'ব্রহ্মণ=প্রার্থনা, স্তব (ক্লী), ব্র'হ্মণ'= প্রার্থনাকারী, স্তোতা (পুং)। স্বরাঘাত দ্বারা সমাসও নির্ণীত হতো—রাজপুত্র =যার পুত্র রাজা (বহুব্রী), 'রাজ'পুত্র'=রাজার পুত্র (ষষ্ঠীতৎ)। বৈদিক যুগের পর কখন কীভাবে যে এই স্বরাঘাত প্রক্রিয়া লোপ পায় এবং সম্ভবতঃ তৎ-স্থলে অতি-ধীরে শ্বাসাঘাতের সূত্রপাত হয়, তা জানবার কোন উপায় নেই। কারণ সংস্কৃত এবং প্রাকৃত ভাষার বৈয়াকরণগণ এ বিষয়ে সম্পূর্ণ নীরব। বৈদিকের মতোই প্রাচীন

গ্রীক এবং বালতো-স্লাবিক ভাষাগোষ্ঠীতেও এই স্বর প্রক্রিয়া বর্তমান ছিল। পৃথিবীর আরো অনেক ভাষাতেই এরূপ স্বর প্রয়োগ করা হয়। ভারতীয় ভাষাগুলোর মধ্যে এ বিষয়ে পাঞ্জাবী ভাষার নাম উল্লেখযোগ্য।

বাঙলা ভাষায় সুরের আরোপ যে একেবারে নেই, এমন কথা বলা চলে না। বক্তার ইচ্ছা অথবা বক্তব্যের গুরুত্ব অনুযায়ী বাক্যে সুরতরঙ্গ প্রবাহিত হ'য়ে থাকে, বিশেষতঃ যে সমস্ত বাক্যে কোনপ্রকার ভাব-প্রবণতা প্রকাশ পায় তার সুরতরঙ্গ সহজেই কানে ধরা পড়ে। সুরতরঙ্গের বৈষম্যে অর্থভেদ হ'তে পারে, কারণ সুর যেখানে উঁচুতে ওঠে, সেখানে ওই শব্দে গুরুত্ব আরোপ করা হয়, কিন্তু সেই সুরকে যদি খাদে নামিয়ে আনা যায়, তাহ'লে তার গুরুত্ব কমে গিয়ে অর্থ-বিভ্রাটের সৃষ্টি করতে পারে। দৃষ্টান্তস্বরূপ নিম্নোক্ত বাক্যটি ধরা যাক্—'**তুমি** আজ এখানে কি বই পড়ছো'—বাক্যে 'তুমি' শব্দটি যদি উদাত্ত সুরে উচ্চারণ করা যায়, তবে বোঝা যায়, বক্তা অপর কারো কথা বলছেন না, 'তুমি' নামক ব্যক্তিটির সম্বন্ধেই তার আগ্রহ। আবার যদি 'তুমি **আজ** এখানে কি বই পড়ছো'—বলেন, তবে বোঝা যাবে, তিনি এই বিশেষ দিনটিকেই নির্দেশ ক'রছেন। যদি বলেন 'তুমি আজ **এখানে** কি বই পড়্ছো'—'এখানে' শব্দটি উদাত্ত স্বরে উচ্চারণ করাতে বক্তার উদ্দিষ্ট হ'লো একটা বিশেষ স্থান। কিন্তু যদি বলা হয়—'তুমি আজ এখানে **কী** বই পড়ছো'—তবে শুধু বইটির পরিচয়ই জানতে চাওয়া হ'য়েছে। আর—'তুমি আজ এখানে কি **বই** পড়ছো' —এই প্রশ্নে বক্তার উদ্দিষ্ট পড়ার বস্তুটি, সেটি বই অথবা অন্য কিছু। সর্বশেষ—'তুমি আজ এখানে কি বই **পড়ছো**'—এই বক্তব্যে বক্তার জ্ঞাতব্য, ব্যক্তিটি বই পড়ছে অথবা দেখ্ছে অথবা অপর কিছু করছে। বস্তুতঃ এই বাক্যটির উচ্চারণে সুরতরঙ্গ নানাবিধ অর্থই সৃষ্টি করতে পারে। তা' ছাড়া বিশেষ সুরের টানের বৈশিষ্ট্যে একটি মাত্র শব্দ (একাক্ষরও) বিশেষ বিশেষ ভাবের বাহক্ হ'তে পারে। যেমন—আচার্য সুনীতিকুমার দেখিয়েছেন—"<'উঁ'>—উচ্চ হইতে উন্নীয়মান সুর=প্রশ্নে ; <<'উঁ'>>—উচ্চ হইতে অবনীয়মান সুর—'তা বটে' এই অর্থে। <উঁ->—নিম্ন হইতে অবনীয়মান ও প্রলম্বিত সুর—'বেশ দেখা যাবে' বা 'বটে, দেখে নেবো' এই অর্থে ; <<~উঁ>>—উচ্চ হইতে ঈষৎ অবনয়ন ও পুনরায় উন্নয়ন—'বটে, কিন্তু—' এই অর্থে ; <<উঁ (বা উঁ—ঃ)—আকস্মিক দ্রুত উচ্চারণ—আপত্তি বা বিরক্তি ব্যঞ্জক।" চীনা-ভাষায় একটি শব্দেরই চার রকম অর্থ হ'তে পারে শুধু তার সুরের আরোহণ-অবরোহণকে অবলম্বন ক'রে। (দ্রঃ 'লিপি' অধ্যায়)

(iv) **যতি/অবকাশ/সন্ধান** (Juncture) ঃ কোন সমাসবদ্ধ পদ অথবা সন্নিহিত দুটি শব্দের উচ্চারণকালে প্রথম শব্দের শেষ ধ্বনি এবং দ্বিতীয় শব্দের প্রথম ধ্বনির

মধ্যে যে একটা শ্বাস-বিরতি থাকা দরকার, তা' অনেক সময় এত ক্ষীণ হয়ে যায়, যাকে প্রায় অশ্রুত বলা চলে। অশ্রুতপ্রায় এই বিরতিকে বলা হয় যতি। ভাষাবিজ্ঞানী বলেন ঃ 'The way in which phonemes follow each other or are joined in the stream of speech'. অর্থাৎ বাক্-প্রবাহে যে উপায়ে স্বনিমগুলি একে অপরকে অনুসরণ করে অথবা পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হয়, তাকেই বলা হয় 'যতি' বা 'সন্ধান'। এ না হলে বাক্যে অর্থবিভ্রাট ঘটা খুব স্বাভাবিক। 'মনোর মাকে ডেকে দাও' বাক্যে 'মনোর' এবং 'মাকে' যদি বিরতি ব্যতীত উচ্চারণ করা যায়, তবে হ'বে—'মনোরমাকে ডেকে দাও'। আবার যতিস্থাপনের সামান্যতম ব্যতিক্রমে বাক্যটি হ'তে পারে—'মনো রমাকে ডেকে দাও'। এরূপে 'পা-টা একটু সরিয়ে নিন্' এবং 'পাটা একটু সরিয়ে নিন্'-এর মধ্যে বিস্তর প্রভেদ। ডাল-না দিয়ে ভাত দাও এবং 'ডালনা দিয়ে ভাত দাও', 'আয়-না, আয়না', 'আম-আর জাম', 'আমার জাম', 'জল পাই কোথা', 'জলপাই কোথায়', ইত্যাদি। 'পত্র-পাঠ চলে আসবে, না এলে বিপদ হ'বে'—এই বাক্যে 'আসবে'-র পর যতি-স্থাপনে যে-অর্থ, 'না'-র পর যতি-স্থাপনে এর সম্পূর্ণ ভিন্ন অর্থ প্রকাশ পায়। এ-জাতীয় ক্ষেত্রে যথাস্থানে যতিচিহ্ন না দিলে বিপৎপাতের আশঙ্কা আছে।

(v) **অনুনাসিক ধ্বনি (Nasals)**—নাসাবিবরের সাহায্যে উচ্চারিত ধ্বনি **অনুনাসিক ধ্বনি**। যে কোন স্বরধ্বনিকে সানুনাসিক উচ্চারণ করা চলে এবং তার ফলেও অর্থবিভ্রাট ঘটতে পারে।—'কাটা, কাঁটা ; হাসি, হাঁসি' প্রভৃতির অর্থপার্থক্য তো সুস্পষ্ট। শিশুদের নাকি সুরে কথা বলার অর্থ যে 'আবদার, বায়না', সাধারণ-ভাবে বলা কথার চেয়ে এর অর্থ পৃথক্—এও অনুনাসিকতার বিশেষ ধ্বনিতাগুণই প্রকাশ করে।

(নব্যভারতীয় আর্যভাষা যথা বাংলা-আদির ক্ষেত্রে এই অনুনাসিক ধ্বনি-সম্বন্ধে একটু বিচার প্রয়োজন। তৎসম সানুনাসিক যুক্ত ব্যঞ্জন কালগত ধ্বনি-পরিবর্তনের ফলে ক্রমে সরল বর্ণে বিবর্তিত হ'লে তার পূর্বস্বরকে সাধারণভাবে অনুনাসিক ক'রে দেয়। আমাদের ব্যাকরণের লিপিমালায় এই 'চন্দ্রবিন্দু' অক্ষরটি তাই তার নিজস্ব স্থান ক'রে নিতে পেরেছে। কাজেই এটিকে 'অবিভাজ্য ধ্বনিতা' বলে গ্রহণ করা সঙ্গত কিনা, এটি অবশ্যই বিচার্য।—ধ্বনিতাত্ত্বিক নিয়মে যে নাসিক্যীভবন হয়, তার সম্বন্ধেই প্রশ্নটি উত্থাপিত হ'লো, শিশুদের নাকি সুরে কথা বলার সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই।)

[দুই] ধ্বনি পরিবর্তনের কারণ

ভাষার পরিবর্তন প্রধানত ধ্বনির পরিবর্তন—নদীপ্রবাহের মতো অখণ্ড গতিতে এই পরিবর্তন চল্‌তে থাকে। প্রতি মুহূর্তের এই পরিবর্তন (উভয় ক্ষেত্রে) এত সূক্ষ্ম যে বুদ্ধিমান্ জীব মানুষের অতিশয় সচেতন ইন্দ্রিয়ও তা' গ্রহণে অক্ষম। দীর্ঘকাল বা সুদূর স্থানের ব্যবধানেই এই পরিবর্তন গোচরীভূত হ'তে পারে। বক্তার মুখ থেকে নিঃসৃত বাক্য বা ধ্বনিসমষ্টি শ্রোতার কর্ণকুহরে প্রবেশ ক'রে স্নায়ুতন্ত্রীর সাহায্যে মস্তিষ্কে যে উত্তেজনার সৃষ্টি করে, তারই ফলে শ্রোতা বক্তার বক্তব্য উপলব্ধি করতে পারে। এই জটিল প্রক্রিয়ার মধ্যে কতরকম স্খলন-পতন ত্রুটি ঘট্‌তে পারে। কিন্তু সেগুলো এত সূক্ষ্ম যে তা' অনুভবে আসে না। এইভাবে পরম্পরাক্রমে চল্‌তে চল্‌তে এক সময় মূলের সঙ্গে পরিবর্তিত ধ্বনির পার্থক্য সুস্পষ্ট হ'য়ে ওঠে। এই কারণেই কোন শব্দের ধ্বনি-পরিবর্তনের স্বরূপটি বুঝতে হ'লে শব্দটির মূলরূপ সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা দরকার। যথা—'সন্ধ্যা—সম্‌ঝা>সাঁঝ; উপকারিকা>উঅআরিআ>উয়াড়ি' প্রভৃতি শব্দে আমরা ধ্বনিপরিবর্তনের ধারাটা অনুধাবন ক'রে পরিবর্তনের কারণ নির্ণয়ে সচেষ্ট হ'তে পারি। বিশেষভাবে লক্ষ্য করলে ধ্বনি-পরিবর্তনের কতকগুলো নিয়ম বা সূত্র আবিষ্কার করা যায়, যদিচ এই নিয়ম প্রাকৃতিক নিয়মের মতো অলঙ্ঘনীয় নয়। এরূপ দুটি প্রধান সূত্রকে এভাবে বলা চলে—(১) কোন ধ্বনিপরিবর্তন-সূত্র কোন বিশেষ ভাষার বিশেষ অবস্থাতেই প্রযোজ্য, এ সূত্র নির্বিশেষে প্রযোজ্য হ'তে পারে না। অর্থাৎ বাঙলা ভাষার ক্ষেত্রে যে নিয়ম প্রযোজ্য, ইংরেজীর ক্ষেত্রে তা' প্রযোজ্য নয় কিংবা প্রাচীন বা মধ্য ভারতীয় আর্য ভাষায় ধ্বনি-পরিবর্তনে যে নিয়ম ছিল, একালের বাঙলায় সে নিয়ম খাটে না। (২) শব্দ মধ্যে ধ্বনিগুলোর সুনির্দিষ্ট সংস্থানেই সূত্রের অনুসারী পবিবর্তন ঘটতে পারে, অন্যথা নয়। যেমন—পদমধ্যস্থ 'ড', য', বাঙলায় যথাক্রমে 'ড়', য়', কিন্তু আদিতে কখনও পরিবর্তন হয় না, যথা—'ডম্বরু' 'আড়ম্বর', 'যোগ' কিন্তু 'বিয়োগ'।

ধ্বনিপরিবর্তনের কারণসমূহকে নানা জনে নানা দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিশ্লেষণ করে থাকেন, ফলে এ বিষয়ে ঐকমত্য আশা করা যায় না। তবে প্রায় সর্বজনমান্য একটা সিদ্ধান্ত এরূপ ঃ প্রধানতঃ দু'টি কারণে ধ্বনির পরিবর্তন সাধিত হয়—একটা কারণ **বাহ্য** অপরটি আভ্যন্তর। অনেক সময় এ দু'টি কারণই যুগপৎ বর্তমান থাকতে পারে। বাহ্য পরিবর্তনগুলোর মধ্যে রয়েছে রাজনৈতিক, ধর্মীয় বা সাংস্কৃতিক অবস্থা বিশেষতঃ ভৌগোলিক পরিবেশ এবং ভিন্ন ভাষা সম্প্রদায়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংস্রব; কোন পরিবার বা ব্যক্তিবিশেষের প্রভাবও ভাষার ধ্বনিপরিবর্তন ঘটাতে পারে। আভ্যন্তর কারণগুলোর দু'টো স্থূল বিভাগ এরূপ ঃ **বহিরঙ্গ বা শারীরিক কারণ** (Physiological)

এবং মানসিক (Mental/Psychological) **কারণ**। বক্তার জিহ্বার জড়তা, শ্রোতার শ্রবণ-শক্তির অপ্রখরতা, পরিচিত অপর কোন ভাষার ধ্বনির প্রভাব, ব্যক্তিবিশেষের উচ্চারণের অনুকরণ প্রভৃতিকে বহিরঙ্গ বা শারীরিক কারণ বলে ব্যাখ্যা করা চলে। অল্পায়াসপ্রবণতা, উচ্চারণ-সৌকর্য, সুস্বনতা ইত্যাদি মানসিক কারণের অন্তর্ভুক্ত। ধ্বনি পরিবর্তনে অপর একটি প্রধান কারণ **সাদৃশ্য** বা Analogy। এই সাদৃশ্য এবং বিভ্রান্তিকে মনস্তাত্ত্বিক কারণের অন্তর্ভুক্ত করা চলে। অনবধানতা, বিশুদ্ধিপ্রবণতা প্রভৃতিও এই বিভাগের অন্তর্ভুক্ত। পূর্বোক্ত স্থূল কারণগুলোর বিশ্লেষণে বহুবিধ সূক্ষ্ম কারণ অনুভূত হয়। এদের মধ্যে আছে—

(ক) বহিঃপ্রভাব-জাত

১. **ভৌগোলিক প্রভাব ঃ** ভৌগোলিক অবস্থান বা পরিবেশগত অবস্থা কোন দেশ বা জাতির ভাষার উপর সামগ্রিক প্রভাব বিস্তার করতে পারে। বহির্জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন কোন ভাষাভাষী সম্প্রদায় যদি দীর্ঘকাল ও একই স্থানে বর্তমান থাকে, তবে অপর ভাষা-সম্প্রদায়ের সংস্পর্শে না আসায় তাদের ভাষায় ধ্বনি-পরিবর্তন অতিশয় ধীরে সংঘটিত হয়। অনেকে মনে করেন যে শীত-প্রধান দেশের অধিবাসীদের উচ্চারণে বিবৃত ধ্বনি কম থাকে ; এমন কি যাদের উচ্চারণে বিবৃত ধ্বনি বর্তমান, তারাও যদি দীর্ঘকাল শীতপ্রধান দেশে বাস করে, তবে তাদের ধ্বনি ক্রমশঃ সংবৃত হয়ে আসে। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে এর বিপরীত ব্যাপার ঘটে। অবশ্য এই মতবাদে অনেকে বিশ্বাসী নন। তবে আরবী ভাষায় কণ্ঠ্য ধ্বনির প্রাধান্য এবং বাঙলা ভাষায় তরল ধ্বনির প্রাধান্যের পশ্চাতে যথাক্রমে মরুভূমি ও নদ-নদীর বাহুল্য অকারণ নাও হ'তে পারে।

২. **সামাজিক প্রভাব ঃ** দেশের সামাজিক অবস্থা ভাষা তথা ধ্বনির গতি-প্রকৃতি-নির্ণয়ে অনেকখানি প্রভাব বিস্তার করে। যে দেশে সাধারণতঃ শান্তি বিরাজ করে, সেখানে উচ্চারণে বিকৃতি খুবই কম ; পক্ষান্তরে যে সমস্ত দেশকে যুদ্ধবিগ্রহেই অধিক সময় লিপ্ত থাকতে হয়, তাদের শব্দোচ্চারণের প্রতি এবং বিশেষ বিশেষ অংশে গুরুত্ব আরোপ-হেতু ধ্বনি পরিবর্তনের পরিমাণ অনেক বেড়ে যায়।

৩. **ঐতিহাসিক কারণ বা স্বাভাবিক বিকাশ ঃ** নদীর মতোই ভাষাও জীবন্ত বলেই তার মধ্যে কালের গতির সঙ্গে সঙ্গে কিছু পরিবর্তন দেখা দেবেই। ইতিহাসের ধারায় এই পরিবর্তন ঘটে বলে একে ধ্বনির বিকৃতি না বলে ধ্বনির বিকাশ বলাই সঙ্গত। সিন্ধু > হিন্দু, ঘোটক > ঘোড়অ > ঘোড়া।

৪. **ভিন্ন ভাষার প্রভাব ঃ** অপর কোন ভাষার ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এলে উক্ত ভাষার কিছু ধ্বনি উদ্দিষ্ট ভাষায়ও সংক্রামিত হ'তে পারে। দ্রাবিড় ভাষার সংস্পর্শে ভারতীয়

আর্য ভাষায় মূর্ধন্য ধ্বনির (ট-বর্গ) আবির্ভাব এর একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ; আরবী ও ইংরেজির প্রভাবে বাংলা ভাষায় এসেছে—জ. (z), খ., ফ. (fool) প্রভৃতি।

৫ **ব্যক্তিগত প্রভাব :** কোন পরিবার অথবা ব্যক্তিবিশেষের উচ্চারণরীতি অপর কোন ব্যক্তির অথবা সামগ্রিকভাবেই ভাষার ধ্বনিতে পরিবর্তন আনতে পারে। রবীন্দ্রনাথের অনুকরণে অনেকেই 'ম্লান' শব্দটিকে 'ম্লানো' উচ্চারণ করেন; শান্তিনিকেতনের প্রথম যুগের আবাসিকদের মুখে 'ল' এবং 'শ'-এর বিশিষ্ট উচ্চারণ লক্ষ্য করা যায়।

৬. **লিপিবিভ্রাট :** কোন এক ভাষার শব্দ অপর কোন ভাষায় লিখতে গেলে সমবর্ণের অভাবে কাছাকাছি উচ্চারণে নিয়ে আসা হয়, তার ফলে ধ্বনিতে বিরাট পরিবর্তন সাধিত হতে পারে। চীনের রাজধানী পিকিং/পেইচিং/বেইজিং—তিন রকম বানানে লেখা হয়, অথচ কোনটিই যথার্থ নয়। ইংরেজির কল্যাণে বাঙালী 'বসু' হ'য়েছেন 'বোস'/'বাসু', 'কলকাতা' হয়েছে 'ক্যালকাটা' (Calcutta)। আরবী ভাষায় 'প' অক্ষর না থাকায় তাদের লেখায় 'পারশি' হ'য়েছে 'ফারশি' এবং এখন 'ফারসি'ই প্রচলিত।

(খ) শারীরিক কারণগুলোর মধ্যে আছে—

৭. **বাগ্‌যন্ত্রের ত্রুটি :** বাগ্‌যন্ত্রে কোন ত্রুটি থাক্‌লে অনেক ধ্বনিই যথার্থভাবে উচ্চারণ করা যায় না বলে ধ্বনি পরিবর্তন ঘটতে পারে। 'স্বর্ণলতা' উপন্যাসের 'গডাচর চন্‌দ্রে'র উক্তি—'ডুডুও খাবো, টামাকও খাবো'—উৎকৃষ্ট উদাহরণ। সম্ভবতঃ বাগ্‌যন্ত্রের ত্রুটির জন্যই আমাদের উচ্চারণে 'ষ' হয়ে যায় 'শ'।

৮. **শ্রবণযন্ত্রের ত্রুটি :** শ্রবণযন্ত্রেব ত্রুটির জন্য বক্তার কথা যথাযথভাবে গ্রহণ করা সম্ভব না হ'তে পারে। সেক্ষেত্রে উক্ত কথার পুনরাবৃত্তি করতে গেলেই ত্রুটি ধরা পড়বে। ইংরেজিতে অজ্ঞ জনৈক ব্যক্তি কোন সাহেবকে সম্বর্ধনা করবার জন্যে অপর এক ব্যক্তির নিকট তালিম নিতে গিয়েছিল। ঐ ব্যক্তি কানে খাটো ছিল। তাকে জিজ্ঞেস করা হ'লো—'বসুন মহাশয়' ইংরেজিতে কী হ'বে? উনি শুনলেন 'রসুন মহাশয়', অতএব বলে দিলেন 'Garlic Sir'।—শেষ পর্যন্ত ঘটনা কী হ'য়েছিল সহজেই অনুমান করা চলে।

৯. **অনুকরণে অক্ষমতা :** সাধারণতঃ অশিক্ষিত ব্যক্তির পক্ষে দুরুচ্চার্য শব্দ বা বিদেশি শব্দ-উচ্চারণে অক্ষমতা প্রকাশ পায় এবং তার ফলে ধ্বনি পরিবর্তন অনিবার্য। —রিক্সা—রিস্কা, উষ্ট্র<উষ্ট্র/উষ্ট (কালিদাস নাকি প্রথম জীবনে এরূপই উচ্চারণ করেছিলেন)।

১০. **উচ্চারণ দ্রুতি ঃ** খুব তাড়াহুড়ো ক'রে কথা বলতে গেলে শব্দের মধ্যস্থ কোন কোন অক্ষর স্খলিত হ'য়ে পড়ে ধ্বনিতে পরিবর্তন নিয়ে আসে।—পণ্ডিতমশাই< পোন্‌শাই, কোথা যাবে<কোজ্জাবে।

১১. **অল্পায়াসপ্রবণতা/প্রযত্নলাঘব ঃ** শব্দের উচ্চারণকে সহজ করবার উদ্দেশ্যে কখনও যুক্ত ব্যঞ্জনকে ভেঙে, কখনো সমীকৃত ক'রে, কখনো বা নোতুন ধ্বনির আগম ঘটিয়ে অথবা অন্যবিধ উপায়ে ধ্বনিতে পরিবর্তন নিয়ে আসা হয়।—জন্ম>জনম, কর্ম>কম্মো, স্কুল>ইস্কুল, মধু<মউ।

(গ) **মানসিক কারণগুলোর** মধ্যে আছে ঃ

১২. **শ্বাসাঘাত/অনবধানতা ঃ** নিজের অজ্ঞতা বা অনবধানতা-হেতু শব্দের মধ্যে যথাস্থানে শ্বাসাঘাত না পড়ায় ধ্বনিতে পরিবর্তন দেখা যায়। মধ্যস্বরে শ্বাসাঘাত পড়ায় 'অলাবু>লাউ', আদিস্বরে শ্বাসাঘাতের ফলে 'গামোছা>গাম্‌ছা'।

১৩. **অজ্ঞতা ঃ** অজ্ঞতাহেতু যথাযথ উচ্চারণে অক্ষমতা আসে, ঐজন্য অথবা না জেনে ভুল শব্দকে শুদ্ধ ভেবে উচ্চারণ করতে গেলেও ধ্বনি-পরিবর্তন সাধিত হয়। ব্যাজ>(Badge) ব্যাচ, ফর্ম>ফরম, স্টুপিড>ইস্টুপিট, উচ্চারণ>উশ্চারণ।

১৪. **লোকনিরুক্তি ঃ** অপরিচিত বা বিদেশি শব্দকে পরিচিত শব্দের সদৃশ করে উচ্চারণ করবার চেষ্টায় ধ্বনি পরিবর্তন ঘটে। Hospital>হাঁসপাতাল; Who comes there ? হুকুমদার/হুকুম সদর।

১৫. **ভাবপ্রবণতা ঃ** ভাবপ্রবণতা-হেতু কোন কোন শব্দে অতিরিক্ত ধ্বনি যোজনা করে তাকে অধিকতর হৃদয়গ্রাহী করে তোলা হয়, তাতেও ধ্বনি-পরিবর্তন ঘটে।—আইমা>আম্মা>মাম্মা, মামা>মামু, দুষ্ট<দুষ্টু।

১৬. **বিশুদ্ধিপ্রবণতা ঃ** সাধু ভাষার শব্দ কঠিন এবং দুরুচ্চার্য হয়—এই ধারণায় সহজ শুদ্ধ শব্দকে অশুদ্ধ বিবেচনা করে তাকে শুদ্ধ করে উচ্চারণ করবার চেষ্টা করতে গিয়ে প্রকৃতপক্ষে শুদ্ধ শব্দকেও অশুদ্ধ ক'রে তোলা হয়। পুষ্ট> পুরুষ্ট, উচ্চারণ>উরুশ্চারণ, উৎকৃষ্ট>উৎকৃক্ষ—অবশ্য তদ্ভব-আদি শব্দকে শুদ্ধতর করার ইচ্ছায়ও শব্দের রূপ পরিবর্তন ক'রে দেওয়া হয়। যথা, গ্রামের নাম—ইট আমতলা>ইষ্টকাম্রতলক ; বেনেগাঁও>বাণীগ্রাম।

১৭. **অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কার ঃ** কোন কোন শব্দ সংস্কারবশতঃ, উচ্চারণের যোগ্য না হ'লে তাকে বিকৃত ক'রে উচ্চারণ করবার ফলে ধ্বনিপরিবর্তন ঘটে।—গোবি> কাঁপ, সাপ>সাবু।

১৮. **শব্দদৈর্ঘ্য :** বড় শব্দকে সংক্ষিপ্ত করার উদ্দেশ্যে তাতে ধ্বনিপরিবর্তন ঘটানো হয়। খাইবার (বস্তু)>খাবার; UNESCO; গুগাবাবা; সারেগামা, ল. সা. গু.। বাই-সাইকেল>বাইক, ক্যালিবার>ক্যালি।

১৯. **অন্যমনস্কতা :** বক্তার অন্যমনস্কতাহেতু পর পর শব্দের উচ্চারণে বর্ণ-বিপর্যয় ঘটে গিয়ে ধ্বনিপরিবর্তন সৃষ্টি করে।—এক কাপ চা>এক চাপ কা; হাতে ছাতি>ছাতে হাতি।

২০. **কবিতার মাত্রা/কোমলতা :** কবিতায় মাত্রার জন্য অথবা কোমলতার জন্য শব্দে ধ্বনি পরিবর্তন ঘটানো হয়। জন্ম>জনম, বিশ্বাস>বিশোয়াস।

২১. **সাদৃশ্য :** ভাষার ধ্বনি পরিবর্তনে সাদৃশ্যের বিরাট ভূমিকা বর্তমান। বস্তুতঃ, শুধু ধ্বনি পরিবর্তনেই যে সাদৃশ্যের কাজ সীমাবদ্ধ তা নয়, ভাষার অন্যান্য ক্ষেত্রেও সাদৃশ্য সমভাবে ক্রিয়াশীল। শব্দের রূপতাত্ত্বিক পরিবর্তন, পুরাতন শব্দের নোতুন অর্থ উৎপাদন এবং নোতুন শব্দ-সৃষ্টিতেও সাদৃশ্য সদা সক্রিয়। আলোচ্য ক্ষেত্রে ধ্বনি-পরিবর্তনে তার ভূমিকা-বিশ্লেষণেও তার বহুমুখী ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়।—একার্থবাচক 'বধূ' ও 'বধূটিকা' শব্দ দুটি থেকে যথাক্রমে 'বৌ' ও 'বউড়ি' শব্দের সৃষ্টি; 'শ্বশ্রূ' থেকে হয়েছে 'শাস'। 'বৌ' আর 'বউড়ি' একই অর্থ, সেই সাদৃশ্যে 'শাস' হলো 'শাসুড়ি' এবং 'ঝি' থেকে 'ঝিউড়ি'। 'দ্বাদশ' শব্দের সাদৃশ্যে 'একদশ' হলো 'একাদশ'।

[তিন] ধ্বনি পরিবর্তনের ধারা

নানা কারণেই শব্দ-মধ্যে যে সকল ধ্বনিপরিবর্তন সাধিত হয় যত্ন সহকারে তাদের শৃঙ্খলাবদ্ধ করে নিতে পারলে ধ্বনিপ্রবৃত্তিগুলো আবিষ্কার করা কঠিন নয়। এগুলো ধ্বনিপ্রবৃত্তি মাত্র—প্রাচীন ব্যবহার দেখে এদের বিচার করতে হয়; এগুলোকে ধ্বনি-সূত্র বা ধ্বনিনিয়ম বলা সঙ্গত নয় এই কারণে যে, যদি এগুলো নিয়ম হয় তবে প্রত্যেক শব্দ ভবিষ্যতে কোন্ রূপে পরিণতি লাভ করবে, তা আমরা বলে দিতে পারতাম। কিন্তু কার্যতঃ তা' সম্ভব নয়—এই কারণেই এগুলোকে ধ্বনিসূত্র না বলে ধ্বনিপ্রবৃত্তি বলাই উচিত।

ধ্বনিপ্রবৃত্তিগুলো বিচার ক'রে ধ্বনিপরিবর্তনের দুটি মূল ধারা কল্পনা করা যায়—একটি বিবর্তনমূলক (evolutionary) ও সংযোগমূলক (combinatory), অপরটি মনোবিষয়ক—এর মধ্যে আছে কিছু সাদৃশ্যমূলক (analogical) এবং কিছু বিভ্রান্তিমূলক (confusional)।

বিবর্তনমূলক ও সংযোগমূলক ধ্বনিপরিবর্তনের তিনটি প্রধান ধারা; (ক) ধ্বনি-বিলোপ, (খ) ধ্বনি-আগম, (গ) ধ্বনি-রূপান্তর।

(ক) **ধ্বনিবিলোপ**—এ পর্যায়ভুক্ত ধ্বনিপরিবর্তনের প্রধান কারণ শ্বাসাঘাত—বিশেষ কোন অক্ষরে প্রবল শ্বাসাঘাত পড়লে অপর অক্ষর দুর্বল হ'য়ে ক্রমশঃ লোপ পেতে পারে। আরও একটি কারণ—উচ্চারণ-দ্রুতি, এর ফলেও কোন অক্ষর বাদ পড়ে যেতে পারে। এই পর্যায়ে আছে:

১ (অ)—**আদিস্বর লোপ** (Aphesis/Aphaeresis)—সাধারণতঃ অনাদ্যস্বরে প্রবল শ্বাসাঘাতের ফলে আদিস্বর লোপ পায়। অতসী>তিসি, অলাবু>লাউ, অরিষ্ট>রীঠা, অপিনন্ধ>পিনন্ধ, অভ্যন্তর>ভিতর, আছিল>ছিল, আনোনা>নোনা, আমেরিকান>মার্কিন, উদুম্বর>ডুমুর, উধার>ধার, উপানহ্>পানই, উপবিংশতি>উবইসই>বইসে, এরণ্ড>রেড়ী, esquire<squire, ওঝা>ঝা।

১ (আ)—**মধ্যস্বর লোপ** (Syncope)—প্রাধানতঃ দুর্বল শ্বাসাঘাত অথবা শ্বাসাঘাত-হীনতা-আদি কারণে শব্দস্থ মধ্যস্বরের লোপ হ'তে পারে। ভগিনী>ভগ্নী, সুবর্ণ>স্বর্ণ, গৃহিণী>গিন্নি, কলিকাতা>কলকাতা, দেবকুল>দেঅউল>দেউল, গামোছা>গামছা,, do not>don't, কাচাকলা>কাচকলা, ঘোড়াদৌড়>ঘোড়দৌড়, রাঁধনা>রাধ্‌না, ভাগিনেয়>ভাগ্‌নে, কোথা থেকে>কোত্থেকে, তা'নইলে>তা' ন'লে, নাতিজামাই>নাতজামাই।

১ (ই)—**অন্ত্যস্বর লোপ** (Apocope)—শব্দের আদিস্বরে প্রবল শ্বাসাঘাত-হেতু অন্ত্যস্বর দুর্বল হ'য়ে ক্রমে লুপ্ত হয়। অগ্নি>অগ্‌গি>আগি>আগ, গোরূপ>গোরুঅ>গোরু, দদ্রু>দদ্দু>দাদ, সারেগামা>সরগম্, সন্ধ্যা>সঞ্ঝা>সাঁঝ, জল>জল্, bombe>bomb।

১ (ঈ)—**ব্যাকরণপ্রবণতার** জন্যও অনেক সময় মধ্যস্বর এবং অন্ত্যস্বর লোপ পায়। বামুন+ঈ>বাম্‌নী, পাগল+আ>পাগ্‌লা, হলদিয়া>হল্‌দে।

২ (অ)—**ব্যঞ্জন লোপ**—স্বরধ্বনির মতোই আদি, মধ্য বা অন্তস্থিত ব্যঞ্জন ধ্বনি লোপ পায়। ঐতিহাসিক ধারায় ভাষার বিবর্তনে মধ্য ভারতীয় আর্যভাষার যুগে স্বর-মধ্যবর্তী অল্পপ্রাণ ব্যঞ্জন লোপ পেতো, মহাপ্রাণ ধ্বনি 'হ'-য়ে পরিণত হ'য়ে নব্য ভারতীয় ভাষায় লোপ পেয়েছে। ঘৃত>ঘিঅ>ঘি, সখী>সহি>সই।

আদিব্যঞ্জন লোপ—স্থিত>থিতু, শ্মশান>মশান, know>no।

মধ্যব্যঞ্জন লোপ—শৃগাল>শিআল, রাধিকা>রাহিঅ>রাই।

daughter>dater, walk>wak।

অন্ত্যব্যঞ্জন লোপ—নাহি>নাই, আম্র>আম্ব>আম, বর্গীর>বরগী।

২ (আ)—**হ-কারের লোপপ্রবণতা**—পদমধ্যস্থ অথবা পদের অন্ত্যস্থ 'হ্'-কারের লোপ-প্রবণতা বাঙ্‌লা ভাষার একটি বৈশিষ্ট্য। ফলাহার>ফলার, ব্যবহারী শাড়ি> বেভারি শাড়ি, কহি>কই, মহুয়া>মউআ।

২ (ই)—**অনুনাসিক ব্যঞ্জন ধ্বনির লোপ**—পূর্ববর্তী স্বরধ্বনিকে সানুনাসিক ক'রে অনুনাসিক ব্যঞ্জনধ্বনির লোপপ্রবণতাও বাঙ্‌লা ভাষার বৈশিষ্ট্য। সন্ধ্যা>সাঁঝ, দন্ত>দাঁত, হংস>হাঁস, তাম্র>তাঁবা।

৩ **সমাক্ষর লোপ** (Haplology)—পাশাপাশি অথবা কাছাকাছি অবস্থিত দু'টি সমধ্বন্যাত্মক অক্ষর কিংবা সমধ্বনির একটি লোপ পেলে সমাক্ষর লোপ হয়। পৃষৎ+ উদর=পৃষদুদর>পৃষোদর, উদককুম্ভ>উদকুম্ভ, মধুদুঘ>মধুঘ, পটললতা>পলতা, পাটকাঠি>প্যাকাটি, চকখড়ি>চাখড়ি, কৃষ্ণনগর>কৃষ্‌নগর (Krisnagar), মধ্য-দেশীয়া>মদেশীয়া, বড়দাদা>বড়দা, লৌকিকতা>লৌকতা, মুখখানি>মু'খানি সব্যবস্থ>সাব্যস্ত, ছোটকাকা>ছোটকা ; Parttime>Partime, Everready> Eveready।

(খ) **ধ্বনি আগম**—উচ্চারণ সৌকর্যের নিমিত্ত শব্দের আদিতে, মধ্যে বা অন্ত্যে স্বর বা ব্যঞ্জনধ্বনির আগম ঘটতে পারে।

১ (অ) **আদিস্বরাগম** (Vowel prothesis)—ব্যঞ্জনের আদিতে উচ্চারণের সুবিধার জন্য স্বরের আগমকে আদি স্বরাগম বলে। স্ত্রী>প্রা' ইথি, স্পর্ধা>আস্পর্ধা, কুমারী>অকুমারী, আকুমারী, স্থান>আস্তানা, স্কুল>ইস্কল, stable>আস্তাবল। (আদি স্বরাগমকে কেহ কেহ 'পুরোহিতি' বলে থাকেন)।

১ (আ)—**স্বরভক্তি/বিপ্রকর্ষ/মধ্য স্বরাগম** (Anaptyxis)—উচ্চারণ-সৌকর্যের জন্য শব্দমধ্যবর্তী যুক্ত ব্যঞ্জনকে ভেঙে তার মধ্যে স্বরধ্বনির অনুপ্রবেশকে মধ্য-স্বরাগম বলে। ইন্দ্রা>ইন্দিরা, মনোহর্থ>মনোরথ, ভক্তি>ভকতি, ফিল্ম>ফিলিম, সূর্য>সুরুজ, গ্লাস>গেলাশ, প্রীতি>পিরীতি।

১ (ই)—**অন্ত্যস্বরাগম** (Catathesis)—শব্দের অন্তে কখন কখন স্বরধ্বনির আগম ঘটে, তাকেই বলে অন্ত্যস্বরাগম। দিশ্>দিশা, কান্ন>কান্না, বেঞ্চ>বেঞ্চি, অ্যাক্টিং>অ্যাক্টিনি, দুষ্টু, মিষ্টি, দুধু ভাতু, কান্>কানু, কানাই, তখ্‌ত্>তক্তা, জুল্‌ফ্>জুল্‌ফি।

(২) **ব্যঞ্জনাগম**—স্বরধ্বনির মতো প্রচুর না হ'লেও শব্দের মধ্যে ব্যঞ্জনধ্বনির আগমও বিরল নয়—বিশেষতঃ শব্দের আদিতে বিচিত্র সব ব্যঞ্জনের আবির্ভাব দেখা যায়।

আদিতে—ওষ্ঠ>ঠোঁট, ওঝা>রোজা, উই>রুই, উপকথা>রূপকথা, উদ্বর্ত্তন>উব্বট্টন>উবটন>উপটান>রূপটান, ওমলেট্>মামলেট।

মধ্যে—অম্ল>অম্বল, সুনর>সুন্দর, বানর>বাঁদর, সাহায্য>সাহার্য, মোকদ্দমা>মোকর্দমা।

অন্ত্যে—লঘু>হাল্‌কা, রাধাকৃষ্ণ>রাধাকৃষ্ণন্।

(৩) **অপিনিহিতি** (Epenthesis)—অপিনিহিতির সংজ্ঞা-বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। একমতে—"শব্দের মধ্যে 'ই' বা 'উ' থাকিলে সেই 'ই' বা 'উ'-কে আগে হইতেই উচ্চারণ করিয়া ফেলিবার রীতি বাঙ্গালার একটি বৈশিষ্ট্য। এই রীতির নামকরণ হইয়াছে অপিনিহিতি।" (ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়)। রাখিয়া>রাইখ-ইয়া>রাইখ্যা, আজি>আইজি>আইজ, দদ্দু>দাদু>দাউদ। "য-ফলার অন্তর্নিহিত ই-কারের অপিনিহিতি এখন পূর্ববঙ্গের উচ্চারণে বিশেষরূপে বিদ্যমান।" (তদেব)। সত্য>সইত্ত, কাব্য>কাইব্ব। অপর মতে—"যুগ্ম ব্যঞ্জনধ্বনির পূর্বে ই-কারের আগম হইলে বলে **অপিনিহিতি**।" (ডঃ সুকুমার সেন)। বাক্য>বাক্ক>বাইক্ক, চারি>চাইর। অপিনিহিতি মধ্যযুগের বাংলার এবং আধুনিক কালে পূর্ববঙ্গীয় উচ্চারণের বৈশিষ্ট্য।

অপিনিহিতির প্রাথমিক পর্যায়ে, মনে হয়, পরবর্তী 'ই' বা 'উ'-কে বজায় রেখেই 'ই'/'উ'-র আগম ঘট্‌তো। যেমন—গাঁতি>গাঁইতি, কাঁচি>কাঁইচি। সম্ভবতঃ 'আজি>আইজি', 'কালি>কাইলি'—প্রথমে এরূপ ছিল, পরে শেষোক্ত 'ই'/'উ' বর্জিত হয়। পূর্ববঙ্গীয় অপিনিহিতি উচ্চারণে এখনো পরবর্তী 'ই'-র আভাষ রয়েছে, যেমন—'রাখিয়া>রাইখিয়া>রাইখ্যা', কিন্তু 'রাইখা' নয়। -'্য' ফলায় 'ই'-কারের লুপ্তাবশেষ রয়ে গেছে।

(৪) **শ্রুতিধ্বনি** (Glide)—পাশাপাশি দু'টি ধ্বনির উচ্চারণকালে উচ্চারণ-সৌকর্যের নিমিত্ত অথবা অনবধানতাহেতু দু'য়ের মাঝখানে একটি তৃতীয় ধ্বনির আগম ঘটে গেলে তাকে বলে শ্রুতিধ্বনি। শ্রুতিধ্বনি দ্বিবিধ—য়-শ্রুতি ও ব-শ্রুতি। যখন 'য়'-ধ্বনির আগম ঘটে, তখন 'য়-শ্রুতি' হয়। সাগর>সাঅর>সায়র, শৃগাল>শিআল>শিয়াল, মোদক>মোঅঅ>মোআ>মোয়া। কখন কখন এরূপ ধ্বনি শুধু উচ্চারণেই শোনা যায়, লেখায় আসে না। কে এলো—কেয়েলো। দুই ধ্বনির মাঝে যখন 'ব' আসে তখন 'ব-শ্রুতি' হয়। শুকর>শুঅর>শুওর, যা+আ>যাওয়া (যথার্থ বানানটি হওয়া উচিত 'যাবা')। (বাংলায় অন্তঃস্থ 'ব' নেই বলে তৎস্থলে 'উঅ' বা 'ওঅ' বা 'ওয়' ব্যবহার করা হয়।)

(৪ অ) **হ-শ্রুতি**—সাধারণতঃ বাংলায় 'হ' ধ্বনিলোপের প্রবণতা থাকলেও কখন কখন দুই ধ্বনির মাঝখানে 'হ'-এর আবির্ভাবও ঘটে।—বিপুলা>বিউলা>বেহুলা, viola>বেহালা, রাজকুল—রাউল>রাহুল, বেয়ারা>বেহারা।

(৪ আ) **-দ-, -ব-, -র- -ল-, শ্রুতি**—দুই ধ্বনির মাঝখানে 'দ', 'ব', 'র' বা 'ল' ধ্বনিরও কখন কখন আগম ঘটে। বানর>বাঁদর (বানর>বান্দর>বাঁদর), জেনারেল>জাঁদরেল; আম>আঁব, অম্ল>অম্বল; পুষ্ট>পুরুষ্টু; সাহায্য>সাহার্য; তাঐ>তালৈ, ছাই>ছালি।

(গ) **ধ্বনিরূপান্তর**—শব্দমধ্যস্থ কোন স্বর, ব্যঞ্জন বা অক্ষর যদি স্থান পরিবর্তন করে অথবা অপরের সঙ্গে স্থান বিনিময় করে, তাহলেই ধ্বনিরূপান্তর ঘটে থাকে।

(১) **অভিশ্রুতি** (Umlaut)—অপিনিহিত 'ই' বা 'উ' ধ্বনি যদি লোপ পায় অথবা অপর স্বরের প্রভাবে অথবা অপর স্বরের সঙ্গে মিলিত হ'য়ে নবরূপ প্রাপ্ত হয়, তবে তাকে বলা হয় অভিশ্রুতি। আজি>আইজ>আজ, চারি>চাইর>চার, সাধুর>সাউধের>সেধের, মাছ+উয়া=মাছুয়া>মাউছা>মেছো, হাটুয়া>হেটো, রাখিয়া>রাইখ্যা>রেখে। অভিশ্রুতিতে শব্দমধ্যে যে পরিবর্তন সাধিত হয় তা' সাধারণতঃ ত্রিবিধ: (১) একাক্ষর (monosyllabic) শব্দে অপিনিহিত 'ই' বা 'উ' লোপ পায়; (২) একাধিক অক্ষরময় শব্দে বাংলা সন্ধির নিয়মানুযায়ী আভ্যন্তর সন্ধি হ'তে পারে,—শউল>শোল, বহিন>বইন>বোন; (৩) স্বরসঙ্গতির (পরে দ্রষ্টব্য) নিয়মানুযায়ী স্বরসন্ধি ও স্বরপরিবর্তন হ'তে পারে, হাসিয়া>হাইস্যা>হাস্যা, হেস্যা>হেসে, জল+উয়া=জলুয়া>জউলুয়া>জোলুয়া>জোলো, জালুয়া> জাউল্যা>জাইল্যা>জেইলা>জেলে। অপিনিহিতি যেমন পূর্ব বাংলার ভাষার অন্যতম উচ্চারণবৈশিষ্ট্য, অভিশ্রুতি তেমনি পশ্চিম বাংলার উচ্চারণবৈশিষ্ট্য।

(২) **স্বরসঙ্গতি** (Vowel Harmony)—কোন এক স্বরধ্বনির প্রভাবে যদি অপর স্বরধ্বনি সঙ্গতি লাভের উদ্দেশ্যে পরিবর্তিত হয়, তবে তাকে বলা হয় স্বরসঙ্গতি। সাধারণতঃ উচ্চাবস্থিত স্বরধ্বনির প্রভাবে নিম্নাবস্থিত স্বরধ্বনি উচ্চাবস্থ হয়। যেমন, উচ্চাবস্থিত 'ই' ধ্বনির প্রভাবে নিম্নাবস্থিত 'এ' বা 'আ' ধ্বনি উচ্চাবস্থ 'ই' রূপ লাভ করে। দেশি>দিশি, বিলাতি>বিলিতি। স্বরসঙ্গতি চতুর্বিধ—পূর্ব-স্বরের প্রভাবে পরবর্তী স্বর পরিবর্তিত হলে (অ) **প্রগত স্বরসঙ্গতি**। জুতা>জুতো, ঠিকা>ঠিকে। পরবর্তী স্বরের প্রভাবে পূর্বস্বরে পরিবর্তন ঘটলে (আ) **পরাগত স্বরসঙ্গতি**। চোর+ই>চুরি, খোকা>খুকী। পূর্ব এবং / বা পরবর্তী স্বরের প্রভাবে মধ্যবর্তী স্বর পরিবর্তিত হ'লে (ই) **মধ্যগত স্বরসঙ্গতি**। নিড়ানি>নিড়ুনি, এখনি>

এখ্বনি, বিলাতি>বিলিতি, বারেন্দা>বারান্দা। এবং পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী উভয় স্বরই পরস্পরের প্রভাবে পরিবর্তিত হ'লে (ঈ) **অন্যোন্য স্বরসঙ্গতি** হ'য়ে থাকে। ধোঁকা>ধুঁকো, যোগ্য>যুগ্‌গি, পোষ্য>পুষ্যি। এই স্বরসঙ্গতি স্বরধ্বনির অবস্থানে একটা বিশেষ ভূমিকা পালন করে। সাধারণতঃ ক্রমিক পর্যায়ে উচ্চাবস্থ স্বরধ্বনি ('ই, ঈ' এবং 'উ, ঊ') মধ্যাবস্থ স্বরধ্বনি ('এ, অ্যা' এবং 'ও, অ') ও নিম্নাবস্থ ('আ') স্বরধ্বনিকে এক স্তর উপরে তুলে নেয় এবং কখন কখন নিম্নাবস্থ স্বরধ্বনির প্রভাবেও উচ্চাবস্থ বা মধ্যাবস্থ স্বরধ্বনি নেমে আসে। যথা—শুনে>শোনা, কেন> ক্যান, বিড়াল>বেড়াল, পিছন>পেছন, 'অ্যাকটা' (নিম্নাবস্থ 'আ'-এর প্রভাবে উচ্চমধ্যাবস্থ 'এ' নিম্নমধ্যাবস্থ 'অ্যা' হ'লো), কিন্তু 'দুটো' (উচ্চাবস্থ পশ্চাৎ স্বরধ্বনি 'উ'-র প্রভাবে নিম্নাবস্থ 'আ' উচ্চমধ্যাবস্থ পশ্চাৎ স্বরধ্বনি 'ও' হ'লো) এবং 'তিনটে' (উচ্চাবস্থ সম্মুখ স্বরধ্বনি 'ই'-র প্রভাবে নিম্নাবস্থ 'আ' উচ্চমধ্যাবস্থ সম্মুখ স্বরধ্বনি 'এ' হ'লো)। এইরূপ—'দীপবর্তিকা>দীঅটী>দেউটি', দীপালি> দেয়ালি, ইদানিং>এদানি, 'বসুক>বোসুক', 'শোনা' কিন্তু শুনি, 'ঝোলা' কিন্তু 'ঝুলি', 'উড়ানি>উড়ুনি', 'শেফালি>শিউলি', 'ভিতর>ভেতর', 'শহরিয়া> শহুরে'। অতএব দেখা যায়, 'স্বরসঙ্গতি'তে স্বরধ্বনির উচ্চতা-নীচতা অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ।

(৩) **সমীভবন** (Assimilation)—সন্নিকৃষ্ট দুই বিষম ধ্বনি যদি পরস্পরের প্রভাবে উভয়ই সমরূপত্ব লাভ ক'রে অথবা একের প্রভাবে অপরটিও সমধ্বনিতে রূপান্তরিত হয়, তবে তাকে বলা হয় সমীভবন। সমীভবন ত্রিবিধ। (অ) পূর্ববর্তী ধ্বনির প্রভাবে পরবর্তী ধ্বনি সমাবস্থায় এলে **প্রগত সমীভবন** (progressive assimilation) হয়। পদ্ম>পদ্দ, লগ্ন>লগ্‌গ, অশ্ব>অশশ, চক্র>চক্ক। (আ) পরবর্তী ধ্বনির প্রভাবে পূর্ববর্তী ধ্বনি সমাবস্থায় এলে হয় **পরাগত সমীভবন** (Regressive assimilation)। উৎ+মুখ>উন্মুখ, পাঁচশো>পাঁশশো, কর্ম>কম্ম। (ই) যখন পরস্পরের প্রভাবে উভয় ধ্বনিই পরিবর্তিত হ'য়ে অল্পবিস্তর সাম্যলাভ করে, তখন হয় **অন্যোন্য সমীভবন** (Mutual assimilation)। মহোৎসব>মোচ্ছব, চারটি>চাড্ডি, উৎ+শ্বাস>উচ্ছ্বাস, অদ্য>অজ্জ। লক্ষণীয় যে সংস্কৃত তথা বাংলা ব্যঞ্জন সন্ধির অনেক দৃষ্টান্তই বস্তুতঃ এই সমীভবন মাত্র।—সৎ+জন>সজ্জন, প্রাক্+মুখ>প্রাঙ্মুখ, মেঘ+করেছে>মেক্করেছে, পাক+ঘর>পাগ্‌ঘর ইত্যাদি যেমন সন্ধির দৃষ্টান্ত, তেমনি সমীভবন-দৃষ্টান্তরূপেও গ্রাহ্য।

(৪) **বিষমীভবন** (Dissimilation)—শব্দমধ্যস্থ দুটি সমধ্বনির কোন একটি পরিবর্তিত হ'লে বিষমীভবন হয়। প্রক্রিয়াটি সমীভবনের বিপরীত। লাল>নাল,

(৫) **বিপর্যাস / বর্ণবিপর্যয়** (Metathesis)—শব্দমধ্যস্থিত ধ্বনিদ্বয়ের স্থান-বিনিময়কে বিপর্যাস বা বর্ণবিপর্যয় বলা হয়। রিক্সা>রিস্কা, আহ্লাদ>আল্‌হাদ, চিহ্ন>চিন্‌হ, গর্জন>গজরান, মৃণাল>মৃলান, কুফ্‌ল>কুল্‌প, মুকুট>মটুক, হ্রদ>হ্‌দ>দহ, বারাণসী>বেনারস, প্লাটুন>পল্টন, পিশাচ>পিচাশ, আধিক্যতা> আদিখ্যেতা।

(৬) **ঘোষীভবন** (Voicing)—অঘোষধ্বনি যদি সঘোষ হয়, তবে ঘোষীভবন হয়। কাক>কাগ, বক>বগা, উপকার>উবগার, ছোট+দা>ছোড়দা, থাপড়া> থাবড়া, কতদূর>কদ্দূর, মকর>মগর।

(৭) **অঘোষীভবন** (Devoicing)—সঘোষ ধ্বনি অঘোষবৎ উচ্চারিত হ'লে অঘোষীভবন হয়। অবসর>অপসর, গুলাব>গোলাপ, খরাব>খারাপ, শিগ্‌নি> শিক্‌নি, ছাদ>ছাত, রাগ করেছো>রাক্‌ করেছো, ক্ষুধ্‌+পিপাসা>ক্ষুৎপিপাসা।

(৮) **মহাপ্রাণীভবন** (Aspiration)—পশ্চাদ্‌বর্তী কোন মহাপ্রাণ ধ্বনির সঙ্গে যুক্ত হ'য়ে অথবা কোন মহাপ্রাণ ধ্বনির প্রভাবে অল্পপ্রাণ ধ্বনি মহাপ্রাণিত হ'লে মহাপ্রাণীভবন হয়। এবেহোঁ>এভোঁ, কবহুঁ>কভু, কাৎ হও>কাথও, স্কন্ধাগার> খামার, বিবাহ>বিভা, মস্তক>মাথা। অপর কোন মহাপ্রাণ ধ্বনির প্রভাব ছাড়াই যদি অল্পপ্রাণ ধ্বনি মহাপ্রাণধ্বনিতে পরিণত হয়, তবে তাকে **স্বতোমহাপ্রাণীভবন** (spontaneous aspiration) বলা হয়। পতঙ্গ>ফড়িং, কিঞ্চিৎ>কিছু, নির্বাপয়তি> নিভায়, পাশ>ফাঁস, ক্রীড়্‌>খেলা, জুষ্ট>ঝুটা, জীর্ণ>ঝুনা, কীলক>খিল।

(৯) **অল্পপ্রাণীভবন** (De-aspiration)—মহাপ্রাণ ধ্বনি কোন কারণবশতঃ অল্পপ্রাণ ধ্বনিতে পরিণত হ'লে 'অল্পপ্রাণীভবন' হয়। শৃংখল>শিকল, অবধি> অবদি, দুধ>দুদ। ভগিনী>বহিন (এখানে প্রথম মহাপ্রাণটি অল্পপ্রাণিত হ'লো এবং পরবর্তী অল্পপ্রাণ ধ্বনিটি মহাপ্রাণিত হ'লো।) হস্ত>হত্থ>হাত, বৃদ্ধ> বুঢ়া>বুড়া, মহার্ঘ>মাগ্গি, করছি>কচ্চি, নহে>নয়।

হসন্তযুক্ত মহাপ্রাণ ধ্বনি বাংলায় সর্বদাই অল্পপ্রাণিত হয়।—মে্‌ঘলা>মেগ্‌লা, দুধ্‌>দুদ্‌, গাছ্‌>গাচ্‌। শব্দের আদি স্বরটি প্রস্বরিত হ'লে পশ্চিমবঙ্গীয় উচ্চারণে স্বরান্ত মহাপ্রাণও অল্পপ্রাণিত হ'তে পারে।—কোথায়>কোতায়, এয়েছে>এয়েচে।

(১০) **উষ্মীভবন** (Spirantisation)—স্পৃষ্ট ধ্বনির উচ্চারণ-কালে যদি শ্বাস-বায়ু প্রলম্বিত হয়ে উষ্মধ্বনির সৃষ্টি করে তবে তাকে উষ্মীভবন বলা হয়। ক-বর্গ, চ-বর্গ ও প-বর্গের কোন কোন ধ্বনি এরূপ উষ্মীভূত হয়ে উচ্চারিত হ'তে পারে। কাগজ>কা গ জ, ফুল (Phul)>ফুল (fool), খালীপুজা>খালিফুজা

(উষ্মীভূত ব্যঞ্জনের মাথায় বিন্দু চিহ্ন যোগ করে বাংলায় বোঝানো হয়। পূর্ববঙ্গীয় উচ্চারণে 'চ' বর্গ সাধারণতঃ উষ্মীভূত হ'য়ে থাকে। জান্তি>জান্তি=zı)।

(১০ ক) **সকারীভবন** (Assibilation): চ-বর্গের ধ্বনিগুলো উষ্মীভূত হ'য়ে যদি 'শ, স' বা 'জ'-রূপ লাভ করে, তবে এই প্রক্রিয়াকে বলা হয় সকারীভবন। পরশুরামের 'চিকিৎসা সংকট' নাটকের কবিরাজের বিখ্যাত উক্তি 'অ'য় অ'য়, zান্ত পার না'—এখানে 'জ' ইংরেজি 'z'-রূপে উচ্চারিত হয়েছে। পূর্ববঙ্গীয় উচ্চারণে 'চ, ছ, জ. ঝ' যথাক্রমে সকারীভূত হ'য়ে 'ৎস (ts), স (s), জ (z), ঝ (zh)' রূপ লাভ করে। পশ্চিমবঙ্গীয় উচ্চারণেও ক্বচিৎ সকারীভবনের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। মেজদা>মেজ়দা, গাছতলা>গাস্‌তলা, গিয়েছিলে>গিস্‌লে।

(১০ খ) **রকারীভবন** (Rhotacism)—'স্' যদি ঘোষবৎ 'জ্' হ'য়ে সর্বশেষে 'র্'-কারে পরিণত হয়, তবে তাকে বলা হয় 'রকারীভবন'। *অউসোসা (ausosa)> *অউজ়োজ়া (Auzoza)>অরোরা (Aurora); *হস (hasa=শশ)>*হজ় (haza)>হেয়ার (hare), * dusmenes>duzmanas>দুর্মনস্। দ্বাদশ> দুবাজ়স>বারস>বারহ>বার।

(১১) **নাসিক্যীভবন** (Nasalisation)—অনুনাসিক বা নাসিক্যধ্বনি স্বয়ং লুপ্ত হ'য়ে যদি পূর্ববর্তী স্বরধ্বনিকে অনুনাসিক ক'রে দেয়, তবে তাকে বলে নাসিক্যীভবন। হংস>হাঁস, কণ্টক>কাঁটা, দন্ত>দাঁত, সন্ধ্যা>সাঁঝ, আম্র>আঁব।

(১১ ক) **স্বতোনাসিক্যীভবন** (Spontaneous nasalisation)—কোন অনুনাসিক ধ্বনির লোপ কিংবা প্রভাব-ব্যতীতই যদি অকারণে কোন ধ্বনি সানুনাসিক হ'য় ওঠে, তবে তাকে বলা হয় স্বতোনাসিক্যীভবন। পুস্তক>পুঁথি, ইষ্টক>ইঁট, ঘোটক>ঘোঁড়া, পেচক>পেঁচা, পাপাইয়া>পেঁপে, যূথী>জুঁই, সূচ>ছুঁচ, হাসপাতাল>হাঁসপাতাল।

(১১ খ) **বিনাসিক্যীভবন** (Denasalisation)—মূল শব্দের নাসিক্যধ্বনি যদি ভাষা পরিবর্তন-স্রোতে বিলুপ্ত হ'য়ে যায়, তবে তাকে বিনাসিক্যীভবন বলা হয়। কিঞ্চিৎ>কিছু, যন্ত্রণা>যাতনা, শৃঙ্খল>শিকল, এরণ্ড>রেড়ী, অভ্যন্তর>ভিতর, মঞ্চ>মাচা, টঙ্ক>টাকা।

(১২) **মূর্ধন্যীভবন** (Cerebralisation)—ঋ, র, ষ-যোগে অথবা অপর কোন মূর্ধন্যধ্বনির প্রভাবে দন্ত্যবর্ণ মূর্ধন্যীকৃত হয়ে মূর্ধন্যীভবন হয়। প্রাকৃতে এ জাতীয় মূর্ধন্যীভবনের প্রবণতা খুব বেশি ছিল, এমন কি 'স'-যোগেও হ'তো। বিকৃত>

বিকট, দক্ষিণ>ডাহিন, তির্যক>টেরা, মৃত্তিকা>মাটি, ক্ষুদ্র>খুড়া, চতুর্থ>চৌঠা, বৃদ্ধ>বুড়া, ধৃষ্ট>ঢিট।

(১২ অ) **স্বতোমূর্ধন্যীভবন** (Spontaneous cerebralisation)—কোন মূর্ধন্যবর্ণের প্রভাব-ব্যতীত অকারণেই যখন কোন দন্ত্যবর্ণ মূর্ধন্যরূপে উচ্চারিত হয়, তখন তাকে বলা হয় স্বতোমূর্ধন্যীভবন। পততি>পড়ই>পড়ে, উৎ-দীন>উড্ডীন, পতঙ্গ>ফড়িং, দংশক>ডাঁশা, বালুতি>বালুটি, উদ্দংশ>উরশ, দংশে>ডংশে।

(১৩) **তালব্যীভবন** (Palatalisation)—জিহ্বাগ্র দ্বারা উচ্চার্য কোন ধ্বনির উচ্চারণকালে জিহ্বার পশ্চাদ্ভাগ যদি তালু স্পর্শ করে তবে ঐ ধ্বনিব তালব্যীভবন হয়ে থাকে। অদ্য>অজ্জ>আজ, সত্য>সাচ্চা, কৃত্যগৃহ>কাছারি, আদিত্য> আইচ্, দ্যূত>জুয়া, এডুকেশন>এজুকেশন, কুৎসা>কুচ্ছা, মধ্য>মাঝ, মহোৎসব> মোচ্ছব, চিকিৎসা>চিকিচ্ছে। 'ক্ষ'-যুক্ত ব্যঞ্জনটিরও তালব্যীভবন হয়ে থাকে। কক্ষ>কাছ, মক্ষিকা>মাছি।

(১৪) **সংকোচন** (Contráction)—ধ্বনি পরিবর্তনের ক্ষেত্রে অনেক সময় পাশাপাশি অবস্থিত ধ্বনিগুলোর কোন কোনটি অপর ধ্বনির সঙ্গে লীন হ'য়ে যায়—এরূপ প্রক্রিয়াকে সঙ্কোচন বলা হয়। অন্ধকার>আন্ধার, সুবর্ণ>স্বর্ণ, পরিষদ্> পর্ষদ্, অক্ষবাট>আখড়া।

(১৫) **বিস্ফারণ** (Expansion)—কোন ধ্বনিতাত্ত্বিক পরিবর্তনে এক অক্ষর একাধিক অক্ষরে পরিণত হ'লে তাকে বলে বিস্ফারণ। প্রত্যাশা>প্রতিআশা, বিশ্বাস>বিশোয়াসা, পেরা>পেয়ারা, স্নান<স্নাহান।

(১৬) **অবরুদ্ধধ্বনি** (Recursive) / **কণ্ঠনালীয়ভবন** (Glottalısation)—কোন ধ্বনির উচ্চারণশেষে কণ্ঠনালী আকুঞ্চিত হ'লে কণ্ঠনালীয়ভবন হয়। এভাবে উচ্চারিত ধ্বনিকে **অবরুদ্ধ ধ্বনি** বলা হয়। সিন্ধী এবং পাঞ্জাবী ভাষার উচ্চারণে এবং পূর্ববঙ্গীয় স্পৃষ্টমহাপ্রাণ ঘোষবর্ণের (ঘ, ঝ, ঢ, ধ, ভ) কণ্ঠনালীয়ভবন হ'য়ে থাকে। এরূপ ধ্বনিতে মহাপ্রাণ বর্ণগুলো 'হ' ত্যাগ করে অর্ধেক,' / ? বা 'ঃ'-রূপ লাভ করে। গায়ে ঘা>গায়ে গা, ভাত<বা'ত, ধান>দা'ন।

(১৭) **অর্ধব্যঞ্জনে বিপর্যয়**—অর্ধব্যঞ্জন ধ্বনিগুলোর অর্থাৎ 'ম', 'ন', 'র' এবং 'ল'-এর মধ্যে পারস্পরিক পরিবর্তন ঘটে থাকে।

ন>ল=নামা>লামা, নড়া>লড়া, নৌকো>লৌকো।

ল>ন=লবণ>নুন, লেবু>নেবু, লাউ>নাউ, লুচি>নুচি, লোহা>নোয়া।

র>ল=শারিকা>শালিকা, ক্ষুদ্র>খুল্ল, প্রাচীর>পাঁচিল, হরিদ্রা>হলুদ।

র>ন=রথ্যা>লচ্ছা>নাছ।

ল>র=লশুন>রশুন, প্রবাল>পোয়ার।

ন>ম=বেশন>বেশম।

(১৮) **ব্যঞ্জনদ্বিত্ব** (Gemination)—শ্বাসাঘাতের কারণে অথবা বক্তার ইচ্ছানুযায়ী গুরুত্ব আরোপের উদ্দেশ্যে একক ব্যঞ্জনের স্থানে যুগ্ম ব্যঞ্জন ব্যবহৃত হ'লে ব্যঞ্জনদ্বিত্ব হয়। পদাতিক>পাইক্ক, ছোট>ছোট্ট, সকাল>সক্কাল, বাবা>বাব্বা, আহমক>আহাম্মক।

(১৯) **পূরক দীর্ঘতা / পরপূরক, মাত্রাপূরক, ক্ষতিপূরক দীর্ঘীভবন** (Compensatory lengthening)—প্রাকৃত থেকে বাঙলায় পরিণতির মুখে ভাষার বিবর্তন স্তরে যুক্ত বা যুগ্মব্যঞ্জন একক ব্যঞ্জনে পরিণত হবার কালে মোট মাত্রায় যে ক্ষতি সাধিত হয়, তার যথাযথ পরিপূরণের উদ্দেশ্যে উক্ত যুক্ত বা যুগ্ম ব্যঞ্জনের পূর্ববর্তী হ্রস্ব স্বরটি দীর্ঘস্বরে পরিণত হ'তো—একে বলা হয় পূরক দীর্ঘতা। —চন্দ্র>চন্দ>চাঁদ, কার্য>কজ্জ>কাজ, হস্ত>হত্থ>হাথ, হাত।

(২০) **উচ্চারণ দ্রুতি** (Tempo)ঃ—দ্রুত উচ্চারণের ফলে কথ্য বাঙলায় স্বরধ্বনিলোপ বা ধ্বনিসমন্বয়ের কারণে শব্দসংকোচ ঘটে ও ধ্বনি পরিবর্তন সাধিত হয়, একে বলা হয় উচ্চারণ-দ্রুতি।—কোথায় যাবে>কোজ্জাবে, কোথা থেকে এলে>কোত্থেকেলে, নিয়া আসিস্ গে যা>নেস্‌গে' যা।

(২১) **অপশ্রুতি (গুণ-বৃদ্ধি-ক্ষয়/সম্প্রসারণ** (Ablaut/Apophony)/**'স্বরক্রম** (Vowel-gradation)ঃ—কোন শব্দের অন্তর্ভুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনিগুলোকে অক্ষুণ্ণ রেখে যদি স্বরধ্বনির একটি আনুক্রমিক পরিবর্তন ঘটে এবং তৎসহ অর্থেরও কিঞ্চিৎ তারতম্য হয়, তবে ঐ প্রক্রিয়াকে বলা হয় অপশ্রুতি। অপশ্রুতির ফলে স্বরধ্বনির যে পরিবর্তন হয় তার তিনটি ক্রম—প্রথম ক্রমে ধাতু-প্রাতিপদিকের অথবা প্রত্যয়-বিভক্তির মূল স্বরধ্বনি অক্ষুণ্ণ থাকে, দ্বিতীয় ক্রমে স্বর দীর্ঘ হয়, তৃতীয় ক্রমে স্বরটি ক্ষীণ অথবা লুপ্ত হয়। এই কারণে প্রক্রিয়াটি 'স্বরক্রম' নামেও অভিহিত হয়। সংস্কৃত বৈয়াকরণগণ এদের নাম দিয়েছেন যথাক্রমে **গুণ ও বৃদ্ধি**। তৃতীয় ক্রমটির কোন সাধারণ নাম তাঁরা দেন নি। তবে, বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে (ঋ>র, য়>ই, ব>উ) এটিকে 'সম্প্রসারণ' বলেছেন। তবে সাধারণভাবে তৃতীয় ক্রমে স্বরধ্বনিটি দুর্বল বা ক্ষয়িত হয় বলে এটিকে 'ক্ষয়' বা 'ক্ষীণ' বলেও অভিহিত করা হয়। 'যজ্' ধাতু থেকে যজ্ঞ (গুণ), যাগ (বৃদ্ধি) এবং ইষ্ট (সম্প্রসারণ বা ক্ষীণ); স্বপ্

ধাতু থেকে স্বপ্ন (গুণ), স্বাপ (বৃদ্ধি), সুপ্ত (সম্প্রসারণ)। এইভাবেই দেখা যায় গুণ, বৃদ্ধি, ক্ষয়ের ফলে 'কৃ' ধাতু যথাক্রমে 'করণ', 'কারণ' ও 'কৃতি' ; ভূ ধাতু হয় 'ভবতি', 'ভাবয়িষ্যতি' ও 'অভূৎ' প্রভৃতি রূপে। বাংলা ক্রিয়াপদের ণিজন্ত-রূপে আমরা শুধু গুণ আর বৃদ্ধির নিদর্শন পাই—চলে (গুণ) —চালায়/চালে (বৃদ্ধি)। ইং—sing—sang—sung—song, give—gave—given—gift প্রভৃতির মধ্যেও স্বরধ্বনির এরূপ পরিবর্তন ঘটে।

মনোবিষয়ক ধ্বনি পরিবর্তন ঃ

মনোবিষয়ক ধনি-পরিবর্তনের দুটি প্রধান ধারা ঃ একটি **সাদৃশ্যমূলক** (analogical) এবং অপরটি **বিভ্রান্তিমূলক** (confusional)। এগুলোকে একত্রে শব্দ-প্রভাবিত এবং অর্থানুগত পরিবর্তন বলেও ব্যাখ্যা করা চলে।

(১) **সাদৃশ্য** (Analogy)—কোন দুটি সাদৃশ্য শব্দের কোন একটিতে যদি কোন ধ্বনিতাত্ত্বিক পরিবর্তন ঘটে, তবে অপর শব্দটিতে ঐরূপ পরিবর্তন প্রত্যাশিত—এই বোধ থেকেই সাদৃশ্যের জন্ম। ভাষাবিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সাদৃশ্যের বিরাট ভূমিকা—অবশ্য সংসার-জীবনের সাদৃশ্যের ব্যাপকতর ভূমিকার কথা স্মরণে আনলে ধ্বনি-পরিবর্তনে সাদৃশ্যের প্রভাবকে সহজেই মেনে নেওয়া চলে। অনেক ধ্বনিতাত্ত্বিক নিয়ম কতকগুলো ধারা অনুসরণ ক'রে চলে, কিন্তু সাদৃশ্যের ক্ষমতা প্রায় নিরঙ্কুশ এবং সার্বভৌম। ভাববোধক '-তা' প্রত্যয় যোগে অনেক বিশেষণ পদকে বিশেষ্যে রূপান্তরিত কবা হয়, কিন্তু সাদৃশ্যের এমনি প্রভাব সে 'অস্মদ্' শব্দের ষষ্ঠী বিভক্তির পদ 'মম' শব্দের সঙ্গেও '-তা' প্রত্যয় যোগে 'আত্মপরতা' অর্থে 'মমতা' পদটি নিষ্পন্ন হয়েছে। অথচ ব্যাকরণ-মতে বিভক্তিযুক্ত কোন পদের সঙ্গে কোন প্রত্যয় কখনও যুক্ত হ'তে পারে না। ইংরেজিতে auxiliary verb 'shall' এবং 'will'-এর অতীত রূপ 'should' এবং 'would' ; মূল পদে 'l' ছিল বলে অতীতকালেও তার স্মৃতি রয়ে গেছে। ইংরেজিতে আর একটি auxiliary verb আছে 'can'—এতে 'l' নেই কিন্তু পূর্বের শব্দদ্বয়ের সাদৃশ্যে এর অতীতকালে 'could'—এখানেও 'l' এসে গেছে।

'রোদসী' শব্দের অর্থ 'আকাশ', এর মূলে আছে যে ধাতু, তার অর্থ 'রোদন করা'—এর সমার্থক শব্দ 'ক্রন্দন করা'—অতএব রবীন্দ্রনাথ তৈরি করলেন, নোতুন শব্দ 'ক্রন্দসী', অর্থ 'আকাশ' (শব্দটি বেদে আছে ভিন্নার্থে)। শিশুর মনে প্রশ্ন জাগে 'put' যদি 'পুট' হয় তবে 'but' 'বুট' নয় কেন ? এ-ও সাদৃশ্যের কারণে। 'সব'>সব্ব>সব্ব', অথচ ধ্বনিতাত্ত্বিক নিয়মে 'সাব' হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু

বহুত্ববাচক 'সভা'-শব্দের সাদৃশ্যে 'সব' হ'লো। 'কালিদাস'-এর সাদৃশ্যে 'কালিচরণ', 'কালিপদ' হয় কিন্তু উভয়ই অশুদ্ধ। 'হংস' থেকে 'হাঁস'-এর সাদৃশ্যে 'হাস্য>হাসি'-তেও "ঁ" এসে গেছে। বধূটিকা>বউড়ি-এর সাদৃশ্যে ঝিউড়ি, শাশুড়ি; 'আম্হে', 'তুম্হে'র সাদৃশ্যে 'সর্ব'>সব'-স্থলে মধ্য-বাংলায় 'সম্হে'।

(২) **বিমিশ্রণ/মিশ্রণ** (Contamination)—কোন একটি শব্দ ব্যবহার-কালে ধ্বনি-সারূপ্যের ফলে অপর শব্দ তাদৃশ রূপ লাভ করলে বিমিশ্রণ হয়। 'রস' শব্দের সাদৃশ্যে অপরিচিত পর্তুগীজ শব্দ 'আনানস' হলো 'আনারস', পিপাসা>পিয়াসা,-এর সাদৃশ্যে 'তৃষ্ণা' থেকে 'তিয়াষ' এইরূপে, 'ত্বরিত' এবং 'তড়িৎ'—দ্রুততা-বাচক এই শব্দ দু'ইটির প্রভাবে 'ঝটিৎ'।

(৩) **জোড়কলম শব্দ** (Portmanteau word)—দুটি-শব্দের দুটি অর্থ জোড়া দিয়ে নোতুন শব্দ তৈরি হ'লে তাকে বলে 'জোড়কলম' শব্দ। আরবী ভাষার 'মিন্নৎ'+বাং 'বিনতি'=মিনতি, অরি+বৈরিতা=ঐরিতা, ধোঁয়া+কুয়াসা=ধোঁয়াসা, সিংহ+ব্যাঘ্র=সিংঘ্র, হাঁস+সজারু=হাঁসজারু, নিশ্চল+চুপ=নিশ্চুপ, চন্দ্রমা+চন্দ্রিকা=চন্দ্রিমা, চন্দ্রাতপ+স্কন্ধাবার=চন্দ্রাবার, মোটর+হোটেল=মোটেল। জেদী+তেজালো=জেদালো, Smoke+fog=Smog, Europe+Asia=Eurasia।

(৪) **সংকরামিশ্র শব্দ** (Hybrid word)—একাধিক জাতীয় ভাষার শব্দের মিশ্রণে অথবা শব্দ ও প্রত্যয় / বিভক্তির মিশ্রণে 'সংকর' বা 'মিশ্র' শব্দ হয়। বাং কহা+সং তব্য=কহতব্য, বাং নি=ফা খরচা=নিখরচা, বাং ধাতু 'কাট্'-এর সঙ্গে সংস্কৃত প্রত্যয়-উপসর্গ যোগ করে 'অকাট্য', পর্তুগীজ 'পাও'+হিন্দী রোটি=পাওরুটি, মাস্টার+ই=মাস্টারি, জজিয়তি।

(৫) **লোকনিরুক্তি / লোকব্যুৎপত্তি** (Folk Etymology)—অপরিচিত অথবা বিদেশি কিংবা দুরুচ্চার্য শব্দ পরিচিত অল্পবিস্তর সমধ্বনিবিশিষ্ট শব্দের সাদৃশ্য লাভ করলে তাকে বলা হয় লোকনিরুক্তি। ইং 'আর্মচেয়ার' ধ্বনিসাম্যের খাতিরে বাংলায় হ'য়েছে 'আরামচেয়ার' বা 'আরাম কেদারা'। এই 'আরাম' শব্দটিকে বাংলা ধরে নিয়ে আবার তার ইংরেজি করা হয়েছে 'Easy chair'—(কিন্তু কোন ইংরেজ এ শব্দ বুঝবে না—তারা একে বলে 'Deck chair')। ধনাধিপতি দেবতা যক্ষরাজ কুবের, অতএব 'টাকার কুবের' শব্দের মানে বোঝা যায়। 'কুবের' সাধারণ লোকের অপরিচিত এবং গল্পে শোনা যায়—কুমীরের পেটে সোনাদানা পাওয়া যায়, অতএব 'টাকার কুবের' ধ্বনিসাম্যের সুযোগে লোকমুখে রূপ পেল 'টাকার কুমীর'।

প্রায় অশিক্ষিত সদর-দরজা-রক্ষীর মুখে শোনা যায় 'হুকুমদার' কিংবা 'হুকুম-সদর'—এই তাৎপর্যহীন শব্দ। আসলে শব্দটি ইং 'who comes there'—অর্থবোধ গ্রহণে অক্ষমের মুখে পরিচিত শব্দ-সাদৃশ্যে উক্ত রূপ লাভ করেছে। মাকড়সা নাভিতে উর্ণা বোনে, এই লোকবিশ্বাসের ফলে তার 'উর্ণবাভ' নাম (উর্ণা বয়ন করে যে) হ'য়ে দাঁড়ালো 'উর্ণনাভ'। অঙ্গরাগ লেপনকে বলে 'উদ্বর্তন', ধ্বনিপরিবর্তনে উদ্বর্তন—উবট্টন—উবটন—'র'-আগমনের ফলে 'রুবটন'—লোকনিরুক্তির ফলে 'রূপটান'। 'উপকথা'-ও 'র'-আগম এবং লোকনিরুক্তির ফলে 'রূপকথা'—অথবা অপূর্ব কথা—অপরূপ কথা—('অপ'-বর্জিত হয়ে) রূবকথা>রূপকথা (লোক-নিরুক্তির ফলে)। বিদেশি violin এভাবেই হয়েছে 'বাহুলীন'। লজেন্স (lozenges) চুষে খাওয়া হয়, অতএব 'ল্যাবেঞ্চুশ, লবঞ্চুশ' হয়ে গেলো। বুড়ো বয়সে নানা কারণে বিভ্রম হ'তে পারে, অতএব 'ভ্রমাতি' থেকে জাত 'ভীমরতি' বলে একটি শব্দ দাঁড়িয়ে গেল। অথচ শব্দটি 'ভীমরাত্রী>ভীমরথী' থেকেই আসা সম্ভব। এর অর্থ সাতাত্তর বৎসর সাত মাসের সপ্তম রাত্রি—সে রাত্রি অনতিক্রমণীয়া। 'শন-পাপড়ি' শব্দটি মূলে হিন্দীতে ছিল 'শোভন পাবড়ি', তা' 'শোহন পাপড়ি' হ'য়ে বাংলায় শন্ তন্তুর সাদৃশ্যে রূপান্তরিত হয়েছে শনপাপড়িতে। 'বিষফোড়া' শব্দটি মূলে বিস্ফোটক—অতিশয় বিষাক্ত, এই বিশ্বাসে লোকনিরুক্তিতে বিষমচ্ছেদ (তাহা দ্রঃ) করে হ'লো বিষফোড়া।

(৬) **বিষমচ্ছেদ/ভ্রান্তিবিশ্লেষ/নিষ্কাশন** (Metanalysis)—শব্দের বিশ্লেষণ যেভাবে হওয়া উচিত, অনেক সময় সাদৃশ্য-আদি কারণবশতঃ সেভাবে না হ'য়ে বিকৃতরূপে হয়ে থাকে, যার ফলে নোতুন শব্দ বা প্রত্যয়েরও উদ্ভব ঘটতে পারে—এরূপ বিকৃত বিশ্লেষণকে 'বিষমচ্ছেদ' বলা হয়। 'অসুর' শব্দের প্রকৃত বিশ্লেষণ ছিল 'অস্+উর', এটি ছিল প্রশংসাবাচক; পরবর্তীকালে শব্দটি যখন নিন্দাবাচক হ'লো, তখন তার বিশ্লেষণ হ'লো—'ন সুর' অর্থাৎ যে সুর নয়—এইভাবে দেববাচক নোতুন শব্দ সৃষ্টি হ'লো 'সুর'। 'বিধবা' শব্দটি মূলতঃ ছিল মৌলিক, এর বিশ্লেষণ হয় না। কিন্তু শব্দের প্রথম অক্ষর 'বি'-কে সাদৃশ্যবশতঃ উপসর্গরূপে বিবেচনা করে একটা ভ্রান্ত বিশ্লেষণ করা হলো—বি (বিগত) ধব (স্বামী) যে নারীর। স্বামি-বাচক 'ধব' নামক নোতুন শব্দের সৃষ্টি হ'লো। ভাগলপুরের চিঠি-বিলিকারক পিওন একবার এক চিঠি হাতে নিয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছিল 'মচ্ছর'-বাবুকে। কেউ তার সন্ধান দিতে না পারলেও শেষ পর্যন্ত এক ভদ্রলোক চিঠির ঠিকানা পড়ে পিওনকে নিয়ে গেলেন সাহিত্যিক শরৎচন্দ্রের বাড়িতে, কারণ তিনিই এই চিঠির প্রাপক। জনৈক ব্যক্তি চিঠির উপরে নাম লিখেছিল সংস্কৃত সন্ধির নিয়ম

মেনে, ফলে—শ্রীমৎ+শরৎ+চন্দ্র=শ্রীমচ্ছরচ্চন্দ্র হ'য়ে গেলেন। পিওন আবার বিষমচ্ছেদ ঘটিয়ে অর্থাৎ গোটা শব্দের মুণ্ডু আর লেজটুকু খসিয়ে সারটুকু বের ক'রে নেবার ফলেই তিনিই 'মচ্ছর' বাবু হ'য়ে গেলেন। সং 'নবরঙ্গ' থেকে ফা' নারাঙ্গি; ইংরেজিতে 'একটি নারাঙ্গি' হ'লো a norange, বিষমচ্ছেদের ফলে an orange, নোতুন শব্দ হ'লো orange=কমলালেবু। এইভাবেই 'বরগীর', 'মুহুরীর', 'করবীর', প্রভৃতি শব্দের শেষ 'র'-টিকে ভ্রান্তিবশতঃ ষষ্ঠী বিভক্তির চিহ্নরূপে গ্রহণ করে অঙ্গচ্ছেদ করা হ'লো। ফলে শব্দগুলো হয়ে দাঁড়ালো যথাক্রমে 'বরগী', 'মুহুরী', 'করবী'। এইভাবেই হয়েছে 'পরদীপ (=প্রদীপ) মালা নগরে নগরে'>'পর দীপমালা নগরে নগরে', 'বিদ্যাস্থানেভ্যঃ এবচ'—বিদ্যাস্থানে ভয়ে বচ' প্রভৃতি। 'হরেক রকম বাজি—হরে কর কম বা'। 'বিস্ফোটক' বিষমচ্ছেদের ফলে হয় 'বিষ ফোটক', কিন্তু আসলে বি (বিশেষ) স্ফোটক (ফোড়া)। আমরা কোন জিনিশ 'আল-গোছে' তুলে নিই, কিন্তু শব্দের দু'টি পৃথক্ অংশই অর্থহীন মূল বিভাজনটা হ'বে 'আলগ্-সে'।

(৭) **অন্যোন্য ধ্বনিবিপর্যাস** (Spoonerism)—পাশাপাশি অবস্থিত শব্দগুলোর কোন কোন অক্ষরের যদি স্থান বিনিময় হয় এবং একটা আপাত অর্থ দাঁড়ায় তবে তাকে অন্যোন্য ধ্বনিবিপর্যাস বলা হয়। ক্যাম্বিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ স্পুনার প্রায়শঃ এরূপভাবে শব্দ গুলিয়ে ফেলতেন বলেই তাঁর নামে প্রক্রিয়াটির নামকরণ হ'য়েছে। তাঁর নিজস্ব উক্তি বলে কথিত—Fetch me my rugs and bags—স্থলে Fetch me my bugs and rags; তিনি তাঁর এক ছাত্রকে বল্‌তে চেয়েছিলেন—You have wasted a whole term, কিন্তু বলেছিলেন You have tasted a whole warm। বাংলায় প্রচলিত ঠাট্টা—'এক চাপ কা', 'কশুরে জৈ' (যশুরে কৈ)। বর্ষাকালে বাসের এক সহযাত্রীর কাছে ভাড়ার জন্যে কন্‌ডাক্টার বারবার তাগিদ করলে ভদ্রলোককে বল্‌তে শুনেছিলাম, 'ছাতে হাতি, পয়সা দিই কি করে?' শুনে চমকে উঠেছিলাম। পরে বুঝেছিলাম, তিনি বল্‌তে চেয়েছিলেন 'হাতে ছাতি'।

(৮) **শব্দবিভ্রম** (Malapropism)—বাক্যে এক শব্দের স্থলে প্রায় সমধ্বনিবিশিষ্ট অথচ অন্যার্থক শব্দের ব্যবহারে শব্দবিভ্রম হয়। শেরিডান (Sheridan)-এর *The Rivals* নামক নাটকের Mrs Malaprop নামক এক চরিত্রের মুখে এরূপ অনেক কথা আছে বলেই এই ধ্বনি প্রক্রিয়াটির এরূপ নামকরণ করা হ'য়েছে। একটি উক্তি—'You will promise to illiterate him from your memory'—এখানে

অভিপ্রেত শব্দ ছিল obliterate। গিরিশ ঘোষের 'প্রফুল্ল' নাটকে আছে—'আমি তোমার সহিত উদ্বন্ধনে আবদ্ধ হইতে ইচ্ছা করি' ('উদ্বাহবন্ধন' স্থলে)। এজাতীয় 'গলাধাক্কা' স্থলে 'গলাধঃকরণ', 'গাত্রোত্থান'>'গাত্রোৎপাটন' প্রভৃতি।

(৯) **পুনর্গঠিত/পূর্বস্তরীয় শব্দগঠন** (Back formation)—অসংস্কৃত শব্দের সংস্কার সাধন ক'রে তাকে একটা সংস্কৃত রূপদান অথবা কোন শব্দের একটা আনুমানিক মূলরূপ গঠনকে পুনর্গঠিত শব্দ বলা যায়। গ্রীক Kamelos থেকে সংস্কৃত ক্রমেলক, বিদেশী তামাককে 'তাম্রকুট' নাম দান প্রভৃতি।

(১০) **ভূয়া শব্দ** (Ghost word)—যে শব্দের কোন মূল নেই, অথচ এটাকেই মূল শব্দ বলে ধরে নেওয়া হয়, তাকে বলে ভূয়া শব্দ। 'প্রতিমা নিরঞ্জন' শব্দটি বহু প্রচলিত অথচ 'নিরঞ্জন' শব্দটি যে অর্থে ব্যবহার করা হয়, তার মূল নেই। সম্ভবত 'নীরাজন'+'নীরমজ্জন' দু'য়ের যোগে শব্দটির সৃষ্টি। 'পোতা হইয়াছে'—এই অর্থে 'প্রোথিত' শব্দটিও বহু প্রচলিত, কিন্তু সংস্কৃতে কোন 'প্রোথ্'/'প্রথ্' ধাতুই নেই। 'স্তোকবাক্য' অর্থহীন, অথচ খুবই প্রচলিত, সম্ভবতঃ 'স্তোতবাক্য'ই ভ্রান্ত উচ্চারণে 'স্তোকবাক্য' হয়ে গেছে।

(১১) **সমরূপ / সমনাম শব্দ** (Homonym)—বিভিন্ন শব্দ সমমুখ ধ্বনি-পরিবর্তনের ফলে যদি একই রূপ লাভ করে, তবে তাকে বলা হয় সমরূপ শব্দ। এখানে সমরূপ শব্দগুলি বস্তুতঃ প্রত্যেকটি পৃথক্ শব্দ, ধ্বনি-পরিবর্তনের ফলে একই রূপ লাভ করেছে, এদের কোনটিকেই বহু-অর্থবোধক এক শব্দ বলে গ্রহণ করা যায় না। 'বপন' এবং 'বয়ন'—দু'টি শব্দেরই পরিবর্তিত রূপ 'বোনা'; 'প্লীহা' এবং 'পিত্তল'—দুটিরই পরিবর্তিত রূপ 'পিলে'; সহ্য করি>সই, সখী>সই, সহি (signatuie)>সই।

(১২) **সমধ্বনি শব্দ** (Homophone)—বিভিন্ন শব্দ সমমুখ ধ্বনি-পরিবর্তনের ফলে যদি একই ধ্বনিরূপ লাভ করে অথচ বানানে পৃথক্ থাকে, তবে তাদের সমধ্বনি শব্দ বলা হয়। সোনা, শোনা; যায়, জায়।

(১৩) **সমমুখধ্বনি-পরিবর্তন** (Convergent phonemic change)—বিভিন্ন শব্দ যদি ধ্বনি-পরিবর্তনের ফলে একই পরিণতি প্রাপ্ত হয় (রূপে কিংবা ধ্বনিতে), তবে এই ক্ষেত্রে ঐ সমস্ত শব্দের সমমুখ ধ্বনি-পরিবর্তন ঘটেছে বল্‌তে হয়। (দৃষ্টান্ত : উপরে দ্রঃ)

(১৪) **বিমুখ ধ্বনি পরিবর্তন** (Divergent phonemic change)—এক শব্দ যদি ধ্বনি-পরিবর্তন-বশতঃ একাধিক রূপ গ্রহণ করে, তবে সেই প্রক্রিয়াকে বলা

চলে 'বিমুখ ধ্বনি-পরিবর্তন'। সং মহিষ—মোষ, ভৈস ; মেঢ্র>মেড়া, ভেড়া ; দীপবর্তিকা>দিয়াবাতি, দেউটি ; ঘটিকা>ঘড়ি, ঘটি ; গ্রন্থি>গাঁথি, গাঁটি চক্র>চরকা, চাকা ; কক্ষ>কাঁখ, কাছ।

(১৫) **অনুকার শব্দ** (Echo word)—যদি একটি শব্দের ধ্বনি-সাদৃশ্যে অপর একটি অর্থহীন শব্দ তৈরি হ'য়ে পূর্ব শব্দের সঙ্গে যুক্ত হয়ে সমগ্রভাবে সমাসবদ্ধবৎ যুক্ত শব্দটিকে বিশেষ অর্থযুক্ত করে, তবে তাকে বলা হয় অনুকার শব্দ। অনুকার শব্দটির নিজস্ব কোন অর্থ নেই। বই-টই, কাপড়-চোপড়, বাড়ি-ফাড়ি, গান-টান, ভাত-ফাত—দ্বিতীয় শব্দটি অনুকার।

(১৬) **অনুগামী শব্দ** (Dependent/Tag word)—যদি কোন একটি শব্দের সঙ্গে অপর একটি সমধ্বন্যাত্মক শব্দ ব্যবহৃত হয়, যার নিজস্ব অর্থ থাকলেও স্বাধীন ব্যবহার নেই, তবে তাকে বলে অনুগামী শব্দ। রাজা-রাজড়া, গাছ-গাছড়া, নাতি-নাতকুড়, পাথ-পথালি।

(১৭) **সমার্থক অনুগামী শব্দ** (Tautologous compound)—সমার্থবাচক দুটি শব্দের যোগাযোগ হলে পরের শব্দটিকে সমার্থক অনুগামী শব্দ বলে। এই শব্দটির অর্থ এবং স্বাধীন ব্যবহার আছে। বইপত্র, মামলামোকদ্দমা, দাবিদাওয়া, লেখাপড়া, আঁকাজোকা।

(১৮) **মুণ্ডমাল শব্দ** (Acrostic word)—কোন বাক্যাংশের শব্দসমূহের আদি অক্ষরযোগে গঠিত শব্দকে মুণ্ডমাল শব্দ বলা হয়। গুপাবাবা (গুপী গাইন বাঘা বাইন), সসেমিরা (চারিটি সংস্কৃত শ্লোকের আদি শব্দ, 'সম্ভাব, সেতুবন্ধ, মিত্রদ্রোহী, রাজা'—এদের আদি অক্ষর নিয়ে গঠিত), স. সা. গু., গ. সা. গু. পি-পু-ফি-শু (পিঠ পুড়ে, ফিরে শুই), B. A. (Bachelor of Arts), M. A., A. B. T. A. (All Bengal Teachers Association), RADAR (Radio Detective and Ranging), আলি-কালি (অ-কারাদি স্বরবর্ণ এবং ক-কারাদি ব্যঞ্জনবর্ণ), সরগম/সারেগামা, O. K. (All Correct) NEWS (অনেকে মনে করেন North, East, West, South—সবদিক থেকে আসা সংবাদ), খ্রীঃ পূঃ (খ্রীষ্ট-পূর্ব)।

(১৯) **খণ্ডিত শব্দ** (Clipped word)—গোটা শব্দের অংশবিশেষকে যখন পূর্ণশব্দের অর্থবাহক-রূপে ব্যবহার করা হয়, তখন তাকে বলেন 'খণ্ডিত শব্দ'। খাইবার বস্তু>'খাবার', বানারসী শাড়ি>'বানারসী' ; বাইসাইকেল>'বাইক' ;

বর্তমানে এরূপ বহু ইংরেজি খণ্ডিত শব্দ বাংলায় ব্যবহৃত হচ্ছে,—'ক্যালি', 'ফন্ডা' প্রভৃতি।

(২০) **বাক্য শব্দ** (Sentence word)—কখন কখন গোটা বাক্য কিংবা বাক্যাংশ শব্দরূপে ব্যবহৃত হয়, তাকে বলে বাক্য শব্দ। সাধারণতঃ এক ভাষার এরূপ বাক্য বা বাক্যাংশই অপর ভাষায় শব্দরূপে ব্যবহৃত হয়। ইতিহাস (সং—ইতি-হ-আস=এরূপ ছিল), কিংবদন্তী (কিং বদন্তি=কি বলে), তন্নতন্ন (তৎ ন তৎ ন=এটা নয়, এটা নয়), যৎপরোনাস্তি (যৎ পরঃ ন অস্তি=যার পর কিছু নেই), নাস্তানাবুদ (ফা-ন অস্ত্ ন বুদ্—না আছে, না ছিল), ডো নট্ কেয়ার (do not care) মনোভাব, আন্নাকালী (আর-না কালী)।

ধ্বন্যাত্মক শব্দ (Onomatopoetic word)

ধ্বনির অনুকরণে সৃষ্ট শব্দকে বলা হয় 'ধ্বন্যাত্মক শব্দ'। বাংলা শব্দ-ভাণ্ডারে এ জাতীয় শব্দকে 'দেশি শব্দ'-রূপে গ্রহণ করা হ'লেও এদের অনেক শব্দের মূলে তৎসম শব্দও পাওয়া যেতে পারে। তবে এভাবে ধ্বন্যাত্মক শব্দের জাতি-বিচার ক'রে তার কৌলীন্যের সন্ধান পাওয়া যাবে না, কারণ ধ্বন্যাত্মক শব্দ যে কোন ভাষারই নিজস্ব সম্পদ, তেমনি সম্ভবতঃ আদি সম্পদও বটে। কোন কোন ভাষাতাত্ত্বিক গবেষক ভাষার উদ্ভব-সম্পর্কিত মতবাদে ধ্বন্যাত্মক শব্দকেই আদিরূপ বলে উল্লেখ ক'রে থাকেন। প্রাচীন সংস্কৃত ভাষায়ও যে বেশ কিছু ধ্বন্যাত্মক পূর্ণ শব্দ মর্যাদার সঙ্গে গৃহীত হয়েছিল, তার প্রমাণ রয়েছে—'মর্মর, চঞ্চল, ঝঙ্কার, টঙ্কার, ঘন্টা, বর্বর, কর্কশ, কাক' প্রভৃতি শব্দে। ইংরেজি ভাষাতেও যথেষ্ট ধ্বন্যাত্মক শব্দ ব্যবহৃত হয়, যেমন—hissing, whispering, dazzling, zigzag' প্রভৃতি। তবে পরিমাণগত-ভাবে বাংলায় ব্যবহৃত এ জাতীয় শব্দের সংখ্যা অনেক বেশি।

বাংলা ভাষায় ধ্বন্যাত্মক শব্দের ব্যবহার-বিষয়ে রবীন্দ্রনাথই প্রথম ভাষা-বিজ্ঞানীদের এবং সর্বসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং 'ধ্বন্যাত্মক শব্দ' নামক একটি প্রবন্ধ রচনা ক'রে তাঁর 'শব্দতত্ত্ব' গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট করেন। তবে এ বিষয়ে আরও বিস্তৃততর আলোচনা করেন রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী তাঁর 'শব্দ-কথা' গ্রন্থের 'ধ্বনিবিচার' নামক প্রবন্ধে। ধ্বন্যাত্মক শব্দগুলি আমাদের আপাত-বিচারে অর্থহীন ধ্বনিসমষ্টি মনে হ'লেও এগুলি যে আমাদের খেয়ালখুশিমতো সৃষ্টি হয় নি, তিনি প্রভূত দৃষ্টান্ত-সহকারে তা' বুঝিয়ে দিয়েছেন। তিনি বলেন : "প্রত্যেক ধ্বনির একটা নৈসর্গিক তৎপরতা আছে—এই তৎপরতা প্রত্যেক ধ্বনির উৎপাদক বস্তুর স্বাভাবিক গুণে প্রতিষ্ঠিত। কঠিন দ্রব্যের আঘাতে ট-বর্গের ধ্বনি জন্মে ; কোমল দ্রব্যের আঘাতের

সহিত ত-বর্গের ধ্বনির সম্পর্ক ; ফাঁপা জিনিষের ভিতর হইতে বায়ু নিঃসরণে প-বর্গের ধ্বনি জন্মে ; ইত্যাদি। প্রত্যেক ধ্বনি স্বভাবতঃ কাঠিন্য, তারল্য, কোমলতা, শূন্যগর্ভতা প্রভৃতি এক একটা বস্তু ধর্মের সম্পর্ক রাখে এবং সহকারিতা রাখে, এবং প্রত্যেক ধ্বনি শ্রুতিগত হইবামাত্র ঐ ঐ ধ্বনি স্মরণ করায় বা ব্যঞ্জনা করে।" তিনি আরও বলেন "প্রত্যেক বর্গের অন্তর্গত ধ্বনিগুলির এই রূপ এক-একটা স্বাভাবিক ব্যঞ্জনা আছে। প্রত্যেক বর্গের অন্তর্গত ধ্বনির মধ্যে আবার অল্পপ্রাণতা বা মহাপ্রাণতা, ঘোষবত্তা বা ঘোষহীনতার ভেদে সেই তাৎপর্যের ইতর-বিশেষ হইয়া থাকে। প-বর্গের বর্ণ মধ্যে প্ ও ফ উভয়েই বায়ুপূর্ণতা বা শূন্যগর্ভতা স্মরণ করায় ; কিন্তু প' র চেয়ে ফ'র জোর যেন অধিক ; ব'র চেয়ে ভ'র স্থূলতা যেন অধিক। এই স্থূলতার আধিক্যে যাবতীয় ভ-কারাদি শব্দ স্থূলতা মনে আনে এবং স্থূলতার সহকারী আলস্য, ঔদাস্য প্রভৃতি মানসিক ধর্মও মনে আনে। মূলে যাহা ধ্বন্যাত্মক বা নৈসর্গিক ধ্বনির অনুকৃতিজাত, তাহার অর্থ ও তাৎপর্য ক্রমে বিস্তার লাভ করিয়া ব্যঞ্জনার দৌড় ক্রমে বাড়িয়া যায়।"

পূর্বোক্ত আলোচনাটি আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর বাংলা ভাষার প্রেক্ষাপটে করলেও বস্তুতঃ পৃথিবীর সমস্ত ভাষাতেই যে ধ্বন্যাত্মক শব্দের এ জাতীয় মূল্য স্বীকৃত হয়ে থাকে, তার অপর একটি উল্লেখের মধ্যেও আমরা ধ্বনি-বিশেষের এজাতীয় নৈসর্গিক তথা প্রাকৃতিক গুণের পরিচয় পাই, *The Making of English* গ্রন্থে হেনরি ব্রাড্‌লি বলেন : "Quite often the sound of a word have a real intrinsic significance; for instanee, a word with a long vowel, which we naturally utter slowly, suggests the idea of slow movement. A repetition of the same consonant suggests a repetition of movement. Sequences of consonants which are harsh to the ear, or involve different muscular effort in utterance, are left to be appropriate in words descriptive of harsh or violent movement."

পূর্বোক্ত আলোচনা সূত্রে জানা গেলো, বিভিন্ন ধ্বনি বিভিন্ন প্রকার ভাব-প্রকাশক। নিম্নে আমরা যথানুক্রম বিভিন্ন ধ্বন্যাত্মক শব্দ এবং তাদের ভাব-প্রকাশক ক্ষমতার পরিচয় পেতে চেষ্টা করবো।

প-বর্গীয় ধ্বনির উচ্চারণ-কালে মুখের অভ্যন্তরস্থ আবদ্ধ বায়ু বেরিয়ে আসে, যে সমস্ত শব্দের আদিতে প-বর্গীয় কোন বর্ণ আছে, সাধারণতঃ তাতে শূন্যগর্ভতা এবং বায়ুনিঃসরণের ভাবই প্রকাশ পেয়ে থাকে।—পচ্‌পিচে, পটকা, পাপড়, পিনপিনে, পুটুলি, প্যাচপেচে, পোটলা।' মহাপ্রাণ ফ-এর একটু জোর বেশি—ফনফনে, ফাঁকা,

ফানুস, ফিকে, ফুচকা, ফুলকো, ফেনা, ফোলা। ব-য়ে শূন্যগর্ভতা আরও প্রকট—বক্‌বকম্‌, বাঃ, বিজবিজ, বুদ্বুদ, বুজকুরি, ব্যাজবেজে, বোমা, বোঁবোঁ। 'ভ'-য়ে শূন্যতা সবচেয়ে বেশি—ভম্‌ভোলা, ভাসাভাসা, ভুটভাট, ভুস্‌ভুসে, ভেরি, ভ্যা, ভোঁ ভোঁ। অনুনাসিক ধ্বনি 'ম' ধ্বনিকে একটু মৃদু একটু কোমল ক'রে দেয়—মচ্‌মচ্‌, মিউ, মুড়ি, মিনমিনে ম্যাম্যা, মোটা। অপর ধ্বনির সংস্পর্শে অবশ্য এদের রূপান্তর হ'তে পারে।

ত-বর্গের ধ্বন্যাত্মক শব্দ কোমলতা-বাচক। তকতকে, তাই তাই, তিড়িং-বিড়িং, তুড়ি, থই থই, থপাস, থাবড়া, থেঁতলান। 'দ' এবং 'ধ' ঘোষবর্ণ—এতে একটু গাম্ভীর্য বেশি'—দমকা, দামামা, দাউ-দাউ, দুরদার, ধপধপ, ধাঁ ক'রে, ধিকিধিকি, ধুপধাপ, ধ্যাবড়ান, ধোঁকা। অনুনাসিক 'ন'-যোগে কাঠিন্য-বর্জিত কোমলতা প্রকাশ পায়—নড়বড়, নাদুস-নুদুস, নিশ্‌পিশ্‌।

ট-বর্গের ধ্বনিগুলির সঙ্গে আছে কাঠিন্য ও রূঢ়তার সম্পর্ক। টক্‌টক্‌, টাক্‌রা, টিপির টিপির, টুকটুকে, টেঙোস্‌ টেঙোস্‌, টোটো, ঠকাঠক, ঠোকরান। ঘোষধ্বনিতে অধিকন্তু গাম্ভীর্য যুক্ত হয়। —ডম্বরু, ডিন্ডিম, ডুবকি, ঢাক, ঢোল, ঢেঁড়ি। অনুনাসিক ধ্বনি যুক্ত হ'লে একটা ধাতব মধুর ধ্বনির অনুভূতি জাগে—টং, টন্‌ঠন্‌, টিন্‌টিন্‌, ঠং, ড্যাং ড্যাং।

চ-বর্গের ধ্বনির সঙ্গে একটা তরলতা ও চপলতার সম্পর্ক রয়েছে। রবীন্দ্রনাথের 'চল চপলার চকিত চমকে করিছে চরণ বিচরণ'—এর মধ্যেও একই ভাবের প্রকাশ।—চন্‌চন্‌, চিটেল, চুরচুরে, চুকানো, চ্যাপচ্যাপে, চোপসা, ছলছল, ছাট, ছিচকাদুনে, ছোঁড়া, ছোলা, জমজমাট, জিলজিলে, জ্যালজেলে, ঝন্‌ঝন্‌, ঝাঁ ঝাঁ, ঝিরঝির, ঝুরঝুর।

ক-বর্গের ধ্বনিগুলি অপর ধ্বনির সহযোগে নানাবিধ ভাবপ্রকাশে সম্ভব। কচ্‌, কপ্‌, কা-কা, কিড়মিড়, কিল্‌কিল, কুটকুট, কুঁইকুঁই, কেঁউমেউ, কিটকেটে, কুচকুচে, খটাস্‌, খিক, খিটিমিটি, খুটখাট, খুৎখুতি, খ্যানখেনে, গজর-গজর, গাঁই-গুঁই, গিস্‌গিস, গুম, গণগণে, গোঁ-গোঁ, ঘড়্‌ঘড়, ঘিন্‌ঘিনে, ঘুসঘুসে, ঘেউঘেউ, ঘ্যাচর ঘ্যাচর।

র-য়ে কিঞ্চিৎ কাঠিন্য এবং ল-য়ে কোমলতার ভাব প্রকাশ করে। —রেরে, রিরি, রিন্‌ঝিন, রুমঝুম, লটপট, লিকলিকে, লে লে।

উষ্মধ্বনির সঙ্গে কিছুটা গতির সম্পর্ক আছে।—সড়াৎ, সন্‌সন্‌, সা, সাঁই-সাঁই, সিরসির, সুড়সুড়ি, সুড়ুৎ, সোঁ, স্যাৎসেতে, সোঁসোঁ।

মহাপ্রাণ ধ্বনি হ্-এর যোগে উগ্রতা, শক্তি-সামর্থ্য, বেগ প্রভৃতি প্রকাশ পায়।—হড়াৎ, হন্‌হন, হাউমাউ, হাঁ-হাঁ, হি-হি, হিড়-হিড়, হাপুস, হুটহাট, হুস্‌হুস, হে-হে, হ্যাট-হ্যাট, হো-হো।

অনেক ধ্বন্যাত্মক শব্দেরই শ্রুতিগ্রাহ্য কোন অনুভূতির পরিবর্তে একপ্রকার চিত্রাত্মক গুণের ধর্ম দেখা যায়। অনেকেই তাই এ জাতীয় শব্দকে 'দৃশ্যাত্মক শব্দ'-রূপে অভিহিত ক'রে থাকেন। যেমন—'টকটকে লাল', ফিন্‌ফিনে জ্যোৎস্না'। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ এর ধ্বন্যাত্মক গুণটিও স্বীকার করেন। তিনি বলেন : "টকটক শব্দ কাঠের ন্যায় কঠিন পদার্থের শব্দ।...ঘোর লাল আমাদের ইন্দ্রিয় দ্বারে যে আঘাত করে, তাহার যদি কোন শব্দ থাকিত, তবে আমাদের মতে টকটক শব্দ। আবার সেই রক্তবর্ণ যখন মৃদুতর হইয়া আঘাত করে, তখন তাহার কটকট শব্দ টুকটুক শব্দে পরিণত হয়।"

উপরের দৃষ্টান্তটিতে শব্দে শুধু স্বরধ্বনির পরিবর্তনের সাহায্যেই লালের উগ্রতা কমিয়ে দেওয়া গেলো। এ জাতীয় সামান্যতম পরিবর্তনেও যে ধ্বনির মেজাজ পাল্টানো যায় তার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথ বলেন : "অবস্থাবিশেষে শব্দের হ্রস্ব-দীর্ঘতা আছে ; ধপ করিয়া যে লোক পড়ে, তাহা অপেক্ষা স্থূলকায় লোক ধপাস করিয়া পড়ে। পাতলা জিনিস কচ করিয়া কাটা যায়, কিন্তু মোটা জিনিস কচাৎ করিয়া কাটে।"

আমাদের ইন্দ্রিয়গম্য যাবতীয় অনুভূতিকেই আমরা বিভিন্ন ধ্বন্যাত্মক শব্দের সাহায্যে প্রকাশ করতে পারি। যেমন, দর্শনেন্দ্রিয়ের সহায়তায় পাই—ধাঁ ক'রে, পন্ পন্ ক'রে, বোঁ করে, ভোঁ ক'রে, সাঁ ক'রে কিংবা সোঁ ক'রে চলে যাওয়া। এমন কি যাবতীয় বর্ণ-বৈচিত্র্যের আভাসও (টুক-টুকে, টকটকে, ধব্‌ধবে, ম্যাড়মেড়ে, মিশ্‌মিশে, ফ্যাকাসে রং) আমরা অনুভব করতে পারি। ধ্বনিমাত্রই তো শ্রুতিগম্য, কাজেই শ্রবণেন্দ্রিয়ের জন্য পৃথক্ দৃষ্টান্ত নিষ্প্রয়োজন। মানসিক ভাবের প্রতিফলনেও ধ্বন্যাত্মক শব্দ-ব্যবহার সার্থক। ম্যাজম্যাজ করা, মাটি মাটি করা, হু হু করা, ছম্ ছম্ করা প্রভৃতি।

অনেক ধ্বন্যাত্মক শব্দ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, বিশেষ বিশেষ ব্যঞ্জনধ্বনির সঙ্গে কয়েকটি বিশেষ স্বরধ্বনির যোগে কয়েকটি, বিশেষ ভাবের দ্যোতনা হয়। যেমন—'অ' যোগে সাধারণভাব, 'ই' যোগে ন্যূনতা, 'উ' যোগে কোমলতা এবং '-অ্যা' যোগে কর্কশতা বোঝায়। নিম্নোক্ত কয়েকটি শব্দে তার নিদর্শন :

কটকট	কিটকিট	কুটকুট	ক্যাটক্যাট
খচখচ	খিচখিচ	খুচখুচ	খ্যাচখ্যাচ
ঝরঝর	ঝিরঝির	ঝুরঝুর	ঝ্যারঝ্যার
মটমট	মিটমিট	মুটমুট	ম্যাটম্যাট

নবম অধ্যায়

রূপতত্ত্ব
(Morphology)

[এক] রূপমূল / পদাণু-বিচার (Morpheme)

ভাষাবিজ্ঞান তথা ব্যাকরণের অন্যতম আলোচ্য বিষয় : রূপতত্ত্ব বা morphology। রূপতত্ত্ব বলতে সাধারণভাবে শব্দ, পদ পরিচয়, পদের গঠন (সমাস, প্রত্যয়, বিভক্তি, উপসর্গ ইত্যাদি) প্রভৃতি বুঝিয়ে থাকে। ভাষা-বিজ্ঞান-আলোচনায় এতকাল ঐতিহাসিক বা কালানুক্রমিক এবং তুলনামূলক পদ্ধতিই প্রাধান্য পেয়ে আসছিল। সম্প্রতি আলোচনা-পদ্ধতির একটি মৌলিক পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে। অতি সাম্প্রতিক-কালের ভাষাবিজ্ঞানীদের একটা গোষ্ঠী বর্ণনামূলক ভাষাতত্ত্ব (Descriptive Linguistics) তথা সাংগঠনিক ভাষাতত্ত্বের (Structural Linguistics) উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। ফলতঃ ভাষাবিজ্ঞানের আলোচনা-পদ্ধতিও পাল্টে যাচ্ছে।

চার্লস এফ্ হকেট ভাষার মূল কাঠামোকে এইভাবে বিশ্লেষণ করেছেন : (1) the grammatic system : a stock of morphemes (রূপ ও বাক্যরীতি), (2) the phonology system : a stock of phonemes (ধ্বনিরীতি), (3) the morpho-phonemic system (রূপ-ধ্বনিরীতি), (4) the semantic system (শব্দার্থ পরিবর্তন) ও (5) the phonetic system (ধ্বনির উচ্চারণ ও শ্রুতি)। ভাষা তথা ব্যাকরণের আলোচনায় আমরা এখানে একটি নোতুন শব্দের সাক্ষাৎ পাচ্ছি—শব্দটি morpheme। এর বাংলা প্রতিশব্দরূপ ব্যবহৃত হ'চ্ছে 'রূপমূল', বা 'মূলরূপ', কেউবা বলেছেন 'রূপিম'; কিন্তু সম্ভবতঃ 'পদাণু' শব্দটি দ্বারাই morpheme-এর ভাবটি অপেক্ষাকৃত স্পষ্ট হয়। শব্দটি খুবই সাম্প্রতিককালের সৃষ্টি। প্রাচীনতর ভাষা-বিজ্ঞানীদের রচনায় শব্দটির সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না। অতএব এ বিষয়ে আলোচনারও কোন অবকাশ ছিল না।

বাক্যের অর্থময়তাযুক্ত ক্ষুদ্রতম অংশই **রূপমূল** বা **পদাণু**। 'কর্' একটি রূপমূল বা পদাণু, কারণ এর একটা অর্থ আছে এবং এটিকে যদি আরও বিশ্লেষণ করা যায় তাহলে তার কোন অংশেরই অর্থময়তা থাকে না, অতএব এটিই ক্ষুদ্রতম অংশ। আবার 'আ'ও একটি পদাণু কারণ এর অর্থময়তা আছে, তাই 'কর্'-এর

সঙ্গে যোগ করলে 'করা' একটা বিশেষ অর্থযুক্ত শব্দ নয়। উপর্যুক্ত দৃষ্টান্ত দুটির মধ্যে 'কর্' যেমন একটি পদাণু বা রূপমূল, তেমনি শব্দও বটে, কারণ এটি বাক্যে ব্যবহারযোগ্য, কিন্তু '-আ' তা নয়। যেমন একটি রূপমূলই একটি শব্দ হ'তে পারে, তেমনি একাধিক রূপমূলের সাহায্য নিয়েও শব্দ বা পদ গঠিত হ'তে পারে। Gleason রূপমূলকে বলেছেন 'smallest meaningful unit in the structure of a language'. রূপমূল শব্দের এমন এক অংশ যাকে আর ভাগ বা বিশ্লেষণ করা যায় না, ভাগ করলে এর অর্থ বিনষ্ট হবে অথবা অর্থান্তর ঘটবে। তিনি রূপমূলের আর একটি পরিচয় তথা শর্তের কথাও বলেন : "Morphemes are generally short sequences of phonemes. These sequences are recurrent....' অর্থাৎ এক বা একাধিক ধ্বনিমের সমন্বয়ে গঠিত রূপমূলটির বারবার ফিরে আসা চাই অর্থাৎ বিভিন্ন শব্দে তার ব্যবহারযোগ্যতা থাকা প্রয়োজন। পূর্বোক্ত দুটি দৃষ্টান্তেরই সেই যোগ্যতা রয়েছে ; 'কর্' রূপমূলটি 'করা' ছাড়াও 'করে' 'করতো', 'করি' প্রভৃতি অসংখ্য শব্দে এবং '-আ' পদাণুটিও এরূপ 'ধরা' 'চলা', 'নাচা' প্রভৃতি অসংখ্য শব্দে বার বার ফিরে আসে। ব্যাকরণ-আলোচনায় রূপমূলের ভূমিকা সম্বন্ধে তিনি বলেন : 'grammar is the study of morphemes and their combination'. অর্থাৎ রূপমূলের আলোচনাই ব্যাকরণের একমাত্র বিষয়।

আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানে রূপতত্ত্ব-বিষয়ক আলোচনাও যে প্রধানতঃ রূপমূলের আলোচনাতেই সীমাবদ্ধ, এ বিষয়ে একজন বিশিষ্ট ভাষাবিজ্ঞানী বলেন : "Morphology is the study of morphemes and their arrangements in the forming words. Morphemes are the meaningful units which may constitute words or parts of words." (Eugene a Nida)। অতএব দেখা যাচ্ছে রূপতত্ত্ব আলোচনায় রূপমূলই একমাত্র বিচার্য বিষয়।

রূপমূলকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয় : (১) মুক্ত রূপমূল (free morphemes) ও (২) বদ্ধ রূপমূল (bound morphemes)। এ প্রসঙ্গে স্মরণ রাখা দরকার যে রূপমূল মুক্ত কিংবা বদ্ধ যাই হোক্ না কেন, কোনপ্রকার রূপমূল বা পদাণুকে আর কোন ক্ষুদ্রতর অর্থযুক্ত রূপমূলে বিশ্লিষ্ট করা সম্ভবপর নয়। যাকে অনুরূপভাবে বিশ্লিষ্ট করা যায় না, শুধু তাদেরই রূপমূল/পদাণুরূপে স্বীকার করা চলে। Bernard Bloch এবং George L. Jrager তাঁদের *Outline of Linguistic Analysis* গ্রন্থে বলেছেন : "Any form, whether free or bound, which cannot be divided into smaller meaningful parts

is a MORPHEME."—যে সমস্ত রূপমূলের স্বাধীন ও একক ব্যবহার-যোগ্যতা আছে অর্থাৎ যে সমস্ত রূপমূলের সঙ্গে অপর কোন রূপমূল যোগ না করেই বাক্যে ব্যবহার করা যায়, তাদের বলা হয় মুক্তরূপমূল বা মুক্ত পদাণু। বিভিন্ন ভাষায় অনেক শব্দ, কিছু সর্বনামমূল এবং ধাতুমূল (verb roots) এর অন্তর্গত।—বাংলায় 'মা, ভাই, বোন্, আম' প্রভৃতি শব্দ 'তোমা, সে, তাহা' প্রভৃতি সর্বনাম শব্দ এবং (তুই) 'খা, দেখ্,' প্রভৃতি ধাতুমূলেরও স্বতন্ত্র ব্যবহারযোগ্যতা রয়েছে এবং এদের প্রত্যেকটিই অবিভাজ্য বলে এদের 'মুক্তরূপমূল' / 'মুক্ত পদাণু' বলা চলে। বলা বাহুল্য, এই বিচারে সংস্কৃত ভাষায় কোন মুক্তরূপমূল থাকা সম্ভব নয়। কারণ সংস্কৃত ভাষায় যে-কোন শব্দকে বিশ্লেষণ করলে মূলে পাওয়া যাবে একটি ধাতুমূল; তার সঙ্গে প্রত্যয়-বিভক্তি যোগ না করে কখনও বাক্যে ব্যবহার করা যায় না। যে সমস্ত রূপমূলের অর্থময়তা আছে অথচ স্বাধীনভাবে এককভাবে ব্যবহারযোগ্যতা নেই, অন্য রূপমূলের সঙ্গে যুক্ত হলেই তার অর্থময়তার তাৎপর্য বোঝা যায়, তাকে বলা হয় বদ্ধরূপমূল বা বদ্ধপদাণু। সর্ববিধ প্রত্যয় (Affix) যথা—আদ্যপ্রত্যয় বা উপসর্গ (Prefix), অন্ত্যপ্রত্যয় (Suffix), বিকরণ ও মধ্য-প্রত্যয় (Infix), শব্দ বিভক্তি ও ধাতু বিভক্তি (Inflections) এবং কিছু কিছু ধাতুমূল এই বদ্ধরূপমূলের অন্তর্ভুক্ত। 'প্র, পরা, অপ্, নি'-প্রভৃতি উপসর্গ, 'তা, ত্ব, অক্, বৎ' প্রভৃতি অন্ত্য প্রত্যয় 'কারয়তি, গময়তি' প্রভৃতি শব্দের মধ্যবর্তী 'অয়' বিকরণ বা মধ্যপ্রত্যয়', 'রা, দের, কে' প্রভৃতি শব্দবিভক্তি, 'ইতেছি, ও, বে' প্রভৃতি ক্রিয়াবিভক্তি; দা, 'আস' প্রভৃতি ধাতুমূল এবং 'মো', 'তো' প্রভৃতি সর্বনাম-মূলের স্বতন্ত্র ব্যবহারযোগ্যতা নেই অথচ অপর কোন পদাণুর সঙ্গে যুক্ত হ'লে অর্থযুক্ত শব্দ সৃষ্টি করতে পারে। অতএব এগুলিকে 'বদ্ধরূপমূল' / 'বদ্ধ পদাণু' বলা চলে। এক কথায় বলা চলে একক ব্যবহারযোগ্য সমস্ত শব্দ, বহু ধাতুমূল ও সর্বনামমূল মুক্ত রূপমূল ও সর্বনামমূল এবং সমস্ত প্রত্যয় বিভক্তি ও কিছু ধাতুমূল বদ্ধরূপমূল।

বর্ণনাত্মক ভাষাবিজ্ঞানের প্রথম প্রবক্তা L. Bloomfield আলোচ্য পদ্ধতিতে ভাষা-বিশ্লেষণের প্রেরণা লাভ করেছিলেন পাণিনি-রচিত 'অষ্টাধ্যায়ী' থেকে। পাণিনির ব্যাকরণকে তিনি বলেছেন, "the greatest monument of human intelligence. It describes with minutest details, every inflection, derivation and composition, and every syntactic usage of its author's speech. No other language to this day has been so perfectly described." পাণিনি যেভাবে সংস্কৃত ভাষার বিশ্লেষণ করেছেন, তেমনটি পৃথিবীর অপর কোন

ভাষায় কখনও হয়নি। কিন্তু পাণিনি বিশ্লেষণ পদ্ধতি-সম্পর্কে কিছু বলে না যাওয়ায় একালের ভাষাবিজ্ঞানীদের সেই পদ্ধতি আবিষ্কার করতে হচ্ছে। বস্তুতঃ পাণিনি যেমনভাবে সংস্কৃত ভাষার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম এবং পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করেছেন, পৃথিবীর অপরাপর ভাষাসমূহের, বিশেষতঃ আমেরিকার আদিম আদিবাসীদের বহু ভাষা—যে সমস্ত ভাষার কোন লিখিত সাহিত্য কিংবা ব্যাকরণ নেই, সেই সমস্ত ভাষার অনুরূপ বিশ্লেষণের প্রয়োজনেই সাম্প্রতিক বর্ণনাত্মক ভাষা-বিজ্ঞানের জয়যাত্রা শুরু।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য যে পাণিনি-কৃত শব্দ-বিশ্লেষণ আরও সূক্ষ্ম। বর্ণনাত্মক ভাষাবিজ্ঞানের হিসেবে যে সমস্ত শব্দ মুক্তরূপমূল-রূপে চিহ্নিত হয়, পাণিনির মতে সেগুলিও মুক্ত নয়। তাদেরও ক্ষুদ্রতর অণুতে বিশ্লেষণ ক'রে একাধিক বদ্ধরূপমূলে পরিণত করা হয় এবং সর্বশেষ দেখা যায়, সমস্ত শব্দের মূলেই রয়েছে বদ্ধরূপমূল-রূপে একটি ক্রিয়ামূল এবং তার সঙ্গে যুক্ত হয় আরও এক বা একাধিক 'বদ্ধমূল', যেগুলি কোন এক জাতীয় প্রত্যয়। অবশ্য এ জাতীয় বিশ্লেষণ সম্ভবতঃ ব্যুৎপত্তী সাহিত্যসম্পন্ন কোন ভাষাতেই মাত্র সম্ভবপর।

[দুই] শব্দ-বিচার

রূপমূল-সম্বন্ধে আলোচনা করতে গেলে দৃষ্টান্ত-আদির জন্যে কোন একটি ভাষাকে ভিত্তি করে করতে হয়। সুবিধের জন্য এখানে বাংলা ভাষাকেই গ্রহণ করা হ'লো। কোন বস্তু বা ভাববোধক একক ধ্বনি বা ধ্বনিসমষ্টিকে বলা হয় 'শব্দ'। বর্ণনাত্মক ভাষাবিজ্ঞানীদের মতে শব্দ চারভাবে গঠিত হ'তে পারেঃ—(১) একটি একক মুক্তরূপমূল একটি শব্দ হ'তে পারে। যেমন—'মা, সে, বোন্'। (২) একটি মুক্তরূপমূলে অপর একটি বা একাধিক বদ্ধরূপমূলের সাহায্যে শব্দ গঠন করতে পারে।—'ছেলে+মি=ছেলেমি', 'ভদ্র+তা=ভদ্রতা'। (৩) একাধিক, বদ্ধরূপমূল মিলিতভাবে শব্দ গঠন করতে পারে।—'দা+ও=দাও', 'আস+ছি=আসছি'। (৪) একাধিক মুক্তরূপমূলও মিলিতভাবে শব্দ গঠন করতে পারে।—'স্বর্গ+উদ্যান=স্বর্গোদ্যান', জমা+খরচ='জমা খরচ'।

প্রচলিত ব্যাকরণ-মতেও প্রায় অনুরূপভাবেই শব্দের শ্রেণীবিভাগ করা হয়। নামে ও সংখ্যায় গরমিল থাকলেও কার্যতঃ বিশেষ কোন পার্থক্য নেই।

ব্যাকরণমতে শব্দ দ্বিবিধ—মৌলিক বা স্বয়ংসিদ্ধ (Root words) এবং সাধিত শব্দ (Derived/composed words)। যে শব্দকে আর বিশ্লেষণ করা যায়

না, তাকে ভাঙতে বা বিশ্লেষণ করতে গেলে আর তার কোন অর্থ বজায় থাকে না, তাকেই মৌলিক বা স্বয়ংসিদ্ধ শব্দ বলে। বর্ণনাত্মক ভাষাবিজ্ঞানের মতে এগুলোই মুক্তরূপমূল। পূর্বোক্ত দৃষ্টান্তের 'এ, কে, ভাই, ছেলে (+মি), সাধু (+তা), স্বর্গ (+) উদ্যান'—প্রত্যেকটি মৌলিক শব্দ এবং প্রতিটিই মুক্তরূপমূল। এই প্রসঙ্গে একটা অতি প্রয়োজনীয় তথ্য জেনে রাখা দরকার। আচার্য সুনীতিকুমার বলেন, "অন্য ভাষা হইতে গৃহীত শব্দ, সেই ভাষার মৌলিক বা মূল শব্দ না হইলেও, বাঙ্গালা ভাষায় যদি সেগুলির বিশ্লেষ এবং বিশ্লেষ-অনুযায়ী ভগ্ন অংশের অর্থগ্রহ না হয়, তাহা হইলে বাঙ্গালার পক্ষে সেগুলি মৌলিক শব্দ বলিয়া গণ্য হইবার যোগ্য।" দৃষ্টান্তস্বরূপ তিনি 'হস্তী, মনুষ্য, আতিথ্য, বাজেয়াপ্ত, রোম্যাণ্টিক' প্রভৃতি শব্দের উল্লেখ করেছেন। প্রসঙ্গক্রমে বলে রাখা চলে, যে-যে ভাষা থেকে ঐ শব্দগুলো দৃষ্টান্তস্বরূপ গ্রহণ করা হয়েছে, সেই সেই ভাষায় এদের কোনটাই মৌলিক নয়। যেমন—সংস্কৃতে 'হস্তী' শব্দের বিশ্লেষণে হস্ত, মনু থেকে মনুষ্য, অতিথি থেকে আতিথ্য হয়েছে। এবং এগুলোকেও আবার বিশ্লেষণ করা চলে। কিন্তু খাঁটি বাংলা ব্যাকরণের নিয়মে এগুলি আর বিশ্লেষণযোগ্য নয় বলেই মৌলিক শব্দ, মুক্তরূপমূলও বটে। যাহোক্, এ থেকে সিদ্ধান্ত করা চলে যে, বাঙলা ভাষায় ব্যবহৃত তৎসম, দেশি ও বিদেশি—যাবতীয় শব্দকেই এক একটি মুক্তরূপমূল বলে গ্রহণ করা সঙ্গত।

সাধিত শব্দ দ্বিবিধ—প্রত্যয়নিষ্পন্ন (inflected) ও সমস্ত (অর্থাৎ সমাসবদ্ধ) শব্দ (compound word)। যে শব্দের বিশ্লেষণে একটি মৌলিক অংশ অর্থাৎ মুক্তরূপমূল ছাড়াও তার প্রসারক, সঙ্কোচক বা অর্থান্তরকারী কোন অংশ (প্রত্যয়/ suffix) পাওয়া যায়, সেই সকল শব্দকে প্রত্যয়নিষ্পন্ন শব্দ বলে। অর্থাৎ মুক্তরূপ-মূলের পূর্বে বা পরে যে সকল প্রত্যয় যুক্ত হয়, তারাই হ'লো বদ্ধরূপমূল। — 'অজানা' শব্দে 'অ-' উপসর্গ (বদ্ধরূপমূল)+'জান্' ধাতু (মুক্তরূপমূল)+'-আ' প্রত্যয় (বদ্ধরূপমূল)। 'রাখালি' শব্দে 'রাখ্' মুক্তরূপমূল+'আল্'+'ই'—পরবর্তী দুটি প্রত্যয় এবং বদ্ধরূপমূল।

যে শব্দ বিশ্লেষণে একাধিক মৌলিক শব্দ পাওয়া যায় তাকে বলা হয় সমস্ত শব্দ বা সমাসবদ্ধ শব্দ, যেমন 'স্বর্গোদ্যান'—স্বর্গ+উদ্যান। এরূপ শব্দের প্রত্যেক অংশেই অন্ততঃ একটি মুক্তরূপমূল থাক্‌বেই, অবশ্য তার সঙ্গে বদ্ধরূপমূলও যুক্ত থাকতে পারে।

মৌলিক শব্দ বা মুক্তরূপমূলকে ব্যাকরণের পরিভাষায় বলা হয় "**প্রকৃতি**"। দ্রব্য-গুণ-জাতি বা কোন ভাবাবেগবোধক প্রকৃতিকে বলে **নামপ্রকৃতি** এবং গতি-আদি ক্রিয়াবোধক প্রকৃতিকে বলা হয় **ধাতুপ্রকৃতি** বা **ধাতু**। এর সঙ্গে যুক্ত হয় বিশেষ ধ্বনিম বা ধ্বনিতা (Phoneme)—যাদের পরিচয় বন্ধরূপমূল-রূপে (Bound Morpheme)—ব্যাকরণের পরিভাষায় এদের বলে **প্রত্যয়** (affix) ও **বিভক্তি** (inflection)। ধাতুপ্রকৃতির সঙ্গে প্রত্যয় যুক্ত হ'য়ে অন্য ধাতু বা শব্দ সৃষ্টি করে। এই প্রত্যয়যুক্ত বা ধাতুপ্রকৃতি এবং প্রত্যয়যুক্ত কিংবা প্রত্যয়বিহীন নামপ্রকৃতিকে এক কথায় বলা হয় **প্রাতিপদিক** (word base)। বাক্যে ব্যবহার-যোগ্যতা অর্জনের জন্য প্রাতিপদিকের সঙ্গে আবার যুক্ত হয় এক বা একাধিক বন্ধরূপমূল, যার পারিভাষিক নাম বিভক্তি। সংস্কৃতে এই 'বিভক্তি'-যোগের গুরুত্ব অপরিসীম। শব্দের সঙ্গে বিভক্তি যুক্ত হ'লে হয় 'পদ' এবং একমাত্র পদই বাক্যে যুক্ত হ'তে পারে, শব্দের সেই যোগ্যতা নেই। বাংলায় অবশ্য বহু শব্দে কোন বিভক্তি যুক্ত হয় না। ইংরেজিতে বিভক্তি প্রায় নেই বললেই চলে। পদের বিশ্লেষণে এই বন্ধরূপমূলগুলোর গুরুত্ব অসাধারণ। শব্দে বিভক্তি যুক্ত হবার পর আর কিছু যুক্ত হয় না।

বাঙলায় ধাতুমূলগুলো একদিকে যেমন মুক্তরূপমূল, অন্যদিক থেকে এদের বন্ধরূপমূলও বলা যায়। 'কর্' বা 'খা' যখন শূন্য বিভক্তি যুক্ত হ'য়ে তুচ্ছার্থক মধ্যমপুরুষে নির্দেশার্থে ব্যবহৃত হয় ('তুই কাজটা কর্'/'তোরা এখন ভাত খা') তখন এটা মুক্তরূপমূল। কিন্তু যখন এর সঙ্গে প্রত্যয় বা ধাতুবিভক্তি যোগে একে বাক্যে ব্যবহার করা হয়—'করি', 'খাও'—তখন 'কর্' এবং 'খা'-কে বন্ধরূপমূল রূপেই গণ্য করা সঙ্গত। কোন কোন সর্বনামমূল 'আমা-', 'তোমা-' প্রভৃতি সম্বন্ধেও একই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা চলে। 'তোমা হেন গুণনিধি'-প্রভৃতি স্থলে 'তোমা' মুক্তরূপমূল ; কিন্তু 'তোমাকে', 'তোমার' ইত্যাদি ক্ষেত্রে বন্ধরূপমূল-রূপ গ্রহণযোগ্য। অতএব স্থির বিচারে দেখা যায় যে, বাঙলার মৌলিক শব্দগুলোকেই শুধু মুক্তরূপমূল বলা চলে, এ ছাড়া যাবতীয় রূপমূলই বন্ধরূপমূল।

[তিন] রূপমূল ও অক্ষর

একই ধ্বনিতা বা ধ্বনিসমষ্টি (Phonemes) অক্ষরও (Syllable) হ'তে পারে আবার রূপমূলও হ'তে পারে। কিন্তু অক্ষর এবং রূপমূল এক নয়। 'কর' শব্দটি রূপমূলের দিক থেকে বিশ্লেষণ করলে পাচ্ছি—'কর্+অ'—দুটি বন্ধরূপমূল। কিন্তু অক্ষরের দিক থেকে পাচ্ছি 'ক+র'—অথচ ধ্বনিতাত্ত্বিক দিক থেকে দুই'ই এক।

আকার একই ধ্বনি কখনও রূপমূল হ'বার যোগ্যতা রাখে, কখনও রাখে না। যেমন 'খায়' শব্দে 'খায়'—এখানে 'য়' এই একক ধ্বনিমূলটি দ্বারা বোঝাচ্ছে যে ক্রিয়াটি বর্তমান কালের এবং তার কর্তাটি নাম পুরুষের; অতএব অর্থময়তা থাকায় 'য়' ধ্বনিমূলটি একটি রূপমূলও বটে, কিন্তু 'ভয়' শব্দে যে 'য়' আছে সেই ধ্বনিমূলটিকে শব্দ থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিলে কোন অংশেরই অর্থময়তা থাকে না, অতএব 'য়' এখানে রূপমূল নয়, অক্ষর মাত্র। কখন কখন আবার একটি অক্ষরের মধ্যেই একাধিক রূপমূল নিহিত থাকতে পারে। 'খাই' শব্দে অক্ষর (Syllable) একটিই, অথচ রূপমূল দুটি—'খা' + 'ই'। অতএব অক্ষর ও রূপমূলের পার্থক্য নির্ধারণে দেখা গেল—রূপমূলে যেখানে অর্থময়তা আবশ্যিক, অক্ষরে সেখানে অর্থ থাকতেও পারে, না-ও থাকতে পারে। কখনো কখনো ধ্বনির দিক থেকে অভিন্ন হ'লেও রূপমূলের দিক্ থেকে তারা পৃথক্ বলে গণ্য হয়। 'তোমায়' এবং 'খায়'—শব্দ দুটিতে 'য়'-রূপমূল বর্তমান, কিন্তু অর্থের দিক্ থেকে প্রথম-'য়' রূপমূলটি যেখানে কর্মকারকের ভাব বোঝাচ্ছে, দ্বিতীয়, '-য়' রূপমূলটি সেখানে বর্তমান কালের ক্রিয়া এবং কর্তাটি যে নাম-পুরুষ, তাই বোঝাচ্ছে—অতএব এখানে রূপমূল দু'টি পৃথক্। এরূপ রূপমূলজোড়াকে **'সমধ্বনিজাত রূপমূল'** (homophonous morpheme) বলা হয়। "Frequently two morphemic elements are alike in expression but different in content. Such pairs are said to be *homophonons* literally 'sounding alike'."

(৪) **'রূপমূলনির্ধারণ/শনাক্তকরণ'** (Identification)—এর ব্যাপারে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন প্রয়োজন। স্বল্পসংখ্যক শব্দ-বিশ্লেষণে সমধ্বনিজাত আপাতদৃষ্ট রূপমূল অনেক সময় গবেষককে বিপথে পরিচালিত করতে পারে। 'চলতা, জটিলতা, আশালতা' শব্দগুলিতে 'লতা' কোন রূপমূল নয়, কারণ 'চ+লতা'—দুটি অংশই অর্থহীন; এমন কি, এই ক্ষেত্রে '-তা'ও রূপমূল নয়, কারণ 'আশাল+তা'—প্রথমাংশ অর্থহীন। অথচ বহুক্ষেত্রেই 'লতা' মুক্তরূপমূল, এবং 'তা' বদ্ধরূপমূল-রূপে সহজপ্রাপ্য, কিন্তু আলোচ্য ক্ষেত্রে নয়। আবার 'করদাতা, সন্ধিদাতা, প্রাণদাতা' প্রভৃতি শব্দে 'দাতা' মুক্তরূপমূলরূপে বিবেচ্য হ'লেও একই অর্থ 'কর্তৃত্ব' বোঝাতে যখন 'ভয়ত্রাতা', গ্রন্থকর্তা' প্রভৃতি শব্দকেও এর সঙ্গে গ্রহণ করি, তখন দেখি, 'দাতা' নয়, আসল রূপমূল হ'লো 'তা'। এইজন্য যত বেশি সম্ভব শব্দ যাচাই করে নিলেই বিশুদ্ধ রূপমূলটির সন্ধান পাওয়া যাবে—আবার 'শ্রীমান' ও 'চলমান' শব্দের 'মান' যে একটি রূপমূল নয়, পৃথক্ পৃথক্ রূপমূল, সে বিষয়ে সতর্ক থাকা

প্রয়োজন। পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদে এরূপ আরও কিছু দৃষ্টান্ত প্রদত্ত হ'য়েছে। এই সমস্ত বিচার বিবেচনা ক'রে, তবেই রূপমূল নির্ধারণ বা শনাক্ত করা সম্ভবপর। এই সাবধান বাণী উচ্চারণ করেছেন গ্লীসনও। তিনি বলেন: "Morphemes can be identified only by comparing various samples of a language. If two or more samples can be found in which there is same feature of expression which all share and some feature of content which all hold in common, then one requirement is met and these samples may be tentatively identified as a morpheme and its meaning.…This is not actually sufficient. In addition there must be some contrast between samples with similar meaning and content, some of which have the tentative morpheme and some of which do not."

কখনও কখনও ধ্বনিগতভাবে ব্যাখ্যাযোগ্য পার্থক্য থাকলে এবং অর্থগত পার্থক্য না থাকলে ঐরূপ ধ্বনি বা ধ্বনিগুচ্ছকেও একই রূপমূল বলা হয় ("Two elements can be considered as the same morpheme if (1) they have some common range of meaning, and (2) they are in *complementary distribution* conditioned by some phonological feature." —*Gleason*)। 'সঙ্কর-এর 'সঙ্', 'সঞ্চয়'-এর 'সঞ্', 'সম্ভব'-এর 'সম্' এবং 'সংবাদ'-এর 'সং'—ধ্বনিগতভাবে পৃথক্ হলেও একই রূপমূল, কারণ ক্ষেত্রবিশেষে অর্থাৎ পরবর্তী ধ্বনির প্রভাবে যে একই রূপমূল ভিন্ন ভিন্ন রূপ লাভ করেছে, তা ধ্বনিতাত্ত্বিক দিক্ থেকে ব্যাখ্যা করা যাচ্ছে এবং এদের মধ্যে অর্থগত কোন পার্থক্য নেই। এক্ষেত্রে 'সম্' রূপমূলটির যে সকল রূপান্তর ঘটেছে, তাদের **সহরূপমূল** (Allomorph) বলা হয়। বাঙলায় '-টা, -টি, -টো' কিংবা 'গুলি, গুলো, গুলা' প্রভৃতি এরূপ সহরূপমূলের দৃষ্টান্ত। এমন কি ধ্বনিগত দিক্ থেকে যদি পার্থক্যও থাকে অথচ অর্থগত সাদৃশ্য থাকে এবং তা **পরিপূরক অবস্থান-জাত** (complementary distribution) হয়, তা'হলেও তাদের সহরূপমূল বিবেচনা করা হয় ("Two elements are said to be in *complementary distribution* if each occur in certain environments in which the other never occurs—that is, if there are no environments in which both occur."—*Gleason.*)। যথা—'গি' এবং 'যা' ধাতুমূল দুটিকে সহরূপমূল বিবেচনা করা সঙ্গত; কারণ, ধ্বনিগত পার্থক্য থাকলেও অর্থের দিক্ থেকে তারা অভিন্ন এবং

পরিপূরক অবস্থানজাত ; যেহেতু 'গি-' শুধুই অতীতকালে ('গেল, গিয়াছিল'), এবং '-ইয়া' ও '-ইলে' অসমাপিকা যোগে (গিয়া, গেলে) ব্যবহৃত হয়, অন্যত্র কদাপি নয় ; পক্ষান্তরে অপর সমস্ত ক্ষেত্রে 'যা' ব্যবহৃত হয় (যাওয়া, যাই, যাইবে)।

'সহরূপমূল' (Allomorph)-সম্বন্ধে গ্লীসন ধ্বনিগত দিকে বাইরে রূপগত বিচারে বলেন ঃ "Two elements can be considered as allomorphs of the same morpheme if : (1) They have a common meaning. (2) They are in complementary distribution, and (3) They occur in parallel formation. Note that there are three requirements. All three must be met."

দশম অধ্যায়

শব্দার্থ তত্ত্ব

(Semantics)

[এক] শব্দার্থ-পরিবর্তন

(ক) শব্দার্থের চঞ্চলতা

শব্দ বস্তু বা ভাবের বোধক ; কোন শব্দকে বিশ্লেষণ করলে তার মূল অর্থটি পাওয়া যায়। কালে কালে মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তার পরিচিত বস্তুজগৎ এবং ভাবজগতের পরিসীমাও বাড়তে থাকে, ফলে একই শব্দ বা শব্দমূল একাধিক বস্তু বা ভাবের বোধক হ'য়ে দাঁড়ায়—তার প্রত্যক্ষ ফল—শব্দার্থের পরিবর্তন। নিরুক্তকার যাস্কই সর্বপ্রথম এই সমস্যাটির কথা উত্থাপন করেছেন, কিন্তু সমাধানের কোন পথ দেখাতে পারেন নি। পরবর্তীকালে শব্দশাস্ত্র, অলংকার শাস্ত্র এবং দর্শনশাস্ত্রেও এই শব্দার্থ-তত্ত্ব নিয়ে বিস্তর আলোচনা হয়েছে।

অভিধা (denotation), লক্ষণা (indication of secondary meaning) এবং ব্যঞ্জনা (suggestion)—এই তিনটি শক্তির মধ্যেই শব্দার্থের মূল রহস্য ধরা পড়েছিল। অভিধা দ্বারা মুখ্যার্থের, লক্ষণা দ্বারা গৌণার্থের বোধ জন্মায়—আর এই দুই শক্তি যে তাৎপর্যার্থ জ্ঞাপন করতে পারে না, সেই ব্যঙ্গার্থের বোধ জন্মায় ব্যঞ্জনা শক্তি। শব্দার্থের এই বৈচিত্র্য থেকেই আমরা তার চির-চঞ্চলতা-বিষয়ে অবহিত হ'তে পারি। শব্দমাত্রই অর্থযুক্ত ধ্বনিসমষ্টি।

শব্দটির বিশ্লেষণে তার আদি বা মূল অর্থ জানা যেতে পারে। এই অভিপ্রেত অর্থটিই 'অভিধা' বা 'বাচ্যার্থ'। কিন্তু মননশীল মানুষ বিধাতাপুরুষের সর্বশেষ সৃষ্টি হওয়া সত্ত্বেও ভাবজগৎ এবং বস্তুজগতে এত দ্রুত এগিয়ে চলেছে যে মানুষী ভাষা তার গতির সঙ্গে তাল রেখে চলতে পারেনি। কাজেই মানুষ তার ভাষাকে ব্যুৎপত্তিগত অর্থের সীমায় আটকে রাখলে তার ভাষা-প্রকাশে বাধার সৃষ্টি হয়, তাই ভাষার অর্থকে কিছু নমনীয় করতেই হলো ; তাতেই এলো অর্থচাঞ্চল্য, ফলে শব্দার্থের বিস্তৃতি ঘটে। এইভাবে ব্যবহার, ব্যাকরণ ও বিদিতার্থ-শব্দ-সান্নিধ্য (context)—এই ত্রিবিধ উপায়ে বাচ্যার্থ কিছুটা অর্থবিস্তার স্বীকার ক'রে 'মুখ্যার্থ' হ'য়েই রইল। মুখ্যার্থ হ'লেও কিন্তু এর মধ্যে শব্দের অর্থচাঞ্চল্য গুণটি সুস্পষ্ট ধরা পড়ে। মোটামুটি এর উপর ভিত্তি করেই প্রাচীন বৈয়াকরণগণ 'অভিধা'

শব্দসমষ্টিকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন—যৌগিক, যোগরূঢ় ও রূঢ়; ব্যুৎপত্তির সাহায্যে যে অর্থ পাওয়া যায় তাকে বলে **যৌগিক** শব্দ, যেমন— 'দাতা'—যিনি দান করেন; 'অসুস্থ'—যে সুস্থ নয় এমন। যৌগিক অর্থসমূহের মধ্য থেকে শব্দ যখন বিশেষ কোন একটিকে মাত্রই গ্রহণ করে, তখন তাকে বলা হয় **যোগরূঢ় শব্দ**। যেমন—'হস্তী' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ 'যাহার হস্ত আছে'—হস্ত তো অনেকের এবং অনেক কিছুরই আছে, কিন্তু 'হস্তী' শব্দ দ্বারা সে সমস্ত কিছুকে না বুঝিয়ে 'হস্তবৎ শুণ্ড' আছে বলেই একটা বিশেষ জীবকে বোঝাচ্ছে, তাই 'হস্তী' যোগরূঢ় শব্দ। যখন প্রকৃতি-প্রত্যয়ের অনুসারী না হয়ে শব্দ দ্বারা কোন আরোপিত অর্থকে বোঝায় তখন তা রূঢ় শব্দ। 'মণ্ডপ' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ 'মণ্ড পান করে যে'—কিন্তু শব্দটি দ্বারা এর বোধ না জন্মিয়ে একটা সম্পূর্ণ নোতুন বস্তুর বোধ জন্মাচ্ছে, অতএব শব্দটি রূঢ়। আচার্য জগদীশের মতে শব্দের অর্থ ৩/৪ বা ৫ প্রকার। 'রূঢ়ং লক্ষকঞ্চৈব যোগরূঢ়ঞ্চ যৌগিকম্। তচ্চতুর্ধা পরৈরূঢ়যৌগিকং মন্যতেঽধিকম্।' অর্থাৎ প্রাগুক্ত তিনটির অতিরিক্ত **যৌগিক** এবং **রূঢ়যৌগিক** নামে অতিরিক্ত দু'টি অর্থের কথাও তিনি বলেছেন। কিন্তু বাস্তবে রূঢ় এবং যৌগিকের মধ্যে এবং যোগরূঢ় যৌগিকের মধ্যে পার্থক্য অতি সামান্যই।

(২) বক্তার অভিপ্রেত অর্থটি যদি বাচ্যার্থের দ্বারা প্রকাশিত না হ'য়ে, তৎ-সংশ্লিষ্ট অপর কোন গৌণ অর্থ-দ্বারা দ্যোতিত হয়, তবে সেই ক্ষেত্রে শব্দটি বাক্যে 'লক্ষ্যার্থে' প্রযুক্ত হয়,—এটি শব্দের 'লক্ষণা শক্তি'। যেমন,—'লেখনীর মতো তুলিও রবীন্দ্রনাথের অমোঘ অস্ত্র।' এখানে 'লেখনী' এবং 'তুলি' বলতে যথাক্রমে সাহিত্যকীর্তি এবং চিত্রশিল্পকে বোঝাচ্ছে এবং 'অস্ত্র' বলতে বোঝায় তাঁর শক্তি তথা কৃতিত্ব।

(৩) বাক্যের অর্থ যখন 'বাচ্যার্থ' কিংবা 'লক্ষ্যার্থ' দ্বারা প্রতিপন্ন না হ'য়ে ভিন্নপ্রকারে তথা ব্যঞ্জনা শক্তির গুণে আভাষিত হয়, তখন তাকে বলা হয় 'ব্যঙ্গার্থ'। যেমন—'কথাটা শুনে তার মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়লো।'—এখানে সত্যি সত্যি আকাশ ভেঙ্গে পড়ার মতো কোন দুর্ঘটনা ঘটেনি। কিন্তু অনুরূপ বিপৎপাতের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে।

একালে শব্দার্থতত্ত্ব বা Semantics নিয়ে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে আলোচনা শুরু করেছেন Michael Breal। তারপর বিভিন্ন ভাষাতেই এ বিষয়ে বিস্তর গবেষণা এবং আলোচনা হ'য়েছে ও হচ্ছে। এ বিষয়ে আমাদের প্রাচীনগণও যে অনবহিত ছিলেন না, তার প্রমাণ পাওয়া যায় 'বাক্যপদীয় গ্রন্থে'। সেখানে বলা হয়েছে যে

শুধু রূপ থেকেই শব্দার্থবিচার সম্ভব নয়, 'বাক্য' বা 'পদসংযোগ', প্রকরণ বা প্রসঙ্গার্থ বা প্রকাশসামর্থ্য, ঔচিত্য ও দেশকালানুযায়ী অর্থবৈচিত্র্য দিয়ে শব্দার্থ নির্ণয় করতে হয়। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য যে পাশ্চাত্ত্য ভাষাবিজ্ঞানিগণও connotation বা denotation অর্থসামর্থ্য ছাড়াও context বা প্রকরণ এবং collocation বা অন্যপদ সংযোগ বা বাক্যকেও শব্দার্থনির্ণয়ের জন্য অপরিহার্য বিবেচনা করেছেন।

[দুই] শব্দার্থ পরিবর্তনের কারণ

শব্দের অর্থ আবহমানকাল একই থাকছে, তার কোন দিকে কোন পরিবর্তন হয়নি, এমন দৃষ্টান্ত পাওয়া কঠিন। ভাষা নদীর মতই চির-প্রবহমাণা, কাজেই প্রতিমুহূর্তে তাতে তরঙ্গ-বিক্ষোভ না ঘটতে পারে, কিন্তু গতি থাকবেই। সেই গতির টানে শব্দের মূল অর্থ ক্রমেই দূরতর হয়, ফলে এক সময় শব্দার্থের পরিবর্তন সুস্পষ্ট হ'য়ে ওঠে। শব্দার্থের পরিবর্তন ঘটতে পারে নানা কারণেই। কিন্তু এ সমস্ত কারণের সংখ্যা এত অধিক যে তাদের সবকটিকে একটিমাত্র আলোচনায় সীমিত করা প্রায় অসম্ভব। বিভিন্ন ভাষাবিজ্ঞানী এদের যেভাবে শ্রেণীবদ্ধ করেছেন তাদের মধ্যেও মতানৈক্য বর্তমান। যাহোক, সাধারণভাবে শব্দার্থ-পরিবর্তনের কারণগুলোকে তিনটি প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত করা চলে : (ক) **ভিন্ন পারিবেশিক কারণ**, (খ) **মনোবিজ্ঞানিক কারণ**, (গ) **আলংকারিক কারণ**। কোন কোন শব্দের অর্থ বিশ্লেষণে যুগপৎ একাধিক কারণের সন্নিবেশও লক্ষ্য করা যায়। নিম্নে অপেক্ষাকৃত বিস্তৃতভাবে প্রধান কারণসমূহ আলোচিত হ'লো।

(ক) ভিন্ন পারিবেশিক কারণ : অর্থ-পরিবর্তনে ইতিহাসের ইঙ্গিত

স্থান-কাল-পাত্রের পরিবর্তনে যে শব্দের অর্থান্তর ঘটে তার বহু দৃষ্টান্ত বর্তমান। শব্দের অর্থপরিবর্তনের ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে আমরা শুধু ভৌগোলিক পরিবেশ পরিবর্তনেরই পরিচয় পাই না, আমরা বিভিন্ন জাতির সামাজিক ইতিহাসেরও অনেকটা পরিচয় জানতে পারি এবং একে অবলম্বন করেই "ভাষা-আধারিত প্রত্ন ইতিহাস" নামক এক শাস্ত্র গড়ে উঠেছে। এক অঞ্চলের শব্দ অপর অঞ্চলে অনেক সময়েই ভিন্নার্থে ব্যবহৃত হয়। ফা' 'দরিয়া' অর্থ নদী (আমুদরিয়া), কিন্তু বাঙলায় তা 'সমুদ্র' হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। ফা' 'মুর্গ'—যে কোন পাখি, বাং 'কুক্কুট' অর্থাৎ এক বিশেষ ধরনের পাখি। কাঁচের তৈরি জলপাত্র, ইং glass, বাঙলায় কাঁসা বা রূপোর তৈরি জলপাত্রও 'গ্লাস'। বাং 'শাক' বলতে 'কাঁচা পাতা', হি' 'রান্না করা নিরামিষ তরকারী'।

একভাষাভাষী সম্প্রদায়ের বিচ্ছিন্নতার ফলেও শব্দার্থের পরিবর্তন ঘটতে পারে। যে বর্ণ হিন্দী এবং বাঙলায় 'নীল', গুজরাটিতে তাহাই 'সবুজ'। ইন্দো-য়ুরোপীয় ভাষার * fekus, ইংরেজিতে 'fees', সংস্কৃতে 'পশু'—একই মূল অথচ অর্থের তাৎপর্য অনেকখানি পাল্টে গেলো। সম্ভবতঃ একই মূল শব্দ থেকে ঈরানী ভাষার 'মুর্গ' (পাখি) এবং সংস্কৃতে 'মৃগ' (পশু) শব্দ উদ্ভূত হয়েছে, অথচ অর্থের কত পরিবর্তন।

কালের পরিবর্তনেও শব্দার্থের পরিবর্তন ঘটা সম্ভব। একসময় 'উষ্ট্র' বলাতে 'আরণ্য-বৃষ' বোঝাতো, এখন শুধু 'উট'কেই বোঝায়।

ধর্ম, সংস্কৃতি ও সমাজের কালানুক্রমিক পরিবর্তনে বহু শব্দই অর্থান্তর লাভ করেছে। ইং mother, sister—শব্দগুলো খ্রীষ্টান ধর্মীয় পরিবেশে পারিবারিক গন্ডী ছাড়িয়ে প্রতিষ্ঠানগত মর্যাদা লাভ করেছে।

রাষ্ট্র-জাতি-সম্প্রদায়-আদি-সম্বন্ধে হীন মনোভাবের ফলে বহু প্রাচীন শব্দই বর্তমানে অপকৃষ্ট অর্থে ব্যবহৃত হয়।—বুর্জোয়া, পুঁজিবাদী, জোতদার, অসুর, হিন্দু।

এক বর্গের কোন এক শব্দের অর্থ-পরিবর্তনে তৎসংশ্লিষ্ট অপর সমস্ত শব্দেরও অর্থ পরিবর্তন ঘটতে পারে। মূলে 'দুহিতা' শব্দের অর্থ ছিল 'দোহনকারিণী', কালক্রমে শব্দটি যখন 'কন্যা' অর্থে প্রযুক্ত হলো, তখন তৎসংশ্লিষ্ট শব্দসমূহে পরিবর্তিত অর্থই বজায় রইলো। 'দৌহিত্র'—শব্দে দোহনের অর্থ আর ফিরে আসেনি।

একটি শব্দের একাধিক রূপ ভিন্ন ভিন্ন অর্থে প্রযুক্ত হ'তে পারে অর্থাৎ মূল শব্দে যে অর্থ ছিল, তজ্জাত শব্দের সে অর্থ না-ও থাকতে পারে। সাধু, সাহু; ভোজ, ভোজন; সৌভাগ্য, সোহাগ; অধ্যাপক-বাচক 'উপাধ্যায়'-শব্দজাত 'ওঝা'র সঙ্গে আর অধ্যাপনার কোন সম্পর্ক নেই'—'ওঝা' এখন 'বোজা' হয়ে ঝাড়ফুঁক করে। 'বিবাহ, পাণিগ্রহণ, পরিণয়' প্রভৃতি শব্দের মধ্যে যে বলপ্রয়োগের অর্থ বর্তমান ছিল এখন আর তা নেই। 'লঙ্কাকাণ্ড', 'কুরুক্ষেত্র' এখন আর মহাকাব্যে নিবন্ধ নেই, এখন তা' গৃহস্থ ঘরেরও নিত্যকার সামগ্রী।

পাত্র বা বস্তুর পরিবর্তনেও শব্দের অর্থান্তর ঘটে। গাছের পাতায় লিখে তা গেঁথে রাখা হতো, তাই পত্ররচিত 'গ্রন্থ' হ'তো, এখন আর সে বস্তু নেই, কিন্তু তার অর্থ রয়ে গেছে। কাঁচের তৈরি 'গ্লাস' এখন যে কোন ধাতব দ্রব্যের সাহায্যেও হতে পারে। 'Penna' বা পালকের সাহায্যে লেখনী হ'তো বলে তার নাম ছিল 'pen'—এখন

steel-এরও pen হয়। জল/বালি বোঝাই ঘড়ার সাহায্যে সময় নিরূপণ করা হ'তো বলে 'ঘড়ি'—কিন্তু এখন পুরো যান্ত্রিক ব্যবস্থায় সময়জ্ঞাপন করা হয়, নাম তাও রয়ে গেছে 'ঘড়ি'। 'তুলো' দিয়ে তৈরি হ'তো বলে 'তুলি', এখন পশুলোম বা নাইলনের তৈরি হ'লেও নামটি রয়ে গেছে।

প্রথা-সম্বন্ধীয় বাতাবরণের ফলেও অর্থ-পরিবর্তন হয়। যজ্ঞকর্তার সামনে উপস্থাপিত হতো বলে 'অগ্নি'র নাম ছিল 'পুরোহিত'; এখন আর অগ্নি পুরোহিত নয়, যিনি যজ্ঞ-কর্তার হ'য়ে কাজ করেন, তিনিই হলেন পুরোহিত। যার ইষ্টসাধনের উদ্দেশ্যে পুরোহিত যজ্ঞ ক্রিয়া করতেন, তিনি ছিলেন 'যজমান', এখন ধোপা-নাপিতও নিয়মিতভাবে যাদের বাড়িতে কাজ করে, তারা হয় তাদের যজমান।

(খ) মনস্তাত্ত্বিক কারণ

শব্দার্থ-পরিবর্তনে মনস্তত্ত্বের ভূমিকা অসাধারণ, এমন কি অনেক সময় অপর দুই কারণ অর্থাৎ পারিবেশিক এবং আলঙ্কারিক কারণের মধ্যেও মনস্তাত্ত্বিক অর্থান্তরের সন্ধান পাওয়া যায়।

মনস্তাত্ত্বিক বিষয়ের মধ্যে সংস্কার শব্দার্থ-পরিবর্তনে প্রধান অংশ গ্রহণ করে। অমঙ্গলের আশঙ্কায় আমরা বলি 'চাউল বাড়ন্ত', 'শাঁখা শীতলানো'; যে যায় তাকে বলি 'এসো'।

কুরুচিকর অথবা গ্রাম্য শব্দ-ব্যবহারের পরিবর্তে ভিন্নতর শব্দ দ্বারাও উক্ত ভাব প্রকাশ করা হয়। বিশেষ একটা বেগ বোঝানোর জন্যে বলা হয় 'বাথরুম পাওয়া', গ্রামের লোকেরা বলে 'মাঠে যাওয়া/ঘাটে যাওয়া', হিন্দীতে বলে 'বিলেত যাওয়া'।

কটুতা বা ভয়ঙ্করতা এড়িয়ে যাবার উদ্দেশ্যে অপেক্ষাকৃত মৃদু বা নিরীহ শব্দ ব্যবহার দ্বারা শব্দের অর্থপরিবর্তন ঘটানো হয়। সুন্দরবন অঞ্চলে 'বাঘ'কে বলে 'বড় শেয়াল', রাত্রিবেলা অনেকে 'সাপ'কে বলে 'লতা', 'বসন্ত রোগ'কে বলা হয় 'মায়ের দয়া' বা 'শীতলার দয়া'।

অন্ধবিশ্বাসও শব্দার্থ-পরিবর্তনের অন্যতম কারণ। যাঁরা গুরুজনের নাম গ্রহণ করতে পারেন না, অথচ প্রয়োজনে উল্লেখ করতে হয়, তাঁরা 'কালীচরণ'কে বলেন 'ময়লাচরণ', 'তুলসী পাতার রস' বোঝাতে বলেন 'ভাসুর ঠাকুরের পাতার রস'। গোঁড়া বৈষ্ণবরা শাক্ত দেবদেবী কিংবা তৎ-সংক্রান্ত কোন কিছুর নাম উল্লেখ করেন না—অথচ প্রয়োজনীয় তথ্য জানাতে নয়। এ জন্য যে পন্থা তাঁরা গ্রহণ করেন (এখন নয়, অনেক কাল আগের কথা), তার একটা মজাদার গল্প ছেলেবেলায়

শোনা ছিল। জনৈক বৈষ্ণব একটা বিবরণ দিচ্ছে—হাতিশুঁড়ার মায়ের মাঠে তিন তিরিঙ্গার ডালে, প্রভুরে বানাইয়া রাখছে, রস পড়ে তার নালে।' অর্থাৎ দুর্গাপুরের মাঠে একটা বেল গাছের ডালে একটা পাঁঠা ঝুলিয়ে রেখেছে, তার থেকে দরদর করে রক্ত পড়ছে।

হীন কাজকে শোভনতা দানের উদ্দেশ্যেও অনেক মহৎ শব্দকে হীন অর্থে ব্যবহার দ্বারা অর্থপরিবর্তন সাধিত হয়। রান্নার কাজ করে যে পুরুষ, তাকে 'ঠাকুর/মহারাজ' বলে আখ্যায়িত করা হয়। বাড়ির কাজের দাসীকে কন্যার মর্যাদায় অভিষিক্ত ক'রে বলা হয় 'ঝি' ; এখন বহু ব্যবহারে 'ঝি' শব্দের অর্থকৌলীন্য নষ্ট হ'য়ে গিয়ে 'দাসী' অর্থই চালু হ'য়ে গেছে, দাসীরাও এখন 'ঝি' বল্লে অসন্তুষ্ট হয়, তাদের বলতে হয় 'মাসি', 'কাজের লোক' ; 'তস্কর' শব্দের ব্যবহারিক অর্থ 'চোর' হলেও মূল অর্থটা ছিল 'উৎকর্ম সম্পাদক'।

ধ্বনি পরিবর্তনের আলোচনা কালে দেখা গেছে, সাদৃশ্যের ভূমিকা সেখানে বিরাট। শব্দার্থ পরিবর্তনের ব্যাপারেও সাদৃশ্য বিরাট ভূমিকা গ্রহণ করে। দেহের মধ্যে মাথাই শ্রেষ্ঠ এবং সর্বোচ্চে অবস্থিত, অতএব তার সাদৃশ্যে শ্রেষ্ঠতা বা উচ্চতা বোঝাতে যথেচ্ছভাবে 'মাথা' শব্দের ব্যবহার হয়ে আসছে। 'গাঁয়ের মাথা, গাছের মাথা, দইয়ের মাথা, কথার মাথামুণ্ডু, তেমাথা, মাথা ধরা, মাথা খাওয়া, মাথায় রাখা' প্রভৃতি। 'বড়' বোঝাতে 'রাম, রাজ, হাতি, ঘোড়া' প্রভৃতির ব্যবহারও এভাবেই হ'য়ে আসছে।—রামধনু, রামপাঁঠা, রামবোকা, রাজপথ, ঘোড়ানিম, হাতি-পাড় (শাড়ি)।

শব্দ প্রয়োগে অসতর্কতা এবং অজ্ঞতাও শব্দার্থ-পরিবর্তনের অন্যতম কারণ। জোরে বলা বা ঘোষণা করা অর্থে এখন 'সোচ্চার' শব্দটি খুব ব্যবহৃত হচ্ছে, অথচ শব্দটির মূল অর্থ আদৌ এর সঙ্গে যুক্ত নয়, এর একটা অর্থ 'শব্দসহ বমি'। 'পাষণ্ড' শব্দের অর্থ ছিল বৌদ্ধ সন্ন্যাসী, এখন 'নিষ্ঠুর'। ষণ্ড ও অমর্ক ছিলেন প্রহ্লাদের গুরু, কিন্তু কৃষ্ণদ্বেষী, তা থেকে 'ষণ্ডামার্কা' সম্পূর্ণ ভিন্ন অর্থে চলে এলো। 'অবদান' শব্দের অর্থ 'মহৎ কীর্তি', কিন্তু 'দান' অর্থেই ব্যবহৃত হয়। 'স্তোকবাক্য' শব্দটি প্রায় অর্থহীন, 'স্তোক' শব্দের অর্থ 'অল্প, ছোট'—অজ্ঞতাবশতঃ সম্ভবতঃ 'স্তোভবাক্য' স্থলে ব্যবহৃত হয়।

বিবক্ষা অর্থাৎ বক্তার ইচ্ছানুযায়ী এবং কবিদের নিরঙ্কুশতার জন্যও শব্দার্থের পরিবর্তন ঘট্‌তে পারে। রবীন্দ্রনাথ 'আকাশ' অর্থে 'ক্রন্দসী' শব্দের ব্যবহার করেছেন, কিন্তু 'ক্রন্দসী' শব্দের প্রকৃত অর্থ 'চীৎকারকারী সৈন্য' ; মধুসূদন

জেনেশুনেই বরুণ-পত্নী অর্থে 'বারুণী' শব্দ ব্যবহার করেছেন, যদিও হওয়া উচিত ছিল 'বরুণানী' ; 'বারুণী' শব্দের অর্থ 'মদ্য'।

অতিশয়িত ব্যবহারেও শব্দার্থের পরিবর্তন ঘট্‌তে পারে। কাউকে একটু সম্মান দেখাতে গিয়ে অনেক সময়ই বাড়াবাড়ি হ'য়ে যায়, ফলে মূল অর্থের মূল্য কমে যায়। বাস-ট্রামের কন্‌ডাক্টরদের মুখে 'বড়দা' আর 'দাদু' শব্দগুলোর অতিব্যবহারে এগুলোর মূল্য নষ্ট হয়ে গেছে। 'বাবু' শব্দেরও অনুরূপ পরিবর্তন ঘটেছে।

মানসিক সহযোগের ফলে শব্দসংক্ষেপ বা অঙ্গচ্ছেদ দ্বারাও শব্দার্থের পরিবর্তন ঘটে। ক্ষৌরকর্ম>কামানো, দণ্ডবৎ প্রণাম>দণ্ডবৎ, ভোটানাং দেশ>ভুটান, খাইবার বস্তু>খাবার, বাইসাইকেল>বাইক, হিপোপটেমাস>হিপো, হেলিকপ্টার>কপ, ক্যালিবার>ক্যালি, ফান্ডামেন্টাল>ফণ্ডা, খবরের কাগজ>কাগজ, Newspaper> Paper।

(গ) আলংকারিক কারণ :

পৃথিবীর সব ভাষাতেই অলংকার আরোপের ফলে শব্দার্থের পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। প্রাচীন ভারতে রূপক অলংকার আরোপের ফলে বহু শব্দের অর্থ এমনভাবে পরিবর্তিত হ'য়েছে যে তার মৌলিক অর্থের সঙ্গে পরিবর্তিত অর্থের কোন সম্পর্কই খুঁজে পাওয়া ভার। 'দারুবৎ কঠিন' অর্থে 'দারুণ', কিন্তু এখন দারু বা কাঠের সঙ্গে কোন সম্পর্কই নেই। 'গবাক্ষ' শব্দের মূল অর্থ 'গোরুর চোখ'—তেমন আকৃতিবিশিষ্ট বাতায়ন, কিন্তু এখন তো বাতায়ন-মাত্রই চৌকো। 'বীণাবাদনে দক্ষ'-ই ছিলেন 'প্রবীণ', এখন বয়সই একমাত্র বিবেচ্য, বীণার সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই।

অনেক শব্দার্থের মধ্যে উপমা-রূপক উৎপ্রেক্ষা-আদি অলংকার এমনভাবে লুকিয়ে আছে যে বোঝবার কোন উপায় নেই। আর এরি ফলে যে অর্থেরও পরিবর্তন ঘটে গেছে, তাও চট্‌ ক'রে বোঝা যায় না। 'হরতাল' শব্দটি গুজরাটি 'হড়তাল'—মূলে 'হাটে তালা', তা থেকেই 'ধর্মঘট' দাঁড়িয়ে গেছে। 'বেলাভূমিকে অতিক্রান্ত' অর্থে 'উদ্বেল', কিন্তু আমাদের হৃদয়ও উদ্বেল হয়। 'শ্বাপদ' বলতে বুঝি 'হিংস্র পশু', কিন্তু মূল অর্থ 'শ্বন্‌ অর্থাৎ কুকুরের মতো পা যার।' বই-এর ব্যাপারে যে সকল শব্দ আমরা ব্যবহার করি, সবই বৃক্ষসংক্রান্ত : পত্র, কাণ্ড, পর্ব, পল্লব, শাখা, স্কন্ধ, লম্বক, সর্গ। বিভিন্ন অলংকার ব্যবহারের ফলে শব্দের অর্থ স্থায়িভাবেই পরিবর্তিত হ'য়ে গেছে।

ব্যষ্টির স্থলে সমষ্টি (metonymy অলংকার) এবং সমষ্টি স্থলে ব্যষ্টির (synecdoche অলংকার) প্রয়োগেও অর্থ পরিবর্তন ঘটে। লাল রং-এর পানীয় মাত্রই আর 'লালপানি' নয়, এখন একটা বিশেষ পানীয়ের ক্ষেত্রেই শব্দটি ব্যবহৃত হয়। সবুজ রংবিশিষ্ট হ'লেই আর সব্জী হয় না, আবার সব্জী হলেই যে সবুজ হ'বে তা'ও নয়, প্রমাণ—বেগুন। 'ভাত-কাপড়' দেওয়া অর্থে শুধু ভাত আর কাপড় দেওয়া নয়, যাবতীয় ভরণপোষণের ব্যবস্থা। চায়ের নেমন্তন্ন থাকলেও 'চা'-এর সঙ্গে 'টা'ও থাকে; 'গেরুয়া কাপড়' বল্লে সাধু-সন্ন্যাসীকেই বোঝায়, যে কোন গেরুয়াধারীকে নয়।

অতিশয়োক্তি (Hyperbole) অলংকারও শব্দার্থের পরিবর্তন ঘটায়।—ভয়ংকর ছেলে, ভীষণ সুন্দর, সাপের পাঁচ পা দেখা, বাড়ি মাথায় করা, মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়া, প্রভৃতি।

মনস্তাত্ত্বিক প্রসঙ্গে যে শোভনতার কথা বলা হয়েছে তা সুভাষণ (Euphemism)-এর অন্তর্ভুক্ত।—হরিজন, জমাদার।

সুভাষণের বিপরীত 'দুর্ভাষণ' (Pejoration)-এর সাহায্যেও অর্থান্তর ঘটে।—নাতিকে আদর করে 'শালা', পুত্র বা পুত্রোপম ব্যক্তিকে 'বেটা'।

অতি নম্রতা প্রদর্শনের জন্যও শব্দার্থের পরিবর্তন ঘটানো হয়।—নিজের বাড়ি হ'লে 'গরীবখানা', পরের হ'লে 'দৌলতখানা', দেবতার জন্য খাদ্য নয় 'ভোগ', দেবতাকে দেখা নয় 'দর্শন'।

বক্রোক্তির সাহায্যে দূষণীয় শব্দকে ছদ্মবেশ পরিয়ে দেওয়াতেও তার অর্থ পরিবর্তিত হয়।—হাতটান, চক্ষুদান, রামপাখি, শ্বশুরঘর, মামার বাড়ি (=জেলখানা)।

ব্যঙ্গোক্তির সাহায্যে অর্থের বৈপরীত্য ঘটানো হয়।—ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির, বড় খোকা, শ্রীঘরবাস।

[তিন] শব্দার্থ পরিবর্তনের ধারা

শব্দের অভিধা-শক্তিকে বলে বাচ্যার্থ, লক্ষণাশক্তিকে লক্ষ্যার্থ এবং ব্যঞ্জনাশক্তিকে ব্যঙ্গার্থ। এই সমস্ত শক্তির সাহায্যে শব্দের অর্থান্তর ঘটানো হ'য়ে থাকে। কোন শব্দ ভাষায় বহুদিন ব্যবহৃত হ'লে একদিকে যেমন অর্থে জীর্ণতা দেখা দেয়, অন্যদিকে মানসিক কারণ বা বহিঃপ্রভাবের ফলে অর্থে অনাবশ্যক বস্তুর সঞ্চয় জমে তাকে পৃথুলতাও দান করে। ফল কথা, শব্দার্থের পরিবর্তন নানা ধারাতেই প্রবাহিত হয়।

ধারার শ্রেণীবিভাগ সম্বন্ধে নানাবিধ মতবাদ বর্তমান থাকলেও শব্দার্থ পরিবর্তনের পঞ্চমুখী ধারার সাহায্যেই সর্বপ্রকার অর্থ পরিবর্তনকে ব্যাখ্যা করা চলে :—(ক) অর্থের উন্নতি (Elevation of meaning), (খ) অর্থের অবনতি বা অর্থাপকর্ষ (Pejoration/Deterioration of meaning), (গ) অর্থের সংকোচ (Restriction/ Narrowing of meaning), (ঘ) অর্থের প্রসার (Expansion/ Generalisation of meaning), (ঙ) অর্থসংক্রম/অর্থ-সংশ্লেষ/সম্পূর্ণ নোতুন অর্থের আগমন (Transfer of meaning)।

(ক) **অর্থের উন্নতি/অর্থোৎকর্ষ**—শব্দের বাচ্যার্থ বা মূল অর্থ অপেক্ষা প্রচলিত অর্থ যদি উচ্চতর ভাব বা বিষয়কে প্রকাশ করে, তবে তাকে বলা হয় 'অর্থের উন্নতি'। 'মন্দির' শব্দের মূল অর্থ ছিল 'গৃহ', অর্থোন্নতির ফলে 'দেবগৃহ'। 'ভীষণ' শব্দের অর্থ 'ভীতিপ্রদ' হলেও যদি বলা হয় 'ভীষণ সুন্দর' তখন 'অতিশয়' অর্থে ব্যবহৃত হয়। 'সম্ভ্রম'-এর মূল অর্থ 'ভয়' কিন্তু 'মান্য' অর্থে ব্যবহৃত হয়। 'ভোগ' আর 'ভোজ' একার্থবাচক হ'লেও 'ভোগ' এখন দেবতার উদ্দেশ্যেই শুধু নিবেদিত হয়। 'হঠাৎ' শব্দার্থ—যা হঠকারিতার সঙ্গে করা হয়, কিন্তু প্রচলিত উন্নত অর্থ—আকস্মিক ভাবে সংঘটিত। 'সাহস' অর্থ যা সহসা করা হয় অর্থাৎ 'হঠকারিতা', কিন্তু এখন অতিশয় প্রশংসাত্মক অর্থে ব্যবহৃত হয়। স্থান>'থান' বলতে শুধু দেবস্থানকেই বোঝায়। আদর ক'রে যখন ছোটদের দুষ্টু, পাজি, বদমাশ, পাগলা' প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করা হয়, তখন তাদের অর্থোন্নতি ঘটে।

(খ) **অর্থের অবনতি/অর্থাপকর্ষ**—শব্দের বাচ্যার্থ বা মূল অর্থ উৎকর্ষবাচক হ'লেও প্রচলিত অর্থ যদি অপেক্ষাকৃত হীন অর্থে ব্যবহৃত হয়, তবে তাকে বলা হয় 'অর্থের অবনতি'। 'মহাজন' শব্দের মূল অর্থ 'মহৎ ব্যক্তি' কিন্তু 'সুদখোর উত্তমর্ণ' অর্থে ব্যবহৃত হয়। 'সাধু' শব্দের মূল অর্থ 'সৎ ব্যক্তি', কিন্তু যারা ব্যবসা করতে গিয়ে লোককে ঠকায় তাদের এক সময় বলা হ'তো 'সাধু'। 'পাষন্ড' শব্দের মূল অর্থ—বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের একটি সম্প্রদায়, কিন্তু অর্থাবনতির ফলে এখন 'নিষ্ঠুর' অর্থে ব্যবহৃত হয়। 'অসুর' শব্দের মূল অর্থ ছিল—প্রাণপ্রদ প্রধান দেবতা ; পরে অর্থের অপকর্ষ ঘটিয়ে করা হ'লো—দেবতা নয় এমন দানব। 'কস্‌বা' শব্দের অর্থ—নগরের উপকন্ঠ অর্থাৎ নগর-বাসে অক্ষম ব্যক্তিরা যেখানে থাকতে বাধ্য হন, মূল আরবী শব্দটির অর্থ ছিল নগরের শ্রমজীবী মানুষ। ভর্তা শব্দের মূল অর্থ—ভরনপোষণ-কর্তা অর্থাৎ স্বামী, কিন্তু অতিশয় অপকৃষ্ঠ গ্রাম্য শব্দ-রূপে বিবেচ্য হয় 'ভাতার', যা 'ভর্তা' থেকেই উৎপন্ন। 'উজবুক' শব্দের মূলে আছে 'উজবেগ' মধ্যপ্রাচ্যের

উজবেগিস্তানের অধিবাসী। এরা মুঘল তুর্কী-সৈন্য রূপে এদেশে ছিল। এরা বিচার বুদ্ধিহীনভাবে সেনা নায়কের আদেশ পালন করতো বলে ক্রমে 'নির্বোধ' ব্যক্তি অর্থেই শব্দটি ব্যবহৃত হ'তে থাকে। অবশ্য বাংলা 'অজ' এবং 'বোকা' শব্দ ও অর্থানুষঙ্গ এতে যুক্ত হ'য়ে থাকতে পারে। 'ইতর' শব্দের অর্থ 'অন্য, অপর', কিন্তু পরিবর্তিত অর্থ ছোটলোক'। 'রাগ'-এর অর্থ 'আকর্ষণ' থেকে 'ক্রোধ'-এ দাঁড়িয়েছে, 'প্রীতি>পীরিতি' বৈষ্ণব পদাবলীতে 'প্রেম' অর্থে ব্যবহৃত হ'তো, এখন 'অবৈধ প্রেম'। 'দেবী' শব্দের মূল অর্থ 'দেবকন্যা' বা 'দেবজায়া', এখন মানবীরাও 'দেবী' উপাধি ব্যবহার করেন। 'বিরক্ত' ছিল 'বিরাগযুক্ত', এখন 'ক্রুদ্ধ'। সর্বত্রই অর্থের অবনতি লক্ষ্য করা যায়।

(গ) **অর্থের সংকোচ**—কোন শব্দের অর্থসমষ্টির মধ্যে যদি কোন একটি প্রধান হ'য়ে ওঠে অথবা সমষ্টিবাচক শব্দকে ব্যষ্টি-অর্থে, সমগ্র থেকে অংশকে কিংবা কারণবাচক শব্দ থেকে কার্যবাচক শব্দকে বোঝায় তখন শব্দের অর্থসংকোচ ঘটে থাকে। 'অন্ন' শব্দের মূল অর্থ 'খাদ্যবস্তু' এখন শুধু 'ভাত'; বিবাহ সম্বন্ধে সম্পর্কিত ব্যক্তিই 'বৈবাহিক' হবার যোগ্য, কিন্তু বর-কনের পিতা-মাতাদের মধ্যেই সম্বন্ধটি আবদ্ধ রয়েছে। সম্বন্ধ-যুক্ত ব্যক্তিই 'সম্বন্ধী' হ'তে পারেন, কিন্তু হ'চ্ছেন শুধু 'বড় শ্যালক'। 'ভালোমন্দ' শব্দটির মূল অর্থ ভালো এবং মন্দ, অর্থসংকোচে দুটির যে কোন একটিকে বোঝাতে পারে, যেমন—'ভালো-মন্দ খাওয়া হ'বে, আর আমি যাব না?' —এখানে অর্থ 'ভালো'; আবার—'ওর ভালোমন্দ যদি কিছু হয়, তাই এ সময় কাছে থাকা দরকার।'—এখানে অর্থ 'মন্দ'। 'মৃগ' শব্দের মূল অর্থ 'পশু' (যথা—মৃগয়া, মৃগেন্দ্র), কিন্তু অর্থসংকোচের ফলে 'হরিণ'; গো-সম্বন্ধীয় বলে ধনুর ছিলা 'গুণ'—এখন 'দড়ি' (গুণ টানা)। 'কৃপণ' অর্থ ছিল 'কৃপার পাত্র', এখন তাদের মধ্যে একমাত্র 'ব্যয়কুণ্ঠ' ব্যক্তি; 'মহোৎসব' অর্থ 'মহান্ উৎসব' কিন্তু বৈষ্ণবদের উৎসব-বিশেষই এখন 'মচ্ছব'। 'বিলাত' অর্থ বিদেশ, কিন্তু এখন ইংলণ্ডকেই বোঝায়; 'খাদ্য' থেকে 'খাজা' বিশেষ ধরনের খাবার; 'পর্ণ' অর্থাৎ পাতা থেকে জাত 'পান' শুধু এক বিশেষ জাতীয় পাতাকেই বুঝায়। 'প্রদীপ' বলতে যে কোন দীপকেই বোঝাতো, কিন্তু এখন শুধু মৃৎপাত্র বা তদাকৃতি পাত্রে তেল-সল্তে দিয়েই প্রদীপ হয়।

(ঘ) **অর্থের প্রসার**—শব্দের মূল অর্থ যখন কোন কারণে বস্তুর সীমাবদ্ধতা অতিক্রম ক'রে বস্তুনিরপেক্ষ হ'য়ে দাঁড়ায়, তখনই তার প্রসার ঘটে। 'গৌরচন্দ্র' অবলম্বনে গীতই ছিল 'গৌরচন্দ্রিকা'। এখন যে কোন বিষয়ের প্রারম্ভিক আলোচনা বা ভণিতাই গৌরচন্দ্রিকা। কালো রং-এর লিখবার তরল উপাদান ছিল 'কালি'—

এখন রং-এর প্রসার ঘটায় লাল কালি, সবুজ কালি প্রভৃতি। 'পরশ্ব' শব্দের মূল অর্থ—আগামীকালের পরদিন, অর্থবিস্তার হ'লো—গতকালের আগের দিনও। 'পত্র'—গাছের পাতা; এখন চিঠি-অর্থেও ব্যবহার হয়, কারণ আগে চিঠি গাছের পাতায় (কলা পাতা, তালপাতা, ভূর্জপত্র) লেখা হ'তো। 'ফলাহার' বললে ফলের আহার আর বোঝায় না—'দই-চিড়ে-কলা' দিয়ে ফলাহার>ফলার-এর ব্যবস্থা হয়। 'পাত্র'—কোন বস্তু-স্থাপনের আধার যেমন, 'জলপাত্র'; অর্থ-প্রসারে কন্যা-দানের আধার-রূপে 'জামাতা'ই পাত্র হলো। এক সময় বর্ষাকালে বৎসর আরম্ভ হ'তো বলে বৎসরকে 'বর্ষ' বলা হয়। কিন্তু এখন যে কোন সময়ই বর্ষ আরম্ভ হয় (যেমন; শীতে খ্রীষ্টাব্দ, বসন্তে শকাব্দ আর মুসলিম বর্ষ যে কোন কালেই)। 'জতুগৃহ' (লাক্ষা-নির্মিত গৃহ) থেকে 'জউহর'>'জহর' ব্রত—আগুনে আত্মোৎসর্গ করা, যবের মণ্ডকে বলা হয় 'যবাগূ', তা' থেকে জাত 'জাউ', এখন চালেরও হয় (খুদের জাউ)। 'গবাক্ষ'—মূল অর্থ 'গোরুর চোখ', তৎসাদৃশ্যে 'ঘুল-ঘুলি'-জাতীয় বাতায়ন, এক্ষণে যে কোন আকৃতিবিশিষ্ট বাতায়ন। বিশেষ নদী 'গঙ্গা' থেকে জাত 'গাঙ' অর্থে যে কোন নদীই বোঝায়। যার ধন আছে, তিনিই ছিলেন 'ধন্য', এখন 'সৌভাগ্যবান' অর্থে ব্যবহৃত হয়। 'নাছ'—মূল শব্দটি 'রথ্যা'—অর্থাৎ যে পথ দিয়ে রথ চলে। তার বিবর্তনে রচ্ছা>লচ্ছা>নাছ—অর্থ, বড় রাস্তায় সম্মুখস্থ দরজা, প্রধান ফটক। কিন্তু অন্তঃপুরিকারা খিড়কি দরজাকেই চলাচলের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করেন, অতএব এটিই তাদের নিকট 'নাছ দুয়ার'। শব্দটির উপর 'পাছ দুয়ার' শব্দের প্রভাব থাকা সম্ভব। 'শ্বশুর'—শব্দটির মূল্য 'স্বামীর পিতা' (অবশ্য ব্যুৎপত্তিগত অর্থ 'যিনি আশু অর্থাৎ দ্রুত ভোজন করেন'—কিন্তু এর তাৎপর্য বোঝা যায় না), কিন্তু এখন কন্যার পিতাও শ্বশুর পদবাচ্য।

ব্যক্তির নাম বস্তুনিরপেক্ষ হয়ে অনেক সময় সাধারণ বস্তু বা ভাবের পরিচায়ক হ'য়ে দাঁড়ায়। Sandwitch নামক ব্যক্তির নাম থেকে 'মাঝখানে পুর দেওয়া খাবার'; Macintosh-এর নাম থেকে বর্ষাতি। Lady Canning-এর নাম থেকে 'লেডিকেনি' নামক মিষ্টি; Boycott নামক ব্যক্তি একঘরে হ'য়েছিলেন—তা থেকে boycott করা অর্থাৎ কোনরকম সম্পর্ক না রাখা; ষণ্ড এবং অমর্ক নামক প্রহ্লাদের কৃষ্ণ-বিদ্বেষী গুরুর নাম থেকে 'ষণ্ডামার্ক' -রূপ বিশেষণ; 'বিভীষণ, মীরজাফর' নামক বিশ্বাস-ঘাতকের প্রতিশব্দরূপে ব্যবহারের মধ্য দিয়ে শব্দের অর্থপ্রসারই লক্ষ্য করা করা যায়। 'উজবুক'—মোগলদের সঙ্গে আগত অশ্বারোহী উজবেগিস্থানের সৈন্য, এদের যত দৈহিক শক্তি-সামর্থ্য ছিল, সেই পরিমাণে বুদ্ধি ছিল না। তাই 'অজ' এবং 'বোকা' শব্দানুষঙ্গ ও অর্থানুষঙ্গের যুক্ত হ'য়ে নির্বোধ অর্থে পরিণত হলো উজবুক।

কোন স্থান থেকে আগত বস্তুর নামের সঙ্গে ঐ স্থানের নামের যোগাযোগেও শব্দার্থের প্রসার ঘটে। ব্যাটাভিয়া থেকে আগত 'বাতাবী লেবু', মিশর থেকে আগত বলে 'মিশ্রি', চীন থেকে 'চিনি', সুর্পারিক থেকে আগত 'সুপারি', ভুটান থেকে আগত 'ভোট' (কম্বল), মার্তাবান থেকে আগত 'মর্তমান' কলা প্রভৃতি।

(ঙ) **অর্থ-সংক্রম/অর্থ-সংশ্লেষ বা শব্দার্থের সম্পূর্ণ পরিবর্তন**—শব্দার্থের ক্রমান্বিত সঙ্কোচ এবং প্রসারের ফলে মধ্যবর্তী স্তরের অর্থ লুপ্ত হয়ে যায়, তখন মূল অর্থের সঙ্গে প্রচলিত অর্থের আর কোন সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া যায় না—এই-ভাবেই অর্থসংক্রম ঘটে থাকে। 'তত্ত্ব' এবং 'সন্দেশ' শব্দ দুটির মূল অর্থ ছিল—'সংবাদ' ; সম্ভবতঃ কন্যাগৃহে সংবাদ আদান-প্রদান কালে কাপড়-চোপড় এবং মিষ্টি দ্রব্য পাঠানোর নিয়ম ছিল ; তা থেকে ক্রমে মুখ্য সংবাদ-এর প্রয়োজন বাতিল হ'য়ে 'তত্ত্ব' অর্থে কাপড়-চোপড় এবং 'সন্দেশ' অর্থে এক জাতীয় 'মিষ্টি দ্রব্য' হ'য়ে দাঁড়াল। 'পুরোহিত' শব্দের মূল অর্থ—সম্মুখস্থিত অগ্নি, তা থেকে হ'লো—যিনি সম্মুখে থেকে যাজন করেন, এখন যিনি যজমানের পক্ষে স্বয়ং পূজা করেন। 'মণ্ডপ' শব্দের মূল অর্থ 'মণ্ডপানকারী'—সম্ভবতঃ কোন সময় সবাই মিলে এক জায়গায় বসে মণ্ডপান করতো, তা থেকে সর্বসাধারণের মিলন স্থান অর্থে 'মণ্ডপ' শব্দ ব্যবহৃত হচ্ছে। 'দারুণ'—'দারু' শব্দের অর্থ কাঠ, যা' অতিশয় কঠিন ও রসশূন্য : দারু-বৎ কঠিন ও রসহীন অর্থই দারুণ শব্দের মূল অর্থ। তা থেকে ক্রমশঃ হৃদয়হীন, নিষ্ঠুর, ভয়ানক, অতিশয় (দারুণ সুন্দর) অর্থ দাঁড়িয়ে গেল। 'প্রসাদ'-এর মূল অর্থ অনুগ্রহ, তা থেকে উচ্ছিষ্ট খাদ্য বা নিবেদিত বস্তু। 'লোহ' ছিল লাল রঙের ধাতু, তা থেকে বর্তমান 'লোহা' ; 'শুশ্রূষা'—মূল অর্থ শোনার ইচ্ছা, প্রচলিত অর্থ 'সেবা'। 'ঘড়েল', লোক বলতে বোঝায় খুব চালাক-চতুর ব্যক্তিকে,—মূলে ছিল 'ঘটিকাপাল'>'ঘড়িয়াল'—অর্থাৎ বালুকাঘড়ি বা জলঘড়ির তদারককারী অতি সতর্ক ব্যক্তি। 'প্রবন্ধ' শব্দের মূল অর্থ 'প্রকৃষ্ট বন্ধন যার', এখন রচনা মাত্রই প্রবন্ধ। 'সহজ' মানে 'সহজাত' তা থেকে 'অনায়াসসাধ্য'। 'পাষণ্ড' ধর্ম-সম্প্রদায় বিশেষ> বিরুদ্ধ ধর্মসম্প্রদায়>বিরুদ্ধাচারী>নিষ্ঠুর। ঘর্ম=গরম (তুং Thermos), তা থেকে স্বেদ (ঘাম)। 'বিবাহ, পরিণয়, পাণিগ্রহণ/পাণিপীড়ন' প্রত্যেকটি শব্দের সঙ্গেই 'বহন করা' বা 'নিয়ে যাওয়া' ইত্যাদি বলপ্রয়োগের পরিচয় আছে, কিন্তু এখন সবটাই সম্মতিসূচক। 'গোষ্ঠী' বলতে বোঝাতে—যাদের গোরু এক স্থানে থাকতো—এখন এখন এক বংশের লোককে বোঝায়। বর>নির্বাচনকারী>কন্যা নির্বাচনকারী>নির্বাচিত পাত্র>নব বিবাহার্থী>কন্যার স্বামী>স্বামী। 'পদার্থ'

শব্দের মূল অর্থ 'পদের অর্থ, অভিধেয়'। কিন্তু অর্থপরিবর্তনে বস্তুমাত্রই পদার্থ। ষড়্দর্শনের প্রত্যেকটিতে এর বিভিন্ন সংজ্ঞা ও সংখ্যা দেওয়া হ'য়েছে। বিজ্ঞানশাস্ত্রে ভৌতবিজ্ঞান (Physical Science)-কে 'পদার্থবিজ্ঞান' নামে অভিহিত করা হয়। 'গবেষণা' শব্দের মূল অর্থ 'গোরু খোঁজা'। 'আংটি' শুধু অঙ্গুষ্ঠে পরা হ'তো। 'কুমার-কুমারী' অর্থ ছিল ছিল বালক-বালিকা।

[চার] ভাষা-আধারিত প্রত্ন-ইতিহাস (Linguistic Palaeontology)

(ক) পরিচয়

শব্দার্থতত্ত্ব তথা বাগর্থবিজ্ঞানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত একটি শাখার নাম দেওয়া যায় 'ভাষা-আধারিত প্রত্ন-ইতিহাস' বা Linguistic Palaeontology বা Urges-chichte। বিষয়টি অতিশয় প্রয়োজনীয় এবং আগ্রহোদ্দীপক, কিন্তু তৎসত্ত্বেও বাঙলা ভাষায় একান্ত উপেক্ষিত হয়ে রয়েছে এতকাল। উপেক্ষিত এই কারণেই বলছি—বাঙলায় ভাষাবিদ্যা-বিষয়ক বহু গ্রন্থ রচিত হলেও একান্ত প্রয়োজনীয় এই বিষয়টি কোথাও আলোচিত হয়নি, ক্বচিৎ কোথাও উল্লেখ করা হয়েছে মাত্র। বিচ্ছিন্নভাবেও এ বিষয়ে কোন আলোচনা বড় একটা চোখে পড়েনি।

Palaeontology শব্দটি বিশ্লেষণ করলে তার অর্থ দাঁড়ায় 'প্রত্নতত্ত্ববিদ্যা' (*Palaeo*=প্রত্ন, *Ontology*=তত্ত্ববিদ্যা)। গোটা শব্দটি বিজ্ঞানশাস্ত্রের একটি বিশেষ পারিভাষিক অর্থে ব্যবহৃত হয় 'প্রত্নজীববিদ্যা' বা 'জীবাশ্মবিজ্ঞান' অর্থে। ভূবিদ্যার (Geology) এই শাখাটির আলোচনায় জীবাশ্মের অস্তিত্ব থেকে পৃথিবীর আদিমযুগীয় অথচ অধুনাবিলুপ্ত বিভিন্ন জীবের অস্তিত্ব-বিষয়ে জ্ঞানলাভ করা যায়; উদ্ভিদবিজ্ঞানেও এর সার্থক প্রয়োগ লক্ষিত হয়। কিন্তু ভাষাশাস্ত্রে শব্দটি একটু পৃথক্ অর্থে প্রযুক্ত হয়ে থাকে। এখানে Palaeontology শব্দটি 'প্রত্ন ইতিহাস' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ Linguistic Palaeontology দ্বারা বোঝায় ভাষাশাস্ত্রের এমন একটি বিভাগ, যার সহায়তায় আমরা বিলুপ্ত ইতিহাস-পূর্বযুগের কিছু কিছু তথ্য পুনরুদ্ধার করতে পারি। এই ইতিহাস গড়ে তুলতে হবে শব্দ তথা ভাষাকে আধার করেই, অতএব সার্থক নামকরণ 'ভাষা-আধারিত প্রত্ন-ইতিহাস'; জার্মান ভাষায় শব্দটি Urgeschichte, অর্থ 'Pre-history' বা প্রত্ন-ইতিহাস।

ভাষাতত্ত্ব-বিষয়ক আলোচনার অন্যতম পথিকৃৎ ম্যাক্সমূলারই (Friederich Max-Muller, 1820—1903 A. D.) সর্বপ্রথম Urgeschichte শব্দটি ব্যবহার করেন

এবং শব্দের সাহায্যে যে প্রাচীন ইতিহাস কিছুটা উদ্ধার করা সম্ভবপর তার পথ প্রদর্শন করেন। ইন্দো-য়ুরোপীয় আর্যভাষার বিভিন্ন শাখার প্রাচীন শব্দগুলোর তুলনামূলক আলোচনার সাহায্যে যে প্রাচীন আর্যজাতির ইতিহাস তথা জীবনযাত্রার বিভিন্ন দিক্ সম্বন্ধে কিছু কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আবিষ্কার করা যায়, সে বিষয়ে তিনিই সর্বপ্রথম আলোকপাত করেন। কিন্তু তাঁর নিজস্ব গবেষণা সর্বক্ষেত্রে বিজ্ঞানভিত্তিক না হওয়াতে তাঁর সমস্ত সিদ্ধান্ত নির্বিচারে মেনে নেওয়া যায় না। এ বিষয়ে শ্রাডের (O. Schrader, 1855—1919 A. D.) বিস্তর পরিশ্রম করে একাধিক গ্রন্থে ইন্দো-য়ুরোপীয় আর্যভাষা-ভাষী জনগোষ্ঠীর হারিয়ে যাওয়া ইতিহাস অনেকটা উদ্ধার করেছেন। বস্তুতঃ ভাষা-আধারিত প্রত্ন-ইতিহাসের গবেষকদের মধ্যে একক কৃতিত্বে শ্রাডের-এর কীর্তি সর্বাধিক সমুজ্জ্বল।

ইন্দো-য়ুরোপীয় আর্যভাষার অনেকগুলো শাখা বর্তমান এবং অনেক শাখাতেই কিছু কিছু প্রাচীন সাহিত্যও রয়েছে। এদের মধ্যে আবার সংস্কৃত, গ্রীক ও লাতিন এবং প্রাচীন পারসিক ভাষায় খ্রীষ্টপূর্বকালের লিখিত সাহিত্য পাওয়া যাচ্ছে, লিথুআনীয় ভাষায় অতিশয় প্রাচীন সাহিত্য না থাকলেও এই ভাষার রক্ষণশীলতার জন্য এর প্রাচীন রূপ অনেকত্র অব্যাহত রয়ে গেছে। এই সমস্ত ভাষার প্রাচীন রূপগুলোর তুলনামূলক আলোচনার সাহায্যে আমরা মূল আর্যভাষাভাষী জনগণের জীবনযাত্রার অনেকখানি পরিচয় লাভ করতে পারি। বস্তুতঃ ইন্দো-য়ুরোপীয় ভাষার ক্ষেত্রে প্রাচীন ইতিহাস উদ্ধারের যে সুযোগ পাওয়া যাচ্ছে, অপর কোন ভাষাগোষ্ঠীর পক্ষে ততখানি সুযোগ এত সুলভ নয়। প্রাচীন আর্যজাতির ইতিহাস-উদ্ধারের কার্যে শব্দবিদ্যার সহায়তা অত্যাবশ্যক। "The linguistic possibilities we have for reconstructing the culture of the Indo-European community have been exploited by study known as Linguistic Palaeontology' (*W. P. Lehmann*)। এ বিষয়ে বিগত শতাব্দীর ভারতীয় মনীষী অক্ষয়কুমার দত্তের উক্তিটিও স্মরণীয়ঃ "কিন্তু ধন্য শব্দবিদ্যা। ইউরোপীয় শাব্দিকদিগকে শতবার ধন্যবাদ। আমরা ঐ মৃতসঞ্জীবনী শব্দবিদ্যা-প্রভাবে ঐ অপরিজ্ঞেয় কল্প আর্যবংশীয়দিগের কিছু কিছু পরিচয় প্রাপ্ত হইয়াছি।"

(খ) আলোচনা-পদ্ধতি

এলোপাথাড়ি কতগুলো শব্দ নিয়ে প্রত্ন ইতিহাস উদ্ধার করা সম্ভব নয়। এর জন্য কতকগুলো বিশেষ পদ্ধতির মধ্য দিয়ে এগুতে হয়। ভাষার কয়েকটি শাখার মধ্যে বিশেষ কোন শব্দ পাওয়া গেলেই শব্দটিকে মূল ভাষার শব্দ বলে গ্রহণ করা চলবে,

শুধু ঘনিষ্ঠসম্বন্ধযুক্ত ভাষাগুলোর মধ্যে গেলে চলবে না। সংস্কৃত ও ঈরানী ভাষায় কোন শব্দ পেলে তা থেকে মূলে পৌঁছুনো যাবে না, বরং যদি সংস্কৃত ও ইংরেজী কিংবা ফরাসী ভাষায় কোন কোন শব্দসাদৃশ্য পাওয়া যায় (পারস্পরিক প্রভাব-বর্জিত), তাহলে বরং ওরূপ শব্দকে মূল ভাষার শব্দ বলে অনুমান করা চলতে পারে। এ বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে, যেন শব্দটি এক ভাষা থেকে অপর ভাষায় ঋণস্বরূপ গৃহীত না হয়ে থাকে। গুচ্ছবদ্ধ শব্দের কোন একটি শব্দ যদি সমস্ত শাখায় প্রাপ্তব্য না হয় অথচ অন্য শব্দগুলো পাওয়া যায়, তবে ঐ শব্দটির অস্তিত্ব স্বীকার করে নিতে হয়। হয়তো কোন বিশেষ কারণে কোন বিশেষ ভাষায় ঐ বিশেষ শব্দটি বর্জিত হয়ে থাকতে পারে। যেমন, 'দুই' থেকে 'শত' পর্যন্ত সমস্ত সংখ্যা সব ইন্দো-য়ুরোপীয় ভাষায় পাওয়া যাচ্ছে, কিন্তু 'এক' পাওয়া যাচ্ছে না (সং 'এক', ইং 'one' এক শব্দজাত নয়), অতএব একের একটি সাধারণ রূপ সব ভাষায় প্রচলিত ছিল বলে ধরে নেওয়া হয়। নাক, কান, চোখ, পা প্রভৃতি প্রত্যঙ্গের সাধারণ রূপ সব ভাষায় আছে, অথচ 'হাত'-এর তেমন কোন সাধারণ রূপ নেই—এটাও ছিল বলে ধরে নিতে হয়। কালে কালে শব্দার্থের পরিবর্তন ঘটে—এই সত্যটি মনে রেখেই শব্দ বাছাই করতে হয়। সং 'গিরি' (পর্বত), লিথু 'গিরে' (অরণ্য), প্রাচীন প্রুশীয় 'গরিয়ম্' (=গাছ), মূলতঃ একই শব্দ অথচ বিভিন্ন ভাষায় অর্থের রূপান্তর ঘটেছে। কোন ভাষার একটিমাত্র শব্দ থেকে কোন সিদ্ধান্তে আসা সঙ্গত নয়। সং 'ভ্রাতা' শব্দের বিশ্লেষণে অর্থ দাঁড়ায় 'যে বহন করে', এবং 'দুহিতা'—'যে দোহন করে'—এ থেকে ম্যাক্সমূলর অনুমান করেছেন যে ইন্দো-য়ুরোপীয় আর্যদের পরিবারে যারা শিশুদের বহন করতো তারা ছিল 'ভ্রাতা' এবং যারা গো দোহন করতো তারা ছিল 'দুহিতা'। একালের ভাষাবিজ্ঞানিগণ এ ধরনের সিদ্ধান্তে আপত্তি জ্ঞাপন করেন। কোন বস্তুর পরিচিতির ব্যাপারটি নানা দিক্ থেকে বিচার করে দেখা দরকার। 'অশ্ব' শব্দের প্রতিশব্দ সব ভাষাতেই পাওয়া যাচ্ছে (সং 'অশ্ব', প্রা° পা° 'অস্পো', গ্রী 'হ্‌স্', ই° horse)—এ থেকে শুধু এটুকু সিদ্ধান্তই করা চলে যে প্রাচীন আর্যগণ অশ্বের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। কিন্তু যখন 'রথ' বা 'ঘোড়দৌড়' প্রভৃতি শব্দও সব ভাষায় পাওয়া যাচ্ছে, তখন সিদ্ধান্ত নেওয়া চলে যে প্রাচীন আর্যগণ শুধু অশ্বের সঙ্গে পরিচিতই ছিলেন না, তাঁরা অশ্বকে পোষও মানিয়েছিলেন।

(গ) আদি আর্যজাতির প্রত্ন ইতিহাস

ইন্দো-য়ুরোপীয় আর্যভাষাভাষী জনগোষ্ঠীর প্রাচীন সভ্যতা, সংস্কৃতি এবং

সমাজ-সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জনের যতগুলো উপায় আছে, তাদের মধ্যে শব্দবিদ্যা শুধু অন্যতম নয়, সম্ভবতঃ তাকে একতম বলে অভিহিত করাই সঙ্গত। কারণ, প্রাচীন আর্যগণ কোথায় বাস করতেন, তাদের খাদ্যাভ্যাস কীরূপ ছিল অথবা তাদের পারিবারিক জীবনই বা কেমন ছিল, এসব বিষয়ের কোন লিখিত প্রমাণ নেই, কোন প্রাচীন কীর্তি নেই, এমনকি কোন স্থাপত্য শিল্পের ধ্বংসাবশেষেরও চিহ্ন পাওয়া যায় না। এই অবস্থায় বিভিন্ন ভাষার তুলনামূলক আলোচনার সাহায্যে আদি আর্যভাষার একটা কাল্পনিক কাঠামো দাঁড় করিয়ে তা' থেকেই আদি আর্য জাতির প্রত্ন ইতিহাস উদ্ধার করা যেতে পারে।

দেহের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের নাম পাওয়া যাচ্ছে প্রায়-সব ভাষাতেই, কাজেই ইন্দো-য়ুরোপীয় জাতি যে নিজেদের দেহবিষয়ে সচেতন ছিলেন, তা সহজেই বোঝা যায়। চোখ (অক্ষি—গ্রী· okkos, লা· oculus), নাক (নাসা—nose), দাঁত (দন্ত—গ্রী· odonto· লা· denus, ইং tooth), পাদ (পাদ—গ্রী podos, ইং foot), উদর (udder), হৃৎ (heart), কপাল (গ্রী· kephale, cephal), অস্থি (গ্রী· osteon), চর্ম (গ্রী· derma) প্রভৃতি। দেহের সঙ্গে মনের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য, তাই মানসিক গুণ ও ক্রিয়াবাচক অনেক শব্দও বিভিন্ন ভাষায় পাওয়া যাচ্ছে। যাওয়া (গম্—go), খাওয়া (অদ্—eat), জানা (জ্ঞা—know), দেখা (লোক্—look), বহা (ভৃ—bear), ঘুমান (স্বপ্ গ্রী· hupnos, লা· sopor)।

ইন্দো-য়ুরোপীয় সম্প্রদায় প্রধানতঃ মৃগয়াজীবী এবং যাযাবর হলেও তাদের মধ্যে পরিবারবন্ধন যে দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় পারিবারিক সম্পর্কবাচক বিভিন্ন শব্দ থেকে। পিতর্ (father), মাতর্ (mother), ভ্রাতর্ (brother), বোন্ (স্বসৃ—sister), পুত্র (সূনু—son), কন্যা (দুহিতর্—daughter)। বিবাহ যে সামাজিক কৃত্য বলে পরিগণিত হতো তার প্রমাণও পাওয়া যায় বিভিন্ন শব্দে। পুত্রবধূ (স্নুষা—গ্রী· nuos, প্রা· জা· snura), শ্বশুর (গ্রী· hekura, গ· swaihre, প্রা· জা· swigar)। এ দু'টি শব্দের প্রতিশব্দ ইংরেজি ভাষায় নেই, বাংলাতেও 'স্নুষা' চলে না। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য যে, শ্বশুর শব্দের মূল অর্থ ছিল 'স্বামীর পিতা', অর্থ-প্রসারে 'পত্নীর পিতা' হয়েছে। গ্রীক ভাষায় 'Pentheros' শব্দটি ব্যবহৃত হয় পত্নীর পিতা 'শ্বশুর' অর্থে। 'জামাতা' শব্দের প্রতিশব্দ ঈরানী ভাষায় পাওয়া যায় 'দামাদ', অন্য ভাষায় নেই। এ থেকে অনুমিত হয়, তৎকালীন সমাজ ছিল পিতৃতান্ত্রিক এবং পুত্রবধূ স্বীয় পরিবারভুক্ত হ'লেও জামাতারা একটু দূরেই ছিলেন। বৈধব্য প্রথা যে তৎকালেও প্রচলিত ছিল

তার প্রমাণ পাওয়া যায় 'বিধবা' (ইং widow, রুশ vdova) শব্দ থেকেই। পারিবারিক সীমার বাইরে যে বৃহত্তর সমাজ কোন রাজতন্ত্র দ্বারা শাসিত হতো তা অনুমিত হয় রাজবাচক শব্দের উপস্থিতি দ্বারা—রাজ্ (লা˙ rex, আই˙=ri)।

ইন্দো-য়ুরোপীয় আর্যজাতি যে পশুপাখি বা উদ্ভিদ-জগতের সঙ্গে খুব বেশি পরিচিত ছিলেন না, তা বোঝা যায় ঐ সমস্ত বিষয়ের স্বল্পসংখ্যক বস্তুর নাম থেকে। উদ্ভিদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য নাম ভূর্জ (birch)। Oak এবং willow গাছও তাদের পরিচিত বলে জানা যায়। তবে বৃক্ষবাচক 'দারু' (দ্রু˙ গ্রী˙ drus, ইং tree) শব্দটি ও'রা ব্যবহার করতেন। . গৃহপালিত পশুদের মধ্যে গোরু (গো, আবেঃ gao, গ্রী˙ bous, ইং cow), ঘোড়া (অশ্ব, ঈ˙ অস্প, গ্রী. eqqus ইং horse), মেষ (অবি, গ্রী. ois, লা˙ ovi-s), ছাগ, কুকুর (শ্বন্—hound), খরগোস (শশক—hare), প্রভৃতি ছাড়া আর পরিচিত ছিল ভালুক (bear), শূকর (বরাহ—boar) ইঁদুর (মূষা —mouse), ভোঁদড় (উদ্র—otter), হাঁস (হংস, গ্রী˙ khen, লা˙ auser, ইং goose), নেকড়ে (বৃক, ঈ˙ vehrka, গ্রী. lukos, ইং wolf), মৌমাছি (মক্ষী, ঈ ma hski, লা˙ musca, ফ˙ mouche) প্রভৃতি। তাঁদের মধ্যে মাছের কোন প্রতিশব্দ কিংবা নাম এবং বিশেষ কোন শস্যের নাম না পাওয়া যাওয়াতে অনুমান হয় যে ইন্দো-য়ুরোপীয় সম্প্রদায় সম্ভবতঃ একান্তভাবেই মাংসাশী ছিলেন। মাছ বা দানাশস্যের ব্যবহার তখনো শুরু হয়নি।

অনেকে অনুমান করেন আদিম আর্যজাতি সম্ভবতঃ তখনো ধাতু যুগে প্রবেশ করেন নি, নব্য প্রস্তর যুগেই বাস করতেন। একমাত্র সম্ভবতঃ লৌহবাচক (?) 'অয়স্' (লা˙ aes, ইং ore) ছাড়া ধাতুর কোন প্রতিশব্দ কিংবা সোনা, রুপা, তামা প্রভৃতি কোন ধাতুরই নাম পাওয়া যায় না।

দেব-কল্পনাতে প্রাচীন আর্যজাতি গোড়ায় সম্ভবতঃ প্রকৃতিনির্ভর ছিলেন, পরে অসীরিয় বা সুমেরীয়দের প্রভাবে বিভিন্ন দেবদেবীর সৃষ্টি হ'তে পারে। ইন্দো-ঈরানীয় বা আর্যভাবনায় যেমন স্বাধীনভাবে ইন্দ্র, মিত্র-আদি দেবতার সৃষ্টি হয়েছিল তেমনি স্বাধীনভাবেই গ্রীক ও রোমকরাও অসংখ্য দেবদেবীর সৃষ্টি করেছিলেন। উত্তরাধিকার-সূত্রে প্রাচীন আর্যজাতি থেকে উভয় গোষ্ঠী দেবতাকে লাভ করেছিলেন তাদের মধ্যে আছেন—দ্যৌঃ পিতর্—*Dyeus Peters (তুং—Zeus, Jupiter), পৃথিবী মাতর্—Plthəwiə Mater. *Suwelios=সুবলীয়স্ (সূর্য), *Ausos =উষস্, *wntos=বাতস্ প্রভৃতি।

আদি আর্যজাতির বাসস্থান এবং পরিবেশ-আদি বিষয়ে পাশ্চাত্যের গবেষকগণ যে

সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন, তার সারমর্ম পাওয়া যায় সুইজারল্যাণ্ডের Henne am Rhyn-কৃত *Kulturgeschichte des deutschen Volks* (*Cultural History of the German People*)-গ্রন্থে। তার ইংরেজি অনুবাদের অংশবিশেষ আগ্রহী পাঠকের কৌতূহল নিবৃত্ত করতে পারে। তিনি লিখেছেন: "Yet according to the common legends and vocabulary of the Aryan peoples and languages, we are able to assume with approximate reliability at any rate the following about the unknown cradle of the languages; it was a rather cold and bleak land in which ice, snow, clouds, fog and rain were familiar and winds frequent. The country was mountainous; there were summits called 'teeth', rocky clefts and gorges (Sanskrit and Norse gap), swamps, rivers, lakes and ponds. It was doubtful whether the land bordered on the sea. Birch and fir-tree grew there, as well as various cereals; tropical plants were as unknown as the Asiatic animals lion, tiger, donkey, camel, elephant, whereas wolf and bear haunted the region, the beaver built its dams and the mouse was a nuisance; bulls (or oxen) and cows were bred, also goats, sheep and pigs; there were also geese and chickens. The people kept herds and flocks of these animals, supervised by cowherds and shepherds and watched over by dogs; consequently, they also practised dairy-farming. Besides, the inhabitants lived by agriculture, baked bread, drank mead from honey and sheared the sheep of its wool which, the same as flax, they spun, wove and sewed into clothes. The horse was also known but neither bred nor used for riding. Of the wild birds, the owl and quail were known. The inhabitants further made paths and fords over the rivers (though apparently no bridges as yet); they propelled ships, or at any rate boats (modern German *Nachen*: Sanskrit nau, nava': old German Nauem) with oars (Sanskrit—aritra) made pottery. hammered together wooden houses with doors, rediers very primitive carts, fought with club and battle-axe, bow and arrow, spear and sword, which were

probably still made of stone (the use of metal cannot be conclusively proved). They had fortified places (Sanskrit Puri, pura : Greek polis : Lithuanian pilis) as well as villages—but no towns. They designated numbers, stopping short of one thousand, counted time in years and months, were familiar with the concepts of thinking and knowledge and of simple medicine. They also know the degrees of kinship familiar to us, had a well-ordered family system, tribal princes, kings (naturally minor ones), diets. accepted laws and judges. They sang songs, made up myths and legends, especially about demonic creatures tempting humans or working for them which were often part beast part human. In the form of certain animals, yet more often of gods resembling humans, all of which they originally named after forces of nature, they worshipped the glow of the heavenly light, particularly of sun, moon and dawn, as well as the forces of fire and thunder-storm ; they revered their ancestors under the term of 'man', 'human being', and their heroes (Sanskrit vira : Latin vir) and believed in the immortality of the soul."

একাদশ অধ্যায় | # বাক্যতত্ত্ব/পদবিধি
(Syntax)

[এক] আকৃতিমূলক শ্রেণীবিভাগ

ভাষার আধার বাক্য। মননশীল মানুষের চিন্তাভাবনা কোন একটি বস্তুর বা ভাবের নামকে আশ্রয় করে বর্তমান থাকে না, তার মনে অবিচ্ছিন্নভাবে একটা চিন্তার প্রবাহ বইতে থাকে। তাই, কোন বিশেষ শব্দ দ্বারা কোন বস্তু বা বিষয়ের বোধ জন্মালেও সঙ্গে সঙ্গে অখণ্ড বাক্যপ্রবাহের মধ্যে সেই বস্তু, ভাব বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ে অতএব শব্দমাত্রকে অবলম্বন করে মানুষের মনোভাব কখনো স্ফূর্তি লাভ করতে পারে না।

বাক্যের অংশ পদ বা শব্দ। এ বিষয়ে ভাষাভেদে বৈচিত্র্য দেখা যায়। সংস্কৃত ভাষায় বাক্যের অংশ 'পদ', ইংরেজি ভাষায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে 'শব্দ'। পদ এবং শব্দের পার্থক্য এই—বস্তু-ভাব-ক্রিয়াবোধক অর্থবহ ধ্বনিসমষ্টি 'শব্দ', শব্দের সঙ্গে বিভক্তি যুক্ত হলে তা হয় 'পদ'। বাক্যমধ্যস্থ এক শব্দের সঙ্গে অপর শব্দের সম্পর্ক বোঝানোর জন্য শব্দের সঙ্গে বিভক্তি যুক্ত হয়ে থাকে। নাম শব্দের সঙ্গে যুক্ত বিভক্তিকে বলা হয় **শব্দ-বিভক্তি** এবং ক্রিয়া পদের সঙ্গে যুক্ত বিভক্তিকে বলা হয় **ক্রিয়াবিভক্তি**। সংস্কৃতে অব্যয় বা নিপাত-ব্যতীত অপর সকল শব্দের সঙ্গে বিভক্তি যোগ আবশ্যিক। 'নাপদং শাস্ত্রে প্রযুঞ্জীত'—অপদ অর্থাৎ বিভক্তিহীন শব্দ কখনো বাক্যে ব্যবহৃত হতে পারে না। বাঙ্‌লা ভাষায়ও অনুরূপভাবে শব্দের সঙ্গে বিভক্তি যোগ করেই বাক্যে ব্যবহার করা হয়, তবে অনেক স্থলে বিভক্তি চিহ্ন লুপ্ত বা অদৃশ্য, কখন বা অপর কোন শব্দ দ্বারা বিভক্তির অভাব পূরণ করা হয়। ইংরেজি ভাষায় ক্রিয়ার সঙ্গে বিভক্তি চিহ্নযুক্ত হলেও নাম শব্দের সঙ্গে কোন সম্পর্কবাচক বিভক্তি যোগ করা হয় না। বচন বা জাতিবাচক বিভক্তি চিহ্ন যুক্ত হয়, এবং সম্বন্ধ পদ বোঝানোর জন্য কোন কোন ক্ষেত্রে একটি বিভক্তি চিহ্নের ব্যবহার আছে। ক্বচিৎ কোন শব্দও এমনভাবে সম্পর্কযুক্ত করে গঠিত (him, my, yours) যেখানে বিভক্তি যোগের প্রয়োজন হয় না। আবার কোন কোন ভাষায় বিভক্তি চিহ্নের ব্যবহার একেবারেই নেই। বাক্যে শব্দের অবস্থান থেকেই পারস্পরিক সম্পর্কের বোধ জন্মে। এমন কোন কোন ভাষা আছে, যে ভাষায় শব্দ আর বাক্যের কোন পার্থক্য থাকে না, গোটা বাক্যই একটি মাত্র

শব্দ পুঞ্জীভূত হয়। বস্তুবোধক শব্দের অস্তিত্ব থাকা সত্ত্বেও সেই বস্তুকে যখন বাক্যে প্রয়োগ করা হয়, তখন বস্তুবোধক শব্দের পৃথক সত্তা আর বর্তমান থাকে না। আমেরিকার আদিম অধিবাসী ইরোকুইস্‌দের ভাষা থেকে একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক্। তাদের ভাষায় 'জল'-বাচক একটি শব্দ আছে—'awen'। যখন জলকে তারা বাক্যে ব্যবহার করে, তখন দেখা যায় ১. আমি জলের কাছে গিয়েছিলাম—eschoirhon, ২. জলের কাছে যাও—setsonha, ৩. এই বালতিতে জল আছে—ondequoha, ৪ এই পাত্রে জল আছে—daustantewacharet। শেষোক্ত দুটি বাক্যের বক্তব্য প্রায় এক হওয়া সত্ত্বেও বাক্য দুটি তথা বাক্য-শব্দ দুটিতে কত পার্থক্য। অতএব বাক্যের সঙ্গে বাক্য শব্দের অনেক ব্যবধান দেখা যায়। এই কারণেই গঠন-বৈচিত্র্য লক্ষ্য করে বাক্যের চতুর্ধা রূপ স্বীকৃত হয়ে থাকেঃ ১. অসমবায়ী বা অযোগাত্মক (Isolating), ২. সমবায়ী বা প্রশ্লিষ্ট যোগাত্মক (Incorporating), ৩. যৌগিক বা অশ্লিষ্ট যোগাত্মক (Agglutinating) এবং ৪. সমন্বয়ী বা শ্লিষ্ট যোগাত্মক (Inflectional)। [এই বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনার জন্য দ্বিতীয় অধ্যায়ে রূপগত বিভাগ দ্রষ্টব্য।]

(১) **অসমবায়ী বা অযোগাত্মক** বাক্যের বিশিষ্ট লক্ষণ এই যে বাক্যের মধ্যে শব্দের স্থান সুনির্দিষ্ট, এইজন্য এদের **আবস্থানিক বাক্য** বলেও অভিহিত করা হয়। শব্দে কোন বিভক্তিচিহ্ন যুক্ত হয় না। বাক্যে শব্দের অবস্থানের উপর কর্তা-কর্ম-আদি কারকের ভাব বোঝায়। চীনা ভাষা ও সুদানী ভাষা এই বর্গের অন্তর্গত।

(২) **সর্বসমবায়ী বা প্রশ্লিষ্ট যোগাত্মক** বাক্যে শব্দ এবং বাক্যে কোন পার্থক্য নেই। পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদে ইরোকুইস ভাষায় এরূপ দৃষ্টান্ত প্রদত্ত হয়েছে।

(৩) **যৌগিক বা অশ্লিষ্ট যোগাত্মক** বাক্যে শব্দের আগে বা পরে সম্বন্ধনির্ণায়ক প্রত্যয় যুক্ত হয়ে থাকে। এরূপ প্রত্যয়ের ব্যবহারের মূল শব্দের আকৃতির কোন পরিবর্তন হয় না। হয়তো এক সময় এই প্রত্যয়গুলো গোটা শব্দ ছিল, পরে ক্ষয়িত হ'তে হ'তে প্রত্যয়ে পরিণত হয়েছে। দ্রাবিড় ভাষাগোষ্ঠী এবং তুর্ক-তাতার গোষ্ঠী এই বর্গের অন্তর্ভুক্ত।

(৪) **সমন্বয়ী বা শ্লিষ্ট যোগাত্মক** বাগ্‌রীতির ব্যবহারই পৃথিবীতে সর্বাধিক প্রচলিত। সেমীয়-হামীয় এবং ইন্দো-য়ুরোপীয় ভাষাগোষ্ঠী এই বর্গের অন্তর্ভুক্ত। এই জাতীয় ভাষায় বাক্যরীতির বিশিষ্ট লক্ষণ এই যে বাক্যস্থ শব্দগুলোর পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণীত হয় বিভক্তি বা প্রত্যয়ের সাহায্যে। বিভক্তির সামান্যতম পরিবর্তনেও বাক্যের অর্থ পরিবর্তিত হয়ে যেতে পারে। বিভক্তিগুলো শব্দদেহের সঙ্গে এমনভাবে

মিশে যায় যে শব্দের মূল রূপেরও পরিবর্তন ঘটে যেতে পারে। এই জাতীয় ভাষায় **সংশ্লেষাত্মক** (Synthetic) এবং **বিশ্লেষাত্মক** (Analytic)—দ্বিবিধ রূপ পাওয়া যায়। প্রাচীন কালে সংশ্লেষাত্মক রূপেরই প্রাধান্য ছিল, আধুনিক কালে ঐ সমস্ত ভাষার বিশ্লেষাত্মক প্রবণতা দেখা যায়। প্রাচীন সংস্কৃত, গ্রীক প্রভৃতি ছিল সংশ্লেষাত্মক, পক্ষান্তরে একালের বাংলা ও ইংরেজি প্রভৃতি বিশ্লেষাত্মক।

[দুই] বাক্যের অঙ্গ

পরিপূর্ণ মনোভাব প্রকাশের জন্যই বাক্য ব্যবহৃত হয়। অতএব সাধারণভাবেই অনুমান করা চলে যে বাক্যে একাধিক পদ বা শব্দের সমাবেশ ঘটবে। অনেক সময় একটিমাত্র শব্দেও মনোভাব প্রকাশ করা যেতে পারে, সেই ক্ষেত্রে শব্দটি পূর্ববর্তী কোন প্রশ্নের উত্তররূপে ব্যবহৃত হয় বলে শব্দটিকে বাক্যের পরিপূরক রূপে গ্রহণ করা চলে।

কোন একটি বিষয়, বস্তু, ভাব বা ক্রিয়াকে অবলম্বন করে বক্তা তার মনোভাব বাক্যে প্রকাশ করে থাকেন। যাকে অবলম্বন করে এই মনোভাব-প্রকাশিত হয় অর্থাৎ বক্তার যা উদ্দিষ্ট, তাকে বলা হয় **উদ্দেশ্য** (Subject)। এই উদ্দেশ্যকে অবলম্বন করেই কোন কিছু বলা হয়ে থাকে—উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যা বলা হয়, তাকে বলে **বিধেয়** (Predicate)। অতএব বাক্যের দুই অঙ্গ—উদ্দেশ্য এবং বিধেয়। যে কোন বাক্যে দু'টি অঙ্গই বর্তমান থাকবে ; অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রকাশ্যভাবে, কখনও বা কোন একটি উহ্য থাকতে পারে।

—রাম, তুমি কি বাড়ি ছিলে ?

—না।

—তবে সেখানে কাকে দেখতে পেলাম ?

—ভাইকে।

উক্ত কথোপকথনে দ্বিতীয় ব্যক্তি অর্থাৎ রামের উত্তর 'না' এবং 'ভাইকে'—একটিমাত্র শব্দের সাহায্যে গঠিত হয়েছে। কিন্তু লক্ষ্য করলেই বোঝা যায়, এই উত্তরটি প্রশ্নের পরিপূরক বলেই সংক্ষিপ্ত, পূর্ণ উত্তর উহ্য রয়ে গেছে। প্রথম উত্তরটি হবে—'আমি বাড়ি ছিলাম না', দ্বিতীয়টি হবে 'সেখানে তুমি আমার ভাইকে দেখেছিলে।'

ব্যাকরণের বিচারে উদ্দেশ্যকে বাক্যের **কর্তা** এবং বিধেয়কে **সমাপিকা ক্রিয়ারূপে** অভিহিত করা চলে। অতএব ব্যাকরণের পরিভাষায় বলা যায়, প্রতি বাক্যে একটি কর্তা এবং একটি সমাপিকা ক্রিয়া থাকা অত্যাবশ্যক। শুধুমাত্র কর্তা এবং ক্রিয়ার

সাহায্যে সর্বপ্রকার মনোভাব প্রকাশ সম্ভব নয় বলেই উদ্দেশ্য এবং বিধেয় অংশে পরিপূরক পদ বা বাক্যাংশ যোজিত হয়ে থাকে। এগুলোকে যথাক্রমে **উদ্দেশ্যের সম্প্রসারক** এবং **বিধেয়ের সম্প্রসারক** নামে অভিহিত করা চলে।

[তিন] গঠনগত শ্রেণীবিভাগ

বাক্যের গঠনের দিক থেকে বিচার করলে বাক্যকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা চলে। (ক) সরল বাক্য (Simple sentence), (খ) মিশ্র বা জটিল বাক্য (Complex sentence), (গ) যৌগিক বাক্য বা সংযুক্ত বাক্য (Compound sentence)।

(ক) **সরল বাক্য**—যে বাক্যে একটিমাত্র উদ্দেশ্য এবং একটিমাত্র বিধেয় বা সমাপিকা ক্রিয়া থাকে, তাকে বলে সরল বাক্য। অবশ্য এরূপ ক্ষেত্রে উদ্দেশ্য ও বিধেয় —উভয়ের প্রসারক থাকতে পারে।—'অযোধ্যাধিপতি দশরথের জ্যেষ্ঠপুত্র রামচন্দ্র পত্নী সীতা এবং ভ্রাতা লক্ষ্মণসহ পিতৃসত্য পালনার্থে বনে গেলেন।'

(খ) **মিশ্র বা জটিল বাক্য**—যে বাক্যে একটি উদ্দেশ্য এবং একটি বিধেয় থাকার পরও তার উপর নির্ভরশীল অপর কোন গৌণ খণ্ডবাক্য বা বাক্যাংশ থাকে, তাকে বলে 'মিশ্র' বা 'জটিল বাক্য'। 'যে কলমখানি তুমি আমাকে দিয়েছিলে, তা হারিয়ে গেছে।' এখানে 'তা' হারিয়ে গেছে'—প্রধান বা মুখ্য বাক্য এবং অবশিষ্টাংশটি অপ্রধান বাক্য, প্রধানটির উপর নির্ভরশীল। এই অপ্রধান বাক্যটি বিশেষ্যধর্মী, বিশেষণধর্মী বা ক্রিয়াবিশেষণধর্মী হ'তে পারে।

(গ) **যৌগিক বা সংযুক্ত বাক্য**—যে বাক্যে একাধিক সরল বাক্য ও/বা মিশ্র বাক্য থাকে এবং বাক্যগুলো সংযোজক বা বিয়োজক অব্যয় দ্বারা যুক্ত হয়, তাকে 'যৌগিক বাক্য' বলা হয়। এরূপ বৃহৎ বাক্যের অন্তর্গত বাক্যগুলোর প্রত্যেকটিই স্বনির্ভর। 'তুমি এখন বাড়ি গিয়ে চেষ্টা কর, আর যদি টাকার ব্যবস্থা করতে না পার তবে আবার ফিরে এসো।'—এ বাক্যে 'তুমি…কর' একটি সরল বাক্য, অবশিষ্টটি একটি মিশ্র বাক্য —দুটিকে 'আর'-শব্দ দ্বারা যুক্ত করায় যৌগিক বাক্য হলো।

[চার] অর্থগত শ্রেণীবিভাগ

অর্থের দিক থেকে বাক্যকে নানা শ্রেণীতে বিভক্ত করা চলে। শ্রেণীসংখ্যাবিষয়ে বৈয়াকরণগণ ঐকমত্য পোষণ করেন না। পূর্বোক্ত ত্রিবিধ বাক্যকেই অন্ততঃ সাতটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা চলে।

১. **নির্দেশাত্মক বাক্য** (Indicative sentence)—অস্ত্যর্থক (affirmative) বা সদর্থক এবং নাস্ত্যর্থক বা নঞর্থক (negative) ভেদে নির্দেশাত্মক বাক্য দ্বিবিধ।

অস্ত্যর্থক—আমরা সকলেই কাল এসেছি। **নাস্ত্যর্থক**—তোমাকে দিয়ে আর কাজটা হ'ল না।

২. **প্রশ্নাত্মক বাক্য** (Interrogative sentence)—তোমরা কি কেউ আমার সঙ্গে আসবে ?

৩. **ইচ্ছার্থক বা প্রার্থনাত্মক বাক্য** (Optative sentence)—তোমার ভালো হোক।

৪. **আদেশাত্মক বাক্য** (Imperative sentence)—তুমি এই মুহূর্তে এখান থেকে বিদায় হও।

৫. **কার্যকারণাত্মক বাক্য** (Conditional sentence)—যদি বৃষ্টি হয় তবে আর আমার আসার আশায় থেকো না।

৬. **সন্দেহাত্মক বাক্য** (Dubitative sentence)—হয়তো কাজটা এতক্ষণে শেষ হয়ে থাকবে।

৭. **বিস্ময়াত্মক বাক্য** (Interjective sentence)—ওঃ কী অপূর্ব দৃশ্য।

[পাঁচ] বাক্যের লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য

১। বাক্যে পদের অবস্থান, তাদের ক্রম এবং পারস্পরিক সঙ্গতির উপর শুধু যে বাক্যের অর্থই নির্ভর করে তা নয়। এদের ত্রুটিবিচ্যুতিতে বাক্য আর বাক্য থাকে না, বড়জোর পদসমষ্টি হতে পারে। এইজন্য বৈয়াকরণগণ বাক্যের তিনটি বিশিষ্ট লক্ষণের কথা উল্লেখ করে থাকেন, যাদের অভাবে বাক্যের গঠন হয় ত্রুটিপূর্ণ। এই লক্ষণগুলো : (১) আকাঙ্ক্ষা, (২) যোগ্যতা, (৩) আসত্তি।

(ক) **আকাঙ্ক্ষা** (Expectancy)—বাক্যে পদসংস্থান এমন হওয়া আবশ্যক যাতে শ্রোতার আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি ঘটে; আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্ত না হওয়া পর্যন্ত বাক্যের পরিপূর্ণতা ঘটে না। 'তুমি যদি সেখানে যেতে চাও'—বক্তার এরূপ উক্তিতে শ্রোতার আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্ত হয় না, অতএব এটা বাক্য হয় না। এরপর অপর কিছু যোগ করতে হবে অথবা এর আগে অপর কোন প্রাসঙ্গিক উক্তি উহ্য আছে বলে ধরে নিতে হবে।

(খ) **যোগ্যতা** (Propriety/compatibility)—বাক্যস্থ পদগুলোর মধ্যে অর্থগত বা ভাবগত সঙ্গতি থাকা অত্যাবশ্যক। নতুবা ব্যাকরণের নিয়মে পদ সন্নিবিষ্ট হ'লেও বাক্য হয় না। 'গোরুটি গাছে উঠে সাঁতার কাটছে'—এখানে ব্যাকরণের নিয়মে পদ সন্নিবেশ ঘটলেও ভাবগত অসঙ্গতি বর্তমান থাকায় এটাকে বাক্য বলে মেনে নেওয়া

চলে না। অবশ্য বাহ্যতঃ অর্থহীন কিছু কিছু অলঙ্কৃত বাক্য গূঢ়ার্থে ব্যবহৃত হতে পারে।

(গ) **আসত্তি** বা **নৈকট্য** (Proximity)—পদের ক্রম ও সঙ্গতি রক্ষা কোন কোন ভাষায়, বিশেষতঃ বিশ্লেষাত্মক ভাষায় অত্যাবশ্যক, নতুবা বাক্য অর্থহীন হ'তে পারে অথবা উদ্দিষ্ট-ব্যতিরিক্ত অর্থের সূচনা করতে পারে। সংশ্লেষাত্মক সংস্কৃত ভাষায় পদের ক্রম রক্ষার বিশেষ কোন উপযোগিতা নেই। 'ছাগেন ঘাসঃ খাদিতঃ' কিংবা 'ঘাসঃ খাদিতঃ ছাগেন' অথবা 'খাদিতঃ ছাগেন ঘাসঃ'—কোনভাবেই অর্থের পরিবর্তন ঘটে না। কিন্তু বাংলায় 'ছাগল ঘাস খায়'-স্থলে 'ঘাস ছাগল খায়' কিংবা ইংরেজিতে 'Goat eats grass'-স্থলে 'Grass eats goat' বললেই বিপত্তি ঘটে যায়। তাই, বাক্যে ভাষার নিজস্ব নিয়ম-অনুসারে পদগুলোকে সাজাতে হয়। এক পদের সঙ্গে সম্পর্ক-অনুযায়ী অপর পদের নৈকট্য বা আসত্তি-বিষয়ে নির্দিষ্ট নিয়ম আছে, সেই নিয়ম রক্ষা করা সর্বতোভাবে কর্তব্য।

২। **বাক্যে পদের ক্রম** (Order of words in the sentence) :

প্রত্যেক ভাষারই নিয়ম-অনুযায়ী বাক্যমধ্যে পদের অবস্থান ঘটে। এ বিষয়ে কোন্ সাধারণ নিয়ম নেই, প্রত্যেক ভাষা স্ব স্ব নিয়মের অধীন—যেমন, বাঙলায় প্রথমে কর্তা, তারপর কর্ম এবং পরে ক্রিয়াপদ ব্যবহৃত হয়। 'আমি রামকে পড়াই।' কিন্তু ইংরেজিতে প্রথমে কর্তা, তারপর ক্রিয়া, কর্মের অবস্থান তারপর। I teach Ram. বাঙলা ভাষাতেও প্রাচীনকালে বাক্যের গঠনে পদ-সংস্থান-বিষয়ে যে নিয়ম ছিল, এখন আর সর্বতোভাবে তেমন নয়। প্রাচীন বাঙলায় নঞর্থ অব্যয় ক্রিয়াপদের আগে বসতো, এখন পরে বসে। প্রাচীন বাঙলা—'ধরণ ন জাই', 'কণ্ঠ ন মেলই'; আধুনিক বাংলা—'ধরা যায় না', 'কণ্ঠ মেলে না'। আবার গদ্যভাষার এবং কাব্যভাষার পদবিধিও একরূপ না হ'তে পারে। কাব্যে আছে 'চিনল না সে মরণকে,' গদ্যভাষায় হ'বে, 'সে মরণকে চিনল না'। আবার কোন কোন আঞ্চলিক বিভাষায়ও অনুরূপ ব্যতিক্রম ঘটতে পারে। যেমন চট্টগ্রামী বিভাষায়—'আঁই ন পাইরবাম্' অর্থাৎ আমি পারবো না। সাধারণভাবে বাঙলা বাক্যে পদসংস্থানের প্রধান নিয়ম এই—বাক্যের প্রথমে কর্তা এবং সর্বশেষ সমাপিকা ক্রিয়ার স্থান। ক্রিয়ার অব্যবহিত পূর্বে মুখ্যকর্ম, তার পূর্বে গৌণ কর্ম; করণ-অধিকরণ-আদি কর্তা ও কর্মের মাঝখানে স্থান করে নেয়—এ বিষয়ে কোন ধরাবাঁধা নিয়ম নেই।

[বাংলায় বাক্যের পদ-ক্রম-বিষয়ক বিশদ আলোচনার জন্য 'বাংলা পদবিধি/বাক্য-তত্ত্ব'-শীর্ষক অধ্যায় দ্বিতীয় খণ্ডে যথাস্থানে দ্রষ্টব্য।

৩। **উক্তি-ভেদ**—উক্তিভেদে বাক্য দ্বিবিধ (ক) প্রত্যক্ষ উক্তি, (খ) পরোক্ষ উক্তি।

(ক) **প্রত্যক্ষ/স্বকীয় উক্তি** (Direct narration)—বক্তার উক্তি যথাযথভাবে বিবৃত হ'লে প্রত্যক্ষ উক্তি হয়।—তিনি বললেন, 'আমার তো এখন যাবার সময় নেই।' সাধারণতঃ উদ্ধৃতি চিহ্নের সাহায্যে প্রত্যক্ষ উক্তিকে নির্দিষ্ট করা হয়।

(খ) **পরোক্ষ/পরকীয় উক্তি** (Indirect narration)—বক্তার নিজস্ব উক্তির বিষয়টি অপরের ভাষায় পরিব্যক্ত হ'লে পরোক্ষ উক্তি হয়।—তিনি বললেন যে তখন তার যাবার সময় ছিল না।

বাঙলা ভাষায় পরোক্ষ উক্তির ব্যবহার খুব সুলভ নয়, সাধারণতঃ অপরের মুখেও বক্তার নিজস্ব উক্তিটিই ব্যবহৃত হ'য়ে থাকে। ইংরেজির অনুকরণে বাঙলায় পরোক্ষ উক্তির ব্যবহারে কিছুটা ব্যাপকতা এলেও উক্তি পরিবর্তনের নিয়মগুলো যথাযথভাবে অনুসৃত হওয়া সম্ভব নয়। শুধু তাই নয়, বাঙলা ভাষা পরোক্ষ উক্তির অনুকূল নয় বলেই বাঙলা ব্যাকরণে পরোক্ষ উক্তির যে সকল নিদর্শন দেওয়া হয়, সেগুলো অনেক ক্ষেত্রেই কৃত্রিম এবং হাস্যোদ্দীপক হ'য়ে দাঁড়ায়।

দ্বাদশ অধ্যায়

শব্দবিদ্যা অধ্যয়ন

(Linguistic Studies)

[এক] প্রাচীন ভারতে শব্দবিদ্যা-অধ্যয়ন

সাহিত্য-সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে শব্দ ও ভাষাবিষয়ে আলোচনা আরম্ভ হ'বে, এটাই প্রত্যাশিত—অন্ততঃ প্রাচীন ভারতের ক্ষেত্রে এটা উপলব্ধ সত্য। বেদ ভারতের প্রাচীনতম সাহিত্য, বেদের সামগ্রিক উপলব্ধির নিমিত্ত প্রায় সমকালেই রচিত হয়েছিল বেদাঙ্গসমূহ—ছয়টি বেদাঙ্গের অন্ততঃ তিনটিই ধ্বনি, শব্দ ও ভাষা-সম্পর্কিত। এই তিনটি যথাক্রমে 'শিক্ষা' (Phonetics), 'ব্যাকরণ' (Grammar) ও 'নিরুক্ত' (Etymology)। এগুলোর প্রাচীনত্বের সন্ধান মিলেছে—সামবেদের ষড়্‌বিংশ ব্রাহ্মণ, মুণ্ডক উপনিষদ, চরণব্যূহ, মনুস্মৃতি এবং আরও অনেক উপনিষদে এদের উল্লেখ থেকে। আধুনিক কালে যে অর্থে ভাষাবিজ্ঞান-আদি পারিভাষিক শব্দ ব্যবহৃত হ'য়ে থাকে সেকালে সে সমস্তের উদ্ভব না ঘটলেও বিষয়ের দিক্ থেকে শব্দবিদ্যার বিভিন্ন অঙ্গবিষয়ের অধ্যয়নে কোন ত্রুটি ছিল না। প্রধানতঃ বেদের পাঠ অভ্রান্ত রাখবার প্রয়োজনেই প্রাগুক্ত বেদাঙ্গ এবং অন্যান্য শব্দশাস্ত্রের আবির্ভাব ও বিকাশ সাধন ঘটেছিল।

ভাষাতাত্ত্বিক আলোচনার প্রথম সূত্রপাত ঋগ্বেদেই। ঋগ্বেদের বিভিন্ন সূত্রে এ বিষয়ে যথেষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়। বৈদিক সংহিতাগুলোর পর রচিত হয় ব্রাহ্মণসমূহ। শব্দের প্রকৃত অর্থ নির্ধারণের জন্য ব্যাকরণ অর্থাৎ বিশ্লেষণ এবং ধাত্বর্থ নির্ণয়ের প্রথম প্রচেষ্টা তথা ভাষাবিজ্ঞানের প্রাথমিক পদক্ষেপ এখানেই লক্ষিত হয়েছিল। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে, ঐতরেয় আরণ্যকে এবং তৈত্তিরীয় উপনিষদে 'বাক্, স্বর, ব্যঞ্জন, মাত্রা, বর্ণ' ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা রয়েছে। বেদপাঠে পরিপূর্ণ বিশুদ্ধতা রক্ষার জন্যে বেদের একাদশবিধ পাঠ কল্পিত হ'য়েছিল—তাদের মধ্যে 'সংহিতা পাঠ'-এর পরই আছে 'পদপাঠ' এবং এই পদপাঠেই প্রথম শব্দকে বিশ্লেষণ ক'রে পৃথক করা হ'য়েছে। এখানেই সন্ধি, সমাস ও স্বরাঘাত-আদি-সম্বন্ধে ঋষিদের জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে।

১. **শিক্ষা ও প্রাতিশাখ্য**—বৈদিক ভাষা কালক্রমে লোকপ্রচলিত ভাষা থেকে অনেক দূরে সরে গেলে ধর্মীয় কারণেই এর পাঠে এবং অর্থবোধে শুদ্ধিরক্ষা

অপরিহার্য হয়ে উঠলো। সামগ্রিকভাবে বেদপাঠের যাবতীয় বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ রাখার প্রয়োজনে গড়ে ওঠে বেদের ষড়ঙ্গ তথা বেদাঙ্গ সাহিত্য, যার প্রথমেই রয়েছে 'শিক্ষা'। এই 'শিক্ষা' এবং পরবর্তীকালে রচিত 'প্রাতিশাখ্য' ছিল মূলতঃ ধ্বনি-বিজ্ঞান শাস্ত্র। বেদের প্রতিটি শাখার জন্যই কালক্রমে গড়ে উঠেছিল বৈজ্ঞানিক ধ্বনি-অধ্যয়ন-প্রচেষ্টা—যার নাম 'প্রাতিশাখ্য'। এই প্রাতিশাখ্যেই আমরা ধ্বনি-বিজ্ঞানসম্মত পূর্ণাঙ্গ আলোচনা লক্ষ্য করি। প্রাতিশাখ্যের সংখ্যা কত ছিল তা আর এখন বলা সম্ভব নয়। তবে নাম থেকে অনুমান বেদের প্রতিটি শাখার জন্যই অন্ততঃ একটি করে প্রাতিশাখ্য রচিত হয়েছিল ঃ শৌনক-রচিত 'ঋক্‌প্রাতিশাখ্য', কাত্যায়ন-রচিত 'শুক্ল প্রাতিশাখ্যসূত্র', 'তৈত্তিরীয় প্রাতিশাখ্য সূত্র', 'সামপ্রাতিশাখ্য' ও 'অথর্ব প্রাতিশাখ্য'। বর্তমানে বেদ-প্রতি একটি মাত্র প্রাতিশাখ্যের সন্ধান পাওয়া যায়। প্রাতিশাখ্য রচনার মূল উদ্দেশ্য ঃ সংহিতার পরম্পরাগত উচ্চারণ সুরক্ষিত রাখা। এর সাহায্যে স্বরাঘাত (pitch accent), মাত্রাকাল তথা উচ্চারণ সম্বন্ধীয় অন্যান্য নিয়মের অধ্যয়ন-কার্য সুরক্ষিত হ'তো। কোন কোন বেদের 'পদপাঠ'ও প্রাতিশাখ্যে পাওয়া যায়। প্রাতিশাখ্যগুলিকে বলা হয়েছে—'...a treatise on phonetics'। প্রাতিশাখ্যে সংস্কৃত ধ্বনির যে বর্গীকরণ করা হ'য়েছে, তা আজও অব্যাহত রয়েছে। প্রাতিশাখ্যে শব্দের চারিটি বিভাগ কল্পিত হয়েছে—নাম, আখ্যাত, উপসর্গ ও নিপাত।

শিক্ষা—ধ্বনিতাত্ত্বিক অধ্যয়নের নিমিত্ত বেদাঙ্গের যে শাখা 'শিক্ষা' নামে পরিচিত, বস্তুতঃ প্রাতিশাখ্যের সঙ্গে তার বিষয়গত পার্থক্য নেই বললেই চলে। উভয়ের পার্থক্য এই ঃ শিক্ষায় যে ৬৫/৬৮টি বর্ণের ধ্বনি বা উচ্চারণ রীতি নির্দেশ করে দেওয়া হয়েছে, তা' সমগ্র বৈদিক সাহিত্য এবং এমনকি লৌকিক সংস্কৃতের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য ; পক্ষান্তরে প্রাতিশাখ্যে প্রদত্ত উচ্চারণ-রীতি শুধু তত্তৎ শাখার ক্ষেত্রেই প্রযোক্তব্য। 'শিক্ষা'য় পাওয়া যায় 'প্রাতিশাখ্যে' আলোচিত বিষয়ের প্রাণরূপ। পরবর্তীকালে প্রাতিশাখ্যই শিক্ষার স্থান অধিকার ক'রে নিয়েছে। খুব প্রাচীন সর্বাঙ্গসুন্দর শিক্ষাগ্রন্থ অপ্রাপ্য। এখন পর্যন্ত অন্যূন ৬৫টি শিক্ষাগ্রন্থের সন্ধান পাওয়া গেলেও এদের বহুলাংশ এখনও অমুদ্রিত ও অপ্রকাশিত এবং অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন। কোন কোন শিক্ষাগ্রন্থে এমন সমস্ত ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যার পরিচয় কোন প্রাতিশাখ্যে পাওয়া যায় না। আবার কতকগুলো শিক্ষাগ্রন্থ কেবল কতকগুলো নামের তালিকামাত্র। পাণিনিভ্রাতা পিঙ্গল-কর্তৃক রচিত 'পাণিনীয় শিক্ষা' অন্যগুলোর তুলনায় অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। তবে এটিও যথেষ্ট

প্রামাণিক কিনা সন্দেহজনক। ঋগ্বেদের 'স্বর-ব্যঞ্জন শিক্ষা', যজুর্বেদের 'মাণ্ডবী-শিক্ষা', 'যাজ্ঞবল্ক্য-শিক্ষা', সামবেদের 'নারদ শিক্ষা', 'লোমশী শিক্ষা', 'গৌতমী শিক্ষা' এবং অথর্ববেদের 'মাণ্ডূকী শিক্ষা'র নাম উল্লেখযোগ্য। এদের কোন কোনটি প্রাচীন হলেও অনেকগুলো অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন কালের রচনা। আদি 'শিক্ষা' গ্রন্থগুলির রচনাকাল খ্রীঃ পূঃ ৮০০-৫০০ অব্দ এবং 'প্রাতিশাখ্য'গুলির রচনাকাল খ্রীঃ পূঃ ৫০০-১৫০ অব্দ বলে অনুমিত হ'য়ে থাকে।

২. **নিঘণ্টু**—মূলতঃ নিঘণ্টু ছিল বৈদিক শব্দসংগ্রহ। প্রাচীনকালে অনেক নিঘণ্টু এবং তাদের টীকা ভাষ্যাদি রচিত হয়েছিল। কিন্তু কালক্রমে প্রায় সবই লুপ্ত হ'য়ে গেছে। মহামুনি যাস্ক যে-নিঘণ্টুর টীকা-রূপে 'নিরুক্ত' রচনা করেছিলেন একমাত্র ঐ নিঘণ্টুটিই বর্তমান আছে। কেউ কেউ মনে করেন এই নিঘণ্টুটিও যাস্ক মুনিরই সঙ্কলন। আবার অনেকের মতে এটি প্রাচীনতর কোন বেদবিদের রচনা। প্রজাপতি কশ্যপ নিঘণ্টু রচনা করেছিলেন বলে মহাভারতের একটি শ্লোকে বলা হয়েছে। নিঘণ্টুটিতে পাঁচটি অধ্যায়। প্রথম তিনটি অধ্যায়ের নাম 'নৈঘণ্টুক কাণ্ড', চতুর্থ অধ্যায় 'নৈগম কাণ্ড' এবং শেষ অধ্যায়টি দৈবত কাণ্ড'। যাস্কর জীবৎকালে অনেক নিঘণ্টু বর্তমান ছিল, যাস্ক নিজেই অন্ততঃ পাঁচটি নিঘণ্টুর সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। নিঘণ্টুর টীকা-কারদের মধ্যে দেবযজ্বা অন্যতম।

৩. **যাস্ক : নিরুক্ত**—বেদব্যাখ্যার নিমিত্ত যে ছয়প্রকার বেদাঙ্গের সৃষ্টি হয়েছিল, তাদের মধ্যে ভাষাবিজ্ঞানের দিক থেকে আলোচনার যোগ্য—শিক্ষা, নিরুক্ত ও ব্যাকরণ। 'নিরুক্ত' একটিমাত্রই পাওয়া গেছে—এটি মহামুনি যাস্ক-কর্তৃক রচিত। কিন্তু এইটিই একমাত্র নিরুক্ত নয়, কারণ যাস্ক স্বয়ং তাঁর পূর্ববর্তী অনেক নিরুক্তকারের নাম উল্লেখ করেছেন, দুর্ভাগ্যক্রমে সেগুলো আর একাল অবধি পৌঁছায়নি। যাস্ক যাদের কথা বলে গেছেন এঁদের মধ্যে অনেক বৈয়াকরণ এবং বৈয়াকরণ সম্প্রদায়েরও নাম রয়েছে : ঔর্ণনাভ, শাকটায়ন, শাকপূণি, শাকল্য, গার্গ্য, গালব, আগ্রায়ণ, ঔদুম্বরায়ণ, কাত্থক্য, চর্মশিরা, মনু প্রভৃতি। সম্ভবতঃ শাকল্য-রচিত নিঘণ্টুর টীকারূপেই যাস্ক তার নিরুক্ত রচনা করেন। এই নিরুক্তে প্রায় ৬০০ বেদমন্ত্রের উল্লেখ এবং সম্ভবতঃ ২৫০ মন্ত্রের সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা রয়েছে। প্রায় ২৫০০ বৈদিক শব্দের ব্যুৎপত্তি ও ব্যাখ্যা নিরুক্তে পাওয়া যাচ্ছে। নিঘণ্টুর মত নিরুক্তও নৈঘণ্টুক, নৈগম ও দৈবত—এই তিন কাণ্ডে বিভক্ত। প্রথম কাণ্ডে তিনটি অধ্যায়, দ্বিতীয় কাণ্ডে তিনটি অধ্যায় এবং দৈবত কাণ্ডে ছয়টি অধ্যায়। প্রথম অধ্যায় 'উপোদ্ঘাত'-এ যাস্ক শব্দ-শাস্ত্রের কয়েকটি প্রধান বিষয়ের আলোচনা করেছেন। প্রাতিশাখ্যকারগণ সমস্ত

শব্দকে নাম, আখ্যাত, উপসর্গ ও নিপাত—এই চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করলেও যাস্কই এদের বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করেন। যাস্কের পূর্ববর্তী নিরুক্তকার শাকটায়নের মতে সমস্ত শব্দই আখ্যাত থেকে প্রত্যয়যোগে উৎপন্ন এবং গার্গের মতে 'ডিত্থডবিত্থাদি' শব্দের ব্যুৎপত্তি-অন্বেষণ নিরর্থক। যাস্ক এঁদের মতের বিস্তৃত বিচার ক'রে স্বীয় মত প্রতিষ্ঠা করেন। শুধু শব্দবিচারই নয়, প্রসঙ্গক্রমে তিনি ভাষার উৎপত্তি, গঠন এবং বিকাশ-সম্বন্ধেও বিচার-বিবেচনা করেছেন। শ্রেষ্ঠ শব্দের লক্ষণ-প্রসঙ্গে যাস্ক বলেন—যে শব্দের অর্থ কোন ব্যক্তিবিশেষের ইচ্ছার উপর আধারিত না হয়ে সিদ্ধ ও স্থির থাকে, বক্তাও শ্রোতার মনে একই ভাবনা উৎপন্ন করে এবং যে শব্দ স্বল্পায়াসে সূক্ষ্ম অর্থের বোধ জন্মায়, সেই শব্দই শ্রেষ্ঠ। তিনি বাণীর অতিরিক্ত অবয়ব-সংকেতকেও ভাষা বলে মেনেছেন কিন্তু অব্যাবহারিকতা ও অস্পষ্টতা দোষের জন্য এর অধ্যয়ন নিষ্প্রয়োজন বিবেচনা করেছেন। পাণিনি যে ধাতুসিদ্ধান্ত প্রতিপাদনে সাফল্য অর্জন করেছেন, তার মূলে আছে নিরুক্তকার যাস্কের প্রয়াস—কারণ, তিনিই প্রথম বোঝাতে চেষ্টা করেছিলেন যে, সব শব্দের মূলে আছে কোন্ ধাতু। 'কৃৎ' এবং 'তদ্ধিত' প্রত্যয়ের পার্থক্যের অস্পষ্ট উল্লেখও নিরুক্তে বর্তমান। ব্রাহ্মণ-গ্রন্থসমূহে ধ্বনিতত্ত্ব বা ভাষাবিজ্ঞান বিষয়ে যে প্রাথমিক প্রয়াস লক্ষিত হয়েছিল, যাস্ক তাকে আরও বিশুদ্ধ এবং বিজ্ঞানসম্মত ক'রে তুলতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। বস্তুতঃ তিনিই যে আধুনিক ভাষাতত্ত্বেরও আদি প্রবর্তক, এ বিষয়ে অধ্যাপক এস্. কে. বেলভেলকর বলেন ঃ..."he definitely formulates the theory that every noun is derived from a verbal root and meets the various objections raised against it—a theory on which the whole system of Panini is based, and which is in fact, the postulate of modern Philology." অবশ্যই সেকালের আলোচনা এ কালের মতো হ'বে না, কিন্তু যাস্ক যতোটা করেছিলেন সেকালের পক্ষে তাই ছিল যথেষ্ট। যাস্কের জীবৎকাল আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব সপ্তম শতক। তাঁর টীকাকারদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য দুর্গাচার্য ও স্কন্দস্বামী।

৪. **পাণিনি ঃ অষ্টাধ্যায়ী ব্যাকরণ**—একালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাষাবিজ্ঞানী L. Bloomfield পাণিনির ব্যাকরণকে বলেছেন, 'one of the greatest monuments of human intelligence.' পাণিনি কোন ভুঁইফোড় বৈয়াকরণ নন। যাস্ক এবং পাণিনির অন্তর্বর্তীকালে অনেক বৈয়াকরণের আবির্ভাব পাণিনির পথকে মসৃণ করে দিয়ে যায়। পাণিনি নিজেই অন্ততঃ ৬৪ জন পূর্বাচার্যের নাম উল্লেখ করেছেন,

যাদের মধ্যে আছেন—গার্গ্য, কাশ্যপ, গালব, ভারদ্বাজ, শাকটায়ন, শাকল্য, চাক্রবর্মণ, সেনক, স্ফোটায়ন এবং বিশেষভাবে আপিশলি এবং কাশকৃৎস্ন। পাণিনির পূর্বেই প্রচলিত ছিল বলে পাণিনি কোন ব্যাখ্যা না করেই 'প্রত্যয়, ধাতু, উপসর্গ, বৃদ্ধি, অব্যয়, সমাস, তৎপুরুষ, বহুব্রীহি, অব্যয়ীভাব, কৃৎ ও তদ্ধিত'-আদি পারিভাষিক শব্দ ব্যবহার করেছেন। এমন কি 'দ্বন্দ্ব, কর্মধারয়, অনুনাসিক, সবর্ণ, প্রগৃহ্য, লোপ, হ্রস্ব, দীর্ঘ, প্লুত, উদাত্ত, অনুদাত্ত, স্বরিত, অপৃক্ত, উপসর্জন' শব্দগুলো ব্যাখ্যা করলেও তিনিই প্রথম ব্যবহার করেন নি বলেই মনে হয়। পণ্ডিতদের অনুমান, পূর্বোক্ত আপিশলি এবং কাশকৃৎস্ন-ই পাণিনি-পূর্ব ব্যাকরণ-সম্প্রদায়ের জনক। কৈয়ট উভয়ের রচনা থেকে কিছু উদ্ধৃতি সংকলন করেছেন এবং বামনের 'কাশিকা'য় আপিশলির একটা নিয়মের উল্লেখ করা হয়েছে। এ ছাড়া এঁদের সম্বন্ধে আর জানবার কোন উপায় নেই। অনেকে মনে করেন, এঁরাই ঐন্দ্রসম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা। কাত্যায়ন এই সম্প্রদায়ের প্রধান বৈয়াকরণ। এই শাখাটি পাণিনি-পূর্বকালে সৃষ্ট হ'য়ে থাকলেও এর বিকাশ ঘটেছে পাণিনি-পরবর্তীকালেই। দক্ষিণ ভারতে এই শাখার বিশেষ সমাদর।

পাণিনির তুল্য প্রতিভাধর কোন বৈয়াকরণ আজ পর্যন্ত বিশ্বের কোথাও জন্মগ্রহণ করেছেন কিনা সন্দেহ। আনুঃ খ্রীষ্টপূর্ব ৪৫০ অব্দে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের তথা তৎকালীন গান্ধারের শলাতুর গ্রামে তাঁর জন্ম। পাণিনির নামান্তর—আহিক, শালঙ্কি, দাক্ষীপুত্র, শালাতুরীয়। কথাসরিৎসাগর-মতে পাণিনির গুরু ছিলেন উপবর্ষ অথবা বর্ষদেব। পাণিনি পাটলিপুত্রবাসী ছিলেন এবং মহারাজ নন্দের সঙ্গে তাঁর ছিল মিত্রতা।

পাণিনি-রচিত গ্রন্থ অষ্ট অধ্যায়ে বিভক্ত বলে গ্রন্থনাম 'অষ্টাধ্যায়ী'। এর প্রত্যেক অধ্যায় চারিটি পাদ এবং প্রতি পাদে অনেক সূত্র বর্তমান—মোট সূত্রের সংখ্যা ৪৫০০। পাণিনি পূর্বাচার্যদের কোন কোন সূত্র পরিভাষা গ্রহণ করলেও তাঁর মৌলিক প্রতিভার পরিচয় নিহিত রয়েছে ১৪টি মাত্র মূলসূত্র তথা শিবসূত্র বা মহেশ্বরসূত্রের উপর। এই চৌদ্দটি মূল সংজ্ঞা বা প্রত্যাহারের উপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছিল যে জটিল ও বিস্তৃত সংস্কৃত ব্যাকরণশাস্ত্র, তা' তুলনাবিহীন। Bloomfield-এর ভাষায়ঃ "It dascribes with minutest detail, every infection, derivtion and composition, and every syntactic use of its author's speech. No other language to this day has been so perfectly described···The Indian grammar presented to European eyes, for the first time a complete

and accurate description of a language based not upon theory but upon observation."

পাণিনির প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলোকে নিম্নোক্তক্রমে বিবৃত করা চলে। তিনি মনে করেন যে প্রতিটি শব্দের মূলে রয়েছে কোন-না-কোন ক্রিয়াবোধক একাক্ষর ধাতুপ্রকৃতি —এর সঙ্গে উপসর্গ-প্রত্যয়াদির যোগে যাবতীয় শব্দ গঠিত হয়। তিনি আরও মনে করেন যে ভাষার মূলে আছে বাক্য। প্রাচীনতর বৈয়াকরণগণ শব্দের চারপ্রকার ভেদ কল্পনা করেছিলেন, পক্ষান্তরে পাণিনি তিনপ্রকার ভেদ মাত্র স্বীকার করেন—সুবন্ত (বিশেষ্য, বিশেষণ. সর্বনাম), তিঙন্ত (ক্রিয়া) ও নিপাত (অব্যয়)। সম্ভবতঃ শব্দের এতাদৃশ বিভাগই সর্বাধিক বৈজ্ঞানিক। ধ্বনির উৎপত্তিস্থান এবং প্রযত্ন-অনুযায়ী পাণিনি যেভাবে বর্ণের বর্গীকরণ কারছেন, ধ্বনিবিজ্ঞানের দিক্ থেকে তা' অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ। বৈদিক এবং লৌকিক সংস্কৃতের তুলনামূলক অধ্যয়নও পাণিনির অন্যতম কীর্তি।

পাণিনি অষ্ট্যাধ্যাযী-ব্যতীত আরও কয়েকটি শব্দ-বিদ্যা-বিষযক গ্রন্থ রচনা করেছেন এরূপ সন্ধান পাওয়া গেছে। (১) **ধাতুপাঠ**—এতে বৈদিক এবং লৌকিক সংস্কৃতের ১৯৪৪টি ধাতুপ্রকৃতি সংগৃহীত হয়েছে। ধাতুসমষ্টিকে পাণিনি মোট দশটি গণে বিভক্ত করেছেন। (২) **গণপাঠ**—পাণিনি এতে শব্দের ২৬১ গণের তালিকা সংকলন করেছেন, এদের প্রত্যেকটির আদর্শ বা আদিরূপ অষ্টাধ্যায়ীতে বর্তমান। ভাষাতাত্ত্বিক দিক্ থেকে উক্ত উভয় গ্রন্থই অতিশয মূল্যবান। (৩) **উণাদি-সূত্র**—নামক একটি গ্রন্থের কর্তৃত্ব শাকটায়নের উপব আরোপিত হ'লেও অনেকে এর বিভিন্ন পারিভাষিক শব্দ দর্শনে এবং অন্যান্য কারণে এটিকেও পাণিনি-রচিত বলেই মনে করেন। পাণিনির অষ্টাধ্যায়ী অবলম্বনে প্রচুর টীকা-ভাষ্যাদি রচিত হয়েছে, এদের সংখ্যা কম করে হ'লেও অন্ততঃ পঞ্চাশটি।

মহামুনি পাণিনির কৃতিত্ব বিচার করতে গিয়ে অতি সাম্প্রতিক কালের ভাষা-বিজ্ঞানীরাও উচ্চকন্ঠ। ভাষাবিজ্ঞানের তো বটেই, এমন কি অতি সাম্প্রতিককালের ভাষাবিজ্ঞানের যে ধারাটি সর্বাধিক অনুশীলিত হ'চ্ছে, সেই বর্ণনামূলক ভাষা-বিজ্ঞানও (Deseriptive Linguistic) পাণিনি ব্যাকরণেই প্রথম আলোচিত হয়, এ কথা এখন সকলেই স্বীকার করেন। যেমন ড. মিশ্র বলেন, "Sanskrit laid the foundation of Comparative Philology as well as of Descriptive Linguigsties, the first deseriptive Grammar of a language, being the

Sanskrit Grammar of Pāṇini." পাণিনি একটি বিশেষ ভাষার বিশেষ কালের রূপ-হিসেবেই সংস্কৃতকে গ্রহণ করেছিলেন এবং বাক্যকেই মূল একক ধরে বিশ্লেষণ করতে করতে একেবারে তার সূক্ষ্মতম স্তরে—ধাতুমূলে উপনীত হয়েছেন। এটিকে একান্ত-ভাবে আঙ্গিকসর্বস্বতা (Structuralism) বলেও অভিহিত করা যাবে না, কারণ শব্দ-গঠনে যে শুধু শব্দের রূপ-ই (morpheme) একমাত্র বিবেচ্য তা' নয়; সমাস-আদি ক্ষেত্রে অর্থের গুরুত্বও কম নয়। বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সাম্প্রতিকতম প্রবণতার নাম (নোয়াম্ চম্‌স্কি-প্রবর্তিত) Transformational Generative Grammar বা 'রূপান্তরণীয় উৎপাদী ব্যাকরণ'—এটি 'সংবর্তনী সঞ্জননী' ভাষাতত্ত্ব-কিংবা 'রূপান্তর মূলক ব্যাকরণ' নামেও অভিহিত হয়। এই তত্ত্বটির মূলকথা—মানুষ পরিবেশ ও শিক্ষার প্রভাবে কোন ভাষার কিছু শব্দ বা বাক্যের গঠন আয়ত্ত করে; তারপর নিজের উৎপাদনী তথা সৃজনীশক্তির প্রভাবে তার রূপান্তর ঘটিয়ে ঘটিয়ে ভাব-প্রকাশের উপযোগী অসংখ্য বাক্য রচনা করে। মহামুনি পাণিনির ব্যাকরণেও যে এই তত্ত্বের পরিচয় পাওয়া যায়, একথা স্বীকার করেন স্বয়ং চম্‌স্কি। তিনি বলেন: What is more, it seems that even Pāṇini's grammar can be interpreted as a fragment of 'generative grammar' in essentially the contemporary sense of this term."

৫. **কাত্যায়ন-পতঞ্জলি**—পাণিনির অনুসারীদের মধ্যে কাত্যায়ন ও পতঞ্জলি প্রধান। সংস্কৃত ব্যাকরণ তথা শব্দবিদ্যার ক্ষেত্রে পাণিনি, কাত্যায়ন ও পতঞ্জলি একত্রে 'মুনিত্রয়' নামে অভিহিত হয়ে থাকেন। ঐতিহ্যানুসারে কাত্যায়নকে পাণিনির সমকালীন মনে করা হলেও ঐতিহাসিকদের মতে কাত্যায়ন পাণিনির অন্ততঃ দুই-তিন শতাব্দী পরবর্তী। কালের সঙ্গে মানিয়ে কাত্যায়ন পাণিনির কিছু কিছু সূত্র সংশোধন করেছেন এবং তা' করতে গিয়ে কখনও আবার ভুল করেছেন। কাত্যায়নের মোট বার্তিকের সংখ্যা প্রায় ৪০০০, এর মধ্যে পাণিনির সূত্রের উপর আছে ১২৪৫টি। ভারতীয় বৈয়াকরণগণ পাণিনির পরই পতঞ্জলির নাম উচ্চারণ করে থাকেন। তিনি সম্ভবতঃ খ্রী' পূ' দ্বিতীয় শতকে বর্তমান ছিলেন। পতঞ্জলি-কৃত গ্রন্থের নাম **'মহাভাষ্য'** বা **'ফণিভাষ্য'**। গ্রন্থটি আনুপূর্বিক অষ্টাধ্যায়ীর অনুসরণে রচিত। কাত্যায়ন যে সমস্ত ক্ষেত্রে পাণিনির সমালোচনা করেছেন, পতঞ্জলি তার যথোচিত উত্তর দিয়েছেন। অবশ্য কোন কোন ক্ষেত্রে তিনিও পাণিনির সমালোচনা করেছেন। গ্রন্থটির অনেক টীকাভাষ্য রচিত হয়েছে এবং যথাযথভাবে অধীত ও আলোচিত হয়েছে।

পাণিনি-প্রবর্তিত ধারার একজন বিশিষ্ট বৈয়াকরণ দার্শনিক **ভর্তৃহরি**। তিনি সম্ভবতঃ খ্রীঃ সপ্তম শতকের পূর্বেই বর্তমান ছিলেন। তাঁর রচিত মহাভাষ্যের টীকা 'মহাভাষ্য দীপিকা'র অংশমাত্র পাওয়া যায়। অপর গ্রন্থ 'বাক্যপদীয়' বস্তুতঃ ব্যাকরণ-দর্শন। এই ধারার অনুযায়ী **জয়াদিত্য ও বামন** যুগ্মভাবে অষ্টাধ্যায়ীর টীকা রচনা করেন, নাম 'বৃত্তিসূত্র' বা 'কাশিকা'। পাণিনি থেকে প্রচুর উদাহরণ এবং বিস্মৃত লেখকদের পরিচয়দান কাশিকার মূল্য বাড়িয়ে দিয়েছে। এই ধারার শেষ উল্লেখযোগ্য বৈয়াকরণ **কৈয়ট।কৈয়্যট**। এঁর গ্রন্থনাম 'মহাভাষ্যপ্রদীপ'।

৬. **বিভিন্ন ধারা**—একাদশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষে তুর্কী-আক্রমণের ফলে দেশের সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটে, সংস্কৃত-চর্চা ক্রমশঃ স্তিমিত হয়ে আসে। ফলতঃ পরবর্তীকালে পাণিনির অষ্টাধ্যায়ীকে যুগোপযোগী করে ঢেলে সাজাবার প্রয়োজন দেখা দেয়। এই ধারার প্রবর্তকদের বলা হয় **কৌমুদীধারা**। এই ধারার সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য বৈয়াকরণ **ভট্টোজীদীক্ষিত**। খ্রী সপ্তদশ শতকে তৎ-কর্তৃক রচিত 'সিদ্ধান্তকৌমুদী' একালের পাণিনি-পঠন-পাঠনের পক্ষে অপরিহার্য বিবেচিত হয়ে থাকে। সিদ্ধান্তকৌমুদীর টীকা 'বালমনোরমা' এবং 'প্রৌঢ়মনোরমা' তাঁরই রচিত। এই ধারায় আর আছেন—চতুর্দশ শতকের 'রূপমালা'র গ্রন্থকার **বিমল সরস্বতী**, পঞ্চদশ শতকের 'প্রক্রিয়া কৌমুদী'র গ্রন্থকার **রামচন্দ্র** এবং অষ্টাদশ শতকের **বরদরাজ**। এই শতকেরই **নাগোজীভট্ট** বা **নাগেশ** ছিলেন ভূরিকর্মা। তাঁর রচিত অনেক গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'শব্দেন্দুশেখর', 'বৈয়াকরণ সিদ্ধান্তমঞ্জুষা' এবং 'পরিভাষেন্দুশেখর'।

এর বাইরেও কয়েকটি ব্যাকরণ-সম্প্রদায় গড়ে উঠেছিল। **কাতন্ত্র-সম্প্রদায়ের শর্ববর্মন্** খ্রীঃ প্রথম শতকে 'কাতন্ত্র ব্যাকরণ' বা 'কলাপ-ব্যাকরণ' রচনা করেন—সর্ববঙ্গে গ্রন্থটি বহুল প্রচলিত। **চান্দ্র-সম্প্রদায়ের** বৌদ্ধপণ্ডিত **চন্দ্রগোমিন** ৪৭০ খ্রী 'চান্দ্রব্যাকরণ' রচনা করেন। **জৈনেন্দ্র-সম্প্রদায়ের** 'জৈনব্যাকরণ' ষষ্ঠ শতকে **পূজ্যপাদ দেবনন্দী**-কর্তৃক রচিত হয়েছিল। এতে নোতুনত্ব কিছু নেই। নবম শতকে **পাল্য-কীর্তি** রচিত 'শব্দানুশাসন' **শাকটায়ন-সম্প্রদায়ের** ব্যাকরণরূপে পরিচিত। 'সিদ্ধ হেমচন্দ্র' বা 'হৈমব্যাকরণে'র রচয়িতা **হেমচন্দ্র** দ্বাদশ শতকে 'শব্দানুশাসন' নামে প্রসিদ্ধ ব্যাকরণ রচনা করেন। সংস্কৃত-অংশে উল্লেখযোগ্য তেমন কিছু না থাকলেও প্রাকৃত ব্যাকরণের ক্ষেত্রে তাঁর গ্রন্থ অষ্টাধ্যায়ীতুল্য মর্যাদার অধিকারী। এছাড়া অপর সম্প্রদায়গুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য—'সরস্বতী কণ্ঠাভরণ, সংক্ষিপ্তসার, মুগ্ধবোধ, সুপদ্ম, সারস্বত, লিঙ্গানুশাসন' প্রভৃতি। পশ্চিমবঙ্গের **নব্যন্যায়-সম্প্রদায়**-রচিত

ব্যাকরণের দার্শনিক দিকটি উল্লেখযোগ্য। **জগদীশ তর্কালঙ্কার** রচিত '**শব্দশক্তি প্রকাশিকা**' এই শাখার শ্রেষ্ঠ কীর্তি।

প্রাচীন ভারতে পালি এবং প্রাকৃত ভাষায়ও বহু ব্যাকরণ রচিত হয়েছিল।

[দুই] পাশ্চাত্ত্যে শব্দবিদ্যা অধ্যয়ন (প্রাচীনকাল)

য়ুরোপীয় জ্ঞানবিজ্ঞান-চর্চার প্রসূতিভূমি প্রাচীন গ্রীসদেশে শব্দবিদ্যা-বিষয়ে বিশদ আলোচনা আশ্চর্যরকমভাবে অনুপস্থিত। প্রাচীন গ্রীকদের ধারণা ছিল,—মানুষ জন্মগত সূত্রে ভাষা আয়ত্ত করে থাকে, তার জন্য শিক্ষার প্রয়োজন নেই। এই কারণেই তাঁরা গ্রীক ভাষার ব্যাকরণ-রচনা বিষয়েও মনোযোগী হননি। তৎসত্ত্বেও তিন মনীষী দার্শনিক শব্দবিদ্যা বিষয়ে কিছু কিছু তথ্যের উল্লেখ করেছেন।

সোক্রাতিস্ বস্তু এবং তার নাম অর্থাৎ শব্দ ও অর্থের স্বাভাবিক সম্বন্ধ স্বীকার করেন নি। তবে, ঐরূপ ভাবানির্মাণের সম্ভাব্যতাকেও তিনি অস্বীকার করেন নি। **প্লাতো** গ্রীকধ্বনির বর্গীকরণ করেছিলেন সঘোষ ও অঘোষ-ভেদে, আবার অঘোষ ধ্বনিকে তিনি দ্বিধাবিভক্ত করেছিলেন, একভাগে ছিল অন্তঃস্থ বর্ণ এবং অপর ভাগে ব্যঞ্জন। সঘোষ বলতে তিনি স্বরধ্বনিকেই বুঝিয়েছিলেন। উদ্দেশ্য-বিধেয়, বাক্য ব্যুৎপত্তি-বিষয়েও তিনি কিছু ইঙ্গিত করে গেছেন। তা হ'লেও বলতে হয় যে প্লাতো ছিলেন মূলতঃ ভাববাদী, তাই ভাষা-জিজ্ঞাসা-বিষয়ে তিনি যথেষ্ট চিন্তা করলেও সে-বিষয়ে তার বাস্তব প্রতিফলন ততোটা পাওয়া যায় না। **আরিস্তোতল**-কৃত শব্দের পদবিভাগ এবং নামকরণ আজও পর্যন্ত প্রচলিত আছে :—Letter (বর্ণ), Syllable (অক্ষর), Conjunction (সংযোজক অব্যয়), Article (পদ-অর্থ-নির্দেশক), Noun (বিশেষ্য), Verb (ক্রিয়া), Case (কারক) ও কথা/বাক্য (Speech)। এদের প্রত্যেকটিই ব্যাকরণের প্রয়োজনীয় আলোচ্য বিষয় হ'লেও এতে ব্যাকরণের সামগ্রিক রূপ ফুটে ওঠে না। তিনি বাক্যে বিভিন্ন জাতীয় পদের অস্তিত্ব-বিষয়ে সচেতন ছিলেন এমন কি ভাষার নানা রীতি, বিশেষতঃ কাব্যশৈলী (Poetic diction) বিষয়েও যে অবহিত ছিলেন, এটিও সে যুগের পক্ষে কৃতিত্বের পরিচায়ক। তিনি বর্ণকে অবিভাজ্য ধ্বনি মেনে নিয়ে তাকে স্বরবর্ণ, অন্তঃস্থ বর্ণ এবং স্পর্শবর্ণ—এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করেছিলেন। ক্রিয়াপদের বিশ্লেষণ, কারক, শব্দ, লিঙ্গভেদ-আদি সম্বন্ধেও তিনি আলোচনা করে গেছেন।

গ্রীকভাষায় প্রথম ব্যাকরণ রচনা করেন **ডিওনিসিওস থ্রাক্স্** (Dionysios Thrax—খ্রীঃ পূঃ দ্বিতীয় শতাব্দী)। ইনি কর্তা ও ক্রিয়ার সম্পর্ক বিচার করেন

এবং লিঙ্গ, বচন, বিভক্তি, কাল ও পুরুষ-বিষয়ে আলোচনা করেন। তিনি মোটামুটি-ভাবে গ্রীক ব্যাকরণের একটা কাঠামো দাঁড় করিয়েছিলেন। তিনি পদবিভাগের মধ্যে উল্লেখ করেন: Noun, Pronoun, Article, Verb, Adverb, Participle, Preposition ও Conjunction। এরপর খ্রী° দ্বিতীয় দশকে দুস্কোলোস্ (Apollonios Duskolos) ও তৎপুত্র হেরোদিয়ানুস্ (Herodianus) গ্রীক ব্যাকরণে নোতুনতর বিষয়সমূহ সন্নিবিষ্ট করে তাকে অনেকটা সম্পূর্ণতা দান করেন।

এরপর সুদীর্ঘকাল শব্দ-বিদ্যা-অধ্যয়ন যথাযোগ্য মর্যাদালাভ করেনি। গ্রীক ব্যাকরণের অনুকরণে রোমক ভাষায় ব্যাকরণ রচিত হয়। খ্রীষ্টান ধর্ম প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে হিব্রুভাষার অধ্যয়ন শুরু হ'য়েছিল। এক সময় মনে করা হ'তো যে, সমস্ত শব্দেরই মূল হিব্রু। ধর্মযুদ্ধ বা ক্রুসেডের পর আরবী ভাষার চর্চা শুরু হ'য়েছিল। গোটা মধ্যযুগ অর্থাৎ অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত সমস্ত য়ুরোপে লাতিন ভাষার ছিল জয়জয়কার। যে কোন য়ুরোপীয় জাতি মাতৃভাষা অপেক্ষাও লাতিন ভাষার উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করতেম। রোমক বৈয়াকরণরা গ্রীক আদর্শ-অনুসরণেই লাতিন ব্যাকরণ রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে রয়েছেন খ্রী° পূ° প্রথম শতাব্দীর ভারো (Varro) খ্রী° প্রথম শতাব্দীর কুইন্তিলিয়ানুস (M. F. Quintiliānus), খ্রী° চতুর্থ শতকের দোনাতুস (Donatus) এবং বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য প্রিস্কিয়ানুস্ (Priscianus)। শেষোক্ত জন—ধ্বনিতত্ত্ব, রূপতত্ত্ব ও বাক্যতত্ত্ব—ব্যাকরণের তিনটি শাখারই পূর্ণ পরিচয় দান করেন। তিনি বর্তমান কালে প্রচলিত ৮টি পদেরই উল্লেখ করেছেন। তাঁর ব্যাকরণের এই ধারাটিই দীর্ঘকাল অনুসৃত হয়েছিল।

এই সময় য়ুরোপ খণ্ডে যে রেনেশাঁস (Renaissance) বা নবজাগরণ দেখা যায়, ভাষা-আলোচনার ক্ষেত্রে তারও কিছুটা প্রভাব পড়েছিল। প্রত্যেক জাতিই তার প্রাচীন ভাষার স্বরূপ উদ্ঘাটনে এবং পুনর্মূল্যায়নে প্রবৃত্ত হ'য়েছিল। ফলতঃ তুলনামূলক অধ্যয়নের প্রতিও কেউ কেউ দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন। গ্রীক ও লাটিন ভাষা যে একই মূল থেকে উৎপন্ন, তারও আভাস পাওয়া গেল, এবং শব্দ যে ধাতুর উপর আধারিত, এ বিষয়েরও ইঙ্গিত পাওয়া গেল। শব্দ সংগ্রহ এবং শব্দবিশ্লেষণের প্রতিও অনেক বৈয়াকরণ এবং দার্শনিক যথোচিত আগ্রহ প্রকাশ করেন। কোন কোন ক্ষেত্রে রাজশক্তিও এই বিষয়ে আনুকূল্য প্রদর্শন করেন। এই সমস্ত কার্যে যাঁরা আত্মনিয়োগ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে আছেন পী. এস. পল্লস (১৭৪১-১৮১১), জে. জি. হর্ডের, কোণ্ডিল্যাক, ডী. জেনিস্।

[তিন] পাশ্চাত্যে শব্দবিদ্যা অধ্যয়ন (অন্তর্বর্তীকাল)

য়ুরোপখণ্ডে বিজ্ঞানসম্মতভাবে শব্দবিদ্যা-বিষয়ে অধ্যয়ন শুরু হয় সংস্কৃত ভাষা-বিষয়ে তাদের অবহিত হবার পর থেকে। সপ্তদশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে য়ুরোপের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে খ্রীষ্টান মিশনারীরা ভারতে এসে সংস্কৃত ভাষার পরিচয় লাভ করেন এবং তাদের মারফত কোন কোন গ্রন্থের অনুবাদ য়ুরোপে প্রচার লাভ করে। **চার্লস উইলকিন্স** (Charies Wilkins) ১৭৮৫ খ্রী 'ভাগবদ্‌গীতা'র ও ১৭৮৭ খ্রী 'হিতোপদেশ'-এর ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশ করেন। ১৭৮৯ খ্রী **স্যার উইলিয়ম জোন্স** (Sir William Jones) 'শকুন্তলা'র ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশ করেন। কলকাতা সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি এবং রয়েল এসিয়াটিক সোসাইর প্রতিষ্ঠাতা স্যার উইলিয়ম জোন্সই (১৭৪৬-১৭৯৪) প্রকৃতপক্ষে গ্রীক, লাতিন এবং অপরাপর য়ুরোপীয় ভাষাগুলোর সঙ্গে সংস্কৃত ভাষার জ্ঞাতিত্বের কথা উল্লেখ করেন এবং এই সূত্র ধরেই য়ুরোপে বিজ্ঞানসম্মতভাবে ভাষা চর্চার সূত্রপাত হয়।

য়ুরোপে, বিশেষতঃ ইংলণ্ডে ও জার্মান দেশে সংস্কৃত ভাষার চর্চা প্রবল গতিতে প্রতিষ্ঠিত হ'লো। সংস্কৃত ভাষার আদি বিদ্বানদের মধ্যে ইংরেজ পণ্ডিত **কোলব্রুক** (Henry Thomas Colebrooke, 1765-1837)-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। জার্মান-বিদ্বান্ **ফ্রীডরীখ শ্লেগেল্** (Friederieh Schlegel, .772-1829) এবং তাঁর ভাই **অ্যাডল্‌ফ্ শ্লেগেল্** (Adolf Schlegel, 1767-1845) সংস্কৃত ভাষায় কৃতবিদ্য ছিলেন। ফ্রীডরিথ শ্লেগেলই সর্বপ্রথম তুলনাত্মক ব্যাকরণের কথা উল্লেখ করেন এবং কয়েকটি ধ্বনিনিয়মের সঙ্কেত দান করেন। ইন্দো-য়ুরোপীয় ভাষাগুলো যে একই মূল থেকে উদ্ভূত এ কথাও তিনিই বলেন। তিনি মনে করতেন যে বিভিন্ন ভাষার উৎপত্তি বিভিন্ন সূত্র থেকে ঘটাই সম্ভব। অ্যাডল্‌ফ্ শ্লেগেল সংস্কৃত এবং অন্যান্য সগোত্র শ্লিষ্ট ভাষাগুলোকে সংশ্লেষাত্মক (Synthetic) এবং বিশ্লেষাত্মক (Analytic)—এই দুই বর্গে বিভক্ত করেন।

জার্মান দেশে **হাম্‌বোল্ড্‌ট্** (Wilhelm Von Humboldt, 1767-1835) প্রকৃতপক্ষে তুলনাত্মক ভাষাবিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠাতা না হ'লেও একজন কৃতী গবেষক। তাঁর বিশেষ কৃতিত্ব প্রকাশ পেয়েছে ভাষার আঙ্গিক বিশ্লেষণে তথা বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানে। অধিকন্তু তিনিই ভাষাবিজ্ঞানের মনস্তাত্ত্বিক দিকটি নিয়ে সর্বপ্রথম সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি ভাষার উৎপত্তি বিষয়ে অনুসন্ধান অকারণ বিবেচনা করতেন, বরং ভাষার শ্লিষ্ট-অশ্লিষ্ট-আদি বর্গ বিভাগ করেছিলেন। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে শব্দের মূলে আছে ধাতু-প্রকৃতি ; প্রত্যয়-বিভক্তিগুলো

এক সময় স্বাধীন শব্দ ছিল, অর্থবোধের নিমিত্ত অপর শব্দের সঙ্গে যুক্ত হ'য়ে স্বাধীন সত্তা হারিয়ে ফেলে। **ফ্রানৎস্ বপ্** (Franz Bopp, 1791-1867) সংস্কৃত, জেন্দ-আবেস্তা, গ্রীক, লাতিন, লিথুআনীয় প্রভৃতি ভাষার প্রথম তুলনাত্মক ব্যাকরণ রচনা করেন। প্রাথমিক কার্য হিশেবে এর মূল্য থাকলেও বর্তমানে এর মূল্য অনেক কমে গেছে। তিনিও প্রত্যয়-বিভক্তিকে স্বাধীন শব্দ থেকে উৎপন্ন বলে মনে করতেন। তিনি পৃথিবীর যাবতীয় ভাষাকে ত্রিধা বিভক্ত করেছিলেন। (১) চীনা-আদি ব্যাকরণ-নিয়মরহিত ভাষা, (২) একাক্ষর-ধাতুমূলক বিভিন্ন আর্যগোষ্ঠীর ভাষা এবং (৩) দ্ব্যক্ষর বা তিন বর্ণবিশিষ্ট সেমীয় ভাষাগোষ্ঠী। রূপকথার প্রখ্যাত লেখক **যাকোব গ্রিম** (Jacob Grimm, 1765-1863)-এর 'জার্মান ব্যাকরণ'ই প্রথম ঐতিহাসিক ব্যাকরণ; আদি আর্যভাষার কোন কোন স্বরধ্বনি কীভাবে জার্মান ভাষায় রূপান্তরিত হয়, সেই স্বরক্রম-বিষয়ে তিনি কয়েকটি ধ্বনিনিয়ম আবিষ্কার করেন। **র‍্যাজমাস রাস্ক্** (Rasmas Kristian Rask, 1787-1832) প্রাচীন নর্স (Norse) বা আইসল্যাণ্ডের ভাষা, অ্যাংলো-স্যাক্সন ভাষা ও জার্মান ভাষা-সম্বন্ধে অনেক তথ্য আবিষ্কার করেন। জার্মান ভাষার কয়েকটি ধ্বনিনিয়মের আবিষ্কর্তাও তিনি। কিন্তু নিয়মটি বিধিবদ্ধ করেছিলেন গ্রিম, তাই নিয়মটি 'গ্রিমের সূত্র' (Grimm's Law) নামে পরিচিত। রাস্ক জেন্দ-আবেস্তার ভাষার প্রাচীনত্ব-বিষয়ে প্রামাণিক সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন।

পূর্বোক্ত ভাষাবিজ্ঞানীরা ভাষাতত্ত্ব তথা ভাষাবিজ্ঞানের মূলভিত্তি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এর পর শুরু হয় উপকরণ সংগ্রহের কাজ। এ ব্যাপারে যাঁরা অগ্রণী ছিলেন, তাঁদের মধ্যে প্রথমেই নাম করতে হয় **আগস্ট পট** (August F. Pott, 1802-1887)-এর। এঁকে অনেকেই বৈজ্ঞানিক ব্যুৎপত্তিশাস্ত্রের জনক বলে অভিহিত করে থাকেন। তিনি বপ্-এর ব্যাকরণের কিছু সংস্কারও সাধন করেছিলেন। গ্রিম্-এর সমকালীন **কে. এম. র‍্যাপ** ধ্বনিশাস্ত্র-বিষয়ে আলোচনা করেন। তিনি বিভিন্ন দেশে গিয়ে তত্তৎ জীবিত ভাষা অধ্যয়ন করেন। তিনি ধ্বন্যাত্মক লিপির (Phonetic transcription) উপযোগিতার কথা প্রথম উল্লেখ করেন। জার্মানীর অধিবাসী **ম্যাক্সমূলর** (Friedrich Max-Muller, 1823-1900) ভাষাবিজ্ঞানী হিশেবে খুব মহৎ না হলেও ভারতের বিভিন্ন ভাষাগোষ্ঠী-সম্পর্কে, বিশেষতঃ প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য-সম্পর্কে যে সমস্ত গ্রন্থ রচনা করে গেছেন, তার জন্য আমরা চিরকাল কৃতজ্ঞ থাকবো। ভাষার উদ্গম, বিকাশ, বর্গীকরণ প্রভৃতি বিষয়ে তিনি বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। **আগস্ট শ্লাইখর** (August Schleicher, 1823-1868) অন্তর্বর্তী যুগের শেষ প্রতিনিধিরূপে বিবেচিত হ'তে পারেন। তিনি অযোগাত্মক এবং শ্লিষ্ট

যোগাত্মক—এই তিন বর্গে ভাষাকে বিভক্ত করেন। এঁর প্রধান কার্য আদি ইন্দো-য়ুরোপীয় ভাষার পুনর্গঠন। **উইলিয়ম হিবটীন** (W. D. Whitny, 1827-1894) আমেরিকার প্রথম ভাষাবিজ্ঞানী। ইনি ম্যাক্সমুলরের সমকালীন এবং প্রতিদ্বন্দ্বী। সংস্কৃত ভাষার উপর তিনি খুব ভাল কাজ করলেও ভারতে ম্যাক্সমুলরের তুল্য সমাদর লাভ করতে পারেন নি। এইকালের অপরাপর ভাষাবিজ্ঞানীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য **জেমস্ প্রিন্সেপ** (1799-1840), **স্যর হেনরি রলিনসন্** (1810-1895), **ফেডরীখ্ স্পীগেল** (1820-1895) প্রভৃতি।

[চার] পাশ্চাত্ত্যে শব্দবিদ্যা অধ্যয়ন (আধুনিক যুগ)

১৮৫৫ খ্রী **স্টাইনথাল** (H. Stinthal)-কর্তৃক ভাষাশাস্ত্র বিষয়ক একখানি গ্রন্থ প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে ভাষাচর্চার ইতিহাসে একটা নবযুগের প্রবর্তন হয়। এই যুগটাকে বলা হয় **য়ুংগ্রামাটিকের** (Junggrammatike=young grammarians) বা 'নব্য বৈয়াকরণ'দের যুগ। স্টাইনথালের গ্রন্থটি যে খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল তা' নয় ; তবে তিনি মনস্তত্ত্ব এবং অন্যান্য শাস্ত্রের সঙ্গে ভাষাবিজ্ঞান-চর্চার আবশ্যিক যোগাযোগের কথা সর্বপ্রথম উত্থাপন করেন।

নব্যবৈয়াকরণদের দৃষ্টিভঙ্গির বৈশিষ্ট্যগুলোকে সংক্ষেপে নিম্নোক্তক্রমে সূত্রবন্ধ করা চলে ঃ একমাত্র ধ্রুবসাহিত্যের (Classical Literature) সহায়তায় ভাষাচর্চা-বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ আলোচনা সম্ভবপর নয়, এর জন্য জীবন্ত ভাষাগুলোর চর্চাও অত্যাবশ্যক। মানুষের জ্ঞানভাণ্ডার অসম্পূর্ণ, এই অবস্থায় ভাষার মূল উৎস বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্ভবপর নয়। শারীরিক (Physiological) এবং মনস্তাত্ত্বিক (Psychological)—দুদিক থেকেই ভাষার আলোচনা হওয়া প্রয়োজন, কারণ উভয়েই পৃথক্ অথচ সুনির্দিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে। সাদৃশ্য (Analogy) ভাষাবিজ্ঞান-আলোচনার বিভিন্ন ক্ষেত্রে অসাধারণ ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে। বিভিন্ন জাতির মিশ্রণও ভাষার ইতিহাসে অনেকখানি প্রভাব বিস্তার করে থাকে।

এই নব্যধারায় **আস্কোলি** (Ascoli) ১৮৭০ খ্রীঃ সর্বপ্রথম আদি আর্যভাষাকে 'কেন্তুম্' ও 'সতম্' গোষ্ঠীতে বিভক্ত করেন। যে তিন প্রধান ব্যক্তিত্বকে কেন্দ্র করে নব্যবৈয়াকরণ শাখা দৃঢ়ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়, তাঁরা হলেন—**হারম্যান অস্থফ্** (Hermann Osthof), **কার্ল ব্রুগম্যান** (Karl Brugmann) ও **হারম্যান পল্**

(Hermann Paul)। এ'দের মধ্যে ব্রুগম্যানকে এযুগের শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধিরূপে স্বীকার করা হয়। ভাষার দর্শন ও নীতি বিষয়ে পলের গ্রন্থ এখনও প্রামাণিক বলে স্বীকৃত হয়। এ ধারার ডেলব্রুকের (B. Delbruck) নামও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। প্রকৃতপক্ষে বিভিন্ন ভাষায় অসাধারণ ব্যুৎপত্তির সহায়তায় তিনিই প্রথম 'তুলনাত্মক বাক্যরীতি'র (comparative syntax) উদ্ভাবন করেন। জুলিয়াস্ জোলি (Julius Jolly), পিটার গাইল্স (Peter Giles) এবং শ্রাডের (O. Schrader—of Breslau) নব্য বৈয়াকরণ শাখায় বিভিন্ন দিকে উল্লেখযোগ্য কাজ করে গেছেন। শ্রাডেরই প্রথম ভাষাতত্ত্বের সাহায্যে 'প্রত্ন ইতিহাস' (Urgeschichte)-উদ্ধারের উপর আলোকসম্পাত করেন।

ভাষাবিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যাঁরা নোতুন নোতুন তত্ত্ব বা তথ্য উদ্ভাবন করেছেন, তাদের বাইরেও রয়েছেন কিছু মনীষী, যাঁরা সাধারণভাবে 'প্রাচ্যবিদ্যাবিশারদ' আখ্যা পেতে পারেন। তাঁরা ভারতের বিভিন্ন ভাষা-বিষয়ে বিস্তর গবেষণা করেছেন এবং বহু চিন্তামূলক গ্রন্থাদি রচনা করে গেছেন। ভারতের বিভিন্ন ভাষা অধ্যয়নে এ'দের সহায়তা অপরিহার্য। এ'দের মধ্যে আছেন গেঅর্গ বুহলার (Georg Buhler, 1857-1898)—ভারতীয় ভাষাতত্ত্ব এবং ভারতের প্রত্নতত্ত্ব ছাড়াও ভারতের লিপিতত্ত্ব (Palaeography)-বিষয়েও তাঁর মৌলিক গবেষণা রয়েছে। কার্ল গেল্ডনার (Karl Geldner, 1854-1929) জেন্দ আবেস্তা এবং ঋগ্‌বেদের উপর ভাল কাজ করেছেন। আমেরিকার হিবট্‌নির যোগ্য উত্তরসাধক ছিলেন চার্ল্‌স্ ল্যানম্যান (Charles R. Lanman 1850-1941)। তাঁর রচিত সংস্কৃত ভাষার ব্যাকরণ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি-প্রসূত। প্রখ্যাত ফরাসী মনীষী সিলভ্যাঁ লেভি (Sylvain Levi, 1873-1936) ভারত-প্রেমের জন্য এদেশে একজন অতিপরিচিত ব্যক্তি। তিনি শুধু ভারতবিদ্যায় নন, প্রাচ্যজগতের বহু ভাষাতেই কৃতবিদ্য ছিলেন। মধ্যভারতীয় আর্যভাষা তথা প্রাকৃত এবং অপভ্রংশ ভাষার একজন দিক্‌পাল পণ্ডিত ছিলেন পিশেল (R. Pischel, 1836-1909)। উভয় ভাষার উপরই তাঁর উল্লেখযোগ্য কাজ রয়েছে। হারম্যান ওল্ডেনবার্গ (Hermann Oldenberg) যেমন বেদ এবং সংস্কৃত ভাষার উপর কাজ করেছেন, তেমনি বৌদ্ধসাহিত্যে এবং পালিভাষাতেও ছিলেন প্রাধীতী, বস্তুতঃ এ বিষয়ে তাঁর কাজকে প্রামাণিক বলে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। হারম্যান য়াকোবি (Hermann Jacobi) প্রধানতঃ প্রাকৃত ভাষা, জৈনধর্ম এবং জৈনসাহিত্যে সুপণ্ডিত বলে গণ্য হ'লেও মহারাষ্ট্রীয় প্রাকৃত এবং প্রাচীন মারাঠী ভাষার উপর যে কাজ করে গেছেন তা' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। জ্যাকব ওয়াকের্‌নাগেল (Jacob Wacker-

nagel, 1853-1940) সংস্কৃত ব্যাকরণের বিভিন্ন দিক নিয়ে কয়েক খণ্ডে বিভক্ত যে ব্যাকরণ [রচনা] করেন, তার মূল্য অপরিসীম। **বিশপ কল্ড্ওয়েল** (Bishop Caldwell, 1814-1891) দীর্ঘকাল দাক্ষিণাত্যে বসবাস করে দ্রাবিড় ভাষাসমূহের এক তুলনাত্মক ব্যাকরণ রচনা করেন। এই জাতীয় গ্রন্থসমূহের মধ্যে এটিকে আদর্শস্থানীয় মনে করা হয়। **জন্ বীমস্** (John Beams) ছিলেন ব্রিটিশ ভারতের একজন উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী। তিনি ১৮৭২ খ্রীঃ তিন খণ্ডে বিভক্ত ভারতীয় আর্যভাষাসমূহের যে তুলনাত্মক ব্যাকরণ রচনা করেন, পরবর্তী নব্য ভারতীয় আর্যভাষাসমূহের আলোচনায় ঐটিই পথপ্রদর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করে। **ডঃ হর্নলে** (Dr. Hoernley, 1841-1918) গৌড়ীয় ভাষাগুলোর সঙ্গে তুলনা করে পূর্বী হিন্দী ভাষার যে ব্যাকরণ রচনা করেন, ভাষাবিজ্ঞানিগণ তাকে অতিশয় মর্যাদার সঙ্গে গ্রহণ করে থাকেন। সিন্ধী ও পোস্তু ভাষার উপর ১৮৭২ খ্রীঃ প্রকাশিত **ডঃ আর্নেস্ট ট্রাম্প** (Dr. Earnest Trumpp) রচিত গ্রন্থও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অধ্যাপক **জুল ব্লক** (Jules Block) আধুনিক ভারতীয় ভাষাসমূহের বিকাশ-বিষয়ে একজন বিশেষজ্ঞ ছিলেন। তিনি মারাঠী ভাষার উপর যে আলোচনা ক'রে গেছেন, নব্য ভারতীয় আর্যভাষার আলোচনায় ঐটি আদর্শরূপে গৃহীত হয়ে থাকে। দ্রাবিড় ভাষা-বিষয়েও তিনি গ্রন্থ রচনা করেছেন। ভারততত্ত্ববিদ্ ইহুদী পণ্ডিত **হাইনরিখ্ লুডার্স** (Heinrich Luders) বহু প্রাচীন লিপির পাঠোদ্ধার করে লুপ্ত ইতিহাসের পুনরুদ্ধার সাধন করেছেন। ভারতের অতি উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী **স্যার জর্জ গ্রীয়ারসন** (Sir George Abraham Grierson) তেত্রিশ বছরের সাধনায় একাদশ খণ্ডে বিভক্ত 'Linguistic Survey of India' নামে যে মহাগ্রন্থ রচনা করেছেন, তাতে ভারতের অসংখ্য ভাষা, উপভাষা ও বিভাষা উদাহরণ এবং ব্যাকরণসহ আলোচিত হয়েছে। ভাষার এ ধরণের ভৌগোলিক জরিপ এর পর আর কখনও হয়নি।

[পাঁচ] শব্দবিদ্যা অধ্যয়নে সাম্প্রতিক প্রবণতা

জার্মানীর নব্য বৈয়াকরণদের ভাষাবিষয়ক আন্দোলন দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসারের ফলে ভাষাবিজ্ঞান-আলোচনায় ব্যবহারিক বিজ্ঞানের দিক্ও আর দীর্ঘকাল অবহেলিত রইলো না। পাশ্চাত্ত্য দেশসমূহে ও আমেরিকায় যন্ত্রনির্ভর ভাষাবিজ্ঞান অধ্যয়ন শুরু হয়েছে। নানাপ্রকার যন্ত্র আবিষ্কারের ফলে ধ্বনির উচ্চারণ অধিকতর সূক্ষ্মভাবে নিরূপণ করা সম্ভবপর হচ্ছে। এইসব যন্ত্রের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য **কায়মোগ্রাফ** (Kymograph)-এর সাহায্যে বিভিন্ন ধ্বনির স্বরূপ ও মাত্রা নির্ণয় করা হয়। প্রয়োগাত্মক ধ্বনিবিজ্ঞান-অধ্যয়নে কায়মোগ্রাফের

মতই অপরিহার্য যন্ত্র **কৃত্রিম তালু** (False Palate)। **এক্সরে** (X'Ray) যন্ত্র ও কৃত্রিম তালুর সাহায্যে যথাক্রমে অস্পৃষ্ট ও স্পৃষ্টধ্বনিগুলোর উচ্চারণস্থান নির্ণয় করা হয়। **ল্যারিঙ্গোস্কোপ** (Laryngoscope) যন্ত্রের সাহায্যে বিভিন্ন ধ্বনির উচ্চারণকালে স্বরযন্ত্র ও স্বরতন্ত্রীর অবস্থান লক্ষ্য করা যায়। **এন্ডোস্কোপ** (Endoscope) যন্ত্রটি পূর্বোক্ত যন্ত্রের উন্নত সংস্করণ। মুখ বন্ধ রেখেও যন্ত্রের সাহায্যে স্বরযন্ত্র ও স্বরতন্ত্রীর অবস্থান বোঝা যায়। এগুলো ছাড়াও **অটো-ফনোস্কোপ** (Auto-Phonoscope), **ব্রীদিং ফ্ল্যাস্ক** (Breathing Flask), **স্পিরোমিটার** (Spirometer), **স্টেথেগ্রাফ** (Stethegraph), **ন্যুমোগ্রাফ** (Pneumograph) প্রভৃতি যন্ত্রের আবিষ্কার ভাষাবিজ্ঞানচর্চার বিশেষতঃ ধ্বনিবিষয়ক আলোচনার ক্ষেত্রে যুগান্তর সৃষ্টি করেছে।

শব্দবিদ্যা-সম্বন্ধীয় আলোচনার প্রধান কেন্দ্রস্থল ছিল জার্মানী, ক্রমে প্যারিস এবং লণ্ডনও উল্লেখযোগ্য গবেষণাকেন্দ্ররূপে পরিচিত হয়। সাম্প্রতিক কালে ভাষাবিজ্ঞান-চর্চার কেন্দ্র সরে গেছে অনেকদূর—আমেরিকায়। আমেরিকায় **ব্লুমফিল্ড** (L. Bloomfield), **স্যাপির** (Edward Sapir), **স্তুর্তেভাঁ** (E. H. Sturtevant) প্রভৃতি ভাষাবিজ্ঞানিগণ শব্দবিদ্যার বিভিন্ন ক্ষেত্রে দিক্‌পালের ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। এদিকে ইংরেজ মনীষী **ড্যানিয়েল জোন্স** (Daniel Jones) ধ্বনি-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এক যুগান্তর সৃষ্টি করেছেন। ডেনিস্ অধ্যাপক **অটো জেস্‌পারসন্** (Otto Jesperson)-ও ইংরাজি ভাষার ক্ষেত্রে অসাধারণ কাজ করেছেন। বর্তমান শতাব্দীতে ভারতবর্ষেও পাশ্চাত্ত্য ধারায় শব্দবিদ্যার বিভিন্ন ক্ষেত্রে স্বাধীনভাবে অনেক কাজ হয়েছে। এঁদের মধ্যে অগ্রণী পুরুষ **রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকর।** **আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়**-রচিত *Origin and Development of Bengali Language* শুধু বাঙলা ভাষার ক্ষেত্রেই নয়, সমগ্র নব্য ভারতীয় আর্যভাষার ক্ষেত্রেও আকরগ্রন্থরূপে বিবেচিত হ'য়ে থাকে। সমগ্র প্রাচ্য জগতে শব্দবিদ্যার উপর এতখানি অধিকার, অপর কারোর ছিল না বলেই মনে হয়। অধ্যাপক **তারাপোরওয়ালা** (Irach Jehangir Sorabji Taraporewala), **ডঃ** মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ এবং ডঃ **সুকুমার সেন**ও শব্দবিদ্যার বিভিন্ন দিকে অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন।

আফ্রিকা এবং আমেরিকার আদিবাসীদের মধ্যে অসংখ্য ভাষা-উপভাষা প্রচলিত আছে। তাদের লিখিত কোন সাহিত্য না থাকায় সেই সমস্ত ভাষার ধ্বনি, বর্ণ, শব্দ-আদি-সম্বন্ধে আলোচনার ব্যাপারে বিরাট অসুবিধার সৃষ্টি হয়। ঐতিহাসিক এবং তুলনাত্মক ভাষাবিজ্ঞান—কোন রীতিই এক্ষেত্রে প্রয়োগ সম্ভবপর নয় বলে ভাষাবিজ্ঞান-চর্চার এক নোতুন শাখার সৃষ্টি করা হ'লো—এর নাম **বর্ণনাত্মক ভাষাবিজ্ঞান** (Descri-

ptive Linguistics)। 'বর্ণনাত্মক ভাষাবিজ্ঞান' বিষয়টি নোতুন নয়, পাণিনি থেকে অনেকেই এই ধারায় আলোচনা ক'রে গেছেন। তবে আধুনিক পদ্ধতি প্রয়োগগত এবং বিশ্লেষণগত বৈশিষ্ট্যের জন্যই এটি নোতুন শাখা-রূপে বিবেচিত হয়েছে। কোন একজন ব্যক্তি বা এক সম্প্রদায়ের ব্যবহৃত ভাষা বা উপভাষাকে নিয়ে বর্ণনাত্মক ভাষা-বিজ্ঞান গড়ে ওঠে। 'The universe of discourse for a descriptive linguistic investigation is a single language or dialect. These investigations are carried out for the speech of one particular person, or one community of dialectically identical persons at a time, so that the resulting system of elements, and statements applies to one particular dialect."—Zelling S. Harris (*Methods in Structural Linguistics*)। মহামুনি পাণিনির ভাষা-বিশ্লেষণ-রীতির সাফল্যে উদ্বুদ্ধ হয়েই ব্লুমফীল্ড দেশ-কাল-পাত্রানুযায়ী এর কিছুটা রূপান্তর সাধন করে এই বর্ণনাত্মক পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছিলেন। বর্ণনাত্মক ভাষাবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়কে প্রধানত দুটি ধারায় বিভক্ত করা হয়। (১) **ধ্বনিতত্ত্ব** (Phonology)—ধ্বনিতা বা স্বনিম (Phoneme) এর আলোচ্য বিষয় এবং (২) **ব্যাকরণ** (Grammar)—রূপমূল বা পদাঙ্গ (morpheme) এর আলোচ্য বিষয়। **গ্লীসন** (H. A. Gleason Jr), **হকেট** (Charles Francis Hockett), **নীদা** (Eugene Albert Nida), **হ্যারিস** (Zelling Sabbetai Harris) প্রভৃতি ভাষাশাস্ত্রিগণ শব্দবিদ্যার এই নোতুন ধারার প্রবর্তনে অতিশয় সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেন। হ্যারিস্ ভাষাবিজ্ঞানে গঠন-সর্বস্বতার (Structuralism) উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। অর্থের দিকটিকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা ক'রে তিনি ভাষার গঠন এবং অবস্থানের দিক্ থেকেই ভাষার বিভিন্ন উপাদান বিশ্লেষণ করেন। এরই মধ্যে **চম্‌স্কি** (Noam Chomsky) এক নব আন্দোলনের সূচনা করেছেন। চম্স্কি যে মতবাদের প্রবর্তন করেন, তাকে বলা হয় 'সংবর্তনী সঞ্জননী ব্যাকরণ' বা রূপান্তরাত্মক সৃজনমূলক ব্যাকরণ' (Transformational Generative Grammar)। তাঁর মূল বক্তব্য এই—মানুষ তার সহজাত বোধ-বুদ্ধির সহায়তায় মাতৃভাষার মূলনীতিগুলি আয়ত্ত ক'রে তাকেই যথাযোগ্যভাবে প্রয়োগ ক'রে নিজের সৃজনীশক্তির সাহায্যে সীমাবদ্ধ উপকরণ দিয়ে পরিস্থিতির উপযোগী প্রয়োজনীয় বাক্য সৃষ্টি ক'রে থাকে। তিনি আরও দেখিয়েছেন যে, জাতিতে জাতিতে নানা পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও সমস্ত জাতির ভাষাপ্রক্রিয়ায় ও ব্যাকরণে রয়েছে একটা মূলগত সার্বিক ঐক্যবোধ—তিনি একে বলেছেন 'ভাষাগত বিশ্বজনীনতা' (Linguistic Universal)-তত্ত্ব।

ভাষাবিজ্ঞানের এবং/অথবা তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অপর কয়েকটি শাখাও ক্রমে শ্রীবৃদ্ধি লাভ করছে। এদের মধ্যে আছে সুরবিজ্ঞান (Tonetics), ভাষার দার্শনিক স্বরূপ-বিবেচনা (Metalinguistics), উপভাষা-বিজ্ঞান (Dialectology), ভাষাতাত্ত্বিক ভূগোল (Linguistic Geography) এবং ধ্বনিতত্ত্ববিজ্ঞান (Phonemics)।

[ছয়] একালের কয়েকজন স্মরণীয় ভাষাবিজ্ঞানাচার্য

(১) ফের্দিনাঁ দ্য সোস্যুর (Ferdinand de Sausure : 1857-1913 A.D.)—জীববিজ্ঞানী ডারুইন-এর 'বিবর্তনবাদ' (Theory of Evolution) প্রচারিত হবার পরই ভাষাবিজ্ঞানীরাও ভাষাবিজ্ঞান-চর্চায় কঠোরভাবে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রয়োগ ক'রে ভাষাচর্চার এক নবরূপের উদ্বোধন করেন। এই ধারার ভাষাবিজ্ঞানীরা 'নব্য বৈয়াকরণ' (Junggrammatiker—young grammarians) গোষ্ঠী নামে পরিচিত। এই ধারারই একজন বিশিষ্ট প্রবক্তা ফের্দিনাঁ দ্য সোস্যুর কর্মজীবনে ছিলেন তুলনামূলক ব্যাকরণ ও সংস্কৃতের অধ্যাপক। সম্ভবতঃ এই সূত্রেই পাণিনির ব্যাকরণের সঙ্গে পরিচিত হ'য়ে তাঁর প্রভাবে তিনি ভাষাবিজ্ঞানে 'বর্ণনামূলক ধারার' (Descriptive Linguistics) প্রবর্তন করেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর বক্তৃতা-সঙ্কলন করে ১৯১৬ খ্রীঃ *Course in General Linguistics* নামে প্রকাশিত হয়। পূর্ববর্তী ভাষাচার্যগণ ঐতিহাসিক এবং তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের বাইরে যান নি, সোস্যুরই প্রথম ভাষাচর্চার ধারাকে বর্ণনাত্মক দিকে প্রবাহিত করেন এবং বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানের মূলনীতিসমূহ শৃঙ্খলাবদ্ধ আকারে প্রকাশ ক'রে এই ধারাকে দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা করেন। পূর্বসূরীদের ভাষাবিশ্লেষণাত্মক খণ্ড দৃষ্টির পরিবর্তে তিনি খণ্ড ও অখণ্ড ভাষারূপের মধ্যে সমন্বয় সাধনের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেন। তাঁর এই কৃতিত্ব-বিষয়ে বলা হয়েছে: "De Sausure was among the first to see that language is a self-contained system whose interdependent parts function and acquire value through their relationship to the whole." তাঁর এই মতবাদকে অবলম্বন ক'রেই পরবর্তীকালে 'অবয়ববাদ' বা 'গঠন-সর্বস্বতাবাদ' (Structuralism) গড়ে ওঠে। ভাষাবিদ্যা-চর্চার ক্ষেত্রে সোস্যুরের অপর মহৎ কীর্তি 'ভাষা' অর্থাৎ 'শিষ্ট ভাষা' (Language) এবং 'জানপদ ভাষা' অর্থাৎ কথ্যভাষার (Speech=Parole) পার্থক্য নির্ধারণ। বস্তুতঃ এই ধারণাকে অবলম্বন করেই পরবর্তীকালে চম্‌স্কি-প্রবর্তিত 'রূপান্তরণীয় উৎপাদক ব্যাকরণ' বা 'রূপান্তরমূলক সৃজনমূলক ব্যাকরণ'। 'সংবর্তনী সঞ্জননী ব্যাকরণে' অনেক

(২) স্যাপীর (Edward Sapir : 1884-1939)—মূলতঃ ঐতিহ্যগত ভাষাতত্ত্বের অধ্যাপক হ'লেও এড্‌ওয়ার্ড স্যাপীর বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানের প্রভাবাধীন হ'য়ে পড়েন। তিনিও ঐতিহাসিক এবং তুলনামূলক ভাষাবিজ্ঞানের 'কালানুক্রমিক ধারা'র (Diachronic description) পরিবর্তে বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানের 'ঐককালিক ধারা'র (Synchronic description) সঙ্গে যুক্ত হ'য়ে পড়েন এবং সোস্যুর-প্রবর্তিত Structuralism তথা 'অবয়ববাদ' তত্ত্বের দ্বারা প্রভাবিত হন। কিন্তু তিনি নিছক অবয়ববাদী ছিলেন না, ধ্বনি এবং শব্দের অর্থ-নিয়মনে মনস্তত্ত্বের গুরুত্বও তিনি স্বীকার করেন। এইদিক্ থেকে তাঁর স্বাতন্ত্র্য মেনে নিতে হয়।

(৩) লিওনার্ড ব্লুমফীল্ড্ (Leonard Bloomfield : 1887-1949)—বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানের প্রবর্তক-রূপে সোস্যুরের নাম কীর্তিত হলেও কার্যতঃ লিওনার্ড ব্লুমফীল্ডের হাতেই ভাষাবিজ্ঞানের এই ধারাটি যথোপযুক্তরূপে পরিপুষ্টি লাভ ক'রে একটা পূর্ণাঙ্গ রূপ পরিগ্রহ করে। তবে তিনি ছিলেন সম্পূর্ণতঃই অবয়ববাদী (Structuralist Linguist) ভাষাবিজ্ঞানী। তাঁর সমকালীন অপর ভাষাবিজ্ঞানী স্যাপীর অবয়ববাদী হ'লেও তিনি ভাষা-বিশ্লেষণে মনস্তত্ত্বের ভূমিকাকেও স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। কিন্তু ব্লুমফীল্ড শব্দের অর্থ-বিশ্লেষণকে ভাষাচর্চার ক্ষেত্রে একটি দুর্বলতার লক্ষণ বলে মনে করতেন এবং মনে করতেন যে মানবিক জ্ঞান আরও পূর্ণতায় উপনীত না হওয়া পর্যন্ত এভাবেই চলবে। তবে তিনি এ কথা বিশ্বাস করতেন যে ভাষা-বিশ্লেষণে অভ্যস্ত আচরণ (behaviour) অনেকখানিই প্রভাব বিস্তার করে এবং তিনিও এই আচরণবাদী পরিসীমার (behaviorist boundraies) মধ্যে থেকেই ভাষাচর্চা ক'রে গেছেন। একালের বর্ণনামূলক তথা অবয়ববাদী ভাষাবিজ্ঞানীরা ব্লুম্‌ফীল্ডকেই পিতৃত্বের মর্যাদা দান করেন।

(৪) আব্রাহাম নোয়াম্ চম্‌স্কি (Abraham Noam Chomsky : 1928—)—সাম্প্রতিক কালে ভাষাবিজ্ঞানে যে ধারাটি বিশেষ বলবতী, সেই বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞান বর্তমান আমেরিকায় গভীরভাবে অনুশীলিত হ'চ্ছে। গবেষণাকারীদের মধ্যে গ্লীসন (জুঃ), চার্লস্ হকেট্, ইউজিন এলবার্ট নীদা, হ্যারিস্ প্রভৃতি প্রত্যেকেই স্ব স্ব ক্ষেত্রে অতিশয় খ্যাতিমান্। তবে এ'রা সকলেই প্রধানতঃ অর্থ-ব্যতিরিক্ত অবয়ববাদের উপরই সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেন। নোয়াম্ চম্‌স্কিই প্রথম উল্লেখযোগ্যভাবে এই মতবাদের বিরোধিতায় এগিয়ে আসেন। তাঁর গবেষণাপত্র তথা প্রথম প্রবন্ধ গ্রন্থ *Syntactic Structure* (1957) প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই ভাষাবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এক নব তরঙ্গ দেখা দেয়। অতঃপর তাঁর ভাবনা-চিন্তার ক্রম-পরিণতি

প্রকাশিত হয় পরবর্তী গ্রন্থসমূহে। এদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য—*Current Issues in Linguist Theory* (1964), *Aspects of the Theory of Syntax* (1965), *Topic in the Theory of Generative Grammars* (1966), *Cartesian Linguistics* (1966), *Language and Mind* (1972), *Studies on Semantics in Generative Grammar* (1972) প্রভৃতি। চমস্কি তাঁর দ্বিতীয় গ্রন্থেই অবয়ববাদের যান্ত্রিক বিশ্লেষণকে অস্বীকার ক'রে ভাষার উৎপাদক শক্তি তথা সৃজনী শক্তির উপর গুরুত্ব আরোপ ক'রে তাঁর 'রূপান্তরণীয় উৎপাদক ব্যাকরণ'/ 'রূপান্তরমূলক সৃজনমূলক ব্যাকরণ' তথা 'সংবর্তনী সঞ্জননী ব্যাকরণ' (*Transfomational Generative Grammar*)-তত্ত্ব প্রকাশ করেন। চমস্কির এই তত্ত্ব ভাষাবিজ্ঞানী-মহলে যথেষ্ট আলোড়ন সৃষ্টি করলেও এখনো তা' সর্বজন-স্বীকৃত-রূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করেনি, ফলতঃ অবয়ববাদীরাও এখনও পর্যন্ত ঐ প্রচলিত ধারাতেই কাজ ক'রে যাচ্ছেন। তবে চমস্কি শুধু ভাষাবিজ্ঞানীই নন, সমাজবিদ্যা শাখাতেও তাঁর স্বচ্ছন্দ বিচরণ। কাজেই ভাব-জগতের অন্যত্রও চমস্কির মতবাদের প্রয়োগ-প্রচেষ্টা চলছে।

চমস্কি-প্রবর্তিত মতবাদের মূলকথা: তিনি ভাষাকে একটি নিয়মবদ্ধ যান্ত্রিক প্রক্রিয়া বলে মনে করেন নি (যা' তাঁর পূর্ববর্তী এবং সমকালবর্তী 'অবয়ববাদী' তথা 'Structuralist'-রা করতেন এবং করেছেন), পক্ষান্তরে তিনি স্বীকার করেছেন যে ভাষায় রয়েছে একটা নিজস্ব উৎপাদিকা শক্তি বা সৃজনী ক্ষমতা, এবং তার জন্যই কোন অল্পজ্ঞানী মানুষও তার ভাষাকে ভাব-প্রকাশের উপযোগী ক'রে রূপ থেকে রূপান্তরে পরিণত করতে পারে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা চলে যে সুদীর্ঘ কয়েক সহস্রাব্দ পূর্বেই মহামুনি পাণিনিও যে এই তত্ত্বটি অবগত ছিলেন, তা' স্বীকার করেছেন চমস্কি। তিনি বলেন: "What is more, it seems that even Panini's grammar can be interpreted as a fragment of such a 'generative grammar' in essentially the contemporary sense of this term." এ বিষয়ে একালের একজন বিশিষ্ট মনীষী অধ্যাপক বলেন যে, "...that the work of Yask and Panini anticipated the methodology of Descriptive Linguisties.' এছাড়া ভাষাচার্য সুনীতিকুমার তার 'ভাষাপ্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ' (১৯৩১) এবং *A Brief Sketch of Bengali Phonetics* (1921) গ্রন্থ দু'টিতে চমস্কির বহু পূর্বেই Synchronic Desrciptive Analysis বা ঐককালিক বর্ণনাত্মক ভাষাবিজ্ঞানেরই নিদর্শন তুলে ধরেছেন। যাহোক, চমস্কির এই

সৃজনীতত্ত্বের সঙ্গে ভাষার মনোগত দিকটি ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত বলেই তত্ত্বটি 'মনোগত তত্ত্ব' (mentalistic theory) নামেও পরিচিত। সহজ ভাষায় ব্যাপারটিকে এইভাবে ব্যাখ্যা করা চলে:—সাধারণ মানুষ পরিবেশ এবং শিক্ষার সহায়তায় বেশ কিছু শব্দ এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় বাক্যের গঠন আয়ত্ত করে এবং পরে তার সৃজনী শক্তির সহায়তায় ভাব প্রকাশের উপযোগী নানাপ্রকার বাক্য গঠন করে। এই সৃজনীশক্তি মানুষের সহজাত। আমরা যত কথা বলি, সব আগে থেকেই তৈরি ক'রে বা মুখস্থ ক'রে রাখি না, প্রয়োজনমতো উদ্ভাবন করি। এই তত্ত্বের একজন ব্যাখ্যাতা বলেন: "Whoever speaks a natural language does not simply carry around in his head a long list of words or sentences which he has stored, but is able to form new sentences and to understand utterances he has never heard before. The command of language is thus a productive capacity, not merely the knowledge of an extensive nomenclature."

এ ছাড়াও চম্‌স্কি বাক্যের অর্থ স্পষ্টতর করবার উদ্দেশ্যে ভাষার বহিরঙ্গ গঠন (surface structure) এবং অন্তরঙ্গ গঠন (deep structure)-এর সঙ্গে যথাক্রমে ধ্বনিপ্রবাহ (sound structure) এবং অর্থ (semantic structure)-বোধের যোগাযোগ দেখিয়ে দিয়েছেন এবং বাক্যার্থের সঙ্গে তার আঙ্গিক স্বরূপটিও স্পষ্ট হ'য়ে উঠেছে। বাক্যের এই যে অন্তরঙ্গ গঠন (deep structure), এটি পৃথিবীর অধিকাংশ ভাষাতেই প্রায় অভিন্নরূপে বর্তমান। তাঁর এই অন্বেষা থেকেই তিনি 'ভাষিক বিশ্বজনীনতা' তত্ত্বে উপনীত হ'য়েছেন। ভাষাবিজ্ঞান-চর্চার ইতিহাসে এটিও নোয়াম্ চম্‌স্কির অপর এক মহতী কীর্তি।

(৫) আধুনিক কালে ভারতবর্ষে ভাষাবিদ্যা-চর্চার সূত্রপাত করেছিলেন কলকাতা-স্থিত সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি স্যার উইলিয়ম জোনস্ (William Jones: 1746-1794)। বিভিন্ন পাশ্চাত্ত্য ও প্রাচ্যভাষায় কৃতবিদ্য এই মনীষী রয়েল এশিয়াটিক সোসাইটির পত্তন-কালেই সংস্কৃত ভাষার সঙ্গে ইরানীয় ও য়ুরোপীয় ভাষাসমূহের একবংশজাত হবার সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করেন। এই সূত্রটি অবলম্বন করেই পাশ্চাত্ত্য তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের গোড়াপত্তন হয়। এরপর ভারতবর্ষের বিভিন্ন ভাষা-অবলম্বনে পাশ্চাত্তের বহু ভাষাবিজ্ঞানীই ভাষাচর্চার ক্ষেত্রে অনেক স্মরণীয় দান রেখে গেছেন। এদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয় একজনের কথা যিনি প্রত্যক্ষভাবে বাঙলা ভাষার সঙ্গেও জড়িত ছিলেন—তিনি জন্ বীম্‌স্।

(৬) জন্ বীমস্ (John Beams : 1837-1902)—বাঙলা ভাষার প্রথম ব্যাকরণ-রচয়িতা-রূপে হ্যালহেড্ সাহেব পিতৃত্বের মর্যাদায় ভূষিত হ'লেও বিজ্ঞানসম্মতভাবে বাঙলা ভাষার ব্যাকরণ তথা ভাষার বিভিন্ন দিক্ নিয়ে প্রথম আলোচনার সূত্রপাত করেন ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসের কর্মচারী জন্ বীমস্। কর্মসূত্রে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বসবাস কালে স্থানীয় বিভিন্ন ভাষায় তিনি অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। তাঁর প্রথম গ্রন্থ *Outlines of Indian Philology* হলেও ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে রচিত *Comparative Grammar of the Aryan Languages of India* (তিন খণ্ডে প্রকাশিত) এবং ভারতীয় আর্যভাষা-সমূহের তুলনামূলক আলোচনার ক্ষেত্রে এবং কোন কোন বিষয়ে বর্ণনাত্মক বিশ্লেষণেও ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। সাম্প্রতিককালে ভাষা-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে নানা দিগন্ত উন্মোচিত হলেও সামগ্রিকভাবে নব্যভারতীয় আর্যভাষা-সমূহের একত্রীভূত তুলনামূলক আলোচনার এমন প্রচেষ্টা আজও দেখা যায়নি।

(৭) স্যর জর্জ্ আব্রাহাম্ গ্রীয়ার্সন্ (Sir George Abraham Grierson, 1851-1941)—কর্মসূত্রে স্যর জর্জ গ্রীয়ার্সন্ উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী এবং অতিশয় উচ্চশিক্ষিত হলেও তিনি জীবনের সুদীর্ঘকাল প্রধানতঃ বিহার অঞ্চলে অতিবাহিত করেছিলেন। কিন্তু, তাঁর জ্ঞানের পরিধি অপরিসীম হবার ফলেই সমগ্র ভারতবর্ষের জনজীবন এবং ভাষা-বিষয়ে তিনি অপরিসীম দক্ষতা অর্জন করেছিলেন। প্রথম জীবনে তিনি বিহারী ভাষার বিভিন্ন উপভাষা ও বিভাষা বিষয়ে *Seven Grammars of the Dialects and Sub-dialects of Bihari Language* (১৮৮৩-৮৭) এবং বিহারের জনজীবন-সম্পর্কে *Bihar Peasant Life* (১৮৮৫) রচনা করেন। কিন্তু, সমগ্র ভারতীয় ভাষা জিজ্ঞাসার ক্ষেত্রে তাঁর অবিস্মরণীয় অবদান হল একাদশ খণ্ডে রচিত *Linguistic Survey of India*। স্টেন্ কোনো (Sten Konow)-র মতো মনীষীর এবং অপর কিছু সহযোগীর সহায়তায় ২৮ বৎসরের সুদীর্ঘ প্রচেষ্টায় তিনি এর সংকলন এবং সম্পাদনা সম্পূর্ণ করেন। গ্রন্থটি সম্বন্ধে ভাষা-বিজ্ঞানী তারাপুরওয়ালা (I. J. S. Taraporewala) মন্তব্য করেছেন, "The main plan and execution of the task was distinctly Grierson's own. He has left his impress definitely on every volume. These volumes would remain standard works on Modern Indo-Aryan dialects for many years to come. The amount of valuable

সংস্করণ ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হলেও পরবর্তী প্রায় শতাব্দীকালের মধ্যে এ জাতীয় ভৌগোলিক জরিপ আর কখনো হয়নি। এর বিভিন্ন খণ্ডে সমগ্র উত্তর ভারতের নব্যভারতীয় আর্যভাষার আঞ্চলিক রূপ, তাদের উপভাষা ও বিভাষা, দক্ষিণ ভারতের প্রচলিত প্রধান দ্রাবিড় ভাষাসমূহ এবং বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে-পড়া আঞ্চলিক ভাষাসমূহ, 'নিষাদ' বা অস্ট্রিক (কোল-গোষ্ঠীর ভাষা) ভাষাসমূহ এবং উত্তর-পূর্ব ভারতীয় 'মোন্-খ্মের' ও 'তিব্বতী-বর্মী গোষ্ঠী'র অর্থাৎ 'কিরাত' ভাষাসমূহের বিস্তৃত বিবরণ, এমনকি ইরানীয় ভাষাসমূহ দরদীয় বা কাশ্মীরী সহ 'পৈশাচী' ভাষাসমূহ ও জিপ্সি তথা রোমানি ভাষার—এককথায় ভারতবর্ষের যাবতীয় ভাষা-উপভাষার নিদর্শন সহ এমন বিশ্লেষণ আজ পর্যন্ত আর কোথাও হয়নি। তাই বলা চলে, যে-কোনো ভারতীয় ভাষাচর্চার পক্ষে এই মহা-গ্রন্থটি অপরিহার্যরূপে বিবেচিত হবার যোগ্য। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য, এর পঞ্চম খণ্ডে পূর্বী-প্রাচ্য ভাষাগোষ্ঠীর, (১) বাঙলা ও অসমীয়া, (২) ওড়িয়া ও মৈথিলী আদি বিহারী ভাষা, উপভাষা ও বিভাষাসমূহের নিদর্শন-সহ বিস্তৃত বিবরণ রয়েছে।

(৮) আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় (১২৯৭ বঙ্গাব্দ—১৩৮৪ বঙ্গাব্দ)—সর্বতোমুখী প্রতিভার অধিকারী আচার্য সুনীতিকুমার ছাত্রজীবনে ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে সাম্মানিক স্নাতক স্তরে এবং স্নাতকোত্তর স্তরে অত্যুচ্চ কৃতিত্ব প্রদর্শন করলেও এবং বৈদিক সাহিত্যে সংস্কৃত চতুষ্পাঠীতে পাঠ গ্রহণ করলেও আসলে তিনি যে ছিলেন মাতৃভাষায় নিবেদিতপ্রাণ, তার প্রমাণ, ছাত্রজীবনে প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ বৃত্তির জন্য তাঁর রচিত গবেষণা নিবন্ধটিঃ *An Historical Comparative Grammar of the Bengali Language* (১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দ)। সম্ভবতঃ জীবনের এই প্রারম্ভিক গবেষণা কর্মটিই ছিল তাঁর জীবন পথের প্রধান দিঙ্-নির্ণায়ক। কারণ, পরবর্তী জীবনে তিনি বাঙলা ভাষা, সংস্কৃতি এবং প্রধানতঃ ভাষা-চর্চার ক্ষেত্রেই আত্মনিয়োগ করেছিলেন। অনুমান করা হয়, পৃথিবীর বিভিন্ন গোষ্ঠীর অন্যূন ত্রিশটি ভাষা ছিল তাঁর অধিগত।

সুনীতিকুমার ছিলেন প্রায় সর্বতোমুখী প্রতিভার অধিকারী। বিভিন্ন ভাষায় তিনি যে বিপুল পরিমাণ গ্রন্থ রচনা করেছেন, আলোচ্য ক্ষেত্রে কালানুক্রমিকভাবে তাদের মধ্য থেকে শুধু ভাষা-বিষয়ক গ্রন্থগুলির নাম দেওয়া হল। (১) বাঙলা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা (১৯২৯), (২) ভাষাপ্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ (১৯৩৯), (৩) ভারতের ভাষা ও ভাষা সমস্যা (১৯৪৪), (৪) বাঙ্গালা ভাষা-প্রসঙ্গে (১৯৭৫), (৫) *The*

Origin and Development of the Bengali Language (1926), (৬) *Bengali Self-Taught* (1927), (৭) *A Bengali Phonetic Reader* (1928), (৮) *Indo-Aryan and Hindi* (1942), (৯) *Bengali Phonetics* (1928), (১০) *Language and the Linguistic Problem* (1943), (১১) *Dravidian* (1965), (১২) *Phonetics in the Study of Classical Languages in the East* (1967), (১৩) *On the Development of Middle Indo-Aryan* (1983) প্রভৃতি।

উপর্যুক্ত গ্রন্থগুলির মধ্যে (১) ভাষাপ্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ, (২) O. D. B. L (*The Origin and Development of the Bengali Language*), (৩) *Bengali Self-Taught*, (৪) *Bengali Phonetics* এবং (৫) *A Bengali Phonetic Reader*—এই পাঁচটি গ্রন্থ বাঙলা ভাষাচর্চার ক্ষেত্রে অপরিহার্য বিবেচিত হবার যোগ্য। এদের মধ্যেও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ ১৯২৬ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত তাঁর O. D. B. L. বা *The Origin and Development of the Bengali Language*। যার মূল রূপটি প্রকৃতপক্ষে *Indo-Aryan Linguistics—The Origin and Development of the Bengali Language* নামে গবেষণাপত্ররূপে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে ডি. লিট্. ডিগ্রির জন্য স্বীকৃতি পেয়েছিল। ভারতীয় ভাষাচর্চার ক্ষেত্রে প্রাচীন এবং আধুনিক যুগে আরও অনেক বৈয়াকরণ, ভাষাবিজ্ঞানী যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন, কাজেই আচার্য্য সুনীতিকুমারকে কোনক্রমেই ভারতীয় ভাষাবিদ্যার জনক কিংবা পথপ্রদর্শকের মর্যাদায় অভিষিক্ত করা যায় না। কিন্তু নব্যভারতীয় আর্যভাষার এমন নিপুণ তুলনামূলক, ঐতিহাসিক এবং বর্ণনাত্মক দৃষ্টিভঙ্গিতে রচিত দ্বিতীয় কোন গ্রন্থ আজও পর্যন্ত রচিত হয়নি, এটি নিঃসন্দেহে উচ্চারণ করা চলে। বস্তুতঃ এটিকে অবলম্বন করে এবং এরই আদর্শে অপরাপর আঞ্চলিক ভাষারও বহু মূল্যবান গ্রন্থ রচিত হয়েছে। কিন্তু এই মহাগ্রন্থের যে সামগ্রিক মূল্যমান, এর কাছাকাছি অন্য কোনটিই আজও পেঁছিতে পারেনি।

বৃহদায়তন O. D. B. L. গ্রন্থটির সংক্ষিপ্ত সূচীপত্র বিশ্লেষণে এর বিষয়বস্তু, প্রকৃতি ও পরিমাণ অনুমান করা যেতে পারে। প্রথমেই 'ভূমিকা, গ্রন্থ সংকেত, সংকেত চিহ্ন, প্রতিবর্ণীকরণ, ধ্বনিতাত্ত্বিক-প্রতিবর্ণীকরণ' ইত্যাদি বিষয়ে ৩৪ পৃষ্ঠা, 'গ্রন্থকারের ভূমিকা' (Introduction)' ১ থেকে ১৪৯ পৃষ্ঠা, 'Introduction'-এর Appendix—A, B, C, D, E—১৫০ থেকে ২৩৫ পৃষ্ঠা, 'Phonology (ধ্বনিতত্ত্ব)'

২৩৭ থেকে ৬৪৮ পৃষ্ঠা, 'Morphology (রূপতত্ত্ব)' ৬৪৯ থেকে ১০৫২ পৃষ্ঠা, 'ঐ Appendix' ১০৫৩ থেকে ১০৫৬ পৃষ্ঠা, 'সংযোজন ও সংশোধন' ১০৫৭ থেকে ১০৭৮ পৃষ্ঠা, 'বাংলা শব্দসূচী' ১০৭৯ থেকে ১১৭৯ পৃষ্ঠা। মহাগ্রন্থটির প্রথম খণ্ড ৬৪৮ পৃষ্ঠায় এবং দ্বিতীয় খণ্ড ১১৭৯ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। এরপর ১৯৭২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সংশোধনী এবং সংযোজনী-রূপে এর একটি তৃতীয় খণ্ড প্রকাশ করেন। তার ১ থেকে ১১২ পৃষ্ঠা পর্যন্ত ঐ উদ্দেশ্যে নিয়োজিত হয় এবং ১১৩ থেকে ১২১ পর্যন্ত, তৃতীয় খণ্ডের একটি 'বাংলা শব্দসূচী' সংযোজন করা হয়।

প্রধানতঃ O. D. B. L.-এ এবং অন্যত্র ভাষাবিদ্যা বিষয়ে তিনি যে উল্লেখযোগ্য দান রেখে গেছেন তার প্রধান কয়েকটি নিম্নে উল্লেখ করা হচ্ছে। পূর্বসূরীগণ ভারতীয় আর্যভাষার বিবর্তনে সাধারণভাবে যে তিনটি স্তর নির্দেশ করেছিলেন, আচার্য সুনীতিকুমার তাকে আরও সূক্ষ্ম এবং নিপুণভাবে বিশ্লেষণ করে মধ্য-স্তরকেও চারটি উপস্তরে বিভক্ত করেছেন। হর্নলে, গ্রীয়ার্সন প্রমুখ ভাষাবিজ্ঞানিগণ নব্যভারতীয় আর্যভাষার ক্ষেত্রে যে 'অন্তরঙ্গ এবং বহিরঙ্গ শ্রেণীবিভাগ' (Inner and Outer Aryan Theory)-তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, সুনীতিকুমার তা খণ্ডন করেন। চর্যাপদের ভাষা যে মূলতঃ বাঙলা তিনি যুক্তির সাহায্যে এই অভিমত প্রতিষ্ঠিত করেন। সুনীতিকুমার 'বাঙলা ধ্বনিতত্ত্ব' বিষয়ে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার সহায়তায় যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন, ব্লুম-ফিলড্ আদি মনীষি-গণও তাঁর সেই কাজকে গবেষণার আদর্শ বলে স্বীকৃতি জানিয়েছেন। ভারতীয় আর্যভাষায় প্রাগ্-আর্য উপাদান আবিষ্কারে এবং বিশ্লেষণেও তিনি বিস্ময়কর প্রতিভার পরিচয় দিয়েছিলেন। প্রাচীন বাঙলার তাম্রশাসন এবং প্রত্নলেখে যে সমস্ত স্থান-নামের উল্লেখ পাওয়া যায়, সাধারণ দৃষ্টিতে তা অকিঞ্চিৎকর বিবেচিত হ'লেও সুনীতিকুমার তার বিশ্লেষণ থেকেই নব্যভারতীয় আর্যভাষার উদ্ভবকালের (আঃ দশম শতক) সমর্থন পেয়েছেন। মধ্যভারতীয় আর্যভাষায় যুক্তব্যঞ্জনের সমীভবন-প্রক্রিয়াটি বহুপরিচিত হ'লেও সমীভবনের কারণ দুটি আবিষ্কার করেন সুনীতি-কুমারই।

রবীন্দ্রনাথ থেকে আরম্ভ ক'রে আরো অনেকেই একটি খাঁটি বাঙলার পূর্ণাঙ্গ ব্যাকরণের অভাব অনুভব ক'রে আসছিলেন। আচার্য সুনীতিকুমারের মহাগ্রন্থ O. D. B. L এবং 'ভাষাপ্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ' যে সে অভাব পূরণ করেছে, যে কোন নিষ্ঠাবান পাঠকের নিকটই তা' ধরা পড়বে। পরবর্তী গ্রন্থখানি সম্বন্ধে তিনি 'ভূমিকা'য় অপর অনেক বক্তব্যের সঙ্গে একথাও বলেছেন, "প্রস্তুত পুস্তকে বাঙ্গালা

ভাষার ঐতিহাসিক আলোচনা নাই, কিন্তু ঐতিহাসিক বিচারের আধারেই বাঙ্গালা ভাষার ব্যাকরণগত বিশ্লেষণ ইহাতে করিবার চেষ্টা যথাশক্তি করিয়াছি।" 'বলাবাহুল্য গ্রন্থে টীকা-রূপে সন্নিবিষ্ট ক্ষুদ্রতর লিপিতে মুদ্রিত অংশও সযত্নে পঠনীয়। তাহ'লেই গ্রন্থের পরিপূর্ণ মূল্য বোঝা যাবে। একালে 'বর্ণনাত্মক ভাষাবিজ্ঞান' (Descriptive Linguistics) নামে ভাষাবিদ্যার যে শাখাটি বিশেষ সমাদর লাভ করেছে, তার প্রতি সুনীতিকুমার কখনো বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ না করলেও, পূর্বোক্ত গ্রন্থ দুটিতেই যে এই ধারার পূর্বগামিতা লক্ষ্য করা যায়, তা' কে অস্বীকার করবে? এ ছাড়া পাশ্চাত্ত্য ভাষাবিজ্ঞানে ব্যবহৃত 'Epenthesis' (অপিনিহিতি), 'Omlaut' (অভিশ্রুতি), 'Ablaut' (অপশ্রুতি), 'Vowel-harmony' (স্বর-সঙ্গতি) প্রভৃতির পারিভাষিক প্রতিশব্দ নির্মাণ ও তাদের ব্যবহারিক প্রয়োগ-বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা ক'রে তিনি বাঙলা ব্যাকরণ ও ভাষাবিদ্যার ক্ষেত্রকে অনেকখানি সমৃদ্ধ ক'রে তুলেছেন।

বাঙ্গালা ব্যাকরণে পূর্ণাঙ্গ আলোচনা থাকলেও 'বাক্যতত্ত্ব' (Syntax) ও 'শব্দার্থ তত্ত্ব' (Semantics)-বিষয়ক আলোচনার O. D. B. L গ্রন্থে না থাকায় তার পরিপূর্ণতায় যেন একটু ত্রুটি থেকে যায়। তবে প্রসঙ্গক্রমে 'রূপতত্ত্বে'র (Morphology) আলোচনাসূত্রে বাক্যতত্ত্ব-বিষয়েও কিছুটা আলোচনা পাওয়া যায়। সর্বশেষ একটি কথা—আচার্য্য সুনীতিকুমার যখন গবেষণাকর্মে নিযুক্ত ছিলেন, তখন ভাষাবিদ্যার ক্ষেত্রে 'কালানুক্রমিক ভাষাবিজ্ঞান' অর্থাৎ 'ঐতিহাসিক ও তুলনামূলক' (Diachronistic Method) রীতিই ছিল প্রচলিত। আচার্য্য সুনীতিকুমারও ঐ ধারারই সার্থক অনুগামী। আবার, যেহেতু যাস্ক এবং পাণিনির 'নিরুক্ত' ও 'অষ্টাধ্যায়ী' ছিল তাঁর আয়ত্ত ও উত্তরাধিকার-সূত্রে ওদের আলোচনা-রীতি ছিল সম্ভবতঃ তাঁর রক্তের মধ্যে নিহিত, তাই তাঁর মহাগ্রন্থে আধুনিক 'ঐককালিক রীতি' (Synchronistic Method অর্থাৎ Descriptive and Structural Linguistics) বা বর্ণনাত্মক ভাষারীতি—যার স্রষ্টা ও পথপ্রদর্শক মহামুনি পাণিনি—তাও সনিষ্ঠ-ভাবে অনুসৃত হ'য়েছে। ফলতঃ O. D. B. L. মহাগ্রন্থে ঐতিহাসিক, তুলনামূলক এবং বর্ণনাত্মক ভাষাবিজ্ঞানর ত্রিবেণীসঙ্গম ঘটেছে।

তবে সাম্প্রতিক কালের 'বর্ণনাত্মক ভাষাবিজ্ঞান' বিষয়ে আচার্য্য সুনীতিকুমার যে খুব অনুকূল মনোভাব পোষণ করেন নি, তা' তাঁর শেষ জীবনে রচিত O. D. B. L-এর তৃতীয় খণ্ডে প্রকাশ পেয়েছে। তিনি বলেছেন: "...The Old, however still continues to prove helpful; ...—so it can be said of the old *Diachronistic (or Historical and Comparative) Method* which is now

sought to be relegated to the limbs of oblivion by some of the more ardent advocates of the modernistic Synchronistic Method. Unfortunately there is no general agreement among the masters and protagonists of the new method, particularly in the matter of a set of sane and precise and universally accepted technical terms.... Each single master in the new line seems to be ploughing his solitary furroes....While the Synchronistic Method is progressing, there are steadily growing objections to its ideas, methods and findings, and to its 'inadequacies', and the need for rethinking is being pressed by competent 'Critics of the New'."

(৯) **ডঃ তারপোরওয়ালা** (Irach Jehangir Sorabji Taraporewala)—স্যার উইলিয়াম জোন্স কলকাতার সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি নিযুক্ত হয়ে আসবার পর সংস্কৃত ভাষা-শিক্ষাসূত্রে অনুধাবন করতে পেরেছিলেন যে, সংস্কৃত এবং লাতিন, গ্রীক প্রভৃতি ইউরোপীয় ভাষাসমূহের তুলনামূলক অধ্যয়নের সাহায্যেই ঐ ভাষা-সমূহের মূল উৎসের সন্ধান সম্ভবপর। 'বস্তুতঃ তুলনামূলক ভাষাবিদ্যা' (Comparative Philology)-র সূত্রপাত ঘটে এইভাবেই। এবং সমগ্র ভারতবর্ষেই এ বিষয়ে পথ প্রদর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। ভারতে এখানেই প্রথম স্নাতকোত্তর পর্যায়ে তুলনামূলক ভাষাবিদ্যা অধ্যয়নের ব্যবস্থা করা হয়। আর উক্ত বিষয়ে প্রথম বিভাগীয় অধ্যক্ষরূপে নিযুক্ত হয়েছিলেন প্রখ্যাত গুজরাতী মনীষী ডঃ জাহাঙ্গীর তারাপোরওয়ালা। তিনি বিভিন্ন ভারতীয় এবং ইউরোপীয় ভাষার সঙ্গে উত্তমরূপে পরিচিত ছিলেনই, অধিকন্তু তিনি পারসিক সম্প্রদায়ভুক্ত হওয়ার ফলে প্রাচীন ইরানি এবং আবেস্তার ভাষায়ও প্রাধীতী ছিলেন। এই অপূর্ব যোগাযোগের ফলে তাঁর পক্ষে বিশেষভাবে ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাসমূহের তুলনামূলক অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা অনেক সহজ ব্যাপার ছিল। বস্তুতঃ কলকাতায় ভাষাবিদ্যা চর্চার আলোচনার ক্ষেত্রে, আচার্য সুনীতিকুমারের পূর্বেই ডঃ তারাপোরওয়ালাই অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন।

ডঃ তারাপোরওয়ালা-রচিত যে ভাষাবিদ্যা-বিষয়ক গ্রন্থটি এতকাল ভারতীয় জিজ্ঞাসু পাঠক ও ছাত্রসমাজের এতদ্বিষয়ক প্রয়োজনসাধন করেছে, সেই গ্রন্থটি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়-কর্তৃক প্রকাশিত *Elements of the Science of Language* (1931)। ১৯৬২ খ্রীষ্টাব্দে ৬৫০ পৃষ্ঠার সমাপ্ত এই মহাকায় গ্রন্থে

সন্নিবিষ্ট বিষয়সূচি অনুসরণ করলেই বোঝা যাবে, 'ঐতিহাসিক ও তুলনামূলক ভাষাবিদ্যা'র ক্ষেত্রে (Historical & Comparative Philology) প্রায় যাবতীয় তথ্যই এর অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। নিম্নে এর সংক্ষিপ্ত বিষয়সূচী সন্নিবিষ্ট হ'ল—

Chapter I. Introduction. The psychology of speech : Branches of Linguistic Studies (Art : 1—16)

Chapter II. Language types and the classification of Languages (Art : 17—25)

Chapter III. Some considerations of syntactical growth (Art : 26—42)

Chapter IV. Growth of Languages (Art : 43—49)

Chapter V. The Intellectual Laws of Language : Analogy and kindred phenomena (Art : 50—62)

Chapter VI. Semantics or the Seience of Meaning (Art : 63—87)

Chapter VII. The Production and classification of Sounds (Art : 88—112)

Chapter VIII. Phonetic tendencies in Language and phonetic change (Art : 113—139)

Chapter IX. Form-Building and Word Building (Art : 140—152)

Chapter X. Linguistic Palaeontology (Art : 153—165)

Chapter XI. The Languages of India (Art : 166—201)

Chapter XII. The Indo-European Languages (Art : 202—225)

Chapter XIII. The Various Language Families of the World (Art : 226—263)

Chapter XIV. History of Linguistic Studies in India and in the West (Art : 264—298)

Appendix A. The Language Problem of India.

Appendix B. English as World Language.

General Index ইত্যাদি।

বস্তুতঃ এককভাবে এই একটিমাত্র গ্রন্থ থেকেই তৎকাল-প্রচলিত ভাষাবিদ্যা-বিষয়ক প্রায় যাবতীয় তথ্য আহরণ সম্ভবপর। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্যযোগ্য, পরবর্তী-

কালে গবেষকদের নিরন্তর প্রচেষ্টায় ভাষাবিদ্যার সমস্ত শাখাতেই নানা পরিবর্তন ও সংশোধন সাধিত হয়েছে।

(১০) **ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্** (১৮৮৫-১৯৬৯ খ্রীঃ)—ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ সাহেব সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যে সাম্মানিক স্নাতক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'য়েও সংস্কৃত বিভাগের কোন কোন অধ্যাপকের বিরূপতায় স্নাতকোত্তর পর্যায়ে ভর্তির সুযোগ থেকে বঞ্চিত হন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন উপাচার্য মহান্ আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের আগ্রহাতিশয্যে শহীদুল্লাহ্ সাহেব তখন 'তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব বিভাগে' ভর্তি হন এবং ১৯১২ খ্রীঃ তিনি উক্ত বিষয়ে স্নাতকোত্তর উপাধি লাভ করেন। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য, শহীদুল্লাহ্ সাহেবই তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব-বিভাগের প্রথম ছাত্র। অতঃপর ভাষাবিজ্ঞানে অধিকতর জ্ঞান লাভের প্রয়োজনে বৃত্তি লাভ ক'রে প্যারী (সরবোন) বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণাকর্মে নিযুক্ত হন এবং সহজিয়া বৌদ্ধসিদ্ধাচার্য কাহ্নপাদ ও সরহপাদের সাধনপদের (*Les Chants Mystique de Kanha etde Saraha*) উপর গবেষণা ক'রে ডি. লিট. উপাধি লাভ করেন। তিনি তথায় ধ্বনিবিজ্ঞানের ডিপ্লোমা লাভ করেছিলেন।

ডঃ শহীদুল্লাহ্ কর্মজীবনে স্বল্পকাল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করলেও তাঁর প্রায় সমগ্র কর্মকালই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অতিবাহিত হয়। তাঁর রচিত গ্রন্থ সংখ্যায় খুব বেশি নয়। কিন্তু বাঙলা ভাষাচর্চার এবং তা' প্রচারের ক্ষেত্রে তিনি যে আন্দোলন সারাজীবন ধরে পরিচালনা করেছেন এবং তা তাঁর ছাত্র ও অনুগামীদের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়েছেন, তা' বাঙলাদেশের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে শোভমান হ'য়ে থাকবে। বাঙলা ভাষাপ্রীতির এমন নিদর্শন বস্তুতঃই দুর্লভ।

ডঃ শহীদুল্লাহ্ সাহেব বাঙলা ভাষা-সম্পর্কিত যে সমস্ত গ্রন্থ ও প্রবন্ধ রচনা করেছেন, তাদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য *Outline of an Historical Grammar of the Bengali Language* (1920), 'ভাষা ও সাহিত্য' (১৯৩১), 'বাঙ্গালা ব্যাকরণ' (১৯৩৫), 'আমাদের সমস্যা' (১৯৪৯), 'বাঙ্গালা ভাষার ইতিবৃত্ত' (১৯৬৫), এবং তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত 'পূর্ব পাকিস্তানী আঞ্চলিক ভাষার অভিধান' (১৯৬৪)।

পূর্ববর্তী আলোচনা থেকে বাঙলা ভাষার সেবায় নিবেদিতপ্রাণ আচার্য শহীদুল্লাহ্ সাহেবের কৃতিত্বের কিছুটা পরিচয় পাওয়া গেলেও তার সম্যক্ পরিচয়ের

জন্য আর একটু বিশ্লেষণ প্রয়োজন। **১৯২০ খ্রীঃ প্রকাশিত তাঁর প্রথম** প্রবন্ধে বাঙলা ভাষার একটি ঐতিহাসিক ব্যাকরণ রচনা প্রচেষ্টার যে ইঙ্গিত পাওয়া যায়, তারই পূর্ণবিকশিত রূপটি ধরা পড়ে তাঁর ১৯৩৫ খ্রীঃ প্রকাশিত 'বাঙ্গলা ব্যাকরণ' গ্রন্থে। খাঁটি বাংলা ব্যাকরণ-রচনার সূত্রপাত করেছিলেন আচার্য যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি অবশ্য কিয়ৎকাল পূর্বেই। কিন্তু ওটিকে কোনক্রমেই পূর্ণাঙ্গ বলা চলে না। ডঃ শহীদুল্লাহ-র গ্রন্থেই সর্বপ্রথম সাধু ও চলিত—উভয়বিধ রীতির পরিচয় দেওয়া হ'য়েছে। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য, আচার্য সুনীতিকুমারের 'ভাষাপ্রকাশ' প্রকাশিত হয় আরও ৩/৪ বৎসর পর। 'কাহ্নপা ও সরহপা'-র সাধন পদগুলি বিষয়ে তিনি যে গবেষণা গ্রন্থটি রচনা করেছিলেন, তার সঙ্গে মূল অপভ্রংশ দোহা ও তাদের তিব্বতী অনুবাদও সংযোজিত হ'য়েছিল, এটি উল্লেখযোগ্য। এই গ্রন্থে এবং Dacca University Studies-এ প্রকাশিত *Buddhist Mystic Songs* নামক প্রবন্ধে, তিনি বৌদ্ধ ধর্মতত্ত্ব সম্বন্ধেও নানাবিধ তথ্য প্রকাশিত করেন। 'চর্যাপদ'-এর অন্যতম সিদ্ধাচার্য কাহ্নপাদ সম্বন্ধে তিনি বলেন যে উক্ত সিদ্ধাচার্য অবশ্যই খ্রীঃ অষ্টম শতকে বর্তমান ছিলেন ; সেই হিসেবে 'চর্যাপদে'র রচনাকাল তথা 'নব্য ভারতীয় আর্য-ভাষা'-রূপ প্রাচীন বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রারম্ভকাল খ্রীঃ অষ্টম শতক। ডঃ শহীদুল্লাহ 'বাঙলা ভাষার উদ্ভব' বিষয়ে যে মৌলিক অভিমত প্রকাশ করেছেন তা' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেন ঃ "...বৈয়াকরণদিগের বর্ণিত কোনও প্রাকৃতের সহিত এই মূল ভাষার ঐক্য পাওয়া যাইবে না। তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের সাহায্যে আমাদিগকে এই প্রাকৃতের লক্ষণ আবিষ্কার করিতে হইবে। সুবিধার অনুরোধে আমরা ইহাকে গৌড়ী প্রাকৃত বলিতে পারি।" (এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনার জন্য এই গ্রন্থের 'বাঙলা ভাষার উদ্ভব বিষয়ে নোতুন ভাবনা'—প্রবন্ধটি দ্রষ্টব্য।)

(১১) **ডঃ সুকুমার সেন** (১৯০১—১৯৩৫)—আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের ছাত্র এবং একালের অন্যতম বিশিষ্ট ভাষাবিজ্ঞানী আচার্য সুকুমার সেন স্নাতক স্তরে সাম্মানিক সংস্কৃতে এবং স্নাতকোত্তর স্তরে ঐতিহাসিক ও তুলনা-মূলক ভাষাবিদ্যায় উচ্চতম স্থান অধিকার ক'রে ছাত্রজীবনেই প্রতিভা ও কৃতিত্বের পরিচয় দান করেন। পরস্পর-সংশ্লিষ্ট এই দুটি বিষয়েই পারঙ্গমতা হেতু তাঁর মনীষা শুধুমাত্র বাঙলা ভাষার অনুশীলনেই নিবদ্ধ ছিল না, তিনি প্রাচীন ভারতীয় আর্য তথা সংস্কৃত এবং মধ্যভারতীয় আর্য তথা প্রাকৃত ভাষার অনুশীলন এবং গবেষণায়ও অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। বস্তুতঃ একালে যারা সাধারণ-ভাবে ভাষাতত্ত্ব নিয়ে অধ্যয়ন-অধ্যাপনা করেন, তাঁদের নিকট আচার্য সুনীতিকুমারের

O. D. B. L অপ্রাপ্য ও দুরধিগম্য বিবেচিত হওয়ায় প্রধানতঃ ডঃ সেনের 'ভাষার ইতিবৃত্ত'ই ছিল একমাত্র অবলম্বন।

প্রথমেই উল্লেখ করা প্রয়োজন, যে ডঃ সেন তদীয় আচার্য অধ্যাপক সুনীতি-কুমারের উত্তরাধিকার সর্বার্থেই বহন করে ঐতিহাসিক ও তুলনামূলক ভাষাবিদ্যার চর্চাতেই নিমগ্ন ছিলেন। গুরুর মতো তাঁর প্রতিভারও ছিল বহুমুখিতা। তাই ভাষাবিদ্যার বাইরেও তিনি সাহিত্য, ইতিহাস ইত্যাদি বিষয়েও প্রভূত পরিমাণ গবেষণামূলক কাজ করে গেছেন। ভাষাবিদ্যা বিষয়ক তাঁর প্রধান রচনাসমূহ ঃ

(১) প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তির জন্য রচিত গবেষণা নিবন্ধ 'Syntax of Old and Middle Indo-Aryan Language'।

(২) Ph. D. উপাধির জন্য তাঁর মৌলিক গবেষণাপত্র নিবন্ধ ঃ 'Historical Syntax of Middle and New Indo-Aryan' (1936)।

(৩) বাঙলা গদ্যশৈলীবিজ্ঞানের উপর রচিত 'বাংলা সাহিত্যে গদ্য' (১৯৩৪)।

(৪) বাঙলা ভাষায় রচিত প্রথম উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞান 'ভাষার ইতিবৃত্ত' (১৯৩৯)।

(৫) আদি আর্যভাষা অর্থাৎ ইন্দো-য়ুরোপীয় ভাষা থেকে ক্রম-বিবর্তন সূত্রে সংস্কৃত ভাষা পর্যন্ত সমগ্র আর্যভাষার ক্রমবিকাশ *History and Pre-History of Sanskrit* (1958) গ্রন্থে।

(৬) *A Comparative Grammar of Middle Indo Aryan* (1960) গ্রন্থে আলোচিত হ'য়েছে মধ্যভারতীয় আর্য তথা পালি-প্রাকৃতের বিস্তৃত আলোচনা।

(৭) এবং খাঁটি বাঙলা শব্দের ব্যুৎপত্তিমূলক অভিধান—*An Etymological Dictionary of Bengali*

এছাড়াও তাঁর-জীবনের প্রথম রচনা হিসেবে উল্লেখযোগ্য 'The Use of Cases in the Vedic Prose' (1929) এবং প্রত্নবিদ্যার অনুশীলন ক্ষেত্রে 'Old Persian Inscriptions' (1941)।

উপযুক্ত তালিকা থেকেই অনুমান করা চলে যে ইন্দো-ইরানীয় ভাষা তথা আর্য-ভাষা থেকে আরম্ভ করে প্রাচীন ভারতীয় ও মধ্যভারতীয় আর্যভাষার মধ্য দিয়ে নব্যভারতীয় আর্যভাষার বিভিন্ন স্তরে কী অসাধারণ নৈপুণ্যের সঙ্গে তাঁর গবেষণা কার্য পরিচালনা করেছেন। তাঁর 'ভাষার ইতিবৃত্ত' গ্রন্থটি একালের ভাষাবিদদের নিকট একটি দিগ্‌দর্শন যন্ত্রের তুল্য বিবেচিত হয়ে থাকে। এই গ্রন্থে তিনি ভাষাবিদ্যা

সম্পর্কিত সাধারণ আলোচনা, ধ্বনিতত্ত্ব, শব্দার্থতত্ত্ব, ইন্দো-য়ুরোপীয় আর্যভাষার সামগ্রিক বিবরণ, সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষার বৈশিষ্ট্যসমূহ এবং বাংলা শব্দবিদ্যা বিষয়ে ঐতিহাসিক এবং বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানের সম্যক্ পরিচয় দান করেছেন। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য যে অধ্যাপক সুনীতিকুমারের অনুগামী হওয়া-সত্ত্বেও তিনি অন্ধভাবে তাঁকে অনুসরণ করেন নি। বহুক্ষেত্রেই তিনি অনেক মৌলিকতারও পরিচয় দিয়েছেন। যেমন, অপভ্রংশ থেকে নব্যভারতীয় আর্যভাষাসমূহের সরাসরি উদ্ভব ঘটেছে বলে তিনি স্বীকার করেন না। তিনি মনে করেন এই দুই-এর অন্তর্বর্তীকালে 'প্রত্নানব্যভারতীয় আর্য' নামে অপর একটি স্তর ছিল, এই বিষয়ে তাঁর অভিমত ঃ "নব্য ভারতীয় আর্যের উদ্ভব-এর সময়ে ভাষাগুলির মধ্যে যে সাধারণ লক্ষণ ছিল সেইগুলির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া এই সময়ের ভাষাগুচ্ছকে একটি বিশিষ্ট ভাষার সন্তান বলিয়া গণ্য করিতে হয়, ভাষাতত্ত্বের দিক দিয়া আলোচনার সুবিধার জন্য। এই কাল্পনিক ধাত্রী ভাষাটিকে বলা হইল **প্রত্ন নব্যভারতীয় আর্য** (Proto-New Indo-Aryan)। অপভ্রষ্টের দ্বিতীয় বা শেষ স্তর হইল এই প্রত্নানব্য ভারতীয়। অপভ্রষ্ট হইতে প্রত্ন-নব্যভারতীয় আর্যের রূপ প্রায়ই সূক্ষ্ম বিচার নহিলে ধরা পড়ে না।"

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে ঐতিহাসিক ও তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের গবেষক হলেও এই মনীষী অধ্যাপক একালের বহুল প্রচলিত 'বর্ণনামূলক ভাষা-বিজ্ঞান' (Descriptive Linguistics) বিষয়েও সম্পূর্ণ অবহিত ছিলেন। এই বিষয়টি সম্বন্ধে তিনি বলেন, "বর্ণনামূলক ব্যাকরণের সঙ্গে **বর্ণনামূলক ভাষা-বিশ্লেষণের** (Descriptive Linguistic) পার্থক্য জানা আবশ্যক। বর্ণনামূলক ব্যাকরণ ও ঐতিহাসিক ব্যাকরণের সম্পর্ক সম্পূর্ণ এড়ানো হয় না কিন্তু বর্ণনামূলক ভাষাবিশ্লেষণে সে ভাষার অতীত ইতিহাস লইয়া কোনরূপ আলোচনা থাকে না, এখানে শুধু ব্যবহারিক দিক্ দিয়াই ভাষার গঠনরীতি বিশ্লেষণ করা হয়। যেমন, বাঙ্গালায় বর্ণনামূলক ব্যাকরণে 'করিল', 'করিব', 'করিতে'—এই সাধুভাষার পদগুলি যথাক্রমে [কর্ + ইল] [কর্ + ইব] [কর্ + ইত + এ] এইভাবে ধাতু-প্রত্যয়-বিভক্তি বিশ্লিষ্ট করিয়া দেখানো হয়। বর্ণনামূলক ভাষা-বিশ্লেষণের পদগুলি যথাক্রমে [করি + ল] [করি + ব] [করি + তে]—এইভাবে বিশ্লিষ্ট হয়।

'যে ভাষার কোন পুরানো নিদর্শন নাই এবং যে ভাষা কখনও লিপিবদ্ধ হয় নাই সে ভাষা শীঘ্র ও সহজে ব্যবহারে আনিবার জন্যই বর্ণনামূলক ভাষা-বিশ্লেষণের উপযোগিতা।"

আলোচ্য উক্তি থেকে সহজেই অনুমান করা চলে যে বাঙলাভাষার ক্ষেত্রে বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞান আলোচনার বিশেষ সার্থকতা নেই বলেই তিনি মনে করেন। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য যে পাণিনি থেকে আরম্ভ করে ডঃ সেনের 'ভাষার ইতিবৃত্ত' পর্যন্ত ভাষাবিদ্যা-বিষয়ক যাবতীয় গ্রন্থই বর্ণনামূলক ব্যাকরণের অন্তর্গত।

বহু বিষয়ে বহু গ্রন্থ-রচনা সত্ত্বেও আচার্য সেনের অপর একটি গ্রন্থের নাম উল্লেখ না করলে প্রত্যবায় ঘটবে। সেই মহাগ্রন্থটি হ'ল বহু খণ্ডে বিভক্ত বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস—তত্ত্বে ও তথ্যে পূর্ণ এই গ্রন্থটি সংশ্লিষ্ট বিষয়ের গবেষকদের নিকটও আকর গ্রন্থরূপে বিবেচিত হ'য়ে থাকে।

(১২) **পরবর্তী ধারা**: বর্তমানে বাঙলা ভাষাবিদ্যা বিষয়ে যাঁরা বিশেষ অধ্যয়ন ও অধ্যাপনায় নিরত, তাঁদের মধ্যে প্রবীণতর গোষ্ঠী প্রধানতঃ সুনীতিকুমার-শহীদুল্লাহ্-সুকুমার—এই আচার্য-ত্রয়ীর ধারায় ঐতিহাসিক ও তুলনামূলক ভাষাবিদ্যা বিষয়েই আগ্রহী। এঁদের অনেকেই ভাষাবিজ্ঞান-বিষয়ক অনেক গ্রন্থও রচনা করেছেন, পূর্বসূরীদের ধারা অনুসরণ ক'রেই। এঁদের মধ্যে অন্ততঃ একজন অপেক্ষাকৃত নবীন গবেষক অধ্যাপকের নাম অবশ্যই উল্লেখযোগ্য—এই নামটির অধিকারী অধ্যাপক ডঃ পরেশচন্দ্র মজুমদার। তাঁর রচিত 'সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষার ক্রমবিকাশ' (১৩৩৫ বঙ্গাব্দ) ও 'বাঙলা ভাষা পরিক্রমা' (১ম খণ্ড ১৯৩৫ ২য় খণ্ড ১৩৩৫ বঙ্গাব্দ) গ্রন্থদ্বয়ে আচার্য সুনীতিকুমারের O. D. B. L.-এর ধারায় ভারতীয় আর্যভাষায় তিন যুগের যে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণাত্মক পরিচয় দান করা হ'য়েছে এমন সুনিপুণ ও শ্রমসাধ্য কাজ বাঙলা ভাষায় আর দেখা যায়নি। এই প্রবীণতর গোষ্ঠীর মধ্যে অধুনা বন্দিত বর্ণনাত্মক ভাষাবিজ্ঞানকে (Descriptive Linguistics) যথার্থ অর্থে বাংলায় প্রথম প্রবর্তন করেন অধ্যাপক দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু, তাঁর 'বাংলা ভাষার আধুনিক তত্ত্ব ও ইতিকথা' (১ম খণ্ড—১৯৩৫) গ্রন্থে। তাঁর অকালপ্রয়াণহেতু গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ড আর প্রকাশিত হয়নি। একালের নবীনতর ভাষাবিজ্ঞানীদের প্রধান ধারাটির গবেষণা-ক্ষেত্র আমেরিকা এবং ফলতঃ বর্তমানে 'বর্ণনাত্মক ভাষাবিজ্ঞান' চর্চার একটা তরঙ্গ এদেশেও দেখা দিয়েছে এবং এখনকার গবেষকদের অনেকেই এই ধারারই অনুসরণ করছেন।

পূর্ববঙ্গ অর্থাৎ বর্তমান বাংলাদেশে ডঃ মহম্মদ শহীদুল্লাহ ভাষাবিদ্যাচর্চার প্রবর্তন করেছিলেন, তাঁর সাক্ষাৎ শিষ্য এবং অনুবর্তীদের মধ্যে অনেকেই স্বদেশে ও বিদেশে ভাষাবিদ্যা গবেষণায় যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছেন। বাংলাদেশে তাঁর ছাত্র,

মদীয় সতীর্থ (ছাত্রজীবনে ও কর্মজীবনে) ডঃ মুহম্মদ আব্দুল হাই ধ্বনিবিজ্ঞানের গবেষণায় প্রভূত কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। ডঃ হাই পরে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ভাষাবিজ্ঞানে এম· এ. ডিগ্রি লাভ করেন এবং পরে ওখানেই ধ্বনি-বিজ্ঞানে গবেষণাকর্মে নিযুক্ত হন। উক্ত গবেষণার ফলস্বরূপ আমরা তাঁর তিনখানি গ্রন্থ পেয়েছি। (১) *A Phonetic and Phonological Study of Nasals and Nasalization in Bengali* (1960), (২) *The Sound Structures of English and Bengali* এবং (৩) 'ধ্বনিবিজ্ঞান ও বাংলা ধ্বনিতত্ত্ব' (১৯৬৪)। বাঙলাদেশের সাম্প্রতিক কালের ভাষাবিজ্ঞানীরা প্রধানতঃ নব্যতন্ত্রেই অর্থাৎ বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞান চর্চাতেই আত্মনিয়োগ করেছেন এবং এ বিষয়ে গবেষণামূলক কাজও যথেষ্ট উল্লেখ-যোগ্য। এই ধারার দু'জন বিশিষ্ট ভাষাবিজ্ঞানী অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী ও ডঃ রফিকুল ইসলাম।

দ্বিতীয় খণ্ড

ভাষাতত্ত্ব (PHILOLOGY)

বাঙলা ভাষা পরিচয়

ত্রয়োদশ অধ্যায়

বাঙলা ভাষার উদ্ভব, ক্রমবিকাশ ও বৈশিষ্ট্য

'কত ভঙ্গ বঙ্গদেশ, তবু রঙ্গে ভরা'—এ শুধু কবির কল্পনা নয়, একান্ত বাস্তব সত্য। বঙ্গদেশের রূপরেখা যে কতবার কতভাবে পরিবর্তিত হয়েছে তার যথার্থ ইতিহাস উদ্ধার করাও আজ আর সম্ভব নয়। দেশের পরিসীমায় জাতি গড়ে ওঠে, কিন্তু যে সীমারেখা বারবার বিলীন হয়েছে, তার নিরিখে জাতির পরিচয় পাওয়াও অসম্ভব। একমাত্র ধ্রুবনক্ষত্ররূপে বিরাজমান বাঙলা ভাষা, অতএব বাঙলা ভাষার নিরিখেই বঙ্গদেশ ও বাঙালীর পরিচয় খুঁজে বার করতে হবে। বঙ্গদেশ ও বাঙালী জাতি বলতে আমরা বঙ্গভাষাসমৃদ্ধ অঞ্চল ও বঙ্গভাষাভাষী জনগোষ্ঠীকেই বুঝবো। এ প্রসঙ্গে আর একটা কথা পরিষ্কার করে নেওয়া দরকার। কিছুকাল পূর্বে বঙ্গদেশের পূর্বাংশ (অর্থাৎ পূর্ববঙ্গ) পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে 'বাঙলাদেশ' নাম গ্রহণ করলেও স্বাধীনতা-পূর্ব যুগে 'বাঙলাদেশ' বলতে সমগ্র বঙ্গদেশকেই বোঝাতো। আলোচ্য গ্রন্থে 'বাঙলাদেশ' বলতে 'বঙ্গদেশ'-ই বোঝাবে। সাম্প্রতিক কালের 'বাঙলা-দেশ' বোঝানোর জন্য 'পূর্ববঙ্গ' শব্দ ব্যবহার করা হবে। রাজনৈতিক দিক থেকে সাম্প্রতিক বাঙলাদেশ তথা পূর্ববঙ্গ এবং বর্তমান পশ্চিমবঙ্গ দুটি পৃথক রাষ্ট্রশক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হ'লেও সাংস্কৃতিক এবং বিশেষতঃ ভাষাতাত্ত্বিক দিক্ থেকে উভয় অঞ্চলই এক অভিন্ন সূত্রে গ্রথিত। ভাষা-আলোচনা-প্রসঙ্গে বর্তমান বাঙলাদেশ অর্থাৎ পূর্ববঙ্গকে আমাদের আলোচনা-সীমার বাইরে রাখা যাবে না। এই কারণে বাঙলাদেশ বলতে সমগ্র বঙ্গদেশ, বাঙালী জাতি বলতে বাঙলা ভাষা-সমৃদ্ধ অঞ্চলের অধিবাসী এবং বাঙলা ভাষা বলতে সারা বাঙলায়—পূর্ব-পশ্চিম-উত্তর-দক্ষিণ-নির্বিশেষে—ব্যবহৃত ভাষাকেই বোঝানো হ'বে।

বাঙলা ভাষার সঙ্গে বাঙলাদেশ ও বাঙালী জাতি অচ্ছেদ্য সম্পর্কসূত্রে জড়িত বলেই বাঙলা ভাষার উদ্ভব প্রসঙ্গে বাঙলাদেশ ও বাঙালী জাতিরও কিছুটা পরিচয় জানা আবশ্যক। এক সময় বাঙলাদেশ অনার্য-অধ্যুষিত থাকলেও কালক্রমে এখানেও আর্যজাতির আগমন ঘটে, আর্য সভ্যতা বিস্তৃত হয় এবং সেই সূত্রেই বাঙলা ভাষার উদ্ভব এবং পরিণতি। কাজেই যে জনজীবনের সঙ্গে ভাষার ইতিহাস অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে রয়েছে তার পরিচয় না জানলে ভাষার সামগ্রিক পরিচয় উদ্ধার করা যাবে না।

[এক] বাঙলাদেশে আর্যসভ্যতা বিস্তার

পাণ্ডব-বর্জিত বাঙলাদেশ দীর্ঘকাল অসভ্য প্রাগার্য জাতি দ্বারা অধ্যুষিত ছিল, আর্য সভ্যতার কেন্দ্রস্থল থেকে দূরতম স্থানে অবস্থানহেতু এই অনভিজাত অঞ্চলটি উত্তর ভারতের আর্য-সংস্কৃতিসমৃদ্ধ জনমানসে এইভাবেই প্রতিভাত হ'তো। বলা বাহুল্য, স্বদেশ ও স্বজাতির সমর্থনে কোন জোরালো প্রমাণ না থাকায় আমরাও এক প্রকার হীনমন্যতাবোধে আক্রান্ত ছিলাম। বস্তুতঃ বিজয়সিংহ-সম্বন্ধীয় একটি কাল্পনিক কাহিনী ছাড়া বাঙালীর ঐতিহ্যের পরিপোষক বলবার মতো কোন গল্পকথাও আমাদের জানা ছিল না। সম্প্রতি বঙ্গভূমির পশ্চিম ও দক্ষিণ অঞ্চলে কতকগুলো উৎখননে—পাণ্ডুরাজার ঢিবি, বানেশ্বর ডাঙা, চন্দ্রকেতুর গড়, মহিষাদল, নানুর, ভরতপুর, পোখরনা প্রভৃতি স্থলে যে সকল প্রত্নতাত্ত্বিক বস্তু আবিষ্কৃত হয়েছে, তা থেকে এ সত্য প্রমাণিত যে খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় সহস্রকের মধ্যভাগে প্রায় সারা বাঙলায় তাম্রাশ্মীয় সভ্যতা বর্তমান ছিল। এই সভ্যতা হরপ্পা-মোহেন্-জো-দড়ো-লোথালের সমকালীন এবং সমধর্মী হওয়াই সম্ভব। কেউ কেউ মনে করেন, সুদূর ক্রীট দ্বীপের সঙ্গেও এই অঞ্চলের যোগাযোগ ছিল। যারা হরপ্পা-মোহেন্-জো-দড়োতে সভ্যতা বিস্তার করেছিল, তারাই যে বাঙলাদেশের তৎকালীন সভ্যতার স্রষ্টা—এ সম্ভাবনার কথাও উড়িয়ে দেওয়া যায় না। একটা সাধারণ বিশ্বাস এই—বাঙলাদেশের আদি অধিবাসীরা ছিল অস্ট্রীক বা নিষাদগোষ্ঠীভুক্ত। পাণ্ডুরাজার ঢিবিতে যে সমস্ত নর-কঙ্কাল আবিষ্কৃত হয়েছে, তাদের নৃতাত্ত্বিক পরীক্ষায় প্রমাণিত হ'য়েছে যে এগুলো সম্ভবতঃ নিষাদ জাতির নয়, এতএব এগুলো দ্রাবিড় জাতির হওয়া বিচিত্র নয়। অধুনা প্রচলিত মত এই যে, বৈদিক আর্যদের পূর্বেও প্রাগ্‌বৈদিক আর্যদের একটি বা একাধিক শাখা (গোলমুণ্ড আল্পীয় আর্য) ভারতবর্ষে উপনীত হয়ে সিন্ধুতীরে বসতি স্থাপন ক'রে তথায় সভ্যতা সৃষ্টি করেছিল। পরবর্তীকালে বৈদিক উদীচ্য বা নর্ডিক আর্যদের দ্বারা বিতাড়িত হ'য়ে তারা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং তাদেরই একটি শাখা হয়তো কালক্রমে সুজলা সুফলা বঙ্গভূমিতে উপনীত হয়েছিল। বাংলার বুকে সাম্প্রতিককালে প্রাপ্ত এই নিদর্শনগুলি আল্পীয় আর্যদের হওয়াও সম্ভবপর।

বাঙলার এই প্রাচীন সভ্যতার একটা পরোক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায় প্রাচীন গ্রীক ঐতিহাসিকদের বিবরণীতে। তাঁরা যে প্রাচ্য (Prasioi) এবং গঙ্গারিডাই (Ganga-ridai) রাজ্যের কথা (প্রসঙ্গক্রমে স্মরণীয়, সত্যেন্দ্রনাথের কাব্য পংক্তি 'গঙ্গাহৃদি বঙ্গভূমি') উল্লেখ ক'রে গেছেন এবং এতকাল যার কোন সন্ধান পাওয়া যায়নি, হয়তো অধিকতর উৎখনন ও গবেষণায় এবার এদেরও সন্ধান পাওয়া যেতে পারে।

আর্যভূমির প্রত্যন্তসীমায় অবস্থিত বাঙলাদেশ-সম্বন্ধে প্রাচীন গ্রন্থগুলোতে যে সকল উক্তি করা হয়েছে, আর্যামির দিক্ থেকে সেগুলো নিন্দনীয় মনে হ'লেও বাঙালী জাতিহিশেবে আমাদের ক্ষুব্ধ হ'বার কোন কারণ নেই। কারণ, জাতিহিশেবে বাঙালীকে আর্য বলে অভিহিত করার পশ্চাতে কোন যুক্তি নেই। 'বঙ্গ' সম্বন্ধে প্রাচীনতম উল্লেখ ঐতরেয় আরণ্যক (আঃ খ্রীঃ পূঃ ৭০০-খ্রীঃ পূঃ ৫০০)—'বয়াংসি বঙ্গবগধাশ্চেরপাদাঃ'—এর এ রকম অর্থ করা হয়, 'বঙ্গ মগধ ও চেরপাদ রাজ্যের অধিবাসীরা পাখির মত অব্যক্তভাষী।' ঐতরেয় ব্রাহ্মণে (আঃ খ্রীঃ পূঃ ৮০০) পূর্ব-ভারতের দস্যুজাতিগুলোর মধ্যে পুণ্ড্রদের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য—বিভিন্নকালে বাঙলাদেশের বা তার অংশবিশেষের যে সকল নামের সন্ধান পাওয়া যায়, তাদের মধ্যে 'বঙ্গ' ছাড়াও আছে রাঢ়-সুহ্ম-বরেন্দ্র-বঙ্গাল-সমতট, আছে পুণ্ড্রবর্ধন, গৌড়, বজ্রভূমি প্রভৃতি। প্রাচীন জৈনগ্রন্থ 'আচারাঙ্গ সূত্রে' (আয়ারাঙ্গসুত্ত) রাঢ় অঞ্চলের অধিবাসীদের বিষয়ে কটূক্তি করা হয়েছে। মহাভারতে সমুদ্রতীরবাসী বাঙালীদের 'ম্লেচ্ছ' এবং ভাগবতে সুহ্মদের 'পাপ' জাতি বলে অভিহিত করা হয়েছে। বৌধায়নের 'ধর্মসূত্রে' বলা হয়েছে যে তীর্থযাত্রা ছাড়া বাঙলাদেশে এলে প্রায়শ্চিত্ত করতে হয় ('অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গেষু সৌরাষ্ট্রে মগধেষু চ। তীর্থযাত্রাং বিনা গচ্ছন্ পুনঃ সংস্কারমর্হতি ॥') 'আর্যমঞ্জুশ্রীকল্প' গ্রন্থে গৌড়, পুণ্ড্র, বঙ্গ, সমতট ও হরিকেল অঞ্চলে প্রচলিত ভাষাকে 'অসুর ভাষা' অভিহিত করা হয়েছে। মহাভারতের একটি উপাখ্যানে আছে—অসুররাজ বলির পত্নী সুদেষ্ণার গর্ভে এবং ঋষি দীর্ঘতমার ঔরসে যে পঞ্চপুত্র জন্মগ্রহণ করে তাদের একজন 'বঙ্গ'। অপরদের মধ্যে আছে পুণ্ড্র ও সুহ্ম। অতএব বাঙালীর অসুরত্ব এখানেও সমর্থিত।

প্রাচীন বৌদ্ধ ও জৈনগ্রন্থ, মহাস্থানগড়ের শিলালিপি (আঃ খ্রীঃ পূঃ তৃতীয় শতক) এবং চীনা পরিব্রাজক য়ুয়ান্‌চোয়াঙ-এর সাক্ষ্যের ভিত্তিতে প্রায় নিশ্চিতভাবেই বলা চলে যে খ্রীষ্টপূর্ব যুগেই মৌর্যাধিকার অন্ততঃ পুণ্ড্রবর্ধন বা উত্তরবঙ্গ পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করেছিল। কর্ণসুবর্ণ, সমতট, তাম্রলিপ্তি-আদি অঞ্চলে অশোকনির্মিত বৌদ্ধস্তূপ ও বিহার বর্তমান ছিল বলে য়ুয়ান্‌-চোয়াঙ্ উল্লেখ করেছেন। শুঙ্গ রাজাদের অধিকারও বাঙলাদেশে বিস্তৃতি লাভ করেছিল বলে অনুমান করা হয়। কুষাণ-আমলের কিছু প্রত্নবস্তু বাঙলায় আবিষ্কৃত হয়েছে। খ্রীষ্টোত্তর চতুর্থ শতকের গোড়া থেকে ষষ্ঠ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত বাঙলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল গুপ্ত সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এরপর বিচ্ছিন্নভাবে অঞ্চলবিশেষে বিভিন্ন নরপতি শাসকরূপে প্রতিষ্ঠা অর্জন করলেও খ্রীঃ সপ্তম শতকের গোড়াতেই গৌড়ভুজঙ্গ মহানায়ক নরেন্দ্র

শশাঙ্কগুপ্ত উত্তর ভারতে গৌড় দেশকে এক সমুন্নত উজ্জ্বল ভূমিকায় প্রতিষ্ঠিত করেন। বস্তুতঃ এরপর থেকেই বাঙলাদেশের প্রকৃত ইতিহাসের আরম্ভ—কালানুক্রমিকভাবেই এর বিবরণ এখন আর দুষ্প্রাপ্য নয়।

নৃতাত্ত্বিক দিক্ থেকে বাঙালী নিঃসন্দেহে মিশ্রজাতি—দ্রাবিড়, নিষাদ, মঙ্গোল বা কিরাত এবং আর্যরক্তের মিশ্রণ রয়েছে বাঙালীর দেহে ; কেউ কেউ অনুমান করেন, আর্যদের যে ধারা আল্পাইন নামে অভিহিত, যারা বৈদিক আর্যদের অর্থাৎ নর্ডিক গোষ্ঠীর পূর্বেই ভারতে এসেছিলেন, তাঁদেরই একটি শাখা বাঙলায় উপনিবিষ্ট হয় এবং আধুনিক বাঙালী জাতি মূলতঃ তাঁদেরই বংশধর। সংস্কৃতির দিক্ থেকে বাঙালী প্রধানতঃ আর্য সংস্কৃতির অংশভাগী হলেও এ সংস্কৃতি নিঃসন্দেহে মিশ্র সংস্কৃতি। ভাষার দিক্ থেকে বাঙলা ভাষা প্রাচীন ও মধ্যভারতীয় আর্যভাষার সাক্ষাৎ উত্তরসূরী, যদিও বিভিন্ন ভাষার প্রভাব অল্পবিস্তর বাঙলা এবং অপর সকল নব্য ভারতীয় আর্যভাষায় বর্তমান। অতএব বাঙলা ভাষার ইতিহাস আলোচনা প্রসঙ্গে আমাদের একান্তভাবেই ভারতীয় আর্যভাষার ধারাটি অনুসরণ করে যেতে হয়। তাই বাঙলা ভাষা-আলোচনার ক্ষেত্রে বাঙলাদেশে আর্যসভ্যতা বিস্তারের ইতিহাস-আলোচনা অবশ্যই প্রাসঙ্গিক।

[দুই] বাঙলা ভাষার উদ্ভব

'সংস্কৃত বাংলার জননী'—এরূপ একটি ভ্রান্ত সংস্কার দীর্ঘকাল জন-মানসে পোষিত হ'চ্ছে। কথাটা একটু সংশোধন ক'রে যদি বলা যায়, 'সংস্কৃত বাংলার পিতৃপুরুষ'—তবে অনেকাংশে এর সারবত্তা স্বীকার করা যায়। আসলে যে প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার একটি সাহিত্যিক মর্জিত রূপ এই সংস্কৃত, সেই মূল ভাষার কথ্যরূপটিই কালক্রমে বিবর্তিত হয়ে মধ্য ভারতীয় আর্যভাষার মধ্য দিয়ে বাংলা-নব্য ভারতীয় আর্য আদি ভাষায় রূপায়িত হয়েছে। নিম্নে বিস্তৃত বিবরণ প্রদত্ত হলো।

আনুমানিক খৃষ্টপূর্ব পঞ্চদশ শতকের মধ্যেই আর্য-ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীর তথা আর্যজাতির ভারতাগমন ঘটে। তারও পূর্বে হয়তো তাদের এক বা একাধিক ধারা ভারতে উপনিবিষ্ট হ'য়ে সভ্যতার সূচনা করেন। এমনও মনে করা হয় যে প্রাগ্-বৈদিক আর্যদের সর্বশেষ ধারার আগমন-কালই হয়তো খ্রীঃ পূঃ ১৭৫০ অব্দ অথবা তৎ-পূর্ববর্তী কাল। তবে আর্যেরা যে এককালে একটি মাত্র দল নিয়ে ভারতে আসেন নি, তা' নিশ্চিত। একাধিক কালে ও ধারায় হয়তো বিচ্ছিন্ন জনগোষ্ঠীর আর্য-

ভাষাভাষী দল ভারতে উপনীত হ'য়েছিলেন। তবে তাঁদের মধ্যে ভাষাগত ঐক্যবোধ ছিল। তাঁরা যে ভাষায় কথা বলতেন, তাকে একালের ভাষাবিজ্ঞানিগণ নাম দিয়েছেন **প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা**। এই ভাষাই কালবাহিত হয়ে রূপ থেকে রূপান্তরের মধ্য দিয়ে আধুনিক ভারতীয় আর্যভাষাসমূহে বিবর্তিত হ'য়েছে—এরই একটি শাখা আমাদের বাঙলাভাষা।

ভাষা নদীস্রোতের মতই চিরপ্রবহমাণা। তা থেকে শাখা নদী বেরিয়ে যেতে পারে, উপনদী তাকে স্ফীত করতে পারে, বাঁধ বেঁধে সে ধারার পার্শ্বে বিরাট হ্রদের সৃষ্টি করা যেতে পারে, কিন্তু নদীর মূলধারা একান্ত দৈবদুর্বিপাক ব্যতীত, অবিচ্ছিন্ন প্রবাহে বইতেই থাকে। স্থান-কাল-পাত্র-ভেদে তার মধ্যে রূপান্তরের অবকাশ বর্তমান। কাশীর গঙ্গা আর সাগর-সংগমের গঙ্গা একই ধারার দুই রূপ, শীতের গঙ্গোত্রী আর বর্ষার কলকাতা—একই গঙ্গার কূলে, অথচ কত তার রূপবৈচিত্র্য। ভারতীয় আর্যভাষার সাড়ে তিন হাজার বছরের ইতিহাসেও আমরা ভাষার এই লীলা-বৈচিত্র্য লক্ষ্য করে থাকি।

এই 'প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা'র স্থিতিকাল মোটামুটি সহস্র বৎসর; সাধারণ ভাবে এই ভাষা 'সংস্কৃত' নামেই প্রচলিত। কিন্তু এটি একটি ভ্রান্তিমূলক সংস্কার। পরে দেখবো, সংস্কৃত এই প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষার একটা বিশেষ রূপমাত্র। এর পরবর্তী দেড় সহস্র বৎসর ভাষা যে রূপান্তরের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলে, তাকে বলা হয় 'মধ্যভারতীয় আর্যভাষা'—সাধারণভাবে যাকে বলা হয় 'প্রাকৃত ভাষা'। কিন্তু এখানেও সংস্কৃতের মতোই অতিব্যাপ্তি দোষ ঘটে, কারণ, পরে দেখবো, 'প্রাকৃত' মধ্য আর্যভাষার বিভিন্ন স্তরের একটি রূপ মাত্র। এরপর সহস্র বর্ষকাল চলছে 'নব্য ভারতীয় আর্যভাষা'র যুগ—বাংলা, অসমীয়া, হিন্দী, মরাঠী, পঞ্জাবী প্রভৃতি এর অন্তর্ভুক্ত। হাজার বছর ধরে বিবর্তিত হ'তে হ'তে এই সমস্ত ভাষা আধুনিক রূপ লাভ করেছে। বাংলা ভাষার উদ্ভব ও বিকাশ-বিচারে ভাষাগত বৈশিষ্ট্যের প্রতিটি স্তর-বিষয়েই অবহিত হওয়া প্রয়োজন।

আর্যগণ ভারতে এসে প্রথমে সপ্তসিন্ধুর কূলে আশ্রিত হয়েছিলেন। সেখানে তাঁরা যে ভাষায় কথা বলতেন, তারই একটা মার্জিত প্রাচীন সাহিত্যিক রূপের নিদর্শন পাই বিভিন্ন 'বৈদিক সংহিতা'য়। তারপর ক্রমশঃ তাঁরা পূর্বদিকে গঙ্গা-যমুনার দুই কূল ধরে এগিয়ে চললেন। আনুমানিক খ্রীস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকের দিকে ভারতের মধ্যাঞ্চল তাদের অধিকারভুক্ত হয়। এই সময়কালের মধ্যে তাদের কথ্যভাষায় আরও পরিবর্তন দেখা দিয়েছিল। তৎকালীন ভাষার সংস্কার সাধন ক'রে তৈরি করা হলো

ধ্রুপদী বা লৌকিক আর একটি সাহিত্যের ভাষা—এর নাম 'সংস্কৃত'। একে সমকালীন কথ্যভাষার মার্জিত অর্বাচীন সাহিত্যিক রূপ বলে মেনে নিতে পারি। মূলতঃ মহামুনি পাণিনিই এর প্রধান সংস্কারক। এখানে আমরা প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার দু'টি সাহিত্যিক রূপের সন্ধান লাভ করি—একটি প্রাচীনতর বৈদিক সংস্কৃত, অপরটি এই অর্বাচীন ধ্রুপদী তথা লৌকিক সংস্কৃত। এর বাইরে ছিল ভাষার প্রধান ধারাটি, যেটি কথ্যভাষারূপে লোকের মুখে মুখে ফিরতো। আর্য আগমনের পর এই হাজার বছরের মধ্যে প্রাচীন ভারতীয় কথ্যভাষা অনেকটাই বিবর্তিত হয়, এই বিবর্তনের ফলে পরবর্তীকালে অর্থাৎ খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা যে রূপান্তর লাভ করে তাকে ভাষাবিজ্ঞানিগণ নাম দিয়েছেন **মধ্যভারতীয় আর্যভাষা,** এরই প্রচলিত নাম 'প্রাকৃত ভাষা'। সুদীর্ঘ দেড় সহস্রকালের বিবর্তন-পথে মধ্য ভারতীয় আর্যভাষাকে যে চারটি স্তর অতিক্রম করতে হ'য়েছিল, যথার্থ বিচারে তার চারশ' বছরের একটি স্তরই মাত্র 'প্রাকৃত'—তার পূর্ববর্তী ও পরবর্তী স্তরগুলির ভাষালক্ষণই পৃথক্। কাজেই 'মধ্য ভারতীয় আর্যভাষা'কে সামগ্রিকভাবে ভাষাবিজ্ঞানের নিরিখে 'প্রাকৃত' না বলাই বিধেয়।

মধ্যভারতীয় আর্যভাষার বিস্তৃতিকাল খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতক থেকে খ্রীষ্টোত্তর দশম শতক পর্যন্ত। দীর্ঘকাল বিস্তৃত এই ভাষাপ্রবাহকে ভাষাবিবর্তনের বিচারে তিনস্তরে বিভক্ত করা হয়। আদিস্তর খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতক থেকে খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতক পর্যন্ত, খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতক থেকে খ্রীষ্টোত্তর দ্বিতীয় শতক পর্যন্ত ক্রান্তিকাল, মধ্যস্তর খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতক থেকে ষষ্ঠ শতক পর্যন্ত এবং অন্ত্যস্তর খ্রীঃ ষষ্ঠ শতক থেকে দশম শতক পর্যন্ত বিস্তার লাভ করেছে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, বাস্তবে দেখা যায় মোটামুটি চারশ' বছরে ভাষা একবার ক'রে মোড় ঘুরেছে। প্রথম স্তরের পরই যে 'ক্রান্তিকাল' বা অন্তর্বর্তীকাল তথা যুগসন্ধিকাল রূপে চিহ্নিত হয়েছে, এক সময়ে সেটি 'বন্ধ্যাকাল' বলে মনে হলেও পরে এ যুগেরও কিছু রচনা-নিদর্শন পাওয়া গেছে।

মধ্য ভারতীয় আর্যভাষার তথা প্রাকৃতের প্রথম স্তরে (খ্রীঃ পূঃ ৬০০—খ্রীঃ পূঃ ২০০) আমরা বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষার সাক্ষাৎ লাভ করি। অশোকের শিলালিপিতে (খ্রীঃ পূঃ তৃতীয় ও দ্বিতীয় শতক) উদীচ্যা বা উত্তর দেশীয়া, দক্ষিণ-পশ্চিমা, মধ্যপ্রাচ্য ও প্রাচ্য—এই চার প্রকার ভাষার নিদর্শন পাওয়া যায়। উত্তর প্রদেশের যোগীমারা গুহায় 'সুতনুকা' (শুতনুকা) নামে যে অশোকের সমকালীন প্রত্নলিপিটি (অঃ খ্রীঃ পূঃ ২য় শতক) পাওয়া গেছে, তা প্রাচ্যার অনুরূপ নয়, তাই এর নাম

দেওয়া হয়েছে 'পূর্বীপ্রাচ্যা'। প্রায় সমকালেই বাঙলাদেশের বগুড়া জেলার মহাস্থানগড়ে যে ভগ্ন শিলালিপিটি (আঃ খ্রীঃ পূঃ ৩য় শতক) আবিষ্কৃত হ'য়েছে, তার ভাষা প্রাচ্যার অনুরূপ হ'লেও হুবহু এক নয়, কিছুটা বৈশিষ্ট্যযুক্ত। এই আদি-স্তরের ভাষাগুলো জনসাধারণের উদ্দেশ্যে রচিত হয়েছিল বলেই এদের সজ্ঞান সাহিত্য রচনা-প্রচেষ্টা মনে করা সঙ্গত নয়। অনুমান করা চলে, এগুলো ছিল তৎকাল-প্রচলিত কথ্যভাষা। এছাড়াও এই সময়-সীমার মধ্যে হীনযানপন্থী বৌদ্ধদের রচিত গ্রন্থ ব্যবহৃত হ'য়েছে 'পালিভাষা' এবং মহাযানপন্থী বৌদ্ধগণ গ্রন্থ রচনা করেছেন 'মিশ্র সংস্কৃত' ভাষায়—এদেরও এই স্তরের অন্তর্ভুক্ত বলে বিবেচনা করা হয়।

ক্রান্তি পর্বে (খ্রীঃ পূঃ ২০০—খ্রীঃ ২০০ অব্দ) রচিত কিছু সাহিত্যিক নিদর্শন মধ্য এশিয়ার খোটানে আবিষ্কৃত হ'য়েছে। সেখানে পাওয়া গেছে খরোষ্ঠী লিপিতে লিখিত 'খোটানী ধর্মপদ' (খ্রীঃ পূঃ ১০০—খ্রীঃ ১০০ অব্দ) এবং চীনা তুর্কীস্থানে পাওয়া গেছে খরোষ্ঠী লিপিতে লিখিত 'নিয়া প্রাকৃতে'র কিছু নিদর্শন। সম্ভবতঃ এই প্রাকৃতগুলিকেই বৈয়াকরণগণ 'গান্ধারী প্রাকৃত' নামে অভিহিত করেছেন।

মধ্যভারতীয় আর্যভাষার মধ্যস্তরে (খ্রীঃ ২০০—খ্রীঃ ৬০০) আমরা যে সকল ভাষার সাক্ষাৎ পাই, সেগুলোকে সাধারণভাবে 'সাহিত্যিক প্রাকৃত' নামে অভিহিত করা হয়। এদের মধ্যে আছে—মাহারাষ্ট্রী, শৌরসেনী, মাগধী, অর্ধ-মাগধী প্রভৃতি। নাম থেকেই অনুমান করা যায়, এগুলো ছিল আঞ্চলিক ভাষার সাহিত্যিক রূপ। এদের মধ্যে মাগধী প্রাকৃতকে পূর্বী প্রাচ্যার বংশধর বলে অভিহিত করা যায়, কারণ পূর্বীপ্রাচ্যার (সুতনুকা লিপির) বিশিষ্ট লক্ষণগুলো মাগধী প্রাকৃতে উপস্থিত, যথা—র>ল ; ষ, স>শ এবং পদান্ত অঃ>এ। অন্য সাহিত্যিক প্রাকৃতও আদিস্তরের স্থানীয় প্রাকৃত থেকে উদ্ভূত হয়েছে। মধ্যস্তরের এই প্রাকৃতগুলো যেহেতু সাহিত্যিক প্রাকৃত, তাই এগুলো কৃত্রিম ভাষা, এদের বিবর্তন সম্ভব নয়। কিন্তু সমকালে এদের যে কথ্যরূপ ছিল, সেগুলো থেকেই পরবর্তীকালে আবার নোতুন ভাষার সৃষ্টি হয়।

মধ্যভারতীয় আর্যভাষার অন্ত্যস্তরের (খ্রীঃ ৬০০—খ্রীঃ ১০০০) ভাষাকে সাধারণভাবে 'অপভ্রংশ' এবং অপভ্রংশের অর্বাচীন রূপকে 'অপভ্রষ্ট' বা 'অবহট্ঠ' নামে অভিহিত করা হয়। শৌরসেনী প্রাকৃতের কথ্যরূপ থেকে জাত ভাষার সাহিত্যিক রূপ-রূপে আমরা পাচ্ছি 'শৌরসেনী অপভ্রংশ' ও 'শৌরসেনী অবহট্ঠ'। 'শৌরসেনী অবহট্ঠ' একসময় সমগ্র উত্তর ভারতে শিষ্টজনসম্মত সাহিত্যের ভাষারূপে প্রচলিত

ছিল। শৌরসেনী-ব্যতীত অপর কোন অপভ্রংশ বা অবহট্‌ঠের নিদর্শন পাওয়া না গেলেও ভাষাবিজ্ঞানিগণ এর সমান্তরালভাবে মহারাষ্ট্রী অপভ্রংশ এবং মাগধী অপভ্রংশের কল্পনা করে থাকেন।

প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা মধ্যভারতীয় আর্যভাষায় বিবর্তিত হ'বার সময় প্রভৃত ধ্বনিতাত্ত্বিক বিপর্যয় ঘটেছিল। যেমন, শব্দের আদিতে যুক্ত ব্যঞ্জন প্রাকৃতে বিশ্লিষ্ট হ'য়েছে কিংবা একক ব্যঞ্জনে পরিণত হ'য়েছে, স্বরমধ্যস্থ অল্পপ্রাণ বর্ণ লোপ পেয়েছে ও মহাপ্রাণ বর্ণ 'হ'-য়ে পরিণত হ'য়েছে; স্বরমধ্যস্থ যুক্তব্যঞ্জন সমীভূত হ'য়েছে ও তৎপূর্ববর্তী দীর্ঘস্বর হ্রস্ব হ'য়েছে, প্রভৃতি। রূপতত্ত্বের দিক থেকে মধ্যভারতীয় আর্যভাষা অনেকটা সরল হ'য়েছে। যেমন, দ্বিবচন পরিত্যক্ত হ'য়েছে, বিভিন্ন শব্দরূপে ঐক্য সাধিত হ'য়েছে, ধাতুরূপে সংখ্যা কমেছে—প্রভৃতি।

মধ্য ভারতীয় আর্যভাষার তিন বা চার স্তরের মধ্য দিয়ে ভাষা যে-ভাবে বিবর্তিত হ'য়েছে, তাতে বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন লক্ষণ দেখা দিয়েছে। তবে প্রথম তিনটি স্তরে কালানুক্রমিকভাবে যে ধ্বনিগত পরিবর্তন সাধিত হ'য়েছে, তার পরিচয় পাওয়া যায় "যেমন—'লোক>লোগ>লোগ্‌>লোঅ'—এ থেকে সূত্রটি পাওয়া যাচ্ছে এই—স্বরমধ্যগত অল্পপ্রাণ অঘোষ স্পৃষ্ট ব্যঞ্জন আদি স্তরে বজায় রয়েছে, পরে সঘোষ ধ্বনিতে পরিবর্তিত হ'য়েছে এবং সর্বশেষ লোপ পাবার পূর্বে উষ্মধ্বনির প্রবণতা লাভ করেছিল। অপভ্রংশ স্তরে আর কোন পরিবর্তন হয়নি। তবে রূপ-তাত্ত্বিক ক্ষেত্রে এই স্তরে প্রচুর বৈচিত্র্য সৃষ্টি হ'য়েছে।

স্যার জর্জ গ্রীয়ার্সন ও আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এবং তাঁদের অনুসরণে অপর অনেকেই অনুমান করেন যে এই মাগধী অপভ্রংশ/অবহট্‌ঠের বিবর্তনেই পূর্বভারতীয় ভাষাগুলো তথা বাঙ্‌লা, অসমীয়া, উড়িয়া প্রভৃতি ভাষার উদ্ভব ঘটেছে। এ কথা স্বীকার করলেও বলতে হয় যে, অপভ্রংশ ও অবহট্‌ঠ ছিল সাহিত্যের ভাষা—তা থেকে নব ভাষার উদ্ভব সম্ভব নয়। বরং বলা চলে, মাগধী অপভ্রংশ/অবহট্‌ঠের প্রচলন কালে তার যে কথ্যরূপ প্রচলিত ছিল, তা থেকেই হয়তো বাঙলা-আদি ভাষার উদ্ভব ঘটেছিল আনুমানিক খ্রীঃ দশম শতকের দিকে। অনেকে এটিকে 'আঞ্চলিক কথ্য প্রাকৃত' বলে মনে করেন, সম্ভবতঃ প্রাকৃত বৈয়াকরণগণ যে 'লৌকিক' বা 'দেশী' ভাষার কথা বলেছেন, মাগধী অপভ্রংশ/অবহট্‌ঠ স্থলে এগুলিই জানপদ-ভাষারূপে প্রচলিত ছিল এবং অবশ্যই সৃজনী শক্তি ছিল এই ভাষারই, কোন সাহিত্যিক অবহট্‌ঠের নয়। অর্থাৎ বাঙলা-আদি নব্য ভারতীয় আর্যভাষাগুলি উদ্ভূত

হ'য়েছে এই আঞ্চলিক কথ্য প্রাকৃত তথা 'লৌকিক' বা 'দেশী' ভাষা থেকেই। কেউ কেউ অবহট্‌ঠেরও একটা দ্বিতীয় স্তরের কথা অনুমান করেন। এই দ্বিতীয় স্তরই তৎকালের কথ্যভাষাশ্রিত 'প্রত্ন নব্যভারতীয় আর্যভাষা', বাঙলাদেশের ক্ষেত্রে যাকে বলা চলে 'প্রত্ন বাঙলা' বা 'গৌড়ী ভাষা'। ডঃ সুকুমার সেন এ বিষয়ে বলেন, "নব্য ভারতীয় আর্যের উদ্ভবের সময়ে ভাষাগুলির মধ্যে যে সাধারণ লক্ষণ ছিল সেইগুলির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া এই সময়ের ভাষাগুচ্ছকে একটি বিশিষ্ট ভাষার সন্তান বলিয়া গণ্য করিতে হয়, ভাষাতত্ত্বের দিক দিয়া আলোচনার সুবিধার জন্য এই কাল্পনিক ধাত্রী ভাষাটিকে বলা হইল **প্রত্ন-ভারতীয় আর্য** (Proto-New Indo-Aryan)। অপভ্রংশের দ্বিতীয় বা শেষ স্তর এই প্রত্ন-নব্য ভারতীয়।"

[তিন] বাঙলা ভাষার উদ্ভব-বিষয়ে একটি নোতুন তাত্ত্বিক ভাবনা

প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার ক্রমিক বিবর্তনে মধ্যভারতীয় আর্যভাষার বিভিন্ন স্তরের ভিতর দিয়ে যে অসংখ্য ভাষাস্রোত নব্যভারতীয় আর্যভাষার বিভিন্ন ধারায় পরিণত হয়, তাদেরই একটির ক্রমবিবর্তিত রূপে যে বাঙলা, তাতে সংশয়ের কোন অবকাশ নেই। প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার যে পরিচয় আমরা পেয়েছি, তাতে জানতে পারি যে সেই ভাষা অঞ্চলভেদে ভিন্ন ভিন্ন রূপে পরিণতি লাভ করেছিল; পূর্বাঞ্চলে এরূপ যে কথ্যভাষা প্রচলিত ছিল, পাণিনি তাকে 'প্রাচ্য' বলে উল্লেখ করেছেন। সম্ভবতঃ এই প্রাচ্যারই এক অন্যতম উত্তরসূরী বাঙলা ভাষা।

মধ্যভারতীয় আর্যভাষার যুগে কালগতভাবে অন্ততঃ তিনটি স্তরকে স্বীকার ক'রে নিতে হয়। আদি স্তরের ভাষাগুলির মধ্যে বৌদ্ধদের শাস্ত্রীয় ভাষা 'পালি' এবং বিভিন্ন শিলালিপির ভাষা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অশোকের বিভিন্ন অনুশাসনের ভাষাদৃষ্টে ভাষাবিজ্ঞানিগণ সমকালে চারপ্রকার প্রাকৃতের অস্তিত্ব অনুমান করে থাকেন। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে 'উদীচ্য প্রাকৃত', দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে 'প্রতীচ্য প্রাকৃত', পূর্ব-মধ্যাঞ্চলে 'মধ্যপ্রাচ্য প্রাকৃত' এবং পূর্বাঞ্চলে (উড়িষ্যার ধৌলিতে প্রাপ্ত) 'প্রাচ্য প্রাকৃত'—এ ছাড়া মধ্যভারতের জোগীমারা গুহায় প্রাপ্ত 'শুতনুকা লিপি'র ভাষাকে 'পূর্বীপ্রাচ্য'-রূপে অভিহিত করা হয়। এই 'পূর্বীপ্রাচ্য'র বিশিষ্ট লক্ষণসমূহ প্রতিফলিত হ'য়েছে পরবর্তী স্তরের সাহিত্যিক প্রাকৃত 'মাগধী প্রাকৃতে'। কিন্তু এই শিলালিপিগুলির সমকালে রচিত বাঙলাদেশের বগুড়া জেলার মহাস্থান-গড়ে প্রাপ্ত শিলালিপির ভাষাকে কেন এই প্রসঙ্গে বিবেচনায় আনা হয় নি, তা' বোঝা যায় না। এতে কিন্তু পূর্বীপ্রাচ্যার সমুদয় লক্ষণ বর্তমান নেই। যাহোক—

প্রচলিত অভিমত এই যে, আদিস্তরের পূর্বপ্রাচ্যা থেকে মধ্যস্তরে মাগধী প্রাকৃত ও অন্ত্যস্তরে *মাগধী অপভ্রংশ-অবহট্‌ঠ থেকেই বাঙলা ভাষার উদ্ভব ঘটেছে। এখানেই একটি নোতুন ভাবনার অবকাশ রয়েছে।

বাঙলা যদি মাগধী ধারার ভাষাই হ'য়ে থাকে, তবে মাগধী প্রাকৃতের লক্ষণগুলো বাঙলায় উপস্থিত থাকবে—এটাই স্বাভাবিক। এ বিষয়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষাবিজ্ঞান বিভাগের প্রাক্তন প্রধান অধ্যাপক দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু বলেন, "এর (মাগধী প্রাকৃতের) তিন প্রধান ধ্বনি-বৈশিষ্ট্য /র>ল/, /স, ষ>শ/এবং/-অঃ>এ/। বাঙলা ভাষায় কিন্তু এই তিনটির একটিও নেই বলা যায়।" বাংলায় 'শ' ধ্বনি নেই বলা যায় না, বরং বেশিই আছে, অবশ্য কোন কোন অঞ্চলে শুধু 'স'। কর্তায় 'এ' বিভক্তি বাঙলার একটি বিশিষ্ট লক্ষণ—তবে এটি শুধু সকর্মক ক্রিয়ার কর্তার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য ; অর্থাৎ সকর্মক ক্রিয়া থাকায় বাক্যটি কর্মবাচ্যে রূপান্তরিত হয়, কর্মবাচ্যে কর্তৃকারকে তৃতীয়া বিভক্তির চিহ্ন '-এন>-এ*>-এ'—এইভাবেই বাঙলায় কর্তায় '-এ' বিভক্তি এসেছে। 'ছাগলেন ঘাসঃ খাদিতঃ>ছাগলে* ঘাস খাইঅ>ছাগলে ঘাস খায়।' চর্যাপদে ও শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে কর্তায় 'এ' বিভক্তিই পাওয়া যায়। কিন্তু এদের কোনটিই 'ঃ>এ' নয়। অতএব মাগধী প্রাকৃতের সঙ্গে এর সম্পর্ক না থাকাই সম্ভব। 'র'-স্থলে 'ল'-এর ব্যবহারও তেমন উল্লেখযোগ্য নয়।

অতএব এখন প্রশ্ন দাঁড়াবে—তাহলে বাঙলা ভাষায় প্রসূতি কোন্ ভাষা। গুপ্ত সাম্রাজ্যের অন্তিম যুগে একসময় বাঙলাদেশ সমগ্র উত্তর ভারতে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিল, তখন তার নাম ছিল 'গৌড়দেশ'। গৌড়ভুজঙ্গ মহানায়ক নরেন্দ্রগুপ্ত শশাঙ্কদেব বাঙালীকে মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। সাহিত্যে 'গৌড়ী' রীতির কথা বিশেষভাবে বলা হয়ে থাকে। দণ্ডী 'কাব্যাদর্শ' গ্রন্থে 'গৌড়ীপ্রাকৃত'-এর কথা উল্লেখ করেছেন ('শৌরসেনী চ গৌড়ী চ লাটী চান্যাচ তাদৃশী')। ডঃ সুকুমার সেন যে 'প্রত্ন-নব্য ভারতীয় আর্যভাষা'র কথা উল্লেখ করেছেন, তার মধ্যে একটির নাম দিয়েছেন 'প্রত্নবাঙলা', কিন্তু মূল প্রত্নলিপিটিতে 'গৌড়ী' বলে এর নির্দেশ রয়েছে। এই প্রাপ্ত সূত্র অবলম্বন করে মাগধী প্রাকৃতের সমকালীন এবং সমান্তরাল 'গৌড়ী' প্রাকৃতের অস্তিত্ব কল্পনা করে নেওয়া চলে। দীর্ঘকাল পূর্বেই ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ গৌড়ীপ্রাকৃত থেকে বাঙলা ভাষার উদ্ভবের কথা অনুমান করেছিলেন। তিনি নানাপ্রকার যুক্তিতর্ক অবতারণার পর বলেন : "প্রশ্ন হইবে কোন্ প্রাকৃত হইতে বাঙলা ভাষার উৎপত্তি। এ স্থলে বলিয়া রাখা কর্তব্য যে বৈয়াকরণদিগের বর্ণিত কোনও প্রাকৃতের সহিত এই মূল ভাষার ঐক্য পাওয়া যাইবে না। তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের সাহায্যে

আমাদিগকে এই প্রাকৃতের লক্ষণ আবিষ্কার করিতে হইবে। সুবিধার অনুরোধে আমরা ইহাকে গৌড়ী প্রাকৃত বলিতে পারি।" কিন্তু এই অনুমানের পশ্চাতে গুণিজনের সমর্থন না থাকায় অভিমতটি গুরুত্বহীন হ'য়ে পড়ে। *মাগধী অপভ্রংশ/অবহট্‌ঠকেও কল্পনা করে নিতে হচ্ছে, কারণ বাস্তবে তার সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না। অনুরূপভাবে সমকালে গৌড়ভূমিতে যদি *গৌড়ী অপভ্রংশ/অবহট্‌ঠের কল্পনা করে নেওয়া যায়, তাহলে দোষ কোথায়? বিশেষতঃ ঐ সময় গৌড়ভুজঙ্গ শশাঙ্কদেবের প্রতাপ সমগ্র মধ্যভারতকে অতিক্রম ক'রে যখন কাশ্মীর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল, তখন গৌড়ী প্রাকৃত অনুরূপ মর্যাদা লাভ করতেই পারে। সংস্কৃত সাহিত্যেও 'গৌড়ীরীতি' নামে একটা বিশেষ রীতি যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল।

এখানে আরও একটি সমস্যা রয়েছে। বাস্তবে যে অপভ্রংশ অবহট্‌ঠের সন্ধান পাওয়া যায় এবং বৈয়াকরণগণও যে অপভ্রংশের কথা বলেন, তা তো সাহিত্যের ভাষা—এ থেকে তো নোতুন ভাষা বিবর্তিত হবার সম্ভাবনা থাকে না। বরং এই পর্বে যে 'লৌকিক' বা 'দেশী' নামে জানপদ ভাষার কথা কোন কোন বৈয়াকরণ উল্লেখ করেছেন, সেই 'কথ্য প্রাকৃত' (আমাদের ক্ষেত্রে 'কথ্য গৌড়ী প্রাকৃত'কেই) গৌড়ী অপভ্রংশ/অবহট্‌ঠের স্থলভুক্ত ক'রে নেওয়াই সঙ্গত। এর পূর্ববর্তী স্তরে 'গৌড়ী প্রাকৃত'-এর উল্লেখ এবং পরবর্তী প্রত্ন নব্যভারতীয় আর্যস্তরে যখন 'গৌড়' ভাষার নিদর্শনও পাওয়া গেছে, তখন বাঙলা ভাষাকে গৌড়ীপ্রাকৃত > * গৌড়ী অপভ্রংশ/অবহট্‌ঠ > (কথ্য গৌড়ী প্রাকৃত) গৌড়ী ভাষা (প্রত্ন বাঙলা) > বাঙলা—এইভাবে সূত্রাকারে স্থাপিত করাটাই স্বাভাবিক মনে হয়।

এই প্রসঙ্গে আর একটি প্রশ্ন বিচার্য। মধ্য ভারতীয় আর্যভাষার আদি স্তরে যে মহাস্থানগড়ে প্রাপ্ত প্রাকৃতের নিদর্শন পাওয়া যায়—যার সঙ্গে মাগধী প্রাকৃতের সর্বাংশে মিল নেই (যেমন মাগধীতে সব 'শ', কিন্তু বাঙলার মহাস্থানগড় লিপিতে 'স' রয়েছে)—তা থেকেই গৌড়ী প্রাকৃতের উদ্ভব বলে একটা সম্ভাবনাকে স্বীকার করে নেওয়া চলতে পারে। এই মহাস্থানগড় লিপির রচনাকাল মৌর্যযুগে, আনুঃ খ্রীঃ পূঃ তৃতীয় শতক, অতএব এটি মধ্যভারতীয় আর্যভাষার আদি স্তরের ভাষা। এই ভাষার উদ্ভবকালেরও পূর্বে গৌড়ের অস্তিত্ব ছিল—কারণ মহামুনি পাণিনির রচনায় গৌড়ের উল্লেখ পাওয়া যায়। অতএব আদি স্তরের পূর্বাঞ্চলের মহাস্থানগড় শিলালিপির ভাষাকে যদি 'আদি গৌড়ী প্রাকৃত' বলে উল্লেখ করা যায়, তবে জটিলতা সৃষ্টির কোন সম্ভাবনা নেই। এই 'আদি গৌড়ী প্রাকৃত' থেকে মধ্যস্তরে 'গৌড়ী প্রাকৃত' এবং অন্ত্যস্তরে 'কথ্য গৌড়ী প্রাকৃত'-এর কল্পনা খুব অসঙ্গত বিবেচিত হ'বার কথা নয়। অতএব সামগ্রিকভাবে বাঙলা ভাষার উদ্ভব সূত্রটি নিম্নোক্তরূপ হ'তে পারে।

প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার যুগে আঞ্চলিক কথ্য সংস্কৃত (১) 'প্রাচ্যা'>মধ্য-ভারতীয় আর্যভাষার আদি স্তরে (২) 'আদি গৌড়ী প্রাকৃত'>মধ্যস্তরের (৩) 'গৌড়ী প্রাকৃত'>ও অন্ত্যস্তরের, (৪) 'কথ্য গৌড়ী প্রাকৃত'>নব্যভারতীয় আর্যভাষার আদি পর্বে (৫) 'প্রাচীন বাঙলা'>(৬) 'মধ্যযুগের বাঙলা'>(৭) আধুনিক যুগের 'সাধু বাঙলা'>(৮) শিষ্ট কথ্য বাঙলা। এ সবই সম্ভাবনার কথা, মীমাংসিত সমাধান নয়।

[চার] বাঙলা ভাষার ক্রমবিকাশ

আনুমানিক খ্রীঃ দশম শতকে (কোন কোন ভাষাবিজ্ঞানীর মতে তৎপূর্বেই) বাঙলা ভাষার জন্ম হয়। তারপর প্রায় হাজার বছর কেটে গেছে। এই দীর্ঘ পথ-পরিক্রমায় বাঙলা ভাষা রূপ থেকে রূপান্তরে উপনীত হয়েছে, ভাষাদেহে বারবার বিভিন্ন লক্ষণ পরিস্ফুট হয়েছে—তাই বাঙলা ভাষার ইতিহাসকে লক্ষণানুযায়ী তিনটি স্তরে বিভক্ত করা হয়েছে। বাঙলা ভাষার আদি স্তর (৯৫০—১২০০ খ্রীঃ), ক্রান্তিকাল (১২০০—১৩৫০ খ্রীঃ), মধ্যস্তর (১৩৫০—১৮০০ খ্রীঃ) ও অন্ত্যস্তর (১৮০০ খ্রীঃ থেকে)।

বাঙলা ভাষার আদিস্তরের (খ্রীঃ ৯৫০—খ্রীঃ ১২০০) নিদর্শন পাওয়া যায় প্রধানতঃ চর্যাপদে, অন্যত্র কিছু কিছু বাঙলা শব্দ মাত্র পাওয়া যায়, ভাষা-বিচারে যাদের খুব মূল্যবান বিবেচনা করা যায় না। আদিস্তরের বাঙলায় পদমধ্যস্থ যুগ্ম ব্যঞ্জন একক ব্যঞ্জনে পরিণত হ'য়েছে ও তৎপূর্ববর্তী হ্রস্বস্বর দীর্ঘ হ'য়েছে। স্বরমধ্যবর্তী ব্যঞ্জনলোপের ফলে উদ্বৃত্তস্বরের একস্বরে পরিণতি ঘটেছে এবং শ্রুতিধ্বনির আগম ঘটেছে। শ্বাসাঘাতরীতি তখনো সুপ্রতিষ্ঠিত হয়নি। সাধারণতঃ বহুত্ববাচক শব্দযোগে বহুবচন পদ গঠিত হ'তো—তাই শব্দরূপে একবচন-বহুবচনের পার্থক্য নেই, কিন্তু ক্রিয়ারূপে সেই পার্থক্য বজায় ছিল। কর্মকারকে '-ক', '-রে', করণ কারকে '-এন>এঁ', সম্বন্ধে '-র, -অর, -এর', অধিকরণ কারকে '-এ, -ই, -হি, -ত' ও অপাদান কারকে করণ-অধিকরণের বিভক্তি যুক্ত হ'তো। কারকার্থে বিভক্তি-স্থলে কিছু কিছু অনুসর্গের ব্যবহার প্রচলিত ছিল। সর্বনাম পদের একবচনে 'হঁউ, হাউ, মই, তই' ব্যবহৃত হতো। উত্তম পুরুষের ক্রিয়াপদে সর্বনামজাত -'হুঁ' ও মধ্যম পুরুষের -'তু' বিভক্তির ব্যবহার ছিল। নিষ্ঠা ও শতৃ প্রত্যয়ের সঙ্গে '-এ' যুক্ত হয়ে কিছু কিছু অসমাপিকা পদের সৃষ্টি হ'য়েছিল। এই সময় অল্প কয়েকটি বাঙলা বিশিষ্টার্থক পদগুচ্ছের ব্যবহারও লক্ষ্য করা যায়। শব্দভাণ্ডারে কিছু কিছু তৎসম থাকলেও তদ্ভব শব্দেরই প্রাধান্য, সামান্য পরিমাণ দেশি শব্দও ছিল।

আদিস্তরে ছন্দ ছিল মাত্রাবৃত্ত। তৎকালে অবহট্‌ঠ ভাষাও প্রচলিত ছিল বলে সেকালের বাঙ্‌লায় অবহট্‌ঠেরও কিছু কিছু প্রভাব পড়েছে। ক্রান্তিপর্বে (খ্রীঃ ১২০০—খ্রীঃ ১৩৫০) রচিত কোন সাহিত্যের নিদর্শন পাওয়া যায় না।

বাঙলা ভাষার মধ্যস্তরের (খ্রীঃ ১৩৫০—১৮০০) আদিপর্বে অর্থাৎ আদিমধ্যযুগে (খ্রীঃ ১৩৫০—১৫০০) 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'ই একমাত্র গ্রন্থ যার ভাষা প্রায় অবিকৃত। অন্ত্যমধ্যযুগে (খ্রীঃ ১৫০০—১৮০০) অসংখ্য গ্রন্থে সমসাময়িক ভাষারূপের অবিকৃত নিদর্শন পাওয়া যায়। আদিমধ্যযুগে আদিস্বরে প্রস্বর বা শ্বাসাঘাত প্রায় প্রতিষ্ঠিত, অন্ত্যমধ্যস্তরে পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত, ফলতঃ মধ্যস্বর ও অন্ত্যস্বরের লোপপ্রবণতার ক্রমিক বৃদ্ধি লক্ষ্য করা যায়। আদিমধ্যস্তরে 'আ'-কারের পরস্থিত '-ই', '-উ' ধ্বনির ক্ষীণতা ছিল, অন্ত্যমধ্যস্তরে এগুলো যুগ্মস্বরে পরিণত হ'য়েছে। অন্ত্যমধ্যস্তরে অপিনিহিতির সূত্রপাত এবং শেষদিকে তার অভিশ্রুতিতে পরিণতি লক্ষ্য করা যায়। নাসিক্যযুক্ত মহাপ্রাণ ধ্বনির লোপ-প্রবণতা আদিমধ্যস্তরেই দেখা দিয়েছিল, অন্ত্য-মধ্যস্তরের তা পূর্ণতা লাভ করে। অন্ত্যমধ্যস্তরে বহুত্ববোধক '-রা', '-গুলি, -গুলা' -'দিগ' বিভক্তির প্রচলন দেখা যায়। আদিমমধ্যস্তরে বিশেষণে ও অতীতকালের ক্রিয়ার স্ত্রীলিঙ্গের ব্যবহার ছিল, অন্ত্যমধ্যস্তরে তা পরিত্যক্ত হয়। আদিমধ্য বাঙ্‌লাতে অপাদানে 'হতে' এবং আরও নোতুন নোতুন অনুসর্গের ব্যবহার শুরু হয়। আদিস্তরে কর্তৃবাচ্য ও কর্মবাচ্যের মধ্যে পার্থক্য ছিল, আদিমধ্যস্তরেই সেই পার্থক্য উঠে গেল। অন্ত্যমধ্য বাঙ্‌লায় '-ইল, '-ইব' -অন্ত ক্রিয়াপদের ব্যবহার কর্তৃবাচ্যেই সীমিত রইল। '-আছ্' ধাতুর যোগে যৌগিক ক্রিয়াকালের পদের গঠন আদিমধ্যযুগেই আরম্ভ হয়। অন্ত্যমধ্যযুগে যৌগিক কাল ও যৌগিক ক্রিয়ার বহুল ব্যবহার লক্ষিত হয়। আদিমধ্যযুগে স্বল্প কয়েকটি বিদেশি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে ও তৎসম শব্দের ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছে, অন্ত্যমধ্যযুগে এ দুয়েরই ব্যবহার লক্ষণীয়ভাবে বেড়ে গেছে। উভয় পর্বেই ছন্দ অক্ষরমূলকে স্থিতি লাভ করেছে।

অন্ত্যস্তরের (খ্রীঃ ১৮০০—) অর্থাৎ আধুনিক যুগের বাঙলা ভাষার প্রধান বৈশিষ্ট্য—গদ্যরীতির প্রচলন। ফলে দীর্ঘকালের ধারা থেকে বাঙলা সরে এলো, বাগ্‌ভঙ্গিতেও পরিবর্তন দেখা দিল। পদ্যে পদস্থাপনার নির্দিষ্ট নিয়ম না থাকলেও গদ্যে পদের অবস্থান বিষয়ে কঠোরতা দেখা দিল। অন্ত্যমধ্যস্তরে লেখ্য ভাষার সঙ্গে কথ্যভাষার মিশ্রণ ছিল অবারিত, অন্ত্যস্তরে লেখ্যভাষারূপে যে সাধুভাষার প্রতিষ্ঠা হ'লো তাতে এ প্রকার মিশ্রণ হ'লো একান্তভাবে নিষিদ্ধ। সাধুভাষার পাশাপাশি কথ্যভাষাকে আশ্রয় ক'রে 'চলিত ভাষা' নামে এক শিষ্টজনসম্মত

সাহিত্যিক ভাষাও গড়ে উঠেছে। সাধুভাষা ও চলিত ভাষা—উভয়ক্ষেত্রেই অপিনিহিতির পরিবর্তে অভিশ্রুতি এবং স্বরসঙ্গতি অতিশয় প্রবলভাবে বিদ্যমান, তবে সাধুভাষায় অপিনিহিতি-পূর্ববর্তী স্তরের রূপেই প্রধান। বাঙলা ভাষার অন্ত্যমধ্যস্তরে প্রচুর আরবী-ফার্সী শব্দ ভাষায় অনুপ্রবিষ্ট হয়েছিল। অন্ত্যস্তরে এদের ব্যবহার কিছুটা সীমিত হ'লেও পর্তুগীজ এবং ইংরেজি শব্দের ব্যবহার অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। তৎসম এবং অর্বাচীন তৎসম বা নবসৃষ্ট তৎসম শব্দের ব্যবহারও ব্যাপকতা লাভ করেছে। প্রচুর অসমাপিকা শব্দের ব্যবহার দ্বারা বাক্য সঙ্কোচন-প্রচেষ্টা এবং একাধিক বাক্যকে এক বাক্যে পরিণত করার প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে। সাহিত্যের কোন কোন ক্ষেত্রে, বিশেষতঃ নাটকে আঞ্চলিক ভাষার ব্যবহার প্রচলিত হয়েছে। ছন্দে অনেক বৈচিত্র্য এসেছে। আদিযুগের মাত্রাবৃত্ত ও মধ্যযুগের অক্ষরবৃত্ত তো বর্তমান রয়েছেই, তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে নোতুনভাবে দলবৃত্ত বা স্বরবৃত্তের ব্যবহার।

[পাঁচ] সূত্রাকারে বাঙলা ভাষার উদ্ভব ও বিকাশ

আনুমানিক পাঁচ হাজার বছর পূর্বে য়ুরোপ ও এশিয়া খণ্ডের অন্তর্বর্তী কোন স্থানে সম্ভবতঃ বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর লোকেরা একটি পরস্পরবোধ্য ভাষায় কথা বলতো। বিভিন্ন ভাষার লক্ষণ-বিচারে একালের ভাষাবিজ্ঞানীরা অনুমিত সেই ভাষার নাম দিয়েছেন 'ইন্দো-য়ুরোপীয় ভাষা' (Indo-European Language) বা 'আদি আর্যভাষা' (Proto-Aryan Language)। এই ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীকে অনৈতিহাসিকভাবেই সাধারণতঃ 'আর্য জাতি' বলে উল্লেখ করা হয়। যাযাবর এই জনগোষ্ঠী কালক্রমে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। এক সময় দেখা গেল, তাদের মুখে 'আদি আর্য ভাষা' দু'টি পৃথক ধারায় পরিণত হ'য়েছে। মুখ্যতঃ পশ্চিম য়ুরোপ খণ্ডে ব্যবহৃত এই ভাষা-রূপকে 'কেন্তুম্ ভাষা' এবং পূর্ব য়ুরোপ ও এশিয়া খণ্ডে প্রচলিত রূপকে 'সতম্ ভাষা' নামে অভিহিত করা হয়। 'সতম্' গোষ্ঠীর ভাষা আবার চতুর্ধা বিভক্ত, তাদের একটি 'ইন্দো-ঈরানীয়' (Indo-Iranian) বা 'আর্য' (Aryan) ভাষা নামে অভিহিত। কালে এই আর্যভাষা ব্যবহারকারীদের একটি গোষ্ঠী ভারতে চলে আসে এবং এদের ব্যবহৃত ভাষাই 'ভারতীয় আর্যভাষা' (Indo-Aryan Language) নামে প্রসিদ্ধ।

আনুঃ খ্রীঃ পূঃ ১৫০০ অব্দের মধ্যেই আর্যভাষী জনগোষ্ঠীর সম্ভবতঃ একাধিক দল ভারতের পশ্চিমাংশে উপনিবিষ্ট হয়। এদের ব্যবহৃত আর্যভাষাই অন্ততঃ সাড়ে তিন হাজার বছর ধরে অবিচ্ছিন্ন ধারায় সমগ্র উত্তর ভারতে ব্যবহৃত হ'য়ে আসছে। এই

সুদীর্ঘ সময়সীমায় কালের ব্যবধান যেমন বিস্তর, তেমনি স্থান তথা পরিবেশের বিভিন্নতাও অনেকখানি। পশ্চিম ভারতে উপনিবিষ্ট আর্যগণ একদিকে যেমন ক্রমশঃ মধ্যভারতেও আপনাদের প্রাধান্য বিস্তার ক'রে পূর্বদিকে অগ্রসর হ'য়েছেন ও দক্ষিণে বিন্ধ্যপর্বত পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছেন, অপরদিকে তেমনি ভারতের আদি অধিবাসী প্রাগার্যদের সঙ্গেও পরিচিত হ'য়ে পারস্পরিক প্রভাবাধীন হ'য়ে পড়েছেন। ফলে স্থান ও কালগত সুদীর্ঘ ব্যবধানে তাদের মুখের জীবন্ত ভাষাও আপন স্বভাবধর্মেই বিস্তর পরিবর্তন লাভ করেছে। ভাষা পরিবর্তনের এই স্রোতটি লক্ষ্য ক'রে একালের ভাষাবিজ্ঞানীরা 'ভারতীয় আর্যভাষা'র তিনটি যুগ-বিভাগ কল্পনা করেছেন। উনিশ শতকীয় এবং বিশ শতকের প্রথম পর্বের ভাষাবিজ্ঞানীরা মোটাদাগের এই তিনটি (প্রাচীন যুগ, মধ্য যুগ ও নব্য যুগ) স্তরের কথাই বলেছেন, আচার্য সুনীতিকুমার সমগ্র ভাষা-প্রবাহকে নিম্নোক্ত ক্রমে আরো সূক্ষ্ম স্তরে বিভক্ত করেছেন ঃ

(১) প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা (Old Indo-Aryan/O. I. A.)
—আনুঃ খ্রীঃ পূঃ ১৫০০ খ্রীঃ পূঃ ৬০০ অব্দ।

(২) মধ্য ভারতীয় আর্যভাষা (Middle Indo-Aryan/M. I. A.)
—আনুঃ খ্রীঃ পূঃ ৬০০—খ্রীঃ ১০০০ অব্দ।

(ক) আদি স্তর—খ্রীঃ পূঃ ৬০০—খ্রীঃ পূঃ ২০০
(খ) ক্রান্তি পর্ব—খ্রীঃ পূঃ ২০০—খ্রীঃ ২০০ অব্দ
(গ) মধ্য স্তর—খ্রীঃ ২০০—খ্রীঃ ৬০০
(ঘ) অন্ত্যস্তর—খ্রীঃ ৬০০—খ্রীঃ ১০০০

(৩) নব্য ভারতীয় আর্যভাষা (New Indo-Aryan/N. I. A.)
—আনুঃ খ্রীঃ ১০০০—

অর্থাৎ বাঙলা, হিন্দী প্রভৃতি যে কোন নব্য ভারতীয় আর্যভাষাই প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা থেকে ক্রমবিবর্তিত হ'য়ে মধ্য ভারতীয় আর্যভাষার বিভিন্ন স্তর অতিক্রম ক'রে নব্য ভারতীয় আর্যভাষা-রূপে পরিণত হ'য়েছে।

'সংস্কৃত ভাষা বাঙলা ভাষার জননী'—এরূপ একটি দুর্মর সংস্কার অনেকেই পোষণ ক'রে থাকেন। পূর্বোক্ত আলোচনার প্রেক্ষাপটে বাঙলা ভাষার উদ্ভব-বিষয়ে আলোচনা-প্রসঙ্গে আমরা এই তত্ত্বটিও যাচাই ক'রে নিতে পারি।

'প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা'র প্রাচীন মার্জিত সাহিত্যিক রূপ পাওয়া যায়

বৈদিক সাহিত্যে এবং অর্বাচীন মার্জিত সাহিত্যিক রূপ পাওয়া যায় ধ্রুপদী তথা লৌকিক সংস্কৃত সাহিত্যে (Classical Sanskrit)। আর সেকালের কথ্যভাষার আঞ্চলিক রূপগুলি থেকেই উদ্ভূত হ'য়েছে মধ্যভারতীয় আর্যভাষাগুলি। 'প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা'কে বক্তব্যের সুবিধার জন্য সাধারণভাবে 'সংস্কৃত' নামে অভিহিত করা হ'লেও বস্তুতঃ 'সংস্কৃত' যে এ সমগ্র ভাষাপরিবারের একটি অংশমাত্র, এ কথা বিস্মৃত হওয়া উচিত নয়। সেই বিচারে মধ্যভারতীয় আর্যভাষার উদ্ভব 'সংস্কৃত' থেকে নয়, বড় জোর বলা যায়, আঞ্চলিক কথ্য সংস্কৃত থেকে।

'মধ্যভারতীয় আর্যভাষা'র তিনটি স্তর এবং একটি ক্রান্তি পর্ব—প্রতিটির স্থায়িত্ব-কাল আনু° চারশো বছর.। আদিস্তরে পাওয়া যায় বৌদ্ধ সাহিত্যের ভাষা 'পালি' এবং শিলালিপিগুলিতে অন্ততঃ পাঁচটি আঞ্চলিক আদি প্রাকৃতের নিদর্শন ঃ এদের বলা যায়. উদীচ্যা বা উত্তরদেশীয়া, প্রতীচ্যা বা পশ্চিমদেশীয়া, প্রাচ্যা, প্রাচ্যমধ্যা এবং সুতনুকা-লিপিতে 'পূর্বীপ্রাচ্যা'। ক্রান্তিপর্বের সামান্য কিছু নিদর্শন পাওয়া গেছে মধ্য এশিয়া ও চীনা তুর্কীস্থানে--এটিকে বলা যায় 'গান্ধারী প্রাকৃত'। মধ্য-স্তরের ভাষাকেই প্রকৃতপক্ষে 'প্রাকৃত' নামে অভিহিত করা সঙ্গত, যদিও সাধারণতঃ সংস্কৃতের মতেই 'প্রাকৃত' বলতে বোঝায় সমগ্র মধ্য ভারতীয় আর্যভাষাকে, যা' অতি-ব্যাপ্তিদোষ-দুষ্ট। এই প্রাকৃত তথা 'সাহিত্যিক প্রাকৃত'-রূপে পাওয়া যাচ্ছে বিভিন্ন আঞ্চলিক রূপ—পূর্বাঞ্চলের মাগধী প্রাকৃত, মধ্যাঞ্চলের শৌরসেনী প্রাকৃত, পশ্চিমাঞ্চলের মাহারাষ্ট্রী প্রাকৃত, জৈনদের ব্যবহৃত অর্ধমাগধী এবং বৈয়াকরণগণ-উল্লেখিত পৈশাচী প্রাকৃত। এগুলি সবই সাহিত্যিক প্রাকৃত। তবে সমকালে কথ্য প্রাকৃত-রূপ যেমন, নানাবিধ আঞ্চলিক ঔপভাষিক প্রাকৃত এবং বৈভাষিক প্রাকৃতও প্রচলিত ছিল। মধ্যভারতীয় আর্যভাষার তৃতীয় স্তরটি প্রাকৃত-গুলিরও অর্বাচীন রূপ--সাধারণতঃ 'অপভ্রংশ-অবহট্‌ঠ' নামে পরিচিত। বাস্তবে একটি মাত্র অপভ্রংশ-অবহট্‌ঠেরই সন্ধান পাওয়া গেছে, সেটি 'শৌরসেনী অপভ্রংশ' ও 'শৌরসেনী অবহট্‌ঠ'। ভাষাবিজ্ঞানীদের অনেকেই অনুমান করেন যে, এরই সমান্তরালভাবে অপরাপর অপভ্রংশ-অবহট্‌ঠেরও উদ্ভব ঘটেছিল, মাগধী প্রাকৃত > *মাগধী অপভ্রংশ, মাহারাষ্ট্রী প্রাকৃত > * মাহারাষ্ট্রী অপভ্রংশ প্রভৃতি। তবে লোক-ভাষা বা জানপদভাষা-রূপেও যে নানাবিধ অপভ্রংশ-অবহট্‌ঠ বর্তমান ছিল, সে কথাও বৈয়াকরণগণ স্বীকার করেন। 'একালের অধিকাংশ ভাষাবিজ্ঞানীই অনুমান করেন যে শৌরসেনী অপভ্রংশ-অবহট্‌ঠ থেকে যেমন হিন্দী-আদি নব্যভারতীয় ভাষার উদ্ভব ঘটেছিল, তেমনি* মাগধী অপভ্রংশ,* মহারাষ্ট্রী অপভ্রংশ প্রভৃতি থেকেও অপরাপর নব্যভারতীয় আর্যভাষার উদ্ভব ঘটেছে। কিন্তু কোন কোন ভাষাবিজ্ঞানী

এই মতবাদে আপত্তি জানান। তাঁরা মনে করেন, যে মাগধী বা মাহারাষ্ট্রী অপভ্রংশ বা অবহট্‌ঠের কোন নিদর্শন কিংবা উল্লেখ পাওয়া যায় না, তাদের অস্তিত্বের ভিত্তি কোথায়? আর যদি থেকেও থাকে, তবে সেগুলি ছিল একান্তভাবেই সাহিত্য-নির্ভর, তেমন ভাষা থেকে পরবর্তী ভাষার উদ্ভব সম্ভব নয়। তাঁরা মনে করেন, উক্ত অপভ্রংশের পরিবর্তে তৎকালে আঞ্চলিক কথ্য প্রাকৃত কিংবা 'লৌকিক' বা 'দেশী' নামে বৈয়াকরণ-কথিত যে জানপদ-ভাষা প্রচলিত ছিল, তা' থেকেই বাঙলা-আদি নব্যভারতীয় ভাষার উদ্ভব ঘটেছে।

'নব্য ভারতীয় আর্যভাষা' পরবর্তী সহস্র বৎসর কাল জীবন্ত ভাষার স্বভাব-ধর্ম মেনেই স্তরে স্তরে বিবর্তিত হ'য়েছে। এই বিবর্তন-রেখাটি সব নব্যভারতীয় আর্য ভাষার পক্ষে সমতাসম্পন্ন না হ' লও প্রতিটি আঞ্চলিক ভাষাই যে অন্যূন আদিস্তর এবং মধ্যস্তর অতিক্রম ক'রে মোটামুটি ১৮০০ খ্রীঃ নাগাদ আধুনিক স্তরে এসে পৌঁছেছে তা ইতিহাস-সমর্থিত।

এইবার সূত্রাকারে বাঙলা ভাষার বিবর্তন অর্থাৎ উদ্ভব ও ক্রমবিকাশের স্তরগুলি অনুধাবন করা যেতে পারে।

(ক) প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষাস্তর (খ্রীঃ পূঃ ১৫০০—খ্রীঃ পূঃ ৬০০) থেকেই এই বিবর্তন শুরু। এখানে পাওয়া যাচ্ছে ঃ

(১) আঞ্চলিক কথ্য সংস্কৃত ঃ যেমন 'প্রাচ্যা'।

এই ভাষাই ক্রম-বিবর্তিত হ'য়ে রূপান্তরিত হয়েছে—

(খ) মধ্য ভারতীয় আর্যভাষায় (খ্রীঃ পূঃ ৬০০—খ্রীঃ ১০০০ অব্দ)—এটি আবার ক্রমবিবর্তন-সূত্রে যথাক্রমে নিম্নোক্ত স্তরগুলি পার হ'য়েছে—

(২) আদিস্তরের প্রাকৃত (খ্রীঃ পূঃ ৬০০—খ্রীঃ পূঃ ২০০)

বাঙলা ভাষার পূর্বপুরুষ-রূপে এখানে 'পূবীপ্রাচ্যা' ('সুতনুকা লিপি'—এটি পূর্ববর্তী 'প্রাচ্যা'র বিবর্তনেই উদ্ভূত)।

এরপর ক্রান্তিপর্ব বা যুগসন্ধিকাল (খ্রীঃ পূঃ ২০০—খ্রীঃ ২০০ অব্দ)।

(৩) মধ্যস্তরের প্রাকৃত বা 'সাহিত্যিক প্রাকৃত' (খ্রীঃ ২০০—খ্রীঃ ৬০০)

বাঙলা ভাষার পূর্বপুরুষ-রূপে 'মাগধী প্রাকৃত' (সংস্কৃত-নাটকে) কিংবা মতান্তরে 'গৌড়ী প্রাকৃত' (—পূর্ববর্তী 'পূবী'-প্রাচ্যার বিবর্তন-জাত)।

(৪) অন্ত্যস্তরের প্রাকৃত বা অপভ্রংশ-অবহট্‌ঠ (খ্রীঃ ৬০০-খ্রীঃ ১০০০)

বাংলা ভাষার পূর্বসূরী-রূপে অনুমিত *মাগধী অপভ্রংশ/দেশী/লৌকিক তথা

'গৌড়ী অপভ্রংশ' পূর্ববর্তী *মাগধী / গৌড়ী অপভ্রংশের বিবর্তন-জাত। এই স্তরটিই ক্রমবিবর্তিত হ'য়ে রূপায়িত হয়—

(গ) নব্যভারতীয় আর্যভাষায় (খ্রীঃ ১০০০ অব্দ—)

এই স্তরের ভাষাও বিবর্তন-স্রোতে কয়েকটি স্তর অতিক্রম করে —

(৫) আদি যুগের বাঙলা (খ্রীঃ ১০০০—১২০০ খ্রী)

'চর্যাপদে' এর নিদর্শন লভ্য।

এরপর ক্রান্তিপর্ব বা যুগসন্ধিকাল (১২০০ খ্রীঃ—১৩৫০ খ্রীঃ)

(৬) মধ্যযুগের বাঙলা (খ্রীঃ ১৩৫০—১৮০০ খ্রীঃ)

এর প্রাচীনতর রূপ লভ্য 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে' এবং অর্বাচীন রূপ লভ্য অসংখ্য মঙ্গলকাব্য, রামায়ণাদি অনুবাদ কাব্য, চরিতকাব্যাদিতে।

(৭) আধুনিক যুগের বাংলা (খ্রীঃ ১৮০০—)

প্রাচীনতর রূপ পাওয়া যায় প্রথমদিকের গদ্য সাহিত্যে, পরে বিদ্যাসাগর, মধুসূদন, বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথের হাতে গদ্যপদ্যাদি পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়।

রবীন্দ্রনাথের 'গান গেয়ে তরী বেয়ে কে আসে পারে।
দেখে যেন মনে হয়, চিনি উহারে।'

এই দুটি চরণকে অবলম্বন ক'রে আচার্য সুনীতিকুমার বাঙলা ভাষার বিবর্তনের পূর্বোক্ত সাতটি স্তরে তাব কী রূপ হ'তে পারতো, তার একটা সম্ভাব্য আনুমানিক নিদর্শন দিয়েছেন। দ্রষ্টব্য ঃ তাঁর রচিত 'বাঙ্‌লা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা' এবং 'O. D. B. L. (তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ১০৪-১০৬)।

সাম্প্রতিক কালে কখন কখন নাটকে ও কাব্যে আঞ্চলিক কথ্যভাষাও ব্যবহৃত হচ্ছে।

[ছয়] বাঙলা ভাষার বৈশিষ্ট্য

প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা তথা সংস্কৃত ক্রমবিবর্তিত হয়ে মধ্যভারতীয় আর্যভাষায় পরিণত হয় এবং এই মধ্যভারতীয় আর্যভাষা তথা প্রাকৃত কালক্রমে নব্যভারতীয় আর্যভাষায় তথা বাঙলা-হিন্দী-আদি আধুনিক আঞ্চলিক ভাষায় রূপায়িত হয়। এই সুদীর্ঘ কালের পথ-পরিক্রমায় ভাষাদেহে যে সকল পরিবর্তন-চিহ্ন সূচিত হয়, তা থেকে বাঙলা ভাষার প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ নির্ণয় করা চলে। (ক) একটি বৈশিষ্ট্য—বাঙলা ভাষা ক্রমশঃ সরলতার দিকে এগিয়ে এসেছে, এবং (খ) উল্লেখযোগ্য দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য—সংশ্লেষাত্মক ভাষা থেকে বাঙলার বিশ্লেষাত্মক ভাষায় পরিণতি।

(ক) **সরলতার পথে বাঙলা ভাষা**—সংস্কৃত থেকে প্রাকৃত-মাধ্যমে বাঙলা ভাষার উদ্ভব, এই বিবর্তন পথে ভাষা সরলতর হয়েছে প্রায় সবদিকেই। উচ্চারণসৌকর্য এবং স্বল্পায়াস-প্রবণতাকেই এই সরলতার প্রধান কারণরূপে গণনা করা হ'লেও সাদৃশ্য বা বহিঃপ্রভাব-আদিকেও উপেক্ষা করা চলে না।

ধ্বনিতত্ত্বের দিক্ থেকে দেখা যায়—অনেক প্রাচীন ধ্বনি পরিত্যক্ত অথবা পরিবর্তিত হয়েছে। প্রাকৃতে 'ঋ, ঌ, ঐ, ঔ' বর্জিত হয়েছিল এবং 'ঋ'-স্থলে শুধুমাত্র কোন কোন স্বরধ্বনি অথবা 'র'-আশ্রিত স্বরধ্বনি ব্যবহৃত হতো ; 'ঐ' এবং 'ঔ'-স্থলে যথাক্রমে 'এ' এবং 'ও'কার ব্যবহার করা হতো। প্রাকৃতের এই সরলীকরণ বাঙলাতেও অব্যাহত রইলো। যথা—ঋষি>রিশি ; শৃগাল>শিয়াল ; তৈল>তেল্ল>তেল। স্বরমধ্যস্থ অল্পপ্রাণ অঘোষ স্পৃষ্টধ্বনি (প্রথমে সঘোষ, পরে উষ্ম হয়ে অবশেষে) লোপ পেল। এইভাবে পরিবর্তিত শব্দ বাঙলাতে অব্যাহত রইল, কখনো আরও সরল হ'য়ে, কখনো বা শ্রুতিধ্বনির সহায়তায়। যথা—সাগর>সাঅর>সায়র ; দীপবর্তিকা>দীঅঅট্টিআ>দেউটি। স্বরমধ্যস্থ মহাপ্রাণ ধ্বনি 'হ'-কারে পরিণত হয়েছিলো, বাঙলায় 'হ'-ও লুপ্ত হলো। যথা—সখি>সহি>সই, মধু>মহু>মউ। পদমধ্যস্থ যুক্তব্যঞ্জন প্রাকৃতেই যুগ্ম হয়েছিল, বাঙলায় তা' একক ব্যঞ্জনে পরিণত হ'লো এবং তৎপূর্ববর্তী হ্রস্বস্বর দীর্ঘ হ'লো। যথা—কার্য>কজ্জ>কাজ ; হস্ত>হত্থ> হাত। আদি যুক্তব্যঞ্জন প্রাকৃতে বিশ্লিষ্ট বা একক ব্যঞ্জনে পরিণত হয়েছে, বাঙলাতেও তাই রয়েছে। যথা—স্নান>সিনান>চান ; ব্রাহ্মণ>বাম্ভন>বামুন। স্বরভক্তি, স্বরসঙ্গতি প্রভৃতি ধ্বনিসূত্রের সহায়তায় বাঙলায় বহু শব্দের উচ্চারণ সরলতর করা হয়েছে। যথা—যত্ন>যতন, সূর্য>সুরজ ; দেশি>দিশি। প্রাকৃতের মতোই বাঙলাতেও তিনটি শিস্ধ্বনির মধ্যে একটি (প্রাকৃতে সাধারণতঃ 'স', বাঙলায় 'শ'), 'ন' ও 'ণ'-র মধ্যে একটি (প্রাকৃতে 'ণ', বাঙলায় 'ন') এবং 'য'-স্থানে 'জ'-এর ব্যবহার হ'তে লাগ্লো। যথা—সবিশেষ>শোবিশেশ, কারণ>কারন, যন্ত্র>জাঁতি, অদ্য>আজ। বাঙলায় আবার নোতুন ক'রে 'ঐ-কার', 'ঔ-কার' এবং নোতুন 'অ্যা' ধ্বনিটির আগম ঘটে।

রূপতত্ত্বেও সরলতা লক্ষণীয়। প্রাকৃতেই দ্বিবচন লুপ্ত হয়েছিল; বাঙলাতেও তাই রইল। প্রাকৃতে পদান্তস্থিত হসন্ত বর্জিত হওয়াতে বিবিধ শব্দরূপে ঐক্য সাধিত হয়েছিল, বাঙলায় সব শব্দরূপ প্রায় একাকার হয়ে গেল। সংস্কৃতে প্রত্যেক কারকের জন্য পৃথক্ বিভক্তিচিহ্ন নির্দিষ্ট ছিল। প্রাকৃতে বিভক্তিচিহ্ন অনেক কমে গেল, বাঙলায় প্রাচীন বিভক্তিচিহ্ন প্রায় সবই লোপ পেলো, কোন কোন ক্ষেত্রে নোতুন

বিভক্তি যুক্ত হলো। ফলতঃ বাংলায় 'এ, ক, ত, র'—বস্তুত এ ক'টি মাত্র বিভক্তি এবং এদের সংযোগ-বিয়োগে কয়েকটি রূপান্তর রইল—বিভিন্ন কারকের বোধ জন্মানোর জন্য কোন কোন ক্ষেত্রে অনুসর্গ যুক্ত হয়। বাঙলায় বিশেষণ বা ক্রিয়াপদে লিঙ্গ পরিবর্তিত হয় না এবং ক্রিয়ারূপে পুরুষের ভেদ থাকলেও একবচন-বহুবচনে কোন পার্থক্য নেই। সংস্কৃত এবং প্রাকৃতের তুলনায়ও এই রীতিটি অতিশয় সরল। সংস্কৃতে ক্রিয়ার কাল ও ভাবে যে বৈচিত্র্য ছিল, প্রাকৃতে তা' অনেক কমে যায়, বাঙলায় বৈচিত্র্য আরও কম। তবে বাঙলায় নিত্যবৃত্ত অতীত এবং কিছু কিছু যৌগিক কাল নোতুন যুক্ত হয়েছে।

বাক্যতত্ত্বে বাঙলায় কিছু জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে—এ কথা স্বীকার করতেই হয়। সংস্কৃতে এবং প্রাকৃতেও বাক্যের মধ্যে পদের অবস্থান-বিষয়ে কোন নিয়ম নির্দিষ্ট ছিল না, যে কোন পদকে বাক্যের যে কোন স্থানে বসানো চলতো, তাতে অর্থের কোন পরিবর্তন ঘটতো না, কারণ পদের সঙ্গে বিভক্তিচিহ্ন যুক্ত থাকায় তাদের কর্তৃ-কর্মত্ব-বিষয়ে কোন সংশয়ের কারণ ছিল না। কিন্তু বাঙলায় বহু পদে কোন বিভক্তিচিহ্ন যুক্ত হয় না বলে এবং একই বিভক্তিচিহ্ন অধিকাংশ কারকে যুক্ত হয় বলে বাক্যে পদের অবস্থান হয়েছে সুনির্দিষ্ট। যথা, সংস্কৃতে 'ছাগলঃ ঘাসং খাদতি' বাক্যের পদগুলোকে যে কোন ভাবে সাজানো যেতে পারে, তাতে অর্থের কোন বৈলক্ষণ্য দেখা যাবে না। কিন্তু বাঙলায় 'ছাগল ঘাস খায়'—স্থলে যদি পদের অবস্থান পাল্টে 'ঘাস ছাগল খায়' বলা হয়, তাহ'লেই বিপত্তি ঘটে যায়। বাঙলা ভাষায় সর্বপ্রকার সরলীকরণের মধ্যে অন্ততঃ বাক্যে পদ স্থাপনার দিক্ থেকে যে জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে তা অস্বীকার করা যায় না।

তবে প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য, বাঙলা ভাষার ক্রমবিবর্তন পথে ভাষার শ্রীবৃদ্ধির প্রয়োজনেই প্রথমে তৎসম শব্দ এবং পরে বিদেশি শব্দেরও বাধাবিধি অনুসরণে বাঙলা ভাষায় কিছু কিছু নোতুন জটিলতাও দেখা দিয়েছে।

(খ) সংশ্লেষাত্মক রূপ থেকে বাঙলা ভাষার বিশ্লেষাত্মক রূপে পরিণতি—সংস্কৃত থেকে পূর্বীপ্রাচ্যা এবং পরবর্তী কয়েকটি প্রাকৃত ও অপভ্রংশ স্তরের মধ্য দিয়ে বাঙলা ভাষার উৎপত্তি। অতএব মূল ভাষার প্রকৃতি অনেকাংশে বাঙলা ভাষায়ও বর্তাবে—এইটেই প্রত্যাশিত। সংস্কৃত ভাষার বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, এই ভাষা একান্তভাবেই সংশ্লেষাত্মক—বিভক্তি-যোজনা এর অপরিহার্য অঙ্গ। একমাত্র নিপাত বা অব্যয়-ব্যতিরেকে অপর সকল শব্দের সঙ্গেই কোন-না-কোন প্রকার বিভক্তি যোগ কবা আবশ্যিক, নতুবা ঐরূপ শব্দের বাক্যে ব্যবহৃত হবার যোগ্যতা থাকে না।

এর ফলে বাক্যে পদের অবস্থানের কোন মূল্য নেই। 'রামেন রাবণো হতঃ' বাক্যের যে কোন পদকে যে কোন অবস্থানে রাখা যাক্, তাতে যেমন কোন ব্যাকরণগত দোষ ঘট্‌বে না, তেমনি অর্থেরও কোন বৈলক্ষণ্য ঘট্‌বে না; কারণ প্রত্যেক পদে যে বিভক্তি আছে, সেই বিভক্তিই এর ব্যাকরণ-মূল্য নির্দেশ করে। কিন্তু বাক্যটির বাংলা অনুবাদ—'রাম রাবণ হত্যা করে' বাক্যে পদের অবস্থান-পরিবর্তনে গুরুতর অর্থবিভ্রাট দেখা যায়। এখানে 'রাম' এবং 'রাবণ' শব্দদুটিতে কোন বিভক্তিচিহ্ন যুক্ত না হওয়াতে অবস্থানের দ্বারাই অর্থবোধ জন্মে। অতএব দেখা যাচ্ছে, সংশ্লেষাত্মক সংস্কৃতের বংশধর হওয়া সত্ত্বেও বাঙলা হ'লো 'আবস্থানিক' বা বিশ্লেষাত্মক।

মহাভারতে 'জীবয়িষ্যধ্বম্' পদটি বিশ্লেষণ করলেই খাঁটি সংশ্লেষাত্মক ভাষার স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত হ'বে। এখানে একটি ধাতুমূলের উপর যেন বিভক্তি স্তূপীকৃত হ'য়ে জমেছে। —√জীব্+ণিচ্ প্রত্যয়+ভবিষ্যৎকালজ্ঞাপক চিহ্ন+মধ্যম পুরুষ ও বহুবচনজ্ঞাপক চিহ্ন=জীবয়িষ্যধ্বম্। বিশ্লেষণ করে পাওয়া যাচ্ছে—এই ক্রিয়াটির কর্তা মধ্যমপুরুষের দু'য়ের অধিক ব্যক্তি, ণিচ্ প্রত্যয় দ্বারা 'অপরের দ্বারা করানো'র ভাব প্রকাশিত হচ্ছে, এবং ক্রিয়ার কালটি ভবিষ্যতের। এতগুলো ভাব ও বক্তব্য একটি মাত্র পদে যুক্ত হ'লো বলেই এটা সংশ্লেষাত্মক। সংস্কৃত 'তেষু' পদটিকে বাঙলায় 'তাহাদিগেতে' আনা যায়, কিন্তু এরূপ প্রয়োগ অপ্রচলিত বলেই 'তাহাদের মধ্যে'—এইভাবে শব্দমূলের সঙ্গে সম্বন্ধবাচক বিভক্তি যোগ ক'রে অপর একটি অনুসর্গের ('মধ্যে')-সহায়তায় সংস্কৃতের ভাবটি প্রকাশ করা হ'লো।

কাজেই দেখা যাচ্ছে, সংস্কৃতে শব্দবিভক্তি, বিভিন্ন প্রত্যয় ও ধাতু বিভক্তি যুক্ত হবার ফলে এক একটি শব্দের ভারবহন-ক্ষমতা অসম্ভব বৃদ্ধি পায়—সংস্কৃত ভাষার এই গুণের জন্যই এটি সংশ্লেষাত্মক ভাষা। পক্ষান্তরে, একই ভাব বাঙলায় প্রকাশ করবার জন্যে অনেক শব্দের প্রয়োজন হয়। বিশ্লেষাত্মক ভাষার আদলই বাঙলায় ধরা পড়ে, কিন্তু বিভিন্ন বিভক্তি যুক্ত হওয়াতে (করিতেছিলাম=কর্ ধাতু+-'ইতে'-যুক্ত অপর একটি ধাতু 'আছ্'+অতীতকালবোধক প্রত্যয় -'ইল'+উত্তমপুরুষবাচক প্রত্যয় '-আম্') এর সংশ্লেষাত্মক রূপটি সম্পূর্ণ চাপা পড়েনি। দৃষ্টান্তগুলো থেকে দেখা গেলো যে সংশ্লেষাত্মক থেকে বিশ্লেষাত্মকরূপে যাবার একটা প্রবণতা দেখা দিলেও বাঙলা ভাষাকে এখনই পুরোপুরি বিশ্লেষাত্মক ভাষা বলা সঙ্গত নয়।

বাঙলা ভাষার বিশ্লেষণে দেখা যায়, এখনও বিভক্তিচিহ্ন দ্বারা বহু পদের বোধ জন্মে। যে সমস্ত ক্ষেত্রে বিভক্তিচিহ্ন বর্জিত হয়েছে, সেই সমস্ত ক্ষেত্রে পদের অবস্থানগত মহিমা বর্তমান, অন্যত্র নয়। যথা—'ছাগল ঘাস খায়'—বাক্যে 'ছাগল'

ও 'ঘাস' শব্দদ্বয়ে বিভক্তিচিহ্ন বর্জিত, অতএব এখানে পদের অবস্থান পরিবর্তন চলবে না। কিন্তু 'ছাগলে ঘাসটাকে খাচ্ছে' বাক্যে পদের আবস্থানিক পরিবর্তন ঘটলেও অর্থবিপত্তির আশঙ্কা নেই। অতএব দেখা যাচ্ছে, বাঙলা বাক্যের গঠনে এখনও কিছুটা নমনীয়তা বর্তমান রয়েছে। এর সংশ্লেষাত্মক রূপটি যেমন অংশতঃ বর্তমান, তেমনি অংশতঃ এর বিশ্লেষণাত্মক প্রবণতাও উপেক্ষণীয় নয়, বরং ইতিহাসের গতি অনুসরণ করে বলা যায় যে, বাঙলা ভাষা ক্রমশঃ সংশ্লেষাত্মক থেকে বিশ্লেষাত্মক রূপের দিকে তার গতি অব্যাহত রেখেছে এবং হয়তো শেষ পর্যন্ত বিশ্লেষাত্মক ভাষাতেই পরিণতি লাভ করবে।

চতুর্দশ অধ্যায়

ধ্বনি-বৈশিষ্ট্য ঃ বাঙলা স্বর ও ব্যঞ্জনের উচ্চারণ-বৈশিষ্ট্য

বাঙলা ভাষার উদ্ভব ঘটেছে সংস্কৃত থেকে প্রাকৃত মাধ্যমে, কিন্তু বাঙলা বর্ণমালা আমরা নিয়েছি সরাসরি সংস্কৃত থেকে। প্রাকৃত ভাষায় 'ঋ, ৯, ঐ, ঔ, ন, শ, ষ' প্রভৃতি অনেক বর্ণমালারই সন্ধান পাওয়া না গেলেও আমরা সংস্কৃত থেকে বর্ণমালা নিয়েছি বলে এগুলো বাঙলায় বর্তমান রয়েছে। কিন্তু উচ্চারণের দিক্ থেকে আমরা এখনও প্রধানতঃ প্রাকৃত ভাষাকে অনুসরণ করছি বলে অনেকক্ষেত্রেই সংস্কৃতের সঙ্গে তার মিল নেই। সংস্কৃতে প্রতিটি ধ্বনির জন্য এক একটি সুনির্দিষ্ট বর্ণ ছিল, অথবা ঘুরিয়ে বল্‌তে পারি, প্রতিটি বর্ণের একটা নির্দিষ্ট উচ্চারণ ছিল, প্রাকৃতের যুগে অতি স্বাভাবিক কারণেই ধ্বনি পরিবর্তনের ফলে উচ্চারণ রীতিতেও পরিবর্তন আসে এবং এই পরিবর্তিত উচ্চারণ-অনুযায়ী বর্ণমালাও নিয়ন্ত্রিত হয়। প্রাকৃত থেকে উদ্ভূত বাঙলা ভাষায় উচ্চারণ আরও পরিবর্তিত হয়েছে, কিন্তু তদনুযায়ী বর্ণমালা নিয়ন্ত্রিত তো হয়ই নি, বরং অকারণেই আমরা অনেকটা পিছনে হটে গিয়ে সংস্কৃত বর্ণমালার আশ্রয় নিয়েছি। ফলতঃ বর্ণমালা ও উচ্চারণে বিস্তর পার্থক্য ঘটে গেছে অর্থাৎ সংস্কৃতে যে বর্ণের যে উচ্চারণ নির্দিষ্ট ছিল বাঙলায় অনেক ক্ষেত্রেই আর তা' হচ্ছে না। কালধর্মে বর্ণমালার নিজস্ব বাঙলা উচ্চারণ দাঁড়িয়ে গেছে।

[এক] স্বরবর্ণের উচ্চারণ-বৈশিষ্ট্য / সংস্কৃত স্বরধ্বনির সঙ্গে বাঙ্‌লা স্বরধ্বনির পার্থক্য

সংস্কৃত বর্ণমালায় তেরোটি স্বরধ্বনি—অ (α), আ (αː), ই (i), ঈ (iː), উ (u) ঊ (uː), ঋ (ṛ), ৠ (ṛː), ৯ (ḷ) (ৡ—এটি শোভামাত্র, কোন ব্যবহার নেই), এ (eː), ঐ (αːi), ও (oː), ঔ (αːu)। ধ্বনিবিজ্ঞানে এতগুলো স্বরধ্বনির স্বীকৃতি নেই; সেখানে মৌলিক স্বরধ্বনিরূপে আছে অ (ɔ), আ (a), ই (i), উ (u), এ (e), ও (o)—অবশ্য এদের হ্রস্ব ও দীর্ঘ দ্বিবিধ রূপেরই স্বীকৃতি আছে। এ ছাড়া মৌলিক স্বর 'অ্যা' (ɛ/æ) সংস্কৃতে নেই, বাংলায় আছে, অপর মৌলিক 'স্বর আ' (a) সংস্কৃতেও নেই, বাঙ্‌লায়ও নেই। 'ঋ ৠ ৯'—এদের উচ্চারণে ব্যঞ্জনের যোগ রয়েছে বলে স্বরধ্বনিরূপে এদের স্বীকৃতি নেই, 'ঐ ঔ' মৌলিক নয়, যৌগিক স্বরধ্বনি।

সংস্কৃত ও বাঙ্‌লা উচ্চারণে একটা প্রধান পার্থক্য হ্রস্বস্বর ও দীর্ঘস্বরের ব্যাপারে লক্ষ্য করা যায়। সংস্কৃতে এক গ্রুপ হ্রস্বস্বর ও একগ্রুপ দীর্ঘস্বর আছে—এদের উচ্চারণ যথাক্রমে হ্রস্ব ও দীর্ঘ। 'অ ই উ ঋ ঌ'—হ্রস্বস্বর, 'আ ঈ উ ঋৃ এ ঐ ও ঔ'—দীর্ঘস্বর। বাঙলা উচ্চারণে এই হ্রস্বদীর্ঘভেদ মানা হয় না। তবে বাঙলার একটা নিজস্ব উচ্চারণ-রীতি রয়েছে, যেখানে হ্রস্ব-দীর্ঘভেদ সুস্পষ্ট, কিন্তু লেখায় সেটা ধরা পড়ে না। এই উচ্চারণ-রীতির একটা সাধারণ নিয়ম—যে সকল স্বরবর্ণের পরে হসন্তধ্বনি বর্তমান, সেই সব স্বরের বাঙ্‌লা উচ্চারণ দীর্ঘ, পক্ষান্তরে যে স্বরধ্বনির পর স্বরান্তধ্বনি উচ্চারিত হয়, সেখানে পূর্ববর্তী স্বরটি হ্রস্ব উচ্চারিত হয়ে থাকে। 'অচ্‌, আজ, ইদ্‌, ঈস্‌, উম্‌' প্রভৃতি ক্ষেত্রে আদি স্বরধ্বনিগুলো দীর্ঘ উচ্চারিত হয়, আর 'অতি, আশু, ইনি, ঈশা, উর্মি' প্রভৃতি ক্ষেত্রে আদি স্বরধ্বনিগুলো হ্রস্ব উচ্চারিত হয়। লক্ষ্য করবার বিষয়, এখানে ব্যাকরণের হ্রস্ব-দীর্ঘ ভেদ মানা হয়নি. হ্রস্ব স্বরও দীর্ঘ উচ্চারিত হ'য়েছে, আবার দীর্ঘ স্বরও হ্রস্ব উচ্চারিত হ'য়েছে। নিম্নে বাঙ্‌লা স্বরধ্বনিগুলোর উচ্চারণবৈশিষ্ট্য পৃথক্‌ পৃথক্‌ ভাবে প্রদত্ত হ'লো।

অ(ɔ)—(১) সংস্কৃতে এর উচ্চারণ (α) 'হ্রস্ব আ'—'আজি' শব্দে আ-কার আমরা যেভাবে উচ্চারণ করি, 'অ'-এর প্রকৃত উচ্চারণ তাই; পূর্বভারত বাদে সমগ্র উত্তর ভারতেই এরূপ উচ্চারণ প্রচলিত। বাঙ্‌লায় এর উচ্চারণ অর্ধবিবৃত (ɔ), অন্যত্র বিবৃত (α)। (২) বাঙ্‌লায় এর আর একটা উচ্চারণ প্রচলিত আছে, সেটা প্রায় অর্ধসংবৃত 'ও' (o) কারের মতো। অতি (=ওতি), বসু (=বোসু), পিতল (=পিতোল), ভাল (=ভালো) প্রভৃতি। লেখায় অনেক সময় 'ও'-কার দেওয়া হয় না। (৩) শব্দের অন্তে এবং কখন কখন মধ্যেও 'অ' অনেক সময় অনুচ্চারিত থাকে। যথা—জল (=জল্‌), আকাশ, পাগলা (পাগ্‌লা) প্রভৃতি। (৪) সংস্কৃত সন্ধিস্থলে অনেক সময় অ-কারের লোপ হয়, তাকে বলে 'লুপ্ত অ' (=ঽ)। যথা—ততঃ+অধিক= ততোঽধিক, লেখায় দেখানো হ'লেও এটি উচ্চারিত হয় না (=ততোধিক)।

আ (α)—(১) মূলতঃ সংস্কৃতে দীর্ঘস্বর (αː) হলেও বাঙলায় সাধারণতঃ হ্রস্বরূপেই (α) উচ্চারিত হয়। চর্যাপদে, ব্রজবুলি পদে এবং কোন কোন বাঙলা গানে (প্রত্নকলাবৃত্ত ছন্দে রচিত) অবশ্য এর দীর্ঘ উচ্চারণ অব্যাহত আছে।—'কত কাল (*kαːlɔ*) পরে, বল ভারতরে' (bhαˑrɔtɔrɔ)। (২) আ-কারের পর হসন্ত বর্ণ থাকলে 'আ' (αː) দীর্ঘ উচ্চারিত হয়, তবে এই দৈর্ঘ্য যেন পূর্ণ নয়।—'জা-ল্‌'-এর উচ্চারণ আর 'জালা' উচ্চারণে 'জা'-এর মাত্রার পার্থক্য বোঝা যায়। 'জাল্‌' উচ্চারণে মাত্রা অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ। (৩) আ-ধ্বনির প্রচলিত কণ্ঠ্য (α পশ্চাৎ) উচ্চারণ ছাড়াও

একপ্রকার তালব্য (সম্মুখ) উচ্চারণ আঞ্চলিক ভাষায় শ্রুত হয়, ধ্বনি-পার্থক্য বোঝানোর জন্য অনেক সময় এই অ-কারটিকে অ্যা' (a) বা আ-রূপে লেখা হয়। যথা—ক'াল (>কল্য), কিন্তু কাল (=কালো), চা'ল (চাউল), কিন্তু চাল (চলন)। সাধারণতঃ সাধু বা শিষ্ট বাঙলায় এর ব্যবহার নেই। সংস্কৃতের আ (α) কণ্ঠ্যধ্বনি-রূপেই বিবেচ্য, অতএব এটি যে পশ্চাৎ স্বরধ্বনি, সম্মুখ স্বরধ্বনি (a) নয়, তা' স্বীকার করতেই হয়।

ই (i), ঈ—(১) এদের প্রথমটি হ্রস্বস্বর ও অপরটি দীর্ঘস্বর হ'লেও বাঙলা উচ্চারণে কোন পার্থক্য লক্ষিত হয় না।—'দিন, দীন'—প্রসঙ্গ ব্যতিরেকে মৌখিক উচ্চারণে এদের মধ্যে পার্থক্য নির্ধারণ করা কঠিন। (২) 'ই' বা 'ঈ'র পর স্বরান্ত ধ্বনি থাকলে উচ্চারণ হ্রস্ব এবং হলন্ত ধ্বনি থাকলে অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ উচ্চারণ (iː) শোনা যায়। যথা—'দীননাথ, দিন দেখে বেরিয়ো'—এখানে 'দী' হ্রস্ব ও 'দি'-দীর্ঘতর। (৩) কখন কখন সঙ্গীতে 'ঈ'-কারে দীর্ঘস্বর প্রযুক্ত হয়। 'দী'-ন (diːnɔ) তারিণী তারা'। (৪) বিদেশি শব্দের উচ্চারণে দীর্ঘ ঈকারের উচ্চারণ বহাল থাকে।—বীস্ট (Beast), ঈস্ট (East)। (৫) শ্বাসাঘাতের কারণে কখন কখন 'ই'-কারেরও দীর্ঘ উচ্চারণ শোনা যায়।—'একবার দি-ন্ তো দেখি'। (৬) বাঙ্‌লায় অন্ততঃ একটি ক্ষেত্রে 'ঈ' দীর্ঘ উচ্চারিত হয়।—'কি' যখন বিশেষণ বা সর্বনাম রূপে ব্যবহৃত হয় (কী= kiː বই, কী খাচ্ছো ?)। কিন্তু 'তুমি কি (ki) যাচ্ছো ?' এখানে 'কি' অব্যয় বা ক্রিয়াবিশেষণরূপে ব্যবহৃত ; এতে ক্রিয়ার উপরই জোর দেওয়া হয়। এর উত্তরে শুধু 'হা' বা 'না' হয়।

উ (u) ঊ—'ই'-এবং 'ঈ'-এর মতই 'উ, ঊ-'র বাঙলা উচ্চারণেও কোন পার্থক্য নেই। যে সমস্ত ক্ষেত্রে ই, ঈ দীর্ঘ উচ্চারিত হয়, অনুরূপ সমস্ত ক্ষেত্রেই এদেরও দীর্ঘ উচ্চারণ শ্রুত হয়।

ঋ (r̥), ৠ (r̥ː)—'ঋ'কে স্বরবর্ণের অন্তর্ভুক্ত করার কোন যৌক্তিকতা নেই, একে 'অর্ধব্যঞ্জন'রূপে অভিহিত করাই সঙ্গত। এর মূল উচ্চারণ ছিল 'হ্রস্ব অ-কারের অন্তর্বর্তী র' (ɔrɔ)। সংস্কৃতে 'পিতৃ' শব্দের প্রকৃত উচ্চারণ 'পিতর্'। 'র্'-এর আশ্রয়ে 'ত্-' স্বরধ্বনি ব্যতীতও উচ্চারিত হ'তে পারে বলেই ব্যঞ্জনের আশ্রয়ীভূত স্বরস্থানীয় 'ঋ'-কে স্বরধ্বনিরূপে গ্রহণ করা হ'য়েছে। আধুনিক বাঙলায় এবং উত্তর ভারতে এর উচ্চারণ 'রি', দক্ষিণ ভারতে ও উড়িষ্যায় 'রু' (যথা—অম্রুতাঞ্জন =অমৃতাঞ্জন)। 'ঋ'-কারের প্রকৃত উচ্চারণ অনেকটা 'অর্‌অ'-এর মতন বলেই

পিতৃ+আলয়=পিত্রালয় (পিত্‌র্‌+আলয়) হয়, নতুবা 'পিঋালয়' হ'তো। ইংরেজি thunder (=থাণ্ডর্‌) উচ্চারণে প্রাচীন 'ঋ' ধ্বনিকে পাওয়া যায়।—ৠ (দীর্ঘ ঋ)-এর ব্যবহার বাঙলায় নেই, সংস্কৃতেও গুটি কয় শব্দে মাত্র বর্তমান।

৯ (l) ৡ—ঋ-এর মতই, এটিও অর্ধব্যঞ্জন। বাঙলায় ব্যবহার নেই, সংস্কৃতেও খুব কম। ইংরেজি little (লিট্‌ল্‌)-কে বাঙলায় 'লিট্ঌ' লিখলে ৯-কারের প্রকৃত উচ্চারণ পাওয়া যায়। ৡ সংস্কৃতেও নেই, শুধু বর্ণমালায় সামঞ্জস্য রাখবার জন্য এটির কল্পনা করা হয়েছে।

এ(e)—(১) ইন্দো-ঈরানী ভাষায় ধ্বনিটির উচ্চারণ ছিল 'অই' (αi) যথা—(দেব=দইব), এই উচ্চারণ আদি বৈদিক যুগেও সম্ভবতঃ বর্তমান ছিল, সংস্কৃত 'এ'-কারে পরিণত হয়—ইহা দীর্ঘস্বর (eː)। তবে প্রাকৃতের যুগেই সম্ভবতঃ এর হ্রস্ব-উচ্চারণও প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। বাঙলায় সাধারণভাবে এর উচ্চারণ হ্রস্ব, তবে পরে হলন্ত বর্ণ থাকলে দীর্ঘ উচ্চারণ ঘটে। (২) বাঙলা ভাষার অন্ত্যমধ্য যুগে অর্ধসংবৃত 'এ' কারের একটা অর্ধবিবৃত উচ্চারণ সৃষ্টি হয়, আধুনিক কালে 'অ্যা' বা 'এ্যা' (æɛ)-এর সাহায্যে এর উচ্চারণ বোঝানো হয়। বাঙলায় 'একটা' বা ইংরেজি cat বলতে এই বিকৃত 'এ' বা 'অ্যা' উচ্চারিত হয়—এইটিও একটি মৌলিক স্বরধ্বনি, কিন্তু সংস্কৃত বা প্রাকৃতে এই ধ্বনিটি ছিল না। (৩) পূর্ববাঙলার কথ্যভাষায় 'এ' এবং 'অ্যা'র মধ্যবর্তী একটা উচ্চারণ (ɛ) প্রচলিত আছে—এর কোন লিখিত রূপ বাঙলায় নেই, পশ্চিম বাংলায় এর উচ্চারণ (æ)।

ঐ (o͜i) —সংস্কৃত বর্ণমালায় এটিকে একক রূপে দেখানো হ'লেও এটি বস্তুতঃ একটি **যৌগিক স্বর** বা **সন্ধ্যক্ষর** (Dipthong)। সংস্কৃতে এর উচ্চারণ ছিল 'আই', (α͜ː) (এইজন্যই সন্ধিতে নৈ+অক=নাই+অক=নায়ক), তা থেকে বাঙলায় 'অই' এবং 'ওই'।

[দুই] বাঙলা ব্যঞ্জনধ্বনির বৈশিষ্ট্য / সংস্কৃত ব্যঞ্জনের সঙ্গে বাঙলা ব্যঞ্জনের পার্থক্য

স্বরধ্বনির মতোই বাঙলা ব্যঞ্জনধ্বনির বিন্যাস-রীতিও সংস্কৃতের অনুসরণেই পরিকল্পিত। ফলতঃ কী উচ্চারণ-রীতি-বিষয়ে, কী তার প্রকৃতি-বিচারে, এমন সুশৃংখল পদ্ধতি বহির্ভারতীয় অন্য কোন ভাষায় নেই। ইংরেজি, গ্রীক-আদি

য়ুরোপীয় আর্যভাষার কিংবা হিব্রু-আরবী আদি সেমীয় ভাষাসমূহে তো স্বর ব্যঞ্জন একীকৃত, এমন কি পৃথগ্‌ভাবে বিচার করলেও তাদের মধ্যে শৃঙ্খলা-বিধানের কোন লক্ষণ খুঁজে পাওয়া যায় না। আধুনিককালে পশ্চাত্যের ভাষাবিজ্ঞানীদের গবেষণা-কর্মে ব্যঞ্জনের বিন্যাস বিষয়ে কিছুটা বৈজ্ঞানিক রীতি অবলম্বিত হ'য়ে থাকে। তাঁরা ptk (পতক)-ধারার অনুসরণ করেন। অর্থাৎ ক্রমটি আমাদের বিপরীত। নিঃশ্বাস বায়ুর বহির্গমনের কালেই বিভিন্ন ধ্বনি উচ্চারিত হয় বলে সংস্কৃতে এবং তার অনুসরণে বাংলায় বহির্গমন কালে স্পৃষ্ট-স্থান অনুযায়ী কণ্ঠ্য-তালব্য-মূর্ধন্য-দন্ত্য ও ওষ্ঠ্য ধ্বনিগুলি সজ্জিত হয়েছে। পক্ষান্তরে বিদেশি ভাষাগুলিতে ওষ্ঠ, দন্ত, ও কন্ঠ অনুযায়ী অর্থাৎ বিপরীত দিক্ থেকে সাজানো হয়েছে। আমাদের প্রকৃতি অনুযায়ী শ্রেণীবিভাগও যথেষ্ট সুশৃঙ্খল ও বিজ্ঞানসম্মত। প্রথমেই স্পৃষ্টধ্বনিকে অঘোষ এবং ঘোষ দুই শ্রেণী এবং অঘোষ ধ্বনিকে অল্পপ্রাণ ও মহাপ্রাণ এবং ঘোষ-ধ্বনিকে অল্পপ্রাণ-মহাপ্রাণ ও অনুনাসিক ধ্বনিতে বিভক্ত করা হ'য়েছে। আংশিক স্পর্শধ্বনিগুলিকে 'উষ্মধ্বনি' নামে বর্ণমালার সর্বশেষে স্থান দিয়ে তাদের ও স্পর্শধ্বনির মধ্যবর্তী অর্থাৎ অন্তঃস্থ (স্বরধ্বনি এবং ব্যঞ্জনধ্বনির অন্তঃস্থও বটে) স্থানে য়-র-ল-ব্—এই অন্তঃস্থ ধ্বনিকে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে।

উক্ত আলোচনায় আমরা সংস্কৃত ব্যঞ্জনবর্ণের ধারায় বাঙলা ব্যঞ্জনবর্ণের সংজ্ঞা-প্রকৃতি বিষয়ে অভিন্নতার পরিচয় পেয়েছি। কিন্তু উচ্চারণ- প্রকৃতির দিক্ থেকে যে এতদুভয়ের মধ্যে বিস্তর তারতম্যের সৃষ্টি হ'য়েছে বাঙলা ভাষার সুদীর্ঘ পথ-পরিক্রমায়, নিম্নে আমরা তার পরিচয় পাবো।

কণ্ঠ্য /জিহ্বামূলীয় ধ্বনি (Velar) : ক-বর্গ—ক, খ, গ, ঘ, ঙ—ক-বর্গের এই ধ্বনিগুলো, সংস্কৃতে কণ্ঠ্যধ্বনি-রূপে পরিচিত হ'লেও বাংলায় জিহ্বামূল বা জিহ্বার পশ্চাদ্‌ভাগ কোমলতালু স্পর্শ করে ধ্বনিগুলো উচ্চারণ করা হয় বলে এদের 'জিহ্বামূলীয়' বলেও অভিহিত করা হয়। সংস্কৃত ও বাঙলায় এদের উচ্চারণ প্রায় অভিন্ন হ'লেও সম্ভবতঃ বিদেশি ধ্বনির প্রভাবে 'ক, খ, গ, ঘ'-এর একটা ঘৃষ্ট উচ্চারণও বাঙলায় প্রচলিত হয়েছে (স্পর্শ ও উষ্মধ্বনির মিশ্রণের ফলে)—এদের উচ্চারণকালে পূর্ণস্পর্শ ঘটে না এবং খানিকটা বায়ু নিঃসৃত হয়। ফিরিওয়ালাদের মুখে অনেক সময় 'খবরের কাগজ' উচ্চারিত হয় 'খবরের কাগজ' রূপে। বাঙলার পূর্ব ও পূর্বদক্ষিণ সীমান্তে 'কালীপূজা' উচ্চারিত হয় 'খালি ফুজা'-রূপে। প্রথম দৃষ্টান্তে ক, খ, গ, জ এবং দ্বিতীয় দৃষ্টান্তে ক, খ, ফ, জ-এর উচ্চারণ ঘৃষ্ট।—'ঙ' এবং 'ং'-এর উচ্চারণ বাঙলায় অভিন্ন। যথা—বাঙ্লা=বাংলা। ক-বর্গের সঙ্গে

অপর বর্ণ যুক্ত হ'লেও ক-বর্গীয় ধ্বনিগুলোর উচ্চারণ যথাযথ থাকে। যুক্ত ব্যঞ্জনের বাইরে 'ঙ'-এর স্বাধীন ব্যবহার অতিশয় সীমিত।—যেমন, বাঙ্‌লা (বাংলা), ব্যাঙ্‌, (ব্যাং) রঙ্‌ (রং)।

তালব্য ঘৃষ্ট ধ্বনি (**Palatal Affricate**)—**চ-বর্গ—চ, ছ, জ, ঝ, ঞ**—জিহ্বার মধ্যভাগ দ্বারা কঠিন তালুর স্পর্শে, চ-বর্গীয় ধ্বনির উচ্চারণ হয়। (১) বৈদিক ও প্রাচীন সংস্কৃতে এগুলো স্পর্শধ্বনি ছিল। স্পর্শ ছিল ক্ষণস্থায়ী, কোন ধ্বনিই প্রলম্বিত করা যেতো না। এগুলি ছিল খাঁটি 'তালব্য' (Palatal) স্পৃষ্টধ্বনি। এদের উচ্চারণ ছিল 'ক্য, খ্য, গ্য, ঘ্য'-এর মতো। (২) কিন্তু পরবর্তী সংস্কৃত, প্রাকৃত ও বাঙলায় চ-বর্গীয় ধ্বনিগুলির উচ্চারণ প্রলম্বিত হ'য়ে থাকে। ফলে এদের 'ঘৃষ্ট-ধ্বনি' বলা সঙ্গত। এগুলি এখন তাই 'তালব্য ঘৃষ্ট'-রূপে পরিচিত। অনেকের মতে এই ধ্বনিগুলির উচ্চারণ স্থান দন্তমূল-সন্নিহিত তালু বলেই এদের 'দন্তমূলীয় তালব্য ঘৃষ্ট' (Alveolo-Palatal-affricate) বলে অভিহিত করা হয়। যথা—'ইজ্‌-কে টেনে ই-জ্‌-জ্‌-জ্‌' এরকম করা যায়। (৩) পূর্ববঙ্গে চ-বর্গের উচ্চারণ ঘৃষ্টও নয়, স্পৃষ্টও নয়, একেবারে উষ্মবৎ। উচ্চারণস্থান তালু নয়, দন্ত বা দন্তমূল। এদের মধ্যে 'ছ' এবং 'জ'-এর উচ্চারণ যথাক্রমে ইংরেজী 'S' এবং 'Z'-এর অনুরূপ। বাংলায় এদের চ়, ছ়, জ়, ঝ়—এইভাবে লেখা চলে। পশ্চিমবঙ্গেও দন্ত্যবর্ণের সংস্পর্শে এদের এরূপ উষ্ম উচ্চারণ শোনা যায়। যথা—মেজ়দা (mezda), গাছতলা (গাস্‌তলা)। এরূপ ক্ষেত্রে ধ্বনিগুলিকে 'দন্ত্যঘৃষ্টধ্বনি' (Dental affricate) রূপেই অভিহিত করা সঙ্গত। আবার অসমীয় ভাষায় ও তৎসন্নিহিত পূর্ববঙ্গের কোন কোন অঞ্চলে 'চ'-বর্গীয় ধ্বনি একেবারে 'উষ্মধ্বনি'তে (fricative) রূপান্তরিত হ'য়েছে। ঞ-র স্বাধীন ব্যবহার বাঙলায় নেই বল্লেই চলে। প্রাচীন বাঙলায় খাঞা (=খাইয়া), আনিঞা (=আনিয়া)—ইত্যাদি ক্ষেত্রে 'ঞ'-র ব্যবহার প্রচলিত ছিল। যুক্ত ব্যঞ্জনের প্রথম বর্ণটি 'ঞ' হলে এর উচ্চারণ হয় 'ন'। যথা—চঞ্চল (চন্‌চল্‌), বাঞ্ছা (বান্‌ছা), জঞ্জাল (জন্‌জাল), ঝঞ্ঝা (ঝন্‌ঝা)। পালিতে 'ঞ্ঞ'-র ব্যবহার ছিল। যুক্ত ব্যঞ্জনের পরেরটি 'ঞ' হলে এর নিম্নোক্ত পরিবর্তন ঘটে। চ্‌-এর সঙ্গে যুক্ত হ'লে 'ন' হয়। যথা—যাচ্ঞা=যাচ্‌না (প্রাচীন বাঙলায় 'যাচিঙ্গা) ; 'জ'-এর সঙ্গে যুক্ত হলে উভয় বর্ণের উচ্চারণই সম্পূর্ণ পাল্টে যায়। যথা—আজ্ঞা (আ+জ্‌+ঞ্‌+তা=আগ্‌গ্যাঁ), যজ্ঞ=জ্‌গ্‌গ, জ্ঞান=গ্যাঁন।

মূর্ধন্য (Cerebral / Retroflex) / দন্তমূলীয় (Alveolar) ধ্বনি : ট-বর্গ—ট, ঠ, ড (ড়), ঢ (ঢ়), ণ—এগুলো সংস্কৃতে মূর্ধন্য বর্ণ ছিল, কিন্তু বাঙলায় এদের

উচ্চারণ স্থান আর মূর্ধা নয়, এখন সাধারণতঃ দন্তমূল স্পর্শ করেই এদের উচ্চারণ করা হয় বলে এদের 'দন্তমূলীয় ধ্বনি' বলা হয়। সংস্কৃতে এই ধ্বনিগুলির উচ্চারণে জিহ্বা 'প্রতিবেষ্টিত' হতো অর্থাৎ জিহ্বাকে উল্টে মূর্ধা স্পর্শ করতে হতো বলে এদের **'প্রতিবেষ্টিত' ধ্বনি'ও** (Retroflex) বলা হয়। মূল উচ্চারণ থেকে সরে যাবার ফলে 'ড' ও 'ঢ'-কে মূল উচ্চারণে ফিরিয়ে আনবার জন্য বাঙলায় 'ড়' এবং 'ঢ়' সৃষ্টি করা হয়েছে। এই তাড়িতধ্বনিগুলোর উচ্চারণ অনেকটা মূলানুগ অর্থাৎ প্রতিবেষ্টিত। সংস্কৃতে এবং ভারতের অন্যান্য ভাষায় এই অতিরিক্ত 'ড়' ও 'ঢ়' নেই। বাংলায় শব্দের আদিতে 'ড, ঢ' এবং মধ্যে ও অন্ত্যে সাধারণতঃ 'ড়, ঢ়' ব্যবহৃত হয়। 'ণ'-র ধ্বনি বাঙলায় 'ন'-র সঙ্গে প্রায় অভিন্ন, শুধু 'র' এবং 'ট'-বর্গের সঙ্গে যুক্ত অবস্থায় 'ণ'-র উচ্চারণ কিছুটা মূলের কাছাছাছি যায়। যথা—'দন্ত' ও 'কণ্ঠ' উচ্চারণ করতে গেলে, প্রথম ক্ষেত্রে 'ন্' দন্তমূল থেকে এবং পরের ক্ষেত্রে 'ণ' মূর্ধার কাছাকাছি কঠিন তালু থেকে উৎপন্ন হয়। 'ণ'-র প্রকৃত উচ্চারণ কিছুটা 'ড়ঁ' জাতীয়। পূর্ববঙ্গীয় উচ্চারণে 'ড়' প্রায়শঃ 'র'-বৎ উচ্চারিত হয়। ইংরেজি 't, d'-এর উচ্চারণ দন্তমূলীয়, অনেকটা বাংলা 'ত, দ' বা 'ট, ড'-এর অনুরূপ, সংস্কৃত 'ট-ড'-র মত নয়। বিদেশি, তদ্ভব, অর্ধতৎসম ও দেশি শব্দে 'ণ'-র ব্যবহার অনুচিত।

দন্ত্যধ্বনি (Dental **ত-বর্গ**—ত, থ, দ, ধ, ন—সংস্কৃতে সবই দন্তমূলীয় (Alveolar) ছিল, বাঙলায় 'ন' দন্তমূলীয়, অপরগুলি নিছক দন্ত্যবর্ণ। তাহ'লেও বলা চলে, ত-বর্গের ধ্বনিগুলো প্রায় অবিকৃত রয়ে গেছে।

ওষ্ঠধ্বনি (**Labial**) **প বর্গ**—প, ফ, ব, ভ, ম—এই ঔষ্ঠ্যধ্বনিগুলোর সংস্কৃত উচ্চারণ বাঙ্লাতেও বজায় আছে। আবার অতিরিক্ত একটা উষ্ম উচ্চারণও বাঙ্লায় সৃষ্টি হ'য়েছে—বিশেষতঃ ইংরেজি 'f' এবং 'v'-এর প্রভাবে বাঙলায় 'ফ্' ও 'ভ্'-এর পরিচয় পাওয়া যায়। ইংরেজী 'fool' আর বাঙলা 'ফুল' এক নয়, ইংরেজীতে 'f' উষ্ম, বাংলায় যথার্থ উচ্চারণ দেখতে গেলে 'ফু' লেখা উচিত।—প্রফুল্ল, শোভা ইংরেজিতে Praphulla, Sobha লেখা উচিত, Prafulla, Sova লিখলে উচ্চারণ বিকৃত হয়।—আঞ্চলিক উপভাষায় 'প'-ও কখন কখন উষ্ম উচ্চারিত হয় (প>ফ>ফ)।

অন্তঃস্থ বর্ণ—য, র, ল, ব—ব্যঞ্জনের মধ্যে অবস্থানকারী অর্ধস্বর (Semi-Vowel)—'য, ব'-এর উচ্চারণ বাঙলায় অনেকটা পরিবর্তিত হ'লেও অর্ধব্যঞ্জন 'র, ল'-এর উচ্চারণ মূলের মতোই রয়েছে। প্রাকৃতের যুগে 'য'-র উচ্চারণ 'জ' হয়ে গিয়েছিল, বাঙলায়ও সাধারণত শব্দের আদিতে 'য'-এর উচ্চারণ 'জ'-বৎ, কিন্তু শব্দের মধ্যে

বা অন্ত্যে-এর মূল উচ্চারণ (য়=$\breve{\alpha}$) বজায় আছে, কিন্তু মূল উচ্চারণটি বোঝানোর জন্য বাঙলায় নোতুন বর্ণ 'য়' সৃষ্টি করা হয়েছে। যথা—'যোগ' কিন্তু 'বিয়োগ'। ভারতের অন্যত্র এই পৃথক ব্যবস্থার প্রয়োজন হয়নি। 'য়'-র 'জ'-এ পরিণতি শুধু বাঙলা ভাষাতেই হয়নি, পৃথিবীর বহু ভাষাতেই এরূপ দেখা যায়। আরবী ভাষায় 'য়ূসুফ, য়াকুব, য়াস্‌মিন্‌' ইংরেজিতে 'জোসেফ, জেকব, জেসমিন'-রূপে উচ্চারিত হয়। অপর বর্ণের সঙ্গে 'য' যুক্ত হ'লে (য-ফলা—্য) সাধারণতঃ সেই বর্ণটি দ্বিত্ব প্রাপ্ত হয়। যথা—বাক্য=বাক্‌কো, সত্য=সৎতো, সহ্য=সজ্‌ঝো। লক্ষণীয়, পূর্ববঙ্গে, বিশেষতঃ আরবী-ফার্সী শব্দ 'z'-র উচ্চারণ বোঝানোর জন্য 'জ' বা 'জ়'-এর পরিবর্তে অনেক সময় 'য' ব্যবহার করা হয়। যেমন—'আযাদ (Azad), আযান'।

'র' এবং 'ল'-কে 'তরল ধ্বনি (Liquids) নামেও অভিহিত করা হয়। দাঁতের গোড়ায় জিভের ডগা কাঁপিয়ে 'র' ধ্বনি উচ্চারণ করা হয়, সংস্কৃত ও বাঙলায় উচ্চারণটি প্রায় যথাযথ রক্ষিত হ'য়েছে। 'ল'-দন্তমূলীয় ধ্বনি, সংস্কৃতে এবং বাঙলায় একই তার উচ্চারণ। বৈদিক যুগে একটা মূর্ধন্য (ळ) ছিল, এখনও উড়িষ্যা ও দক্ষিণ ভারতে এই মূর্ধন্য 'ळ'-য়ের উচ্চারণ বর্তমান আছে। বাঙলায়ও 'ল'-এর পর ট-বর্গের কোন ধ্বনি থাক্‌লে 'ল' অনেকটা মূর্ধন্যবৎ উচ্চারিত হয়।— 'আল্‌তা' এবং 'পাল্‌টা' শব্দ দুটির উচ্চারণে 'ল'-য়ের দ্বিবিধ উচ্চারণেই তা বোঝা যায়।

অন্তঃস্থ 'ব' (ব়)-এর উচ্চারণ বাঙলায় প্রায় নেই বল্লেই চলে; উপর পাটির দাঁতের সঙ্গে নীচের ঠোঁট মিলিয়ে এর উচ্চারণ করা হয় বলে এটিকে 'দন্তোষ্ঠ বর্ণ' (Dento-labial fricative) বলা হয়। বাঙলায় 'অন্তঃস্থ ব' এবং 'বর্গীয় ব'-য়ের উচ্চারণে কোন ভেদ নেই। দ্বিবিধ ব-ই একক উচ্চারণে 'বর্গীয় ব'; সংযুক্ত বর্ণে 'বর্গীয় ব' স্পষ্ট উচ্চারিত হয়। যথা—ডিম্ব, কাম্বো। যুক্ত বর্ণের দ্বিতীয়টি 'অন্তঃস্থ ব' হলে পূর্ব বর্ণটি দ্বিত্ব প্রাপ্ত হয়। যথা—বিদ্বান্‌=বিদ্দান, স্বত্ব= শত্তো, অশ্ব=অশ্‌শ। এরূপ ক্ষেত্রে দু'এক স্থলে 'অন্তঃস্থ ব'-এর প্রকৃত উচ্চারণটি প্রায় এসে যায়। যথা—স্বামী=সোয়ামি, স্বস্তি=সোয়াস্তি। বাঙলায় লেখা হয় না অথচ অন্তঃস্থ ব-এর উচ্চারণ আসে, এমন কিছু শব্দ আছে। যথা—পাওয়া=পাব়া, খাওয়া=খাব়া। (বাঙলায় পুনরায় অন্তস্থ 'ব' ধ্বনিটি চালু হ'লে Syllable বা অক্ষর বিভাজন ব্যাপারটা অনেক সহজ হয়)। ইংরেজীতে 'w' এবং 'v' উভয় অক্ষরই এর প্রতিবর্ণ-রূপে ব্যবহৃত হয়। বিশ্ব=Viswa। এছাড়াও নানা দেশীয় ও

বিদেশীয় নামের প্রতিবর্ণীকরণে বিভ্রান্তি এড়ানো সম্ভব অন্তঃস্থ ব-এর পুনর্বাসনে। যেমন, Gavaskar-কে 'গাভাস্কর' কিংবা 'গাওস্কর' না লিখে লিখতে পারি যথার্থ উচ্চারণে 'গাব়াস্কর' কিংবা Winternitz-কে লিখতে পারি 'ৱিন্টারনিৎজ'।

উষ্মধ্বনি (Fricative)—শ, ষ, স, হ—এদের উচ্চারণ কালে শ্বাসবায়ু প্রলম্বিত হয় অর্থাৎ কিছুটা উষ্মা বহির্ভূত হয় বলে এদের 'উষ্মধ্বনি' বলা হয়। এদের মধ্যে প্রথম তিনটি অর্থাৎ 'শ, ষ, স'-এর উচ্চারণকালে শিস্ দেওয়ার মতো একপ্রকার শব্দ হয় বলে এদের 'শিশ্ধ্বনি' (Sibilant)-ও বলা চলে। সংস্কৃতে এরা ছিল যথাক্রমে তালব্য, মূর্ধন্য ও দন্ত্য বর্ণ; কিন্তু বাঙলায় সবই 'তালব্য শ'-রূপে উচ্চারিত হয়।—সবিশেষ=শোবিশেষ্; কণ্ট=কশ্টো। র' ও দন্ত্যবর্ণের সঙ্গে যুক্ত অবস্থায় এদের উচ্চারণ 'দন্ত্য স'।—শ্রী=স্রী, শ্লীল—স্লীল, হস্ত, স্নান প্রভৃতির উচ্চারণে 'স'-এর প্রকৃত রূপটি পাওয়া যায়। কোন কোন বিদেশি শব্দের উচ্চারণে 'স্'-এর একক উচ্চারণও অবিকৃতভাবে বর্তমান থাকে।—সৈয়দ, বাস্ (bus), সাইকেল। বাঙলা ভাষার আঞ্চলিক উচ্চারণে কখন কখন 'শ'-স্থলেও 'স' উচ্চারিত হয়। 'শ্যামবাজারের শশীবাবু শশা খাচ্ছেন=সামবাজারের সসিবাবু সসা খাচ্ছেন।' পূর্ববঙ্গীয় উচ্চারণে শিশ্-ধ্বনিগুলো অনেক সময় 'হ'-কারে পরিণত হয়।—শিয়াল=হিয়াল, আসে=আহে, সাপ=হাপ, শাক=হাগ।—বাঙলায় শিশ্ ধ্বনিগুলো অঘোষ ব্যঞ্জন, কোন কোন বিদেশি ভাষায় এদের সঘোষ রূপের অস্তিত্ব আছে যেমন—Pleasure=প্লেঝ়ার। বাঙলা প্রতিবর্ণীকরণে 'জ, জ়, ঝ, ঝ়'-রূপে দেখাতে হয়।—ক্+ষ=ক্ষ বাঙলায় 'ক্খ'-রূপে উচ্চারিত হয়।

'হ'—কণ্ঠনালীয় উষ্মধ্বনি (Glottal fricative)—সংস্কৃত ও বাঙলায় অভিন্ন উচ্চারণ এবং ঘোষবৎ। কিন্তু পূর্ববঙ্গীয় উচ্চারণে এর ঘোষবত্তা প্রায় বর্তমানে থাকে না, কন্ঠনালীর আকুঞ্চনে ধ্বনিটির সৃষ্টি হয়।—হয়=অ'য়, হাতী—আ'ত্তি, হিন্দু—ই'ন্দু। । কিন্তু 'শ'/'স' যখন 'হ'-কারে পরিণত হয় তখন 'হ'-য়ের পূর্ণ উচ্চারণ বজায় থাকে—সে>হে, হগল, হাপ প্রভৃতি।

অনুস্বার—ং—যে স্বরবর্ণের পর অনুস্বার উচ্চারিত হয় সেই স্বববর্ণটিকে অংশতঃ সানুনাসিক ক'রে দেওয়াই ছিল সংস্কৃত ভাষায় অনুস্বারের কাজ।—সংসার—স-অঁসার। কিন্তু বাঙলায়-এর 'ঙ'-বৎ—শঙ্শার; হিন্দিতে এর উচ্চারণ '-ন্' এবং দক্ষিণ ভারতে '-ম্'। হিন্দী সন্সার, দক্ষিণ ভারতে 'সম্সার'। সাধারণভাবে বাঙলায় 'ং' এবং 'ঙ' নির্বিশেষে ব্যবহৃত হয়।—রঙ, রং, বাঙলা, বাংলা।

বিসর্গ—ঃ—এটি 'হ'য়ের অঘোষ রূপ। খাঁটি বাঙলায় বিস্ময়বোধক অব্যয়ের শেষেই শুধু ব্যবহৃত হয়।—আঃ, উঃ। অন্যত্র শব্দের শেষে প্রায়ই উহ্য থাকে।—করতঃ, বিশেষতঃ (করত, বিশেষত)। শব্দের মধ্যে ঃ থাকলে পরবর্তী ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব হয়। দুঃখ=দুক্‌খ, মনঃসংযোগ=মনস্‌সংযোগ। এর এই দ্বিত্ব ভাবের জন্য শব্দ-মধ্যে দ্বিরুক্ত ব্যঞ্জন থাকলে বিসর্গের ব্যবহার দেখা যায়।—মফস্‌সল=মফঃস্বল।

চন্দ্রবিন্দু—সংস্কৃতে এর ব্যবহার প্রায় নেই, ক্বচিৎ পাওয়া যায়। মহান্‌+লাভ=মহাঁল্লাভ। বাঙলায় সানুনাসিক যুক্ত ব্যঞ্জন একক ব্যঞ্জনে পরিণত হ'লে পূর্বস্বরে চন্দ্রবিন্দু ব্যবহৃত হয়।—চন্দ্র>চাঁদ, সন্ধ্যা>সাঁঝ, আম্র>আঁব।

পঞ্চদশ অধ্যায়

ধ্বনিবিচার

প্রাচীন ভারতীয় আর্য তথা সংস্কৃত থেকে মধ্য ভারতীয় আর্য তথা প্রাকৃতের মাধ্যমে নব্য ভারতীয় আর্যভাষাসমূহের সৃষ্টি। বাঙলা ভাষা নব্য ভারতীয় আর্য-ভাষাগুলোর মধ্যে অন্যতম। সংস্কৃত থেকে আধুনিক বাঙলা ভাষায় উত্তীর্ণ হবার পথে অনেকগুলো স্তর অতিক্রম করতে হয়—এগুলোর মধ্যে আছে পালি বা প্রাচীন প্রাকৃত (বিশেষতঃ 'পূর্বীপ্রাচ্যা') সাহিত্যিক প্রাকৃত (বাঙলার ক্ষেত্রে 'মাগধী প্রাকৃত/গৌড়ী প্রাকৃত'), অপভ্রংশ ও অবহট্ঠ অথবা আঞ্চলিক কথ্য প্রাকৃত 'দেশী'/ (*মাগধী/*গৌড়ী), প্রত্ন নব্য ভারতীয় আর্য (গৌড়ী/*মাগধী), প্রাচীন বাঙলা ও মধ্য বাঙলা। প্রতি ক্ষেত্রেই বা অনেক ক্ষেত্রেই কিছু-না কিছু ধ্বনিতাত্ত্বিক পরিবর্তনের ফলে বহু ক্ষেত্রেই মূলের সঙ্গে শেষতম বংশধরের আকারগত পার্থক্য এত বেশি দাঁড়িয়ে গেল যে দু'য়ের মধ্যে কোন ঐক্যসূত্র আবিষ্কার করাও প্রায় অসম্ভব বলে মনে হয়। অবশ্য কোন কোন ক্ষেত্রে কোন কোন ধ্বনি আগাগোড়াই অবিকৃত থেকে গেছে ; আর যখন পরিবর্তন হ'য়েছে তখন তার দুটি ধারা নির্ণয় করা চলে—(১) **'বহুমুখী পরিবর্তন'**—অর্থাৎ একই ধ্বনি ভিন্ন কালে ও ভিন্ন শব্দে ভিন্ন ভিন্ন রূপ লাভ করেছে। যথা—অরিষ্ট>রীঠা (আদি 'অ'-লোপ), ভক্ত>ভাত>ভাৎ (অন্ত্য 'অ' লোপ), অবসর> অব্‌সর (মধ্য 'অ' লোপ), অশীতি>আশি ('অ'কার 'আ'-কারে পরিবর্তিত), অবিধবা>এয়ো (আ+ই একত্রে 'এ'কারে পরিবর্তিত), রাজকুল>রাঅউল>রাউল (অ+উ একত্রে 'উ'কারে পরিণত), সাগর>সাঅর>সায়র ('অ'-স্থানে 'য়' এসেছে),* কেতটক>কেওড়া ('অ' স্থানে 'ও') প্রভৃতি। (২) **'একমুখী পরিবর্তন'**—অর্থাৎ বিভিন্ন ধ্বনি পরিবর্তিত আকারে এক ধ্বনিতে পরিবর্তিত হ'য়েছে। যথা—ছেদনিকা> ছেনি ('ছ' অপরিবর্তিত), শাবক> ছা' (আদি 'শ' 'ছ'-য়ে পরিণত), ষট্>ছয় ('ষ'-র 'ছ'-য়ে পরিণতি), সূচি>ছুঁচ ('স'-এর 'ছ'-য়ে পরিণতি), কক্ষ>কাছ ('ক্ষ'-য়ের 'ছ'-য়ে পরিণতি), কীণক>ছিনা ('ক'-য়ের 'ছ'-এ পরিণতি), বৎসক>বাছা ('ৎস' যুক্তভাবে 'ছ'-য়ে পরিণত), মৎস্য>মচ্ছ (মাগধী 'মশ্চ')>মাছ (শ্চ-য়ের 'ছ'-য়ে পরিণতি*), মিথ্যা>মিছা ('থ্য'-য়ের 'ছ'-য়ে পরিণতি), কিঞ্চ>কিছু ('ঞ্চ'-এর 'ছ'-য়ে পরিণতি)। এই দু'টি ধারা অবলম্বন ক'রে মূল স্বরধ্বনি ও ব্যঞ্জনধ্বনি বিবর্তিত হ'য়ে বাঙলায় রূপায়িত হ'য়েছে, নিম্নে তার বিস্তৃত পরিচয় দেওয়া হলো।

[এক] স্বরধ্বনির বহুমুখী পরিবর্তন

শব্দের আদিতে, মধ্যে, অন্ত্যে অথবা অপর-স্বরের সংযোগে প্রতিটি স্বরধ্বনিই ভিন্ন পরিবেশে ভিন্ন রূপ লাভ করেছে দেখা যায়। এদের মধ্যে কতক স্বরধ্বনি মূলতঃ ছিল একক বা **ব্যঞ্জন-ব্যবহিত স্বরধ্বনি** (vowels not in contact) এবং কতক ব্যঞ্জনের সঙ্গে যুক্ত বা **সন্নিকৃষ্ট স্বরধ্বনি** (vowels in contact)। উভয়বিধ স্বরধ্বনি প্রাচীনতম অথবা অপর কোন স্তরের তুলনায় বাঙলায় কিভাবে পরিবর্তিত হ'য়েছে, নিম্নে তার দৃষ্টান্ত দেওয়া হ'লো।

(ক) ব্যঞ্জন-ব্যবহিত স্বরধ্বনির পরিবর্তন

দুই স্বরধ্বনির মাঝখানে যখন ব্যঞ্জনের ব্যবধান থাকছে, তাকেই বলা হয় 'ব্যঞ্জন-ব্যবহিত স্বরধ্বনি' (vowels not in contact)।

(অ) **আদ্য স্বরধ্বনি :** (১) শব্দের আদি স্বরধ্বনি প্রধানতঃ অনাদ্য স্বরে শ্বাসাঘাতের কারণে কখন কখন লোপ পেয়েছে।

অ—লোপ : অলাবু>লাউ, অহকম্>হউঁ, অরিষ্ট>রীঠা, অতসী>তিসি।

আ—লোপ : আছিল>ছিল।

উ—লোপ : উধার>উধার>ধার, উপবিশতি>উবইসই>বইসে, উদুম্বর>ডুমুর, উপবীত>পইতা (<পইত্তা<পবিত্রা)।

এ—লোপ : এরণ্ড>রেড়ী, এহেন>হেন।

২. সংস্কৃতে যুক্ত ব্যঞ্জনের পূর্ববর্তী দীর্ঘস্বর প্রাকৃতে হ্রস্ব হয়েছে, এবং বাঙলায় আবার দীর্ঘ হয়েছে।—অষ্ট>অট্ঠ>আট, অন্ধকার>আঁধার, অগ্র>আগ, অগ্নি>আগ।

৩. আদ্য স্বরধ্বনি পূর্বোক্ত নিয়মসত্ত্বেও এবং অন্যত্র সাধারণভাবে বর্তমান রয়েছে।—অপ্সরী>অপ্‌ছরি. ইন্দ্র>ইঁদ, ইন্দু, ইন্দর; আম্র>আম; উপকারিকা>উয়ারি, একাদশ>এগারো।

৪. অনেক আদ্য স্বরধ্বনি নানাভাবে পরিবর্তিত হয়েছে।

অ>আ—অবিধবা>আইয়ো, এয়ো, অভিমন্যু>আইহন, অলক্তক>আলতা।

ই>আ, উ—ইক্ষু>আখ, উখ।

উ>ই—উন্দুর>ইঁদুর।

ঋ>রি—ঋণ>রিন, ঋতু>রিতু।

এ>অ্যা—এক>অ্যাক।

(আ) **আদ্যক্ষরে স্বরধ্বনি :** (১) শব্দের আদ্যক্ষরস্থ স্বরধ্বনির পরে যুক্তব্যঞ্জন থাক্‌লে ঐ স্বরধ্বনি বাঙলায় সাধারণতঃ দীর্ঘতা লাভ করে।

সন্ধ্যা>সাঁঝ, কণ্টক>কাঁটা, বজ্র>বাজ, অন্নাদ্য>আনাজ। ই/ঈ; উ/ঊ প্রভৃতি ক্ষেত্রে হ্রস্ব-দীর্ঘের পার্থক্য বাঙলায় নেই বলে এদের দীর্ঘতা বাঙলায় ধরা পড়ে না।

(২) আদ্যক্ষরস্থ স্বরধ্বনি বহুক্ষেত্রে অবিকৃত থাকে।—ননন্দৃ>ননদ, সপ্তদশ>সতেরো; বর্ততে>বটে; স্বামী>সাঁই, মহাকাল>ময়াল, পাদ>পা, জিহ্বা>জিভ্, পত্র<পত্ত, শৃঙ্ক>খুখা; জ্যেষ্ঠ>জেঠা, দেহ>দে; যোগ>জো।

(৩) আদ্যক্ষরস্থ স্বরধ্বনি ভিন্ন ধ্বনিতে রূপান্তরিত হয়।—প্রভাতিল> পোহাইল; আয়াত+ইল্ল>আইল, এল; প্রাকার>পগার; কাঁঠাল>কেঁঠাল; টাকা—ট্যাকা; প্রিয়কারিকা>পেয়ারী; ছিল>ছেল; পুস্তিকা—পোথিয়া> পুথি/পুঁথি; কুমার>কোঙার; ঘৃত>ঘি, ঘেরৃত, দীপশলাকা>দিয়াশলাই> দেশলাই, মৃতক>মড়া, শৃগাল>শিয়াল. বৃতি>বেড়া, কৃষ্ণ>কেষ্ট, দেশীয়>দিশি, মেণ্ড্রক>ভ্যাড়া, জ্যৈষ্ঠ>জেঠ্, বৈদ্য>বদ্দি, গৈরিক>গেরুয়া, মোদক>ময়রা, চোর >চোর্, পুত্র>পুত্ত>পো, মণ্ডপ>ম্যাড়াপ, ঔষধ>ওষুদ।

(ই) **মধ্যস্বরধ্বনি** (১) শব্দের আদি স্বরে শ্বাসাঘাতের ফলে শব্দমধ্যবর্তী স্বরধ্বনি অনেক সময় লুপ্ত হয়। গামোছা>গামছা, পাগল্+আ>পাগ্‌লা, পিপীলিকা>পিঁপিড়া>পিপ্‌ড়া; ভ্রাতৃ-শ্বশুর>ভাই-শ্বশুর>ভাসুর, পানিকৌড়ি> পানকৌড়ি, অপরাজিতা>অপ্‌রাজিতা, খনিত্র>খন্‌তা।

(২) আদ্য শ্বাসাঘাত-সত্ত্বেও কখন কখন মধ্যবর্তী স্বরের বিলোপ ঘটে না।— দেবকুল>দেউল. সৌভাগ্য>সোহাগ।

(ক) মধ্যবর্তী স্বর কখন কখন ভিন্ন স্বরে পরিণত হয়। ভ্রাতৃজায়া>ভাইজ, গোপাল>গয়লা, কিঞ্চুলিকা>কেঁচো, পতঙ্গ—ফড়িং, লঘুক/লাঘব>হাল্‌কা।

(ঈ) **অন্ত্যস্বরধ্বনি** (১) পদান্ত্যস্থিত স্বরধ্বনি—'-অ, আ' থেকে জাত '-অ', '-ই, ঈ, এ'-থেকে জাত '-ই' এবং '-উ, ও' -থেকে জাত -'উ' বাঙ্‌লায় '-অ' হয়েছে এবং পরে লোপ পেয়েছে। হস্ত>হত্থ>হাত>হাৎ, রাজা>রায়া>রায়, অগ্নি>অগ্গি> আগি>আগ্, সাধু>সাহু>সাহ্, দদ্রু>দদ্দু>দাদ্, জিহ্বা>জিভ্।

(২) যুক্ত ব্যঞ্জনের অন্তে স্থিত পদান্তের স্বরবর্ণ বিশেষত 'অ' বাঙ্‌লয় লুপ্ত হয় না।—কার্য, সত্য, ভক্ত, উষ্ট্র।

(৩) অন্তে অনেক স্বরধ্বনি পরিবর্তিত হয়।—দৃষ্ট>দুট্ঠ, মিষ্ট>মিষ্টি, বৃদ্ধক>বুড়া>বুড়ো।

(খ) **সন্নিকৃষ্ট স্বরধ্বনি** (Vowels in contact)

প্রাকৃত স্তরে যখন পদমধ্যস্থ অল্পপ্রাণ স্পৃষ্টব্যঞ্জন লোপ পেলো, তখন স্বরধ্বনি-গুলো বজায় ছিল, এই স্বরধ্বনিগুলোকে বলা হয় **উদ্বৃত্ত স্বর**। এই উদ্বৃত্ত স্বর পূর্ববর্তী স্বরধ্বনি এবং কখন কখন পরবর্তী স্বরধ্বনির সঙ্গে মিলিতভাবে 'দ্বিস্বরধ্বনি' ও 'ত্রিস্বরধ্বনি' গঠন করেছে। বাঙলা ভাষার স্তরেও প্রাকৃতের 'হ'-ধ্বনি লুপ্ত হওয়াতে উদ্বৃত্ত স্বরের সৃষ্টি হ'য়েছে। উদ্বৃত্ত স্বরের সঙ্গে পূর্ববর্তী অথবা পরবর্তী স্বরের সম্পর্ককেই 'সন্নিকৃষ্ট স্বরধ্বনি' বলা হয়। উদ্বৃত্ত স্বর ছাড়াও স্বল্প পরিমাণে দ্বিস্বরের বিশ্লেষণ-জাত সন্নিকৃষ্ট স্বরধ্বনির উদ্ভব ঘটে।

(১) 'অ'কারের পর 'অ' কখনো 'অ' কখনো 'আ' হয়।—কদলক>কঅলঅ>কলা ; শত>শঅ>শ ; অপর>অঅর>আর, কপর্দক>কবড্ডঅ>কঅড়অ>কড়া।

(২) 'অ'-কারের পর '-ই' '-উ' কখনো কখনো দ্বিস্বরধ্বনিতে পরিণত হয়। প্রতিষ্ঠা>পইঠা, পৈঠা ; বধূ>বহূ>বউ, বৌ ; সখী>সহী>সই, সৈ ; মধু>মহু>মউ, মৌ ; চতুর্থ>চউট্ঠ>চউঠা, চৌঠা।

(৩) 'অ'-কারের পর 'ই'=এ, 'অ'-কারের পর 'উ'=উ।—গত+ইল=গেল ; চলতু>চলউ>চলু ; রাজকুল>রাঅউল>রাউল।

(৪) 'আ'-কারের পরস্থিত 'ই'/'উ' কখন কখন 'এ'-কারে পরিণত হয় এবং কখন কখন শুধু 'আ' অবশিষ্ট থাকে।—আয়াত+ইল>আঅাঅ+ইল>আইল>এল ; আকুল>আউল>এলো (চুল) ; মাছুয়া>মাউছা>মেছো ; অবিধবা>অইহআ>আইহ>এয়ো ; দদ্রু>দদ্দু>দাউদ>দাদ।

পদের অন্তে 'আই'/'আউ' অনেক সময় অপরিবর্তিত রয়েছে।—গবী>গাঈ, গাই ; নাহি>নাই ; অলাবু>লাউ।

পদান্তের 'আউ' অনেক সময় 'আই' হয়েছে।—বায়ু>বাউ>বাই ; বাহু>বাউ>বাই (দশবাই চণ্ডী)।

(৫) 'ই'-কার বা 'ঈ'-কারের পর 'অ' বা 'আ' থাকলে শুধু 'ই' বা 'ঈ' বর্তমান রয়েছে।—চলিত>চলিঅ>চলি, চলী ; পুস্তিকা>পোত্থিআ>পোথী, পুথি ; জামাতৃক>জামাইঅ>জামাই ; দুহিতা>ধীআ>ঝিআ>ঝি ; উপকারিক>.

উঅআরিঅ>উয়ারি। কখন কখন 'ইঅ' সন্ধি হয়ে 'এ'-তে রূপান্তরিত হয়েছে। দ্বি+অর্ধ=দ্ব্যর্ধ>দেড়, দীপশলাকা>দিঅশলাআ>দেশলাই।

'ই' বা 'ঈ'-কারের পর 'ই' বা 'ঈ'-কার থাকলে উভয়ে মিলে 'ই' বা 'ঈ'-কারে পরিণত হয়েছে।—জীবিত+ইল—জীঈল্ল>জীল (জিল=জীবিত হ'লো)।

(৬) 'উ' বা 'ঊ'-কারের পর 'অ' থাকলে 'অ' লুপ্ত হয়েছে।—গোরূপ> গোরূঅ>গোরু; উপকারিক>উঅআরিঅ>উআরি; শল্যরূপ>সয্যরূঅ> সজারু।

'উ' বা 'ঊ'-কারের পর 'ই' বা 'ঈ' থাক্‌লে উভয়েই বর্তমান রয়েছে, তবে আধুনিক বাঙ্‌লায় কখন কখন 'ই' লুপ্ত হয়।—পূতিকা>পূইআ>পুই; ভূতি>হূই; ভূতি>হুই (উপাধি বিশেষ); দুহিয়া>দুইআ>দু'য়ে।

'উ' বা 'ঊ'-কারের পর 'উ' বা 'ঊ'-কার থাক্‌লে শুধু একটি 'উ' বর্তমান থাকে। >বায়ুপুটক>বাউ উডঅ>বায়ুড়া। দ্বিগুণক>দুউনঅ>দু'নো।

(৭) 'এ'-কারের পর 'অ' থাকলে 'অ' লুপ্ত হয়।—দেবকুল>দেঅউল>দেউল; ছেদনিকা>ছেঅনিআ>ছেনি।

'এ'-কারের পর 'উ' অব্যাহত থাকে।—নকুল>নেউল; নূপুর>নেপুর>নেউর।

(৮) 'ও'-কারের পর 'অ' লোপ পেয়েছে।—আলোক>আলোঅ>আলো; রোম>রোঁব>রোঁঅ>রোঁ।

'ও'-কারের পর 'ই' থাক্‌লে উভয়ে মিলে 'উই' হয়।—রোহিত>রোহিঅ>রোইঅ >রুই; গোমিন্‌>গোবিঁ>গুঁই।

'ও'-কারের পর 'উ' বর্জিত হয়।—গোধূম>গোহুম>গোউম>গোম/গম।

[দুই] বাঙলার স্বরধ্বনির পরিবর্তন

সংস্কৃত থেকে প্রাকৃতের মাধ্যমে বিভিন্ন স্তরবাহিত হ'য়ে বাঙলায় যে বিচিত্র উপায়ে স্বরধ্বনির পরিবর্তন ঘটে, পূর্ববর্তী অধ্যায়সমূহে তা' বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হ'য়েছে। কিন্তু স্তরবাহিত না হ'য়েও যে বাঙলা ভাষার নিজস্ব পরিমণ্ডলে স্বরধ্বনির বিচিত্র পরিবর্তন ঘটে থাকে, নিম্নে সে বিষয়ে আলোচনা নিবদ্ধ হ'লো। যে ধ্বনি পরিবর্তন-সূত্রগুলো বর্ণিত হ'চ্ছে, প্রথম খণ্ডে 'ধ্বনিপরিবর্তন' পরিচ্ছেদেও সে বিষয়ে আলোচনা হ'য়েছে। এগুলোর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য :—

(ক) শ্রুতিধ্বনি, (খ) অপিনিহিতি, (গ) অভিশ্রুতি, (ঘ) স্বরসঙ্গতি—বাঙলা ভাষার ধ্বনিতাত্ত্বিক পরিবর্তনে এদের ভূমিকা বিরাট।

(ক) **শ্রুতিধ্বনি**—সন্নিকৃষ্ট স্বরধ্বনিতে অর্থাৎ দুটি স্বরধ্বনি পাশাপাশি থাক্‌লে অনেক সময় তাদের মধ্যে শ্রুতিধ্বনির আগম ঘটে—'য়-শ্রুতি' 'ব়-শ্রুতি'। শ্রুতিধ্বনির আগম ঘট্‌লে আর অন্যবিধ পরিবর্তন ঘটে না।—সাগর>সাঅর> সায়র। শ্রুতিধ্বনির আগম না ঘট্‌লে এখানে 'আ'-কারের পর 'অ'-কার থাকার 'অ'-কারের লোপ হতে পারতো, যেমন অন্যত্র হয়েছে। কিন্তু শ্রুতিধ্বনির ফলে 'আ' এবং 'অ' উভয়ই বর্তমান রইলো।—কেতক>কেঅঅ>কেয়া, বদন>বঅন> বয়ান, নয়ন>নঅন>নয়ান, শূকর>শূঅর>শূয়োর, শূওর ; মোদক>মোঅঅ> মোয়া, শাব>ছাব>ছাও, কেতকট>কেঅঅড>কেওড়া, রাজা>রাআ>রাও, রায়। এখানে লক্ষণীয় যে 'ব়' (অন্তঃস্থ ব) অক্ষরটি বাংলায় নেই, তৎস্থলে বর্গীয় 'ব' দিয়েই লেখা হয়। ফলে 'ব়-শ্রুতি' লেখার সময় ততটা ধরা পড়ে না, এটিকে কখনো 'ও' দিয়ে, কখনো 'য়' দিয়ে লেখা হয়। অনেকের ধারণা, বাংলায় 'অন্তঃস্থ ব' উচ্চারণই নেই, কিন্তু ধারণাটি ভ্রান্ত। যেমন—শূওর, শূয়োর, শূওর=শূব়র, পাওয়া='পাব়া', যাওয়ার='যাব়ার / 'যাবার'।

'য়-শ্রুতি'- বিষয়েও সতর্কতা গ্রহণ আবশ্যক। বানানে 'য়' থাকলেই সেটাকে 'য়-শ্রুতি' বিবেচনা সঙ্গত নয়। যেমন—'করিয়া=করিআ', দিয়ো='দিও', যাওয়া= 'যাওআ'—সর্বত্রই দেখা যাচ্ছে 'য়'টা শ্রুতিতে আসে না, শুধু দৃষ্টিশোভা বাড়ায় ; এ সমস্ত 'য়-শ্রুতি' হয়নি। কারণ বাঙলা শব্দের আদিতে ছাড়া কখনো মধ্যে বা শেষে 'অ' বা 'আ' লিখিত হয় না, এরূপ স্থলে অনেক সময়ই অকারণে কিংবা অন্তঃস্থ ব স্থলে 'য়' লেখা হয়।

(খ) **অপিনিহিতি**—বাঙলা ভাষার অভ্যন্তরে অপিনিহিতির আবির্ভাব বাঙলা স্বরধ্বনির পরিবর্তনে বিরাট ভূমিকা গ্রহণ করে। এই পরিবর্তন মধ্যযুগের বাঙলায় বর্তমান ছিল। এখনও পূর্ববঙ্গীয় উপভাষায় বর্তমান। রাঢ়ী উপভাষায় এটি বিবর্তিত হ'য়ে গেছে অভিশ্রুতিতে। অপিনিহিতির ফলে 'ই' বা 'উ' ধ্বনি পূর্বে চলে আসে, কখনও মূল ধ্বনিটি বর্তমান থাকে, কখনো থাকে না।—আজি>আইজ, কালি>কাইল, চারি>চাইর, সাধু>সাউধ, মাগু>মাউগ, কাঁচি>কাঁইচি, গাঁতি> গাঁইতি।

পশ্চিম বাঙলার প্রান্তিক উপভাষায়, ঝাড়খণ্ডীতে কিন্তু অপিনিহিতির যথেষ্ট

প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়।—দেখে>দেইখে, দাঁড়িয়ে>দাঁইড়ে>,বলছি>বইলছি। বস্তুতঃ একটি ক্ষীণশ্রুত অপিনিহিত ঝাড়খণ্ডী ভাষার বৈশিষ্ট্যই বটে।

শব্দের মধ্যে 'য'-ফলা, 'ক্ষ'-ইত্যাদি বর্তমান থাকলেও অনেক সময় তার পূর্বে 'ই' ধ্বনির আগম ঘটে—এটিও অপিনিহিতির উদাহরণ।—সত্য>সইত্ত, অধ্যক্ষ> অইধ্‌ধইক্‌খ, রাক্ষস>রাইক্‌খস, রাক্ষ>রাইশ্ম।

অপিনিহিতির বিশ্লেষণে দেখা যায়, কখনো কখনো এটি মধ্যস্বরাগম, কখনো বা বিপর্যাস বা স্বরবিপর্যয়।

(গ) **অভিশ্রুতি**—মধ্যবাঙলার অপিনিহিত স্বর আধুনিক বাঙলার শিষ্ট ভাষায় লোপ পেলো অথবা অপর স্বরের সহযোগে ভিন্ন স্বরধ্বনিতে পরিণত হলো। —আইজ>আজ, কাইল>কাল, চাইর>চার, সাউধ-এর>সেধের, মাউগ>মাগ, হাটুয়া>হাউট্যা>হেটো।

য-ফলার জন্য যেখানে 'ই' ধ্বনির আগম ঘটে অনেক সময় শিষ্ট বাঙলায় তাদের স্থান পরিবর্তন ঘটে। সত্য—সইত্ত>সত্যি, বাক্য>বাইক্ক>বাক্যি।

এই প্রক্রিয়াটিই 'অভিশ্রুতি'-রূপে পরিচিত। আধুনিক বাঙলার ধ্বনি-পরিবর্তনে এটির বিশেষ ভূমিকা রয়েছে, রাঢ়ী উপভাষাতেই এর প্রভাব প্রায় সীমাবদ্ধ, বঙ্গালী ভাষায় এখনো এটি প্রবেশাধিকার পায়নি, তেমনি সাধুভাষাতেও এর ব্যবহার প্রশংসনীয় নয়।

(ঘ) **স্বরসঙ্গীত**—বাঙলা ভাষার আধুনিক স্তরে স্বরসঙ্গতিই প্রবলতম প্রভাব বিস্তার করেছে। পশ্চিম বাঙলার উপভাষায় এর ফলে প্রচুর ধ্বনিপরিবর্তনের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। স্বরসঙ্গতি সাধারণঃ কতকগুলো ধ্বনিসূত্র-অবলম্বনে সাধিত হয়।

১। অ+ই/উ>ও+ই/উ—অগ্নি>ওগ্নি, কলি>কোলি, বসু>বোসু।

২। অ+ই+অ>ও+ও—করিল>কোরলো, চলিব>চোল্‌বো।

৩। অ+ই+আ>ও+এ—মরিয়া>মোরে, করিয়া>কোরে।

৪। অ+উ+আ>ও+ও—জলুয়া>জোলো, পড়ুয়া>পোড়ো।

৫। আ+ই+আ>এ+এ—মারিয়া>মেরে, খাইয়া>খেয়ে।

৬। আ+উ+আ>এ+ও—সাথুয়া>সেথো, হাটুয়া>হেঁটো (ধুতি)।

৭। ই+অ (ও), আ, এ>এ…—লিখ্‌+অ (ও), আ, এ=লেখো, লেখা, লেখে।

৮। উ+অ, আ, এ>ও+…—বুন্‌+আ, এ=বোনা, বোনে।

৯। এ+অ, আ, এ্>অ্যা+...—দ্যাখ্যো, দ্যাখা, দ্যাখে।

১০। ই+আ>ই+এ—বিদ্যা>বিদ্যে, বিলাত>বিলেত, টীকা>টীকে।

১১। উ+আ>উ+ও—ধুনা>ধুনো, জুতা, জুতো, তুলা>তুলো।

এগুলো ছাড়াও কোন বিশেষ স্বরের সঙ্গে অপর বিশেষ স্বরের যেন গাঁটছড়া বাঁধা থাকে। তাই একটির পরিবর্তন হলে অপরটিরও পরিবর্তন ঘটে।

—'উ'-কারের সঙ্গে 'ই', 'ঈ'-কার, কিন্তু 'ও'-কারের সঙ্গে 'আ'-কার।—ঘোড়া> ঘুড়ী, তুমি>তোমার, খোকা>খুকী, দু'টি>দোতালা।

—'অ্যা'-কারের সঙ্গে 'আ'-কার, কিন্তু 'ও'-কারের সঙ্গে 'ই, ঈ'কার।—দ্যাখা> দেখি, খ্যালা>খেলি, ভ্যাড়া>ভেড়ী, অ্যাকটা>একটি।

যে সকল শব্দে দুয়ের অধিক অক্ষর আছে এবং তাদের শেষ অক্ষরে 'ই' যুক্ত থাকে, তবে মধ্যবর্তী অক্ষরটি 'অ'-যুক্ত হ'লে সেটি 'উ' কারে পরিণত হয়। —নাটক+ইয়া>নাটুকে, শহর+ইয়া>শহুরে; কাঁদুনে, উড়ুনি, বানুরে প্রভৃতি।

উপযুক্ত দৃষ্টান্তগুলি থেকে একটা সাধারণত ভাষাতাত্ত্বিক নিয়মে উপনীত হওয়া যায়। স্বরসঙ্গতির ক্ষেত্রে সাধারণত উচ্চাবস্থ স্বরধ্বনি নিম্নাবস্থ স্বরধ্বনিকে অন্ততঃ একস্তর উপরে তুলে নেয়; কখন কখন নিম্নাবস্থ স্বরধ্বনির প্রভাবেও উচ্চাবস্থ বা মধ্যাবস্থ স্বরধ্বনি একস্তর নেমে আসতে পারে; উপরে যে ১১ প্রকার দৃষ্টান্ত এবং বিশেষ গাঁটছড়া বাঁধার দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা হ'য়েছে এদের সবকয়টি এই ভাষাতাত্ত্বিক নিয়মটি দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায়। আর কয়েকটি দৃষ্টান্ত ঃ বুনিয়াদ> বোনেদ, দীপশলাকা>দেশলাই, বারেন্দা,>বারান্দা, শিয়াল>শেয়াল।

এই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার ঃ উচ্চাবস্থ স্বরধ্বনি—ই, উ; উচ্চমধ্যাবস্থ—এ, ও; নিম্নমধ্যাবস্থ—অ্যা, অ এবং নিম্নাবস্থ আ। এদের মধ্যে প্রথমটি সম্মুখ স্বরধ্বনি ও দ্বিতীয়টি পশ্চাৎ স্বরধ্বনি।

[তিন] স্বরধ্বনির একমুখী পরিবর্তন / বাঙলায় স্বরধ্বনির উদ্ভব

বিভিন্ন বাঙলা শব্দের যে সকল স্বরধ্বনি ব্যবহৃত হয়, সেই স্বরধ্বনিগুলো কিছু কিছু মূল শব্দেও বর্তমান ছিল, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ভিন্ন স্বরধ্বনি রূপান্তরিত হ'য়ে উক্ত স্বরধ্বনিতে পরিণত হয়েছে। বাঙলা শব্দে ব্যবহৃত প্রতিটি স্বরধ্বনি

বিশ্লেষণ করলেই দেখা যাবে বিভিন্ন স্বর কীভাবে একটি স্বরে পরিণত হয়েছে। একেই বলা হ'চ্ছে 'স্বরধ্বনির একমুখী পরিবর্তন'। (পূর্ববর্তী আলোচনায় স্বরের 'বহুমুখী পরিবর্তন' দেখানো হয়েছে।) নিম্নে বাঙলায় প্রতিটি স্বরবর্ণ ধরে তাদের উদ্ভব দেখানো হ'লো।

১. অ—বাঙলা 'অ' (ɔ) ধ্বনি সংস্কৃত বা প্রাকৃত স্তরে বর্তমান ছিল না। সম্ভবতঃ বাঙলা ভাষার আদিস্তরেই এর উদ্ভব ঘটে। সংস্কৃতে ও প্রাকৃতে এর উচ্চারণ ছিল 'হ্রস্ব আ' (α)। প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার প্রায় প্রতিটি স্বরই কোন-না-কোন পর্যায়ে বাঙলা 'অ'-কারে পরিণত হয়েছে। নিম্নে কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হ'লো।

অ>অ—দধি>দহি>দই; কথয়তি>কহে; কদম্ব>কদম।

আ>অ—প্রাকার>পগার, সন্ধ্যা>সাঁঝ, কারবেল্ল>করলা।

ই>অ—বিভীতক>বহেড়া, রাত্রি>রাত, অগ্নি>আগ।

উ>আ—তন্তু>তাঁত, শ্বশ্রূ>সসূসু>সাসু>শাশ (মাসশাশ)।

ঋ>অ—মৃতক>মড়া, বিকৃত>বিকট।

এ>অ—এহিক্ষণ>এখন>অখন, সন্দেহ>সন্দ।

ও>অ—মোদক-কার>ময়রা, বোলে>বলে।

স্বরভক্তির ফলে 'অ'-এর উদ্ভব—স্বপ্ন>স্বপন, চক্র>চকর।

২. আ—সংস্কৃত ও প্রাকৃত 'আ'-কার অনেকক্ষেত্রেই বর্তমান। পাদ>পাঅ>পা, ভ্রাতা>ভাই, চালয়তি>চালে।

অ>আ—অদ্য>অজ্জ>আজ; অকাল>আকাল; অলবণিক>আলুনি। অনল>আনল, চন্দ্র>চন্দ>চাঁদ।

ই>আ—ইক্ষু>আখ।

উদ্বৃত্ত স্বরের আভ্যন্তর সন্ধিজাত—ভাণ্ডাগার>ভাণ্ডাআর>ভাঁড়ার, অন্ধকার>অন্ধআর>আন্ধার>আঁধার।

আদ্যস্বরাগমহেতু—স্পর্ধা>আস্পর্ধা, কুমারী>আকুমারী।

৩. ই, ঈ—সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষার 'ই'-কার বাংলায় অনেক স্থলেই বর্তমান রয়েছে।—ত্রীণি>তিন্নি>তিন, শিরস্থান>শিথান, জিহ্বা>জিভ্।

অ>ই—পতঙ্গ>ফড়িং, মনুষ্য>মিনসে।

ঋ>ই—ঘৃত>ঘি, বৃশ্চিক>বিছা, শৃগাল>শিয়াল, বৃষ্টি>বিষ্টি।

অপিনিহিতির ফলে—সত্য>সইত্ত, ব্রাহ্ম>ব্রাইহ্ম, গাঁতি>গাঁইতি।

স্বরভক্তির ফলে—বর্ষণ>বরিষণ, প্রীতি>পীরিতি।

বিশেষ বিশেষ যুক্তব্যঞ্জনের প্রভাবে—ধন্য>ধান্য, যজ্ঞ>যজ্ঞি, ভোজ্য>ভুজ্জি।

স্বরসঙ্গতির ফলে—বিলাতি>বিলিতি, তেলী>তিলি।

সন্নিকৃষ্ট স্বরদ্বয়ের সংযোজনে—অশীতি>অশীই>আশি।

৪. উ, ঊ—সংস্কৃত ও প্রাকৃত 'উ' বহুস্থলেই বর্তমান রয়েছে।—মধু>মউ, সাধু>সাউ, উৎ-স্থা>উঠ্‌, উৎকুণ>উকুন, ভূমি>ভুঁই।

অ, আ>উ (স্বরসঙ্গতির ফলে)—ক্রন্দনিক>কাঁদুনে, কাঁপন>কাঁপুনি।
ই>উ—হরিদ্রা>হলুদ।

ঋ>উ—বৃদ্ধ>বুড্‌ঢ>বুড়ো, আবৃষ>আউশ।

স্বরসঙ্গতির ফলে—পুষ্করিণী>পুকুর, চোর+ই>চুরি।

অন্তঃস্থ ব থেকে—পরশ্ব>পরশু, স্বর>সুর।

স্বরভক্তির ফলে—সূর্য>সুরুজ, ভ্রূ>ভুরু, পত্র>পত্তুর।

৫. এ—সংস্কৃত ও প্রাকৃতের 'এ'-কার বহুস্থলেই বর্তমান রয়েছে।—একাদশ> এগারো, দেবকুল>দেউল, ছাগলেন>ছাগলেঁ>ছাগলে।

অ>এ—শয্যা>শেজ, নকুল>নউল>নেউল, পঞ্চদশ>পনের।

প্রাকৃত অই>এ—করই>করে, ভণই>ভণে।

আ>এ (স্বরসঙ্গতির ফলে)—হাসিয়া>হাস্যা>হেসে, আসিয়া>এসে, ইচ্ছা> ইচ্ছে, মিছা>মিছে।

ই>এ—দীপবর্তিকা>দেউটি, দীপশলাকা>দেশলাই, তিন্তিড়ি>তেঁতুল।

ইআ>ই (আভ্যন্তর সন্ধিজনিত)—ঘড়িয়াল>ঘড়েল, উত্তরিয়া>উত্তুরে।

উ>এ—নূপুর>নেউর।

ঋ>এ—বৃথা>বের্থা, ঘৃত>ঘেত, তৃষ্ণা>তেন্টা, কৃষ্ণ>কেন্ট।

ঐ>এ—তৈল>তেল্ল>তেল, বৈবাহিক>বেয়াই, গৈরিক>গেরুয়া, বৈদ্য>বেজ।

৬. অ্যা—সংস্কৃতে ও প্রাকৃতে এই ধ্বনিটি বর্তমান ছিল না, এমন কি বাঙলা ভাষার আদিস্তরেও এর সন্ধান পাওয়া যায় না। অন্তমধ্যস্তরে শব্দমধ্যবর্তী '-ইয়া'- স্থলে সর্বপ্রথম 'অ্যা' ব্যবহৃত দেখা যায়।—করিয়াছ>কর্যাছ, ধরিয়া> ধর্যা।

আধুনিক বাঙলায় প্রধানতঃ শব্দের আদিতে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে 'এ'-স্থলে 'অ্যা' ব্যবহৃত হয়।

অনুনাসিক 'অ, অঁ' ও>অ্যা—পেঁচক>প্যাঁচা, বাঁকা>ব্যাঁকা।

'এ'-কারের পর বিশেষ ধ্বনির অবস্থানে—দেখহ>দ্যাখো, বেঙ>ব্যাং।

স্বরসঙ্গতির প্রভাবে পরে 'আ' থাকলে পূর্ববর্তী 'এ' অনেক সময় 'অ্যা'-কারে পরিবর্তিত হয়।—দ্যাখা, খ্যালা, ভ্যাড়া, অ্যাকটা।

ধ্বন্যাত্মক বা অনুকার শব্দের আদ্যক্ষরে অনেক সময় 'অ্যা' হয়।—প্যাটপ্যাট, খ্যাচখ্যাচ, ম্যাড়ম্যাড়ে।

'এ'কারের পর 'ও' বা 'য়' থাকলে 'এ' অনেক সময় 'অ্যা' হয়, কিন্তু 'ই'-জাত 'এ' সাধারণতঃ 'অ্যা' হয় না। দেওয়াল>দ্যায়াল, দেবকলা>দেয়লা>দ্যায়লা ; শ্যাওলা, প্যায়দা, ব্যায়রা। কিন্তু শিয়াল>শেয়াল, মিল্>মেলা (মিশা)—এগুলোতে পরিবর্তন হয়নি।

দুই বা ততোধিক অক্ষরময় তদ্ভব শব্দের আদ্যক্ষরে 'এ' থাকলে চলিত ভাষায় অনেক সময় 'অ্যা' উচ্চারিত হয়।—এক>অ্যাক, তখন>ত্যাখন, যেমন>য্যামন।

তৎসম-শব্দের 'এ'-কার কখনও 'অ্যা' হয় না (অন্ততঃ হওয়া উচিত নয়)।—এবং, কেবল, একস্বর (দুটিকে পৃথক্‌ভাবে উচ্চারণ করলে 'অ্যাক্ স্বর' হতে পারে, এখানে 'অ্যাক' অর্ধতৎসম শব্দ)।

পূর্ববঙ্গের উপভাষায় আদ্যক্ষরে স্থিত 'এ'-কারের উচ্চারণ কারো কারো মতে 'অ্যা' —কিন্তু বস্তুতঃ এই অভিমত ভ্রমাত্মক। পূর্ববঙ্গে 'এ' ধ্বনিটি 'অ্যা'র মতো বিবৃত নয়, বরং একে বলা চলে 'অর্ধবিবৃত'। 'এ'-কার (e) এবং 'অ্যা'-কারের (æ) মাঝামাঝি (ɛ) স্তরে এর অবস্থান—লেখায় দেখানো যায় না।

৭. **ঐ**—সংস্কৃতে এই দ্বিস্বর ধ্বনিটির উচ্চারণ ছিল 'আই', কিন্তু বাংলায় এর উচ্চারণ 'অই'/'ওই'। প্রাকৃতে 'ঐ' পরিত্যক্ত হওয়ায় সংস্কৃত থেকে প্রাকৃত মাধ্যমে আমরা 'ঐ' পাইনি। বাঙলায় 'অ' বা 'ও' কারের পর উদ্বৃত্ত 'ই'-কারের যোগে নোতুনভাবে ঐ-কারের সৃষ্টি হয়েছে।—দধি>দহি>দই, দৈ ; বহি>বই, বৈ, কবরী >কঅই>কই, কৈ ; নদীঘাটী>নঈহাটি>নৈহাটি।

ছন্দের প্রয়োজন বাঙলায় 'ঐ' দ্বিস্বর ধ্বনিটি বিশ্লিষ্ট হয়ে 'অই' দুই স্বরধ্বনি-রূপে উচ্চারিত হয়।—'তোমা বৈ (—বই) আর বাঁচিনে'।

৮. ও—সংস্কৃত প্রাকৃত 'ও' অনেক সময় বাঙলায় বর্তমান রয়েছে।—গোরূপ> গোরূঅ>গোরূ, মোহ>মো, জ্যোৎস্না>জোনাকি।

অউ>ও (আভ্যন্তর সন্ধির ফলে)—শকুল>শউল>শোল, মুকুল>মউল> মোল, বোল।

অ>ও—স্বরসঙ্গতির ফলে বাঙলায় 'অ'-কারের পর 'ই, উ, য-ফলা, ক্ষ' প্রভৃতি থাকলে আদ্যক্ষরস্থ 'অ' অনেক সময় ক্ষীণ 'ও'কারে পরিণত হয়, অনেক সময় তা' লেখায় দেখানো হয় না।—অগ্নি>ওগ্নি, বন্ধু>বোন্ধু, সত্য>শোত্ত।

বাঙলায় পদান্ত 'অ' যদি লুপ্ত না হয়, তবে অনেক স্থলেই 'ও'-কারবৎ উচ্চারিত হয়।—ছিল>ছিলো, মত>মতো।

'অ'-কারের পর 'হ' থাকলে কখন কখন 'ও' হয়।—মহিষ>মোশ্, বহিন্>বোন্, কহ>কও।

পরবর্তী ওষ্ঠ্যধ্বনির প্রভাবে অনেক সময় 'অ'-কার 'ও' হয়।—ভ্রমরক>ভোমরা, প্রভাতিল>পোহাইল।

ঔ>ও—ঔষধ>ওষুদ, গৌর>গোরা, চৌর>চোর।

৯. ঔ—সংস্কৃতের 'ঔ' প্রাকৃতে বর্জিত হওয়ায় তজ্জাত কোন 'ঔ' বাঙলায় আসেনি বাঙলায় 'অ' বা 'ও'-কারের পরবর্তী উদ্বৃত্তস্বর 'উ' মিলিত হ'য়ে নোতুনভাবে 'ঔ' (=অউ, ওউ) সৃষ্টি করেছে। সংস্কৃতে এর উচ্চারণ ছিল 'আউ'।—বধূ>বহু> বউ, বৌ ; জতুগৃহ>জউঘর>জৌহর ; শকুল>শউল>শৌল।

ছন্দের অনুরোধে অনেক সময় 'ঔ' বিশ্লিষ্টভাবে উচ্চারিত হয়।—'গউড় দেশেতে পহুঁছিল তারা'।

[চার] বাঙলা ব্যঞ্জনধ্বনির উদ্ভব

সাধারণতঃ পদের আদি একক ব্যঞ্জনধ্বনি সংস্কৃত থেকে প্রাকৃত মাধ্যমে বাঙলায় অবিকৃতভাবে এসেছে। সংস্কৃতের আদি যুক্ত ব্যঞ্জন প্রাকৃত স্তরে বিশ্লিষ্ট বা একক ব্যঞ্জনে পরিণত হয়েছে এবং ঐভাবেই বাঙলায় গৃহীত হয়েছে। স্বরমধ্যস্থ অল্পপ্রাণ ব্যঞ্জন প্রাকৃত স্তরেই লুপ্ত হয়েছিল, কাজেই বাঙলায় আর আসেনি ; মহাপ্রাণ ব্যঞ্জন প্রাকৃত স্তরে 'হ' হয়েছিল, প্রাচীন বাঙলায়ও অনেক সময় তাই ছিল, আধুনিক বাঙলায় সেটাও লোপ পেয়েছে। স্বরমধ্যস্থ যুক্ত ব্যঞ্জন প্রাকৃত স্তরে যুগ্মরূপ ধারণ করেছিল, বাঙলায় সেগুলো একক ব্যঞ্জনে পরিণত হয়ে এখনও বর্তমান রয়েছে।

এই সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রমও অনেক রয়েছে। সংস্কৃত এবং প্রাকৃত স্তরের কোন ব্যঞ্জন বাঙলায় ভিন্ন ব্যঞ্জনে পরিণত হয়েছে, এরূপ দৃষ্টান্তও যথেষ্ট। কোন্ কোন্ সূত্রে বাঙলায় কোন্ কোন্ ব্যঞ্জনধ্বনির সৃষ্টি হয়েছে, বর্ণানুক্রমিকভাবে নিম্নে তা' দেখানো হলো।

১. ক—সংস্কৃতের আদি একক 'ক' বাঙলায় অবিকৃত রয়েছে।—কদলী>কলা, কিম্>কি, কৃষ্ণ>কানু।

আদি যুক্ত ব্যঞ্জনস্থিত 'ক' বাঙলায় একক 'ক'য়ে পরিণত হয়েছে।—স্কন্ধ>কাঁধ, ক্রীণাতি>কিনই>কিনে, ক্বাথ>কাই।

স্বরমধ্যস্থ ব্যঞ্জনযুক্ত 'ক' প্রাকৃতে যুগ্ম 'ক্ক' হ'য়ে বাঙলায় একক 'ক'-য়ে পরিণত হয়েছে।—বল্কল>বক্কল>বাকল; শুক্র>শুকে (তারা); চতুষ্কিকা>চউক্কিআ> চউকি, চৌকি; মর্কট>মক্কড>মাকড়; মাণিক্য>মাণিক্ক>মানিক।

অপর ব্যঞ্জনধ্বনি ক্বচিৎ বাঙ্লায় 'ক' হয়েছে।—শৃঙ্খল>শিকল, গুঞ্জ >কুঁচ।

অপর বর্ণের প্রভাবে চল্‌তি বাঙলায় অনেক সময় 'গ'-স্থানে 'ক' শোনা যায়।—রাগ করেছো>রাক্ করেছো।

আদিস্বরে প্রবল শ্বাসাঘাতের দরুণ পরবর্তী 'খ' কখন কখন উচ্চারণে 'ক' হয়।—রোখ>রোক্, দ্যাখোনি>দ্যাকোনি।

ঙ>ক—শিঙ্খানিক>শিঙনি>শিক্‌নি।

পদান্তে স্বার্থিক প্রত্যয়স্থানীয় 'ক' বাঙ্‌লায় নূতন সৃষ্টি।—দেউক, দিক, যাক্, কহিবেক, চলিলেক, বৈঠক।

২. খ—পদের আদি 'খ' বাঙ্লায় অপরিবর্তিত।—খদির>খয়ের, খাদ্য>খাজা, খড্গ>খাড়া।

পদের অন্তর্গত 'ক্ষ' প্রাকৃত স্তরেই 'খ'/'ছ' হয়েছিল, বাঙলায়ও তাই আছে।—ক্ষেত্র>খেত, ক্ষুদ্র>খুদ, অক্ষি>আঁখি, ক্ষণ>খন।

ষ্ক, স্ক, স্ক্র—প্রভৃতি 'ক' যুক্তব্যঞ্জন অনেক সময় 'খ' হয়েছে।—শুষ্ক>শুক্‌খ শুখো, স্কম্ভ>খম্ভ>খাম, ক্রীড়াতি>খেলই>খেলে।

খ-যুক্ত ব্যঞ্জন প্রাকৃতে যুগ্ম হ'য়ে বাঙলায় একক 'খ'-য়ে পরিণত হয়েছে।—শঙ্খ>শাঁখ, দুঃখ>দুখ।

বাঙলার বাইরে 'ষ' ধ্বনিটি বহুস্থলেই 'খ' হ'য়েছে এবং এরূপ কিছু শব্দ এখনও বাঙলাতেও ব্যবহৃত হ'চ্ছে,—শিষ্য>শিখ, ভাষা>ভাখা (ব্রজভাখা), ষড়্জ>খরজ।

'হ'-এর প্রভাবে মহাপ্রাণিত হ'য়ে এবং কখন অকারণেও ক্বচিৎ কোন 'ক' 'খ'-য়ে পরিণত হয়েছে।—কহোল>খোল, একহো>এখো, কিল>খিল (অপর বর্ণের প্রভাব ছাড়াই), করতাল>খত্তাল (ঐ)।

৩. গ—সংস্কৃতের আদি 'গ' বাঙলায় অবিকৃত রয়েছে।—গোরূপ>গোরূঅ>গোরু, গ্রাম>গাঁ, গণ্ড>গল্ল>গাল।

পদমধ্যস্থ ব্যঞ্জনযুক্ত 'গ' প্রাকৃতে যুগ্ম হ'য়ে বাঙলায় একক 'গ'-তে পরিণত হয়েছে।—অগ্নি>অগ্গি>আগি, আগ; ফল্গু>ফগ্গু>ফাগু>ফাগ; সৌভাগ্য>সোহগ্গ>সোহাগ।

সংস্কৃত 'ক' বাঙলায় কখন কখন 'গ' হয়েছে।—প্রাকার>পগার। পরবর্তী ধ্বনির প্রভাবেও বাঙলা 'ক' অনেক সময় 'গ'-বৎ উচ্চারিত হয়।—কাকবক>কাগাবগা, শাকভাত>শাগভাত, উপকার>উব্গার।

'ঘ' কখন কখন 'গ' হয়।, শীঘ্র>শিগ্গির। আদিস্বরে শ্বাসাঘাতের ফলেও 'ঘ' কখন কখন 'গ'-রূপে উচ্চারিত হয়।—বাঘ>বাগ। বিদেশি শব্দেও ও-রকম হ'তে পারে।—তাকদ>তাগদ।

'জ্ঞ'-এর বাঙলা উচ্চারণে 'গ' এসে গেছে।—জ্ঞান>গ্যাঁন, যজ্ঞ>জগ্গোঁ।

৪. ঘ—আদি 'ঘ' অনেক স্থলে বর্তমান রয়েছে।—ঘোটক>ঘোড়া, ঘর্ম>ঘাম, ঘৃত>ঘি, ঘাত>ঘা।

পদমধ্যস্থ ব্যঞ্জন-যুক্ত 'গ' প্রাকৃতে যুগ্ম ব্যঞ্জন 'গ্ঘ'-এ রূপান্তরিত হয়ে 'ঘ' হয়েছে।—ব্যাঘ্র>বগ্ঘ>বাঘ, দীর্ঘিকা>দিগ্ঘিআ>দিঘি।

পরবর্তী মহাপ্রাণধ্বনির প্রভাবে 'গ' কখন কখন 'ঘ' হয়েছে।—গৃহ>গরূহ>ঘর; গোবিষ্ঠা>গইঠা>ঘুঁটে ('ঘুঁটে' শব্দটি 'ঘৃষ্টিকা' থেকেও আসতে পারে)।

৫. ঙ—পদের আদিতে কোথাও 'ঙ'-র ব্যবহার নেই। বাঙলার 'ং'-এর বিকল্প রূপে পদের মধ্যে বা অন্ত্যে কখনো কখনো 'ঙ' ব্যবহৃত হয়। ব্যাং—ব্যাঙ, বাংলা—বাঙলা।

'-ক' '-খ'-এর সঙ্গে যুক্ত 'ঙ' বাঙলায় পূর্ব স্বরকে সানুনাসিক করে নিজে লুপ্ত হয়েছে।—অঙ্ক>আঁক, শঙ্খ>শাঁখ, কঙ্কণ>কাঁকন।

'-গ,-ঘ'-এর সঙ্গে যুক্ত 'ঙ' কখনো পরবর্তী ধ্বনির বিলোপসাধন করেছে, কখনো নিজে সরে গিয়ে 'ং'-কে স্থান করে দিয়েছে, কখনো কখনো বা পূর্ববর্তী স্বরকে সানুনাসিক করে নিজে লোপ পেয়েছে।—সঙ্গ>সাঙ্গ>সাঙ্, সাং, ; রঙ্গ>রঙ্, রং ; গঙ্গা>গাঙ্, গাং ; ব্যঙ্গ>বেঙ্গ>ব্যাঙ্, ব্যাং ; শিংঘানিক>শিংঘানিঅ>শিঙ্নি, শিংনি ; সাঙ্গা>সাঁগা।

৬. চ—পদের আদি ও মধ্যস্থিত 'চ' বাঙলায় অনেক ক্ষেত্রে অবিকৃত রয়েছে।—চন্দ্র>চন্দ>চাঁদ ; চিহ্ন>চিন্, পেচক>পেচঅ<প্যাঁচা।

ব্যঞ্জন-যুক্ত 'চ' বাঙলায় একক 'চ' হ'য়েছে।—উচ্চক>উঁচা, বঞ্চতি>বাঁচে, রুচ্যতে>রোচে, সিঞ্চতি>সিঁচে, পঞ্চ>পাঁচ।

দন্ত্যব্যঞ্জন তালব্যীভূত হয়ে 'চ'-এ পরিণত হয়েছে।—আদিত্য>আইচ্চ>আইচ ; সত্যক>সচ্চঅ>সাচা ; তন্ডুল>চাউল।

'ক' ক্বচিৎ 'চ'এ পরিণত হ'য়েছে।—কিরাততিক্ত>চিরতা।

'জ' অঘোষীভূত হয়ে 'চ' হয়েছে।—বীজ>বীচি, প্রাজন>পাচন (বাড়ি), গুঞ্জ>কুঁচ (ফল)।

সমীকরণের ফলে বাঙলায় 'ত' অনেক সকয় 'চ' হয়েছে।—যাইতেছি>যাচ্ছি, করিতেছে>করচে>কচ্চে।

আদিস্বরে শ্বাসাঘাতের ফলে 'ছ' কখন কখন 'চ' হয়। গাছ>গাচ, মাছ>মা'চ।

৭. ছ—পদের আদি 'ছ' বাঙলায় বর্তমান রয়েছে।—ছত্রক>ছত্তঅ>ছাতা ; ছেদনিকা>ছেঅনিআ>ছেনী ; ছন্দ>ছাঁদ।

পদের আদিস্থিত 'শ, ষ, স' বাঙলায় কখন কখন 'ছ' হয়েছে। শক্তুক>সত্তুঅ> ছাতু, শাব>ছা, ষট্>ছয়, সূচি>ছুঁচ, সূত্রধর>ছুতার, সম্মুখ>ছামু।

পদের আদিস্থিত ও মধ্যবর্তী 'ক্ষ' অনেক সময় 'ছ' হয়েছে।—ক্ষুরিকা>ছুরিআ >ছুরি, কক্ষ>কচ্ছ>কাছ, ক্ষার>ছার, মক্ষিকা>মাছি।

সংস্কৃতের বিভিন্ন যুক্ত ব্যঞ্জন প্রাকৃতে 'চ্ছ'রূপ লাভ করে এবং তা' থেকে বাঙলায় 'ছ'-এ পরিণত হয়।—পৃচ্ছতি>পুচ্ছই>পুছে ; মৎস্য>মচ্ছ>মাছ ; মিথ্যা> মিচ্ছা>মিছা ; রথ্যা>রচ্ছা>লাচ>নাচ ; গুপ্স>গুচ্ছ>গোছা, পশ্চা>পচ্ছা >পাছ ; কিঞ্চ>কিছু ; কশ্যপ>কচ্ছপ।

কোন কোন বিদেশি শব্দস্থ 'স' বাঙলায় 'ছ' হয়েছে।—মুসলমান>মুছলমান, পসন্দ>পছন্দ।

৮. জ—পদের আদিস্থিত 'জ' অনেক সময় বাঙলায় বর্তমান রয়েছে।—জামাতৃ>জামাই, ভ্রাতৃজায়া>ভাউজ>ভাজ, জ্যেষ্ঠ>জেঠা।

পদের আদিতে 'য' বাঙলায় সর্বত্র 'জ'-রূপে উচ্চারিত হয়। কখন কখন লিখিত-ভাবে 'জ' হয়, কিন্তু লিখিতভাবে না হ'লেও উচ্চারণে সর্বত্রই 'জ'।—যন্ত্র>জাঁতি, যাঁতি, যুঁই>জুঁই, যায়>(জায়), যন্ত্র>(জন্ত্র)।

বহু যুক্ত-ব্যঞ্জন প্রাকৃত স্তরে 'জ্জ' হ'য়ে বাঙলায় 'জ' হয়েছে।—লজ্জা>লাজ, কার্য>কজ্জ>কাজ; অদ্য>অজ্জ>আজ, দ্যুতক>জুঅঅ>জুয়া; বৈদ্য>বেজ; শয্যা>সেজ, শল্যকরূপ>সজারু, গর্জন>গাজন, কুব্জ>কুঁজ, দ্বিতীয়>দুঅজ্জ> দুঅজ, দোজ (বর)।

পদের আদিস্বরে শ্বাসাঘাতের ফলে 'ঝ' অনেক স্থলে 'জ' হয়েছে। মধ্য>মজ্ঝ >মাঝ>মেজ, সন্ধ্যা>সাঁঝ>সাঁজ।

'হ্য' বাঙলা উচ্চারণে 'জ্ঝ' হয়। বাহ্য>বাজ্ঝো, সহ্য>সজ্ঝো।

৯. ঝ—আদি 'ঝ' বাঙলায় বর্তমান রয়েছে।—ঝঞ্ঝা>ঝাঁজ, ঝটিকা>ঝড়।

'জ, ক্ষ' এবং অপর কোন কোন ধ্বনি বাঙলায় 'ঝ' হয়েছে। জুস্ট>ঝুট; জুর্ণ >ঝুনা; ক্ষাম>ঝামা; দুহিতা>ধীতা>ঝিআ>ঝি।

পদমধ্যস্থ 'ধ্য' তালব্যীভূত হ'য়ে বাঙলায় 'ঝ' হয়েছে।—মধ্য>মজ্ঝ>মাঝ, উপাধ্যায়>উবজ্ঝই>ওঝা>ঝা, সন্ধ্যা>সঞ্ঝা>সাঁঝ।

দেশি ও ধ্বন্যাত্মক শব্দে বাঙলায় প্রচুর 'ঝ' ব্যবহৃত হয়।—ঝুপ্ঝাপ, ঝমঝম, ঝামেলা, ঝুড়ি।

১০. ঞ—এককভাবে 'ঞ'-র কোন ব্যবহার বাঙলায় নেই, সাধারণতঃ 'চ'-বর্গের সঙ্গে যুক্তভাবে (আগে বা পরে) ব্যবহৃত হয়—বাঙলায় এর উচ্চারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে 'ন'।—চঞ্চল=চন্চল, বাঞ্ছা=বান্ছা, যাচ্ঞা=যাচ্না। 'জ্ঞ'='জ্+ঞ'—এইক্ষেত্রে উভয় ধ্বনিই বাঙলায় সম্পূর্ণ পরিবর্তিত—'গ্‌গঁ', গ্যঁ'। প্রাচীন বাঙলায় ক্বচিৎ একক 'ঞ' ব্যবহৃত হ'তো অনেকটা মূল উচ্চারণ অব্যাহত রেখে—খাঞা, গোসাঞি। আধুনিক বাঙলায় ক্বচিৎ 'মিঞা' ব্যবহৃত হয়।

১১. ট—সংস্কৃত, প্রাকৃত ও দেশি 'ট' বাঙলায় আদিতে অনেক সময় বর্তমান আছে।—টঙ্ক>টাকা, টিট্টিভ>টিটি।

স্বতোমূর্ধন্যীভবনের ফলে 'ত' বহুক্ষেত্রেই 'ট' হয়েছে।—তঙ্কা>টঙ্কা>টাকা, তির্যক>টেরা, তুঙ্গ>টুঙ্গি, ত্রোটি>টুঁটি, তান>টান, তালু>টাকরা, তাল>টাল, বিকৃত>বিকট।

দেশি ও ধ্বন্যাত্মক শব্দে বাঙলায় 'ট'-এর বহুল ব্যবহার।—টিট্‌কারী, টলমল, টঙ্কার, টক্ক, টস্‌টস, টিকটিক।

পদের মধ্যে ও অন্ত্যে বিভিন্ন যুক্তব্যঞ্জন 'ট্ট' রূপ লাভ করে এবং বাঙলায় 'ট' হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মূর্ধন্যীভবনের ফলেই এরূপ ঘটেছে।—ভট্ট>ভাট, খট্বা>খাট, কর্তরিকা>কাটারি, দীপবর্তিকা>দিঅবট্টিআ>দেউটি, স্নেহবৃত্ত>নেহবট্ট>নেওটা, ইষ্টক>ইট্টঅ>ইট, উষ্ট্র>উট্‌ঠ>উট, বৃন্ত>বোটা, কণ্টকীফল>কাটাল।

আদিস্বরে শ্বাসাঘাতের ফলে 'ঠ' অনেক সময় 'ট' হয়।—পাটকাঠি>প্যাকাটি, অঙ্গুষ্ঠিকা>আঙ্গুঠি>আংটি।

'ষ্ণ' বাঙলায় 'ন্ট' হয়েছে।—তৃষ্ণা>তেন্টা, কৃষ্ণ>কেন্ট।

১২. ঠ—দেশি ও ধ্বন্যাত্মক শব্দের আদি 'ঠ' বর্তমান রয়েছে।—ঠাকুর, ঠমক, ঠকঠক, ঠ্যাঙ্গা, ঠুলি।

'স্ত, স্থ' অনেক সময় মূর্ধন্যীভূত 'ঠ'-এ পরিণত হ'য়েছে।—স্থানিক>ঠাঁই, অস্থি>আঁঠি, উৎ-স্থাপন>উঠান, স্তব্ধ>ঠড্‌ঢ>ঠাণ্ডা।

কিছু কিছু যুক্তব্যঞ্জন প্রাকৃতে 'ট্‌ঠ বা 'ট' হ'য়ে বাঙলায় 'ঠ' হয়।—চতুর্থ>চউট্‌ঠ>চোঠা, মিষ্ট>মিঠা, যষ্টি>লাঠি, জ্যেষ্ঠ>জেঠা, গ্রন্থি>গাঁঠি, মন্থক>মাঠা।

'ট' বা 'ত' কাচিৎ 'ঠ' হয়।—তুণ্ড>টুণ্ড>ঠোঁট (শব্দটি 'ওষ্ঠ'-শব্দ থেকেও হ'তে পারে।—ওষ্ঠ>ওঠ্‌>ঠোঁট); টেন্ট>ঠ্যাঁটা।

১৩. ড/ড়—সংস্কৃত ও দেশি 'ড' আদিতে বর্তমান রয়েছে।—ডিম্ব>ডিম, ডিঙ্গি, ডাব।

আদি 'দ' মূর্ধন্যীভূত হ'য়ে 'ড' হয়েছে।—দক্ষিণ>ডাহিন, দারিত>ডাইল, দংশক>ডাঁশা। মধ্যে উদুম্বর>ডুমুর।

পদমধ্যবর্তী 'ট' এবং মূর্ধন্যীভূত 'ত' 'ড/ড়'-কারে পরিণত হয়েছে।—পততি>পড়ই>পড়ে, মৃতক>মড়া, আম্রাতক>অম্বাডঅ>অম্বাডা>আমড়া, পেটক>পেড়া, কর্কটক>কক্কড়অ>কাঁকড়া, বিকৃত>বিকট>বেয়াড়া, কুটির>কুড়ে।

পদমধ্যবর্তী ড-যুক্ত ব্যঞ্জন যুগ্ম 'ড্ড' অথবা 'ন্ড' হ'য়ে পরে বাঙলায় 'ড়' হয়েছে।—জাড্য>জাড়, ভাণ্ডাগার>ভাঁড়ার, কপর্দক>কড়া, সংদংশিকা+সন্ডংসিআ >সাঁড়াশি, ক্ষুদ্র>খুড়ো।

বহু অজ্ঞাতমূল ও দেশি শব্দে 'ড/ড়' পাওয়া যায়। খড়, খড়ি, চোয়াড়, আড্ডা, হাড়।

বাঙলায় পদের আদিতে কখনও 'ড়' হয় না, সর্বত্র 'ড'; পদের মধ্যে সর্বদাই 'ড়', কখনও 'ড' হয় না।—ডুমুর—আড়ম্বর। তবে বিদেশি শব্দে ও যুক্তবর্ণে পদের মধ্যেও 'ড' হ'তে পারে।—সোডা, রড্, আড্ডা।

১৪ ঢ/ঢ়—শব্দের আদিতে দেশি শব্দে 'ঢ' বর্তমান আছে।—ঢাক, ঢোল, ঢেড়স, ঢেউ, ঢং।

ক্বচিৎ পদের আদিস্থিত 'দ/ধ' মূর্ধন্যীভূত হয়েছে।—ধৃষ্ট>ঢীট, ধারয়তি>ঢালে, দুন্দুভি/ডুণ্ডুভ>ঢোঁড়া।

পদের মধ্যে 'ঢ'-এর উচ্চারণ সর্বত্র 'ঢ়'। তবে আধুনিক বাঙলায় তৎসম শব্দ ছাড়া কোথাও 'ঢ়'-এর উচ্চারণ নেই, সর্বত্র মহাপ্রাণত্ব বিসর্জন দিয়ে 'ড়' হয়েছে।—বৃদ্ধক>বুড্ঢা>বুঢ়া>বুড়ো, দংষ্ট্রা>দঢা>দাঁড়া, দৃঢ়>দড়।

১৫. ণ—বাঙলায় ধ্বনিটির উচ্চারণ বর্তমানে প্রায় নেই, সর্বত্র 'ন'। যুক্ত ব্যঞ্জনের ক্ষেত্রে হয় পূর্বস্বরকে সানুনাসিক করে নিজে লোপ পেয়েছে, নতুবা 'ন'-এ পরিণত হয়েছে।—কণ্টক>কাঁটা, দণ্ড>দাঁড়।

'র্'-এর পরে অথবা 'ট' বর্গের আগে যুক্ত অবস্থায় 'ণ'-র প্রাচীন উচ্চারণ (ড়ঁ) কিছুটা বজায় রয়েছে।—আর্ না, অনেক সহ্য করেছি, এবার কানটি ধরে নিয়ে আস্‌বো।'

১৬. ত—পদের আদিস্থিত 'ত' (যুক্ত অথবা একক) বাঙলায় 'ত'-রূপে বর্তমান।—তন্ত্র>তন্ত>তাঁত; ত্রীণি>তিন্নি>তিন; তাপ>তা, ত্রোটয়তি> তোড়ে।

'ত'-যুক্ত ব্যঞ্জন প্রাকৃতে সমীভূত হ'য়ে বাঙলায় 'ত' হয়েছে।—বর্তিকা>বত্তিআ >বাতি, শক্তু>ছাতু, নপ্তৃক>নাতি, দন্ত>দাঁত, যন্ত্র>জাঁতি, করপত্র>করাত, ভিত্তি>ভিত।

দ>ত—ছাদ>ছাত।

'স্ত' পদের আদিতে ও মধ্যে 'ত' হয়।—স্তবক>তবক, হস্ত>হত্থ>হাত।

১৭. থ—বাঙলায় আদি 'থ' এসেছে 'স্ত, স্থ' এবং ধ্বন্যাত্মক শব্দ থেকে।—স্তর>থর, স্তম্ভ>থম্ভ>থাম, স্থির>থির, স্থানক>থানা, থম্থমে, থিক্থিকে।

'স্ত, স্থ, ত্থ, থ, ত্র' থেকে বাঙলার পদমধ্যবর্তী 'থ' এসেছে।—মস্তক>মাথা, পুস্তিকা>পুথি, অবস্থান্তর>আথান্তর, কপিত্থ>কয়েথ (বেল), সার্থ>সত্থ>সাথ, কুত্র>কোথা।

পদ্যমধ্যস্থ 'ন্ত' বাঙলায় 'থ' হয়েছে।—সীমন্ত>সঁীথি, প্রান্তর+পাথার; ভণন্তি>ভণথি (প্রাচীন বাঙ্লা)।

১৮. দ—পদের আদিস্থিত 'দ' (একক বা যুক্ত) থেকে বাঙলায় 'দ' হয়।—দর্প>দাপট, দণ্ড>দাঁড়, দ্বৌ>দুই, দ্বার>দুয়ার, দ্রম্ম>দাম, দ্রোণ>দোনা।

পদমধ্যে 'দ'-যুক্ত ব্যঞ্জন সমীভূত (দ্দ) হ'য়ে বাঙলায় একক 'দ'-য়ে পরিণত হয়েছে।—ক্ষুদ্র>খুদ্দ>খুদ, আর্দ্রক>আদা, চতুর্দশ>চৌদ্দ, চন্দ্র>চাঁদ, ছন্দ> ছাঁদ।

কোন কোন ক্ষেত্রে 'দ'-এর আগম ঘটে।—বানর>বান্দর>বাঁদর; জেনারেল> জাঁদরেল।

'ধ' কখন কখন 'দ'-য়ে পরিণত হয়।—ধাত্রী>ধাই>দাই; অর্ধ>আধ>আদ; দুধ>দুদ (আদিতে শ্বাসাঘাতের ফলে)।

১৯. ধ—আদি 'ধ' বাঙলায় বর্তমান রয়েছে।—ধবল>ধলা, ধূম>ধোঁয়া, ধৌতি>ধুতি, ধাবন>ধোওয়া।

পদমধ্যস্থ ধ-যুক্ত ব্যঞ্জন সমীভূত (দ্ধ) হ'য়ে বাঙলায় 'ধ'-য়ে পরিণত হয়েছে। শ্রদ্ধা>সদ্ধা>সাধ, অর্ধ>অদ্ধ>আধ, অন্ধকার>আঁধার, দুগ্ধ>দুধ, উদ্ধার>উধার >ধার।

কিছু কিছু দেশি শব্দে 'ধ' রয়েছে।—ধাঙ্গড়, ধিঙ্গি, ধাড়ি।

২০. ন—পদের আদি 'ন' এবং মধ্যবর্তী 'ন' ও 'ণ'-র উচ্চারণ বাঙ্লায় 'ন'।—নবতন>নউতন>নোতুন, কান>কানা, নপ্তৃক>নাতি, ব্রাহ্মণ>বামুন।

ক্বচিৎ আদি 'জ্ঞ' এবং 'স্ন' বাঙ্লায় 'ন' হয়েছে।—জ্ঞাতিগৃহ>নাইহর, স্নান> সিনান>নাওয়া, স্নাপিত>নাপিত।

পদমধ্যবর্তী ন-যুক্ত ব্যঞ্জন সমীভূত হ'য়ে (ন্ন) ক্রমে বাঙলায় 'ন'-রূপ লাভ

করেছে।—চিহ্ন>চিন্, চূর্ণ>চুন, জ্যোৎস্না>জোনাকি, খণ্ড>খান, কৃষ্ণ>কান, বন্যা>বান, সংজ্ঞা>সন্না>সান, অন্নাদ্য>আনাজ।

'ল' কখন কখন 'ন'-য়ে পরিণত হয়েছে।—লবণ>নুন, লোহা>নোয়া, রথ্যা> লচ্ছা>লাছ>নাছ।

২১. প—পদের আদিস্থিত একক ও সংযুক্ত 'প' বাঙলায় বর্তমান রয়েছে।—পুত্র>পুত্ত>পুত, পো, প্রীতি>পিরিত, প্রবিশতি>পইসই>পশে, স্পষ্ট>পষ্ট, পিপীলিকা>পিঁপড়ে।

পদমধ্যস্থ প-যুক্ত ব্যঞ্জন প্রাকৃতে সমীভূত (প্প) হ'য়ে বাঙলায় একক 'প'-য়ে পরিণত হ'য়েছে। চম্পক>চাঁপা, উৎপদ্যতে>উপ্পজ্জই>উপজে, সর্প>সপ্প>সাপ, বাষ্প>বপ্ফ>ভাপ, রূপ্যক>রূপ্পঅ>রূপা, ছপ্পর>ছপ্পর>ছাপর, আত্মন্> অপ্পা>আপ (-ন)।

অঘোষীভূত 'ব' কখন কখন 'প'-য়ে পরিণত হয়।—পর্পটিকা>পব্বডি>পাবড়ি, পাপড়ি, সব্‌পেয়েছি—সপ্পেয়েছি।

বিদেশি শব্দের 'ফ' বাঙলায় কখন কখন 'প' হয়।—অফিস>আপিস., রফ্‌তানি >রপ্তানি।

২২. ফ—আদি 'ফ' বা 'স্ফ' বাঙলায় 'ফ' হয়েছে।—ফল্গু>ফগ্গু>ফাগু> ফাগ, ফুল্ল>ফুল; স্ফোটক>ফোডঅ>ফোড়া, স্ফটিক>ফটিক।

আদি 'প' কখন কখন 'ফ' য়ে রূপান্তরিত হ'য়েছে। এই ক্ষেত্রে অপর ধ্বনির প্রভাব অনেক সময় সহায়তা ক'রে থাকে।—প্রেরয়তি> পেল্লই>পেলে>ফেলে, পাশ>ফাঁস।

পদমধ্যস্থ '-স্ফ' পূর্ববর্তী স্বরধ্বনিকে কখন কখন সানুনাসিক করে দিয়ে 'ফ'-য়ে রূপান্তরিত হয়।—লম্ফ>লাফ, গুম্ফ>গোঁফ।

ধ্বন্যাত্মক শব্দে 'ফ' আছে।—ফিস্‌ফিস্, ফ্যালফ্যাল।

২৩. ব—বাঙলায় অন্তঃস্থ 'ব' এবং বর্গীয় 'ব'-এর বিভেদ প্রায় লুপ্ত। বাঙলায় যে সমস্ত ক্ষেত্রে 'ব'-এর উচ্চারণ আংশিক বর্তমান আছে সেখানে 'ও', 'ওয়া' প্রভৃতি ভিন্ন বর্ণের সাহায্যে তা' প্রকাশ করা হয়। খাবার>খাওয়ার, স্বামী>সোয়ামি।

পদের আদি বর্গীয় ব এবং অন্তঃস্থ ব (একক বা যুক্ত অবস্থায়) বাঙলায় একক বর্গীয় 'ব'-এ পরিণত হয়েছে।—বধূ>বহু>বউ, বন্যা>বান, বুধ্যতে>বুজ্‌ঝএ> বুঝে, ব্রাহ্মণ>বম্ভন>বামুন, ব্যাঘ্র>বগ্‌ঘ>বাঘ।

সংখ্যাবাচক 'দ্বা' বাঙলায় শুধু 'ব'-এ পর্যবসিত হয়েছে। দ্বাদশ>দ্বাদস> বারহ>বার, দ্বাত্রিংশৎ>বত্রিশ, দ্বিচত্বারিংশ>বিয়াল্লিশ।

পদমধ্যস্থ 'ব'-যুক্ত ব্যঞ্জন যুগ্ম হ'য়ে বাঙলায় একক 'ব' হয়েছে।—সর্ব>সব্ব> সব, কর্তব্য>কারঅব্ব>করিব, নিম্বুক>নেবু।

পদমধ্যস্থ 'ম্র' কখন কখন 'ব' হয়েছে।—আম্র>আম্ব>আঁব, তাম্রক>তাঁবা।

'ভ' অল্পপ্রাণিত হ'য়ে কচিৎ 'ব' হয়েছে।—ভগিনী>বহিনী>বোন্।

আদিস্বরে শ্বাসাঘাতের দরুণ অনাদ্য 'ভ' অনেক সময় 'ব'-এ পরিণত হ'য়েছে।— অভ্র>অব্ভ>আভ>আব, জিহবা>জিব্ভা>জীভ্>জিব, ঊর্ধ্ব>উব্ভ>উবু; অভ্রচ্ছায়া>আবছা।

২৪. ভ—পদের আদি একক ও সংযুক্ত 'ভ' বাঙলায় 'ভ'-রূপে বর্তমান।— ভাতি>ভাএ, ভণতি>ভনে, ভ্রাতৃ>ভাই, ভ্রমর>ভোমরা।

পদমধ্যস্থ 'ব' বা 'ভ'যুক্ত ব্যঞ্জন সমীভূত হয়ে বাঙলায় একক 'ভ'-য়ে পরিণত হয়েছে।—গর্ভক>গব্ভঅ>গাভা, নির্বাপয়তি>নিভায়, নিবায়; ঊর্ধ্ব>উব্ভ> উভু, উবু; জিহবা>জিভ্, জিব্।

পদস্থিত 'ব' এবং 'ম' কচিৎ 'ভ'-এ পরিণত হয়েছে।—বাষ্প>বপ্ফ>ভাপ, বন্তু >বুন্ত>ভূতি (কাঁঠালের); মহিষ>ভঁ'স, মেঢ্রক>ভেড়া, মেড়া।

২৫. ম—পদের আদিস্থিত একক বা যুক্ত 'ম' বাঙ্লায় 'ম' হয়েছে। মাতা> মাআ>মা, মণ্ডপ>ম্যাড়াপ, মধু>মউ, ম্রক্ষতি>মক্খই>মাখে, শ্মশান>মশান, শ্মশ্রু>মচ্ছু>মোছ।

পদমধ্যস্থ ম-যুক্ত ব্যঞ্জন প্রাকৃতে সমীভূত হ'য়ে বাঙলায় একক 'ম'-এ পরিণত হ'য়েছে।—উন্মত্ত>উম্মত্ত>উমত, জন্ম>জম্ম>জাম, (চর্যাপদে—'জামে কাম'), জম্বু>জম্মু>জাম (ফল), কুম্ভকার>কুম্মআর>কুমার, সম্মুখ>ছামু (সাম্‌নে), কর্ম>কম্ম>কাম, তাম্র>তামা, কুষ্মাণ্ডক>কুম্হণ্ডঅ>কুমড়া, অস্মে>অম্হে>আম্হে >আমি, ব্রাহ্মণ>বম্হণ>বামুন, গ্রীষ্ম+ট>গুম্হ+ট>গুমোট।

'প' কখন কখন 'ম' হয়েছে।—প্রদীপ>পিদ্দিম, সপ্তপর্ণী>ছাতিম।

কোন কোন শব্দে 'ম'-শ্রুতিধ্বনির আগম ঘটে।—জলময়>জলশয়, খোলা-কুচি> খোলামকুচি।

২৬. য়—পদের আদি 'য' বাঙলায় সর্বত্র 'জ'-উচ্চারণে পরিণত হ'য়েছে,

বানানেও বহুস্থলে 'য'-স্থলে 'জ' ব্যবহৃত হয়। যাতি>যাই>যায় ; যন্ত্রক>জাঁতা ; জাঁতি, যূথিকা>জুঁই, যুঁই।

পদের মধ্যে 'য'-এর মূল উচ্চারণ (য়) অব্যাহত আছে, তবে এর জন্য বাঙলায় নোতুন বর্ণ সৃষ্টি হয়েছে 'য়'। যেমন, যোগ, কিন্তু বিয়োগ। তবে সমাসবদ্ধ পদে অনেক সময় পদমধ্যবর্তী 'য' বাঙলায় 'জ'-রূপে উচ্চারিত হয়।—অযান্ত্রিক, ষড়্যন্ত্র।

পদমধ্যবর্তী একক 'য' বাঙলায় লোপ পেয়েছে অথবা অপর কোন স্বরে পরিণত হয়েছে। বাঙলায় আবার উদ্বৃত্ত স্বরে য়-শ্রুতির ফলে নোতুনভাবে 'য়'-র আগম ঘটেছে।—নয়তি>নেই>নেয়, যাতি>জাই>যায়।

পদমধ্যবর্তী ব্যঞ্জনলোপের ফলে যে সকল দ্বিস্বরধ্বনির সৃষ্টি হয়েছে, তথায় 'য়'-শ্রুতির আগম বিশেষভাবে লক্ষণীয়।—সাগর>সাঅর>সায়র, গোপাল>গোআল>গয়লা, বদন>বঅন>বয়ান।

পদমধ্যবর্তী 'য'-যুক্ত ব্যঞ্জন বাঙলায় কখনও 'জ' কখনও 'য়' হয়েছে।—আর্যিকামাতা>আজিমা, আয়িমা (আইমা)।

বাংলায় শব্দের আদিতে ভিন্ন অন্য '-আ' বা '-এ' অক্ষর ব্যবহৃত হয় না ; কিন্তু যেখানে উচ্চারণে তা' বর্তমান আছে, সেখানে তার সঙ্গে '-য়' যুক্ত হয়ে ব্যবহৃত হয়, কিন্তু এই '-য়-' উচ্চারিত হয় না—গি+আ=গিআ>গিয়া, দি+এ=দিএ>দিয়ে, পা+আ=পা+বশ্রুতি+আ=পাবা>পাওয়া (পাওআ-স্থলে)।

২৭. র—পদস্থিত একক বা সংযুক্ত 'র' বিভিন্ন অবস্থানেই বর্তমান রয়েছে।—রোহিত>রুই, রক্তক>রত্তঅ—রাতা ; রাত্রি>রত্তি>রাতি, রাত ; করোতি>করই>করে, অপর>অবর>আর ; সর্ষপ>সরিষা ; আদর্শিকা>আরশি।

বাঙলায় কখনও কখনও 'ল'-স্থলে 'র' ব্যবহৃত হয়।—লশুন>রসুন, প্রবাল>পআল>পোয়ার, লোমন্>রোঅঁ>রোঁ, রোঁয়া।

'ট, ড, দ' কখন কখন বাঙলায় 'র'-এ পরিণত হয়।—পটল>পডোল>পরোল, পাটলী>পাডলী>পারুল, পুটক>পুডঅ>পোর, দ্বাদশ>বারহ>বার, বিড়াল>বেরাল।

পদের আদিতে বা মধ্যে কখন কখন 'র'-এর আগম ঘটে।—ওঝা>রোজা, দ্ব্যশীতি<বিরাশি, উই>রুই।

শুদ্ধিপ্রবণতা থেকে অনেক সময় অকারণ শব্দে 'র'-এর আগমন ঘটানো হয়। —সাহায্য>সাহার্য, মোকদ্দমা>মোকর্দমা, পুষ্ট>পুরুষ্ট, উচ্চারণ>উরুশ্চারণ।

২৮. **ল**—আদি 'ল' বাঙলায় বর্তমান রয়েছে।—লক্ষ>লকখ>লাখ, লভতে>লহএ>লহে, লক্ষণ>লছন, লম্ফ>লাফ।

পদমধ্যবর্তী একক এবং সংযুক্ত 'ল' সমীভূত হ'য়ে বাঙলায় একক 'ল'-য়ে পরিণত হয়েছে।—কদলক>কঅলঅ>কলা, মল্ল>মাল, বিল্ব>বেল, কল্য>কল্ল>কাল।

অপর কোন কোন একক বা 'র-যুক্ত ব্যঞ্জন'ও কখন কখন 'ল' রূপ ধারণ করে। —প্রাচীর>পাঁচিল ; ক্ষুদ্র>খুল্ল, ভদ্র>ভল্ল>ভাল, ষোড়শ>ষোলহ>ষোল, হরিদ্রা>হলুদ, পর্যঙ্ক>পল্লংক>পালংক, গাহ্বিকা>গালি, ক্রোড়>কোল, রথ্যা>রচ্ছা>লচ্ছা>লাছ।

অনেক সময় 'ন', 'য'-স্থলেও বাঙলায় 'ল'-য়ের ব্যবহার দেখা যায়।—নগুণ>লগুন (পৈতা), নৌকো>লৌকো, যষ্টি>লটিঠ>লাঠি।

২৯. **র (অন্তঃস্থ র)**—পূর্ববর্তী '**ব**' দ্রষ্টব্য।

৩০. **শ, ষ, স**—বাঙলা ভাষায় তিনটি শিশ্‌ধ্বনিরই উচ্চারণ 'শ'-বৎ ; বানানে 'ষ, স' থাক্‌লেও উচ্চারণ 'শ'। একক উচ্চারণে কখনও 'শ' ছাড়া কোন উচ্চারণ নেই।>সবিশেষ>শোবিশেশ, সখী>সই (=শোই), ষণ্ড>ষাঁড় (=শাঁড়)।

পদের আদিতে বা মধ্যে সংযুক্ত শিশ্‌ধ্বনি (শ, ষ, স) একক শিশ্‌ধ্বনিতে পরিণত হয়, যার উচ্চারণ 'শ'।—শস্য>শস্স>শাঁস, পার্শ্ব>পাশ, স্বামী>সাঁই, আবুষ>আউশ, রশ্মি>রাশ, শ্বশ্রূ>সস্সূ>সাসু>শাশ।

দন্ত্যধ্বনির সঙ্গে (ত, থ, ন, র, ল) যুক্ত 'শ' ও 'স'-র উচ্চারণ 'স' (=s) বৎ। স্নেহ>স্নেঁহ, আগাপাশ+তলা>আগাপাস্তলা।

কিছু কিছু বিদেশি শব্দে 'স'-র উচ্চারণ বজায় আছে।—বাস্ (Bus), স্টেপ্ (Step), সেলাম।

আঞ্চলিক বাঙলায় কোথাও কোথাও 'স'-ধ্বনির প্রবলতা লক্ষ্য করা যায়।—'শ্যামবাজারেরর শশীবাবু>সামবাজারের সসিবাবু'।

৩১. **হ**—পদের আদি 'হ' বাঙ্‌লায় বজায় রয়েছে।—হস্তিক>হথিঅ>হাথি>হাতি, হরিদ্রা>হলুদ, হরীত>হরই>হরে।

পদমধ্যস্থ স্পৃষ্ট মহাপ্রাণ ধ্বনি প্রাকৃতে 'হ' হয়েছে, বাঙলায় কথনো 'হ' রয়েছে, কখনো বা লোপ পেয়েছে।—সখী>সহি>সই, বধূ>বহূ>বউ, ব্যাঘ্রটীতি>বহূড়ই>বাহুড়ে, কথয়তি>কথেদি>কহেই>কহে, রাধিকা>রাহিআ>রাহি, রাই; সৌভাগ্য>সোহাগ।

পদমধ্যবর্তী 'শ, স' কখন কখন 'হ' হয়েছে।—গোশালা>গোহাল, নাস্তি>নাহি>নাই, দ্বিসপ্ততি>বাহাত্তর।

পূর্ববঙ্গীয় উপভাষায় 'শ, ষ, স' বহুস্থলেই আদিতে ও অন্তে 'হ' হয়েছে।—শেষ>হেশ্, আসে>আহে, সেই>হেই।

কোন কোন শব্দে 'হ'কারের আগম ঘটে।—অস্থ>অনঠ্>হাট্, এথা>হেথা, ভগিনী>বহিন, বায়ান্ন>বাহান্ন।

পশ্চিম প্রান্তীয় ভাষায় অনেক সময় 'অ'-স্থলে 'হ' ব্যবহৃত হয়।—আমাকে>হামাক।

ষোড়শ অধ্যায় | # রূপতত্ত্ব (১) ঃ বাঙলা শব্দ-গঠন

কণ্ঠোচ্চারিত অর্থবহ ধ্বনি বা ধ্বনিসমষ্টিই শব্দ। শব্দ দ্বারা কোন পদার্থ, ভাব বা ক্রিয়ার বোধ জন্মে। শব্দ দ্বিবিধ—(১) মৌলিক বা স্বয়ংসিদ্ধ, (২) সাধিত শব্দ।

মৌলিক শব্দ স্বয়ংসিদ্ধ বলেই এর আর বিশ্লেষণ চলে না। বাঙলা ভাষায় যে সকল তৎসম, দেশি বা বিদেশি ভাষার শব্দ ব্যবহৃত হয়, সেই সকল শব্দ তদ্বৎ ভাষায় বিশ্লেষণযোগ্য হ'লেও বাঙলা ভাষায় যদি তাদের বিশ্লেষণ না করা যায়, অথবা বিশ্লেষণ করলেও যদি অর্থগ্রহ না হয়, তবে ঐ সমস্ত শব্দকে **'মৌলিক শব্দ'** বলেই গ্রহণ করা হয়। আচার্য সুনীতিকুমার বলেন: "অন্য ভাষা হইতে গৃহীত শব্দ, সেই ভাষার মৌলিক বা মূল শব্দ না হইলেও, বাঙ্গালা ভাষায় যদি সেগুলির বিশ্লেষ এবং বিশ্লেষ-অনুযায়ী ভগ্ন অংশের অর্থগ্রহ না হয়, তাহা হইলে বাঙ্গালার পক্ষে সেগুলি মৌলিক শব্দ বলিয়া গণ্য হইবার যোগ্য: যেমন—হস্ত, চরণ, চন্দ্র, জমীন, নাজির…প্রিন্টার, রোমান্টিক…"ইত্যাদি।—রূপমূল বা পদাণু (morpheme)-বিচারে এই মৌলিক শব্দগুলি 'মুক্ত রূপমূল' (free morpheme) রূপে গ্রহণযোগ্য।

যে সকল শব্দ বাঙলায় বিশ্লেষণযোগ্য তাদের বলা হয় **'সাধিত শব্দ'**। সাধিত শব্দ দ্বিবিধ—'প্রত্যয়-নিষ্পন্ন' (Inflected words), ও **'সমস্ত শব্দ'** (Compounded words)।

যে সকল শব্দের বিশ্লেষণে শব্দের মধ্যে একটি মৌলিক শব্দ এবং ভাবের প্রসারক, সঙ্কোচক বা পরিবর্তনকারী কোন অংশ বর্তমান থাকে, তাকে বলে **'প্রত্যয়-নিষ্পন্ন শব্দ'**। মৌলিক শব্দের অতিরিক্ত অংশটিকেই বলা হয় **'প্রত্যয়'**। শব্দের পূর্বে যুক্ত হ'লে তাকে বলে 'পূর্বপ্রত্যয়' (Prefix) বা 'উপসর্গ', মধ্যে যুক্ত হ'লে 'মধ্যপ্রত্যয়' (Infix) এবং শেষে যুক্ত হ'লে 'পর-প্রত্যয়' (Suffix) বা সাধারণভাবে 'প্রত্যয়' নামে অভিহিত হয়। শব্দের গঠনে এই প্রত্যয়ের ভূমিকা অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ। রূপমূল/পদাণু-বিচারে এই প্রত্যয়গুলি 'বন্ধরূপমূল' (bound morpheme), কারণ এদের অর্থময়তা আছে কিন্তু একক স্বাধীন ব্যবহারযোগ্যতা নেই।—ছেলে+'মি'=ছেলেমি, সাধু+'তা'=সাধুতা, 'প্র'+ভূত=প্রভূত। 'পরা'+জয়=পরাজয়।

যে সকল শব্দের বিশ্লেষণে একাধিক মৌলিক শব্দ পাওয়া যায়, তাদের বলে, 'সমস্ত শব্দ' বা 'সমাসবদ্ধ শব্দ'। এখানে শব্দের দুটি অংশই দুটি মুক্ত রূপমূল।—'স্বর্গ' +'উদ্যান'=স্বর্গোদ্যান, 'ডাল'+'ভাত'=ডালভাত।

পূর্বোক্ত আলোচনা থেকে বোঝা গেল—বাঙলা শব্দ গঠন করা হয় দুইভাবে—প্রত্যয়ের সাহায্যে এবং সমাসবদ্ধ করে। যে সকল প্রত্যয় ক্রিয়াধাতুতে যুক্ত হ'য়ে শব্দ গঠন করে তাদের বলা হয় **'কৃৎ প্রত্যয়'** (Primary suffix),—যেমন '-অন্ত' (চল্+'অন্ত'=চলন্ত), '-তি' (বাড়্+'তি'=বাড়তি); আর যে সকল প্রত্যয় শব্দের সঙ্গে যুক্ত হয়ে অপর শব্দ গঠন করে তাদের বলা হয় **'তদ্ধিত প্রত্যয়'** (Secondary suffix)—যেমন '-মি' (ছেলে+'-মি'=ছেলেমি), '-তা' (সাধু+'-তা'=সাধুতা)। কৃৎ-প্রত্যয়-যুক্ত শব্দকে বলে 'কৃদন্ত শব্দ' ও তদ্ধিত-প্রত্যয়-যুক্ত শব্দের নাম 'তদ্ধিতান্ত শব্দ'। যে সকল তদ্ধিত প্রত্যয় যোগ করাতে মূল শব্দের অর্থ বিশেষ পরিবর্তিত হয় না, তাদের বলা হয় **'স্বার্থিক প্রত্যয়'** (Pleonastic suffix)।—বাল+'-ক'=বালক, হইবে+-'ক'=হইবেক, খাদ্য>খজ্জ>খাজ+'-আ'=খাজা।

[এক] বাঙলা কৃৎ-প্রত্যয়

সংস্কৃতে কৃৎ-প্রত্যয়-যুক্ত কৃদন্ত শব্দগুলো প্রাকৃতের মাধ্যমে বাঙলায় এমন পরিবর্তিত রূপ লাভ করেছে যে এদের বিশ্লেষণ ক'রে আর মূল প্রত্যয়ের সন্ধান লাভ করা যায় না। বস্তুতঃ সংস্কৃত ভাষায় যে সকল প্রত্যয় ব্যবহৃত হ'তো, সেগুলো অনেক সংক্ষিপ্ত ও পরিবর্তিত আকারে বাঙলা কৃৎ-প্রত্যয়ে পরিণত হ'য়েছে; এদের অন্তর্বর্তী স্তরে রয়েছে প্রাকৃত প্রত্যয়। কাজেই বলতে হয়, বাঙলা কৃৎ-প্রত্যয়গুলো সরাসরি প্রাকৃত প্রত্যয় থেকেই উদ্ভূত, অতএব এদের 'তদ্ভব প্রত্যয়' বলা চলে। যেমন—সং-'ত্বন'>-'পন' (গিন্নিপনা), সং-'কা'>-'আ' (ছোরা)।

বাঙলা কৃৎ-প্রত্যয়গুলো সাধারণতঃ খাঁটি বাঙলা শব্দ অর্থাৎ তদ্ভব শব্দের সঙ্গেই যুক্ত হ'য়ে থাকে। তেমনি সংস্কৃত প্রত্যয়ও যুক্ত হয় তৎসম শব্দের সঙ্গে; ক্বচিৎ তদ্ভব শব্দের সঙ্গে যুক্ত হ'লেও সেইসব কৃদন্ত শব্দ শিষ্টভাষায় স্বীকৃত হয় না।

সংস্কৃতে কৃৎ-প্রত্যয়ের সংখ্যা প্রায় অগণিত, কিন্তু এদের এক এক গোছা একমুখী পরিবর্তনের ফলে প্রাকৃতে এবং বাঙলায় অভিন্ন রূপ ধারণ করেছে, ফলতঃ বাঙলা ভাষায় কৃৎ-প্রত্যয়ের সংখ্যা খুব বেশি হ'তে পারেনি। সংস্কৃত কৃৎ-প্রত্যয় ছাড়া কিছু কিছু শব্দও রূপান্তরিত হ'য়ে বাঙলায় প্রত্যয়ে পরিণত হ'য়েছে।

১। অ—(ক) সংস্কৃত 'অচ্, অপ্, ঘঞ্'-প্রত্যয় থেকে জাত 'অ', 'ক্ত'-প্রত্যয় থেকে জাত 'ত' এবং 'ষৎ, ণ্যৎ'-প্রত্যয় থেকে জাত 'য়' ধ্বনিপরিবর্তন-বশে বাঙলায় লোপ পাওয়াতে এদের 'লুপ্ত অ প্রত্যয়' নামে অভিহিত করা যায়। শব্দের অন্তে এই 'অ' বাঙলায় অনুচ্চারিত।—কর্ত>কট্ট>কাট (কাট-ছাট করা), বর্ধ>বড্ঢ>বাড় (বাড়-বাড়ন্ত), নৃত্য>নচ্চ>নাচ (নাচ-গান); এবং এরূপ—ধর (ধর-পাকড়), চল (চল না থাকা), ছাড় (ছাড়পত্র), ভাঙ্গ (ভাঙ্গ-চুর), ভাত (ভাত-কাপড়)। এই শব্দগুলো সাধারণতঃ ক্রিয়াদ্যোতক বিশেষ্য হয়ে থাকে।

(খ) উচ্চারিত 'অ' প্রত্যয়টি সম্ভবতঃ সংস্কৃত '-অক' বা '-উক' প্রত্যয়ের পরিবর্তনে সৃষ্ট হয়েছে। 'ঈষদ্ভাব' অথবা 'প্রায় এরূপ' অর্থে প্রত্যয়টি ব্যবহৃত হয়ে থাকে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রত্যয়যুক্ত শব্দটির দ্বিত্ব হয়। বাঙলা উচ্চারণে পদান্তস্থিত এই 'অ' প্রত্যয়টি স্বরসঙ্গতির কারণে 'উ' বা 'ও' রূপও প্রাপ্ত হয়ে থাকে। —পড়্পড়্ (=পড়োপড়ো), নিচু-নিচু, মরো-মরো, ডুবু-ডুবু, দাউ-দাউ, হবু (জামাই)। এই কৃদন্ত শব্দগুলো বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হ'য়ে থাকে।

২। অন—(ক) সংস্কৃত 'অন' থেকে জাত বাঙলা প্রত্যয় 'অন' এবং এর প্রসারে 'অনা, অনি, অনী, উনি, উনী' এবং সংকোচনে 'না' ও 'নি, নী'-প্রত্যয় সৃষ্টি হয়েছে। —নর্তন-কুর্দন>নাচন-কুঁদন, ঝাড়+অন>ঝাড়ন, খা+অন>খাওন, এইরূপ—দেখন, কাঁপন, মরণ, ঝুলন প্রভৃতি। পূর্ববঙ্গের উপভাষায়ই সাধারণতঃ এই প্রত্যয়টি বহুল ব্যবহৃত হয়। এই ক্রিয়াবাচক প্রত্যয়টির প্রসারিত বা সংকুচিত রূপটি সাধু ভাষায় এবং শিষ্টজনসম্মত চলিত ভাষায় ব্যবহৃত হ'য়ে থাকে।

(খ) -অন+আক>-'আন'-প্রত্যয় এবং আধুনিক বাঙলায় দ্বি-মাত্রিকতার ফলে জাত '-না' প্রত্যয় ঃ কান্দন+আ>কান্দনা>কান্দ্না>কান্না ; রান্ধ্+অন+আ>রান্ধনা>রান্ধ্না>রান্না ; এইরূপ—ঢাকনা, বাজনা, দেনা-পাওনা, আনা-গোনা।

(গ) -অন+ই, ঈ>ইক='-আনি,-অনী' এবং স্বরসঙ্গতির ফলে জাত '-উনি, -উনী' ও দ্বিমাত্রিকতার ফলে জাত '-নি, -নী' প্রত্যয়টি সাধারণতঃ ভাব বা বস্তু অর্থে ব্যবহৃত হয়।—ছেদন+ইকা>ছেদনিকা>ছেঅনিআ>ছেনি, মথনিক>মহনিঅ>মউনি, চালনিক>চালনি, চালুনি ; ছাদনিক>ছাউনি ; এইরূপে—ঢাকনি, ঢাকুনি ; নাচনি, নাচুনী, বিনুনি, রাঁধুনী, জ্বলনি, জ্বলুনি।

৩। (ক) -অন্ত এবং স্ত্রীলিঙ্গে -অন্তি, -অন্তী প্রত্যয়টি সংস্কৃত 'শতৃ' প্রত্যয়-অন্ত-জাত। প্রত্যয়টির সাহায্যে সাধারণতঃ বিশেষণ পদ গঠিত হয়। জী+অন্ত>জীয়ন্ত, জ্যান্ত, চল্+অন্ত>চলন্ত ; এইরূপে—ভাসন্ত, ডুবন্ত, বাড়ন্ত, দেখন্তী,

নাচুন্তী, 'উঠন্তি মুলো পত্তনেই চেনা যায়'। এই প্রত্যয়টি কতকগুলো বিশেষ ধাতুর সঙ্গেই যুক্ত হয়।

(খ) -অত এবং প্রসারে -অতা, -অতী ও সংকোচনে—ত, -তি প্রত্যয়কে অনেকে 'শতৃ-' প্রত্যয়জাত মনে করেন। ডঃ সুকুমার সেন এই প্রত্যয়টিকে 'বর্ত' (>-ত), 'বর্তক' (>-তা) ও 'বর্তিক'(>-তি)-শব্দের বিকারজাত বলে মনে করেন। —এই প্রত্যয়টি-'অন্ত-'র সমার্থক এবং ক্রিয়া ও বস্তু বুঝাতে ব্যবহৃত হয়।—চলতি, উঠতি, পড়তি ; ফেরত, ফেরতা ; বহতা, সব-জান্তা, ধরতা, জানত, পারত।—বিশেষ্য এবং বিশেষণ—দ্বিবিধ পদ-গঠনেই প্রত্যয়টি ব্যবহৃত হ'চ্ছে।

ডঃ সুকুমার সেন এই প্রত্যয়টিকে 'ত', 'তি' প্রভৃতি রূপে গ্রহণ করেছেন। তিনি সংস্কৃত-'ত্ব>ত' এবং 'ত্ব+ইক>-তি' প্রত্যয়ের সম্ভাবনার কথাও উল্লেখ করেছেন।

৪। -আ—(ক) কর্মবাচ্যের অতীত কালবাচক **বিশেষণ** (Past participle) এবং ভাববাচক বা ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য (Verbal noun) বুঝানোর জন্য বাঙলায় ধাতুর উত্তর '-আ' প্রত্যয় হয়। এই প্রত্যয়টি সংস্কৃত '-ইত' বা '-ত' প্রত্যয়জাত। —দেখ্+আ=দেখা (লোক), কর্+আ=করা (কাজ), রাঁধা (ভাত), জানা (বই) প্রভৃতি।

(খ) সংস্কৃত '-অক' বা '-আক' -প্রত্যয় থেকে এই '-আ' প্রত্যয়যুক্ত শব্দ এককভাবে ব্যবহৃত হয় না, অপর শব্দের সঙ্গে সমাসবদ্ধ হয়ে ব্যবহৃত হয়।—কাট্+আ=কাটা (গলা-কাটা দাম, গলা-কাটা দোকানী), ভাত-রাঁধা হাঁড়ি, ভাত-রাঁধা ঠাকুর, ঘরে-পাতা দই, বাদুরচোষা আম।—এই প্রত্যয়যুক্ত শব্দ সমাসবদ্ধ হয়ে যে বিভিন্ন কারকের ভাব প্রকাশ করছে, উদ্ধৃত দৃষ্টান্তে তা' স্পষ্টভাবেই বোঝা যায়। সমস্ত পদ বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হয়।

(গ) ণিজন্ত (প্রযোজক) ক্রিয়ায় নামধাতুতে এবং কর্মবাচ্যে '-আ' প্রত্যয় ব্যবহৃত হয়। ধাতুর অংশবৎ বলে এই প্রত্যয়টিকে '**ধাত্ববয়ব**' নামে অভিহিত করা যায়।—ণিজন্ত ক্রিয়ায়—কর্+আ>করা>করায়, জান্+আ>জানা>জানায় ; নাম ধাতুতে—বিষ>বিষ্+আ>বিষা>বিষায়, চড়>চড়্+আ>চড়া>চড়ায় ; কর্মবাচ্যে —শুন্+আ>শোনা>শোনায় (কথাটা ভালো শোনায় না), কহ্+আ>কহা> কহায়।

প্রত্যয়টির উদ্ভব সংস্কৃত ণিজন্ত প্রত্যয় '-আপয়' -থেকে। আপয়+অক্> আপক>-আপঅ>-আঅঅ>-আ।— *পক্ষিমারাপক>*পক্‌খিমারাঅঅ>পাখমারা, *চৌরধরাপক>চোরধরা, ভক্তরন্ধনাপক>*ভক্তরন্ধনাঅঅ>ভাতরাঁধা।

৫। **আই**—সংস্কৃত 'আপয়+ইক>আপিক>আইঅ>আই' এবং '-আপয়+ইত>আপিত>-আইঅ>আই'। ভাববাচক বা ক্রিয়াদ্যোতক বিশেষ্য এবং বিশেষণ-রূপেও '-আই' প্রত্যয়যুক্ত শব্দ ব্যবহৃত হয়।—*নৃত্যাপিক>*ণচ্চাইঅ>নাচাই, *চোরাপিত>চোরাইঅ>চোরাই। এইরূপে—বাধাই, ধরাই, যাচাই।

৬। **আও**—ভাবার্থে এই প্রত্যয়টি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। -আপয়>উক>-আঅআ+উঅ>আও—এইভাবে প্রত্যয়টির উদ্ভব সম্ভব।—চড়্+আও>চড়াও, ঘেরাও, বনিবনাও।

৭। **-আন**—এবং প্রসারে '-আনি, -আনী, -আনো, -উনি' প্রত্যয়টি সংস্কৃত ণিজন্ত '-আপয়্+অন+ক' থেকে উদ্ভূত।

(ক) ক্রিয়াবাচক ও বস্তুবাচক বিশেষ্য বুঝতে 'আন' প্রত্যয়-যুক্ত শব্দ ব্যবহৃত হয়। *জানাপনক (=জ্ঞাপনক)>জানান, জানানো;—*শ্রবণাপনক>শুণাঅণঅ>শুনানো; চালান, চালানো, মানান, মানানো।

(খ) ক্রিয়া ও বস্তু বুঝাতে 'আনি' প্রত্যয় ব্যবহৃত হয়।—শুনানি, শুনানী; উড়ানি, উড়ুনি; ঝাঁকনি, ঝাঁকানি, ঝাঁকুনি; জ্বালানি; পারানি; তোলানী, তুলুনি (শেজ-তুলুনি)।

(গ) ণিজন্ত অর্থাৎ প্রযোজক বা প্রেরণার্থক ক্রিয়া বুঝাতে 'আনো' প্রত্যয় ব্যবহৃত হয়।—কর্+আনো=করানো, খাওয়ানো, দেখানো।

৮। **ই**—সংস্কৃত -ইত>-ইঅ>-ই, -ঈ প্রত্যয়টি পূর্ণরূপে কচিৎ সাধুভাষায় এবং প্রায় সর্বতোভাবে পূর্ববঙ্গীয় উপভাষায় বিদ্যমান।—মারিত>মারিঅ>মারি>মাইর, মা'র; হাসি, হাস; বুলি, বোল।

৯। **-ইয়ে**—সংস্কৃত অক+ইক+আক>অঅইঅআঅ->-অইআ>-ইয়া, -ইয়ে; অভ্যস্ততা বুঝাতে 'ইয়ে' প্রত্যয় যুক্ত হয়।—খা+ইয়ে>খাইয়ে, গাইয়ে, বাজিয়ে, বলিয়ে, কইয়ে, দুখ-জাগানিয়া। -ইয়ে' প্রত্যয়যুক্ত শব্দ বিশেষণ-রূপে ব্যবহৃত হয়।

১০। **-উয়া**—এবং স্বরসঙ্গীত বশে '-ও' প্রত্যয়টি শব্দকে বিশেষণে পরিণত করে।—পড়্+উয়া>পড়ুয়া, প'ড়ো; ঘাউয়া, ঘেয়ো।

১১। **-উক**—এই প্রত্যয়টি 'স্বভাব' বুঝাতে ব্যবহৃত হয়।—মিশ+উক>মিশুক, খা+উক>খাউক, খেকো (কাঁচা-খেকো)।

১২। **-ক**—এবং এর প্রসারে -'কা, -কি, -কু' প্রত্যয়টিকে সাধারণভাবে স্বার্থিক

প্রত্যয় বলা চলে, সংযোগ বুঝাতেও এই প্রত্যয় ব্যবহৃত হয়ে থাকে।—মুড়্+ক> মোড়ক, বৈঠ্+ক>বৈঠক ; সড়কি, ছেঁচকী, হুড়কো।

দ্রঃ। সংস্কৃত 'কৃৎ-প্রত্যয়' শুধু তৎসম শব্দেই ব্যবহার্য হলেও ক্বচিৎ তদ্ভব বা দেশি শব্দেও যুক্ত হ'য়ে থাকে।—কহ্+তব্য=কহতব্য, নঞ্—কাট্+যৎ=অকাট্য। তবে এ ধরনের ব্যবহার শিষ্টসম্মত নয়।

সংস্কৃতে 'শতৃ' এবং 'শানচ্' প্রত্যয় ব্যবহারের সুনির্দিষ্ট রীতি রয়েছে। কিন্তু বাঙলায় অনেক সময় রীতি-বিরোধী প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়, যদিও তৎসম শব্দের সঙ্গেই এই কৃৎ-প্রত্যয় যুক্ত করা হয়।—'প্র—বহ্+শতৃ>প্রবহৎ' এরূপ হওয়া সংগত, কিন্তু ব্যবহৃত হয় 'প্র—বহ্+শানচ্>প্রবহমাণ'—এটি অশুদ্ধ প্রয়োগ ; 'চলৎ'-স্থানে 'চলমান' (শতৃ-স্থানে শানচ্) অশুদ্ধ প্রয়োগ।

কিছু কিছু সংস্কৃত কৃদন্ত শব্দের বাঙলায় অপপ্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়।—'অন্তর্হিত হওয়া'-স্থলে 'অন্তর্ধান হওয়া', 'প্রণত হই' -স্থলে 'প্রণাম হই', 'মৌনী থাকা'-স্থলে 'মৌন থাকা' প্রভৃতি।

কিছু কিছু কৃদন্ত সংস্কৃত শব্দ বাংলায় ব্যুৎপত্তিগত অর্থে ব্যবহৃত না হয়ে ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়।='সৎ' শব্দের মূল অর্থ 'বিদ্যমান', কিন্তু বাঙলায় 'সাধু' অর্থে ব্যবহৃত হয় ; শুশ্রূষা—শুনবার ইচ্ছা (বাং সেবা), মুমূর্ষু—মরণেচ্ছু (বাং— অন্তিম অবস্থাপ্রাপ্ত) প্রভৃতি।

[দুই] বাঙলা তদ্ধিত প্রত্যয়

বাঙলা 'কৃৎ'-প্রতয়ের তুলনায় তদ্ধিত প্রত্যয়ের সংখ্যা এবং বৈচিত্র্য অনেক বেশি। কিছু কিছু বাঙলা তদ্ধিত প্রত্যয় এসেছে সরাসরি সংস্কৃত থেকে (কখনও কখনও অর্থ-পরিবর্তন-সহ), কখনও প্রাকৃত মাধ্যমে, আবার কখন কখন সংস্কৃতে সমাসের উত্তরপদ যথাযুক্ত বিবর্তন-সহ বাঙলা তদ্ধিত প্রত্যয়ে পরিণত হয়েছে।

(১) -অ—এই তদ্ধিত প্রত্যয় বাঙলায় তিনরূপে বর্তমান—লুপ্ত অবস্থায়, যথাযথ অবস্থায় এবং 'উ', 'ও'-রূপে।—কাল্ (-সাপ), কাল (কালো জিরা) ; শিব, শিবু, শিবো।

(২) -অট, -ট—প্রসারে '-অটা, -অটি, -অটিয়া, -অটী, -অটীয়া' এবং স্বরসঙ্গতির ফলে সঙ্কোচনে -'টা, -টি, -টে, -টো, -আটে' প্রভৃতি। এই প্রত্যয় সংস্কৃত প্রত্যয় থেকে আসেনি, এসেছে একাধিক সংস্কৃত শব্দের বিবর্তনে। যথা—

(ক) '-বর্তিক, -বৃত্ত, -বৃত্তি'>ধূম্রবর্তিক>ধূমঅট্টিআ>ধোঁয়াটে ; স্নেহবৃত্ত> নেহবট্ট>নেহটা>নেওটা, ন্যাওটে ; আম্রবর্ত>আমোট ; এইরূপে দাপট, আঙ্গট, আঙ্গটা, শুখটি, পাঁশটে, আঁশটে, ভাড়াটে, ঘোলাটে, তামাটে, ঝগড়াটে, একটা, দুটো, তিনটে।—স্বার্থে, ভাবার্থে বা শীলার্থে ব্যবহৃত।

(ই) -'পট্ট, -পট্টিকা'>লিঙ্গপট্ট>লেঙ্গট ; মলাট, কষটি, উলট।

(৩) -আ—এবং স্বরসঙ্গতি-হেতু পরিবর্তিত রূপ '-এ', '-ও'। বিভিন্ন অর্থেই বাঙলায় এই প্রত্যয়টি ব্যবহৃত হয়ে থাকে।—(স্বার্থে) ঃ ঘোড়+আ>ঘোড়া, চাঁদ +আ>চাঁদা, পাতা, চোরা, গোয়ালা। (নিন্দার্থে) ঃ বামুন+আ>বামনা, কেষ্টা, পাগলা। (বিশেষণে) ঃ—পশ্চিম+আ>পশ্চিমা, দক্ষিণা, জঙ্গলা, দোহারা, পাতলা। (সম্বন্ধার্থে)—তেল+আ>তেলা, ডাহিনা, লোনা।

(৪) আই—এই তদ্ধিত প্রত্যয়টি একাধিক সূত্র থেকে বাঙলায় এসেছে। যথা—

(ক) *'আকিক>আইঅ>আই'—ব্যক্তিনামে বা আদরে ব্যবহৃত হয়।—কৃষ্ণ> কণ্‌হ>কান+আই>কানাই, বলাই, জগাই, মাধাই, গণাই, ছিরাই।

(খ) 'পতি>অই>আই'—ভগিনী-পতি>বোনাই, ননদ-পতি>নন্দাই।

(গ) 'আপয়+ইক/ইত>আঅঅ+ইঅ>আই'—বৃত্তি বোঝাতে অথবা নিন্দার্থে প্রত্যয়টি ব্যবহৃত হয়।—*ব্রাহ্মণাপিত/-ণাপিক>বামনাই, বড়াই, উৎরাই, ভালাই। সম্বন্ধার্থেও প্রত্যয়টি ব্যবহৃত হয়।—মোগলাই, ঢাকাই, বাদশাই, চোরাই।

(৫) -আড়ি—বাসক+বাটিক>বাসাড়িয়া>বাসাড়ে, চাষাড়ে, *হস্তপাটিক> হাতুড়ে, খেলুড়ে, জুয়াড়ি।

(৬) -আন, আনো—নামধাতুর পদ তৈরি করতে নাম-শব্দের সঙ্গে প্রত্যয়টি যুক্ত হয়ে থাকে।—জুতো+আন>জুতান>জুতানো ; জমানো, ঠ্যাঙ্গানো, পেঁচানো।

(ক) -'আনি'—প্রত্যয়টি 'পানীয়'-শব্দের বিকারে উৎপন্ন।—অম্লপানীয়> অম্লআনিঅ>আমানি, নাকানি, চুবানি, চোখানি, তলানি।

(৭) -আম—প্রসারে-'আমি,-আমো, -উমি, -ওমি,-মি'। ভাবার্থে প্রত্যয়টি ব্যবহৃত হয়।—এর উৎপত্তি 'কর্মক, কর্মিক' থেকে।—পাকাম, পাকামো, ঠকামো, পেজোমি, ছেলেমি, বড়াম, জেঠামো, ঘরামি।

(৮) -আর—একাধিক সূত্র থেকে এই প্রত্যয়টির উদ্ভব ঘটেছে। যথা—

(ক) '-আগার>আর'—ভাণ্ডাগার>ভাণ্ডার>ভাঁড়ার ; মহাগর>মেহার, সভাগার>সাভার, স্কন্ধাগার>খামার।

(খ) '-কার (ক), -কারিক>আর, -আরি, -আরু।—কুম্ভকার> কুম্ভার>কুমার> কুমোর; চামার, ভিখারি, পূজারি, শাঁখারি, সেকরা, পিয়ার, পিয়ারী, দিশারী, দিশারু, ডুবারু, খোঁজারু।

(গ) 'আকার>আআর>আর'।—পদাকার>পয়ার, মধ্যাকার>মাঝার, ঝিয়ারি, বৌয়ারি।

(৯) -আল—প্রসারে '-আলা, -আলি, -আলিয়া, -এল'। এই প্রত্যয়টিও একাধিক সূত্র থেকে বাঙলায় এসেছে। যথা—

(ক) 'পাল, পালিক>আল, আলি'—গোপাল>গোয়াল, গয়লা; ঘটিকাপাল> ঘড়িআআল>ঘড়িয়াল>ঘ'ড়েল, রাখাল, ঘাটাল, বঙ্গাল; মিত্রপালিক>মিতালি।

(খ) 'কাল, কালিক>আল, আলি'—পৌষকালিক>পৌষালি; মত্তকাল> মাতাল; চৈতালী।

(গ) হিন্দুস্থানী 'ওয়ালা>আলা' ও প্রসারিত রূপ—বাড়িআলা, গাড়িআলা, মাতোয়ালা।

(১০) আলি—ভাব, কার্য বা সম্বন্ধার্থে ব্যবহৃত হয়।—মিত্রকারিক>মিতালী, ঘটকালি, ঠাকুরালি, নাগরালি, মেয়েলি (সাদৃশ্যার্থে), সোনালি, রূপালি, সুতালি।

(১১) -ই, -ঈ—সংস্কৃত '-ইক, -ইকা, -ঈয়, -ঈয়া' থেকে জাত এই প্রত্যয়টি নানাবিধ অর্থে বাঙলায় বিশেষভাবে প্রচলিত।—(ক্ষুদ্রার্থে)—পুস্তিকা>পোথিআ> পোথী=পুথি, ঘটিক>ঘড়ি। (স্ত্রীলিঙ্গে)—মামী, বোষ্টমী, বুড়ি। (ভাবার্থে)— বড়মানুষি, রাখালি, রাখালী, দেশি, বেগুনি। (বিদেশি শব্দে)—মাস্টারি, বিলাতী, জমিদারি, চাকরি, জজিয়তি।

(১২) -ইয়া ও অভিশ্রুতিবশে '-এ'। 'ইক+আক>ইকাক>ইআঅ>ইআ' প্রত্যয়টি প্রধানতঃ সম্বন্ধ বোঝাতে এবং কর্তৃবাচক বিশেষ্য ও বিশেষণ পদ গঠনে ব্যবহৃত হয়।—নগরিয়া, নগুরে, শহুরে, উত্তুরে, হলদে, পাহাড়িয়া, পাড়াগেঁয়ে, মুটিয়া, মুটে, জেলে, সাতাশে, বারমাস্যা, বারমেসে, জাগানিয়া, জাগানে, মিছ-কউনে, উড়িয়া, উড়ে, পিউসিয়া, পিসে, কাঁদুনে, ঘর-ভাঙানে, খুটখুটিয়া, খুটখুটে, টনটনে।

(১৩) -উ—স্বার্থে, হ্রস্বার্থে বা আদরে প্রত্যয়টি ব্যবহৃত হয়।—কান>কানু, রামু, পঞ্চু, খুকু, দুষ্টু।

(১৪) -উড়ি, -উড়—অন্তঃকুটিক>অন্তউড়িঅ>আঁতুড়, ত্রিকুটিক>তিউড়ি। পত্রপুটিক>পত্তউড়িঅ>পাতুড়ি; হস্তপুটিক>হাতুড়ি।

(১৫) -উয়া এবং অভিশ্রুতিবশে '-ও'।—উক+আক>উকাক>উয়া>ও। বৃত্তি-বাচক বিশেষণ-পদ-গঠনে এবং ব্যক্তিনামে ব্যবহৃত হয়।—হাট+উয়া>হাটুয়া, হেটো ; নেটো, খেনো, জলো, টেকো, কেঠো, মেছো ; মাধব>মাধয়>মেধো, রেমো, খেমো।

(১৬) -উল—দেবকুল>দেঅউল>দেউল, রাজকুল>রাউল।

(১৭) -ক—প্রসারে -'কা, -কি, -কী, -কিয়া, -কুয়া, -কে, -কো'-রূপে তথিত প্রত্যয়টি নানা অর্থেই ব্যবহৃত হয়। ঢোল+ক>ঢোলক (ক্ষুদ্রার্থে), ধনু+ক> ধনুক (স্বার্থে), কাঠ+ক>কেঠ্‌কো (সম্বন্ধার্থে) ; গণ্ডাকিয়া, কড়াকিয়া, পণকে, মুনকে ; মড়া+ক>মড়ক, চড়ক।

(১৮) -ড়—প্রসারে '-ড়া, ড়ি, -ড়ী, -আড়, -ড়িয়া'—একাধিক সূত্র থেকে বাঙলায় এসেছে এবং নানাবিধ অর্থেই ব্যবহৃত হয়। যথা—

(ক) স্বার্থে বা সাদৃশ্য—গাছ+ড়>গাছড়া, রাজড়া, পাতড়া, চামড়া, মুখ+ড় >মুহড়া>মহড়া, ঝিউড়ি, শাশুড়ি।

(খ) বৃত্তি, সম্বন্ধ বা শীল-অর্থে—ভাঙ্গড়, ফাঁসুড়ে, তুখোড়, হাতুড়ে, ঘেসেড়া, জুয়াড়ি, সাপুড়ে, চাষাড়ে, খেলুড়ে, যোগাড়ে।

(গ) স্থানবাচক নামে—গোপবাটিকা>গোয়াড়ি, অক্ষবাটক>আখড়া।

(১৯) -ত এবং প্রসারে -'তা, -তি, -তী, -তুতো' বিভিন্ন সূত্র থেকে বাঙলায় আগত এবং নানাবিধ অর্থে ব্যবহৃত।

(ক) '-ত্ব>ত'। ভাব বোঝাতে ব্যবহৃত হয়—অবিধবাত্ব>আইয়ৎ, এয়োতি, জ্ঞজিয়তি।

(খ) 'পত্র>ত'—নামপত্রক>নামতা, রঙ্গপত্রক>রাংতা, করপত্র>করাত, নাল-পত্রিকা>নালিতা, জন্মপত্রিকা>জাঁওয়াতি, শুষ্কপত্র>শুকতো, পটোলপত্র> পলতা।

(গ) 'পাত্র, পাত্রিক>ত'—শালপাত্রিক>শালতি, সঙ্গপাত্র>সাঙ্গাত, বণিকপাত্রিক >বেনেতি।

(ঘ) 'অক্ত>ত'—পানীয়+অক্ত>পানিতা>পানতা, লবণাক্ত>নুনতা।

(ঙ) 'পুত্র>ত'—জ্যেষ্ঠতাতপুত্র>জেঠতুত, জেঠাতো, মাসতুতো, পিসতুতো।

(২০) -(ই) ত, -(ই) তি—'বৃত্ত, বৃত্তিক' থেকে জাত এই প্রত্যয়টির অর্থও বৃত্তি-বাচক।—সেবাবৃত্তিক>সেবাইত ; জালিয়াত, জালিয়াতি, ডাকাত, ডাকাতি।

(২১) **ন**—প্রসারে '-নি, -নী, -অনী, -আনী, -ইনী, -উনী' প্রভৃতি বাঙলা স্ত্রীবাচক প্রত্যয়।—সতিন, মিতেন, বেয়ান, নাতিন, নাতিনী, ঠাকুরুন, ঠাকুরানী, ডাক্তারনী, মেথরানী, ননদিনী, সাপিনী, বাঘিনী, পেত্নী, নাগ্নেনী।

(২২) **-পন**—প্রসারে '-পনা'। বৈদিক '-ত্বনক>প্পণ (অ)>পন (া)। ভাব বোঝাতে প্রত্যয়টি ব্যবহৃত হয়।—*গৃহিণীত্বন>গিন্নিপনা, বড়পনা, ঢীটপনা, সতীপনা।

(২৩) **-পানা,-পারা**—সাদৃশ্যার্থে ব্যবহৃত হয়।—চাঁদপানা, লম্বাপানা, কালো-পানা। -'পারা' প্রত্যয়টিও একই অর্থে ব্যবহৃত হয়।

(২৪) **-ভর, -ভরা**—পরিমাণ বোঝাতে ব্যবহৃত হয়।—তোলাভর, দিনভর, ছটাকভর, রাতভর, গালভরা, বাটাভরা।

(২৫) **মন্ত,-মত,-বন্ত**—সংস্কৃত 'মতুপ্' প্রত্যয় থেকে জাত। লক্ষ্মীমন্ত, পয়মন্ত, শ্রীমন্ত, গুণবন্ত, এমত, যেমত, হেনমত।

(২৬) **-র**—গৃহ>ঘর>র। দেবগৃহ>দেওঘর>দেহরা ; জ্ঞাতিগৃহ>নাতিঘর> নাইঅর ; বাসঘর>বাসর।

(২৭) **-রু, -উর**—রূপ>রুঅ>উর। -স্বার্থে বা সাদৃশ্যার্থে ব্যবহৃত হয়।—গোরূপ>গোরুঅ—গোরু ; সুরূপ>সরু ; বৎসরূপ>বচ্ছরুঅ>বাছরু> বাছুর ; কামরূপ>কাঙুর ; *ক্ষামরূপ>ঝামরু।

(২৮) **-ল**—প্রসারে '-লা, -লি, -লী'। সংস্কৃত -'ল, -অল, -ইলি'-প্রভৃতি থেকে জাত প্রত্যয়, বিশেষণে ব্যবহৃত হয়।—দীর্ঘল>দীগ্ঘল>দীঘল ; *বিদ্যুল্লিকা> বিজ্জুল্লিআ>বিজলি ; *পত্রলক>পাতলা ; সখী>সহেলা, সয়লা ; শাব+অল+ ইয়া>ছাওয়ালিয়া>ছালিয়া>ছাইলা>ছেলে ; আদল, মাদল, হাতল।

(২৯) **-স, -সা, -ছা, -চা**—'স্বাদ>সা'।—পানীয়স্বাদ>পানিসা>পানসে ; চর্মস্বাদ>চামসা>চামসে ; ফরসা, ঝাপসা, কুয়াসা ; আবছা, ভেংচা, লালচে, ফ্যাকাসে। 'গাস>স'—অষ্টনাসিক>আটগেসে>আঁটাশে ; সাঁতাশে।

(৩০) **-সই**—জলসই, দশাসই, বুকসই।

[তিন] অন্যান্য তদ্ধিত প্রত্যয়

(ক) প্রচুর পরিমাণ **বিদেশি ফারসী তদ্ধিত প্রত্যয়** বাঙলা শব্দেও ব্যবহৃত হয়।

(১) **-আন,-ওয়ান**—'তার আছে অর্থে'—গাড়োয়ান, দারোয়ান।

(২) **-আনা (-য়ানা)**—শীল বা অভ্যাস অর্থে—বাবুয়ানা—নি, সাহেবিয়ানা।

(৩) **-খানা**—'স্থান'-অর্থে—বৈঠকখানা, মুদিখানা, ডাক্তারখানা, পিলখানা।

(৪) **-খোর**—'সেবী'-অর্থে—গাঁজাখোর, গুলিখোর, ঘুষখোর, চশমখোর।

(৫) **-গর**—'যে গড়ে' অর্থে—কারিগর, বাজিগর (বাজিকর)।

(৬) **-গিরি**—'ভাব বা কার্য' অর্থে—বাবুগিরি, পান্ডাগিরি, কেরানিগিরি।

(৭) **-চা-চি,-চী**—'আধার' অর্থে ধুনাচি, নলিচা, পাতচি ; 'কর্মী' অর্থে—কলমচি, বাবুর্চি, তবলচি।

(৮) **-দান,-দানি**—'পাত্র'-অর্থে—আতরদান, ধুপদানি, পিকদানি।

(৯) **-দার**—'কর্তা'-অর্থে—দোকানদার, চৌকিদার, ডিহিদার, ভাগীদার, সমঝদার।

(১০) **-নবিশ**—'অভিজ্ঞ'-অর্থে—নকলনবিশ, সুমারনবিশ, শিক্ষানবিশ।

(১১) **-বাজ, -বাজি**—'শীল' ও 'ভাব'-অর্থে—কলমবাজ, -বাজি, চালবাজ, ধাঁড়বাজ, গলাবাজি।

(১২) **-সই,-সহি**—'যোগ্যতা' ও 'পরিমাণ' অর্থে—মানানসই, টেকসই, চলনসই, প্রমাণসহি।

(খ) কিছু কিছু সংস্কৃত শব্দ বাংলায় তদ্ধিত প্রত্যয়রূপে ব্যবহৃত হয়।

(১) **জাত**—মূল অর্থ 'উৎপন্ন' হলেও বাঙলায় অন্য অর্থেও তদ্ধিতরূপে ব্যবহার করা হয়।—পকেটজাত, দ্রব্যজাত।

(২) **শুদ্ধ**—'সহ'-অর্থে—সবশুদ্ধ, আমিশুদ্ধ, বই-শুদ্ধ।

(৩) **সহ**—'সঙ্গে'-অর্থে—সবসহ, তুমিসহ, ঢাকিসহ।

(৪) **স্থ**—'স্থিত'-অর্থে—দোকানস্থ, ভদ্রস্থ।

(গ) সংস্কৃত তদ্ধিতান্ত কোন কোন শব্দ বাঙলায় যখন ব্যবহৃত হয়, তখন **তদ্ধিত প্রত্যয়ের অর্থটি পরিবর্তিত** হয়ে যায়, ফলতঃ শব্দের মূল অর্থ বিকারপ্রাপ্ত হয়।

গুরুতর—মূল অর্থ—'দুয়ের মধ্যে অধিকতর গুরু'—কিন্তু বাঙলায় প্রচলিত অর্থে তারতম্যের ভাবটি অন্তর্হিত ; 'অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ' অর্থে ব্যবহৃত।

মহীয়সী—মূল অর্থ—'দুয়ের মধ্যে অধিকতর মহতী'—বাঙলায় এখানেও তারতম্যের ভাবটি অন্তর্হিত।

বলিষ্ঠ—'সর্বাধিক বলশালী'-স্থলে 'অতিশয় বলশালী'-অর্থে বাঙলায় ব্যবহৃত হয়, তারতম্যের ভাবটি এখানেও অন্তর্হিত।

[চার] উপসর্গীয় প্রত্যয় (Prefixes) / আদ্য প্রত্যয়

বৈদিক যুগে উপসর্গগুলো স্বাধীনভাবে ব্যবহৃত হ'তো। সংস্কৃতে ধাতুর পূর্বে উপসর্গের যোগে ধাতুর অর্থান্তর ঘটানো হ'তো, (যেমন—'আ'হার, 'বি'হার, 'প্র'হার, 'সং'হার' প্রভৃতি)। পরে অবশ্য নাম শব্দের পূর্বেও উপসর্গ যোগ করা হ'তো (যেমন —'সু'ভদ্র, 'প্রতি'শব্দ, 'নিঃ'সন্দেহ প্রভৃতি)। জাতিতে এই উপসর্গগুলো অব্যয়। ব্যাকরণে 'উপসর্গ' এই পারিভাষিক নামে চিহ্নিত হ'লেও ভাষাবিজ্ঞানে এদের 'প্রত্যয়' (আদ্যপ্রত্যয়/পূর্বপ্রত্যয়) নামেই অভিহিত করা হয়। ব্যাকরণে উপসর্গ-ব্যতিরিক্ত যে সকল শব্দ উপসর্গ-বৎ শব্দের পূর্বে অবস্থান করে, তাদের বলা হয় 'গতি' (যেমন—'আবি'ষ্কার, 'বহির্'জগৎ, 'পুরো'হিত' প্রভৃতি)—খাঁটি বাঙ্লা উপসর্গকে আমরা এই নামেও পরিচায়িত করতে পারি।

তৎসম শব্দে এবং অন্যত্রও সংস্কৃত উপসর্গগুলি বাংলায়ও ব্যবহৃত হ'য়ে আসছে, এগুলি—'অতি, অধি, অনু, অন্তঃ/অন্তর্, অপ, অপি, অব, অভি, আ, উদ্, উপ, দুঃ-দুর/দুষ্, নি, নিঃ/নির্/নিষ্, পরা, পরি, প্র, প্রতি, বি, সং/সম্, সু'।

বাঙলা ভাষায় যে সকল উপসর্গীয় প্রত্যয় ব্যবহৃত হয়, তাদের মধ্যে কিছু খাঁটি বাঙলা অর্থাৎ সংস্কৃত শব্দ এবং তজ্জাত তদ্ভব শব্দ ; আর কিছু উপসর্গীয় প্রত্যয় আমরা গ্রহণ করেছি বিদেশি ভাষা থেকে—কখনও তাদের উপসর্গ নিয়েছি, কখনো একটা শব্দকেই আমরা উপসর্গরূপে ব্যবহার করছি।

(ক) বাঙলা উপসর্গীয় প্রত্যয়

অ-, অন-, অনা-, আ—সংস্কৃতে উপসর্গ-ব্যতিরিক্ত অনেক শব্দই গতি-রূপে শব্দের আদিতে উপসর্গবৎ যুক্ত হ'তো, তাদের মধ্যে একটি মাত্র 'শব্দাংশ' সমাস-পূর্বপদরূপে গণ্য হ'য়ে উপসর্গীয় প্রত্যয়ের কাজ করতো—এইটি ছিল নঞর্থ 'অ' -বা 'অন্'। ব্যঞ্জনধ্বনির পূর্বে 'অ' বস্তো (অকারণ, অবিমিশ্র) ; এবং স্বরধ্বনির পূর্বে বস্তো 'অন্' (অনসূয়া, অনাদ্য)। বাঙ্লায় এই নঞর্থক বা নিষেধার্থক উপসর্গীয় প্রত্যয়টি যথাযথ অর্থেই প্রসারিত হ'য়ে, অন-, অনা-, আ-' রূপ লাভ করেছে।—অবেলা, অকাজ, অদেখা ; অন্-অবসর, অনাসৃষ্টি (অনাচ্ছিষ্টি), অনামুখো, আদেখলা, আকাল, আলুনি, আকাঁড়া।

(২) **অ-, আ**—স্বার্থে, সাদৃশ্যার্থে বা প্রকৃষ্টার্থে এই উপসর্গীয় প্রত্যয়টি ব্যবহৃত হয়, এটি নঞর্থক নয় বলেই এটির পৃথক্ উৎপত্তি অনুমান করা যায়। সংস্কৃত 'আ-'

উপসর্গ থেকে এটি আসতে পারে অথবা আদি স্বরাগমও এর কারণ হ'তে পারে।— অমন্দ, অকুমারী/আকুমারী, অঘোর, আকাঠা, আস্পর্ধা।

(৩) **আড়**—সংস্কৃত, 'অর্ধ'>অড্ঢ>আড়'।—আড়মাতাল, আড়খেমটা, আড়-চোখের চাউনি, আড়-পাগলা।

(৪) **কু**—সংস্কৃত 'কু' শব্দটি বাঙলায়ও 'কুৎসিত'-অর্থে আদি প্রত্যয়রূপে ব্যবহৃত হয়।—কুকাজ, কুচাল, কুনজর।

(৫) **নি, নির্**—সংস্কৃত 'নহি' শব্দের বিকারে অথবা উপসর্গ 'নি' এবং 'নিঃ' থেকে বাঙলায় এই নঞর্থক উপসর্গীয় প্রত্যয়টি এসে থাকতে পারে। নিনেয়ে (নি-নাইয়া), নিলাজ, নিখাউন্তি, নির্ভরসা, নিজর্শ, নিখরচা, নিঃসাড়ে, নিশ্কেড়ে, নিকড়ে।

(৬) **পাতি**—ক্ষুদ্রার্থে ব্যবহৃত হয়।—পাতিহাঁস, পাতিকুয়া, পাতকো, পাতি-কাক, পাতিলেবু, পাতিশেয়াল।

(৭) **বি**—নঞর্থ—বিকাল, বিজোড়, বিভুঁই।

(৮) **ভর, ভরা**—'পূর্ণ অর্থে'—ভরসন্ধ্যে, ভরদিন, ভরপেট, ভরা যৌবন।

(৯) **স**—'সহিত' অর্থে—সজোরে, স-বুট, স-লাঙ্গল ; স্বার্থে—সঠিক, সক্ষম।

(১০) **সু**—'প্রশংসনীয়'-অর্থে—সুডৌল, সুছাঁদ, সুনজর, সুখবর।

(১১) **হা**—'অভাব' অর্থে—হাভাতে, হাঘরে, হাপুত।

(খ) বিদেশি উপসর্গীয় প্রত্যয়

বিদেশি উপসর্গীয় প্রত্যয়ের মধ্যে আছে বেশ কিছু ফারসী শব্দ ও অব্যয় এবং ইংরেজি শব্দ ও অব্যয়।

(১২) **গর**—'না' বা 'ব্যতীত' অর্থে—গরহাজির, গরমিল, গরকবুল, গরপছন্দ।

(১৩) **দর**—'নিম্নস্থ'-অর্থে—দরপত্তনী, দরইজারা। অন্য অর্থেও এর প্রয়োগ আছে—দরকচা, দরদালান।

(১৪) **না**—নঞর্থক—না-লায়েক, নাবালক (=নাবালিগ্), না-হক্, না-মঞ্জুর।

(১৫) **ফি**—'প্রতি' অর্থে—ফি-সন, ফি-বছর, ফি-রোজ, ফি-হাত।

(১৬) **বদ্**—নিন্দার্থে—বদ্রাগী, বদ্মায়েস, বদ্জাত (>বজ্জাত), বদ্গন্ধ।

(১৭) **বে**—'নিন্দনীয়' বা 'অভাব'-অর্থে—বেচাল, বেবন্দোবস্ত, বেহাত, বে-মক্কা (>বে-মোকা), বে-ঘোরে।

(১৮) **হর**—'প্রতি' বা 'সব'-অর্থে—হরদিন, হররোজ, হরবোলা।

(১৯) **হাফ্** (half)—হাফ হাতা, হাফ-আখড়াই, হাফ-গেরস্ত।

(২০) **হেড্** (head)—হেড্পণ্ডিত, হেড্মুন্সী, হেড বাবুর্চি, হেড্-মিস্ত্রি।

[পাঁচ] সমাস (Compound words)

দুই বা ততোধিক পদের একপদীকরণকে 'সমাস' বলা হয়। যে পদগুলোর একীকরণ করা হয়, তাদের বলে 'সমস্যমান পদ/ব্যস্তপদ', সমাসবদ্ধ পদকে বলে 'সমস্ত পদ' এবং যে বাক্যের সাহায্যে সমাসকে বিশ্লেষণ করা হয় তাকে বলে 'ব্যাসবাক্য'।

বাঙলা সমাস অনেকাংশে সংস্কৃতের অনুসারী হলেও এক বিষয়ে বিরাট পার্থক্য রয়েছে—বাঙলা সমাস সাধারণতঃ বৈদিক যুগের সমাসের মতো দ্বিপদময়, পক্ষান্তরে সংস্কৃতে বহুপদময় সমাসের অভাব নেই। বাঙলায় একটি বৈশিষ্ট্য—'সমষ্টিগত যোগ' (Group inflexion)—অর্থাৎ বিভক্তিচিহ্ন-বিহীন কতকগুলো শব্দ যোগ করে শেষ শব্দটির সঙ্গে বিভক্তিযোগ, ফলতঃ সবগুলো শব্দ মিলিতভাবে সমাসবদ্ধ পদ-রূপে প্রতীয়মান হয়।

সাধারণতঃ তৎসম শব্দের সঙ্গে তৎসম শব্দের সমাস-বন্ধনই অভিপ্রেত হ'লেও বাঙলায় তৎসম শব্দের সঙ্গে অপর জাতীয় শব্দের তথা বিভিন্ন জাতীয় শব্দের পারস্পরিক সমাসবন্ধন বহু প্রচলিত। এক সময় 'শব-পোড়া, মরাদাহ' প্রভৃতি সমাসবদ্ধ পদ হাসির খোরাক যোগাত এবং গুরুচণ্ডালী দোষ বলে গণ্য হ'তো। এক্ষণে 'শ্বশুর-ঘর, হেডপণ্ডিত, চাঁদবদন' প্রভৃতি শব্দ আর আপত্তিকর বিবেচিত হয় না।

সংস্কৃতে যে সকল সমাস প্রচলিত আছে, তাদের প্রায় সব কটিই বাঙলাতেও প্রচলিত। সমাসের পূর্বপদের বিভক্তিলোপ সংস্কৃতের মতো বাঙ্লারও একটি সাধারণ নিয়ম। তবে পূর্বপদে বিভক্তিচিহ্নের বর্তমানতা অর্থাৎ অলুক সমাসের ব্যবহার বাঙলায় সংস্কৃতের চেয়ে অনেক বেশি এবং প্রায় সর্ববিধ সমাসেই 'অলুক্' সহজপ্রাপ্য। বাঙ্লায় কোন কোন সমাসের পর সমাসান্ত তদ্ধিত 'ঈ, ইয়া>এ' ব্যবহৃত হ'য়ে থাকে।

সংস্কৃতের মতোই বাঙলা সমাসকেও মোটামুটি তিনটি প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত করা চলে: (ক) 'সংযোগমূলক বা দ্বন্দ্বসমাস' (Copulative/Collective Compounds), (খ) 'ব্যাখ্যানমূলক বা আশ্রয়মূলক সমাস' (Determinative compounds), (গ) 'বর্ণনামূলক সমাজ' (Descriptive compounds)।

(ক) **সংযোগমূলক সমাস**—দ্বন্দ্বসমাস এই জাতীয় সমাস, এই সমাসে উভয় পদের অর্থই প্রধান থাকে।—মা-বাপ, ভাই-বোন, দুধ-ভাত, গাড়ী-ঘোড়া, মুড়ি-মুড়কি, গাই-বলদ, রাজা-উজির, ডাক্তার-বদ্যি, হাট-বাজার, কেতাব-পত্র। বাঙলায় দ্বন্দ্বসমাসে দু'য়ের অধিক পদও ব্যবহৃত হয়। তেল-নুন-লকড়ি, ইট-কাঠ-চুন-সুরকি, ধন-দৌলত-লোক-লস্কর।

বাঙলায় অলুক দ্বন্দ্বের ব্যবহারও প্রচুর।—হাটে-বাজারে, পথে-ঘাটে, ঠ্যারে-ঠোরে, দুধে-ভাতে।

'অনুরূপ বস্তু' বোঝানোর জন্যে বাঙলায় সহচর, অনুচর, প্রতিচর এবং বিকার শব্দের যোগেও দ্বন্দ্বসমাসের পদ গঠিত হয়।—চুরি-চামারি, ছেলে-ছোকরা, কাপড়-চোপড়, আলাপ-সালাপ ; মেয়ে-মদ্দ, বামুন-বোষ্টম ; ফাঁকি-ঝুঁকি, ভাত-টাত।

'**সমার্থক দ্বন্দ্ব**' সমাসের দৃষ্টান্তও বাঙলায় সহজলভ্য।—রাজা-বাদশা, ভাগ-বাটোয়ারা, চিঠি-পত্র।

(খ) **ব্যাখ্যানমূলক সমাস : এই শ্রেণীভুক্ত সমাসের মধ্যে পড়ে** (১) তৎপুরুষ, (২) কর্মধারয়, (৩) দ্বিগু।

তৎপুরুষ সমাস—এই জাতীয় সমাসে দ্বিতীয় পদের অর্থ প্রধান হলেও প্রথম পদটি কর্তা-কর্ম-করণ-আদি সম্বন্ধ রূপে দ্বিতীয়টির সঙ্গে অন্বিত থাকে। প্রথম পদে যে সম্বন্ধটি সূচিত হয়, তৎপুরুষ সমাসটির নামকরণ হয় সেই অনুযায়ী। সংস্কৃতে কর্তায় ১মা, কর্মে ২য়া, করণে ৩য়া-আদি সম্পর্ক বর্তমান থাকায় দ্বিতীয়া তৎপুরুষ, তৃতীয়া তৎপুরুষ, চতুর্থী তৎপুরুষ প্রভৃতি নাম প্রচলিত হয়েছে। কিন্তু বাঙলায় এরূপ সুনির্দিষ্ট বিভক্তি না থাকায় এদের নামকরণ হওয়া উচিত কর্তৃবাচক তৎপুরুষ, কর্মবাচক তৎপুরুষ, করণ-বাচক তৎপুরুষ ইত্যাদি রূপে।

(অ) **কর্তৃবাচক (১মা) তৎপুরুষ**—দাগ-লাগা, ঘর-চাপা।

(আ) **কর্মবাচক (২য়া) তৎপুরুষ**—জল-তোলা, রথ-দেখা, ছেলে-ভুলানো, মাথা-গোঁজা, ভুঁই-ফোড়, আধ-পাকা, নিম-রাজি।

(ই) **করণবাচক** (৩য়া) **তৎপুরুষ**—মন-গড়া, নুনমাখা, দা-কাটা, ঘি-ভাত, পোয়া-কম, মা-হারা, ঢেঁকি-ছাঁটা।

(ঈ) **তাদর্থ্যবাচক** (৪র্থী) **তৎপুরুষ**—বিয়ে-পাগল, ডাক-মাসুল, হিন্দু-স্কুল, জীয়ন-কাঠি, বালিকা-বিদ্যালয়।

(উ) **অপাদানবাচক** (৫মী) **তৎপুরুষ**—ঘর-পালানো, দল-ছাড়া, আগা-গোড়া, থলে-ঝাড়া, বিলাত-ফেরত।

(ঊ) **সম্বন্ধবাচক** (৬ষ্ঠী) **তৎপুরুষ**—ঠাকুর-ঘর, পুকুর-ঘাট, বাঁদর-নাচ, ধানক্ষেত, টেঁকঘড়ি, ঠাকুরপো, চা-বাগান, রেল-কুলি।

(ঋ) **অধিকরণবাচক** (৭মী) **তৎপুরুষ**—গাছ-পাকা, পুঁথিগত, গোলা-ভরা, মাথা-ব্যথা, বাক্সবন্দী, পকেটজাত।

(ৠ) **অলুক তৎপুরুষ**—এই সমাসে পূর্বপদের বিভক্তি চিহ্নটি লোপ পায় না—গায়ে-হলুদ, ছিপে-গাঁথা, মামার-বাড়ি, মাথায়-টুপি. কাঁধে-গামছা।

(ঌ) **উপপদ তৎপুরুষ**—দ্বিতীয় পদটি কৃৎপ্রত্যয়-যুক্ত এবং প্রথম পদটি উপসর্গের মত ব্যবহৃত হয়; সমস্ত পদের বাইরে কৃদন্ত দ্বিতীয় পদটির স্বাধীন ব্যবহার চলে না—মোটামুটি এইটিই উপপদ তৎপুরুষের লক্ষণ।—ছেলেধরা, বর্ণচোরা, মনোলোভা, মিছকউনে, হালুইকর।

(এ) **নঞ্-তৎপুরুষ**—আ-লুনি, অকর্মা, অনামুখো।

(ঐ) **অব্যয়ীভাব**—সমস্ত পদটি অব্যয়ে পরিণত এবং বাক্যে ক্রিয়া-বিশেষণ-রূপে অবস্থান করে।—ঘর-ঘর, ভরপেট, দিনভর, হর-রোজ, কমবেশী, একহাত, সারাবেলা।

(২) **কর্মধারয় সমাস**—কর্মধারয় সমাস বস্তুতঃ কর্তৃবাচক বা ১মা তৎপুরুষ, এতে পূর্বপদ উত্তর পদের বিশেষণ বা বিশেষণস্থানীয় হয়, অর্থের দিক থেকে দ্বিতীয় পদটিরই প্রাধান্য থাকে।

(অ) **সাধারণ কর্মধারয়**—কাল-পেঁচা, খাস-মহল, চালাক-চতুর, টাটকা-ভাজা, ফিকে লাল, ঠাকুর-মশাই, রাজাবাহাদুর, কুনজর, বিভুই, আলুসিদ্ধ।

(আ) **মধ্যপদলোপী কর্মধারয়**—ঘর-জামাই, তেলধুতি, ঘি-ভাত, যম-যন্ত্রণা, মানিব্যাগ, ফাঁসিকাঠ।

(ই) **উপমান কর্মধারয়**—সিঁদুর-লাল, অরুণ-রাঙা, মিশকালো।

(ঈ) **উপমিত কর্মধারয়**—পদ্ম-আঁখি, সোনামুগ, কাঁচপোকা।

(উ) **রূপক কর্মধারয়**—প্রাণপাখি, আঁখিপাখি, কান্নাসাগর।

(৩) **দ্বিগুসমাস**—প্রথম পদটি সংখ্যাবাচক এবং সমস্ত পদটি সমষ্টিবাচক হয়।—চার-চোখ, তিন-ঠ্যাং, দশ-হাতি (শাড়ি), তে সনি, (ইনাম)।

(গ) **বর্ণনামূলক সমাস**—এই পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত বহুব্রীহি সমাস। এতে কোন

পদের অর্থই প্রধান নয়, এদের মিলিত অর্থ অপর কোন পদার্থকে বোঝায়। বহুব্রীহি সমাসে অনেক সময় সমাসান্ত প্রত্যয় যুক্ত হয়।

(অ) **ব্যধিকরণ বহুব্রীহি**—দেখন-হাসি, সোনামুখ, গোঁফ-খেজুরে, বার-মুখো, চাঁদবদনী, উট-কপালী।

(আ) **সমানাধিকরণ বহুব্রীহি**—কালোবরণ, কানাচোখো, কালাপেড়ে, লাল-পাগড়ি, হতভাগা, উন-পাঁজুরে।

(ই) **ব্যতিহার বহুব্রীহি**—লাঠালাঠি, হাতাহাতি, চুলোচুলি, টানাটানি, ধরাধরি, সোজাসুজি, রাতারাতি, মোটামুটি।

(ঈ) **মধ্যপদলোপী বহুব্রীহি**—দশ-বছুরে, দেড়হাতী।

(উ) **অলুক্ বহুব্রীহি**—গায়ে-হলুদ, ঘাড়ে-পড়া, ছড়ি-হাতে, মুখে-মধু।

(ঘ) **বাক্যাংশ সমাস**—সম্বোধন পদ ও ক্রিয়াপদের একীকরণে এবং বাক্যের অংশকে একপদরূপে গ্রহণ করে বাঙলায় একধরনের সমাস নিষ্পন্ন হয়ে থাকে, যাদের প্রচলিত কোন সমাসের আওতায় আনা যায় না—এদের 'বাক্যাংশ সমাস' নামে অভি-হিত করা চলে। সম্বোধন পদ ও ক্রিয়াপদের সমন্বয়ে অথবা শুধু একাধিক সম্বোধন পদে গঠিত সমস্ত পদ সাধারণতঃ বাঙলায় ব্যক্তিনাম-রূপেই ব্যবহৃত হয়।—আন্না-কালী (আর-না-কালী), থাক-মনি, রাখহরি, জয়গোপাল, হরেকৃষ্ণ, হরিবোল।

বাক্যের অংশকে একপদ-রূপে গ্রহণ—যাচ্ছেতাই (যা ইচ্ছা-তাই), নাস্তানাবুদ, (ন অস্তু ন বুদ), 'পেছনে-ফেলে-আসা-দিনগুলো', 'যেমন-তেমন-করে-করা-কাজ', 'সব-পেয়েছির দেশ'।

বাঙলায় দীর্ঘ সমাসবদ্ধ পদকে অনেক সময় পৃথক্ শব্দে লেখা হয়; সংযোগ চিহ্ন দ্বারা এদের সংযুক্ত করা প্রয়োজনীয় হলেও সম্ভবতঃ দৃষ্টিকটুত্বের জন্যই অধিক সংযোগ-চিহ্ন (হাইফেন) বর্জিত হয়ে থাকে—এদের '**অসংলগ্ন সমাস**' নামে অভিহিত করা চলে।—নিখিল ভারত গোসেবা সমিতি, প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন, প্রস্তর এবং ইষ্টকাদিনির্মিত প্রাসাদ।

[ছয়] শব্দদ্বৈত দ্বিরুক্ত শব্দ (Reduplication of words)

গ্রন্থের 'ধ্বনিতত্ত্ব' অধ্যায়ের 'ধ্বনি-রূপান্তর'-শীর্ষক আলোচনায় 'অনুকার শব্দ' (Echo word), 'অনুগামী শব্দ' (Dependent/Tag word) এবং 'সমার্থক অনুগামী শব্দ' (Tautologous compound) নামক বিষয়গুলির ধ্বনিতাত্ত্বিক দিক্ বিচার করা হয়েছে। গঠনের দিক্ থেকে, এগুলি যেহেতু একাধিক শব্দের সমন্বয়ে

গঠিত, তাই এগুলিকে অনেকেই 'সমাস' বলেই মনে করেন। ধ্বনিতাত্ত্বিক দিক্ থেকে পার্থক্য থাকলেও গঠনের বিচারে এদের একশ্রেণীভুক্ত করা হয় এবং বলা হয় 'শব্দদ্বৈত' বা 'দ্বিরুক্ত শব্দ'। সাধারণতঃ দু'টি শব্দ মিলিতভাবে একটি শব্দে পরিণত হয় এবং দ্বিতীয় শব্দটির প্রকৃতি অনুধাবন করেই এদের নামকরণ করা হয়। (ক) পুনরুক্ত শব্দ, (খ) অনুকার শব্দ, (গ) অনুগামী শব্দ ও (ঘ) সমার্থক অনুগামী শব্দ। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য এই যে, দ্বিরুক্ত শব্দ বিশেষ্য, বিশেষণ বা ক্রিয়া যে কোন পদেরই হ'তে পারে।

(ক) যখন একই শব্দের পুনরুক্তি দ্বারা দ্বিরুক্ত শব্দ গঠন করা হয়, তখন তাকে বলা চলে 'পুনরুক্ত শব্দ' (Repeated word)।—বড়-বড়, দেখে-দেখে, নিজে-নিজে, সকাল-সকাল।

(খ) দ্বিতীয় শব্দটি যখন অর্থহীন এবং প্রথম শব্দটির কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত রূপ, অনেকটা প্রতিধ্বনির মতো, তখন তাকে বলা যায় 'অনুকার শব্দ' (Echo word)। —বই টই, ভাত-ফাত, লুচি-মুচি।

(গ) দ্বিতীয় শব্দটি ধ্বনিতে এবং অর্থে প্রথম শব্দটির নিকটসম্পর্কযুক্ত অথচ স্বাধীনভাবে ব্যবহৃত হয় না, শুধুই প্রথম শব্দটির সঙ্গে সমাসবদ্ধ আকারেই ব্যবহৃত হয়, এরূপ দ্বিরুক্ত শব্দকে বলা চলে 'অনুগামী শব্দ' (Dependent/Tag word)। —রাজা-রাজড়া, গাছ-গাছড়া, ছেলে-পিলে।

(ঘ) প্রথম ও দ্বিতীয়—উভয় শব্দ সমার্থক এবং উভয়েই স্বাধীনভাবে ব্যবহৃত হ'তে পারে, তৎসত্ত্বেও যখন দুটি মিলে দ্বিরুক্ত শব্দে পরিণত হয়, তখন তাদের 'সমার্থক অনুগামী' (Tautologous Compound) নামে অভিহিত করা চলে।— পুথি-পত্র, কাগজ-পত্র, দলিল-দস্তাবেজ, লেখা-জোখা।

শব্দগুলি দ্বিরুক্ত হ'বার ফলে তাদের অর্থসামর্থ্য বৃদ্ধি পায় এবং নানাবিধ ভাব প্রকাশেই তা' সক্ষম। নিম্নে এজাতীয় শব্দের কিছু অর্থ-সামর্থ্যের পরিচয় দেওয়া হ'লো।

(১) বহুবচনের ভাব-প্রকাশ করতে পুনরুক্ত শব্দের ব্যবহার করা হয়।—ঘরে-ঘরে, বড়-বড়, লাল-লাল, চোখে-চোখে, দেখে-দেখে, ফিরে-ফিরে।

(২) ঈষৎ বা সাদৃশ্য বোঝাতে পুনরুক্ত শব্দ ব্যবহৃত হয়।—'জ্বর জ্বর' ভাব, 'কাঁদো কাঁদো' মুখ, 'শীত শীত' ভাব, 'যাই যাই' করা।

(৩) ব্যতিহার বা পারস্পরিক ভাব বোঝাতে দ্বিতীয় শব্দে শুধু স্বরধ্বনির (-আ>ই) পরিবর্তন ঘটে।—হাতাহাতি, কোলাকুলি, ধরাধরি, খেওখেয়ি

(৪) ক্রিয়ার অসম্পূর্ণতা-জ্ঞাপনে 'ইতে' প্রত্যয়ান্ত পুনরুক্ত শব্দ ব্যবহৃত হয়।—দেখিতে দেখিতে, শুনতে শুনতে, খেতে খেতে।

(৫) 'অনুরূপ' অথবা 'ইত্যাদি'—অর্থ বোঝাতে 'অনুকার' ও 'অনুগামী শব্দ' ব্যবহৃত হয়।

(৬) 'সম্পূর্ণতা' বোঝানোর জন্য সাধারণতঃ 'সমার্থক অনুগামী' শব্দ ব্যবহৃত হয়।

(৭) অধিকাংশ 'ধ্বন্যাত্মক শব্দ'ই (দ্রঃ 'ধ্বনিতত্ত্ব' অধ্যায়ের 'ধ্বনি-রূপান্তর' শীর্ষক আলোচনা) দ্বিরুক্ত অনুকার শব্দ। এতে পরবর্তী শব্দের ধ্বনি পরিবর্তনে শব্দের অর্থসামর্থ্যও পরিবর্তিত হয়।

ধ্বন্যাত্মক কিংবা অনুকার শব্দের প্রতিধ্বনি রূপ দ্বিতীয় শব্দটির স্বর বা ব্যঞ্জন ধ্বনির পরিবর্তন কীভাবে নানাপ্রকার অর্থ পরিবর্তনের ইঙ্গিত করে, আচার্য সুনীতি কুমারের ব্যাকরণ-অনুসরণে তার পরিচয় নিম্নে প্রদত্ত হ'লো।

(১) মূল শব্দের স্বরধ্বনির পরিবর্তন দ্বারা :

(ক) ধ্বন্যাত্মক শব্দে ঈষৎ পরিবর্তিত ধ্বনির ভাব নিয়ে আসে।—টুপুর্ টাপুর্, দুপ্-দাপ্, টুপ্-টুপ্ ও টুপ্-টাপ, ঠাকুর-ঠুকুর।

(খ) ধ্বন্যাত্মক-ব্যতীত অপর শব্দে ভাবের প্রকর্ষ বা সম্পূর্ণতা প্রকাশ করে অথবা স্বার্থে কিংবা অর্থ প্রসারণে ব্যবহৃত হয়।—চুপ্‌চাপ, ফিট্‌ফাট্, ছিম্‌ছাম্, সাজ-গোজ, ধার-ধোর, মিট্‌মাট, জোগাড়-জাগাড়।

(২) মূল শব্দের ব্যঞ্জনধ্বনি-পরিবর্তনে 'ইত্যাদি' অর্থে শব্দের প্রসার :

(ক) 'ট'-বর্ণ-যোগে অনুরূপ বস্তু অর্থে: ভাত-টাত, বই-টই, গিয়ে-টিয়ে, দেখলে-টেকলে।

(খ) 'ফ' বর্ণ যোগে 'অবজ্ঞা' অর্থে ভাত-ফাত, লুচি-ফুচি, তাস-ফাস, গিয়ে-ফিয়ে।

(গ) 'স' বর্ণ যোগে আদর/কোমলতার ভাব প্রকাশে : জড়-সড়, বোকা-সোকা, রকম-সকম, আঁট-সাট, গুটিয়ে-সুটিয়ে।

(ঘ) 'ম'-বর্ণ-যোগে 'অপ্রীতি' বা 'রুক্ষতা'-প্রকাশে : ছাতা-মাতা, কাগজ-মাগজ, বুঝো-মুঝো।

(৩) ধ্বন্যাত্মক শব্দের দ্বিরুক্তির দুটি শব্দই অর্থহীন হ'লেও দ্বিতীয় শব্দটি প্রতিরূপ বা প্রতিধ্বনি হ'য়ে থাকে ; বড়জোর স্বরধ্বনির পরিবর্তন হয়। কিন্তু শব্দ-দ্বৈতে এমন দ্বিরুক্ত শব্দ অনেক পাওয়া যায়, যেখানে দুটি শব্দের আদি ব্যঞ্জনে পার্থক্য থাকে এবং দুটিই বিশেষ অর্থহীন শব্দ-মাত্র। তবে দ্বিরুক্ত হবার পর অর্থ-

সামর্থ্য সৃষ্টি হয়।—উস্-খুস্, হাঁস-ফাঁস, আই-ঢাই, আবোল-তাবোল, হিজি-বিজি, ভড়্-বড়্, ছট্-ফট্, আগড়ম্-বাগড়ম্।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য—'ধ্বন্যাত্মক শব্দে' আদি ব্যঞ্জনের প্রয়োগ যে বিশেষ বিশেষ অর্থ প্রকাশ করতে পারে, এ বিষয়ের আলোচনার জন্য 'ধ্বন্যাত্মক শব্দ' শীর্ষক আলোচনা দ্রষ্টব্য।

[সাত] শব্দ গঠনের অন্যান্য উপায়

(ক) বাঙলা কৃৎপ্রত্যয়, তদ্ধিত প্রত্যয় এবং সমাসের সাহায্যেই প্রধানতঃ বাঙলা শব্দ গঠিত হলেও আরও বিচিত্র উপায়ে কিছু কিছু শব্দ নির্মিত হয়ে থাকে।—তৎসম শব্দের সঙ্গে তৎসম প্রত্যয় যোগ ক'রে কিছু শব্দ সৃষ্টি হয়েছে, যেগুলোকে একান্ত-ভাবেই নূতন সৃষ্ট শব্দ বলে অভিহিত করতে হয়—সংস্কৃত ব্যাকরণ অভিধানে এদের কোন স্থান নেই।—অবসৃত (=অবসরপ্রাপ্ত), উৎপাতক (=উৎপাতকারী), পরি-দর্শয়িতা (=পরিদর্শক), দ্বৈপায়নতা – (অনন্যসংযুক্তি), নির্ভরী (=নির্ভর-শীল), জানপদিক (popular), অনুষঙ্গী (=সহচর), আগ্রাসন (aggression), অবলুণ্ঠন (=লুটাইয়া পড়া), নির্মশক (=মশকহীন)।

(খ) অনেক বিদেশি শব্দ; বিশিষ্টার্থক পদগুচ্ছ বা বাক্যাংশের অনুবাদও নূতন নূতন শব্দ গঠনে সহায়তা করে।—সিংহভাগ (lion's share), বিহঙ্গমাবলোকন (bird's eye veiw), ধন্যবাদ (thanks), ভূমিপুত্র (son of the soil), ভাগ্যের পরিহাস (irony of fate), ফিরতি টিকিট (return ticket), কালো টাকা (black money), রূপালি রেখা (silver lining), মনস্তাত্ত্বিক চাপ (psychological pressure) প্রভৃতি চালু হ'য়ে গেলেও এ জাতীয় আরো কিছু শব্দ উদ্ভাবিত হ'য়ে চলছে। যেমন—কালো ঘোড়া (dark horse), কক্ষ সমন্বয় (floor-coordination), গো-বলয় (cow-belt)।

(গ) ভিন্ন ভাষার শব্দ রূপান্তরিত হ'য়ে বাঙলা ভাষায় পরিণত হ'য়েছে, এরূপ শব্দের সংখ্যাও বাঙলায় কম নয়।—লণ্ঠন (lantern), লম্ফ (lamp), টিউকল, টিপকল (tubewell), লাগাতার।

(ঘ) শব্দের অংশবিশেষ গ্রহণ ক'রে অথবা শব্দকে সংক্ষিপ্ত ক'রেও নূতন শব্দ গঠন করা যায়। বাস্ (omnibus), বাইক্ (bicycle), ফোন (telephone), উদো (উদ্ধব), দীপু (দীপেন্দ্র)।

(ঙ) বিভিন্ন শব্দের আদি অক্ষর পরস্পর সাজিয়ে একজাতীয় মুণ্ডমাল শব্দ করা হয়।—সসেমিরা, পিপুফিশু, বেনীআসহকলা, বি. এ. (Bachelor of Arts)।

সপ্তদশ অধ্যায় | # রূপতত্ত্ব (২) : বাঙলা পদ-পরিচয়

[এক] পদের শ্রেণীবিভাগ

বাক্যে ব্যবহৃত হ'বার যোগ্যতা-সম্পন্ন ধ্বনি বা ধ্বনিসমষ্টি তথা শব্দকে 'পদ' বলা হয়। কিন্তু সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়মে শব্দের সঙ্গে বিভক্তি যোগ না ক'রে বাক্যে ব্যবহার করা যায় না ; অতএব সংস্কৃতে বিভক্তিযুক্ত শব্দই 'পদ'। সংস্কৃতের এই হিশেবের সঙ্গে বাঙলার হিশেব মেলে না। কারণ, সংশ্লেষাত্মক ভাষা সংস্কৃত বিভক্তির উপর একান্তভাবে নির্ভরশীল, পক্ষান্তরে বিশ্লেষণাত্মক প্রবণতা-যুক্ত ভাষা বাঙলায় বিভক্তির ব্যবহার অপরিহার্য নয়। বিভক্তির সাহায্যেই সংস্কৃতে ক্রিয়ার সঙ্গে বিভিন্ন পদের সম্পর্ক নিরূপিত হয়, আর বাঙলায় তা' সাধিত হয় প্রধানতঃ বাক্যে পদের অবস্থানের উপর। তাই সংস্কৃতে 'শব্দে' এবং 'পদে' পার্থক্য যতটা সুস্পষ্ট, বাঙলায় ততটা নয়। বরং ইংরেজিতে 'Part of Speech' বলতে যা' বোঝায়, বাঙলায় 'পদ' বলা হয় তাকেই এবং বাঙলায় শব্দ ও পদ পরস্পরের প্রতিশব্দ-রূপে নির্বিচারে ব্যবহৃত হ'য়ে থাকে।

বাঙলা ব্যাকরণের কাঠামো গড়ে উঠছে অনেকাংশে ইংরেজি ব্যাকরণকে ভিত্তি করে। তাই ইংরেজির অনুকরণে বাঙলা ব্যাকরণেও পদের পঞ্চধা (বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্বনাম, ক্রিয়া, অব্যয়) অথবা অষ্টধা বিভাগ কল্পিত হয়। যথা—১. বিশেষ্য (Noun), ২. বিশেষণ (Adjective), ৩. সর্বনাম (Pronoun), ৪. ক্রিয়া (Verb), ৫. ক্রিয়া-বিশেষণ (Adverb), ৬. উপসর্গ (Preposition), ৭. সংযোজক-বিয়োজক অব্যয় (Conjunction) এবং ৮. বিস্ময়বোধক অব্যয় (Interjection)।

বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির বিচারে ইংরেজি ব্যাকরণসম্মত পদের এই শ্রেণীবিভাগ বাঙলায় গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ ব্যাকরণের দিক থেকে বিশেষ্য ও বিশেষণে কোন পার্থক্য নেই—একের স্থলে অপরের ব্যবহার বাঙলায় অপ্রতুল নয়। আবার ক্রিয়া-বিশেষণ, উপসর্গ এবং দ্বিবিধ অব্যয়ের মধ্যে কোন মৌলিক পার্থক্য নেই—বস্তুত এরা সবই অব্যয় অর্থাৎ রূপান্তররহিত। সেই হিশেবে বাঙলায় বিশেষণকেও কখন কখন এই শ্রেণীভুক্ত করা চলে।

প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে মহামুনি পাণিনি পদের যে শ্রেণীবিভাগ করে-ছিলেন, আধুনিক পাশ্চাত্য ভাষাবিজ্ঞানীদের মতেও এই পদবিভাগই আদর্শস্থানীয়।

তিনি সমস্ত পদকে তিনশ্রেণীতে বিভক্ত করেন—১. সুবন্ত, ২. তিঙন্ত, ৩. নিপাত। পাণিনি-পূর্বকালে বৈদিক প্রাতিশাখ্যকার পদের চতুর্ধা বিভাগ কল্পনা করেছিলেন—নামপদ (সুবন্ত), আখ্যাত (তিঙন্ত), উপসর্গ ও নিপাত।

পাণিনি যেভাবে পদবিভাগ করেছেন, আধুনিক ব্যাকরণের বিচারে তাকে এইভাবে বিশ্লেষণ করা যায়ঃ—১. **সুবন্ত পদ** অর্থাৎ 'সুপ্' বা শব্দবিভক্তিযুক্ত পদ—সংস্কৃত ব্যাকরণের মতে বিশেষ্য, বিশেষণ ও সর্বনাম অর্থাৎ 'নামপদ' এই বিভাগের অন্তর্ভুক্ত। ২ **'তিঙন্ত'** অর্থাৎ 'তিঙ্' বা ধাতুবিভক্তি-যুক্ত পদ—এককথায় ক্রিয়াপদ বা 'আখ্যাত' এই পর্যায়ভুক্ত। ৩. **'নিপাত'** বা অব্যয়—যাতে কোন বিভক্তি কখনও যুক্ত হয় না অর্থাৎ এর রূপে কোন পরিবর্তন হয় না। এই অব্যয়ের মধ্যে পড়ে উপসর্গ, কিছু কিছু মূলতঃ নামপদ—'দিবা, মিথ্যা, পুরা' প্রভৃতি, বাঙলা অসমাপিক ক্রিয়াপদ— -ইতে' -ইলে, -ইয়া'-যুক্ত পদ, এবং বাঙলায় বিশেষণ পদে বিভক্তিচিহ্ন যোগ হয় না বলে এগুলোও অব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত হবারই যোগ্য ; ক্রিয়াবিশেষণ, সংযোজক বিয়োজকাদি অব্যয়, বিস্ময়বোধক অব্যয় এবং বাঙলা ভাষায় ব্যবহৃত অসংখ্য অনুসর্গ--এগুলোও অব্যয়।

ব্যাকরণের বিচারে পদের আরও সূক্ষ্মতর বিভাগঃ **রূপগ্রহ বা সবিভক্তিক** (Inflexional) **অরূপগ্রহ বা বিভক্তিহীন** (Non-inflexional) **পদ**। বাঙলায় রূপগ্রহ পদ বলা যেতে পারে তাদেরই যেগুলোতে বিভক্তিচিহ্ন যুক্ত হয়। এদেরও আবার দ্বিধা বিভক্তীকরণ সম্ভব—একভাগে নামপদ অর্থাৎ বিশেষ্য ও সর্বনাম, অপরভাগে আখ্যাত বা ক্রিয়াপদ। অরূপগ্রহ পদ বলতে বোঝায় সেই সমস্ত পদকে যাদের সঙ্গে কারক-পুরুষ-লিঙ্গ-বচন কিংবা কাল-ভেদে কোন বিভক্তি যুক্ত হয় না বা যাদের কোন রূপান্তর ঘটে না—এই বিভাগে পড়েছে বিশেষণ ও সর্বশ্রেণীর অব্যয় এবং অসমাপিকা ক্রিয়াপদ।

পূর্বোক্ত পদবিভাগ আদর্শস্থানীয় হলেও বাঙলা ব্যাকরণে কিংবা শব্দবিদ্যায় এখনও গৃহীত হয়নি এবং এগুলো এখনো তেমন পরিচিত বা প্রচলিত নয়। তাই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সঙ্গে সামঞ্জস্যবিধান করে প্রচলিত রীতি-অনুযায়ী নিম্নোক্তক্রমে পদবিভাগ করা হ'লোঃ—(ক) বিশেষ্য-বিশেষণ-সর্বনাম বা নামপদ, (খ) ক্রিয়াপদ, (গ) অব্যয়। বাঙলায় বিশেষণ সাধারণভাবে অরূপগ্রহ হ'লেও অনেকসময় বিশেষণ-গুলো বিশেষ্যবৎ ব্যবহৃত হয় এবং তখন এদের দেহে কারক-লিঙ্গ-বচনাদিসূচক বিভক্তি-চিহ্ন যোগ করতে হয়। আবার বাঙলা সাধুভাষায় বিশেষণের অনেক সময় লিঙ্গান্তরও ঘটে থাকে। এই কারণেই বিশেষণকেও বিশেষ্য ও সর্বনামের মত নামপদের অন্তর্ভুক্ত

করা সঙ্গত। ক্রিয়াবিশেষণ অব্যয়ের মত অরূপগ্রহ হওয়া-সত্ত্বেও মূলতঃ বিশেষণ বলেই বিশেষণের অন্তর্ভুক্ত করা সঙ্গত। অসমাপিকা ক্রিয়াপদও অব্যয়ের মত অপরিবর্তনীয় হওয়া সত্ত্বেও ক্রিয়াপদের অন্তর্ভুক্ত হ'বার যোগ্য। উপসর্গ প্রকৃতই অব্যয়, তাই অব্যয়ের সঙ্গে আলোচ্য। বাঙলায় ব্যবহৃত অনুসর্গগুলো কতক নামপদজাত, কতক ক্রিয়াপদ-জাত ; এরাও অব্যয়ের মত অপরিবর্তনীয়, কিন্তু মূলতঃ এগুলো বিভক্তির পরিবর্তে ব্যবহৃত হয় বলেই কারক-বিভক্তির সঙ্গে এদের যুক্ত করা হ'লো।

[দুই] বিশেষ্য

মানুষের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অথবা উপলব্ধিগোচর যে কোন বস্তু, ভাব, গুণ, সত্তা বা ক্রিয়াবাচক শব্দকেই **বিশেষ্য** বা **নামশব্দ**-রূপে অভিহিত করা চলে। আমরা বাক্যে যে সমস্ত শব্দ ব্যবহার করি তাদের একটা বৃহৎ অংশই বিশেষ্যপদবাচ্য। লিঙ্গ, বচন এবং ক্রিয়ার সঙ্গে সম্বন্ধভেদে বিশেষ্যের রূপান্তর ঘটে থাকে। যে কোন বিশেষ্য শব্দই প্রথম-পুরুষ বাচক।

(ক) লিঙ্গ

সংস্কৃতে ও প্রাকৃতে পুংলিঙ্গ, স্ত্রীলিঙ্গ ও ক্লীবলিঙ্গ —ত্রিবিধ লিঙ্গভেদ ছিল। এই লিঙ্গভেদে যে সর্বত্র প্রাকৃতিক বিধান মানা হ'তো তা নয়। যেমন—'স্ত্রী'-বাচক তিনটি শব্দ—'পত্নী' (স্ত্রীলিঙ্গ), 'দার' (পুংলিঙ্গ), 'কলত্র' (ক্লীবলিঙ্গ)। সংস্কৃত ও প্রাকৃতের স্ত্রীলিঙ্গ-বাচক প্রধান তিনটি প্রত্যয় আ, ই, ঈ, অবভ্রংশের স্তরে 'অ' কারে পরিণত হওয়াতে স্ত্রীলিঙ্গবাচক শব্দগুলো পুংলিঙ্গ-বাচক শব্দে পরিণত হ'লো। বাঙলায় এ সমস্ত শব্দকে আবার স্ত্রীলিঙ্গে রূপান্তরিত করবার জন্য নোতুন প্রত্যয়ের প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল।

বাঙলা ভাষায় প্রাকৃতিক লিঙ্গভেদে প্রতিষ্ঠিত হ'য়েছে। পুরুষবাচক প্রাণী পুংলিঙ্গ, স্ত্রীবাচক প্রাণী স্ত্রীলিঙ্গ এবং অপ্রাণীবাচক বস্তু, ক্রিয়া বা ভাব ক্লীবলিঙ্গ। বাঙলা অভিধানে কিংবা ব্যাবহারিক দিক থেকে ত্রিবিধ লিঙ্গের স্বীকৃতি মিললেও ব্যাকরণের দিক থেকে ক্লীবলিঙ্গের কোন অস্তিত্ব নেই। পৃথিবীর অনেক ভাষাতেই—সংস্কৃত, হিন্দী, জার্মান প্রভৃতি—বিশেষ্যের লিঙ্গভেদ-অনুযায়ী বিশেষণ এবং অনেক ক্ষেত্রে ক্রিয়ারও লিঙ্গভেদ ঘটে, কিন্তু আধুনিক বাঙলায় বিশেষণ ও ক্রিয়াপদে স্ত্রীলিঙ্গের ব্যবহার নেই, এমন কি স্ত্রীজাতীয় প্রাণী ছাড়া অপর কোন বিশেষ্যেও স্ত্রীলিঙ্গ ব্যবহৃত হয় না। এই কারণেই বাঙলা ভাষা বা অভিধানে স্ত্রীলিঙ্গ থাকলেও বাঙলা ব্যাকরণে নেই—এ উক্তিকে অযথার্থ বলা চলে না :

বাঙলার মতোই অপরাপর মাগধী প্রাকৃত-জাত পূর্বাঞ্চলীয় ভাষাসমূহেও—অসমীয়া, ওড়িয়া, ভোজপুরী, মগহী এবং মৈথিলী—লিঙ্গ-অনুযায়ী বিশেষণ ও ক্রিয়ারূপে কোনরূপ পার্থক্য দেখা যায় না। অবশ্য মৈথিলীতে কখন কখন প্রাচীন লিঙ্গান্তর রীতি অনুসৃত হলেও চলতি ভাষায় তা লোপ পাবার পথে। পক্ষান্তরে হিন্দীতে এবং অপরাপর পশ্চিমাঞ্চলীয় ভাষায় লিঙ্গান্তর ব্যবস্থা প্রবলভাবেই বর্তমান। বিশেষণ সর্বনাম বিশেষণ এবং কৃদন্ত ক্রিয়াপদে বিশেষ্য-অনুযায়ী লিঙ্গবিধান হয়ে থাকে। যেমন—'উন্‌কা লড়কা', কিন্তু 'উনকী লড়কী', 'রাম গয়া থা' কিন্তু 'সীতা গয়ী থী'।

১. আধুনিক বাঙলায় স্ত্রীলিঙ্গের ব্যবহার না থাকলেও প্রাচীন বাঙলা ও আদি-মধ্য বাঙলায় স্ত্রীলিঙ্গের বহুল প্রচলন ছিলঃ বিশেষণে তো বটেই, এমনকি 'র'-যুক্ত বিশেষ্য সম্বন্ধ পদে এবং '-ল'-যুক্ত অতীতকালেও স্ত্রীলিঙ্গের ব্যবহার ছিল। —চর্যাপদে—'হাড়েরী মালী' (হাড়ের মালা), 'লাগেলি আগি' (=আগুন লাগিল), 'সোনে ভরিলী করুণা নাবী' (=সোনায় ভরা করুণা নৌকা) প্রভৃতি এবং 'শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তনে'—কোঅলী পাতলী বালী' (কোমল পাতলা বালিকা), 'উত্তরলী হইলী রাহী' (রাধা উত্তরল হইল) প্রভৃতি।

২. বাঙলা সাধুভাষায়, যেখানে তৎসম শব্দের বহুল ব্যবহার প্রচলিত, সেখানে স্ত্রীলিঙ্গের ব্যাপক ব্যবহার বজায় রয়েছে।—'সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা মাতৃভূমি', 'জ্যোৎস্নাপুলকিতা রজনী', 'তরঙ্গ-বিক্ষুব্ধা নটিনী তটিনী', 'একাকিনী শোকাকুলা সীতা'। আধুনিক বাঙলায় বিশেষণে এ জাতীয় স্ত্রীলিঙ্গের ব্যবহার প্রায় বর্জিত। —'মেয়েটি সুন্দরী' না বলে 'মেয়েটি সুন্দর' কিংবা 'সুন্দরী বৌ'-এর স্থলে 'সুন্দর বৌ'-এর ব্যবহারই এখন প্রচলিত। কোন কোন ক্ষেত্রে পুরুষ জাতির ক্ষেত্রেও স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের ব্যবহার এখন আর আপত্তিজনক মনে হয় না।—'লক্ষ্মী ছেলে' কিংবা 'ভাই সুমিত্রা'। খাঁটি বাঙলা অর্থাৎ তদ্ভব শব্দের ক্ষেত্রে অনেক সময় বিশেষণকে স্ত্রীলিঙ্গে পরিবর্তিত করবার কোন উপায়ও নেই।—'বড় বৌ', 'ভাল মেয়ে', 'দুধালো গাই', 'একগুঁয়ে ভেড়ী'—এসমস্ত ক্ষেত্রে 'বড়, ভাল, দুধালো, একগুঁয়ে' প্রকৃতি বিশেষণগুলির লিঙ্গ পরিবর্তন অসাধ্য।

৩. প্রাকৃতিক বিধানে নারী অথবা পত্নী বোঝানোর জন্যে বাঙলায় স্ত্রীলিঙ্গের ব্যবহার রয়েছে। সাধারণতঃ জাতিবাচক শব্দটি পুরুষের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় এবং শব্দের উত্তর কোন প্রত্যয় বা ভিন্ন শব্দ যোগ করে স্ত্রীলিঙ্গের রূপদান করা হয়। কিন্তু আধুনিক বাঙলায় পুংলিঙ্গবাচক একটি প্রত্যয়ের উদ্ভব হয়েছে, যার সূত্রপাত

ঘটেছিল প্রাচীন বাঙলাতেই—প্রত্যয়টি 'আ'। সংস্কৃতে এবং সাধু বাঙলায় 'আ (<আপ্)' স্ত্রীলিঙ্গবাচক প্রত্যয়। স্বার্থিক '-ক>অ' প্রত্যয় পূর্ববর্তী উদ্বৃত্তস্বরের (অ) সঙ্গে মিলিত হয়ে এই প্রত্যয়টি সৃষ্টি করেছে বলে অনুমান করা যায়।—ঘোটক >ঘোড়অ>ঘোড়া, হংসক>হাঁসা'। যে শব্দ দ্বারা কোন জাতিবাচক প্রাণীকে বোঝায় সেইক্ষেত্রে উক্ত জাতির পুরুষ প্রাণীকে বোঝানোর জন্য এই 'আ' এবং স্ত্রীজাতি বোঝানোর জন্য 'ঈ'/(-ই) প্রত্যয় ব্যবহৃত হয়। ঘোড়া→ঘুড়ী, পাঁঠা→পাঁঠী, গাধা→ গাধী, ভৈসা→ভৈসী, খোকা→খুকী, ছোঁড়া→ছুঁড়ী, বামনা→বামনী, কাকা→কাকী, খুড়া→খুড়ী, জেঠা→জেঠী, ব্যাঙ্গমা→ব্যাঙ্গমী, ভাগিনা→ভাগনী, পাগলা→ পাগলী।

৪. শুধু 'আ'-কারান্ত পুংলিঙ্গ ছাড়াও অপর কোন কোন শব্দের সঙ্গে 'ঈ' প্রত্যয় যোগে লিঙ্গান্তর হয়।—বামুন>বামনী, ডাহুক>ডাহুকী।

৫. সাধারণতঃ পুংলিঙ্গ শব্দকেই স্ত্রীলিঙ্গে পরিণত করা হয়, কিন্তু বাঙলায় এমন কিছু শব্দ আছে, সেগুলো মূলতঃ স্ত্রী-বাচক, এগুলোর সঙ্গে 'পতি>আই' প্রত্যয় যোগে পুংলিঙ্গে পরিবর্তিত করা হয়। বোন→বোনাই, ননদ→নন্দাই, মাসী→ মেসো (অভিশ্রুতি-বশে), পিসি>পিসে (অভিশ্রুতি-বশে)।

৬. বাংলায় বহুল প্রচলিত অপর একটি স্ত্রী-প্রত্যয় '-ন্' এবং প্রসারে '-নি-আনী, ইনী' প্রভৃতি।—নাতি→নাতিন্, মিতা→মিতেন, বেয়াই→বেয়ান্, গয়লা→গয়লানী; নাপ্তিনী, কামারনী, ভিখারিনী।

৭. কোন কোন শব্দের আগে বা পিছনে স্ত্রীবাচক শব্দ যোগ করে লিঙ্গান্তর করা হয়।—কবি→মহিলা কবি, গোঁসাই→মাগোঁসাই, ডাক্তার→মেয়ে ডাক্তার, ডাক্তার-গিন্নী।

৮. কোন কোন জাতি-বাচক শব্দের পূর্বে পুং-বাচক ও স্ত্রী-বাচক শব্দ ব্যবহার করে লিঙ্গ বোঝানো হয়।—বেটা ছেলে→মেয়ে ছেলে, নর-হাতী→মাদী-হাতী, মর্দা উট→মাদী উট, এঁড়ে বাছুর→বকনা বাছুর, ষাঁড় গোরু→গাই গোরু।

৯. ভিন্ন শব্দের ব্যবহার দ্বারা অনেক সময় লিঙ্গান্তর ঘটানো হয়।—বাপ-মা, ছেলে-মেয়ে / বৌ, পো-ঝি / বৌ; দেওর-জা / ননদ; তাঐ-মাঐ, ষাঁড় / বলদ-গাই, নবাব / বাদশা-বেগম, সাহেব-বিবি, চাকর-ঝি / আয়া।

১০. বাংলায় অপ্রাণিবাচক শব্দেও অনেক সময় লিঙ্গান্তরের সাহায্যে ক্ষুদ্র-বৃহৎ ভেদ বোঝানো হয়।—পুং-বাচক '-আ' প্রত্যয় 'বৃহৎ' এবং স্ত্রীবাচক '-ঈ' প্রত্যয় 'ক্ষুদ্র'-অর্থে ব্যবহৃত হয়। হাণ্ডা>হাঁড়ী, ঘড়া—ঘড়ী, খোন্তা—খুন্তী, জাঁতা—জাঁতি, বোচকা—বুচকী।

১১. বাংলায় স্ত্রী প্রত্যয় প্রয়োগের একটি অসাধারণ দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় 'ননদ' শব্দে। 'ননন্দ=ননন্দা>ননদ' শব্দটি স্বভবতঃই স্ত্রীলিঙ্গ, কিন্তু এর সঙ্গে 'ঈ' প্রত্যয় যোগ করে দ্বিতীয়বার স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ ব্যবহার করা হয় 'ননদী' এবং এর সঙ্গে তৃতীয়বার স্ত্রী-প্রত্যয় 'নী' যোগ করে হলো 'ননদিনী'।

(খ) বচন

বস্তুর সংখ্যা বোঝাতে বচন ব্যবহৃত হয়। একটি বোঝাতে একবচন এবং একের অধিক বোঝাতে বহুবচন পদের ব্যবহার আছে। সংস্কৃতে দু'টি বোঝাতে দ্বিবচনের ব্যবহার ছিল, কিন্তু প্রাকৃতের যুগেই দ্বিবচন পরিত্যক্ত হয়, এর আর পুনরাবির্ভাব ঘটেনি।

সংস্কৃত ও প্রাকৃত বহুবচনের বিভক্তির অবশেষচিহ্ন সর্বভারতীয় আর্যভাষার পশ্চিমাঞ্চলীয় শাখাগুলিতে, যেমন—মারাঠা, গুজরাতি, রাজস্থানী, পাঞ্জাবী, হিন্দী প্রভৃতি ভাষায় কিছু কিছু বর্তমান থাকলেও বাঙলায় এবং অপরাপর মাগধী ভাষায় লোপ পেয়েছে। এই ভাষাগুলিতে বহুবচনের ভাব প্রকাশের জন্য নতুন নতুন বিভক্তি উদ্ভাবন করতে হয়েছে, নতুবা অপর কোন উপায় অবলম্বন করতে হয়েছে। সম্ভবতঃ বিভক্তিযুক্ত (ষষ্ঠী বিভক্তি হওয়া সম্ভব) শব্দের বিবর্তিত একটি মাত্র রূপেই বাঙলায় যথার্থ বিভক্তির মর্যাদা পেতে পারে, অপরগুলি বিভক্তি রূপে বর্ণিত হলেও সেগুলি শব্দের অংশমাত্র।

১. বাঙলা শব্দমাত্রই একবচনাত্মক, একবচনের জন্য শব্দের সঙ্গে কোন প্রত্যয় যুক্ত হয় না। প্রাচীন এবং আদিমধ্যযুগে একবচন এবং বহুবচনে শব্দের রূপগত কোন পার্থক্য ছিল না—'এক সে শুণ্ডিনী' আবার 'বতিস জোইনী' (বত্রিশ যোগিনী)—উভয় ক্ষেত্রেই একবচনবোধক বিভক্তি-প্রত্যয়বিহীন পদ ব্যবহৃত হ'য়েছে। মধ্যযুগে সর্বনাম শব্দে প্রথম বহুবচনবোধক বিভক্তি '-রা' যুক্ত হ'তে আরম্ভ করে।—'আহ্মারা, তোহ্মারা' প্রভৃতি। পরে এই বিভক্তি বিশেষ্যেও যুক্ত হয়।

২. বহুবচন বোঝাতে বাঙলায় অনেক সময় বিভক্তিহীন শব্দ এখনও ব্যবহৃত হয়। অনির্দিষ্টভাবে জাতিবাচক শব্দে বিভক্তি যোগ না করলেও বহুবচনের বোধ জন্মায়।—'গোরু ঘাস খায়; মানুষ মরণশীল'—শব্দের পূর্বে বহুত্ববোধক বিশেষণ বা সংখ্যা ব্যবহৃত হ'লে শব্দে কোন বিভক্তি যোগ হয় না।—'অনেক লোক, সাতশ' হাতি, কত আম।' বিশেষ্যের বিশেষণ-রূপে সর্বনাম শব্দ ব্যবহৃত হ'লে বহুত্ববোধক শব্দ সর্বনামের সঙ্গে যুক্ত হয়, বিশেষ্যের সঙ্গে নয়।—কতগুলো বই, সে-সব কথা।

৩. কর্তৃকারকে বহু বচনবোধক বিভক্তি '-রা, -এরা' ব্যবহৃত হয়। স্বরান্ত শব্দে 'রা' এবং ব্যঞ্জনান্ত শব্দে '-এরা' ব্যবহৃত হয়। 'অন্ধরা, রাজারা, সিপাইরা, সাধুরা ; রাখালেরা, পাগলেরা, উটেরা।' দেবতা, মানব এবং সর্বনাম শব্দেই সাধারণতঃ '-রা, -এরা' ব্যবহৃত হয়, ইতর প্রাণিবাচক শব্দও কখন কখন এই বিভক্তি যুক্ত হয়। 'পাখিরা, হাতিরা'। অপ্রাণিবাচক শব্দে সাধারণতঃ '-রা, -এরা' যুক্ত হয় না। এই বিভক্তিটির উৎপত্তি, সম্বন্ধবাচক '-র' বিভক্তি থেকে হ'তে পারে অথবা ফারসী প্রত্যয় থেকেও আসতে পারে। সম্বন্ধবাচক '-র' বিভক্তিটির উৎপত্তি ঘটে থাকতে পারে সং 'কৃতক' বা 'কার্যক' শব্দের বিবর্তনে অথবা ষষ্ঠী বিভক্তি বহুবচন চিহ্ন যুক্ত 'ররাণাম্' শব্দের বিবর্তনে। যদি শেষ অনুমানটি সত্য হয়, তবে বাঙলার সহোদরা অসমীয়া বহুবচন '-বোর' এবং ওড়িয়া বহুবচন '-রাণ' দুটিরই ব্যাখ্যা পাওয়া যায়, বাংলার '-রা'-ও এসে যায়। সপ্তদশ শতক থেকেই বিভক্তিটির বহুল প্রচলন দেখা যায়।

৪. কর্তৃ-ব্যাতিরিক্ত অপর সকল কারকে '-দিগ-' বা '-দে-' এই প্রাতিপদিকের সঙ্গে কারক-বাচক বিভক্তি যুক্ত হ'য়ে পদ গঠন করা হয়। সাধারণতঃ সাধুভাষায় 'দিগ' এবং চলতি ভাষায় '-দে-' ব্যবহৃত হয়—আমাদিগকে, বালকদিগের, তোমাদের, তাদের।—'-দিগ-' বিভক্তিটি 'আদিক'-শব্দজাত হ'তে পারে অথবা ফারাসী 'দিগর' থেকেও আসতে পারে।—বিভক্তিটির ব্যবহার সপ্তদশ শতকেই শুরু হয়েছিল। কিছুকাল পূর্বেও '-র'-যুক্ত সম্বন্ধ পদের সঙ্গে বিভক্তিটি যুক্ত হ'তো।—'তোমারদের, তোমারদিগের'। সাধারণতঃ প্রাণিবাচক শব্দেই বিভক্তিটি যুক্ত হ'য়ে থাকে।

৫. প্রাণিবাচক এবং অপ্রাণিবাচক—উভয়ক্ষেত্রে সমভাবে ব্যবহৃত হয় অপর একটি শব্দ—'গুলি>গুলা-' যা এক্ষণে বহুত্ববোধক প্রত্যয়-রূপে পরিগণিত হয়। ব্যাকরণের দৃষ্টিতে এটি একবচনাত্মক সমাহার শব্দ হ'লেও শব্দের সঙ্গে প্রত্যয়রূপে যুক্ত হ'য়ে নির্দেশক বহুবচনের অর্থ প্রকাশ করে। কর্তৃকারকে 'গুলি, -গুলো' ব্যবহৃত হয়, অপর সকল কারকে এর সঙ্গে বিভিন্ন বিভক্তি যুক্ত হয়।—গোরুগুলি ঘাস খাচ্ছে, গোরুগুলিকে তাড়িয়ে নিয়ে যাও।' ষোড়শ শতাব্দীতেই প্রত্যয়টির ব্যবহার পাওয়া যায়।—'বামনগুলো, নগরিয়াগুলা' (চৈতন্যভাগবতে)। এক্ষণে সাধারণতঃ আদরে 'গুলি' ও অনাদরে 'গুলা' ব্যবহৃত হয়। প্রত্যয়টির সম্ভাব্য উৎস দু'টি—'কুল' শব্দ অথবা 'গোলক, গোলিকা' (=গোটা) শব্দ। দ্রাবিড় ক্লীবলিঙ্গের বহুবচনাত্মক '-গল' থেকে প্রত্যয়টির উদ্ভব কল্পনা করে নিলে ওড়িয়া 'গুড়ি' এবং অসমীয়া '-গিলা'রও ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। উচ্চশ্রেণীর ক্ষেত্রে সাধারণতঃ এই প্রত্যয়টির প্রয়োগ নেই—'দেবতাগুলি, শিক্ষকগুলি'—এরূপ চলে না।

৬. প্রাণিবাচক শব্দের সঙ্গে 'গণ, লোক, সমাজ, জাল' প্রভৃতি শব্দ সমাসবদ্ধ ক'রে বহুবচন পদসাধনের রীতি অতিশয় প্রাচীন। অপভ্রংশের কালেই এই রীতির ব্যাপক ব্যবহার লক্ষিত হয়।—'পণ্ডিঅলোঅ (=পণ্ডিতলোক), পসলোঅ' প্রভৃতি। চর্যাপদে পওয়া যায়—'তুমহে-লোঅ, জোইণিজাল (=যোগিনীজাল)' প্রভৃতি। মধ্য বাঙলায়—'রমণীসমাজ, ভক্তগণ' প্রভৃতি প্রচলিত ছিল। ঐ সময় অপ্রাণিবাচক শব্দেও বহুত্ববোধক 'গণ' শব্দ যুক্ত হ'য়েছে।—'বাদ্যগণ, আভরণগণ'।—এক্ষণে, বিশেষতঃ সাধুভাষায় এ জাতীয় প্রচুরসংখ্যক শব্দ প্রত্যয় রূপে হ'য়ে থাকে।—প্রাণিবাচক শব্দের সঙ্গেঃ 'কুল, গণ, জন, মণ্ডলী, লোক, বর্গ, বৃন্দ, সকল, সব, সভা, সমুচয়, সমূহ', আরবী শব্দ 'মহল' (বন্ধু-মহল), এবং অপ্রাণিবাচক শব্দের সঙ্গেঃ 'আবলী, গ্রাম, চয়, দাম, নিকর, নিচয়, মণ্ডল, মালা, রাজি, সকল, সব, সমুচয়, সমূহ' প্রভৃতি যুক্ত হয়।—এদের মধ্যে 'গণ'-শব্দের প্রয়োগই সর্বাধিক ব্যাপক।

৭. আম্রেড়িত অর্থাৎ পুনরুক্ত বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্বনাম এবং অসমাপিকা ক্রিয়াপদ দ্বারা অর্থাৎ এদের দ্বিত্ব প্রয়োগ দ্বারা বহুবচনের ভাব প্রকাশ করা হয়।—'ঘরে ঘরে', 'বাড়ি বাড়ি ঘুরে', 'লাল লাল ফুল', 'উঞ্চা উঞ্চা পাবত', 'যে যে আইলা তে তে গেলা', 'যার যার বই আছে', 'মিলি মিলি মাঙ্গা', 'ছুঁয়ে ছুঁয়ে যায়'।

৮. বাঙলায় একটা সাধারণ নিয়ম—বহুত্ববাচক কোন শব্দ ব্যবহৃত হ'লে মূল শব্দের সঙ্গে আর কোন বহুত্ববাচক প্রত্যয় যুক্ত হয় না অর্থাৎ বহুত্ববাচক শব্দ বা প্রত্যয়ের দ্বি-প্রয়োগ ঘটে না।—'যে সকল লোক এলো' ('লোকেরা' হবে না), 'অনেক বিশিষ্ট পণ্ডিত জড়ো হ'লেন' ('পণ্ডিতগণ' হবে না) 'পাঁচশ' আম নিয়ে এসো' ('আমগুলি' হ'বে না)।

(গ) **পদাশ্রিত নির্দেশক** (Articles/Enclitic Definitives), **নির্দেশক প্রত্যয়** (Definite Affixes)

কোন বিশেষ্য, সর্বনাম অথবা সংখ্যাবাচক বা পরিমাণ-বাচক শব্দের সঙ্গে অপর কোন শব্দ, শব্দাংশ বা প্রত্যয় যুক্ত হয়ে বস্তু বা পদার্থটির গুণ বা প্রকৃতি প্রকাশ করে, তাকে বলা হয় 'পদাশ্রিত নির্দেশক' বা 'নির্দেশক প্রত্যয়'। এই প্রত্যয়-যোগে বস্তু, ব্যক্তি, ভাব, সংখ্যা বা পরিমাণকে সুনির্দিষ্টভাবে বোঝানো হয়।

এই প্রত্যয় বা শব্দাংশ/শব্দগুলোর মধ্যে আছে—'টা' (<গোটা), '-টি' (<গুটি), '-খানা', '-খানি' (<খণ্ড), '-টুকু', '-গোটা', '-গোছা', 'জন'। এ ছাড়াও কয়েকটি

পদাশ্রিত নির্দেশক আছে, যেগুলো অতিশয় সীমিত এবং সুনির্দিষ্ট ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হয়।—'মূর্তি' (পাঁচমূর্তি বৈষ্ণব), 'কেতা' (তিন কেতা নোট), 'তা' (সাত তা কাগজ), 'থান' (দুই থান সিন্দুর) প্রভৃতি।

১. সংখ্যা বা পরিমাণ বোঝাতে প্রত্যয়গুলো মূল শব্দের সঙ্গে ব্যবহৃত না হ'য়ে সংখ্যা বা পরিমাণ-বোধক বিশেষণ বা বিশেষণ-স্থানীয় শব্দের সঙ্গে ব্যবহৃত হয়।— 'পাঁচটি গোরু, সাতজন লোক, অনেকটা পথ, যতখানি দুধ, লোক দুটো, হাতি ক'টা' প্রভৃতি।

২. মূল শব্দকে নির্দিষ্টভাবে বোঝানোর জন্য প্রত্যয় শুধু একবচনেই ব্যবহৃত হয়।—'লোকটা, শ্লেটখানা, দুধটুকু, লাঠি গাছা'। এগুলোকে বহুবচনে পরিবর্তন করতে গেলে বহুবচন-বাচক প্রত্যয় 'গুলি' ব্যবহার করতে হয়।—'গোরুটাকে, গোরুগুলিকে'।

৩. পদাশ্রিত নির্দেশক প্রত্যয় ব্যবহারের কতকগুলো নির্দিষ্ট রীতি আছে। যে কোন শব্দের সঙ্গে যে-কোন প্রত্যয় ব্যবহৃত হয় না। যথা—

অ. বৃহৎ-অর্থে এবং অনাদরে -'টা' এবং হ্রস্বার্থে ও আদরে '-টি' ব্যবহৃত হয়। —'হাতিটা, কুকুরছানাটি', 'লোকটা বড় জঘন্য', 'ছেলেটির ব্যবহার বড় মিষ্টি', 'তোমার ছেলে ছেলেটা, আমার ছেলে ছেলেটি'। প্রাণিবাচক এবং অপ্রাণিবাচক উভয় ক্ষেত্রেই এই প্রত্যয় প্রযুক্ত হ'তে পারে।—'ঘোড়াটা, ঘড়িটি'।

আ. -'খানা, -খানি' সাধারণতঃ অপ্রাণিবাচক শব্দেই ব্যবহৃত। সাধারণতঃ বৃহৎ-অর্থে ও অনাদরে -'খানা' এবং হ্রস্বার্থে ও আদরে '-খানি' প্রযুক্ত হ'য়ে থাকে। সাধারণতঃ বৃত্তাকার বস্তুর সঙ্গে এই প্রত্যয়ের যোগ হয় না, সমতল ও চতুষ্কোণ বস্তুর ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হয়।—কাপড়খানা ('বল-খানা' নয়)। গুণবাচক বা পরিমাণ-বাচক বস্তুর সঙ্গেও '-খানা, -খানি' যুক্ত হ'তে পারে।—'এতখানি বেলা হ'লো, মনের ভাবখানা জানা রইলো, অনেকখানি জল।'

ই. 'টু, -টুকু, -টুকু' প্রত্যয় সাধারণতঃ আদরে ও স্বল্পতা বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। 'এতটুকু ছেলে, একটু দিয়ো'। অতিশয় স্বল্পতা বোঝাতে '-টুকুন' ব্যবহৃত হয়।—'একটুকুন তো দুধ'।

ঈ. সাধারণতঃ অখণ্ড, দীর্ঘ বা সরু বস্তু বোঝাতে 'গাছ, -গাছা, গাছি' প্রত্যয়রূপ শব্দ ব্যবহৃত হয়।—'খড়গাছ, লাঠিগাছা, মালাগাছি'।

বস্ত্র-বাচক বস্তুতে 'থান'—'তিন থান ধুতি, শাড়ি পাঁচথান'।

কাগজের পরিমাণ বোঝাতে 'তা'—পাঁচ তা কাগজ।

তিন 'কেতা' নোট।

চার 'মূর্তি' বৈষ্ণব।

*। কোন কোন আঞ্চলিক ভাষায় পদাশ্রিত নির্দেশক '-টা' এবং 'টি'র একটি অসাধারণ ব্যবহার পাওয়া যায়।—একবচন বোঝাতে '-টা>ডা' এবং বহুবচনে '-টি>-ডি' ব্যবহৃত হয়।—'ছাগলডারে' (ছাগলটাকে), 'ছাগলডিরে' (ছাগলগুলোকে) 'বইডা' (একটা বই), 'বইডি' (বইগুলো)।

[তিন] বিশেষণ

বিশেষ্যের দোষ-গুণ-অবস্থাদি-প্রকাশক পদকে 'বিশেষণ' বলা হয়। সংস্কৃত ব্যাকরণমতে বিশেষ্যের যে লিঙ্গ-বচন ও বিভক্তি বিহিত হ'তো, বিশেষণেও সেই লিঙ্গ-বচন ও বিভক্তির ব্যবহার ছিল আবশ্যিক। প্রাকৃত স্তরেও এই অবস্থাই বর্তমান ছিল, অপভ্রষ্ট স্তরেই সর্বপ্রথম বিশেষণ পদ বিভক্তিচিহ্ন বর্জিত হয়। ফলতঃ বিশেষণ পদটি যেন সমাসবদ্ধ পদের পূর্বপদে পরিণত হয়। বাঙলা ভাষাতেও বিশেষণে বিভক্তিচিহ্ন যুক্ত হয় না। তবে প্রাচীন ও আদি-মধ্য যুগের বাঙলায় বিশেষণে বিশেষ্যানুযায়ী লিঙ্গ পরিবর্তিত হ'তো। যেমন, চর্যাপদে—'নিসি অন্ধারী', সবরী বালী' প্রভৃতি। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে 'কোঁঅলী পাতলী বালী', 'উত্তরলী রাহী' প্রভৃতি। বর্তমানে বাঙলা সাধুভাষা ও তৎসমবহুল শব্দ-ব্যবহারের ক্ষেত্রে অনেক সময় বিশেষ্যের অনুসরণে বিশেষণেও স্ত্রীলিঙ্গ ব্যবহৃত হয়, কিন্তু এই রীতিটি ক্রমক্ষীয়মাণ। বিশেষ্যটি বহুবচন হ'লেও বিশেষণটি বাঙলায় কখনও বহুবচন হয় না। তবে কখন কখন বিশেষণ বা বিশেষণ-স্থানীয় পদটি বহুবচনে ব্যবহৃত হয় কিন্তু বিশেষ্য পদটি তখন অবশ্যই একবচনান্ত হয়। 'সে-সকল কথা, দশহাজার লোক'।

বাঙলায় অনেক সময় বিশেষণ পদ বিশেষ্যরূপে ব্যবহৃত হয়, তখন তা'তে প্রয়োজনীয় বিভক্তি চিহ্ন যোগ করতে হয়।—'সুন্দরের সাধনা, শীতকে কাবু করা, ভীতুর ডিম, ধনীর বিলাস।'

রূপের বিচারে বিশেষণকে ত্রিধা বিভক্ত করা চলে।—(১) **একপদময়**, (২) **যৌগিক**, (৩) বহুপদময়।

(১) **একপদময় বিশেষণ**—'ভাল, মন্দ, চলতি'। এ জাতীয় বিশেষণ নানা প্রকারের : (অ) মৌলিক—'ছোট, নোতুন, লম্বা'; (আ) কৃদন্ত—'পড়ন্ত, চলন্ত, দেখা,

বহতা'; (ই) তদ্ধিতান্ত—'দেশি, ঢাকাই, গেঁয়ো, ছাবিবশে'; (ঈ) বিশেষ্যের সঙ্গে ষষ্ঠী বিভক্তির যোগে—'সোনার' প্রতিমা, 'ফুলের' শরীর, 'সাতের' পাতা; (উ) উপসর্গ যুক্ত—নিনাইয়া, বেকসুর, বিবসন।

(২) **যৌগিক বিশেষণ**—বিভিন্ন সমাসের দ্বারা গঠিত পদ—আধ-মরা, হাতে-কাটা, মন-মরা'; দিল-দরিয়া, জবর-দস্ত; দিল-খোলা, ছায়া-ঢাকা, দশ-গজী।

(৩) **বহুপদময় বিশেষণ**—'যার-পর-নাই', 'যেমন-খুশি-তেমন', 'সাত-রাজার-ধন'।

(ক) **বিশেষণের অতিশায়ন বা তারতম্য** (Comparison of Adjectives)

পৃথিবীর অনেক ভাষাতেই বিশেষণের অতিশায়ন বা তুলনা বোঝাতে বিশেষণের সঙ্গে প্রত্যয়যুক্ত হ'য়ে থাকে। সংস্কৃতে দু'য়ের মধ্যে তুলনায় '-তর' বা '-ঈয়স্' প্রত্যয় এবং তিন বা ততোধিকের তুলনায় '-তম' বা '-ইষ্ঠ প্রত্যয় ব্যবহৃত হয়।—'নবম অপেক্ষা দশম উচ্চতর শ্রেণী', 'হিমালয় পবর্তসমূহের মধ্যে উচ্চতম', 'মাতা স্বর্গ অপেক্ষা গরীয়সী', 'এই সংখ্যাগুলোর মধ্যে এইটিই গরিষ্ঠ'। বাঙলা সাধুভাষায় বা তৎসম শব্দের সঙ্গে এই প্রত্যয়ের ব্যবহার থাকলেও তদ্ভব শব্দে এদের কোনটিই চলে না।

'ভালোতর, ভালোতম, বড়তর, বড়তম'—এ ধরনের প্রয়োগ বাঙলায় অচল। বাঙলায় তুলনা বোঝাতে বিশেষণের সঙ্গে কখনো কোন প্রত্যয় যুক্ত হয় না—বিভিন্ন উপায় অবলম্বন করা হয়। এই ভিন্ন উপায় অবলম্বনের ব্যাপারটি দ্রাবিড় ভাষার প্রভাব-জাত বলে মনে করা হয়। যথা—

১. দু'য়ের মধ্যে তুলনায় উপমানকে অর্থাৎ যে বস্তুর সঙ্গে তুলনা করা হয়, তার সঙ্গে অপাদান কারকের (পঞ্চমীর) বিভক্তি চিহ্ন যোগ করা হয় এবং বিশেষণটিকে উপমেয়ের অর্থাৎ যার তুলনা করা হয়, তার বিধেয়-রূপে পরে বসানো হয়। 'জলের চেয়ে পাথর ভারি', 'রাম অপেক্ষা যদু বড়ো'।

২. উৎকর্ষ বা অপকর্ষের আধিক্য বোঝাতে বিশেষণের পূর্বে 'বেশি, কম, অধিক, খুব, অনেক' প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করা হয়।—'গাধার চেয়ে ঘোড়া অনেক জোরে ছুটতে পারে', 'তোমার অপেক্ষা তোমার ভাইকে বেশি বুদ্ধিমান মনে হয়।'

৩. অনেকের তুলনায় একটির উৎকর্ষ বা অপকর্ষ বোঝাতে 'সর্বাপেক্ষা' বা 'সবচেয়ে'-জাতীয় কোন শব্দ ব্যবহার করতে হয়।—'মিসিসিপি সবচেয়ে বড় নদী',

'বিদ্যালয়ের সমস্ত ছাত্রের মধ্যে সে-ই সর্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান্'। কখন কখন শুধু ষষ্ঠী বিভক্তির সাহায্যেই এই ভাবটি প্রকাশ করা হয়।—'নদীর সেরা গঙ্গা আর ফলের সেরা আম।'

৪. প্রাচীন এবং মধ্যযুগের বাঙলা ভাষায়ও বিশেষণের তারতম্য বোঝাতে একই রীতি অবলম্বিত হ'তো, তবে কারক-বাচক পার্থক্য ছিল।—'ডোম্বীত আগলি নাহি চ্ছিনালী', 'তারে বাড়া বীর'।

৫. বাঙলায় কখনো কখনো '-তর, -তম' কিংবা '-ঈয়স্, '-ইষ্ঠ' প্রত্যয়যুক্ত শব্দ যথাযথ অর্থে ব্যবহৃত হ'লেও অনেক সময় এদের তারতম্যের ভাবটি অন্তর্হিত হ'য়ে বড়ো জোর গুণের আধিক্য বোঝায়—কিন্তু অতিশায়ন একেবারেই নয়।—'উত্তম প্রস্তাব, ভূয়সী প্রশংসা, প্রেয়সী নারী, বলিষ্ঠ যুবক, গুরুতর সমস্যা' প্রভৃতি ক্ষেত্রে তুলনার ভাবটি একেবারেই অন্তর্হিত : এখানে বিশেষণ পদগুলি বড়জোর অতিশয়িত অর্থে ব্যবহৃত হ'য়েছে।

(খ) ক্রিয়াবিশেষণ

ক্রিয়াকে যা বিশেষিত করে, তাকেই বলে 'ক্রিয়াবিশেষণ'। কোন কোন নাম-বিশেষণ বিভক্তি-যোগে বা বিভক্তিবিহীনভাবে 'ক্রিয়াবিশেষণরূপে ব্যবহৃত হ'লেও অনেক ভিন্ন পদও প্রয়োগের জন্য 'ক্রিয়া-বিশেষণ'রূপে অভিহিত হয়।

১. কখনো কখনো ক্রিয়াবিশেষণে কোন বিভক্তি-চিহ্ন ব্যবহৃত হয় না।—'শীঘ্র যাও', 'সকাল সকাল এসো', 'ক্রমাগত চলেই যাচ্ছি'। অনেক বিদেশি শব্দেও বিভক্তি চিহ্ন যুক্ত হয় না।—'খুব খেয়েছি', 'আস্তে যাও'—এই সমস্ত ক্ষেত্রে দ্বিতীয়া বিভক্তি অথবা সপ্তমী বিভক্তি উহ্য আছে বলে ধরে নেওয়া হয়।

২. বাঙলায় ক্রিয়াবিশেষণের বিশিষ্ট বিভক্তি '-এ, -য়'—দৃশ্যতঃ সপ্তমী বিভক্তির চিহ্ন বলে মনে হ'লেও আসলে এটি তৃতীয়া বিভক্তির চিহ্ন। প্রাচীন বাঙলাতেও ক্রিয়াবিশেষণে এই বিভক্তিটি যুক্ত হ'তো।—'ভবণই গহণ গম্ভীর বেগেঁ বাহী'—স্পষ্টতঃই এখানে 'বেগেন>বেগেঁ>বেগে' (আধুনিক বাঙলায়)—তৃতীয়া বিভক্তির চিহ্ন।—'ধীরে চলে', 'নাদিল কাতরে শিবা', 'আছতো কুশলে বন্ধু', 'ভালোয় ভালোয় ফিরে এসো'।

৩. '-ই' এবং '-ইয়া'-যুক্ত অসমাপিকা ক্রিয়াপদও অনেক সময় ক্রিয়াবিশেষণরূপে ব্যবহৃত হয়।—'দিঢ় করিঅ মহাসুহ পরিমাণ', 'হন্‌হনিয়ে চলে এলাম', 'বেশি করিয়া খাও', 'নেচে চলছে'।

৪. 'পুরঃসর, পূর্বক, মাত্র, সহিত'-প্রভৃতি তৎসম শব্দযোগে গঠিত সমাসবদ্ধ পদও ক্রিয়াবিশেষণ-রূপে ব্যবহৃত হয়।—'তুমি চাহিবা-মাত্র পাইবে', 'প্রণাম-পূর্বক জানাইলাম'।

৫. -'তঃ, -থা, -ধা, -শঃ, -ত্র, -বৎ' প্রভৃতি প্রত্যয় এবং 'মত, মতন' প্রভৃতি শব্দ-যোগে গঠিত পদদ্বারাও ক্রিয়াবিশেষণ পদ গঠিত হয়।—'ন্যায়তঃ, সর্বথা, ত্রিধা, ক্রমশঃ, উভয়ত্র, ঠিকমতো'।

৬. শব্দের দ্বিরুক্তি দ্বারাও ক্রিয়াবিশেষণ পদ তৈরি হ'তে পারে।—বারবার, কখন-কখন, ফোটা-ফোটা; নেচেনেচে, বল্‌তে বল্‌তে; যেখানে-সেখানে, যেমন-তেমন ক'রে'।

[চার] সংখ্যাবাচক বিশেষণ

সংখ্যাবাচক শব্দগুলো বাঙলায় বিশেষণ-রূপে ব্যবহৃত হয়। যখন শুধু সংখ্যামাত্র বোঝানো হয় তখন **বিশুদ্ধ সংখ্যা শব্দ** বা **গণনাসংখ্যা** (Cardinal number) এবং যখন সংখ্যাটির দ্বারা নির্দিষ্ট ক্রম বোঝানো হয় তখন **ক্রমিক সংখ্যা** বা **ক্রমবাচক সংখ্যা** (Ordinal number) হয়। ক্রমিক সংখ্যা শব্দগুলো অবশ্যই বিশেষণ পদ, তবে গণনা-সংখ্যার পদ নিয়ে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়। এই সংখ্যা শব্দের সঙ্গে কখন কখন বিশেষ প্রত্যয় ('-টা, -টি') বা নির্দেশক শব্দ ('-জোড়া, -জন') যোগ করলে বিশেষণের ভাবটি পরিস্ফুট হয় বটে, কিন্তু স্বাধীনভাবে বিশেষণরূপে এদের ব্যবহারও যথেচ্ছ হ'য়ে থাকে।—'তিনজন লোক, দশখানা গ্রাম, পাঁচজোড়া জুতো, কুড়িটা ছাগল' প্রভৃতি; আবার 'বারো ঘর এক উঠান', 'পঞ্চাশ ব্যক্তি, সত্তর দিন, উনিশ টাকা, সাত কিলোগ্রাম, দশ দিক্‌, ছয় ঋতু, চৌদ্দ ভুবন' প্রভৃতিও ভূয়ো-পরিমাণ ব্যবহৃত হয়। বিশুদ্ধ সংখ্যাশব্দ বা গণনাসংখ্যাকেও বিশেষণ-রূপে অভিহিত করলে দোষ হয় না।

(ক) বিশুদ্ধ সংখ্যা শব্দ/গণনাসংখ্যা (Cardinal number)

'কুড়ি' এবং 'হাজার'-ব্যতিরেকে বাঙলায় ব্যবহৃত যাবতীয় গণনাসংখ্যাই সংস্কৃত থেকে প্রাকৃতের মাধ্যমে উদ্ভূত তদ্ভব শব্দ। 'কুড়ি' সংখ্যাটি অস্ট্রীক বা নিষাদ ভাষা থেকে আগত আর 'হাজার' ফারসী থেকে গৃহীত। ধ্বনিপরিবর্তনের সাধারণ নিয়মে তদ্ভব শব্দগুলোর সৃষ্টি হলেও এদের মধ্যে বিস্তর ব্যতিক্রম এবং বহুরূপতা রয়ে গেছে। এই বিচিত্রতার প্রধান কারণ সাদৃশ্য হ'লেও আরও নানাবিধ কারণ বর্তমান থাকা সম্ভব।

'এক থেকে শত'-পর্যন্ত সংখ্যাগুলোর মূলে আছে মাত্র এগারোটি সংখ্যা—এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ, ছয়, সাত, আট, নয়, দশ, শ'—বাকী সংখ্যাগুলো সবই 'দশ' দ্বারা গুণিত এবং 'এক থেকে আট' পর্যন্ত সংখ্যা দ্বারা যুক্ত; এ ছাড়া একটি শব্দ 'ঊন'-ও ব্যবহৃত হ'য়ে থাকে। এক থেকে দশ পর্যন্ত সংখ্যাগুলো সংস্কৃত থেকে যেমন সহজসূত্রে বিবর্তিত হয়েছে, পরে যখন গুণিত অথবা যোগ-যুক্ত হ'য়েছে, তখন কিন্তু তাদের মধ্যে বিস্তর পরিবর্তন ঘটেছে। যেমন—'পঞ্চ>পাঁচ', কিন্তু যখন 'দশ গুণিত'-র সঙ্গে 'পাঁচ' যুক্ত হয়েছে, তখন তার রূপ কোথাও 'পন্-' (পনেরো) কোথাও 'পঁচ্-' (পঁচিশ), 'পঁয়-' (পঁয়ত্রিশ), 'পঞ্চ-' (পঞ্চান্ন) প্রভৃতি।—নিম্নে প্রতি দশকের অন্ত্য একানুক্রমিকভাবে (অর্থাৎ প্রথমে যাদের শেষে ১ আছে, পরে ২—এইভাবে) সংখ্যা শব্দগুলির উৎপত্তির বিবরণ দেওয়া হলো।

১। অন্ত্য 'এক'-যুক্ত সংখ্যা ঃ—বানানে অভিন্ন হ'লেও এটি তৎসম শব্দ নয়, এর উচ্চারণ, অ্যাক্'। এক, এক্য>ইক্ক, এক্ক>এক (=অ্যাক) (১)। দশের সঙ্গে যুক্ত—একাদশ>এগারহ>এগার (১১)। দ্বিগুণিত দশের সঙ্গে যুক্ত—একবিংশতি> এক্কুবীসই>এক্কুইশ>একুশ (২১)। পরবর্তী পর্যায়ে 'এক'-এর আর রূপান্তর ঘটেনি। যথা—একত্রিংশৎ>একত্রিশ, একতিরিশ (৩১)। একচত্বারিংশৎ>একচল্লিশ (৪১); একপঞ্চাশৎ>একান্ন (৫১); একষষ্টি>একষট্টি (৬১); একসপ্ততি>একহত্তর> একাত্তর (৭১); একাশীতি>একাশি (৮১); একনবতি>একানই>একানব্বই (৯১) ('একাশি'র) সাদৃশ্যে 'আ'-কারের আগম।

২। অন্ত্য 'দুই'-যুক্ত সংখ্যা ঃ—স্ত্রী/ক্লীবলিঙ্গ 'দ্বে'>দুবে, দুবি>দু', দুই (২); পুং 'দ্বৌ'>'দো-' ('দোহারা' চেহারা)। (সং 'স্ত্রীণি'র সাদৃশ্যে * দ্বীনি> 'বেণি, বেণী' প্রাচীন বাঙলায় 'দুই'-অর্থে পাওয়া যায়)। দশ-গুণিত সংখ্যার সঙ্গে যুক্ত অবস্থায় 'দ্বা-/দ্বি->দ্বা/দ্বি>ব, বা/বি' ব্যবহৃত হয়। -'দ্বি (বি)- গুণিত দশ= বিংশতি>বিশ (২০)। অন্যত্র যোগ-যুক্ত অবস্থায়—দ্বাদশ>দ্বাদস>বারহ>বার (১২); দ্বাবিংশতি>বাইশ (২২); দ্বাত্রিংশৎ>বত্তিস>বতিশ, বত্রিশ (৩২); দ্বাচত্বারিংশৎ>দ্বাতালীস>বেয়াল্লিশ>বিয়াল্লিশ (৪২) (অতিপ্রাচীন কালেই '-দ্-' লোপ পেয়েছিল); দ্বাপঞ্চাশৎ>বাবন্নাহ>বায়ান্ন (৫২); দ্বাষষ্টি>বাসাইট> বাষট্টি (৬২); দ্বাসপ্ততি>বাহাত্তর (৭২); দ্বি-অশীতি>বিরাশি (৮২) ('চৌরাশি'র সাদৃশ্যে 'র'-আগম); দ্বিনবতি>বিরানব্বই (৯২) ('বিরাশি'র সাদৃশ্য)।

৩। 'অন্ত্য তিন'—ক্লীবলিঙ্গ 'ত্রীণি'>তিন্নি>তিন (৩); ত্রয়ঃ>তে; ত্রি>তি-। 'ত্রি'-গুণিত দশ=ত্রিংশৎ>তীস>তিশ; বাং 'ত্রিশ, তিরিশ' অর্ধতৎসম। 'ত্রি'-যুক্ত

সংখ্যা 'তে' বা 'তি' হ'য়েছে। যথা—ত্রয়োদশ>তেদস>তেরস>তেরহ>তের (১৩); ত্রয়োবিংশতি>তেবীসই>তেইশ (২৩); ত্রয়স্ত্রিংশৎ>তেত্তীস>তেতিশ (৩৩); বাং 'তেত্রিশ' অর্ধতৎসম; ত্রয়চত্বারিংশৎ>তেয়াল্লিশ>তেতাল্লিশ, তিয়াল্লিশ (৪৩); ত্রিপঞ্চাশ>তেপন>তিপান্ন (৫৩); ত্রিষষ্টি>তেষট্টি (৬৩); ত্রি-সপ্ততি>তেহত্তর> তিয়াত্তর (৭৩); ত্রি-অশীতি>তিআশি>তিরাশি (৮৩) (চৌরাশি'র সাদৃশ্যে 'র' আগম)। ত্রি-নবতি>তিরানব্বই ('তিরাশি'র সাদৃশ্যে) (৯৩)।

৪। অন্ত্য **'চার'**—ক্লীবলিঙ্গ 'চত্বারি'>চত্তারি'>চআরি>**চারি, চার** (৪); পুংলিঙ্গ চতুঃ>চউ>চৌ, চো (ধ্বনি পরিবর্তনের ফলে 'চু'-)। চতুর্গুণিত দশ= চত্বারিংশৎ>চত্তারিস্>চআলিস্>চালিশ>চল্লিশ, চালিশ (৪০)। চতুর্যুক্ত সংখ্যা— 'চৌ, চউ (=চর), 'চু' হয়েছে। যথা—চতুর্দশ>চউদ্দহ>চউদ্দ, চোদ্দ (১৪); চতুর্বিংশতি>চউবীস>চৌবিশ, চব্বিশ (২৪); চতুস্ত্রিংশৎ>চৌত্রিশ (অর্ধতৎ) (৩৪); চতুশ্চত্বারিংশৎ>চউতাল্লিশ>চুয়াল্লিশ (৪৪); চতুঃপঞ্চাশৎ>চবান>চউআন্ন> চুয়ান্ন (৫৪); চতুঃষষ্টি>চউষট্টি>চৌষট্টি, চৌষাট (৬৪); চতুঃসপ্ততি>চুয়াত্তর (৭৪); চতুরশীতি>চৌআশি, চউরাশি>চুরাশি (৮৪); চতুর্নবতি>চুরানই, চুরানব্বই (৯৪)।

৫। অন্ত্য **'পাঁচ'**—পঞ্চ>পাঁচ (৫)—ধ্বনিপরিবর্তনের স্বাভাবিক নিয়মেই সিদ্ধ; অপর সংখ্যার পূর্বে—'পঞ্চ>**পঞ্চ**' (অপরিবর্তিত), '**পঞ্চ>পঞ্‌ঞ্‌ঞ>পন**', 'পঞ্চ>পংজ>**পাঁচ**'; পঞ্চ>পন>পঁয়', অপর সংখ্যার পরে '**পঞ্চ>পন্ন>অন্ন**'। পঞ্চ-গুণিত দশ=পঞ্চাশৎ>**পঞ্চাশ**, পঁচাশ (৫০)। **পঞ্চ-যুক্ত** সংখ্যায় বিস্তর পরিবর্তন দেখা যায়।—**পঞ্চদশ>পন্নরস**>পন্নরহ>**পনের**, পনর (১৫); **পঞ্চবিংশতি** >পঁচিশ (২৫); পঞ্চত্রিংশৎ>পঁয়তিরিশ, পঁয়ত্রিশ (অর্ধতৎ) (৩৫); **পঞ্চচত্বারিংশৎ> পাঁচ-চল্লিশ**, পঁয়তাল্লিশ (৪৫); পঞ্চপঞ্চাশৎ>পঞ্চপন্নাহ>পাঁচপান, পঞ্চান্ন (৫৫); পঞ্চষষ্টি>পঁয়ষট্টি (৬৫); পঁঞ্চসপ্ততি>পঁচাত্তর (৭৫); পঞ্চাশীতি>পঁচাশি (৮৫); পঞ্চনবতি>পঁচানই, পঁচানব্বই (৯৫)।

৬। অন্ত্য **'ছয়'**—ষট্>ছ>ছ, **ছয়** (৬)→**ছা, ছি, ছে**। ষট্-গুণিত দশ=ষষ্টি >সট্‌ঠি>ষাঠি, ষাঠ্>ষাটি, **ষাট** (৬০); অপর সংখ্যার পরে ব্যবহৃত হ'লে **'ষাট্টি'**। ষট্-যুক্ত সংখ্যা প্রায় সর্বক্ষেত্রে 'ছ' হয়েছে। ষোড়শ>সোলস>ষোল (১৬); ষট্‌বিংশতি>ছব্বীস>ছাব্বিস (২৬): ষট্‌ত্রিংশৎ>ছয়তিরিশ>ছাত্রিশ (অর্ধতৎ) (৩৬); ষট্ চত্বারিংশৎ>ছয়চাল্লিশ>ছেচাল্লিশ (৪৬); ষট্‌পঞ্চাশৎ>ছাপান্ন (৫৬);

ষট্ষষ্টি>ছয়ষট্টি, ছেষট্টি (৬৬) ; ষটসপ্ততি>ছেহত্তর>ছিয়াত্তর (৭৬) ; ষট্অশীতি >ছয়আশি>ছিয়াশি (৮৬) ; ষট্নবতি>ছিয়ানব্বই (৯৬)।

৭। **অন্ত্য 'সাত'**—সপ্ত>সত্ত>সাত (৭)→**সৎ, সাই**। সপ্ত-গুণিত দশ= সপ্ততি>সত্তরি>সতইর, সত্তর (৭০) ; সংখ্যাটি অপর সংখ্যার পরে বসলে রূপান্তর ঘটে, যথা—সত্তর>হত্তর>অত্তর (একাত্তর, বায়াত্তর, তিয়াত্তর ইত্যাদি)। সপ্তযুক্ত সংখ্যার বিশেষ রূপান্তর ঘটে না।—সপ্তদশ>সত্তরস>সতর, সতের (১৭) ; সপ্তবিংশতি>সত্তবীস>সাতাইশ, সাতাশ (২৭) ; সপ্তত্রিংশৎ>সাততিরিশি>সাঁইত্রিশ (৩৭) ; ('প'য়ত্রিশ'-এর সাদৃশ্যে আননাসিক—অর্ধতৎ) ; সপ্তচত্বারিংশৎ>সাতচল্লিশ (৪৭) ; সপ্তপঞ্চাশৎ>সাপ্তপঞ্চাশ>সাতান্ন (৫৭) ; সপ্তষষ্ঠি>সাতষট্টি>(৬৭) ; সপ্ত-সপ্ততি>সাতসত্তর>সাতহত্তর>সাতাত্তর (৭৭) ; সপ্তাশীতি>সাতাশি (৮৭) ; সপ্তনবতি>সাতানব্বই (৯৭)।

৮। **অন্ত্য 'আট'**—অষ্ট>অট্ট>**আট** (৮)। অষ্টগুণিত দশ=অশীতি>আসীই >আশি (৮০) ; অপর সংখ্যার পরে 'আশি' ব্যবহৃত হয়। অষ্ট-যুক্ত সংখ্যা 'আট্, আঠ্' রূপ লাভ করে।—অষ্টাদশ>অট্টারহ>আঠার, আঠের (১৮) ; অষ্টাবিংশতি >আঠাইশ, আঠাশ (২৮) ; অষ্টাত্রিংশৎ>আটতিরিশ-ত্রিশ (৩৮) ; অষ্টচত্বারিংশৎ> আটচল্লিশ (৪৮) ; অষ্টপঞ্চাশৎ>আটপঞ্চাশ>আটান্ন (৫৮) ; অষ্টষষ্টি>আটষট্টি (৬৮) ; অষ্টসপ্ততি>আটসত্তর>আটহত্তর>আটাত্তর (৭৮) ; অষ্টাশীতি>আটাশি, অষ্টাশি (৮৮) (অর্ধতৎ) ; অষ্টনবতি>আটানব্বই (৯৮)।

৯। **অন্ত্য "নয়'**—নব>নঅ, নো>নয়, ন (৯)। নব-গুণিত দশ=নবতি> নঅই>নই, নব্বই (অর্ধতৎ) (৯০)। অপর সংখ্যার পরে ব্যবহৃত হ'লে সর্বত্র 'নব্বই' হয় (একানব্বই—নিরানব্বই) ; নয়-যুক্ত সংখ্যাগুলো প্রকাশের ধারা অপর সংখ্যার মত নয় (শুধু 'নিরানব্বই' অপর সংখ্যার মত) ; দশ-গুণিত সংখ্যা থেকে এক কমিয়ে ('একোন', ঊন-যোগে) সংখ্যাটি প্রকাশ করা হয়। একোনবিংশতি> এগুনবীস>অউনবীস>ঊনিশ (১৯) ; একোনত্রিংশৎ/ঊনত্রিংশৎ>ঊনত্রিশ (অর্ধতৎ) ; (২৯) ; ঊনচত্বারিংশৎ>ঊনচালিস>ঊনচল্লিশ (৩৯) ; ঊনপঞ্চাশৎ>ঊনপঞ্চাশ (৪৯) ; ঊনষষ্টি>ঊনষাট (৫৯) ; ঊনসপ্ততি>ঊনসত্তর (৬৯) ; ঊনাশীতি>ঊনাশি (৭৯) ; ঊননবতি>ঊনানব্বই (৮৯)। শুধু শত-পূর্ব সংখ্যাটি 'ঊনশত' না হ'য়ে নবনবতি>নিবানই, নিরানব্বই (৯৯) (বিরাশি, তিরাশি' প্রভৃতির সাদৃশ্যে) হয়েছে।

১০। **অন্ত্য 'দশ'**—দশ>দস>দসা, দহ (প্রাচীন বাংলায়) (১০) ; দশগুণিত দশ=শত>শঅ>'শ', শো (১০০)।

'হাজার' (১০০০) শব্দটি ফারসী থেকে গৃহীত। সং 'সহস্র>শাশ' (১০০০) শব্দটি 'শাশমল' এই উপাধির ক্ষেত্রেই শুধু ব্যবহৃত হয়। লক্ষ+লক্খ+লাখ (১০০০০০) বাঙলায় চলে।

(খ) একানুক্রমিক সংখ্যা

'এক' থেকে 'কুড়ি' পর্যন্ত সংখ্যাশব্দগুলির অনুক্রমিক উৎপত্তি ঃ

১। **এক ঃ** বানানে অভিন্ন হলেও বাঙলায় ব্যবহৃত 'এক' (=অ্যাক্—æk) উচ্চারণে তদ্ভব, আর তৎসম শব্দটি 'এক' (eka) উচ্চারণে ভিন্ন। মূল শব্দটি>প্রাকৃত এক্ক>প্রাঃ বাঃ এক, একু>আঃ বাঃ এক (অ্যাক) হয়েছে।

২। **দুই ঃ** সং দ্বে>প্রাঃ দুবে>প্রাঃ বাঃ দুই>দুই, দু'।

৩। **তিন ঃ** সং ত্রীণি (ক্লীব)>প্রাঃ তিণ্ণি>অপঃ তিন্ন>প্রাঃ বাঃ তিনি, তিন>তিন।

৪। **চার ঃ** সং চত্বারি>প্রাঃ চত্তারি>* চয়ারি>চারি, চাইর।

৫। **পাঁচ ঃ** সং পঞ্চ>প্রাঃ পংচ>পাঁচ।

৬। **ছয় ঃ** সং ষষ্, *ষষ>প্রাঃ ছ, ছহ>ছ, ছয়।

৭। **সাত ঃ** সং সপ্ত>প্রাঃ সত্ত>সাত।

৮। **আট ঃ** সং অষ্ট>প্রাঃ অট্‌ঠ>প্রাঃ বাঃ আঠ>আট।

৯। **নয় ঃ** সং নব>প্রাঃ ণব>প্রাঃ বাঃ নয়>নয়, ন'।

১০। **দশ ঃ** সং দশ>প্রাঃ দশ, দহ>প্রাঃ বাঃ দশ, দহ>দশ।

১১। **এগার ঃ** সং-একাদশ>পাঃ একারস>প্রাঃ এগ্গারহ>এগার।

১২। **বার ঃ** সং দ্বাদশ>পাঃ দ্বাদস, বারস>প্রাঃ বারহ>বার।

১৩। **তের ঃ** সং ত্রয়োদশ>পাঃ তেরস>প্রাঃ তেরহ>তের।

১৪। **চৌদ্দ ঃ** সং চতুর্দশ>পাঃ চতুদ্দস>প্রাঃ চউদ্দস>অপঃ চউদ্দহ> চৌদ্দ, চোদ্দ।

১৫। **পনের ঃ** সং পঞ্চদশ>পাঃ পন্নরস>প্রাঃ পণ্ণরহ>পনের।

১৬। **ষোল ঃ** সং ষোড়শ>পাঃ সোল়স>প্রাঃ সোল়স>অপঃ সোল্হ>ষোল।

১৭। **সতের ঃ** সং সপ্তদশ>প্রাঃ সত্তরহ>সতর, সতের।

১৮। **আঠার ঃ** সং অষ্টাদশ>প্রাঃ অট্‌ঠরহ>অপঃ অট্‌ঠারহ>আঠার।

১৯। **ঊনিশ** : সং একোনবিংশতি>ঊনবিংশতি>পাঃ একুনবীসতি>অউণ-বীসঈ>অপঃ এগুণবিংশ>উনিশ।

২০। **বিশ** : সং বিংশতি>পাঃ বীসতি>প্রাঃ বীসই>অপঃ বীস>বিশ। 'কুড়ি'—শব্দটি অস্ট্রীক (নিষাদ) গোষ্ঠীর ভাষা থেকে কৃতঋণ শব্দ বলে অনুমান করা হয়। তবে একটি মতে 'কোটি>কোডি>কুড়ি'—এরূপ হ'তে পারে।

(গ) **ক্রমবাচক সংখ্যা/ক্রমিক পূরণবাচক সংখ্যা** (Ordinal number)

বাঙলায় ক্রমবাচক সংখ্যা বোঝানোর ব্যাপারে যথেষ্ট অসুবিধা রয়েছে। প্রথমতঃ, বিভিন্ন সংখ্যার ব্যাপারে কোন নির্দিষ্ট প্রত্যয়-যোগের ব্যবস্থা নেই; দ্বিতীয়তঃ, ক্রমবোঝানোর জন্য যে রীতি অবলম্বিত হ'য়ে থাকে, তাতে অল্প কয়টি শব্দ ছাড়া বাকি সবগুলোই শুধু তারিখ বোঝাতে ব্যবহৃত হয়; তৃতীয়তঃ, বাঙলা মাসের তারিখ বত্রিশ পর্যন্ত হওয়াতে এর পর আর কোন ক্রমবাচক সংখ্যার অস্তিত্ব নেই।

বাঙলা ক্রমবাচক সংখ্যার অভাব মোচনের জন্য তাই সাধারণতঃ তৎসম সংখ্যা-গুলোই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। 'প্রথম ব্যক্তি, তৃতীয় স্থান, ষোড়শ অধ্যায়, সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ, অশীতিতম জন্মদিবস' প্রভৃতি। অপর একটি রীতি—ষষ্ঠী বিভক্তির প্রয়োগ অথবা সংখ্যা শব্দের পর ষষ্ঠী বিভক্তিযুক্ত উদ্দেশ্য পদে এবং পুনর্বার উদ্দেশ্য পদের ব্যবহার।—'সাতের ঘরের নামতা, একুশ তারিখের দিকে, ছয়ের পাতা; তিনবারের বার; ষোলদিনের দিন, পঁয়ষট্টি জনের জন, আশি বছরের বছর' প্রভৃতি।

১। **পয়লা, পহেলা**—*প্রথ(ম)+ইল>প্রাঃ পাহিল্ল, পঢমিল্ল>পাহিল, পয়লা, পহেলা।

২। **দোসরা / দোজ**—দ্বি+স্র>দোসরা; দ্বিতীয়>প্রাঃ দুইজ্জ>দুঅজ> দোজ। 'দোজবর' কথাটি প্রচলিত; বঙ্গালী উপভাষায় তারিখ বোঝাতে 'দুঅজা তারিখ' ব্যবহৃত হয়। পারিবারিক সম্পর্কে দ্বিতীয় ভ্রাতা বা বধূ বোঝাতে 'মেজ< মজ্ঝঅ<মধ্যক' শব্দ ব্যবহৃত হয়।

৩। **তেসরা / তেজ**—ত্রিসর, ত্রি+স্র>তিসরা, তেসরা। তৃতীয়>তিইজ্জ> তিঅজ, তেজ। 'তেজপক্ষ, তেজবর'—এর বাইরে সাধারণতঃ ব্যবহার নেই। বঙ্গালী উপভাষায় তারিখ বোঝাতে 'তেঅজা তারিখ' ব্যবহৃত হয়। ছেলে, ভাই বা বৌ বোঝাতে 'মেজ'-র সাদৃশ্যে সৃষ্ট শব্দ 'সেজ' (ফারসী 'সে'=তিন+জ)।

৪। **চৌঠা**—চতুর্থ>চউট্ঠ>চউঠ, চৌঠা। সাধারণতঃ তারিখ বোঝাতেই ব্যবহৃত হয়। চতুর্থ>পাঃ চতুত্থ>চৌথ (রাজস্বের চতুর্থ ভাগ)। ভাই বা বৌদের ক্ষেত্রে 'নোতুন অর্থে' 'নব'>'ন' ব্যবহার করা হয়।

৫। **পাঁচুই—আঠারই**—পাঁচ থেকে আঠার পর্যন্ত সংখ্যা শব্দের সঙ্গে 'ই' বা '-উই' প্রত্যয়-যোগে তারিখ বোঝাতে ক্রম-বাচক সংখ্যা ব্যবহৃত হয়।—সাতুই, সতরই, পনেরই। (পঞ্চমিক, ষট্‌মিক, সপ্তমিক প্রভৃতি থেকে উৎপন্ন।)

৬। **উনিশে—বত্রিশে**—উনিশ থেকে বত্রিশ পর্যন্ত সংখ্যা শব্দের সঙ্গে '-ইয়া>-এ' প্রত্যয় যোগে তারিখ বোঝাতে ক্রমবাচক সংখ্যা ব্যবহার করা হয়।—বাইশে, উনত্রিশে।

(ঘ) **ভগ্নাংশ সংখ্যাশব্দ** (Fractional Numeral)

$\frac{1}{4}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{2}$—প্রভৃতি ভগ্নাংশ সংখ্যাগুলো যথাক্রমে বোঝাচ্ছে—চার ভাগের একভাগ, তিনভাগের একভাগ ও দু'ভাগের একভাগ, অতএব সংক্ষেপে চারের এক, তিনের এক ও দুয়ের এক বল্লেই অর্থসঙ্গতি বজায় থাকে। কিন্তু কার্যতঃ এখন বাঙলায় উপরের সংখ্যাটিকে প্রথম উচ্চারণ করা হয়—একের চার, একের তিন প্রভৃতি ; অবশ্য এর পশ্চাতে ইংরেজি পঠনরীতির প্রভাব থাকা সম্ভবপর—one-fourth, one-third প্রভৃতি। এরূপ পাঠে ভুল বোঝবার আশঙ্কা বর্তমান থাক্‌ছে। এ রীতি বজায় রেখে পাঠ পরিবর্তন করা চলে এভাবে—এক চারের, এক তিনের প্রভৃতি। অর্থাৎ নিম্নস্থ বৃহত্তর সংখ্যাটির সঙ্গে সম্বন্ধবাচক ষষ্ঠী বিভক্তির চিহ্ন যুক্ত হওয়া সঙ্গত।

বাঙলা কিছু ভগ্নসংখ্যার নিজস্ব নাম রয়েছে, এগুলো তৎসম থেকে আগত তদ্ভব বা খাঁটি বাংলা শব্দ।

'পো, পোয়া'—$\frac{1}{4}$—পাদ>**পোয়া,** পো, সাধারণ পরিমাণ বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। 'এক পোয়া / পো দুধ' 'তিন পো পথ এখনো বাকি রয়েছে'। 'পয়সা' শব্দেও 'পদ' বা 'পাদ' রয়েছে। মূল শব্দটি 'পদাংশ' হ'তে পারে। এটি এক আনার এক পোয়া বা চতুর্থাংশ।

'সিকি'—$\frac{1}{4}$—*শুক্লিক>প্রা' সুক্কিঅ>*সুকি>**সিকি** ; এক টাকার এক-চতুর্থাংশ অর্থে ব্যবহৃত হয়। এর অপর একটি সম্ভাব্য উৎস 'সপাদক' ; তবে এতে ফাঃ 'সিক্কা' শব্দের প্রভাব পড়ে থাকতে পারে। ওজন এবং মুদ্রামান ছাড়াও শব্দটির ব্যবহার রয়েছে—'সিকি ভাগ কাজ'।

'তেহাই'—$\frac{1}{3}$—*ত্রিভাগিক>**তেহাই**—আধুনিক বাঙলায় ব্যবহার নেই, মধ্য

বাঙলায় ছিল ('অর্ধেক পংকেতে তার তেহাই সলিলে, দশমভাগের ভাগ সেহলার দলে'), তিনভাগের এক ভাগ অবর্থে।

'আধ' ½—অর্ধ>অদ্ধ>আধ, আদ—প্রসারে **'আধলা, আধুলি, আধেক'**। এর আর একটি রূপ অর্ধ>অড্ঢ>আড়—'আড়মাতাল, আড়চোখ' প্রভৃতিতে 'ঈষৎ'-অর্থে বিশেষণ-রূপে সমাসে পূর্বপদরূপে ব্যবহৃত হয়।

'সাড়ে'—+½—সার্ধ>*সড্ঢ>সাড়ে। অপর সংখ্যার সঙ্গে যুক্ত অবস্থায় একে বলে **'সাড়ে'**, ৩½=সাড়ে তিন।

'পৌনে'—¾—¼ সংখ্যাটি পূর্ণসংখ্যার তিন-চতুর্থাংশ, অথবা পূর্ণসংখ্যার এক-চতুর্থাংশ কম—এই ভাবটি বোঝাতে ব্যবহৃত হয় 'পাদোন>পৌনে' শব্দ। ৩¾—পৌনে চার, ৬¾—পৌনে সাত।

'সোয়া'—১¼—এক চতুর্থাংশ-যুক্ত পূর্ণসংখ্যা বোঝাতে ব্যবহৃত হয় সপাদ> **'সোয়া'** শব্দ। চতুর্থাংশ-সহ যে-কোন শব্দেই এটি যুক্ত হয়।—৪¼—সোয়া চার।

'দেড়' -১½—অর্ধযুক্ত পূর্ণসংখ্যা বোঝাতে একটু ঘুরিয়ে শব্দ ব্যবহার করা হয়। বলা হয় 'অর্ধ কম দুই' অর্থাৎ দ্বি-অর্ধ=দ্ব্যর্ধ>দিঅড্ঢ>**দেড়**।

'আড়াই'—২½—আধ কম তিন, অর্ধ তৃতীয়>অড্ঢাইঅ>**আড়াই**।

'আহুট'—৩½—আধ কম চার, অর্ধ চতুর্থ>প্রাঃ অড্ঢুট্ঠ>মঃ বাঃ আউঢ্, **আহুট**। আধুনিক বাঙলায় পদটির প্রচলন নেই, এর অর্থ 'সাড়ে তিন'।

(ঙ) নির্দেশক (Definite) ও অনির্দেশক (Indefinite) সংখ্যা শব্দ

সংখ্যা শব্দ নির্দেশক প্রত্যয় '-টা, -টি' কিংবা '-গোটা, -গুটি প্রভৃতি যোগ করে গণনা বোঝাতে হয়।—'পাঁচটা টাকা, দশটা হাতি, তিনগোটা শর' প্রভৃতি। সংখ্যা-শব্দে প্রত্যয় যুক্ত হলে শব্দটি বিশেষণবৎ কার্য করে।

সংখ্যা শব্দটি যদি নির্দেশক বা পরিমাণ-বাচক শব্দের পরে বসে, তবে তদ্দ্বারা অনির্দিষ্ট সংখ্যা বোঝানো হয়।—'টাকা চার, সের দুই, জনা সাত'।

সংখ্যা শব্দের পূর্বে '-গুটি, -খানা' আদি নির্দেশক শব্দ ব্যবহারেও বস্তুর অনির্দিষ্টতা জ্ঞাপন করে।—'গোটা চার শর', 'খান পাঁচ বই'।

সংখ্যাবাচক শব্দের সঙ্গে '-এক' স্বার্থিকপ্রত্যয়-যোগেও অনির্দিষ্টতা বোঝানো হয়।—'সের পাঁচেক চাউল', 'খান তিনেক কাপড়'।

দুটি সংখ্যাবাচক শব্দ পাশাপাশি বসিয়েও অনির্দিষ্টতা বোঝানো হয়।—পাঁচ সাতজন লোক, দশবারো খান বই।

(চ) গুণিতক সংখ্যা শব্দ (Multiplicative Numerals)

সাধারণতঃ সংখ্যাবাচক শব্দের সঙ্গে '-গুণ' যোগ করে গুণিতক সংখ্যাটি জ্ঞাপন হয়।—পাঁচগুণ, বিশগুণ, হাজারগুণ।

কোন কোন বিশেষ সংখ্যার অবশ্য পৃথক্ গুণিতকও পাওয়া যায়।

এক—এক-ল > একলা, *এক + সর > এক্সর > একেশ্বর (একসর, একসরী), একহারা (< *একভাধারক)।

দুই—দোকলা ('একলা'-র সাদৃশ্যে'), দুনা. দুনো (< দ্বিগুণ), দুরি, দোসর, দোহারা (< *দ্বিভারক)।

তিন—তেহারা (< ত্রিভারক)।

(ছ) কবি শকাঙ্ক

মধ্যযুগের বাঙালী কবিরা অনেক সময় গ্রন্থ রচনার সন তারিখ উল্লেখ করে গেছেন একটা বিশেষ পদ্ধতিতে। প্রাচীন কবিদের মধ্যে একমাত্র মালাধর বসুই স্পষ্ট করে বলেছেন, 'তেরশ' পঁচানই শকে গ্রন্থ আরম্ভন।' অপরেরা শকাব্দই অধিকাংশ ক্ষেত্রে ব্যবহার করেছেন, তবে সন উল্লেখ করেছেন, সাংকেতিক শব্দের সাহায্যে।—১—চন্দ্র, ইন্দু, ব্রহ্ম ; ২—পক্ষ ; ৩—নেত্র ; ৪—বেদ ; ৫—বাণ ; ৬—ঋতু, রস ; ৭—সমুদ্র ; ৮—বসু ; ৯—গ্রহ, রস ; ১০—দিক্ ; ১১—রুদ্র ; ১২—আদিত্য ; সংখ্যা বোঝাতে এই শব্দগুলো সাধারণতঃ ব্যবহার করা হ'তো। 'ঋতু শূন্য বেদ শশী শক-পরিমাণ'—৬০৪১—কিন্তু 'অংকস্য বামা গতি' এই নিয়মে হবে—১৪০৬ শকাব্দ। 'শক লিখে রামগুণ রস সুধাকর'—রাম—৩ (পরশুরাম, রামচন্দ্র, বলরাম), গুণ—৩ (সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ), রস—৬, সুধাকর—১। অতএব ৩৩৬১ উল্টে ১৬৩৩ শকাব্দ। সাধারণতঃ এর সঙ্গে ৭৮ যোগ করলে খ্রীষ্টাব্দ পাওয়া যায়। তবে সর্বত্র সংখ্যার পরিবর্তে এই সংকেত চিহ্নই ব্যবহৃত হয়। কবিগণ স্ব, স্ব উদ্ভাবিত সংকেতচিহ্নও ব্যবহার ক'রে থাকেন, ফলে বহু স্থলেই অর্থ উদ্ধার করা কষ্টকর হ'য়ে দাঁড়ায়।

[পাঁচ] সর্বনাম

যে শব্দ প্রাণিবাচক, অপ্রাণিবাচক বা বস্তুবাচক অর্থাৎ যে-কোন নামশব্দের পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়, তাকে বলে 'সর্বনাম'। সর্বনামের প্রধান বিভাগ দুটি—(ক) পুরুষবাচক (personal) এবং (খ) নির্দেশক (Demonstrative)।

(ক) পুরুষ-বাচক সর্বনাম

বাঙলায় সর্বনামের তিনটি পুরুষ—(১) উত্তম পুরুষ (First Person), (২) মধ্যম পুরুষ (Second Person) ও (৩) প্রথম পুরুষ বা নামপুরুষ (Third Person)। বাঙলা পুরুষে লিঙ্গ-ভেদ নেই, সংস্কৃতে প্রথম পুরুষে ছিল, বাঙলায় তাও নেই।

বাঙলা সর্বনামের একটা সাধারণ বৈশিষ্ট্য এইঃ কর্তৃকারকে শব্দের যে রূপটি ব্যবহৃত হয়, তার সঙ্গে বিভক্তিযুক্ত হয়ে অপর কারকের পদ গঠিত হয় না; অপর সমস্ত কারকের জন্য অর্থাৎ চিহ্ন যুক্ত করবার জন্য শব্দটির একটি 'প্রাতিপদিক রূপ' (stem-form) বা 'তির্যক রূপ' (oblique form) ব্যবহার করা হয়। ফলতঃ, প্রতি সর্বনামের দুটি রূপ বিদ্যমান। কর্তৃকারকে একবচনে একপ্রকার রূপ, অন্য সব ক্ষেত্রে প্রাতিপদিকের সঙ্গে বিভক্তিচিহ্ন যুক্ত হয়। যেমন—'আমি', কিন্তু 'আমাকে' (আমিকে' নয়); 'সে, তার', 'তুমি, তোমাকে'।

(১) উত্তম পুরুষ

সংস্কৃতে উত্তম পুরুষে 'অস্মদ্' শব্দ; বাঙলায় উত্তম পুরুষে কর্তৃকারকে এক বচনের রূপ 'আমি', কিন্তু 'আমি' শব্দের সঙ্গে বিভক্তি যুক্ত হয় না। যে দুটি শব্দকে প্রাতিপদিক-রূপে গ্রহণ করা হয়, অর্থাৎ যাদের সঙ্গে বিভক্তি যুক্ত হয়, সে দুটি 'আমা'- এবং 'মো-'।—'আমার, আমাকে, আমাদের, মোর, মোকে, মোদের প্রভৃতি।

'আমি'ঃ বৈদিক *অস্মে > অম্হে + আহ্মে + **'আমি'** মূলতঃ বহুবচন পদ হলেও আধুনিক বাঙলায় একবচনরূপে ব্যবহৃত হয়। 'আমি' শব্দটি সংস্কৃত করণকারকের পদ 'অস্মাভিঃ' থেকেও আসতে পারে।

'মুই'ঃ সং * 'ময়েন' (=ময়া) > মএঁ > মই > মুই' মূলতঃ একবচন হলেও আধুনিক বাঙলা সাধুভাষায় এর ব্যবহার নেই, উপভাষায় এখনও প্রচলিত আছে।

'হাউ', 'হুঁ'ঃ অহকম্ (=অহং) > হকম্ > হঁউ > **হোঁ**, হুঁ' মধ্য বাঙলায়ও প্রচলিত ছিল, অধুনা অপ্রচলিত। এই শব্দটি শেষ পর্যন্ত ক্রিয়াবিভক্তি-রূপে উত্তম পুরুষে যুক্ত হতো—'দেহুঁ' (=আমি দিই), অতীতকালে 'আয়িলাহুঁ' (আমি আসিলাম)। আধুনিক কালে উত্তম পুরুষের ক্রিয়াপদের '-ম' (চলিলাম, করুম, যামু) এই 'হুঁ' থেকে আগত। প্রাচীন বাঙলায় 'হাঁউ' কর্তায় ব্যবহৃত হতো। **'তুলো ডোম্বী হাঁউ কপালী'**।

'আমা-' ঃ কর্তৃকারকের বহুবচন এবং তির্যক কারকের প্রাতিপদিক **'আমা'**-শব্দের উদ্ভব—অস্মাকম্ > অম্হাকম্ > অম্হাঅ* > অমহা > আহ্মা > আমা-' অথবা *'অস্মাম্ > অম্হম্ > অম্হ > আহ্ম, আহ্মা + আম-'—এ ভাবে।

(পূর্ব ময়মনসিংহে বহুবচনের 'আমরা-' প্রাতিপাদিক, এর সঙ্গে বিভক্তি যুক্ত হয়।—'আমরার, আমরারে')

'মো-' ঃ উত্তম পুরুষের অপর প্রাতিপদিক **'মো-'** নিম্নোক্তক্রমে উদ্ভূত হয়েছে—'মম > মঞো > মো-'।—মোরা, মোদের প্রভৃতি।

বাঙলা ভাষায় প্রাচীন ও মধ্যযুগে কর্তার বহুবচনে প্রাতিপদিক **'আহ্মা'**-র সঙ্গে '-রা' বিভক্তি এবং অন্যান্য কারকেও বিভক্তি যুক্ত হতো।—'আহ্মারা, আহ্মাক/-কে, আহ্মারে, আহ্মাত/-তে, আহ্মার'। আধুনিক বাঙলায় 'আমা-' প্রাতিপদিকের সঙ্গে একবচনে বিভক্তিচিহ্ন এবং বহুবচনে প্রাতিপদিকের সঙ্গে '-দে,-দিগ' যোগ করে পরে বিভক্তিচিহ্ন ব্যবহার করা হয়।—'আমরা, আমাকে, আমাদিগকে, আমার, আমাদের, আমাদিগের'।

'ম', 'মোম'—এই প্রাতিপদিকে প্রাচীনকালে বিভিন্ন বিভক্তি যুক্ত হয়ে বিভিন্ন কারকে ব্যবহৃত হতো—'মো, মোরা, মোক, মোকে, মো' প্রভৃতি। বর্তমান কালে কাব্যে এবং কোন কোন উপভাষায় ব্যবহৃত হয়।

'ম, মো' কর্তৃকারকের একবচনেও প্রাচীনকালে ব্যবহৃত হতো।—'তরঙ্গ ম মুনিয়া', 'মো যদি জানিতাঞ'। শব্দ ও প্রাতিপদিকটির উদ্ভব—'মম > মঞ > মই + মো, ম'।

আধুনিক কালে কবিতায় 'মোরা, মোর, মোদের' চলে—গদ্যে অপ্রচলিত। প্রাচীন বাঙলায় 'মোহোর' পদের প্রাদিপতিক 'মোহ'-র উৎপত্তি—*মভ্যম্ (=মহ্যম্) > মহু > মোহ-'।

(২) মধ্যম পুরুষ

মধ্যম পুরুষের তিনটি রূপ প্রচলিত। তাদের রূপ কর্তৃকারকের একবচনে যথাক্রমে (অ) 'তুই', (আ) 'তুমি' ও (ই) 'আপনি'।

(অ) 'তুই'—মূলতঃ এটি ছিল বাঙলায় একবচনের রূপ। সং 'ত্বয়া > তএ, তুএ > তই, তোএ > তুই'—মূলে করণ থেকে জাত হ'লেও আধুনিক বাঙলায় কর্তৃকারকের পদ। প্রধানতঃ তুচ্ছার্থে ও অনাদরে ব্যবহৃত হয়, আবার অতি ঘনিষ্ঠতায় এবং

নিকট-সম্বন্ধেও প্রযুক্ত হয়। অল্পবয়স্ক অথবা নিম্নশ্রেণীর লোকদের প্রতি যেমন, তেমনি ঘনিষ্ঠ আত্মীয়, সমবয়স্ক বন্ধু এবং কখন কখন দেবতার উদ্দেশ্যেও 'তুই' প্রযুক্ত হয়—'তুই মা জগতের আলো'।

'তো-'—প্রাতিপদিক রূপ 'তো-', এর সঙ্গে বিভিন্ন বিভক্তি-যোগে কর্তৃকারকের বহুবচন এবং তির্যক কারকের বিভিন্ন পদ সাধিত হয়।—'তোরা, তোকে, তোদের'। প্রাচীন বাঙলায় প্রাতিপদিকটি কর্তৃকারকের একবচনের পদ-রূপেও ব্যবহৃত হ'তো —'সুন হরিআ তো'। এর উৎপত্তি—'তব'>'তো, তো-'। এর আর একটি প্রাতিপদিক রূপ 'তুভ্যম্>তুব্‌ভং>তুহু', 'তোহ-'। 'তুহুঁ' ব্রজবুলিতে কর্তায় ব্যবহৃত হ'তো—'তুহুঁ জগতারণ'।

(আ) তুমি—সাধারণ অর্থে ব্যবহৃত এবং বহুপ্রচলিত মধ্যম পুরুষের পদ 'তুমি' মূলতঃ ছিল বহুবচনের পদ।—*'তুষ্মে>তুম্‌হে, তুহ্মে>তুমি' অথবা '*তুষ্মাভিঃ (=যুষ্মাভিঃ)>তুম্‌হাহি>তুম্‌হহি>তুহ্মে, তুম্ভে>তুহ্মি, তুহি>তুমি'—বাঙলা ভাষার মধ্যযুগেই পদটি একবচনে ব্যবহৃত হ'তে থাকে।

'তোমা-', 'তোহ্মা'—'তুমি'-শব্দের প্রাতিপদিক রূপ 'তোহ্মা-, তোমা-', মধ্যযুগে কর্তৃকারকের পদরূপেও ব্যবহৃত হতো—'এক তোহ্মা গতী', তোমা বনমালী'। এর ব্যুৎপত্তি—*তুষ্মাকম্, *তুষ্মাম্ (=যুষ্মাকম্)>তুম্‌হাকং, তুহ্মং>তুম্‌হং> তোম্‌হা>তোহ্মা, তোমা, তোহাঁ'।—প্রাতিপদিকের সঙ্গে বিভিন্ন বিভক্তি জুড়ে কর্তৃকারকের বহুবচন এবং তির্যক কারকের পদ সাধন করা হয়।—'তোমরা, তোমাকে, তোমাদিগকে, তোমাদের, তোমাদিগের' প্রভৃতি। ব্রজবুলিতে *'তুহ্যম্>তুঝ' সম্বন্ধ পদে ব্যবহৃত হয়।

(ই) আপনা-, আপনি—মধ্যম পুরুষের অপর একটি রূপ 'আপনি' সম্ভ্রমাত্মক পদরূপে সম্ভবতঃ অষ্টাদশ শতকেই বাঙলা ভাষায় গৃহীত হ'য়েছিল।—'আত্মন্> অপ্পন>আপনা-'—এই 'আপনা-' প্রাতিপদিকের সঙ্গে বিভিন্ন বিভক্তি-যোগে তির্যক কারকের পদ সাধিত হয়।—'আপনারা, আপনার, আপনাদের/-দিগের' ইত্যাদি।— 'আপনি' শব্দ 'নিজ' অর্থেও ব্যবহৃত হয়—'আপনার ধন পরকে দিয়ে', 'আপনি আচরি ধর্ম পরেরে শিখাও'।

উত্তম পুরুষ ও মধ্যম পুরুষের কিছু কিছু শব্দ মূলতঃ করণকারকের পদ, কর্মবাচ্যের কর্তায় প্রযুক্ত হ'তো; প্রাচীন বাঙলায় ঐ কর্ম-ভাববাচ্যের ভাবটা বর্তমান ছিল, আধুনিক কালে তা' কর্তৃবাচ্যের কর্তায় রূপান্তরিত হয়েছে। —'মুই (>*ময়েন=ময়া), তুই (*>ত্বয়েন=ত্বয়া, আপনি (>আত্মনা)'।

(৩) **প্রথম পুরুষ**

উত্তম পুরুষের 'আমি'-বাচক এবং মধ্যম পুরুষের 'তুমি'-বাচক শব্দগুলো ছাড়া যাবতীয় পুরুষ-বাচক শব্দই 'প্রথম পুরুষ' রূপে বিবেচিত হয়। প্রথম পুরুষের দুটি রূপ—একটি সাধারণ, অপরটি সম্ভ্রমাত্মক। সাধারণ রূপটির কর্তৃকারকের একবচনে 'সে', বহুবচনে এবং তির্যক কারকে 'তা-' কিংবা 'তাহা-' প্রাতিপদিকের সঙ্গে বিভক্তি যোগ করে পদসাধন করা হয়।

'সে' : সং 'সঃ সকঃ>স, সো, সে>সে, সি, সেহ'। প্রাচীন বাঙলায় 'সি' এবং 'সেহ' শব্দের বিরল প্রয়োগ পাওয়া যায়। মধ্যবাঙলায় 'সে'-অর্থে ক্বচিৎ 'সে-না' শব্দের ব্যবহার রয়েছে—'সে না কোন জনা' (পদটি 'তেনা', এনা'-প্রভৃতির সাদৃশ্যে সৃষ্ট হয়েছে।)

'তা-', 'তাহা-' : কর্তৃকারকের একবচন ব্যতীত অপর সমস্ত ক্ষেত্রে চলিত ভাষায় 'তা-' এবং সাধুভাষায় 'তাহা-' প্রাতিপদিকের সঙ্গে বিভক্তি যুক্ত হয়ে থাকে।—'তারা/তাহারা, তারে/তাকে/তাহাকে, তাদের/তাহাদের/তাহাদিগের' প্রভৃতি। 'তা-, তাহ-' মূলতঃ বহুবচন।' সম্ভাব্য উৎস—ষষ্ঠী বিভক্তি একবচনের পদ তস্য>প্রা· তস্স> *তাস>তাহ, তা। অপর একটি অভিমত-অনুযায়ী, ষষ্ঠীর বহুবচন পদ তেষাম্, *তানাম্>অপ· তাহ(ং), তাণ(ং)>তাহা-, তাঁহ- ।

'তিনি' : প্রথম পুরুষে সম্ভ্রমাত্মক কর্তৃকারকের একবচনের রূপ 'তিনি'। *'তেনাম্ (=তেষাম্)>তেণ্হং, তিন্হং>তেন্হ, তেঁহ, তিঁহ>তিনি।' মধ্যবাঙলায় 'তিহঁ, তেঁহ' শব্দের ব্যাপক প্রয়োগ ছিল। কর্তৃকারকের বহুবচন এবং তির্যক কারকের রূপ সাধারণ রূপের মতই, শুধু চন্দ্রবিন্দু-যুক্ত—'তাঁ-, তাঁহা-'। পদান্তস্থিত '-ন' লোপ পেয়ে পূর্বস্বরকে সানুনাসিক করে দেয়। সং ১ বচনে তেন+বহুব তেভিঃ>প্রাঃ তেণ(ং), তিণা>অপঃ তেঁ, তিণি>মঃ বাঃ তেঞি> আঃ বাঃ তিনি। করণকারকের 'তেন'+হি>* তেনই>* তেইনি>তেইন, তিনি> তাইন' (আঞ্চলিক ভাষা)—এরূপ উৎপত্তিও অসম্বব নয়।

বাঙলা সর্বনাম পদগুলিতে কোন লিঙ্গান্তর ঘটে না—এটাই সাধারণ নিয়ম। শুধুমাত্র একটি ক্ষেত্রেই ব্যতিক্রম দেখা যায়। চট্টগ্রাম অঞ্চলে পুংলিঙ্গে 'হিতে (হি+তে=সে+তে), তে' এবং স্ত্রীলিঙ্গে 'তাই' ব্যবহৃত হয় ; পূর্ব ময়মনসিংহেও স্ত্রীলিঙ্গে 'তাই' এবং পুংলিঙ্গে 'হে' (=সে) ব্যবহৃত হয়।

কথ্যভাষায় অনেক সময় 'তাঁর-' পরিবর্তে 'তেনার' বা 'তান' ('তাইন') শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়।

(খ) নির্দেশক সর্বনাম

নির্দেশক সর্বনামকে প্রধান পাঁচটি বর্গে বিভক্ত করা যায়—(১) নিকট-নির্দেশক বা অস্তিক-নির্ণয়-সূচক (Near Demonstrative), (২) দূর-নির্দেশক (Far Demonstrative), (৩) সম্বন্ধ বা সঙ্গতিবাচক (Reflective), (৪) অনিশ্চয়-সূচক বা অনির্দিষ্ট (Indefinite) ও প্রশ্নাত্মক (Interrogative), (৫) আত্মবাচক (Reflexive)।

(১) **নিকট-নির্দেশক সর্বনাম**—নিকট-নির্দেশক সর্বনামের কর্তৃকারকের একবচনে তিনটি রূপ প্রচলিত—'এ (ই), ইনি, ইহা'।

প্রাণিবাচক শব্দে 'এ' বা 'এই' ব্যবহৃত হয়।—'এভিঃ>এহি>এই, এ' অথবা 'ইদম্, এতৎ>ইদং, এদং>ইঅ, এঅ>ই, এ, এহি>এ, এই'। প্রাণিবাচক শব্দের পরিবর্তেই সাধারণতঃ এই সর্বনামটি প্রযুক্ত হয়। এর প্রাতিপদিক 'এ-'।—'এরা, একে, এদের'।

'এর' প্রাণিবাচক সম্ভ্রমাত্মক রূপে 'ইনি'। এষাম্>এণ্হং>এণ, ইন>এনা, ইহিঁ, এহ্ঁ>ইনি, ইহঁ-, এনা'। এর প্রাতিপদিক 'ইহাঁ-'; আঞ্চলিক ভাষায় 'এনা-' প্রাতিপদিকও ব্যবহৃত হয়।—ইঁহারা/এনারা, ইঁহাদের/এনাদের'।

অপ্রাণিবাচক রূপ 'ইহা'। 'এষঃ>এসো>এহু, এহ>এহ, ইহ, ইহা>ইহা।' চলিত বাঙলায় 'ইহা'-র পরিবর্তে 'এ, এটা, এই' প্রভৃতি রূপও ব্যবহৃত হয়। এর প্রাতিপদিক 'ইহা-', 'এ-'।

(২) **দূর নির্দেশক সর্বনাম**ঃ—দূর-নির্দেশক সর্বনামের প্রয়োগ প্রাচীন বাঙলায় পাওয়া যায় না। মধ্য বাঙলা থেকে এর সন্ধান মেলে। এর প্রাণিবাচক সাধারণ রূপ একবচনে 'ও', 'ওই', গৌরবে 'উনি' এবং অপ্রাণিবাচক 'অই, উহা, ওই, ঐ' প্রভৃতি। 'অবঃ, অবং (=অসৌ, অদঃ)>ও' অথবা 'অসৌ>অহো> অও>ও'। এই পদে অনেক সময় '-হা-' যোগ হয়—'উহা'। এদের প্রাতিপদিক 'উহা-, ও-, উঁহা-' ওঁ-, ও-' ওই-' ওনা'-প্রভৃতি।

(৩) **সম্বন্ধীনির্দেশক সর্বনাম**ঃ—সাধারণ প্রাণিবাচক 'যে', প্রাতিপদিক 'যা-' যাহা-' গৌরবে 'যিনি', প্রাতিপদিক 'যাঁ-, যাঁহা-'। অপ্রাণিবাচক 'যা, যাহা, যেটা, যেটি', প্রাতিপদিক—'যে-' (যেগুলি, যে সকল)। 'যঃ, যকঃ, যৎ>জো, জএ> জু, জি>জে>জ>জে (যে); সম্ভ্রমাত্মক পদ—যেষাম্>জেণ্হং>যিনি; যস্য>যাস>জাহ>যাহা।

সম্বন্ধবাচক সর্বনামের পর একে সম্পূর্ণ করবার জন্য সাধারণতঃ আর একটি

সর্বনাম ব্যবহৃত হয়। যথা—যে-সে, যাহা-তাহা, যিনি-তিনি। পৃথকভাবে জানানোর জন্য এই সর্বনামের দ্বিত্ব হয়—'যে-যে, যার-যার'।

(৪) **অনির্দিষ্ট ও প্রশ্নাত্মক সর্বনাম** ঃ—অনিশ্চয়তামূলক প্রাণিবাচক সাধারণ ও সম্ভ্রমাত্মক 'কেউ, কেউ', অপ্রাণিবাচক 'কিছু' এবং প্রশ্নাত্মক সাধারণ ও সম্ভ্রমাত্মক 'কে' ও অপ্রাণিবাচক 'কি' শব্দ কর্তৃকারকে একবচনে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। অপর শব্দ 'কোন' সাধারণতঃ বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হয়। এদের প্রাতিপদিক—'কি-, কা-' কাহা-'।

'কঃ, *ককঃ > কে, কো, কএ > কে, কি, কই > কে' (মনুষ্যবাচক কর্তা)।

'কিম্ > কিং > কি' (অমনুষ্য কর্তা এবং প্রাতিপদিক 'কি-')

*'কাস (=কস্য) > কাহ > কা-, কাহ-' (প্রাতিপদিক)।

*কভিম্ > কহিং > কহি > কই' (প্রশ্নবোধক)।

সাধারণ ও সম্ভ্রমাত্মক কর্তার একবচনে 'কে', সাধারণ বহুবচন ও তির্যক কারকে প্রাতিপদিক চলিত বাঙলায় 'কা-' সাধু বাঙলায় 'কাহা'—'সম্ভ্রমাত্মক প্রাতিপদিক 'কাঁ-' কাঁহা-'। সম্ভ্রমাত্মক কর্তায় আঞ্চলিক প্রয়োগে 'কিনি'ও ক্বচিৎ ব্যবহৃত হয় ('ইনি কিনি')।

প্রশ্নাত্মক 'কই' বাক্যের মধ্যে ব্যবহৃত হয় না, এককভাবে জিজ্ঞাসায় ব্যবহৃত হয়। বঙ্গালী ভাষায় 'কোথায়'-স্থলে বাক্যের মধ্যেও 'কই' ব্যবহৃত হয়।—'আমার চাদরখানা কই (কোথায়)?'

*'কিশ্চ (=কিঞ্চ) > কিচ্ছ > কিছু'—অনির্দিষ্ট বর্ম-কর্তায় ব্যবহৃত হয়। এর আর কোন প্রাতিপদিক নেই, 'কিছু'-র সঙ্গেই বিভিন্ন বিভক্তি যুক্ত হয়।

পৃথগ্‌ভাবে জানবার জন্য অথবা বহুবচন বোঝাতে এই সর্বনামগুলোর অনেক সময় দ্বিত্ব হয়।—'কে-কে, কি-কি, কেউ-কেউ, কোন্ কোন্, কার-কার, কিছু-কিছু'।

(৫) **আত্মবাচক সর্বনাম** ঃ—আত্মবাচক সর্বনামগুলোর মধ্যে আছে—'আপনি, নিজ, স্বয়ং'। শব্দগুলো সমভাবে একবচনে ও বহুবচনে প্রযুক্ত হ'যে থাকে। 'স্বয়ং' শুধু কর্তৃকারকে ব্যবহৃত হয়, অপরগুলো বিভক্তিযোগে সব কারকেই ব্যবহৃত হয়।

[ছয়] সর্বনামজাত বিশেষণ ও ক্রিয়াবিশেষণ (Pronominal Adjectives and Adverbs.)

কিছু কিছু সর্বনাম পদ বিশেষণরূপেও ব্যবহৃত হ'য়ে থাকে। পুরুষবাচক শব্দগুলোর মধ্যে প্রথম পুরুষ এবং অনির্দিষ্ট সর্বনামই এই উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত হয়। বিশেষণের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত সর্বনাম শুধু একবচনেই ব্যবহারযোগ্য, বহুবচনে ব্যবহার করতে হলে সর্বনামের পর 'সকল, সব, সমস্ত' ইত্যাদি বহুত্ববাচক শব্দ যোগ করে নিতে হয়। 'কোন্ মানুষ, সেই জন, কোন ব্যক্তি ;'সেইসব মানুষ, যে সকল নারী

কি সব খবর।' এই সমস্ত ক্ষেত্রে বিভক্তিবাচক চিহ্নগুলো সর্বনামের সঙ্গে যুক্ত না হয়ে বিশেষিত পদের সঙ্গে যুক্ত হয়।—'কোন্ বইতে, কী ছবিতে।' আলোচ্য ক্ষেত্রে বিশেষণরূপে সর্বনামের প্রয়োগ ঘটেছে।

সর্বনামের মূল অংশের বা প্রাতিপদিকে সঙ্গে কিছু প্রত্যয় যোগ করে যে বিশেষণ বা ক্রিয়া-বিশেষণ পদ গঠন করা হয়, তাকেই বলে যথাক্রমে **সর্বনামজাত বিশেষণ ও সর্বনামজাত ক্রিয়াবিশেষণ**। এদের দ্বারা বাঙলা ভাষায় স্থান, কাল, পরিমাণ এবং সাদৃশ্য বোঝানো হয়। ক্রিয়াবিশেষণগুলোকে কখনো বিভিন্ন বিভক্তিযোগে বিশেষ্যের মতও ব্যবহার করা চলে।

এগুলোর বাইরে সাদৃশ্যবাচক বিশেষণ পদ গঠন করবার একটি প্রত্যয় ছিল—'-হেন'। প্রাচীন বাঙলায় 'এহেন, যেহ্ন, তেহেন, তেহ্ন' প্রভৃতি রূপে ব্যবহৃত হ'তো, একালে 'হেন, কেন, যেন' প্রচলিত আছে।—'এ হেন কালে', 'হেনকালে', কি কারণে' অর্থে 'কেন' এবং 'যেন' ক্রিয়াবিশেষণরূপে ব্যবহৃত হয়। ব্রজবুলিতে সর্বনামজাত বিশেষণ-রূপে ঐছন, কৈছন, তৈছন' এবং ক্রিয়া-বিশেষণরূপে 'ঐছে, কৈছে, জৈছে, তৈছে'র প্রয়োগ ছিল।

প্রত্যয়-> মূল বা প্রাতিপদিক ↓	স্থানবাচক ঃ 'থা', থায় 'খান -খানে' (ক্রিয়াবিশেষণ)	কালবাচক ঃ '-খন, -ক্ষণ, -বে' (ক্রিয়াবিশেষণ)	পরিমাণবাচক ঃ '-ত (-তো) (বিশেষণ)	সাদৃশ্যবাচক ঃ '-মন, -মত (মৎ-) -মত (মতো) বিশেষণ
সে- তা-	সেথা, সেথায় সেখান, সেখানে,	সেইক্ষণ, তখন, তবে	(-ততো) তত	সেইমত, তেমৎ, তেমন
এ- (হে-)	এথা, হেথা, হেথায় এখান, এইখানে এখানে	এখন, এইক্ষণ, এক্ষণে, এবে	এত (-এ্যাতো)	এমন, এমত এই মতো
ও- (হো-)	হোথা, হোথায় ওখান, ওখানে ওইখানে	ওইক্ষণ (তখন)	অত (অতো)	অমন (ওমন), ওই মতো
যে-	যেথা, যেথায় যেখান, যেখানে	যখন, যেইক্ষণ যবে	যত (যতো)	যেমন, যেমত যেই মতো
ক- কে-	কোথা, কোথায় কই, কোনখানে	কখন, কোনক্ষণ, কবে	কত (কতো)	কেমন, কেমত কি-মত, কোন্-মত
কে—ও	কোথাও, কোনোখানে	কখনো, কখনও	কতক	কোনোমতেও

[সাত] অব্যয়

যে সকল শব্দ কোন বিভক্তি যুক্ত হয় না বা যাদের দেহে কোন অবস্থাতেই কোন পরিবর্তন ঘটে না, তাকে বলা হয় 'অব্যয়' অর্থাৎ যার ব্যয় বা রূপান্তর নেই। পাণিনি এদের বলেছিলেন 'নিপাত', একালের ভাষাবিজ্ঞানীরা বলেন 'অরূপগ্রহ'। সংস্কৃত ব্যাকরণে 'চ, বা, তু, হি'—জাতীয় নিপাত এবং '-প্র-পরা'-আদি উপসর্গই ছিল মূলতঃ অব্যয়। পরবর্তীকালে বিভিন্ন পদও অব্যয়রূপে ব্যবহৃত হ'তে থাকে—বিশেষ্য 'দিবা, নক্তং', বিশেষণ 'মিথ্যা, পুরা' নানাবিধ বিভক্তি-যুক্ত পদ—'অকস্মাৎ, চিরায়, নীচৈঃ, তুষ্ণীম্' প্রভৃতি। এছাড়া 'ক্তাচ্, ল্যপ্, তুমুন্' প্রভৃতি প্রত্যয়যুক্ত অসমাপিকা ক্রিয়াপদও অব্যয়-রূপে বিবেচিত হ'তো। অপরিবর্তনশীলতাকেই যদি বাঙলায় অব্যয়ের লক্ষণরূপে গ্রহণ করি, তবে অধিকাংশ বিশেষণ, ক্রিয়াবিশেষণ এবং অসমাপিকা ক্রিয়াপদকে বাঙলায় অব্যয়রূপে গ্রহণ করতে হয়।

বাঙলা ব্যাকরণে ইংরেজি ব্যাকরণের অনুসারে অব্যয়ের শ্রেণী নির্ধারণ করা হয়। এই হিশাবে অব্যয়ের দু'টি প্রধান শ্রেণী ঃ—(ক) 'সংযোগবাচক' বা 'সম্বন্ধবাচক' (Conjunction) এবং (খ) 'মনোভাব-বাচক' (Interjection)। ইংরেজি ব্যাকরণে যাকে Preposition বলে অর্থাৎ পদরূপে যেগুলোর স্বাধীন সত্তা আছে এবং যেগুলো শব্দের পূর্বে ব্যবহৃত হয়, খাঁটি বাঙলায় এরূপ শব্দ বা উপসর্গ মাত্র তিনটি—**'বিনা** (বিনু, বিনি)'—বিনিসুতোর মালা, বিনাকাজে ঘুরে বেড়ানো ; **'মাঝ'**—মাঝ বৃন্দাবন, মাঝদরিয়া ; **'বেগর'**—বেগরহাতা জামা।

(ক) **সংযোগবাচক অব্যয়** ঃ—যে সকল শব্দ সংযোগবাচক অব্যয়রূপে ব্যবহৃত হয়, তাদের মধ্যে কিছু আছে 'তৎসম শব্দ' এবং কিছু আছে 'তৎসমজাত তদ্ভব তথা খাঁটি বাঙলা শব্দ। কোন কোন ক্ষেত্রে একাধিক শব্দ মিলিতভাবেও ব্যবহৃত হয়।

(১) সংযোজক ও বিয়োজক অব্যয় ঃ—'আর' (<অঅর<অপর), 'ও' (<অব), 'ই' (<হি), কি, বা, না, চাই কি' প্রভৃতি।

(২) প্রতিষেধক অব্যয় ঃ—তো, তবু, নয়তো, তথাপি, আবার, বটে।

(৩) ব্যতিরেকাত্মক ঃ—নইলে, নতুবা, যদি, না।

(৪) অবস্থাত্মক ঃ—নইলে যদি, না হ'লে, যাই।

(৫) ব্যবস্থাত্মক ঃ—তবে, তাহলে, তাই, তেঁই।

(৬) কারণাত্মক ঃ—যেহেতু, যেকারণে, ব'লে।

(৭) অনুধাবনাত্মক ঃ—তাই, তাইতো, এজন্যে, এদিকে।

(৮) সমাপ্তিবাচক ঃ—যা'তে।

(৯) অবধারণে, বাক্যালংকারে, পাদপূরণে ঃ—তো, না (<নাম), মেনে, বটে।

(১০) প্রশ্নে ঃ— অ্যাঁ ? না ? কি ? হ্যাঁ ?

(১১) উপমাদ্যোতক ঃ যেন, মতো, মতন।

(খ) **মনোভাব-বাচক অব্যয় ঃ—**

(১) সম্মতি-জ্ঞাপক—হাঁ, হ্যাঁ, হুঁ, আচ্ছা, তাই, তা বটে।

(২) অসম্মতিজ্ঞাপক ঃ— না, না তো, আদৌ না, নয়।

(৩) অনুমোদনজ্ঞাপক ঃ—বাঃ বাঃ, বেশ বেশ, বেড়ে, মরি মরি, হায় হায়।

(৪) ঘৃণা বা বিরক্তিব্যঞ্জক ঃ—ছি, ছিঃ, হুঃ, থুঃ, রামঃ, কি আপদ্।

(৫) মনঃকষ্টবাচক ঃ—ওঃ, আ, উঃ, মাগো, গেলুম রে।

(৬) বিস্ময়বোধক ঃ—অ্যাঁ, ও বাবা, করে কি, তাই তো, ওমা।

(৭) আহ্বানদ্যোতক ঃ—এ, এই, ও, ওগো, ওরে, আলো, হেদে।

(৮) অনুকারসূচক ঃ—খাঁ খাঁ, টিম্ টিম, দুড়দাড়, ছলছল।

অষ্টাদশ অধ্যায়

রূপতত্ত্ব (৩) : কারক-বিভক্তি ও অনুসর্গ

[এক] কারক (Case) এবং বিভক্তি (Case-endings/Inflections/ Case-terminations)

মানুষের মনোভাব প্রকাশের প্রধান উপায় ভাষা, ভাষা বাক্যের আকারে ব্যবহৃত হয়। বাক্য বলতে বোঝায় পদসমষ্টি। বাক্যস্থ পদগুলো পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কিত হ'লেও বিশেষভাবে নামপদ অর্থাৎ বিশেষ্য এবং সর্বনামের প্রধান সম্পর্ক থাকে ক্রিয়াপদের সঙ্গে। ক্রিয়ার সঙ্গে নামপদের সম্পর্ককে 'কারক' বলা হয়। এই সম্পর্কের বৈচিত্র্য এবং স্বরূপ-অনুযায়ী কারকেরও বিভিন্ন রূপ রয়েছে।

সংস্কৃত ব্যাকরণ-মতে কারক ছয়টি—**কর্তৃকারক** (Nominative), **কর্মকারক** (Accusative/Objective), **করণকারক** (Instrumental), **সম্প্রদানকারক** (Dative), **অপাদানকারক** (Ablative) এবং **অধিকরণ কারক** (Locative)। এতদতিরিক্ত নামপদের আরও দ্বিবিধ সম্পর্ক রয়েছে, যদিও সেটা ক্রিয়ার সঙ্গে নয়, অপর পদের সঙ্গে। এইহেতু এদের কারক না বলে 'পদ' বলা হয়,—এই পদগুলো কারকস্থানীয় বলেই গণ্য হ'য়ে থাকে। এদের নাম—**সম্বন্ধ পদ** (Possessive case) ও **সম্বোধন পদ** (Vocative case)।

সংস্কৃত ব্যাকরণে সাধারণভাবে প্রতিটি কারক বা পদের জন্য বিশেষ বিশেষ বিভক্তি নির্দিষ্ট রয়েছে ; সেই হিশেবে বলা হয়,—কর্তায় প্রথমা বিভক্তি, কর্মে দ্বিতীয়া, করণে তৃতীয়া, সম্প্রদানে চতুর্থী, অপাদানে পঞ্চমী, সম্বন্ধে ষষ্ঠী এবং অধিকরণে সপ্তমী বিভক্তি। প্রতিটি বিভক্তির বিশেষ বিশেষ রূপ আছে, যদিচ বিভিন্ন শব্দে বিভক্তির রূপে যথেষ্ট পার্থক্য বর্তমান। যেমন, ষষ্ঠী বিভক্তির রূপ :—'নর'-শব্দের 'নরস্য', মুনি-শব্দের 'মুনেঃ', সাধু শব্দের 'সাধোঃ', লতা-শব্দের 'লতায়াঃ', নদী-শব্দের 'নদ্যাঃ', রাজন্ শব্দের 'রাজ্ঞঃ', পাদ-শব্দের 'পাদস্য, পদঃ', দন্ত-শব্দের 'দন্তস্য, দতঃ', পতি-শব্দের 'পত্যুঃ', সুধী-শব্দের 'সুধিয়ঃ', ভ্রাতৃ-শব্দের 'ভ্রাতুঃ', গো-শব্দের 'গোঃ', জরা-শব্দের 'জরসঃ, জরায়া', মতি-শব্দের 'মত্যাঃ, মতেঃ', ধেনু-শব্দের 'ধেন্বাঃ, ধেনোঃ', বারি-শব্দের 'বারিণঃ', মধু-শব্দের 'মধুনঃ' প্রভৃতি।

সংস্কৃত ব্যাকরণের কারক-বিভক্তির এই বৈচিত্র্য প্রাকৃত স্তরে অনেক কমে এলো—এতগুলো কারক রইলো না, আবার শব্দ-ভেদে বিভক্তির এত রূপান্তরও রইলো না।

ব্যঞ্জনান্ত শব্দ সব স্বরান্ত হ'য়ে গেলো এবং অনেক শব্দ-বিভক্তিই 'অ'-কারান্ত শব্দ-সাদৃশ্যে গঠিত হ'লো। যেমন—'নর' শব্দের ষষ্ঠী বিভক্তির রূপ 'নরস্স' এবং এর সাদৃশ্যে মুনি-শব্দের 'মুনিস্স', পিতৃ শব্দের 'পিতুস্স', হস্তী-শব্দের 'হত্থিস্স' প্রভৃতি। বাঙলায় সম্বন্ধ পদের একটিই বিভক্তিরূপ—'-র', লিঙ্গ-বচন নির্বিশেষে যে-কোন শব্দের সঙ্গে শুধু 'র' বিভক্তিই (এবং এর প্রসারে '-এর' এবং ক্বচিৎ '-কার, -কের') ব্যবহৃত হয়। কথা—'নরের, পিতার, মুনির, রাজার, আজকের' প্রভৃতি। অবহট্‌ঠের স্তরে কারকের সংখ্যা দাঁড়ালো মাত্র তিনটিতে। কয়েকটি ব্যতিক্রম বাদ দিলে প্রাচীন বাঙলাতেও কারক ছিল তিনটি—(১) কর্তা-কর্ম, (২) করণ-অধিকরণ, (৩) সম্বন্ধ।

বিদ্যালয়-পাঠ্য বাঙলা ব্যাকরণ সংস্কৃতের অনুকরণে গঠিত বলে সেখানে সাতটি কারকেরই উল্লেখ আছে। কিন্তু বস্তুতঃ আধুনিক বাঙলায় কারকের সংখ্যা মাত্র চারটি—(১) কর্তা, (২) কর্ম, (৩) করণ-অধিকরণ, (৪) সম্বন্ধ। এদের মধ্যে 'কর্তৃকারক'কে 'মুখ্য কারক' (Direct case) এবং তদ্ব্যতিরিক্ত অপরাপর কারককে 'গৌণ কারক' / 'তির্যক কারক' / 'অনুক্ত কারক' (Oblique case)-রূপে অভিহিত করা চলে। কর্তা বা মুখ্যকারকই ক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রিত ক'রে, পক্ষান্তরে তির্যক কারক-গুলি ক্রিয়ারই আশ্রিত বা আধার। বিভক্তির ক্ষেত্রে বাঙলা ভাষায় বৈচিত্র্য ভীষণভাবে হ্রাস পেয়েছে। কার্যতঃ বাঙলায় বিভক্তি মাত্র চারটি—'-এ -ক, -ত, -র' এবং এদের পারস্পরিক যোগে আরও কয়েকটি—'-য়, -য়ে, -কে, -তে, -রে, -এতে, -কার, -কের'। এই বিভক্তিগুলো এসেছে প্রধানতঃ কোন কোন সংস্কৃত শব্দের বিকারে ; একমাত্র '-এ' বিভক্তিটি সংস্কৃত বিভক্তির বিবর্তনে এসেছে, তবে এটি সংস্কৃত সপ্তমী বিভক্তির '-এ' ('গৃহে') নয়। এ ছাড়া আর একটি বিভক্তি কল্পিত হয়, তাকে বলে 'শূন্য বিভক্তি'।

(ক) বিভক্তি-পরিচয় (Case-endings/Inflections)

যে সকল বিশেষ পদাংশ বা পদের যোগে বাক্যস্থ বিশেষ্যের বিশেষ বিশেষ কারক নির্দিষ্ট হয়, তাদের বলা হয় **'বিভক্তি'**। বর্ণনাত্মক ব্যাকরণ মতে এই বিভক্তিগুলি এক একটি 'পদাণু' বা 'বদ্ধরূপমূল'। পদাংশ-রূপ বিভক্তি সর্বদাই কোন শব্দের সঙ্গে যুক্ত হয়, এ ছাড়া এদের পৃথক্ অস্তিত্ব নেই ; এদের নিজস্ব কোন অর্থও নেই, কিন্তু শব্দের সঙ্গে যুক্ত হয়ে শব্দকে বিশেষ অর্থ দান করে। বাঙলা বিভক্তিগুলি সংস্কৃত/প্রাকৃত বিভক্তি বা শব্দের বিকৃতিতে জাত। পদাংশরূপ প্রকৃত বিভক্তি ছাড়া পদ-রূপ বিভক্তিগুলিকে বলা হয় **'অনুসর্গ, পরসর্গ'** বা 'কর্মপ্রবচনীয়'। এগুলির

পৃথক্ অস্তিত্ব এবং অর্থ রয়েছে। বর্ণনাত্মক ব্যাকরণে এগুলি 'মুক্তরূপমূল'। বাঙলায় প্রকৃত বিভক্তি মাত্র চারটি—'-এ, -ক, -ত, -র' এবং এদের যোগাযোগে গঠিত আরো কয়েকটি। এদের মধ্যে শুধু '-এ' বিভক্তিটিই প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষায় বিভক্তি চিহ্নের বিবর্তিত রূপ, অপর সব কয়টি অনুসর্গীয় শব্দের ধ্বংসাবশেষ-রূপে বর্তমান, অতএব '-ক, -ত, -র' -কে 'অনুসর্গীয় বিভক্তি'-রূপে অভিহিত করা চলে।

১। **শূন্য বিভক্তি** (Zero-ending)ঃ—আসলে 'শূন্য বিভক্তি' কোন বিভক্তি নয়, এটি বিভক্তিহীনতা। সংস্কৃতে 'অ'-কারান্ত পুংলিঙ্গ শব্দের একবচনে বিভক্তি ছিল '-স্' (=ঃ), প্রাকৃতে এই বিভক্তিটি কোথাও লোপ পেয়েছে, কোথাও '-এ', কোথাও '-ও' হ'য়েছে। বাঙলায় এই বিভক্তিটি লুপ্ত—'রামঃ>রাম>রাম্', 'রামকঃ >রামঅ>রামা'। ফলতঃ বাঙলায় প্রথমা বিভক্তির একবচনের পদটি প্রাতিপদিকও বটে, কারণ এর সঙ্গে পরে অপর বিভক্তি যুক্ত হয়। অ-কারান্ত শব্দের সাদৃশ্যে অপর সকল শব্দেও প্রথমা বিভক্তি তথা কর্তৃকারকের একবচনে সাধারণতঃ কোন বিভক্তি চিহ্ন যুক্ত হয় না। সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়ম, শব্দে বিভক্তিচিহ্ন যোগ না করে বাক্যে ব্যবহার করতে নেই, তারই অনুকরণে বাঙলায়ও কেউ কেউ এই নিয়মের কথা উল্লেখ করেন। প্রাতিপদিক অর্থাৎ শব্দমূল বিভক্তিহীন অবস্থায় বাক্যে ব্যবহৃত হয়, তখনই নিয়মের ব্যত্যয় হয়,—এর প্রতিষেধের নিমিত্তই এই 'শূন্য বিভক্তি'র কল্পনা। কর্মকারকে এবং অধিকরণকারকেও এরূপ বিভক্তি-হীনতার পরিচয় পাওয়া যায়। করণকারক এবং অপাদানকারকে বিভক্তিস্থানীয় শব্দ অর্থাৎ অনুসর্গ যুক্ত হ'বার কালেও প্রাতিপদিকের সঙ্গে কখন কখন বিভক্তিচিহ্ন যুক্ত হয় না। চর্যাপদের কালেও, একমাত্র গৌণকর্ম ছাড়া অপর সকল কারকেরই বিভক্তিহীন প্রয়োগ (তথা 'শূন্য' বিভক্তি-যুক্ত প্রয়োগ) লক্ষ্য করা যায়। একালেও এর ব্যাপকতর ব্যবহার রয়েছে।

২। **'এ' বিভক্তি**—বাঙলা ব্যাকরণে '-এ' সর্বপ্রধান বিভক্তি। একমাত্র সম্বন্ধ পদ ব্যতীত সর্বপ্রকার কারকেই এর অব্যাহত ব্যবহার। দৃশ্যতঃ '-এ' একটিমাত্র বিভক্তিচিহ্ন বলে মনে হ'লেও আসলে তিনটি পৃথক্ বিভক্তি 'সম-মুখ ধ্বনি-পরিবর্তনে'র ফলে এই রূপ লাভ করেছে। ফলতঃ সর্ববিধ কারকেই এর ব্যবহার পাওয়া যায় বলে একে **'তির্যক বিভক্তি'** (oblique case-ending) আখ্যা দেওয়া হয়। চর্যাপদেও এবং বিচিত্র কারকেই এর ব্যবহার পাওয়া যায়। আধুনিক কালে এটি সর্বব্যাপকতা লাভ করেছে। কর্তায়—'ছাগলে কী না খায়'; কর্ম—'দীন জনে গঞ্জনা কেন?' করণ—'কলমে ভালো লেখা হ'চ্ছে।' সম্প্রদান—'হেন জনে কন্যা

কর দান'। অপাদান—'কালো মেঘে বৃষ্টি হয়।' অধিকরণ—'আকাশে ডাকিল মেঘ, ভেক ডাকে জলে।'

(অ) কর্তৃকারকের চিহ্ন—পুত্রঃ, পুত্রকঃ>পুত্তে,পুত্তকে>পুত্তএ>*পুত্তই> পুতে। এটি সং কর্তৃকারকে প্রথমা বিভক্তি '-স্' (ঃ) থেকে এসেছে।

(আ) কর্মকারকের চিহ্ন—প্রাচীন ও আদিমধ্যযুগের বাঙলায় ক্বচিৎ কর্মকারকে '-এ/-এঁ' এবং অন্ত্যমধ্যযুগে '-এ' বিভক্তির প্রয়োগ পাওয়া যায়। আধুনিক বাঙলায় গৌণকর্ম/সম্প্রদানকারকে (সাধারণতঃ কাব্যভাষায়) '-এ' বিভক্তি ব্যবহৃত হয় কখনো কখনো।—'হেন বরে কন্যা কর দান', 'বৃথা গঞ্জ দশাননে', 'দয়া কর দীনজনে'। সর্বনাম পদে গদ্যেও এমন দৃষ্টান্ত মিলে—'তোমায় বলে লাভ কি?' 'আমায় দে মা তবিলদারি।'—এই বিভক্তিটি করণ/অধিকরণ থেকে সংক্রামিত বলে অনুমান করা হয়।

(ই) করণকারকের চিহ্ন—পুত্রেণ>পুত্তেঁ>পুতে। বাঙলায় সাধারণতঃ অনির্দিষ্ট কর্তায় অথবা সকর্মক ক্রিয়ার কর্তায় যে '-এ' বিভক্তিচিহ্ন যুক্ত হয় তা মূলতঃ করণকারকের চিহ্ন। সংস্কৃত কর্মবাচ্যের রূপটি বাঙলায় কর্তৃবাচ্য হ'য়ে দাঁড়াল। —'ছাগলেন ঘাসঃ খাদিতঃ'>'ছাগলেঁ ঘাস খাইঅ'>'ছাগলে ঘাস খায়'। প্রাচীন ভারতীয় আর্য তথা সংস্কৃত থেকে বিবর্তিত হ'য়ে শুধুমাত্র এই বিভক্তিটিই ধারা-বাহিকক্রমে বাঙলায় আধুনিক যুগ পর্যন্ত এসে পেঁছেছে।—তৃতীয়ার একবচনের মতোই বহুবচনের বিভক্তিও ক্রমবিবর্তিত হ'য়ে এর সঙ্গে মিশে রয়েছে।—পুত্রৈঃ, *পুত্রেভিম্>পুত্তেহি (ং)>*পুত্তহিঁ, পুত্তহি>*পুত্তইঁ>পুতে, পুতেঁ।

(ঈ) সম্প্রদানকারক—গৌণকর্ম এবং সম্প্রদানকারক গঠনের দিক্ থেকে অভিন্ন, তাই '-এ' বিভক্তির প্রয়োগ সম্বন্ধে 'কর্মকারক' দ্রষ্টব্য।

(উ) অপাদানকারক—আধুনিক বাঙলায় অপাদানকারকে সাধারণতঃ কোন বিভক্তিচিহ্ন যুক্ত হয় না। ক্বচিৎ '-এ' বিভক্তির প্রয়োগ পাওয়া যায়—'মেঘে বৃষ্টি হয়', 'তিলে তৈল হয়', লোকমুখে শুনেছি'। এ জাতীয় প্রয়োগ 'চর্যাপদে'ও ছিল—'জামে কাম কি কামে জাম'। এই '-এ' বিভক্তিটি তৃতীয়ার প্রসারে এসেছে বলে অনুমিত হয়।

(ঊ) অধিকরণকারকের চিহ্ন—সংস্কৃতে অকারান্ত শব্দের সপ্তমী বিভক্তির এক-বচনের চিহ্ন '-এ', কিন্তু বাঙলা '-এ' এ থেকে পৃথক। সংস্কৃতের চিহ্ন পূর্বেই লুপ্ত হ'য়েছিল, বাঙলায় এই বিভক্তি চিহ্নটি বিভিন্ন সূত্র থেকে উৎপন্ন হ'তে পারে।

যথা—(১) ইন্দোয়ুরোপীয় *-ধি>এ (*গৃহধি>*ঘরধি>ঘরহি>ঘরই>ঘরে) ; (২) সংস্কৃত '-ক' প্রত্যয়ান্ত শব্দের সঙ্গে বিভক্তি-যোগেঃ—গৃহকে>ঘরএ>ঘরই> ঘরে ; (৩) ইঁয়ু—*-ভিম্‌ বা 'ভিস্‌' থেকে।—হৃদয়েভিঃ *হৃদয়ভিম্‌>হিঅহি, হিঅহিঁ>হিঅই>হিয়ে। (৪) '-এ'-র্‌ আর একটি সম্ভাব্য উৎপত্তি হ'তে পারে '-স্মিন্‌>ম্‌হি>হিঁ>হি>ই>এ'। সর্বনাম শব্দের সপ্তমী বিভক্তির একবচনে সাধারণতঃ 'স্মিন্‌' বিভক্তি ব্যবহৃত হয়—'সর্বস্মিন্‌, যস্মিন্‌', প্রভৃতি। তৎসাদৃশ্যে *গৃহস্মিন্‌>ঘরম্‌হি>ঘরহিঁ>ঘরই>ঘরে।

৩। **'-ক' বিভক্তি**—প্রধানতঃ গৌণকর্ম ও সম্প্রদানকারকে এবং কখনো কখনো সম্বন্ধ পদে ব্যবহৃত '-ক' বিভক্তিটি (অপর বিভক্তির যোগাযোগসহ) সংস্কৃত 'কৃত' শব্দের বিকারে এসে থাকতে পারে।—'কৃতম্‌>*কঅ>'-ক' ; 'কৃতঃ>কউ>-কো, -কু' ; '-কৃতঃ>-কএ>কই>-কি, -কে'। ডঃ সুকুমার সেন এই বিভক্তির অপর একটি সম্ভাব্য সূত্রের কথা উল্লেখ করেছেন—স্বার্থিক ও বিশেষণস্থানীয় প্রত্যয় 'ক' আদি প্রাকৃতে ক্য, ক্ক>নব্য-ভারতীয় আর্যে 'ক'। বিভিন্ন নব্যভারতীয় আর্যভাষায় রূপান্তর সহ (-কা, -কি, -কু, -কে, -কো) '-ক' বিভক্তিটির প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায় ; আধুনিক বাঙলায় এর প্রধান রূপ '-কে'। এর সঙ্গে সম্বন্ধ পদের '-র' বিভক্তি যুক্ত হ'য়ে আরও রূপান্তর সৃষ্টি করেছে,—'কর, -কার, -কের' প্রভৃতি।

বিভিন্ন নব্য-ভারতীয় আর্যভাষায় '-ক'—এই অনুসর্গীয় বিভক্তিটি প্রধানতঃ সম্বন্ধ পদে ব্যবহৃত হ'লেও আধুনিক বাঙলায় এর প্রধান ব্যবহার কর্মকারক ও সম্প্রদানকারকে। সম্বন্ধ পদে এর প্রসারিত রূপ '-কার', '-কের' বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। 'ক'-বিভক্তিটির অপর একটি সম্ভাব্য উৎস—'কার্য/কার্যক'।

৪। **'ত'-বিভক্তি**—সাধারণতঃ অধিকরণ কারকে ব্যবহৃত '-ত'—এই অনুসর্গীয় বিভক্তিটি সংস্কৃত '-অন্ত' শব্দের বিকারে উৎপন্ন হ'তে পারে (মরাঠী ভাষায় 'অন্তঃ-জাত 'আঁত' বিভক্তির প্রয়োগ আছে)। কিন্তু এখানে একটু আপত্তির অবকাশ রয়েছে ; 'অন্তঃ'- জাত হ'লে '-ত' বিভক্তিতে সানুনাসিক ধ্বনি (-তঁ) প্রত্যাশিত ছিল, কিন্তু প্রাচীন বা মধ্যবাঙলায় কোথাও এরূপ নিদর্শন পাওয়া যায়নি বলে ডঃ সুকুমার সেন এর একটি বিকল্প উৎসের কল্পনা করেছেন—'-ত্র>ত্ত>-ত' ; অধিকরণ কারকে '-ত্র' প্রত্যয়ের প্রয়োগ সংস্কৃতে বহুল প্রচলিত, অতএব উৎপত্তির এই সূত্রটিই অধিকতর যুক্তিসম্মত মনে হয়। '-ত'-এর সঙ্গে -'এ' বিভক্তি যুক্ত হ'য়ে 'তে' -এতে' প্রভৃতি রূপান্তর লাভ করে। '-এ' বিভক্তি কর্তায় কর্মে করণে এবং

অধিকরণেও ব্যবহৃত হয় ; তৎসাদৃশ্যে অধিকরণ কারকের '-ত' (-তে, -এতে) বিভক্তিও কর্তায় ও কর্মে কখন কখন ব্যবহৃত হয়।

৫। **'র'-বিভক্তি**—সংস্কৃত 'কৃ'-ধাতুর সঙ্গে এই '-র' অনুসর্গীয় বিভক্তিটির সম্পর্ক কল্পনা করা হয়—'কার্য>কাইর>-কের>এর, -র'। ডঃ সুকুমার সেন বলেন '-কর, -কের' থেকে যথাক্রমে সম্বন্ধ পদের '-র, '-আর, -এর' বিভক্তিগুলোর উৎপত্তি ঘটেছে। সংস্কৃত 'অ'-কারান্ত শব্দের সম্বন্ধ পদের বিশিষ্ট বিভক্তি 'স্য'-এর বিকারজাত রূপ '-আই/আ' প্রাচীন বাঙলায়ও কিছু কিছু বর্তমান ছিল—'মূঢ়স্য>মূঢ়সসে>মূঢ়াহ> মূঢ়া' (চর্যাপদের 'মূঢ়া হিঅহি ন পইসই'=মূঢ়দের হৃদয়ে প্রবেশ করে না), 'গগনস্য> গঅনসসে>গঅনহ' প্রভৃতি, পরে এর বিলুপ্তি ঘটে। সম্বন্ধ পদ বোঝাতে -'র' বিভক্তির সঙ্গে অপর বিভক্তি যুক্ত হ'য়ে রূপান্তর ঘটিয়েছে—'-এর, -কর, -'কার, -কের'। আবার এর সঙ্গে '-এ' বিভক্তি যুক্ত হ'য়ে '-রে, -এরে' প্রভৃতি কর্মকারকের বিভক্তি সৃষ্টি করেছে। অনুমান করা চলে, '-কর' ঘোষীভূত হ'য়ে '-গর -গোর -গো' প্রভৃতি বিভক্তিতে রূপান্তরিত হয়েছে ; বঙ্গালী উপভাষায় সম্বন্ধ পদের বহুবচনের বিভক্তিরূপে এগুলো ব্যবহৃত হয়।

(খ) কারক-পরিচয়

১। **কর্তৃকারক**—সংস্কৃতে কর্তৃকারকে সাধারণতঃ পুংলিঙ্গে '-স্' (ঃ) বিভক্তি এবং ক্লীবলিঙ্গে '-ম্'- বিভক্তিচিহ্ন যুক্ত হতো এবং স্ত্রীলিঙ্গে কোন বিভক্তিচিহ্ন যুক্ত হতো না ; অবশ্য এর ব্যতিক্রমও আছে। বাঙলায় কর্তৃকারকে সাধারণতঃ কোন বিভক্তিচিহ্ন যুক্ত হয় না অথবা বলা চলে, 'শূন্যবিভক্তি' (কেউ কেউ একে '-অ' বিভক্তি বলেন) যুক্ত হয়। অর্থাৎ প্রাতিপদিক বা শব্দমূলই বাঙলায় কর্তৃকারকে ব্যবহৃত হ'য়ে থাকে—'**কাহ্ন** বিমনা ভৈলা', '**মানুষ** কখনও দেবতা হয় না', 'চলিলী রাহী'।

অনির্দিষ্ট কর্তায় বাঙলায় কখন কখন '-এ' বিভক্তি এবং অ-কারান্ত ছাড়া অপর শব্দে '-য়', '-তে' বিভক্তি যুক্ত হয়। 'গাইল বড়ু **চণ্ডীদাসে**', 'না ছাড়ে নন্দের **পো**-এ', '**দশে** মিলি করি কাজ', '**গোরুতে** গাড়ি টানে, গাধায় টানে না।' এখানে একটা বিষয় লক্ষণীয়। সাধারণতঃ দেখা যায়, সকর্মক ক্রিয়ার কর্তাতেই এই বিভক্তিচিহ্ন যুক্ত হয়, অকর্মক ক্রিয়ার কর্তায় হয় না—'**ছাগলে** ঘাস খায়' কিন্তু '**ছাগল** মাটিতে শোয়'। সকর্মক ক্রিয়া কর্মবাচ্যে রূপান্তরিত হ'লে ক্রিয়ার কর্তাটি 'অনুক্ত কর্তা'-রূপে করণ-কারকের চিহ্ন গ্রহণ করে। কর্মবাচ্যের রূপটি বিবর্তিত হ'তে হ'তে বাঙলায় কর্তৃবাচ্য হ'য়ে দাঁড়ায়, ফলে করণকারকের চিহ্ন বাঙলায় কর্তৃকারকে বর্তায়।—

'ছাগলেন ঘাসঃ খাদিতঃ>ছাগলেঁ ঘাস খাইঅ>ছাগলে ঘাস খায়।' মূলতঃ 'ছাগলে' পদটি করণকারকে হ'লেও বাঙলায় কর্তৃকারক বলে বিবেচিত হয়। কর্তার এই '-এ' বিভক্তি অধিকারণ কারকের '-এ' থেকে পৃথক্। কিন্তু এই ঐক্যবোধের জন্যই অধিকরণ কারকের '-তে' এবং '-য়' বিভক্তিও অনুরূপভাবে বাঙলায় কর্তৃকারকে ব্যবহৃত হয়ে আসছে।

অনির্দিষ্ট কর্তায়ও বিভক্তির ব্যবহার আবশ্যিক নয়, বৈকল্পিক।—'ঘোড়া গাড়ি টানে ; ঘোড়াতে গাড়ি টানে ; ঘোড়ায় গাড়ি টানে'।

অন্যোন্য বা সহযোগিতায়, যেখানে একাধিক কর্তা বর্তমান, সেখানেও বিভক্তিচিহ্ন যুক্ত হয়। 'বাপ বেটায়/পিতাপুত্রে ছুটে এলো', 'ভাইয়ে ভাইয়ে দীর্ঘদিন লড়াই করে যাচ্ছে'।

বঙ্গালী ও কামরূপী ভাষায় নির্বিচারে বিভক্তিচিহ্ন ব্যবহৃত হ'য়ে থাকে।—'বাবায় ডাকে' আবার 'বাবায় আইলো', রামে বাড়ি গেছে'।

(২) **কর্মকারক**—সংস্কৃতে কর্মকারকের বিশিষ্ট বিভক্তি '-ম্' বাঙলায় লুপ্ত। পুত্রম্>*পুত্তং,*পুত্ত>পুত, পুত্। সাধারণতঃ বাঙলায় মুখ্য কর্মে কোন বিভক্তিচিহ্ন যুক্ত হয় না বা 'শূন্য বিভক্তি' যুক্ত হয়, এখানে প্রাতিপদিকটিই কর্মরূপে ব্যবহৃত হয়। বাঙলা মুখ্যকর্মে এইটিই সাধারণ নিয়ম।—'**গুরু** পুচ্ছিঅ **জান**', 'বন্দে মাতা **সুরধুনী**', 'আমাকে **ভাত** দাও', 'রাখাল **গোরু** চড়ায়'।

জাতিবাচক, জড়বস্তু কিংবা অনির্দিষ্ট কর্মে সাধারণতঃ বিভক্তিচিহ্ন যুক্ত হয় না, কিন্তু নির্দিষ্ট কর্মে বিভক্তিচিহ্ন যোগ করতে হয়। সম্ভবতঃ প্রথমতঃ গৌণকর্মে ও সম্প্রদানে এবং পরে তা সুনির্দিষ্ট মুখ্যকর্মেও যুক্ত হ'তে আরম্ভ করে। কর্মকারকে বাঙলার সাধারণ বিভক্তি 'কে'। '—গুরুকে জিজ্ঞেস করে এসো', 'আজ সুরধুনীকে দেখে এলাম', 'ভাতটাকে নেড়ে দাও', 'রাখাল গোরুটাকে চ'ড়িয়ে নিয়ে এলো।'

গৌণকর্মের এবং সম্প্রদান কারকের প্রধান বিভক্তি '-কে', তবে প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলায় '-ক, -কু' বিভক্তি ব্যবহৃত হতো।— মতিএঁ **ঠাকুরক** পরিণিবিত্তা', '**বাহবকে** পারই'। প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাঙলায়, আধুনিক কালের কথ্যভাষা এবং বঙ্গালী ও কামরূপী উপভাষায়, গৌণকর্মে ও সম্প্রদানে '-কে'--স্থলে '-রে' বিভক্তির বহুল প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। 'কেহ কেহ **তোহোরে** বিরুআ বোলই', 'অবনত ভারত চাহে **তোমারে**', 'কারে যে কই'। সম্বন্ধবাচক '-র'-এর সঙ্গে '-এ'-যোগে '-রে' বিভক্তিটির উদ্ভব ঘটে থাকতে পারে।

কর্মকারকে -'এ', '-য়' বিভক্তির প্রয়োগ কাব্যভাষায় এখনও প্রচলিত আছে।— 'বৃথা গঞ্জ দশাননে', 'আমায় দে মা তবিলদারি'।

(৩) **করণকারক**—সংস্কৃত অ-কারান্ত শব্দে করণের সাধারণ বিভক্তি '-এন > এঁ > এ' বাঙলায় উত্তরাধিকারসূত্রে বর্তেছে।—'আপনা মাংসেঁ হরিণা বৈরি', 'স্তুতিএঁ তুষিলা হরি জলের ভিতর', 'এ **কলমে** ভাল লেখা যায়'। '-এ'-বিভক্তির সাদৃশ্যে '-য়, -তে' বিভক্তি করণকারকে যথেষ্ট ব্যবহৃত হয়—প্রাচীন বাঙলাতেও এর চল ছিল। —'সুখদুঃখেতেঁ নিচিত মরিয়াই', '**টাকায়** (**টাকাতে**) কি না হয়', 'এ **মেয়েতে** (**মেয়ের**) তোমার সুখ হ'বে না'।

ক্বচিৎ করণকারকে 'শূন্যবিভক্তি' তথা বিভক্তি লোপেরও দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।— 'দিয়া চঞ্চালী', 'বাড়ই সো তরু সুভাসুভ **পানী**' (=শুভাশুভ জল দ্বারা সেই তরু বাড়ে), 'কলসী জল ভরে নিয়ে এসো'। ক্রীড়ার্থক ও প্রহারার্থক ধাতুর যোগে আধুনিক বাঙলায় করণে বিভক্তি চিহ্ন ব্যবহার না-ও হ'তে পারে। 'বেত মারা, পাশা খেলা, বাড়ি মারা, প্রভৃতি।

সম্বন্ধ পদের '-র'-যোগে প্রাচীন বাঙলায় করণকারকের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।— 'মোহের বাধা' (=মোহদ্বারা বাধা)। আধুনিক বাঙলায়—'**কলমের** লেখা', 'নখের আঁচর'। কর্মকারকের বিভক্তির সঙ্গে 'দিয়া' (>দিয়ে) এবং অধিকরণ কারকের বিভক্তির সঙ্গে 'করিয়া' (>ক'রে)—এই অসমাপিকা ক্রিয়াজাত অনুসর্গের ব্যবহার দ্বারা প্রাচীন কাল থেকেই বাঙলায় করণকারকের পদ গঠন করা হ'য়ে আসছে।—'দিআঁ চঞ্চালী', 'তোমাকে দিয়ে কাজটি সিদ্ধ হ'বে না', 'হাতে করে সবটা বানিয়েছি'। আধুনিক বাঙলায় শব্দের সঙ্গে কোন বিভক্তিচিহ্ন যোগ না করে প্রাতিপদিকের সঙ্গে 'দিয়া, দ্বারা, কর্তৃক'-প্রভৃতি অনুসর্গের যোগেও করণকারকের পদ গঠিত হয়।—'হাত দিয়ে'।

(৪) **সম্প্রদানকারক**—বাঙলায় অনেকেই সম্প্রদান কারকের পৃথক্ অস্তিত্ব স্বীকার না ক'রে তাকে গৌণকর্মের সঙ্গে একীভূত ক'রে থাকেন। একদিক থেকে যুক্তিটি সংগত, এক্ষেত্রে গৌণকর্মের অনুরূপ বিভক্তি সম্প্রদান কারকে ব্যবহৃত হ'য়ে থাকে। আর একদিকে সম্প্রদান কারকের একটা নিজস্ব গুরুত্ব রয়েছে—'নিমিত্তার্থে' বা 'তাদর্থ্যে' এর ব্যবহার রয়েছে, এর সঙ্গে গৌণকর্মের কোন সম্বন্ধ নেই। সেই দিক থেকে এর প্রয়োজনীয়তা স্বীকার্য।

প্রাচীন বাঙলায় এতদর্থে '-কে' বিভক্তি যুক্ত হ'তো—'**বাহবকে** পারই', '**মথুরাকে**

চলী ভেলী'। রাঢ়ী উপভাষায় এখনও তাদর্থ্যে '-কে' প্রত্যয়ের ব্যবহার রয়েছে—'বেলা যে পড়ে এলো, **জলকে** চল', 'ঘাসকে **গেলছে**' (=ঘাসের জন্য গিয়াছে)।

তাদর্থ্যে সম্বন্ধ পদের বিশেষ চিহ্ন '-র','-এর' বিভক্তিরও বহুল প্রয়োগ আধুনিক কালে লক্ষ্য করা যায়।—'পূজার ফুল', 'যজ্ঞের কাঠ', 'বিয়ের কনে'।

প্রাচীন কালে নিমিত্তার্থে 'অন্তরে' এবং আধুনিক কালে তজ্জাত '-তরে' অনুসর্গের সম্প্রদান কারকে ব্যবহার দেখা যায়।—'তোহোর অন্তরে', 'তোমার তরে'।

(৫) **অপাদানকারক**—বাঙলা ভাষায় অপাদানকারক অস্বীকৃত, এর নিজস্ব কোন বিভক্তি চিহ্নও নেই। করণ, অধিকরণ ও সম্বন্ধ পদের সহায়তায় অপাদানের ভাব প্রকাশ করা হয়। সংস্কৃতে অপাদানের সাধারণ বিভক্তি '-আৎ', কিন্তু বাঙলায় এর চিহ্নও নেই। প্রাচীন বাঙলায় অপাদানের একটি বিভক্তিচিহ্ন ছিল 'হু'—'**খেপহু** জোইনি লেপ ন জাঅ'। 'হু/হুঁ' বিভক্তিটি 'ভু>হু>হু'—এইভাবে নিষ্পন্ন হ'তে পারে, অথবা 'অতঃ>অদো>অও>অউ>অহু>হু'-এভাবেও আসতে পারে।

কখন কখন '-এ' বিভক্তির সাহায্যে অপাদান পদ গঠিত হয়—'**জামে** কাম, কি **কামে** জাম' (=জন্ম থেকে কর্ম অথবা কর্ম থেকে জন্ম), 'এ মেঘে বৃষ্টি হ'বে না', 'তিলে তৈল হয়' প্রভৃতি। অন্ততঃ একটি ক্ষেত্রে অপাদানকারকে '-কে' বিভক্তিরও প্রয়োগ পাওয়া যাচ্ছে।—'দিনকে দিন'। (পরে আরো আলোচনা দ্রষ্টব্য)। প্রাচীন বাঙলায় অপাদানে '-ত' বিভক্তিরও প্রয়োগ পাওয়া যায়—'**ডোম্বিত** আগলি নাহি ছিনালী'। অধিকরণের বিভক্তি একালেও অপাদানে প্রযুক্ত হয়।—'**খনিতে** সোনা পাওয়া যায়', '**লেখায়** ক্ষান্ত হ'য়ো না'। ক্বচিৎ অপাদানকারকে বিভক্তিচিহ্ন লোপ পায়।—'ছেলেটা **বাড়ি পালিয়ে** কোথায় যাবে?' সম্বন্ধ পদও কখন কখন অপাদান অর্থে ব্যবহৃত হয়।—'**ভূতের** ভয় নেই কি তোমার?' '**বাজারের** কেনা জিনিস ভালো হয় না।'

'রাম ভূতকে ভয় পায়।'—এই বাক্যের গঠনগত দিক্ থেকে 'ভূতকে' কর্মকারকের '-কে' বিভক্তি বলে মনে হলেও বাক্যে 'ভূত' কর্ম নয়। কারণ 'কর্ম' হয় ক্রিয়ার ফলভোগী, কিন্তু এখানে 'ভয় পাওয়া' ক্রিয়ার ফল 'ভূতে' বর্তায় না, বর্তায় রামের উপরই। 'পায়' সকর্মক ধাতু হ'লেও 'ভয় পায়'—এই যৌগিক ক্রিয়াটি প্রকৃতপক্ষে অকর্তৃক ক্রিয়া হ'য়ে দাঁড়াচ্ছে। বাক্যটির নির্গলিতার্থ—'ভূত রামকে ভয় দেখায়'। কাজেই 'রাম ভূতকে ভয় পায়' এই উদ্ধৃত বাক্যে 'ভূতকে' অপাদান কারকে

'-কে' বিভক্তিরূপেই গ্রহণযোগ্য। প্রকৃত তাৎপর্য—'ভূত থেকে ভয়'। অনুরূপ অর্থে '-এ' বিভক্তিও ব্যবহৃত হয়—'ছেলেটার সাপে, বাঘে ভয় নেই।'

অপাদান কারকে বিভক্তিচিহ্নের ব্যবহার খুবই সীমিত। সাধারণতঃ মূল প্রাতিপদিকের সঙ্গে অথবা সম্বন্ধ পদের সঙ্গে 'থাকিয়া (>থেকে), চাইতে, হইতে (>হ'তে)' প্রভৃতি পদ অনুসর্গ-রূপে ব্যবহৃত হ'য়ে অপাদানের পদ গঠন করা হয়। 'ঘর হইতে বাহির ভাল, আপন হইতে পর', 'কূল থেকে মোর গানের তরী ভাসিয়ে দিলেম', 'প্রাণের চেয়ে প্রিয়জন' প্রভৃতি।

(৬) **সম্বন্ধ পদ**—সংস্কৃতে অ-কারান্ত শব্দের সম্বন্ধবাচক বিভক্তি '-স্য' (> স্স) প্রাকৃতে প্রায় নির্বিচারে সর্ববিধ শব্দে ব্যবহৃত হ'তো। প্রাচীন বাঙলায় এর ধ্বংসাবশেষ বর্তমান ছিল—'স্য>স্স>হ>আ'। '**খনহ**' (<ক্ষণস্য), '**মূঢ়া**' (<মূঢ়স্য), '**অনুঅণা**' (<অনুৎপন্নস্য)। বর্তমানে এই বিভক্তিচিহ্নটি একেবারে বিলুপ্ত। বাঙলায় সম্বন্ধ পদের বিশিষ্ট বিভক্তি চিহ্ন '-র' এবং '-এর -কার, কের'।—'**রুখের** তেন্তলী কুম্ভীরে খাঈ', 'এই **ভারতের** সাগরতীরে', 'সবাইকার, কালকের, যেখানকার, পাঁচজনকার, সত্যিকার' প্রভৃতি। সম্বন্ধ পদের বিভক্তিচিহ্ন কখন কখন লুপ্ত হয়।—'**তোমা** অপেক্ষা' (=তোমার অপেক্ষা), '**বেতন** বাবদ' (=বেতনের বাবদ)।

প্রাচীন বাঙলায় এবং সম্ভবতঃ আদিমধ্যযুগেও সম্বন্ধ পদ বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হ'তো এবং বিশেষ্যের অনুরূপ লিঙ্গ গ্রহণ করতো।—'**কাহেরি** শঙ্কা', '**হাড়ীর** মালী', '**আপনকা**রি সখী'।

পশ্চিমাঞ্চলীয় ভাষাগুলিতে সম্বন্ধ পদের বিশেষ অনুসর্গীয় বিভক্তি '-ক' (এবং প্রসারিত রূপ) আধুনিক বাঙলায় একেবারেই প্রচলিত নেই।

(৭) **অধিকরণ কারক**—সংস্কৃতে অধিকরণ কারকের বিশিষ্ট বিভক্তি ছিল '-এ' (গৃহে, সলিলে), '-ই' (মনসি)—এগুলো বাঙলায় লোপ পেয়েছে। বাঙলায়ও অধিকরণের বিশিষ্ট বিভক্তি '-এ', কিন্তু এটি সংস্কৃত বিভক্তি '-এ' নয়। সং *-'ধি, -ভিঃ, -ভিম্, -স্মিন্'-এর বিকারে প্রাচীন বাঙলার '-হি' এবং আধুনিক বাঙলার '-এ' এবং '-ই' (উপভাষায়) বিভক্তির উদ্ভব। 'মূঢ়া **হিঅহি** ন পইসই', '**নিঅড্ডি** (= নিকটে), নিয়ড়ি, **বাইরি** যাও'। অধিকরণে '-এ' বিভক্তিই সর্বাধিক প্রচলিত—'**সমুদ্রে** জল আছে', 'সময়ে বাড়িতে চলে এসো' ক্বচিৎ 'অ-কারান্ত' শব্দে এবং বিশেষভাবে তদ্ব্যতীত অপর শব্দে '-তে, -এতে,-য়' প্রভৃতি বিভক্তিচিহ্ন ব্যবহৃত হয়।—'ঘরেতে ভ্রমর এলো গুন্‌গুনিয়ে', 'কলকাতা আছে কলকাতাতেই', 'কলকাতায়

জলের বড় কষ্ট'। প্রাচীন বাঙলায় '-ত' ব্যবহৃত হ'তো, বঙ্গালী কামরূপীতে এখনো প্রচলিত আছে—**'সাংকমত'** চড়িলে', 'গঅণত', 'বাড়িৎ'। প্রাচীন বাঙলায় অধিকরণ কারকে ক্বচিৎ '-রে' বিভক্তিরও প্রয়োগ পাওয়া যায়।—**জীবেরে** সদয় 'হঞা' (=জীবে সদয় হইয়া)।

কাল-বাচক অর্থে ক্বচিৎ অধিকরণ কারকে '-কে' বিভক্তি যুক্ত হয়।—**আজকে** তোমায় দেখ্‌তে এলাম জগৎ-আলো নূরজাহান'।

অধিকরণ কারকে বিভক্তিচিহ্নের লোপও খুব স্বাভাবিক ব্যাপার। কালবাচক শব্দে এবং গমনার্থক ধাতুর সঙ্গে স্থানবাচক শব্দে শুধুমাত্র প্রাতিপদিকটি ব্যবহৃত হ'য়ে থাকে।—' **আজ** হবে না, কাল এসো ; **কলকাতা** যাচ্ছি, এ **সময় বাড়ি** থাকবো না, **শনিবার** এলে দেখা হ'বে', 'বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর **নদী** এলো বান।'

(চ) **সম্বোধন পদ**—বাঙলা সম্বোধন পদে শুধুমাত্র প্রাতিপদিক ব্যবহৃত হয়, কোন বিভক্তি চিহ্ন যুক্ত হয় না।

[দুই] অনুসর্গ (Post-position)

ভাষায় যে সকল শব্দের নিজস্ব অর্থ ও স্বাধীন ব্যবহার আছে, অথচ তৎসত্ত্বেও নামপদের পর ব'সে উক্ত পদটিকে কারকে পরিণত করে, তাদের বলা হয় **'কর্ম-প্রবচনীয় পরসর্গ, সম্বন্ধীয়** বা **অনুসর্গ'** (Post-position)। প্রাকৃতের স্তরেই অনুসর্গের ব্যাপক ব্যবহার দেখা গেল, কারণ সেই পর্বে সংস্কৃতের বহু বিভক্তিই লোপ পেয়েছে ; কারকের ভাব প্রকাশের জন্য বিকল্প ব্যবস্থা-রূপে অনুসর্গের গুরুত্ব দেখা দিল। প্রথমদিকে নামবাচক (Nominal) অনুসর্গই বিশেষভাবে ব্যবহৃত হ'তো, অর্বাচীন স্তরে ভাববাচক (Verbal) অনুসর্গও প্রতিষ্ঠা লাভ করে। বিভক্তির স্থলে অনুসর্গ ব্যবহৃত হ'লেও এগুলি বিভক্তি নয়। কর্তা ও মুখ্যকর্মে কোন অনুসর্গ ব্যবহৃত হয় না। অনুসর্গ-যুক্ত শব্দটি প্রাতিপদিক হ'তে পারে অথবা কোন বিভক্তিচিহ্ন-যুক্ত শব্দও হ'তে পারে।

বাঙলায় ব্যবহৃত অনুসর্গ ঃ (ক) নাম-অনুসর্গ, (খ) ভাববাচক বা ক্রিয়া-অনুসর্গ। নাম-অনুসর্গের তিন ভাগ—(১) তদ্ভব, (২) তৎসম, (৩) বিদেশি। ক্রিয়া-অনুসর্গ সবই অসমাপিকা ক্রিয়া। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য যে বাঙলায় ব্যবহৃত '-এ'-ব্যতীত অপর সবকয়টি বিভক্তিই বস্তুতঃ 'অনুসর্গীয় প্রত্যয়' (Post-positional affix)।

(ক) **নাম-অনুসর্গ** (Nominal Post-position)

(১) **তদ্ভব ঃ**

আগ, আগে (<অগ্র)—'দাঁড়াও আমার আঁখির আগে', 'রাজা আগে* করিবো গোহারী'।

কাছ, কাছে (<কক্ষ)—'তব কাছে এই মোর শেষ নিবেদন', 'দোঁহ রূপ দোঁহ কাছে কহে পৌর্ণমাসী'।

কাজে (<কার্য)—'কোণ কাজে লাগি আহ্মে সত্য করিব', 'শোনার কাজে সে বড় ওস্তাদ ছেলে'।

ঠাঁই, ঠাঁঞি, ঠান, ঠাম, ঠেঙ্গে, থান (<স্থাম, <স্থান)—'রাজা ঠেঙ্গে চেয়ে আছি গোটা কয় বাঁশ', 'মো বুলিয়লোঁ তোর ঠাই', 'আহ্মার থানত বুঢ়ী কহিআর সরূপ'।

তরে (<অন্তরে)—'ফুল তুলিবাক তরে*', 'জানাইল বাপ-মায়ের তরে'।

থন, থুন, (স্থামন্)—'আমাথুন্ অধিক কিবা ঈশ্বরের ঝি'।

পাকে (<পক্ব, প্রক্রিয়া)—'দামাল পুত্রের পাকে। ঘাটে পুত্র মার্য্যা রাখে।'

পাছ (<পশ্চাৎ)—'রামপাছে মহাবীর চলিল নির্ভয়।'

পানে (<অপ্পণ<*পণ<আত্মন্)—'তোমাপানে রয়েছি চাহিয়া।' 'শিব চারি পানে চান'।

পাশে (<পার্শ্ব)—'মল্লিকা কলিকা-পাশে ভ্রমর না পাএ রসে।'

বাগ (<বগ্‌গা, বর্গ)—'সাতটি ঘোড়া চেয়ে আছে সাতটি চাঁপার বাগে।'

বই, বহি (<বহিস্)—'তোমা বই আর জানিনে', 'ইহা বহি দরশন নাঞি।'

বিনি, বিনু, বিহনে (<বিনা, <*বিভুন)—'চুণবিহণে যেহ্ন তাম্বুল তিতা', 'তুমি বিনে কেহ নাই আমার ভুবনে।'

ভর, ভরে (<ভরম্)—'বায়ুভরে করে এসে নাসিকায় বাস।'

ভিত, ভিতে (<ভিত্তি)—'চাহা বড়ায়ি যমুনার ভিতে।'

ভিতর (<অভ্যন্তর)—'স্তুতীএ* তুষিল হরি জলের ভিতর', 'কুঁড়ির ভিতর কাঁদিছে গন্ধ অন্ধ হ'য়ে।'

মাঝে (<মধ্য)—'গহন অরণ্য মাঝে সাজে সরোবর', 'বন মাঝে* পাইল তরাসে'।

লগে (<লগ্ন)—'ইন্দ্রের লগত যুদ্ধ করিল বিস্তর', 'পাইয়া পরম সুখ গেল সেই লগে।'

সনে (সন্ন, সনাথ)—'নিতি নিতি সিয়ালা সীহ সনে জ্ঝই', 'মোহর সনে করহ সমর।'

সঞে, সম (<সমেন, সমম্)—'তা সমে কি মোর নেহা', 'হালো ডোম্বী তোএ সঙ্গ (সম) করিব মো সাঙ্গ।'

সাথে (<সার্থ)—'কাল্ আদি তের ডোম সাথে', 'কার সাথে কি কইছ কথা, নাইকো মনে।'

হইতে, হতে (<ভবন্ত্, *ভবিত)—'কোথা হতে আস তুমি কোথা চলে যাও।'

হাতে হাথে (<হস্ত)—'তাহার হাথে হৈবে কংসাস্রের বিনাশে।'

(২) **তৎসম ঃ**

অন্তরে (নিমিত্তার্থে)—'তোহোর অন্তরে'। **অপেক্ষা** (তোলনে)—'তিনি সর্বাপেক্ষা ধনী', 'স্খ অপেক্ষা শান্তি শ্রেয়ঃতর।'

অর্থে (নিমিত্তার্থে)—'ধামার্থে চাটল সাঙ্কম গাঢ়ই'। **উপর** (অধিকরণে)—'খোঁপাত উপর'। **কারণে** (নিমিত্তার্থে)—'তোমার কারণে আসি জগৎ সংসারে।'

গোচর (নৈকট্যার্থে)—'তোমার গোচরে নাহি করি অপরাধ।' **জন্য** (নিমিত্তার্থে)—'তোমার জন্যে হন্যে হয়ে ফিরি বনে বনে।'

নিকটে—'কাহার নিকটে রাখি মনের বেদনা'। **(উ)পর**—'তোমার' 'পরে রাগ নাই ত আর।'

পরে—'খাওয়ার পরে রাঁধা আর রাঁধার পরে খাওয়া'। **প্রতি**—'তঙ্কাপ্রতি এক গণ্ডা।'

সকাশে—'পড়ি মরি বরে ছোটে গ্রুর সকাশে'। **সঙ্গে**—'বড়ায়ির সঙ্গে নিতি যায়।'

সমীপে—'নিবেদন এই মোর চরণ-সমীপে'। **সহিত**—'ধামালী সহিত কাহ্নাঞি বলে তিখবাণী।'

(৩) **বিদেশি অন্সর্গ ঃ**

তরে—'কিসের তরে অশ্র্ ঝরে'। **বদল**—'খোসলা বদলে হীরক পঈল'।

বরাবর—'কংস বরাবরে বার্তা জানাইল।' **বাবদ**—'জল খাওয়া বাবদ এত খরচ।'

বাদ/বাদে—'আজি পাঠ বাদ যায়', 'আমি বাদে সবাই আমন্ত্রিত ছিল।' **হ্জ্র**—'উপনীত হৈল গিয়া রাজার হ্জ্রে'।

(খ) **ভাববাচক অসমাপিকা অনুসর্গ** (Participle Post-position).

১। **কর্—করি, করিয়া**—'থির করি', 'ভালো ক'রে দেখ'।

২। **গ—গই**—'কহি গই পইঠা'। **গিয়া**—'আপনে রহিলা রোহিণীগর্ভে গিআঁ।'

৩। **চাহ**—'ইহার চেয়ে হতেম যদি আরব বেদুইন', 'কার চাইতে কে বড়।'

৪। **থাক**—'কংসকে বুলিলে কন্যা আকাসে থাকিআঁ', 'কোত্থেকে এলে', 'সুখে থাকতে ভূতে কিলোয়।'

৫। **দে**—'দিআঁ চণ্ডালী', 'গানের ভিতর দিয়ে যখন দেখি ভুবনখানি।'

৬। **ধর**—সারারাত ধরে বৃষ্টি।

৭। **বল**—তাই বলেই তো চলে এলাম।

৮। **ভর**—'অধ রাতি ভর কমল বিকসিউ', 'তুমি যে চেয়ে আছ আকাশ ভরে।'

৯। **লহ**—'ব্রহ্মা সব দেব লআঁ গেলাভি সাগরে', 'সকল সম্পদ লৈয়া রাজা গেল বনে।'

১০। **লাগ**—'সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু', 'রূপ লাগি আঁখি ঝুরে।'

১১। **হ**—'গোঠে হৈতে আসি আহ্মি বুঢ়ী গোয়ালিনী', 'আপন হইতে পর ভাল', 'আমা হতে হেন কার্য না হ'বে সাধন।'

উনবিংশ অধ্যায়

রূপতত্ত্ব (৪) ঃ ক্রিয়াধাতু (Verb Root) ও ক্রিয়াপদ (Verb)

আমরা মনের ভাব প্রকাশ করবার জন্য যে ভাষা ব্যবহার করি, তার আধার বাক্য। বাক্যের দু'টি অঙ্গ—একটি **উদ্দেশ্য** ও অপরটি **বিধেয়**। উদ্দেশ্য অংশে কোন কিছু বিষয়ে বলা হয় এবং সেটি হয় 'বিশেষ্য' বা 'সর্বনাম' অথবা 'বিশেষ্য'-রূপে ব্যবহৃত 'বিশেষণ' অর্থাৎ এক কথায় **নামপদ**। 'উদ্দেশ্য বিষয়ে যা' কিছু বলা হয়, তাকে বলে বিধেয়। বিধেয় অংশটি গুণ বা ভাবপ্রকাশক হ'তে পারে, তবে সাধারণতঃ হয় কার্য-বাচক তথা ক্রিয়াত্মক। গুণ বা ভাববাচক পদটি সাধারণতঃ 'বিশেষণ' এবং কার্যবাচক বা ক্রিয়াত্মক পদটি 'ক্রিয়াপদ' হয়ে থাকে। কোন ক্রিয়াপদকে বিশ্লেষণ করলে অর্থাৎ পদটির প্রত্যয়-বিভক্তি মোচন করলে যে মূল কাঠামোটি পাওয়া যায় তাকে বলে **ক্রিয়াধাতু**' বা **'ধাতুমূল'** (Verb root) বা সংক্ষেপে **ধাতু** (Root)।

মহামুনি পাণিনি দেখিয়েছেন যে যাবতীয় সংস্কৃত শব্দের মূলে রয়েছে কতকগুলো একাক্ষর ধাতু; তিনি প্রায় দু'হাজার ধাতুর উল্লেখ করেছেন। তবে সংস্কৃতে সর্বদা ব্যবহৃত ধাতুর সংখ্যা প্রায় সাতশ'। এদের সঙ্গে বিভিন্ন উপসর্গ, প্রত্যয় ও বিভক্তি যোগ করে সর্বপ্রকার শব্দ ও পদ নিষ্পন্ন হ'য়ে থাকে। ধাতুর সঙ্গে যখন কোন বিভক্তি যুক্ত হয় তখন উভয়ের মাঝখানে যে ধ্বনি বা প্রত্যয়ের আগম ঘটে, তাকে বলা হয় **বিকরণ**—যথা, 'চল্' ধাতু+লট্ 'তি' ক্রিয়াবিভক্তি='চলতি'—এখানে '**চল্**'-এর সঙ্গে '-অ' বিকরণ যুক্ত হয়েছে। এই বিকরণও ক্রিয়াপদের অঙ্গ। **বস্তুতঃ** ধাতু, বিকরণ ও বিভক্তির যোগে ক্রিয়াপদ গঠিত হয়।

বর্ণনাত্মক ব্যাকরণের মতে, ধাতুমূল যখন যথার্থ ধাতুমূল-রূপেই ব্যবহৃত হয়, তখন এগুলি 'বন্ধপদাণু' (closed morpheme)। মধ্যমপুরুষ তুচ্ছার্থক অনুজ্ঞায় এই রূপটিই 'মুক্ত রূপমূল'রূপে গণ্য হয়।—বিকরণ ও বিভক্তি বন্ধপদাণু।

বাঙলায় ব্যবহৃত মোট ধাতুর সংখ্যা প্রায় ১৫০০ হ'লেও এদের অনেকগুলো ব্যবহারের অভাবে লোপ পেয়েছে। বাঙলা 'ধাতুর কিছু এসেছে সংস্কৃত থেকে, অবশিষ্ট প্রাকৃত, দেশি শব্দ, নাম শব্দ অথবা ধ্বন্যাত্মক শব্দ, ক্বচিৎ বা বিদেশি শব্দ থেকে সৃষ্ট হ'য়েছে। সংস্কৃত থেকে যে ধাতুগুলো বাঙলায় এসেছে, তাদের কোন কোনটি ক্রমবিবর্তনের ধারায় এতটাই পরিবর্তিত হ'য়েছে যে মূলের সঙ্গে তাদের

সম্পর্ক নিরূপণ করা কষ্টকর।—'শ্রু'>শোন্-ধাতু, 'কৃ'>'কৈ' ('ঘর কৈল' বাহির), উপ+বিশ>বস্-ধাতু।

যাবতীয় ক্রিয়াপদের মূলে আছে কোন-না-কোন স্বল্পাক্ষর ধাতু অথবা ধাতুরূপে ব্যবহৃত নামপদ। অতএব ক্রিয়াপদ-বিচারে সর্বাগ্রে ধাতু-বিষয়ে আলোচনা বিধেয়।

[এক] ধাতুর প্রকার-ভেদ

উৎপত্তি ও প্রকৃতি-বিচারে বাঙলা ধাতুকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা চলে—

(ক) সিদ্ধধাতু বা মৌলিক ধাতু (Primary roots), (খ) **সাধিত ধাতু** (Secondary derivative roots) ও **(গ) সংযোগমূলক/যৌগিকমূল ধাতু** (Compounded roots)।

(ক) **সিদ্ধধাতু** বা **মৌলিক ধাতু** (Primary root)—যে ধাতুগুলোর আর বিশ্লেষণ চলে না, তাদের বলা হয় 'সিদ্ধধাতু'। এটি অন্তরঙ্গ বা তুচ্ছার্থক মধ্যম পুরুষ অনুজ্ঞা ভাবে বর্তমান কালের ক্রিয়াপদের ধাতুরূপ। 'তুই যা কর্, দে, বস্, ঘুর্'—বস্তুতঃ এই 'যা, কর্, দে, বস্, ঘুর্'-প্রত্যেকটি ধাতু বা ধাতুমূল। বাঙলায় এই সিদ্ধ ধাতুগুলো বিভিন্ন সূত্রে আগত। (১) উপসর্গহীন সংস্কৃত ধাতু থেকে প্রাকৃত মাধ্যমে আগত কিছু তদ্ভব ধাতু ঃ—'আছ্, কর্, কিন্, ছাড়্, জাগ্, ধা, নে, পুছ্, বাঁচ্, ভাজ্, মিশ্, যা, শো, হ্' প্রভৃতি।

(২) কতকগুলো দেশি ও অজ্ঞাতমূল ধাতু প্রাকৃত মাধ্যমে বাঙলায় এসেছে।—'এড়্, কুঁদ্, খাট্, চাপ্, ঝুল্ নড়্; পুঁত্, ভাস্' প্রভৃতি।

(৩) কিছু কিছু উপসর্গযুক্ত সংস্কৃত ধাতু প্রাকৃত মাধ্যমে বাঙলার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।—'আইস/আস্ (<আ+বিশ্), আন্ (<আ+নী), পর্ (পরি+ধা), বইস্ / বস্ (<উপ+বিশ্)' প্রভৃতি।

(৪) সংস্কৃতে সাধিত (নামধাতু বা Denominative), প্রযোজক ধাতু বা ণিজন্ত ধাতু (Causative) হ'য়েও প্রাকৃত মাধ্যমে কিছু কিছু ধাতু বাঙলায় সিদ্ধ ধাতুতে পরিণত হয়েছে।—'কহ্ (<কথয়তি <কথা) গাহ্ (<গাথয়তি <গাথা), চাল্ (<চল্+ণিচ্), মার্ (<মৃ+ণিচ্), হার্ (হৃ+ণিচ্)' প্রভৃতি।

(৫) সংস্কৃত বিশেষ্য বা বিশেষণ থেকে জাত শব্দকেও কখন কখন বাঙলায় [illegible] করা হয়।—'গত'>গাড়্, 'ঘর্ম'>ঘাম্, 'মত্ত'>'মাৎ'

(৬) প্রচুর সংখ্যক তৎসম অর্থাৎ সংস্কৃত সিদ্ধ ধাতুও বাঙলায় সিদ্ধ ধাতুরূপে ব্যবহৃত হয়।—'কীর্ত্, গর্জ্, তিষ্ঠ্, বর্ত্, সেব্, হিংস্' প্রভৃতি।'

(৭) কিছু কিছু বিদেশি শব্দও বাংলায় সিদ্ধধাতুরূপে ব্যবহৃত হয়।—আরবী —'কম্, জম্'; ফারসী—'দাগ্'; ইং—'পাস্' (=Pass, তাস পাশানো)' প্রভৃতি।

(খ) **সাধিত ধাতু** (Secondary / Derivative root)—যে সকল ধাতুর বিশ্লেষণে অপর কোন ধাতু বা নামশব্দ এবং এক বা একাধিক প্রত্যয় পাওয়া যায়, তাদের বলা হয় 'সাধিত ধাতু'। সংস্কৃত বা তৎসম, প্রাকৃতজ বা তদ্ভব, দেশি বা ধ্বন্যাত্মক এবং বিদেশি—সাধিত ধাতুতে এ সকলেরই দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। অর্থ এবং গঠনের বিচারে সাধিত ধাতুকে নিম্নোক্ত শ্রেণীসমূহে বিভক্ত করা চলে। — (১) প্রযোজক ধাতু (Causative verb) (২) কর্মবাচ্যের ধাতু (Passive voice), (৩) নামধাতু (Denominative verb) এবং (৪) ধ্বন্যাত্মক বা অনুকার ধ্বনিজ ধাতু (Onomatopaetic verb)।

(১) **প্রযোজক ধাতু** (Causative verb root)—সিদ্ধ ধাতুর সঙ্গে '-আ-' বা '-ওয়া-' প্রত্যয় যোগ ক'রে প্রযোজক ধাতু সাধিত হয়। সংস্কৃতে অনুরূপ ক্ষেত্রে 'ণিচ্'-প্রত্যয় যোগ করা হয় বলে এদের 'ণিজন্ত ধাতু'ও বলা হয়। বাঙলায় 'ণিচ্' প্রত্যয় যুক্ত হয় না বলে এদের ণিজন্ত ধাতু বলবার সার্থকতা নেই।—'কর্+আ' ='করা-' (অপরকে দিয়ে করানো), খা+আ='খাওয়া-' প্রভৃতি।

(২) **কর্মবাচ্যের ধাতু** (Passive voice)—সিদ্ধ ধাতুর সঙ্গে '-আ-' প্রত্যয়-যোগে কর্মবাচ্যের ধাতু সাধিত হয়।—'দেখ্+-আ-=দেখা-' ('এটা ভালো দেখায় না'), 'শুন+আ-=শুনা-' প্রভৃতি।

(৩) **নামধাতু** (Denominative verb root)—সাধারণ বিশেষ্য বা বিশেষণ পদের সঙ্গে '-আ-' প্রত্যয়-যোগে নামধাতুর পদ তৈরী করা হয়।—জুতা+-আ-= 'জুতা' (জুতানো), বিষ+আ='বিষা', দগ্ধ+-আ-='দগ্ধা' প্রভৃতি। নিম্নোক্ত প্রত্যয়-যুক্ত বিশেষ্য পদগুলোর সঙ্গে '-আ-' যোগে প্রচুর নামধাতুর পদ গঠিত হ'য়ে থাকে।— '-ক-' (হড়কা, মচকা), '-ট-' -ড়-' (ঘষটা, মোচড়া), '-ল-, -র-' (ছোবলা, হাঁকরা), '-চ-, -স-' (ভেংচা, ধামসা) প্রভৃতি।

(৪) **ধ্বন্যাত্মক/অনুকার ধ্বনিজ ধাতু** (Onomatopaetic verb root)— অনুকার ধ্বনির সঙ্গে '-আ-' যোগে অথবা অনুকার-ধ্বনির দ্বিত্ব করে তৎসহ '-আ-' যোগে সাধিত পদ সৃষ্টি হয়।—'চেঁচা, হাঁফা, গলগলা, দলমলা' প্রভৃতি।

(গ) **সংযোগমূলক / যৌগিকমূল ধাতু** (Compounded roots)—**স্বল্পাক্ষর** সিদ্ধধাতুর স্বল্পতা বাঙলা ভাষার একটি বড় দুর্বলতা। এই কারণে এবং ভাষাকে ভাব-গাঢ় ক'রে তোলার প্রয়োজনে বিশেষ্য পদের সঙ্গে (ক্বচিৎ বিশেষণ ও ধ্বন্যাত্মক শব্দের সঙ্গে) কয়েকটি বিশেষ ধাতুমূল যোগ ক'রে মনোভাব প্রকাশ করা হয়—বিশেষ্য-যুক্ত এরূপ ধাতুকে 'যৌগিকমূল' বা 'সংযোগমূলক ধাতু' বলা হয়। কেউ কেউ একে 'ক্রিয়ামূলক যৌগিক ধাতু বা ক্রিয়াপদ' নামে অভিহিত ক'রে থাকেন। সাধারণতঃ 'কর্, খা, দে, পা, বাস্, যা, হ্'-প্রভৃতি ধাতুই এই উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হ'য়ে থাকে। অনেক ক্ষেত্রেই মূল ভাব প্রকাশক ধাতু বর্তমান থাকা সত্ত্বেও শুধু গাম্ভীর্য আনার জন্যই প্রধানতঃ সাধুভাষায় এরূপ সংযোগমূলক ধাতুর ব্যবহার হ'যে থাকে।—'খাওয়া-' স্থলে 'আহার করা', 'দেখা-' স্থলে 'দর্শন করা', 'দোলা-' স্থলে 'দোল খাওয়া', 'বাড়া-' স্থলে 'বৃদ্ধি পাওয়া', 'ঘামা-'-স্থলে 'ঘর্মাক্ত হওয়া' প্রভৃতি। কোন কোন স্থলে অবশ্য যোগ্য শব্দের অভাবেই বাধ্য হয়ে এরূপ সংযোগমূলক ধাতু ব্যবহার করতে হয়।—'জিজ্ঞাসা করা'-র কোন সিদ্ধ বা সাধিত রূপ বাঙলা শিষ্ট ভাষায় নেই, কিন্তু আঞ্চলিক ভাষায় এর অন্ততঃ তিনটি রূপ পাওয়া যায়—'পুছা, শুধানো, জিগানো'—কবিতায় ক্বচিৎ ব্যবহৃত হলেও সাহিত্যে এদের স্থান নেই। প্রাচীন বাঙলায় এরূপ আরও কিছু সিদ্ধ ধাতু ছিল,—কবিতায় ব্যবহৃত হ'লেও শিষ্ট ভাষায় এদের ব্যবহার নেই, তৎস্থলে সংযোগমূলক ধাতু ব্যবহৃত হয়।—'জিনি'-স্থলে 'জয় করি', 'পশি'-স্থলে প্রবেশ করি', 'লাজানো'-স্থলে 'লজ্জা পাওয়া' প্রভৃতি।

যথার্থ যৌগিকমূল ধাতুগুলিতে অপর কোন ধাতু, শব্দ বা প্রত্যয় একেবারে মিশে গেছে. এমন প্রয়োগও এখন একেবারে সীমাবদ্ধ-রূপেই পাওয়া যায়। সাধারণতঃ অনুজ্ঞায়ই এর ব্যবহার সুলভ।—না+পার='নার-', কর+গিয়া='করগে', দেখ+এসে='দেখসে', না+হও='নহ'।

[দুই] ক্রিয়ার প্রকারভেদ

নানা দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ক্রিয়াপদের রূপভেদ কল্পনা করা হ'য়ে থাকে, ফলতঃ ক্রিয়াপদের বিভাগে অনেক বৈচিত্র্য বর্তমান। সমাপ্তিবিচারে ক্রিয়ারূপের দু'টি শ্রেণী—(ক) **সমাপিকা ক্রিয়া**, (খ) **অসমাপিকা ক্রিয়া**। কর্তৃ-কর্মের সম্বন্ধ বিচারেও ক্রিয়ারূপের দু'টি শ্রেণী—(গ) **অকর্মক ক্রিয়া**, (ঘ) **সকর্মক ক্রিয়া**। এ ছাড়াও বাচ্য, ভাব, পুরুষ ও কাল-বিষয়ে ক্রিয়ারূপের বৈচিত্র্যও পৃথক্ পৃথগ্‌ভাবে আলোচ্য বিষয়।

(ক) **সমাপিকা ক্রি.া** (Finite verb)

যে ক্রিয়াপদের ব্যবহারে বাক্যের অর্থের সমাপ্তি ঘটে, তাকে বলে **'সমাপিকা ক্রিয়া'** —'যাই, করি, গেলাম, করবো' প্রভৃতি। বস্তুতঃ ক্রিয়া-বিষয়ক যাবতীয় আলোচনা সমাপিকা ক্রিয়াকে অবলম্বন ক'রেই ঘটে থাকে। অসমাপিকা ক্রিয়া বাস্তবিকপক্ষে অব্যয়-জাতীয়—কাল, পুরুষ, বচন-ভেদে এর কোন পরিবর্তন নেই। কাজেই অসমাপিকা-ক্রিয়ার বাইরে ক্রিয়া-বিষয়ক যাবতীয় আলোচ্য বিষয়কেই সমাপিকা ক্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত বলে ধরে নিতে হ'বে।

(খ) **অসমাপিকা ক্রিয়া** (Infinite / Non-finite verb)

যে ক্রিয়াপদের ব্যবহারে বাক্যের অর্থ সমাপ্ত হয় না, অপর কোন সমাপিকা ক্রিয়ার জন্য অপেক্ষিত থাকে, সেই ক্রিয়াপদকে বলে 'অসমাপিকা ক্রিয়া'।—সে **হাসিয়া কাঁদিয়া** একাকার করিল', **'খেতে পেলে শুতে** চায়'। প্রত্যয় এবং অর্থ ধরে বিচার করলে বাঙলায় অসমাপিকা ক্রিয়া ত্রিবিধ ঃ (১) '-ইয়া-' যুক্ত ল্যবর্থ বা পূর্বকালিক অসমাপিকা (Conjunctive) এবং সম্পন্ন / নিষ্ঠার্থ অসমাপিকা (Past Participle), (২) 'ইলে'-যুক্ত ভূতার্থ বা যদ্যর্থ অসমাপিকা (Conditional Conjunctive) এবং (৩) -'ইতে'-যুক্ত তুমর্থ বা উদ্দেশক অসমাপিকা (Infinitive) এবং শত্রর্থ অসমাপিকা (Present Participle)। এই প্রত্যয়যুক্ত অসমাপিকা ক্রিয়াগুলো পুরুষ, বচন বা লিঙ্গভেদে পরিবর্তিত হয় না বলে প্রকৃতপক্ষে এগুলো অব্যয়রূপেই বাক্যে বিরাজিত থাকে। বাঙলা ভাষায় ক্রিয়ারূপে বচন-ভেদ ও লিঙ্গভেদ না থাকলেও কাল ও পুরুষ-ভেদে সমাপিকা ক্রিয়ায় বিভিন্ন ক্রিয়াবিভক্তি যুক্ত হয়, ফলে তাদের রূপান্তর ঘটেই থাকে ; কিন্তু অসমাপিকা ক্রিয়ায় কোন বিভক্তিচিহ্ন যুক্ত হয় না, তাই তাদের কোন রূপান্তরও ঘটে না।

(১অ) **'-ইয়া,-ই' (ল্যবর্থ অসমাপিকা**—Conjunctives)—সংস্কৃত ব্যাকরণের 'ক্ত্বাচ্-ল্যপ্' বিভক্তির পরিবর্তে বাঙলায় '-ইয়া' প্রত্যয় যুক্ত হয়। প্রাচীন ও মধ্য বাঙলায় '-ই, -ইঅ, -ইআ, -ইঁ, -ইঁআ' প্রভৃতি বিভক্তি এবং আধুনিক বাংলায় '-ই, -ইয়া (>-ইয়ে)' প্রচলিত। প্রাচীন বাঙলায় এবং আধুনিক কবিতায় '-ই' প্রত্যয়েরও ব্যবহার আছে।—'দিঢ় করিঅ', 'কাহা গই', 'বেজ্জ দেক্‌খি কি রোগ পলাই'। 'করিয়া, চলিয়া, রাখিয়া' প্রভৃতি প্রথমে অপিনিহিতি ও পরে অভিশ্রুতির বশে চলিত ভাষায় 'করে, চলে, রেখে'-প্রভৃতিরূপে ব্যবহৃত হয়। কদাচিৎ বিভক্তিহীন অসমাপিকাও প্রাচীন বাঙলায় দেখা যায়।—'পরিধান কর (<করি) নেতবাসো'। মূল প্রত্যয়টি ছিল **'-ই / -ইঅ (<-ইত, -ইক), -পরে স্বার্থে '-ক-' প্রত্যয়ের '-অ' যুক্ত হ'য়ে '-ইয়া' হয়েছে।**

সংস্কৃতে উপসর্গবিহীন ধাতুর সঙ্গে এই অসমাপিকায় '-ত্বা' (ক্তাচ্) প্রত্যয় এবং উপসর্গযুক্ত ধাতুর সঙ্গে '-য়' (ল্যপ্ প্রত্যয়) যুক্ত হ'তো, প্রাকৃতপর্বে তা' একাকার হয়ে যায়। '-য়' > '-ই -ইঅ, -ইআ'—এরূপ অনুমিত হয়। '-ইয়া' প্রত্যয়টি একান্তভাবে কর্তৃনিষ্ঠ ; বাক্যস্থ সমাপিকা ক্রিয়ার কর্তাই অসমাপিকা ক্রিয়ার কর্তা হ'তে পারে, এর ব্যতিক্রম হয় না। এই অসমাপিকা ক্রিয়াটিকে 'পূর্বকালিক অসমাপিকা' বলবার কারণ এই যে, এ দ্বারা এমন কোন অসমাপ্ত ঘটনার উল্লেখ হয়, সমাপিকা ক্রিয়াবর্ণিত ঘটনার পূর্বেই যার আরম্ভ।—'রাজসাপ দেখি জো চমকই'-('রাজসাপ দেখে যে চমকায়'), 'আমি বইটি পড়িয়া তোমাকে বুঝাইব'।

একই কর্তা বা উদ্দেশ্যের যদি একাধিক বিধেয় ক্রিয়া থাকে, তাহ'লে সাধারণত বাংলায় শেষ ক্রিয়াটিকে সমাপিকা রেখে অপরগুলোকে অসমাপিকা ক্রিয়ায় রূপান্তরিত ক'রে একটি সরল বাক্য গঠন করা হয়।—'তুমি বাড়ি যাও, স্নান কর, খাও দাও, বিশ্রাম কর, তারপর ফিরে এসো'-স্থলে 'তুমি বাড়ি গিয়ে স্নান করে খেয়েদেয়ে বিশ্রাম ক'রে ফিরে এসো।'

(১ আ) **'-ইয়া' (সম্পন্ন / নিষ্ঠার্থ অসমাপিকা**—Past Participle)—**ল্যবর্থ** অসমাপিকা ছাড়াও '-ই, -ইআ' প্রত্যয়টি সম্পন্ন বা নিষ্ঠার্থ অসমাপিকা রূপেও ব্যবহৃত হয়। এর সম্ভাব্য উৎপত্তি—'-ইত' (ক্ত) প্রত্যয় থেকে।—চলিত (ক)>চলিঅ (অ)> চলিআ, চলি ; কিংবা *স্বপিতক>সুবিঅঅ>সুইআ>সুআ>শোয়া। লক্ষণীয় যে '-ইআ>-আ' প্রয়োগটি বাঙলা কৃদন্তবিশেষণরূপে প্রচুর পাওয়া যায়।—'বাহির করিল ধন জে ছিল পুতিয়া=(পোঁতা)', 'আমি দেখেছি, সে তখনো দাঁড়িয়ে', 'ছোই ছোই যাই'।

(২) **'-ইলে' (ভূতার্থ / সাপেক্ষ অসমাপিকা**—Conditional Conjunctive)— সংস্কৃতে 'ভাবে-সপ্তমী'-স্থলে বাঙলায় '-ইলে'-যুক্ত অসমাপিকা ক্রিয়ার প্রয়োগ ঘটে। —'অস্তং গতে ভগবতি মরীচিমালিনি'—'ভগবান্ মরীচিমালী অস্তে **গেলে**।' সম্ভবতঃ '-ইল'-যুক্ত কৃদন্ত বিশেষণের সঙ্গে করণ-অধিকরণের বিভক্তি প্রয়োগে পদটি গঠিত হ'য়েছে। সংস্কৃত 'ক্ত' (>-ত) প্রত্যয়যুক্ত পদের সঙ্গে ভাবার্থে করণ বা অধিকরণের বিভক্তি যোগে পদটি উদ্ভূত হ'য়ে থাকতে পারে।—'রামে গতে ভবতি> রামে গদে হোদি> *রামি গঅইল্লহি* হোই > রাম গেলে হয়।' প্রত্যয়টি 'অন্যাশ্রয়ী অসমাপিকা' ক্রিয়ার প্রকাশক সমাপিকা ক্রিয়া এবং এই অসমাপিকা ক্রিয়ার কর্তা অভিন্ন হ'বার কোন প্রয়োজন নেই।—'দধি ণঠ হৈলে* লৈবোঁ তিনগুণ কৌড়ী', 'আমি গেলে যেতে পারি', কিংবা 'তুমি গেলে তবে আমি যাবো।'—'ইলে' প্রত্যয় দ্বারা ঘটনার

পূর্বত্ব সূচিত হয় বলে একে 'ভূতার্থ অসমাপিকা' বলা হয়। '-ইলে'-যুক্ত অসমাপিকার একটা বিশেষ প্রয়োগ ঘটে সম্ভাব্যতা বা সাপেক্ষতা বোঝাতে।—'তুমি গেলে ভালো হয়'। 'সাংকমত **চড়িলে** দাহিন বাম মা হোহী'='সাঁকোতে চড়লে ডান-বাম হয়ো না' অর্থাৎ 'যদি তুমি সাঁকোতে চড়', অথবা 'যখন তুমি সাঁকোতে চড়, তবে / তখন ডান-বাম হয়ো না'—এই সম্ভাবনা বা 'যদি'-র ভাবটি থাকায় এটিকে 'সাপেক্ষ অসমাপিকা' বা 'যদ্যর্থ অসমাপিকা'-ও বলা হয়। এর '-ইল'-যুক্ত কৃদন্ত বিশেষণ রূপটি প্রাচীন ও মধ্য বাঙলায় যথেষ্ট ব্যবহৃত হ'তো।—'দুহিল দুধু কি বান্টে সামায়।'

(৩ অ) '**-ইতে**' (**তুমর্থ অসমাপিকা**—Infinitive) এবং **শত্রর্থ অসমাপিকা** (Present Participle)—একাধিক অর্থে বাঙলায় 'ইতে' প্রত্যয়টির ব্যবহার দেখা যায়। **তুমর্থ** (Infinitive)-রূপেই প্রত্যয়টির বহুল ব্যবহার। 'ভার লআঁ জাইতেঁ পসার টলিআঁ গেল'। চর্যাপদে '-ইতে'-র পরিবর্তে '-ন্তে' ব্যবহৃত হ'তো—'অমিঅ আচ্ছন্তে বিস গিলেসি' (অমৃত থাকতে বিষ গিলিস্)। সম্ভবতঃ '**শতৃ**'-প্রত্যয়ের **সঙ্গে** করণ-অধিকরণের বিভক্তি-যোগে প্রত্যয়টির উদ্ভব ঘটেছে।—'অমিঅঁ আচ্ছন্তে বিস গিলেসি', 'উচিত কহিতে আমি সবাকার বৈরি।' **শত্রর্থ** (শতৃ অর্থ) '-ইতে' প্রত্যয়টি প্রায় সর্বদাই আম্রেড়িত অর্থাৎ দ্বিরুক্ত হ'য়ে বাক্যে ব্যবহৃত হয়।—'চলিতেঁ চলিতেঁ তোর রুণুঝুনু বাজে', '**সমস্ত পথ চমৎকার দৃশ্য দেখিতে দেখিতে** আমরা যাইতে লাগিলাম', 'হাসতে হাসতে ছেলেগুলো চলে গেলো'।

উদ্দেশ্যার্থক বা নিমিত্তার্থক (Gerundial Infinitive) অসমাপিকা ক্রিয়ারূপে '-ইতে' প্রত্যয়যুক্ত পদ ব্যবহৃত হ'য়ে থাকে। 'বৌ-ঝিরা জল আনিতে নদীতে যায়', 'মশা মারতে কামান দাগানো'। আবশ্যকতা, ইচ্ছা, আদেশ, আরম্ভ, ক্রিয়া, বিধি, প্রভৃতি ভাব জ্ঞাপন করতেও '-ইতে' প্রত্যয় যুক্ত হয়।—'তিনি যেতে অনিচ্ছুক', 'সর্বজীবে দয়া করতে হয়', 'এ বিষয়ে কি আমাকে মত দিতে হইবে?'

'**তুমর্থ**' এবং '**শত্রর্থ**'—যে দু' জাতীয় '-ইতে' প্রত্যয়ের ব্যবহার দেখানো হ'লো, তাদের মধ্যে উৎপত্তিগত এবং অর্থগত পার্থক্য রয়েছে। তুমর্থ '-ইতে' প্রত্যয়টি যুক্ত হয় ভাববাচক বা ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য-পদরূপে, যেমন—'সে জল আনতে যাচ্ছে' অর্থাৎ -'সে জল আনবার কাজ করছে'। পক্ষান্তরে **শত্রর্থ** '-ইতে' কৃদন্ত বিশেষণ—এখানে বাক্যটির অর্থ—'সে যখন যাচ্ছে, তখন সে জল আনবার অবস্থায় রয়েছে।' তুমর্থ '-ইতে' প্রত্যয়ের উৎপত্তি ভাববাচক বিশেষ্য বা ভাববাচকের শেষে সপ্তমীর '-তে' যোগে হতে পারে; 'খাইতে বসিল' (খাওয়া+-তে=খাওয়া-তে>খাইতে); অথবা এটি

র্থ্যর্থ '-ইতে' (<অন্ত,-অয়ন্ত) থেকেও আসতে পারে। এর অপর একটি সম্ভব্য উৎস হতে পারে,—কথ্য সং* -ত্বায়ে>অর্ধমাগধী -ইত্তায়ে>-ইতে।

বঙ্গালী উপভাষার '-ইতে'-স্থলে '-ইবার' প্রত্যয়ের বহুল প্রচলন লক্ষ্য করা যায়। —'আমি দেখতে চাই'>'আমি দেখবার চাই', 'সে খেতে আরম্ভ করেছে'>'সে খাইবার লাগছে'।

বঙ্গালী উপভাষার কোন কোন বিভাষায় '-ইতে' প্রত্যয়ান্ত অসমাপিকার একটি অসাধারণ বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। '-ইতে' অসমাপিকার এমনিতে পুরুষ-ভেদে কোন রূপান্তর ঘটে না বলে একে অব্যয়-জাতীয় মনে করা হয়। কিন্তু উক্ত বিভাষায় পুরুষ-ভেদে রূপান্তর ঘটে। অসমাপিকা ক্রিয়ার পুরুষ-ভেদে রূপান্তরই এর অসাধারণ বৈশিষ্ট্য—'আমি/তুমি/সে দেখতে চাইতাম/চাইতে/চাইতো'—স্থলে 'আমি **দেখতাম** চাইতাম, তুমি **দেখতা** চাইতা, সে **দেখতো** চাইতো'—সমাপিকার অনুরূপ বিভক্তিচিহ্ন যুক্ত হ'চ্ছে। যে কোন কালেই এই রূপান্তর ঘটে থাকে।

(গ) অকর্মক ও সকর্মক ক্রিয়া প্রভৃতি

কর্মভেদে ক্রিয়া দ্বিবিধ ঃ (১) অকর্মক ক্রিয়া ও (২) সকর্মক ক্রিয়া।

১. **অকর্মক ক্রিয়া** (Intransitive verb)—যে ক্রিয়া একান্তভাবে কর্তৃনিষ্ঠ, অপর কোন বস্তু বা পদার্থের অপেক্ষা না করে শুধু কর্তাকে অবলম্বন করেই সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় তাকে বলে 'অকর্মক ক্রিয়া'। 'আমি ঘুমিয়েছিলাম, তুমি গিয়েছিলে, রাম থাকবে, ফুল ফুটলো, গাছ পড়লো' প্রভৃতি। কোন কোন অকর্মক ক্রিয়াকে সকর্মক ক্রিয়ারূপে প্রকাশ করা চলে, ঐ ক্ষেত্রে ক্রিয়ার সঙ্গে সমধাতুজ একটি বিশেষ্য পদকে কর্ম রূপে গ্রহণ করতে হয়,—ঐরূপ কর্মকে বলা হয় **'সমধাতুজ/সমধাতুক কর্ম'** (Cognate object)।—'এমন **ঘুম** ঘুমাইয়াছিল, এত **কান্না** কেঁদোনা, অত **নাচ** নেচো না'।

২. **সকর্মক ক্রিয়া** (Transitive verb)—কোন ক্রিয়াপদের দ্বারা বর্ণিত ব্যাপার যদি উদ্দেশ্য থেকে প্রসৃত হ'য়ে অপর কোন বস্তুকে অবলম্বন ক'রে সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়, তবে তাকে বলে 'সকর্মক ক্রিয়া'।—'আমরা ভাত খাই, তোমরা বই পড়, ওরা কথা শোনে না' প্রভৃতি। কোন কোন ক্রিয়ার দু'টি কর্ম থাকে, ঐরূপ ক্রিয়াকে বলে **দ্বিকর্মক ক্রিয়া**।—'আমি **তোমাকে** একটা **কথা** বলবো, তুমি **তাকে** দশটা **টাকা** দেবে'। দু'টি কর্মের মধ্যে যাকে উদ্দেশ্য ক'রে ক্রিয়াটি নিষ্পন্ন হয়, তাকে বলে **গৌণকর্ম** (Indirect object) এবং যে বস্তুকে অবলম্বন করে কার্য ঘটে তাকে বলে **মুখ্যকর্ম** (Direct object)। পূর্বোক্ত বাক্য দুটিতে 'তোমাকে' এবং 'তাকে'

গৌণকর্ম এবং 'কথা' ও 'টাকা' মুখ্যকর্ম। বাঙলায় সাধারণতঃ চেতন পদার্থটি গৌণকর্ম এবং অচেতন পদার্থটি মুখ্যকর্ম হ'য়ে থাকে। তবে ক্ষেত্রবিশেষে দু'টিই চেতন অথবা দুটিই অচেতন পদার্থ হ'তে পারে।

৩. **অকর্তৃক ক্রিয়া** (Impersonal verb)—সংস্কৃতে ভাববাচ্যের ক্রিয়ার কর্তা থাকে না। বাঙলাতে ভাববাচ্যের কর্তাটি হয় সম্বন্ধবিভক্তিযুক্ত, প্রকৃত কর্তা নয়, প্রতীয়মান কর্তা—তাই ভাববাচ্যের ক্রিয়াকে 'অকর্তৃক ক্রিয়া' বলা হয়। মূল ক্রিয়াটির সঙ্গে 'কর্', 'হ', 'পা' প্রভৃতি ধাতু যোগ করে মূল ক্রিয়াটিকে কর্তার স্থানে বসানো হয়।—'কোথা থেকে আপনার আসা হ'চ্ছে'—এই বাক্যে সম্বন্ধ বিভক্তিযুক্ত পদ 'আপনার' প্রতীয়মান কর্তা, মূল ক্রিয়া 'আসা', বাক্যে কর্তার স্থান অধিকার করেছে এবং তার সঙ্গে 'হ'চ্ছে' যুক্ত হ'য়ে ক্রিয়ার মর্যাদা লাভ করেছে। কর্তৃবাচ্যে এর রূপ হবে —'কোথা থেকে আপনি আসছেন'। 'ইচ্ছা করা, ইচ্ছা হওয়া, কান্না পাওয়া, ক্ষুধা পাওয়া, গরম লাগা, ঘুম পাওয়া, দুঃখ হওয়া, ভয় হওয়া, রাগ হওয়া, লজ্জা করা, শীত করা' প্রভৃতি অকর্তৃক ক্রিয়া—এদের কোন কর্তা থাকে না, এরাই কর্তার মত আচরণ করে।

৪. **স্বয়ংক্রিয় ক্রিয়াপদ** (Reflexive verb)—কর্ম-কর্তৃবাচ্যে কর্মকেই বাক্যের কর্তারূপে দেখানো হয় অর্থাৎ কর্মটিই যেন স্বয়ংকর্তৃত্ব লাভ করেছে, এরূপ ক্ষেত্রে তার ক্রিয়াটিকে বলা হয় 'স্বয়ংক্রিয়' ক্রিয়াপদ।—'বাগানের বাঁশ ভাঙছে, গ্রামে আর শাঁখ বাজে না, বইখানা বাজারে ভাল কাটছে'।

(ঘ) **প্রযোজক ক্রিয়া ও নামধাতু**

১. **প্রযোজক ক্রিয়া** (Causative verb)—যে ক্রিয়ার কার্য একজনের প্রযোজনা বা প্রেরণায় অপর কোন ব্যক্তিদ্বারা অনুষ্ঠিত হয়, সেই ক্রিয়াকে 'প্রযোজক ক্রিয়া' বা 'প্রেরণার্থক ক্রিয়া' বলা হয়।—'মা শিশুকে চাঁদ দেখাচ্ছেন'—এই বাক্যে প্রযোক্তা 'মা' ক্রিয়ার কর্তা এবং প্রকৃতপক্ষে 'দেখা'-র যে কর্তা 'শিশু', তৎস্থানে কর্মকারক হলো। সংস্কৃতে সাধারণ ক্রিয়াকে প্রযোজক ক্রিয়ায় পরিণত করতে হ'লে তার সঙ্গে 'ণিচ্' প্রত্যয় যোগে করা হয়। এই কারণে সংস্কৃতে প্রযোজক ক্রিয়াকে **ণিজন্ত** (ণিচ্+অন্ত) ক্রিয়া বলা হয়। কিন্তু বাঙলায় ণিচ্ প্রত্যয় যুক্ত হয় না বলে 'ণিজন্ত ক্রিয়া' বলবার যুক্তিসঙ্গত কোন কারণ নেই।

প্রযোজক ভাববচন (Causative Verbal Noun)-এর পদ গঠন করতে বাঙলায় '-আন্', '-আনো' প্রত্যয় যোগ করতে হয়।—'জানান, করানো'। '-প্রাণ ধরণ না জাএ', 'লোহার কলাই কভু না খায় সিজান।'—প্রযোজক '-আ'-প্রত্যয়ের সঙ্গে স্বার্থিক '-ন'

যোগে প্রত্যয়টির উদ্ভব সম্ভবপর। প্রযোজক কৃদন্ত বিশেষণ (Causative Participle)-হিসেবেও '-আন', '-আনো' প্রত্যয় যুক্ত হয়। এটি সম্ভবতঃ 'শানচ্' (>আন) থেকে এসেছে।—'সুখান ভালত বসি কাক কারে রাত্র'।

সংস্কৃত ণিজন্ত ক্রিয়ার অংশ 'আপয়-' থেকে বাঙলা প্রযোজক ক্রিয়ার বিশিষ্ট প্রত্যয় '-আ'-র উদ্ভব ঘটেছে।—'করি, দেখি, খাই'—প্রভৃতির প্রযোজক রূপ—'করাই, দেখাই, খাওয়াই'। কতকগুলো বাঙলা ধাতুমূল প্রযোজক ক্রিয়া থেকে বিবর্তিত হ'য়ে সৃষ্ট হ'লেও বাঙলায় তাদের প্রযোজনার ভাবটি অন্তর্হিত হওয়াতে নোতুনভাবে আবার এদের প্রযোজক রূপ গঠন করা হয়।—'চল্' ধাতুর প্রযোজক রূপ 'চাল্'—এক্ষণে এর সঙ্গে আবার প্রত্যয়যোগে সৃষ্টি করা হয়েছে 'চালা'—চলে, চালে, চালায়।

কৃদন্ত পদের সঙ্গে 'কর্' ধাতুর যোগে প্রযোজক ক্রিয়ার পদ গঠন বাঙলা ভাষায় একটি প্রাচীন রীতি। 'বারেক করাহ যবে রাধা দরশনে', 'তিনি বৃদ্ধ বয়সে মাকে জগন্নাথ দর্শন করালেন।' এরূপ **যৌগিক প্রযোজক** ক্রিয়ারূপ আঞ্চলিক বাঙলায় বহুল প্রচলিত।—'খাওয়া করানো, শোওয়া করানো' প্রভৃতি।

মূল ক্রিয়া অকর্মক হ'লে প্রযোজক ক্রিয়াটি সকর্মক হয়।—'খোকা শোয়' কিন্তু 'মা খোকাকে শোয়ান'—মূল ক্রিয়ার কর্তা কর্মকারকে পরিবর্তিত হলো। মূল ক্রিয়াটি সকর্মক হ'লে প্রযোজক ক্রিয়াযোগে অনুষ্ঠাতা করণকারকে রূপান্তরিত হয়।—'আমি কাজটি করছি' কিন্তু প্রযোজক ক্রিয়াযোগে 'আমাকে দিয়ে (=আমা দ্বারা) কাজটি করানো হ'চ্ছে।' অথবা 'আমি তোমাকে দিয়ে কাজটি করাচ্ছি।' কোন কোন বাক্যে প্রযোক্তা কর্তাকে করণকারকে সরিয়ে দিয়ে অপর কোন কর্তা দেখা দেয়, ঐরূপ ক্ষেত্রে প্রযোজক ক্রিয়ার রূপের কোন পরিবর্তন বাঙলায় দেখা না গেলেও তাকে '**আরোপিত প্রযোজক**' ক্রিয়া নামে অভিহিত করা হয়।—'শিক্ষক ছাত্রকে পড়াচ্ছেন'—এখানে 'শিক্ষক' প্রযোক্তা কর্তা এবং 'পড়াচেছন' প্রযোজক ক্রিয়া; আমি শিক্ষককে দিয়ে ছাত্রকে পড়াচ্ছি'—হিন্দীতে এই স্থলে ক্রিয়ারূপের পরিবর্তন সাধিত হয়।—মূল ক্রিয়া 'পঢ়না', প্রযোজক ক্রিয়া 'পঢ়ানা', আরোপিত প্রযোজক ক্রিয়া 'পঢ়ারানা'।

২. **নামধাতু** (Denominative verb)—কোন নামশব্দ অর্থাৎ বিশেষ্য বা বিশেষণকে যখন ক্রিয়ারূপে ব্যবহার করা হয়, তাকে বলে 'নামধাতু'। বিশেষ্য ক্রিয়ারূপে—'হাতানো, ঘামা, জমে'; বিশেষণ ক্রিয়ারূপে—'দগ্ধানো, কমানো', প্রভৃতি। বাঙলা ভাষায় ব্যবহৃত বহু ক্রিয়াই মূলতঃ নামধাতু।—'দাঁড়া (<দন্ড), কামায় (<কর্ম), গোড়ায় (<গোড়=পা)'। মধ্যযুগের বাঙলায়, আধুনিক কালের সাধুভাষায় এবং কবিতায় বহু তৎসম নামশব্দের নামধাতুরূপে ব্যবহার পাওয়া

যায়।—'জিজ্ঞাসিব, নির্মন্ত্রিল, বৃষ্টিল, সান্ত্বাইব, প্রভাতিল, প্রতিবিধিৎসিতে, দানিলা, প্রবেশিতে, মুকুলিল'।

অনেক স্থলে নামশব্দটির সঙ্গে কোন প্রত্যয় যোগ না করেই সরাসরি বিভক্তিযোগে ক্রিয়াপদ গঠন করা হয়।—'কমে, জমে, তাতিল, পাকিবে, ঘামে'। তবে সাধারণভাবে প্রযোজক ক্রিয়ার মতই নামধাতুরও প্রচলিত বিভক্তি '-আ'। 'জুতানো, লতায়, চাবকায়, পিছলায়' প্রভৃতি।

কোন কোন ধ্বন্যাত্মক অব্যয় শব্দকেও নামধাতু-রূপে ব্যবহার করা হয়।—'মড়মড়িল, ঝনঝনানো, খটখটাইয়া'।

কিছু কিছু বিদেশি শব্দও নামধাতু-রূপে ব্যবহৃত হয়।—'বদলায়, শরমায় (=লজ্জিত হয়), তল্লাসিয়া, পাশানো (—তাস pass দেওয়া)। বাঙলা আঞ্চলিক ভাষাসমূহে নামধাতুর বহুল প্রয়োগ দেখা যায়—'গঁধাচ্ছে, জিগ্‌গুস্‌বো, জিগাইমু'।

(ঙ) **যৌগিক ক্রিয়াপদ** (Compound verb)

কোন ক্রিয়াপদ অপর কোন ক্রিয়াপদের সংযোগে যদি একটি মাত্র ক্রিয়ার অর্থ প্রকাশ করে, তবে তাকে 'যৌগিক ক্রিয়াপদ' বলা চলে। [বিশেষ্যের সঙ্গে ক্রিয়াপদের যোগে একটিমাত্র ক্রিয়ার্থ প্রকাশক ক্রিয়াকে ডঃ সুকুমার সেন 'যৌগিক ক্রিয়াপদ' আখ্যা দিলেও আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তাকে বলেছেন 'সংযোগমূলক ক্রিয়াপদ'। 'সংযোগমূলক ক্রিয়াপদ'-স্থলে কেউ কেউ 'নামমূলক যৌগিক ক্রিয়াপদ' ব্যবহার ক'রে 'যৌগিক ক্রিয়াপদ'কে 'ক্রিয়ামূলক যৌগিক ক্রিয়াপদ' বলে উল্লেখ করেন। এ দু'য়ের লক্ষণ-গত বিচারে পার্থক্য থাকায় দু'টিকে পৃথক্‌ভাবে বিবেচনা করাই সঙ্গত। এখানে ক্রিয়ার সঙ্গে ক্রিয়া-যোগে যে ক্রিয়াপদ গঠিত হয়, শুধু সে বিষয়েই আলোচনা নিবদ্ধ রইল। সংযোগমূলক ধাতু'-বিষয়ক আলোচনা পূর্বেই করা হয়েছে (দ্রষ্টব্য ঊনবিংশ অধ্যায়—এক/গ)।]

'সংযোগমূলক ক্রিয়া ও যৌগিক ক্রিয়ার পার্থক্য

'সংযোগমূলক ক্রিয়াপদ' তথা 'নামমূলক যৌগিক ক্রিয়াপদে'র সঙ্গে 'যৌগিক ক্রিয়াপদ' তথা 'ক্রিয়ামূলক যৌগিক ক্রিয়াপদের পার্থক্যটি বিচার ক'রে দেখা প্রয়োজন। 'সংযোগমূলক' / 'নামমূলক' যৌগিক ক্রিয়াপদের প্রথম পদটি বিশেষ্যাদি নামপদ এবং এর অর্থটিই প্রধান ; পরবর্তী সমাপিকা ক্রিয়াপদটি এর অধীন ক্রিয়াপদ মাত্র এবং বিশেষ বিশেষ নামপদের সঙ্গে বিশেষ বিশেষ ক্রিয়াপদই যুক্ত হয়। যেমন—'জিজ্ঞাসা করা, দর্শন করা /—দেওয়া, অস্ত যাওয়া, ভালোবাসা,

গরম লাগা /-হওয়া' প্রভৃতি। এই ক্রিয়াপদটি কার্যকাল বা কার্যভঙ্গির উপর নির্ভরশীল নয়। পক্ষান্তরে 'যৌগিক' / ক্রিয়ামূলক যৌগিক ক্রিয়াপদটির উভয় পদই ক্রিয়াপদ এবং প্রথম পদটির অর্থ প্রধান হ'লেও দ্বিতীয় পদটি দ্বারা প্রথমটির কার্যকাল বা কার্যভঙ্গি বা গতি-প্রকৃতি-আদি পরিস্ফুট হয় বলে দ্বিতীয় পদটি প্রথম পদটির সহায়ক ক্রিয়া (Auxiliary verb)-রূপেই বিবেচিত হবার যোগ্য। যেমন —'করে নাও/ -দাও /-যাও /খাও, /-ফেল' প্রভৃতি। দেখা যাচ্ছে, সহায়ক ক্রিয়াটির দ্বারা মূল ক্রিয়ার পূর্ণতা, নিত্যতা, আরম্ভ, অনুমোদন, অনুবৃত্তি প্রভৃতি ভাব বা আচরণ প্রকাশিত হ'চ্ছে। তবে দ্বিতীয় পদটির নিজস্ব অর্থ আর কিছু বজায় থাকে না।

যে দুটি ক্রিয়াপদের সাহায্যে যৌগিক ক্রিয়াপদ গঠিত হয়, সাধারণতঃ তার প্রথমটি হয় '-ইয়া' বা '-ইতে'-যুক্ত অসমাপিকা এবং পরেরটি সমাপিকা ক্রিয়া। প্রথম ক্রিয়াপদটির অর্থই সাধারণতঃ প্রধান হয়, অপরটি তার সহকারী মাত্র। সংস্কৃত ব্যাকরণে উপসর্গ-যোগে ধাতুর অর্থে কিছু ইতরবিশেষ করা হ'তো, বাঙলা যৌগিক ক্রিয়াপদের দ্বিতীয় বা সমাপিকা ক্রিয়াটিও সেই উদ্দেশ্যই সাধন করে। অবশ্য এটি সাধারণ নিয়ম মাত্র, এর ব্যতিক্রমও যথেষ্ট। যেমন—যৌগিক ক্রিয়াপদের দুটি ক্রিয়াই সমাপিকা হ'তে পারে অথবা পরেরটি অসমাপিকা হ'তে পারে।

গঠন-অনুযায়ী যৌগিক ক্রিয়ার নিম্নোক্তক্রমে শ্রেণীবিভাজন চল্‌তে পারে ঃ—

(১) সমাপিকা+সমাপিকা বা সমজাতীয়, (২) সমাপিকা+অসমাপিকা, (৩) অসমাপিকা+সমাপিকা।

(১) **সমাপিকা+সমাপিকা**—দুই সমাপিকা ক্রিয়ার যোগে যে যৌগিক ক্রিয়াপদ গঠিত হয়, তা'তে কোনটিই প্রধানরূপে প্রতীয়মান হয় না। 'এলে গেলে তো অনেকদিন, কীই বা হ'লো'। দুই অসমাপিকার যোগেও অনুরূপ ক্রিয়াপদ গঠিত হ'তে পারে।—'দেখেশুনে তো ভালোই মনে হয়', 'রয়ে সয়ে থাক্‌তে পারলে ভালোই হ'বে'।

(২) **সমাপিকা+অসমাপিকা**—সাধারণতঃ আভিমুখ্য বা প্রাতিমুখ্য বোঝাতে এ ধরনের ক্রিয়াপদ গঠিত হয়।—'দেখ গিয়া>'দেখ গে', 'দেখ এসে'>'দেখসে', 'মরুকগে', 'হোক্‌গে'।

(৩) **অসমাপিকা+সমাপিকা**—যৌগিক ক্রিয়াপদের এইটিই মূলধারা, অপর দুটির প্রয়োগ ক্ষেত্র অতিশয় সীমিত। এরূপ যৌগিক ক্রিয়ার প্রয়োগ প্রাচীন বাঙলাতেও বর্তমান ছিল।—'চউষঠ্‌ঠি কোঠা গুণিআ লেহু', 'পঞ্চনালে উঠি গিল পাণী'। আধুনিক বাঙলায় যৌগিক ক্রিয়ার ব্যবহার অতিশয় ব্যাপক হ'লেও **শেষ সমাপিকা**

ক্রিয়াটির ব্যবহারে কিছুটা সীমাবদ্ধতা রয়েছে। প্রথমে ব্যবহৃত অসমাপিকাটি যে কোন ক্রিয়াপদের হ'লেও নির্দিষ্ট কয়েকটি মাত্র ক্রিয়াই শেষাংশে ব্যবহৃত হয়। এদের মধ্যে প্রধান—'আস্, চাহ্, গে, থাক্, দে, নে, পড়্, পা, পার্, ফেল্, যা, রহ্, লাগ্, হ' প্রভৃতি।

'-ইয়া-' যুক্ত অসমাপিকার সঙ্গে সমাপিকা ক্রিয়ার মিলনে যৌগিক ক্রিয়াঃ—'দেখে আসা, কেঁদে ওঠা, বসে থাকা, লেগে থাকা, তুলে দেওয়া, দিয়ে দেওয়া, হেসে নাও দু'দিন বই তো নয়, কেড়ে নেওয়া, অংকটা কষে নে, লেগে পড়া, ঘুমিয়ে পড়া, কেটে ফেলা, মেরে ফেলা, ক'রে বসা, বলে বসা, শুনে যাওয়া, পড়ে যাওয়া, লেগে যাওয়া, ধরে রহা/থাকা' প্রভৃতি।

'-ইতে'-যুক্ত অসমাপিকার সঙ্গে সমাপিকা ক্রিয়ার মিলনে যৌগিক ক্রিয়াঃ—'দিতে চাওয়া, করতে চাওয়া, হাস্তে থাকা, ভাস্তে থাকা, খেতে দেওয়া, বসতে দেওয়া, দেখতে পাওয়া, খেতে পাওয়া, চলতে পারা, নাইতে পারা, করতে লাগা' প্রভৃতি।

'ইলে'-যুক্ত অসমাপিকার সঙ্গেও সমাপিকা ক্রিয়া যোগে যৌগিক ক্রিয়ার পদ তৈরি হয়ঃ—'তুমি গেলে পার', 'শুনলেই হ'লো', 'খেলে থাকি', 'উথলে ওঠা' প্রভৃতি।

(চ) অস্ত্যর্থক, নঞর্থক/ন্যস্ত্যর্থ ও অপূর্ণ ক্রিয়া।

(১) **অস্ত্যর্থক ক্রিয়া** (Substantive verb)—যে ক্রিয়া 'অস্তি'-বাচক অর্থাৎ যা 'আছে' অর্থে ব্যবহৃত হয়, তাকে বলে 'অস্ত্যর্থক ক্রিয়া' বা 'সদর্থক ক্রিয়া'। বাঙলা ভাষায় এরূপ ক্রিয়ার সংখ্যা মাত্র অল্প কয়টি—(অ) 'আছ্', (আ) 'থাক্', (ই) 'বট্', (ঈ) 'বস্', (উ) 'রহ্'।

(অ) **আছ্**—সংস্কৃতে 'অস্'-ধাতুর একটি প্রচলিত রূপ ছিল 'অস্তি'; ধাতু-মূলটি ইন্দো-য়ুরোপীয় আর্যভাষায়ও বর্তমান ছিল, কারণ অপরাপর আর্যভাষায়ও এর অস্তিত্ব বর্তমান—গ্রীঃ 'est', লাঃ 'ist', পাঃ 'ast'। সংস্কৃতে 'অস্' ধাতু থেকে উৎপন্ন আর একটি বিকল্প কথ্য রূপ ছিল মনে হয়—*'অচ্ছতি'; গ্রীক ভাষায় পাওয়া যায় 'esketi'। সম্ভবতঃ কথ্য সংস্কৃত থেকে পালি ভাষায়ও শব্দটি গৃহীত হয়েছিল, তা' থেকে প্রাকৃতে 'অচ্ছই' হ'য়ে বাঙলায় 'আছে' পদে বিবর্তিত হ'য়েছে। এর অপর একটি সম্ভাব্য উৎস—বৈঃ 'ক্ষি' ধাতু থেকে।—সং আ-ক্ষেতি>প্রাঃ অচ্ছই,*অক্খই> আছে, খে (ভোজপুরিয়ায়, নইখে=হয় না)। 'অস্তি'-জাত 'অত্থি>আথি' ভারতের কোন কোন ভাষায় প্রচলিত আছে। প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাঙলায় অতীত-কালে (আছিলাহোঁ, আছিল), বর্তমান কালে (আছোঁ; আছহ, আছেন্ত), অনুজ্ঞায় ('আছুক অন্যের কাজ'), অসমাপিকা ক্রিয়ারূপে ('অমিঅ আচ্ছন্তে বিস গিলেসি'=

অমিয় থাকতে বিষ গিলিস), 'আছিতে আছিয়ে ঘরে', 'ছিআঁ' (<আছিয়া),* ক্রিয়াটির ব্যাপক ব্যবহার ছিল। আধুনিক কালে কবিতায় এবং আঞ্চলিক ভাষায় অতীতকালের রূপে 'আছিল' প্রচলিত আছে, কিন্তু সাধুভাষায় ও শিষ্ট চলতি ভাষায় আদিস্বর লোপ পেয়েছে—'ছিল, ছিলে, ছিলাম'; যৌগিককালেও 'আছ্' ধাতুর বর্তমান ও অতীত কালের রূপ ব্যবহৃত হয়,—'করিয়া+(আ) ছিল=করিয়াছিল, করিতে+(আ) ছে=করিতেছে। বাঙলায় 'আছ্' ধাতুর রূপ অপূর্ণাঙ্গ (Defective), ভবিষ্যৎকালে 'আছ্' ধাতুর ব্যবহার নেই। 'থাক্' বা 'রহ্' ধাতুর সাহায্যে ভবিষ্যৎ কালের ভাব প্রকাশিত হয়।

(আ) **থাক্**—সংস্কৃত 'স্থা' ধাতু থেকে নিষ্পন্ন 'থা'-এর সঙ্গে স্বার্থিক 'ক'-প্রত্যয় যোগে বাঙলায় অস্ত্যর্থক 'থাক্' ক্রিয়ার উৎপত্তি। কারো কারো মতে এটি সং 'স্থপ্' ধাতুর সমার্থক কথ্য সং *'স্থক্ক' ধাতু থেকে উদ্ভূত হ'য়েছে। অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ—এই তিন কালেই 'থাক্' ধাতুর ব্যবহার থাকলেও (থাকিল, থাকে, থাকবে') অনেক সময়ই অপূর্ণ 'আছ্'-ধাতুর সম্পূরক রূপেও এটি ব্যবহৃত হয় (-ছিলাম, আছি থাকবো)।

(ই) **বট্**—সংস্কৃত 'বৃৎ' বা 'বত্' ধাতু থেকে বাঙলায় 'বট্' ধাতুর উৎপত্তি (বর্ততে>বট্টই>বটে)। অতীত এবং ভবিষ্যৎ কালে এর ব্যবহার নেই, শুধু বর্তমান কালেই এর ব্যবহার ('একা দেখি কুলবধূ কে বট আপনি'), অতএব এটি অপূর্ণাঙ্গ ধাতু (Defective verb)। পুরুষ-ভেদে এর রূপান্তর ঘটে। রাঢ়ী ও ঝাড়খণ্ডী ভাষায় এর বহুল প্রয়োগ, 'আছে' বা 'হয়'—এ জাতীয় অস্ত্যর্থক বর্তমান কালে। অন্যত্র 'বটে' সাধারণতঃ অবধারণার্থক অব্যয়-রূপেই ব্যবহৃত হয়—'তুমি বলছো বটে, কিন্তু আমি বিশ্বাস করিনে'।

(ঈ) **বস্**—মধ্যযুগের বাঙলায় 'বস্' ধাতুর সামান্য ব্যবহার পাওয়া যায়—'তোমার দেহত কাহ্নাঞি না বসে কি পীত'; 'বড় ইচ্ছা বসে মোর তোমার রন্ধনে।' ক্রিয়াটি জোরালো অর্থে অস্ত্যর্থক ক্রিয়ারূপে ব্যবহৃত হতো।

(উ) **রহ্**—'রহ্'-ধাতুর উৎপত্তির কোন প্রত্যক্ষ সূত্র পাওয়া যায় না। অশোকের শিলালিপিতে 'লঘংতি' নামে যে পদটি পাওয়া যায়, তার সম্ভাব্য ধাতুমূল *রঘ, * 'লঘ্' থেকে এর উৎপত্তি ঘটেছে বলে অনুমান করা হয়। এ ছাড়াও এর বিভিন্ন উৎস-সূত্র অনুমান করা হয়। সং 'রক্ষ্' ধাতু, সং * 'রহ্' ধাতু-ও এর মূল হ'তে পারে। এর ব্যবহার তিনকালে বর্তমান। ক্রিয়াপদ অস্ত্যর্থক। এর অর্থ এবং প্রয়োগ 'থাক' ধাতুর মতই (রহিল, রয়, রইবে,—'যে সহে সে রহে')।

(ঊ) **হো, হ্**—সংস্কৃত 'ভূ' (ভবতি>ভোদি>হোই>হোয়, হয়)-ধাতু এবং 'অস্' (*অসতি>*অহ্‌তি>*অহ্‌ই>হএ>হয়) ধাতু থেকে বাং 'হ' ধাতুর উৎপত্তি। মূলতঃ দুটি পৃথক্ ধাতুমূল থেকে উৎপন্ন এবং গোড়ার দিকে রূপগত পার্থক্য থাকলেও অর্থগত এবং ধ্বনিগত সাদৃশ্যের কারণে দুটির একীকরণ ঘটে যায়। মধ্যযুগের বাঙলা পর্যন্ত 'হো'-এর প্রয়োগ থাকলেও আধুনিক কালে আর তার পৃথক্ অস্তিত্ব নেই। বাঙলায় ধাতুটি তিনকালেই ব্যবহৃত হয় ('হইল, হয়, হইবে')।

(১) **নঞর্থক/নাস্ত্যর্থক ক্রিয়া** (Negative verb)

বাঙলায় বলতে গেলে, নঞর্থক ধাতু একটিই—'নহ্'। অস্ত্যর্থক 'ভূ>হ'-ধাতুর পূর্বে নঞর্থক 'ন' শব্দের যোগে এই ধাতুটি গঠিত হয়েছে।

মধ্য ভারতীয় আর্যভাষা তথা প্রাকৃতের যুগেই নিষেধার্থক অব্যয় 'ন' ব্যবহৃত হতো ক্রিয়াপদের অব্যবহিত পূর্বে। এটি পরবর্তী ক্রিয়াপদের সঙ্গে যুক্ত হ'য়ে কয়েকটি নাস্ত্যর্থক ক্রিয়াপদ সৃষ্টি করেছে, যাদের কিছু কিছু এখনো বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় ব্যবহৃত হয়। যেমন—নাস্তি>নাত্থি>নাথি=হয় না (মারাঠী ভাষায়) ; ন জামাতি >ণ আনই>ণেণ=আমি জানি না (কোঙ্কণী ভাষায়) ; ন আক্ষেতি>ণ *অক্‌খই >নইখে (ভোজপুরিয়া), নেখে=সে হয় না (মানভূমী) ; ন পারয়তি>নারে= না পারে (বাঙলায়)।

মধ্যযুগের বাঙলায় নঞর্থক 'নহ্' ধাতু একমাত্র যৌগিক কালব্যতীত অপর সমস্ত কালেই ব্যবহৃত হ'তো।—অতীতে 'নহিল', বর্তমানে 'নহে', ভবিষ্যতে 'নহিব', নিত্যবৃত্ত অতীতে 'নহিত', বর্তমান অনুজ্ঞায় 'নহ, নহুক', ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞায় 'নহিহ' এবং অসমাপিকা ক্রিয়ায় 'নহিলে'। আধুনিক বাঙলায় সাধারণভাবে বর্তমান কালের নির্দেশক রূপটিই শুধু প্রচলিত আছে—'নহি/নই, নহ/নও, ন'স্ নহে/নয়, ন'ন'। অসমাপিকা ক্রিয়ারূপে 'নহিলে/নইলে'-ও বর্তমান আছে।

একটি নঞর্থক অব্যয় 'নাই' (নেই/নি) বর্তমান কালের ক্রিয়ার পর ব্যবহৃত হয়ে ক্রিয়াটিকে অতীতকালে পরিণত করে। 'আমি দেখি নাই/নি'। এস্থলে 'নাই' অব্যয় হ'লেও কালের পরিবর্তন ঘটাতে সক্ষম বলে এর কিছুটা ক্রিয়া-শক্তি স্বীকার করতে হয়। অতীতকালের ক্রিয়ার সঙ্গে কখনও 'নাই' ব্যবহৃত হয় না, তৎস্থলে 'না' ব্যবহৃত হয়। কিন্তু অতীত কালের সঙ্গে 'না'-যোগে বাক্য এবং বর্তমান কালের সঙ্গে 'নাই'-যোগে অতীত কালের বাক্যে কিছুটা অর্থগত পার্থক্য বর্তমান।—'আমি দেখলাম না' (ইচ্ছা করে অথবা অসামর্থ্যহেতু), আর 'আমি দেখিনি' (শুধু ঘটনাটির অঘটন)।

কবিতায় এবং আঞ্চলিক ভাষায় আর একটি নঞর্থক ধাতুর ব্যবহার পাওয়া যায়—'নার' < ন/না+পার। পুরুষ-ভেদে এবং কাল-ভেদে এর রূপান্তর ঘটে—'নারি, নারে, নারিলি, নারিবে' প্রভৃতি। মধ্যযুগের বাঙলায় তিনকালেই এই ধাতুটির ব্যাপক ব্যবহার ছিল।

প্রাচীন বাঙলায় আরও কয়েকটি নঞর্থক ক্রিয়াপদ পাওয়া যায়, তবে সম্ভবতঃ সেগুলো 'না'-শব্দযোগে যৌগিক ক্রিয়া ছিল।—'নাসিতোঁ' (না+আসিতোঁ), 'নাদে' (না+দেয়), প্রভৃতি।

(৩) **অপূর্ণাঙ্গ ক্রিয়া** (Defective verb)

এমন কিছু কিছু ক্রিয়াপদ প্রাচীনকালে ছিল এবং বর্তমান কালেও আছে, যাদের সাহায্যে ক্রিয়ার সর্বকালের রূপ প্রকাশ করা যায় না—এদের বলা হয় 'অপূর্ণাঙ্গ ক্রিয়া'। সংস্কৃতে—'দৃশ্' ধাতুর বর্তমান কালের (লট্) রূপ 'পশ্যতি', 'স্থা' ধাতুর রূপ 'তিষ্ঠতি'। মূল ধাতুরূপটির সঙ্গে সাধিত রূপের কোন সাদৃশ্য নেই। বস্তুতঃ মূলে উভয়ক্ষেত্রে দুই প্রস্থ ক্রিয়া ছিল, কোন কারণে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে এদের এক একটা রূপ লোপ পেয়ে যায়, ফলে একে অপরের সম্পূরক হয়ে উঠে ; একটির দ্বারা কোন কোন বিশেষ কালের এবং অপরটি দ্বারা অপর সমস্ত কালের ক্রিয়ারূপ প্রকাশিত হয়। সহায়ক ধাতুটিকে মূল ধাতুর 'পূরক ক্রিয়া' (Suppletive verb) নামে অভিহিত করা হয়। বাঙলা ভাষাতেও এরূপ কয়েকটি অপূর্ণ ক্রিয়ার সন্ধান পাওয়া যায়—'আ, আছ্, বট্, গম্, যা, লহ্, নে।

আ—সংস্কৃত 'আ+যা' থেকে এর উদ্ভব। 'আ' ধাতু এবং 'আস্' ধাতু পরস্পর পরিপূরক। সাধারণ অতীতেই 'আ'-র ব্যবহার সীমাবদ্ধ, অপর সমস্ত কালে 'আস্' তৎস্থলবর্তী হয়। মধ্যযুগের বাঙলায় এর বহুল ব্যবহার ছিল, কিন্তু আধুনিক কালে অনেকটা সীমাবদ্ধতা এসে গেছে। এখন শুধু অতীতে এবং অনুজ্ঞায় এর ব্যবহার রয়েছে—'এলো' (<আইল), আয়'। আঞ্চলিক উপভাষায় অবশ্য তিনকালেই এর ব্যবহার পাওয়া যায়—'আইএ, আইল, আইবো, আইলে, আইয়া' প্রভৃতি।

'**আছ্**—'অস্' ধাতু থেকে সৃষ্ট (<*অচ্ছতি), 'আছ্'-ধাতুর যথার্থ প্রয়োগ শুধু বর্তমান কালেই সীমাবদ্ধ, অতীতকালে আদ্য 'আ-' লোপ পায়।—'আছে, আছি' কিন্তু 'ছিল, ছিলাম'। মধ্যযুগে সর্বকালেই এর প্রয়োগ ছিল। আঞ্চলিক বিভাষায় 'আছিল্, আছলাম্' প্রভৃতি রূপ অতীতে ব্যবহৃত হয়। অধুনা এর ভবিষ্যৎ কালের রূপ প্রকাশিত হয় 'থাক্/রহ' ধাতুর সাহায্যে—'আছি, ছিলাম, থাকবো/রইবো'।।

আস্—সং 'আ+বিশ্' থেকে উৎপন্ন। প্রাচীন বাঙলা, মধ্য বাঙলা এবং আধুনিক বাঙলায় এর ব্যবহার সুলভ। আধুনিক বাঙলা সাধুভাষায় সর্ববিধ কালে এর প্রয়োগ পাওয়া গেলেও শিষ্ট কথ্যভাষায় অতীতকালে এর ব্যবহার নেই. এর পূরক ক্রিয়া 'আ' ধাতু। 'আসিল' কিন্তু 'এলো', 'আসিলাম' কিন্তু 'এলাম'। উল্লেখযোগ্য যে বঙ্গালী উপভাষার কোন কোন বিভাষায় শুধু 'আ-' ধাতুরই ব্যবহার রয়েছে, 'আস্-' নেই।

বট্—'বৃৎ'-জাত 'বট্' ধাতুর প্রয়োগ শুধু বর্তমান কালেই সীমাবদ্ধ। 'বট, বটে, বটেন'। (বিস্তৃত আলোচনা 'অস্ত্যর্থক ধাতু'-প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য)।

গ/গম্, যা—'গম্' বা 'গ' ধাতুটি, অধুনা শুধুই অতীত কাল এবং অসমাপিকা ক্রিয়ায় ব্যবহৃত হয়। গেল, গেলাম, গিয়া, গেলে'। 'যা' ধাতুটি এর সম্পূরক, বর্তমান কাল, ভবিষ্যৎ কাল এবং কখন কখন অসমাপিকা ক্রিয়ায়ও ব্যবহৃত হয়।—'যাই, যাচ্ছো, যাবেন, যাইয়া/যেয়ে, যাইতে/যেতে'।

লহ, নে—সংস্কৃত 'লভ্'-জাত 'লহ্' এবং 'নী'-জাত 'নে' ধাতুও এক অর্থে পরস্পরের সম্পূরক। তবে 'নে' ধাতুটির উৎপত্তি-বিষয়ে ভিন্নমতও রয়েছে। আচার্য সুনীতিকুমার মনে করেন * লেতি>প্রা 'লেই' আঞ্চলিক প্রভাবে অথবা/এবং 'নী' ধাতুর প্রভাবে 'নেই' হ'য়ে থাকতে পারে এবং এ থেকেই বাঙলার 'নে' ধাতু এসেছে। কালের দিক থেকে এদের কোন অপূর্ণতা নেই। 'লহ্' ধাতু শুধু সাধুভাষায় এবং 'নে' শুধু চলিত ভাষায় অর্থাৎ শিষ্ট কথ্যভাষায় ব্যবহৃত হয়,—এদের অপূর্ণতা এইদিক থেকে।

এ ছাড়াও বাঙলা ভাষায় প্রাচীন ও মধ্যযুগের অতীতকালে কতকগুলি ক্রিয়াপদের বিশেষরূপ প্রচলিত ছিল—'করিল→কৈল, মরিল→মৈল, বলিল→বুইল, শুইল→শুতিল' প্রভৃতি—এগুলি এখন আর প্রচলিত নেই।

[তিন] বাচ্য (Voice)

বাক্যস্থ ক্রিয়াটি কর্মের অনুগামী অথবা স্বয়ংপ্রধান—ক্রিয়ার যে রূপভেদের দ্বারা তা' নির্ণীত হয়, তাকে বলা হয় ক্রিয়ার 'বাচ্য'। বাচ্য চার প্রকার ঃ—(ক) কর্তৃবাচ্য, (খ) কর্মবাচ্য, (গ) ভাববাচ্য, (ঘ) কর্মকর্তৃবাচ্য।

(ক) কর্তৃবাচ্য (Active Voice)—ক্রিয়াটি কর্তার অনুগামী হ'লে তাকে কর্তৃবাচ্যের ক্রিয়া বলা হয়।—'রাম চাঁদ দেখেছে', 'বাঘ ছাগলটাকে মারলে', 'আমি বাড়ি যাচ্ছি'।

(খ) কর্ম-ভাববাচ্য—সাধারণতঃ বাক্যস্থ ক্রিয়াটি কর্তার অধীন থাকে; কিন্তু কোন কোন বাক্যে তার বিপরীত ক্রমও ঘটতে পারে ; যেমন—বাক্যের ক্রিয়াটি যখন

কর্মের অধীন হয়, তখন 'কর্মবাচ্য', আর যখন বাক্যে ক্রিয়াই কর্তৃত্ব করে তখন 'ভাববাচ্য' হয়—উভয়ক্ষেত্রেই একটি সাধারণ লক্ষণ এই যে এরূপ বাক্যে কর্তার প্রাধান্য থাকে না। আবার সাধারণতঃ সকর্মক ক্রিয়াই কর্মবাচ্যে এবং অকর্মক ক্রিয়াই ভাববাচ্যে রূপান্তরিত হলেও বাঙলায় সকর্মক ক্রিয়াও ভাববাচ্যে রূপান্তরিত হ'তে পারে। এই সমস্ত কারণে অনেকেই এই উভয় বাচ্যকে একত্রে 'কর্ম-ভাববাচ্য'-রূপে অভিহিত করে থাকেন। ইংরেজি Passive Voice-ও তাই। ক্রিয়াপদের গঠনের দিক থেকে উভয়ের মধ্যে সাধর্ম্য থাকায় এদের যুক্ত পরিচয়ও আপত্তিকর নয়।

(গ) কর্মবাচ্য (Passive Voice)—যেখানে কর্তার প্রাধান্য কমে যায় এবং ক্রিয়াটি কর্মের অনুগামী হয়, সেখানে 'কর্মবাচ্যের ক্রিয়া' হয়। একমাত্র সকর্মক ক্রিয়াই কর্মবাচ্যে রূপান্তরিত হয়। বাঙলা সাধুভাষায় কর্তৃবাচ্যকে পরিবর্তিত করতে হ'লে মূল কর্তাকে করণ কারকে এবং কর্মটিকে কর্তৃকারকে রূপান্তরিত করতে হয়।—'ব্যাঘ্র ছাগলটিকে হত্যা করিয়াছে'>'ছাগলটি ব্যাঘ্র-কর্তৃক নিহত হইয়াছে', 'আমি পুস্তকটি পাঠ করিয়াছি'>'আমা দ্বারা পুস্তকটি পঠিত হইয়াছে'। কর্তা-কর্ম ছাড়া ক্রিয়া-রূপেও কিছুটা পরিবর্তন সাধিত হয়। সংস্কৃত কর্মবাচ্যে সাধারণতঃ পরস্মৈপদ-স্থলে আত্মনেপদ ধাতু ব্যবহৃত হয়। প্রাকৃত স্তর থেকেই আত্মনেপদের ব্যবহার উঠে যায়। এ ছাড়াও একটা বিশেষ পরিবর্তন এই ঃ সংযোগমূলক ধাতুর ক্ষেত্রে ক্রিয়ার অব্যবহিত পূর্ববর্তী বিশেষ্য পদটি বিশেষণে পরিণত হয় ও ক্রিয়াপদটিও অনুযায়ী পরিবর্তিত হয়। যেমন, পূর্ববর্তী দৃষ্টান্তে—'হত্যা করিয়াছে>নিহত হইয়াছে', 'পাঠ করিয়াছি>পঠিত হইয়াছে'। ক্রিয়াপদটি সংযোগমূলক ধাতু না হ'লে তাকে সংযোগমূলক ধাতুতে রূপান্তরিত ক'রে অনুরূপ পরিবর্তন সাধন করতে হবে।—'আমি বাঘটিকে দেখিয়াছি>আমা দ্বারা বাঘটি দৃষ্ট হইয়াছে।' বাঙলা সাধুভাষায় যেভাবে কর্তৃবাচ্যকে কর্মবাচ্যে রূপান্তরিত করা হয়, তার পশ্চাতে নোতুনভাবে সংস্কৃতের এবং ইংরেজি ব্যাকরণের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

চলিত বাঙলা ভাষায় কর্মবাচ্যের বাগ্‌ভঙ্গীটি সাধুভাষা থেকে অনেকটাই পৃথক্ এবং স্বতন্ত্র। 'ছাগলটি ব্যাঘ্র-কর্তৃক নিহত হইয়াছে' স্থলে চলিত বাঙলায় 'ছাগলটি বাঘের হাতে মারা পড়েছে' এবং 'আমা-দ্বারা পুস্তকটি পঠিত হইয়াছে'-স্থলে 'পুস্তকটি আমার পড়া হয়েছে'—এই ধরনের বাগ্‌রীতি প্রযুক্ত হয়ে থাকে।

বাঙলায় কর্মবাচ্য-গঠনে সাধারণতঃ তিনটি উপায় গৃহীত হয়। (১ প্রত্যয়-যোগে 'প্রাত্যয়িক কর্মবাচ্য' (Inflected passive); (২) যৌগিক ক্রিয়া দ্বারা 'যৌগিক কর্মবাচ্য' (Periphrastic passive); (৩) প্রযোজক ক্রিয়ার সাহায্যে।

(খ) প্রত্যয়যোগে 'প্রাত্যয়িক কর্মবাচ্য' (Inflected passive) ঃ

প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষায় তথা সংস্কৃতে প্রত্যয়-যোগে নিষ্পন্ন কর্মবাচ্যের পদ ধ্বংসাবশিষ্ট-রূপে পশ্চিমাঞ্চলে কোনরকম টিঁকে থাকলেও বাঙলায় তার আর চিহ্ন নেই। বাঙলায় নোতুনভাবে প্রত্যয়-যোগে কর্ম-ভাববাচ্যের পদ গঠন করা হয়।

আধুনিক বাঙলার যে সমস্ত ক্ষেত্রে কর্তৃবাচ্যের প্রয়োগ লক্ষিত হয়, সেই সমস্ত ক্ষেত্রেও অনেক সময় সংস্কৃত কর্মবাচ্যের বিবর্তিত রূপটিকে খুঁজে পাওয়া যায়।— 'ছাগলে ঘাস খায়' বাক্যটি বাঙলায় সুস্পষ্টভাবেই কর্তৃবাচ্যাধীন ; পূর্ববর্তী স্তরে এর রূপ ছিল 'ছাগলে ঁ ঘাস খাইঅ' এবং সংস্কৃতে 'ছাগলেন ঘাসঃ খাদিতঃ'—স্পষ্টতঃই কর্মবাচ্যের রূপ। 'আমাদের দ্বারা কৃত (করা) হয়'-এর সংস্কৃত 'অস্মাভিঃ ক্রিয়তে (=*কর্যতে)' থেকে পর্যায়ক্রমে 'অম্হাহি করিঅই>আহ্মে করিঅই>আহ্মে করিএ>আমি করি'-ইত্যাদি রূপে বিবর্তিত হয়েছে।

সংস্কৃতে আত্মনেপদ ধাতুতে যে '-য়-' বিকরণ যুক্ত হ'তো ('ক্রিয়তাম্'>) প্রাকৃত স্তরে তা'—'ইয়, -ইয্য>ইজ্জ, ঈয়>ঈঅ, -ইঅ' প্রভৃতি রূপে বিবর্তিত হয়। তারি রেশ ভারতীয় কোন কোন ভাষায় পাওয়া যায়, প্রাচীন এবং মধ্যস্তরের বাঙলা ভাষায়ও এরূপ বহু প্রয়োগের সন্ধান মেলে। —'-হরিণার খুর ন দীসঅ' (=দৃশ্যতে), 'ক্ষুরের উপর রাধার বসতি, নড়িতে কাটিয়ে (=কর্তিত হয়) দেহ', 'পুণ্য বইলে স্বর্গে জাইয়ে' (=যাওয়া যায়)। একটি পুরাতন শুভঙ্করের আর্যায় কর্মবাচ্যের প্রাচীন রূপের দেখা পাওয়া যায়—'কুড়বা কুড়বা কুড়বা লিজ্জে' (=কুড়ায় কুড়ায় কুড়া লইতে হয়)। হিন্দিতে 'লিজিয়ে' 'চাহিয়ে' প্রভৃতি শব্দে কর্মবাচ্যের রূপটি বর্তমান। বাঙলায় 'কি চাও' কর্তৃবাচ্যের রূপ (<চাইএ<চাহিয়ে) কর্মবাচ্যে 'কি চাই'—এর মধ্যে '-ইয়ে' বা -'ই-' কর্মবাচ্যের রূপটি লুক্কায়িত আছে।

মধ্যযুগে '-ইএ-' যুক্ত পদ যথেষ্টই পাওয়া যায়।—'মানুষে এমন প্রেম কভু না শুনিএ', 'ধার্মিক গণিএ শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ ভিতর'। কর্মকর্তৃবাচ্যের '-ইএ>-এ' বিভক্তির প্রয়োগও মধ্যযুগে দুর্লভ নয়।—'পোড়এ শরীর মোর'। আধুনিক বাঙলার কর্তৃবাচ্যের রূপ অনেক ক্ষেত্রেই প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার কর্মবাচ্যের বিবর্তনে এসেছে। যেমন, সং 'অস্মাভিঃ ক্রিয়তে>অম্হেহি করীঅই>আহ্মে করিঅই>আহ্মে করিএ/ করী>আমি করি।' প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাঙলা পর্যন্ত কর্মবাচ্যের চিহ্ন বর্তমান ছিল, আধুনিক কালে লোপ পেয়েছে। তবে ক্বচিৎ চলিত ভাষায়ও কোন কোন বিভাষায় ধ্বংসাবশেষ রূপে সামান্য চিহ্ন বর্তমান রয়েছে। 'যেমন—'মিছে কথা বলে না', 'খালি পেটে চা খায় না।'

কর্মকর্তৃবাচ্যের পদের গঠন কর্তৃবাচ্যের মতো হ'লেও অর্থের দিক থেকে এগুলি

কর্মবাচ্যেরই এবং ক্রিয়াটিও কর্মবাচ্যের রূপ থেকেই জাত।—'শাঁখ বাজে' (<বাজিঅ <বাজিঅই<বাদ্যতে), 'বাঁশ ভাঙে'।

(খ) **যৌগিক কর্মবাচ্য** (Periphrastic passive)

যৌগিক কর্মভাব-বাচ্যের পদ-সাধনে সাধারণতঃ ত্রিবিধ উপায় অবলম্বিত হ'তে পারে।

(১) বাক্যটি যদি যথার্থ কর্মবাচ্যের হয় অর্থাৎ কর্তৃবাচ্যে যেটি কর্ম ছিল, সেটি যদি এখানে কর্তা (উক্তকর্ম) হ'য়ে দাঁড়ায়, তবে তাতে কোন বিভক্তিচিহ্ন যুক্ত হয় না এবং মূল ক্রিয়াটি হয় সহায়ক ধাতুযুক্ত কৃদন্ত বিশেষণ। এছাড়া ক্রিয়াপদটি অকর্তৃক হ'তে পারে এবং (২) উক্ত কর্মে যুক্ত হ'তে পারে দ্বিতীয়া / চতুর্থী বিভক্তি অথবা (৩) ষষ্ঠী বিভক্তি। উভয় ক্ষেত্রে সহায়ক ধাতুর- সঙ্গে যুক্ত হয় ভাব-বচন। দৃষ্টান্ত—(১) 'এখান থেকে তুমি দেখা যাচ্ছ (দৃষ্ট হচ্ছ)'। (২) 'এখান থেকে তোমাকে দেখা যায়'। (৩) 'এবার আমাদের উঠতে হয়' (—এটি এখনও বজায় আছে)।

বাঙলায় যৌগিক কর্মবাচ্যের দিকেও যথেষ্ট প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। সাধারণতঃ 'যা>জা' ধাতুর যোগে এই কর্মবাচ্যের পদ গঠন করা হয়।—'দুলি পিঠা ধরণ ন জাই', 'ললাটে লিখিত খণ্ডন ন জাএ', 'প্রাণ যেহ্ন ফুটি জাএ বুক মেলে চীর'। আধুনিক কালেও এমন প্রয়োগ সুলভ—'কহা যায়, বলা যায়, ধরা যায়'। বঙ্গালীতে প্রাচীন রূপটি—'কহন যায়, ধরণ যায়' প্রভৃতি বজায় আছে। জা-ধাতুর আগম-সম্বন্ধে অন্য একটি সূত্র কল্পনা করা যায়—'আমাদ্বারা ইহা করা হইবে' এই কর্ম-বাচ্যের রূপটি সংস্কৃতে 'এতৎ/ইদং ময়া করণীয়ম্' হতে পারে। 'করণীয়ম্' প্রাকৃতে 'করণিজ্জ' এবং তা থেকে 'করণ জায়' সহজেই আসতে পারে। এই সম্ভাবনার কথাটি প্রথম উল্লেখ করেন বীমস্। তবে এই সূত্রের সাহায্যে যা-(>জা) ধাতু-যুক্ত যৌগিক কর্মবাচ্যের ব্যাখ্যা সম্ভবপর হ'লেও অপর সহায়ক ধাতুগুলি অব্যাখ্যাত থেকে যায়।

(গ) **প্রযোজক ধাতুর সাহায্যে**

সংস্কৃত প্রযোজক ধাতুর 'আপয়'>'-আ' প্রত্যয়টির যোগে বাঙলায় কর্মবাচ্যের পদ গঠন করা হয়। মধ্যযুগেও এজাতীয় ব্যবহার সুলভ ছিল—'যেহ্ন না ছাড়াএ ঘোল'। আধুনিক বাঙলায়ও এরূপ প্রয়োগের অভাব নেই। 'কথাটা এখানে মানায় না, কটু শোনায়', 'এতে দোষ খণ্ডায় না', 'যত পরখায়, তত দোষ ধরা পড়ে', 'কান বেঁধায়' প্রভৃতি।

(২) **ভাববাচ্য** (Neuter/Impersonal Voice)

যেখানে কর্তা বা কর্মের পরিবর্তে ক্রিয়াই প্রাধান্য লাভ করে, বস্তুতঃ ক্রিয়াটিই

যেন কর্তৃত্ব লাভ করে, সেখানে 'ভাববাচ্যের ক্রিয়া' হয়। ভাববাচ্যের ক্রিয়াটি অকর্তৃক। 'আপনি কোথায় যাচ্ছেন' < 'আপনার কোথায় যাওয়া হচ্ছে'—'যাওয়া' ক্রিয়াটাই যেন 'হচ্ছে' ক্রিয়ায় কর্তার স্থান অধিকার ক'রেছে, আর মূল কর্তা 'আপনি' সম্বন্ধ পদে পরিণত হ'লেও কোন কোন ক্ষেত্রে '-কে'-যোগে তার রূপান্তর ঘটানো হয়। —'আমি যাব' > 'আমাকে যেতে হ'বে'।

সাধারণতঃ অকর্মক ক্রিয়াকে অবলম্বন করেই ভাববাচ্যের বাক্য গঠিত হয়, কিন্তু কখন কখন সকর্মক ক্রিয়ার ক্ষেত্রেও ভাববাচ্যের রূপ দেখা যায়।—'মহাশয় কী করেন' > মহাশয়ের কী করা হয়', 'দূর থেকে চাঁদকে ছোট দেখি' (কর্তৃবাচ্য) > 'দূর থেকে চাঁদ ছোট দেখায়' (কর্মবাচ্য) > দূরে থেকে চাঁদকে ছোট দেখায়' (ভাববাচ্য)। এখানে কর্মবাচ্য এবং ভাববাচ্যের রূপগত পার্থক্যটি স্পষ্ট হ'য়ে উঠেছে। কর্মবাচ্যে বিভক্তি চিহ্নবিহীন একটি কর্তা (উক্ত কর্ম) থাকে, কিন্তু ভাববাচ্যে তার সঙ্গে দ্বিতীয় বা ষষ্ঠী বিভক্তির চিহ্ন যুক্ত হয়।

বাঙলা ভাষায় ভাববাচ্য প্রয়োগের একটি বিশেষ ক্ষেত্র—ক্রিয়ায় মধ্যমপুরুষের ব্যবহার পরিহার করা।—মধ্যমপুরুষ সম্ভ্রমাত্মক 'আপনি', সাধারণ 'তুমি' কিংবা অন্তরঙ্গ/তুচ্ছার্থক 'তুই' ব্যবহারের ক্ষেত্র-সম্বন্ধে মনে যখন দ্বিধা জাগে, তখনই ভাববাচ্যের ব্যবহার—'কোথায় যাওয়া হ'বে, কোথায় থাকা হয়, কী করা হয়, ভালো দেখা যাচ্ছে তো' প্রভৃতি।

(ঘ) **কর্ম-কর্তৃবাচ্য** (Quasi-Passive Voice/Middle Voice)

যেখানে ক্রিয়ার প্রকৃত কর্তার সন্ধান পাওয়া যায় না, কর্মই নিজের উপর ক্রিয়া করে, সে ক্ষেত্রে 'কর্মকর্তৃবাচ্য' হয়।—'ঘরে ঘরে শাঁখ বেজে উঠলো'—মনে হয়, এখানে 'শাঁখ'ই বুঝি ক্রিয়ায় কর্তা, কিন্তু শাঁখ তো নিজে বাজে না, অপর কেউ তাকে বাজায়, তাই এখানে কর্ম-কর্তৃবাচ্য হ'লো।—'শীত করে', 'ঠাঁস ঠাঁস ভাঙ্গিতেছে বাগানের বাঁশ', 'বাজারে অনেক বই কেটেছে', 'কাপড়টা ছিঁড়ে গেছে', 'এ কাজ তোমার মানায়', 'কথায় কথায় সময় কাটে'।

কর্মকর্তৃবাচ্যের ক্রিয়াগুলি উদ্ভূত হ'য়েছে কর্মবাচ্যের '-য়-' বিকরণ-যুক্ত ক্রিয়াপদগুলি থেকে। তাই ক্রিয়ারূপে একটা ঐক্য অনুভব করা যায়।—'বাজে < বাজিএ < বাজিঅই < বাদ্যতে', 'করে < করিএ < করিঅই < ক্রিয়াতে'।

[চার] ক্রিয়ার পুরুষ-বচন-লিঙ্গ

নাম শব্দের (বিশেষ্য এবং সর্বনাম) মতই ক্রিয়াও রূপগ্রহ অর্থাৎ বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন বিভক্তি গ্রহণ ক'রে থাকে। কাজেই পুরুষ-বচন-লিঙ্গ-ভেদে ক্রিয়াপদের

রূপান্তর স্বাভাবিক। বস্তুতঃ পৃথিবীর বহু ভাষাতেই এরূপ পরিবর্তন লক্ষিত হ'য়ে থাকে বলেই ক্রিয়ার সঙ্গে পুরুষ, বচন এবং লিঙ্গের আলোচনা প্রয়োজন।

(ক) **পুরুষ** (Person)—পৃথিবীর প্রধান প্রধান সব ভাষাতেই পুরুষ-ভেদে ক্রিয়ায় রূপভেদ ঘটে। সংস্কৃত, ইংরেজী, হিন্দী, বাঙলা—সব ভাষাতেই ক্রিয়ার পুরুষ-অনুযায়ী রূপের পরিবর্তন ঘটে। সংস্কৃতে উত্তমপুরুষ, মধ্যমপুরুষ ও নামপুরুষ বা প্রথমপুরুষ—এই ত্রিবিধ পুরুষে ত্রিবিধ রূপ। ইংরেজিতে এই তিনটির সঙ্গে মধ্যমপুরুষের একটি অন্তরঙ্গ/সম্ভ্রমাত্মক/তুচ্ছার্থক রূপান্তর আছে (thou, thy), তবে একালে তার ব্যবহার প্রায় নেই বল্লেই চলে। বাঙলায় (১) উত্তমপুরুষ, (২) মধ্যমপুরুষ সাধারণ, (৩) মাধ্যমপুরুষ অন্তরঙ্গ/তুচ্ছার্থক, (৪) প্রথমপুরুষ সাধারণ এবং (৫) মধ্যম ও প্রথমপুরুষ সম্ভ্রমাত্মক—এই পাঁচপ্রকার ক্রিয়ারূপ। তবে সর্বনাম পদে মধ্যমপুরুষ সম্ভ্রমাত্মক এবং প্রথমপুরুষ সম্ভ্রমাত্মক পৃথক পৃথক আকৃতি ('আপনি/তিনি গিয়াছিলেন')। অতএব ক্রিয়ায় প্রতি পর্যায়ে (কালগত ও ভাবগত) পুরুষ-অনুযায়ী পাঁচপ্রকার রূপভেদ দেখা যায়। -'আমি যাই, তুমি যাও, তুই যাস্, সে যায়, আপনি/তিনি যান'।

(খ) **বচন** (Number)—পৃথিবীর প্রায় সব ভাষাতেই বচন-অনুযায়ী ক্রিয়ার রূপান্তর ঘটে। সংস্কৃতে তিনটি বচন-হেতু রূপান্তরও ত্রিবিধ—'আমি যাই—অহং গচ্ছামি, আমরা দুজন যাই—আবাং গচ্ছাবঃ, আমরা যাই—বয়ং গচ্ছামঃ'। ইংরেজিতেও কোন কোন ক্ষেত্রে ক্রিয়ার দ্বিবিধ বচন—'আমি যাই—I go, আমরা যাই—we go' —এখানে ক্রিয়ার রূপান্তর নেই, কিন্তু 'সে যায়—He goes, তারা যায়—They go'—রূপান্তর ঘটেছে। হিন্দীতেও ক্রিয়ার একবচন, বহুবচন আছে এবং তা' কঠোরভাবে মানতে হয়। কিন্তু আধুনিক বাঙলায় বচন-ভেদে রূপভেদে হয় না।—'আমি যাই, আমরা যাই ; তুমি যাও ; তোমরা যাও ; সে যায়, তারা যায়।' কিন্তু প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাঙলায় ক্রিয়াপদেও বচন-অনুযায়ী রূপের পরিবর্তন ঘটতো।—উত্তমপুরুষের একবচনে হ'লো—'ডোম্বী তো পুছমি সদভাবে' (বিভক্তিচিহ্ন 'মি') ; বহুবচনে—'করুণা পিহাড়ি খেলহু নয় বল' (=বিভক্তিচিহ্ন 'হু')। চর্যাপদে আরও পাই—মধ্যমপুরুষ একবচনে 'জাসি, বুঝসি' বহুবচনে 'ধরহু' ; প্রথমপুরুষ একবচনে 'ভণই,'জাঅ, বাজএ, বহুবচনে 'কহান্তি, বোলথি'। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনেও বচন-ভেদে রূপভেদ লক্ষিত হয়।—প্রথমপুরুষে 'করএ, করে', আবার 'করন্তি, করন্তে', 'কইল, করিল, করিলে' তার সঙ্গে আবার করিলান্ত, করিলেন্ত' প্রভৃতি।

(গ) **লিঙ্গ (Gender)**—লিঙ্গভেদে ক্রিয়ার রূপভেদ সংস্কৃতে নেই, ইংরেজিতেও নেই। প্রাচীন এবং মধ্যযুগের বাঙলায় বিশেষভাবে অতীতকালের পদে এবং হিন্দী ভাষায় আধুনিক কালেও লিঙ্গভেদে রূপভেদ লক্ষ্য করা যায়। চর্যাপদে '**লাগেলি** আগি', 'সোনে **ভরিলী** করুণা নাবী', 'রাতি পোহাইলী' এবং শ্রীকৃষ্ণকীর্তনেও 'রাধা ঘর **গেলি**', '**উত্তরলী হইলী** রাহী বাঁসীর নাদে'। সংস্কৃত এবং প্রাকৃতে ক্রিয়ার লিঙ্গ-ভেদ নেই, অথচ প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাঙলায় তা' বর্তমান, এটিকে আপাত-সমস্যা বলে মনে হয়। সমস্যাটির সমাধান নিম্নোক্তক্রমে সম্ভব।—ক্রিয়ার ভাব প্রকাশের জন্য সংস্কৃতে অনেকসময় কৃদন্ত বিশেষণ পদের ব্যবহার হ'তো এবং বিশেষণ বলেই তাতে লিঙ্গান্তরও হ'তো।—'সে গেল'—'স গতঃ, সা গতা'। এই কৃদন্ত বিশেষণ থেকে বাঙলা অতীতকালের ক্রিয়ারূপের সৃষ্টি হয়েছে বলেই, ক্রিয়ার বিশেষণের বৈশিষ্ট্য আরোপিত হয়। অতীতকালের এইরূপ কৃদন্ত পদ সম্ভবতঃ তখনো বিশেষণরূপেই বিবেচিত হ'তো—'সোনে ভরিলী করুণা নাবী'=সোনায় ভর্তি করুণা নৌকা'—এই-ভাবে ব্যাখ্যা করলেই সমস্যাটির সহজ সমাধান সম্ভব। মধ্যযুগের বাঙলায়—'গেলা কামিনী গজেন্দ্র-গামিনী'। আধুনিক বাঙলাতেও অতীতকালের ক্রিয়াপদকে বিশেষণ-রূপে ব্যবহারের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়—'গেল বছর জমিতে ধান হয়নি।' তবে আধুনিক কালে ক্রিয়ারূপে লিঙ্গ-অনুযায়ী কোন পরিবর্তন ঘটে না।

[পাঁচ] ক্রিয়ার ভাব (Mood) ও কাল (Tense)

ক্রিয়াপদের বর্ণিত কার্য ঘটনার প্রকার, ভাব বা রীতির বোধ জন্মে যে উপায়ে, তাকেই বলা হয় 'ভাব-প্রদর্শক প্রকার' বা 'ভাব'। ইংরেজি ব্যাকরণের 'Mood' শব্দটির প্রতিশব্দ-রূপে রামমোহন রায় প্রথম তাঁর 'গৌড়ীয় ভাষার ব্যাকরণের প্রকার' শব্দটি গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু ক্রিয়ার প্রকার বলতে 'সমাপিকা-অসমাপিকা' কিংবা 'সকর্মক-অকর্মক'-আদি নানা বিষয়কেই বুঝিয়ে থাকে বলে 'প্রকার' শব্দের পরিবর্তে 'ভাব' শব্দটিই সাধারণতঃ ব্যবহার করা হয়। সংস্কৃত ব্যাকরণে কালের সঙ্গে ভাব অভিন্নভাবে জড়িত, ভাব-সম্বন্ধে পৃথক আলোচনা নেই।

মহামুনি পাণিনি ক্রিয়াবিভক্তিগুলোকে দশটা স্তবকে বিভক্ত করেছেন; প্রতি স্তবকে তিন পুরুষ ও তিন বচন ভেদে ন'টি ক'রে বিভক্তি-রূপ আছে। তিনি ঐ স্তবক-গুলোর নাম দিয়েছেন 'ল'কার। কাল এবং ভাব—উভয়কে নিয়েই 'ল'-কার গঠিত; এদের সংখ্যা দশ: ১. লট্ (Present indefinite), ২. লোট্ (Imperative), ৩. লঙ্ (Past), ৪. লিঙ্ (Potential and benedictive), ৫. লৃট্ (Second future), ৬. লৃঙ্ (Conditional), ৭. লুট্ (First future),

৮. লিট্ (Perfect or second past), ৯. লুঙ্ (Aorist), ১০. লেট্ (Subjunctive)। এদের মধ্যে 'লেট্' শুধু বৈদিক সংস্কৃতেই ব্যবহৃত হ'তো, পরে সংস্কৃতে পরিত্যক্ত হয়েছে। এদিকে বিদ্যাসাগর মহাশয় আবার 'লিঙ্'-কে 'বিধিলিঙ্' ও 'আশীর্লিঙ্' এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করায় 'ল'-কারের সংখ্যা মোট দশটিই রয়ে গেল।

এ থেকে আমরা সংস্কৃতে মোটামুটি পাঁচটি ভাব পাচ্ছি—নির্দেশক বা অবধারক, অনুজ্ঞা, নির্বন্ধ, অভিপ্রায় ও সম্ভাবক ; কাল পাচ্ছি ছয়টি—একটি বর্তমান (লট্) তিনটি অতীত (অসম্পন্ন/লঙ্,অনির্দিষ্ট/লুঙ্,সম্পন্ন/লিট্), একটি ভবিষ্যৎ (লৃট্) এবং একটি সম্ভাব্য অতীত (লৃঙ্)। এছাড়া ভবিষ্যতের 'লুট্' পরবর্তীকালে লুপ্ত হ'য়ে যায়। কালের এই সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ বাদ দিলে আমরা সংস্কৃতে মোটাদাগের কাল পাই তিনটি—অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ। প্রাকৃতের প্রথম স্তরে তিনটি কালই প্রচলিত ছিল, কিন্তু অপভ্রংশ স্তরে প্রাচীন কালগুলোর মধ্যে বর্তমান রইলো শুধু 'বর্তমান' আর 'ভবিষ্যৎ'—এই দুটি কাল। নোতুনভাবে 'অতীত কাল'-এর সৃষ্টি হ'লো প্রাকৃতের দ্বিতীয় স্তরে অর্থাৎ অপভ্রংশে। বাঙলা ভাষায় প্রাচীন, 'ভবিষ্যৎ কাল'ও লুপ্ত হ'লো, অবশিষ্ট রইলো শুধু 'বর্তমান কাল'। বাঙলা ভাষায় 'অতীত কাল' এবং 'ভবিষ্যৎ কাল' আবার নোতুন ক'রে সৃষ্টি করে নিতে হ'লো। ভাবের দিক্ থেকেও দেখা যায় যে সংস্কৃতের এই বৈচিত্র্য প্রাকৃতে ছিল না—সেখানে ছিল শুধু 'অবধারক' বা 'নির্দেশক', 'অনুজ্ঞা' এবং 'সম্ভাবক'। বাঙলাতে 'সম্ভাবক'ও লোপ পাওয়াতে অবশিষ্ট রইলো শুধু 'নির্দেশক' ও 'অনুজ্ঞা'।

অতএব স্থূল-বিচারে বাঙলায় কাল চারটি—অতীতকাল (Past Tense), বর্তমানকাল (Present Tense), নিত্যবৃত্ত (Habitual Present and Conditional) ও ভবিষ্যৎকাল (Future Tense)। 'নিত্যবৃত্ত' বাঙলায় নোতুন যুক্ত হয়েছে। ভাব দুইটি—নির্দেশক (Indicative) ও অনুজ্ঞা (Imperative)। চারটি কালেরই নির্দেশক রূপ বর্তমান ; বর্তমানকাল ও ভবিষ্যৎকালে অনুজ্ঞা ভাবও বর্তমান। এছাড়া কতকগুলি যৌগিক কালও কালে কালে বাঙলায় উদ্ভূত হ'য়েছে।

বাঙলার ক্রিয়াপদের কালকে উৎপত্তি ও আকৃতির দিক্ থেকে প্রধান দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা চলে ঃ—(ক) একপদী বা মৌলিক কাল, (খ) বহুপদী বা যৌগিক কাল।

(ক) একপদী/মৌলিক কাল (Simple Tenses)—সংস্কৃত থেকে প্রাকৃতের মাধ্যমে যে ক্রিয়াপদগুলো বাঙলায় এসেছে, তাদের বলা হয় মৌলিক কাল। মৌলিক কালের জন্য ক্রিয়াধাতুর সঙ্গে সরাসরি প্রত্যয়-বিভক্তি যোগ করলেই চলে, পৃথক্ কোন

ধাতুর সহায়তা আবশ্যক হয় না। একপদী এই মৌলিক কালকে আবার দু'ভাগে বিভক্ত করা হয়,—(১) শুদ্ধ মৌলিক কাল, (২) কৃদন্ত কাল।

(১) **শুদ্ধ মৌলিক কাল 'তিঙন্ত'/'প্রাত্যয়িক কাল'** (Radical Tenses)—বাঙলায় যে সকল ক্রিয়ারূপ সংস্কৃত সমাপিকা ক্রিয়াপদ থেকে আগত, তাদের বলা হয় 'শুদ্ধ মৌলিক কাল'। এর সঙ্গে শুধু ক্রিয়া-বিভক্তি যোগ করলেই বাঙলা পদ সাধিত হয়। কর্+ই=করি, যা+ও=যাও। (অ) নির্দেশক বর্তমান, (আ) বর্তমান অনুজ্ঞা এবং (ই) ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞা—এই তিনটি কাল শুদ্ধ মৌলিক বলে বিবেচিত হয়। এগুলো যথাক্রমে সংস্কৃত 'লট্ ও লোট্' থেকে এসেছে।

(২) **কৃদন্ত কাল** (Participle Tenses)—যে সকল ক্রিয়া-রূপ সংস্কৃত কৃদন্ত (কৃৎ-প্রত্যয় যুক্ত) পদ থেকে প্রাকৃত মাধ্যমে বাঙলায় এসেছে, তাদের বলা হয় 'কৃদন্ত কাল'। এরূপ ধাতুগুলোর সঙ্গে প্রথমে কালবাচক প্রত্যয় ('-ইল, -ইত, -ইব') যুক্ত হয় এবং পরে এর সঙ্গে আবার পুরুষ-বাচক বিভক্তি যোগ করে পদ সাধন করতে হয়। বাঙলায় কৃদন্ত কাল তিনটি—(ঈ) নির্দেশক অতীত, (উ) নির্দেশক ভবিষ্যৎ ও (ঊ) নির্দেশক নিত্যবৃত্ত।

(খ) **বহুপদী যৌগিক কাল** (Compound Tense)—দুই বা ততোধিক ধাতুমূলের সমবায়ে গঠিত ক্রিয়াপদ যদি কোন বিশিষ্ট কালের বোধ জন্মায়, তবে সেই কালকে 'যৌগিক কাল' বলা হয়। যৌগিক কালের ক্রিয়াপদে দুটি অংশ। প্রথম অংশে ধাতুমূলের সঙ্গে '-ইয়া' বা '-ইতে' যুক্ত অসমাপিক হয় এবং পরের অংশে থাকে 'আছ্-' ধাতুর কোন রূপ। এই দুটি অংশ পৃথক্ পৃথক্ অবস্থান করে না, ঘনসন্নিবদ্ধ হয় (অনেকটা সন্ধিবন্ধনের মত) থাকে এবং এ দুয়ের মধ্যে কোন ফাঁক থাকে না।—কর্+ইয়া+আছে=করিয়াছে, 'কর+ইতে+(আ) ছিল'=করিতেছিল। অবশ্য ধ্বনিপরিবর্তনের স্বাভাবিক নিয়মে এদের মধ্যে যে পরিবর্তন ঘটে, সেই পরিবর্তিত রূপই শিষ্ট চলতি ভাষায় এবং বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষায় প্রচলিত। করিয়াছে>করেছে, করছে; করিতেছিল>করছিল, করতেছিল, করত্যাছিল(করতে আছিল্)।

যৌগিক কাল ও যৌগিক ক্রিয়ার পার্থক্য—(পূর্বে আলোচিত 'যৌগিক কাল' এবং 'যৌগিক ক্রিয়া' দ্রষ্টব্য)। যৌগিক কালের সঙ্গে যৌগিক ক্রিয়ার পার্থক্য-সম্বন্ধে অবহিত থাকা প্রয়োজন। উভয় ক্ষেত্রেই দুটি ক্রিয়া বর্তমান, প্রথমটি অসমাপিকা, পরেরটি সমাপিকা। যৌগিক কালে এই উভয় অংশ একসঙ্গে যুক্ত থাকে এবং তাদের মধ্যে অনেক সময় ধ্বনিতাত্ত্বিক পরিবর্তন দেখা যায়,—এখানে অসমাপিকা ক্রিয়ার অর্থই প্রধান এবং পরবর্তী আছ্ ধাতুর সাহায্যে শুদ্ধ কালের বোধ জন্মায়। —'সে

বসিয়াছে'—এখানে ক্রিয়া 'বসার' অর্থই প্রধান। কিন্তু যৌগিক ক্রিয়ায় উভয় অংশই পৃথক্ পৃথক্ অবস্থান করে এবং 'আছ্' ধাতুর অর্থই প্রাধান্য লাভ করে।—সে বসিয়া আছে—এখানে 'আছে'-র অর্থ প্রধান, 'বসিয়া'-দ্বারা শুধু অবস্থাটা বোঝানো হচ্ছে।

যৌগিক কালের প্রথমাংশ '-ইয়া-' যুক্ত হলে তা পুরাঘটিত কাল এবং 'ইতে'-যুক্ত হলে ঘটমান কাল বুঝিয়ে থাকে। পরের অংশে অতীত ও বর্তমান কালে '(আ)ছ' ধাতু এবং নিত্যবৃত্ত ও ভবিষ্যৎকালে 'থাক্' ধাতুর প্রয়োগ হয়। এদের যোগাযোগে নিম্নোক্ত যৌগিক কালগুলোর সৃষ্টি হয়েছে —(ঋ) পুরাঘটিত বর্তমান, (৯) পুরাঘটিত অতীত, (এ) পুরাঘটিত ভবিষ্যৎ, (ঐ) ঘটমান বর্তমান, (ও) ঘটমান অতীত, (ঔ) ঘটমান ভবিষ্যৎ।

[ছয়] বিভিন্ন কালের ক্রিয়া-বিভক্তি

ক্রিয়ার যে বিভিন্ন কালের কথা বলা হয়েছে তাদের পার্থক্য বোঝা যায় ক্রিয়া-বিভক্তির পার্থক্য থেকে। বিভক্তিগুলোর সাধুভাষায় যে আকৃতি দেখা যায়, ধ্বনি-পরিবর্তনের স্বাভাবিক কারণবশতঃই সেগুলো চলিত ভাষায় এবং বিভিন্ন উপভাষায় অবিকৃত থাকেনি। উপভাষায় তাদের রূপান্তর অতি বিচিত্র। স্থান-কাল-ভেদে যে সকল পার্থক্য ঘটেছে, তাদের সব দেখানো সম্ভব নয়। নিম্নে সাধুভাষা এবং চলিত ভাষার রূপগুলোই দেখানো হলো, বিশেষক্ষেত্রে কোন কোন উপভাষার রূপ প্রদর্শিত হলো।

(ক) **মৌলিক কাল** (Simple Tense)

মৌলিক কালগুলোর বিভক্তি চিহ্ন সংস্কৃত থেকে প্রাকৃত মাধ্যমে বাঙলা ভাষায় উপনীত হয়েছে। এদের কতকগুলো সরাসরি সংস্কৃত বিভক্তি থেকে এবং কতকগুলো সংস্কৃত কৃদন্ত পদ থেকে গঠিত হয়েছে। প্রথমোক্তটি 'তিঙন্ত/প্রাত্যয়িক' বা শুদ্ধ মৌলিক এবং পরেরটি 'কৃদন্ত কাল' নামে পরিচিত হয়।

(১) **তিঙন্ত/প্রাত্যয়িক শুদ্ধমৌলিক কাল** (Radical Tense) :

তিঙন্ত বা শুদ্ধ মৌলিক কালের মধ্যে পড়ছে নির্দেশকভাবে বর্তমান, অনুজ্ঞাভাবে বর্তমান এবং অনুজ্ঞাভাবে ভবিষ্যৎকাল। এছাড়াও প্রাচীন বাঙলায় কিছু কিছু নির্দেশক ভাবের ভবিষ্যৎকালে শুদ্ধ মৌলিক কালের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। শুদ্ধ মৌলিক কালের বিভক্তি চিহ্নগুলো সংস্কৃত থেকে বিবর্তিত আকারে বাঙলায় গৃহীত হয়েছে।

(অ) **নির্দেশকভাবে বর্তমান** (Present Indicative)—**সংস্কৃত 'লট্'** কাল-ভাবের বিভক্তিই বাঙলায় নির্দেশক বা অবধারক বর্তমান কালের বিভক্তি চিহ্নে

রূপায়িত হয়েছে। বলা বাহুল্য, বাঙলা ভাষায় প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক যুগে এদের দেহে ক্রমবিবর্তনের চিহ্ন সুস্পষ্ট।

১ **উত্তমপুরুষ : প্রাচীন বাঙলায়** উত্তম পুরুষের বিভক্তি ছিল— -মি <-মহি <-অস্মি,-মি (পুছমি, কহমি, লেমি), '-ম <-মহ <-স্মঃ,-ম,-মঃ <অচ্ছম, -হু <মধ্যম-পুরুষ (দেহু, জানহু),'-হুঁ <ওউঁ <অস্মৎ' (দেহুঁ, খেলহুঁ)।—এই বিভক্তিচিহ্ন-গুলো প্রত্নবাঙলা এবং প্রাকৃত-অবহট্ঠেও বর্তমান ছিল। মধ্যযুগের বিভক্তিগুলোর সঙ্গে এদের সব সময় তাই প্রত্যক্ষ যোগাযোগ নাও থাকতে পারে। **মধ্যবাঙলায়** উত্তম পুরুষের বিভক্তি ছিল —'-ওঁ <-ও <-ম-হুঁ', মম্ -ময়া' (আছোঁ, জাওঁ), -ই/ঈ <-ইএ < অই <-য়তে' (করি, করী, করিএ), -হুঁ <-হুঁ,-অহম্' (করহুঁ, র হুঁ), '-উ <-ড-ইত' (যাউ, পুজিউ), '-মো <-মম' (পুজমো)। প্রাচীন বাঙলা এবং মধ্য বাঙলায় বিভক্তি-চিহ্নে একবচন বহুবচন ভেদ ছিল, কিন্তু সর্বক্ষেত্রে কর্তৃকারকের সঙ্গে সেই ভেদ মানা হতো না, অনেক সময় বিভক্তিচিহ্ন নির্বিশেষেই ব্যবহৃত হতো। **আধুনিক বাঙলায় বচন**-নির্বিশেষে উত্তমপুরুষে একটিমাত্র বিভক্তি চিহ্নেরই ব্যবহার প্রচলিত— '**ই** <-ই,-ঈ' (**করি**, লাগি, খাই, গুনাই)। এই চিহ্নটি সাধুভাষা এবং বিভিন্ন উপভাষাতেও একইরূপে প্রচলিত আছে। মধ্যযুগের '-ই' /'-ইএ' থেকেই আধুনিক যুগের '-**ই**' এসেছে—এরূপ **অনুমান অসঙ্গত নয়**। এটি মূলতঃ ছিল কর্মবাচ্যের বহুবচনের পদ, মধ্যযুগেও তার কিছুটা পরিচয় ছিল, আধুনিক যুগে সেই চিহ্ন আর নেই, এখন এটি একবচন/বহুবচন-নির্বিশেষে কর্তৃবাচ্যেই শুধু ব্যবহৃত হয়।—'অস্মাভিঃ ক্রিয়তে/*কর্যতে' >অমহেহি করিয্যতি >অমহেহি করীঅদি, করীঅই >প্রাচীন বাঙলায় 'আমহে করীঅই' >মঃ বাঃ 'আম্হে করিএ/ করী' >আঃ বাঃ 'আমি করি'।

২. **মধ্যমপুরুষ : প্রাচীন বাঙলায়** মধ্যমপুরুষের বিভক্তিচিহ্ন দুটি মাত্র —'**-সি** < -সি <-অসি, -সি' (আচ্ছসি, গিলেসি),'**-হু** <থঃ-' (করহু, যাহু)। **মধ্যবাঙলায়** বিভক্তি-চিহ্ন বৃদ্ধি পেয়েছে —'-অ <-ত' চল, কর) '**-হ-/হা** < **থ**' (খাহ, চলহ, পলাহা), '**-সি** <-সি' (করসি, যাসি), '**-উ** <উঁ',-হুঁ' (করু, রহু), '-ই <সম্ভবতঃ উত্তমপুরুষ থেকে (অনুমানি, যাই)। **আধুনিক বাঙলায়**—'অ/-ও <-**হ**' (আছ, ধর, খাও, শোও)। মধ্য বাঙলায় মধ্যম পুরুষে **অন্তরঙ্গতা** বা **তুচ্ছতা** বোঝানোর জন্য এক নোতুন ধরনের কর্তৃপদ এবং ক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে।—'**ইস্** <-সি' (করিস্, দিস্), '**-অস্**,**-স্** <-সি' (আঞ্চলিক বিভাষায়—'করস্, ধরস্')।

৩. **প্রথম পুরুষ : প্রাচীন বাঙলায়**—'**-ই** <-তি' ('আছই, দেই, দেখই, হোই'), '**০** <**-অ** <**-ই**' (দীসঅ, দে, তুট), '**-ইঅই**,**-এই** <-তি,-তে (বন্ধুবএ, কহেই, করেই)—**এই** বিভক্তিচিহ্নটি **কর্ম**ভাববাচ্যের রূপ থেকে এসেছে বলে মনে হয় ; '**-থি** <-আথি

<-অথি<অন্তি' (ভণথি, বোলথি)। সম্ভ্রমার্থে প্রাচীন বাঙলায় একটি বহুবচনের বিভক্তি প্রচলিত ছিল **'-অন্ত'** (ভণন্তি, চাহন্তি, নাচন্তি)। বিভক্তিটি সংস্কৃত থেকে প্রাকৃত ও অবহট্টের মাধ্যমে প্রায় অবিকৃতরূপেই প্রাচীন বাঙলা স্তরে এসে পেঁচৈছে। **মধ্যবাঙলা**—**'-অ,-ই,-য়**<-ই<-তি' (দেই, যাই, জাঅ, দেয়)। অ-কারান্ত ব্যতীত সকল শব্দে এই বিভক্তিচিহ্ন যুক্ত হয় ; '-এ<-তি' (চলে, শোএ), **'-ইএ**<কর্মভাববাচ্য (কাটিএ, ধরিয়ে)'। মধ্যযুগ থেকেই বাঙলায় মধ্যমপুরুষ এবং প্রথমপুরুষ সম্ভ্রমাত্মক পদ এবং ক্রিয়াবিভক্তির ব্যবহার পাওয়া যায়। সর্বনাম পদে মধ্যমপুরুষের রূপ 'আপনি, আপনারা', প্রথমপুরুষের রূপ 'তিনি (তিঁহ), তাঁহারা (তাঁরা, তেনারা), কিন্তু ক্রিয়ারূপে এতদুভয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই—উভয় পুরুষের সম্ভ্রমাত্মক রূপ সর্ববিধ কালে ও ভাবে একই প্রকার। মূলতঃ গৌরবে বহুবচনরূপে এগুলোর ব্যবহার হতো।—**'-ন্ত**<-ন্তি' (বোলন্তি, কহন্তি, দেন্তি), **'-এন**<এ+ন' (হএন, হয়েন, করেন, বোলেন),-**'এন্ত**<-এন+**-ন্ত'** (করেন্ত, বোলেন্ত), **'-হি**<-থি' (রহহি*, ভণহি*), '-তি<-তি' (ধরতি, হোতি)। **আধুনিক বাঙলা**—**'এ, য়'**—মধ্য বাঙলার অনুরূপ। সম্ভ্রমাত্মক রূপ '-এন্' উভয় পুরুষেই বর্তমান, রূপ এই একটিই।

(আ) **অনুজ্ঞাভাবে বর্তমান** (Present Imperative)—অনুজ্ঞাভাবে শুধু বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ কালই হয়, অতীত হয় না এবং পুরুষের ক্ষেত্রেও শুধু মধ্যম-পুরুষে এবং প্রথমপুরুষে অনুজ্ঞাভাবের রূপ প্রচলিত, উত্তমপুরুষে নেই। অনুজ্ঞা-ভাবের বর্তমানের বিভক্তিচিহ্ন সংস্কৃত সমাপিকা ক্রিয়াজাত, সেইজন্য ইহা শুদ্ধ মৌলিক বা তিঙন্ত কাল।

১. **মধ্যমপুরুষ ঃ প্রাচীন বাঙলা**—'-অ<-অ<-অ+o' (চল, পুছ, জাঅ), **'-অ**<-অ<-ত' (জাণ, জাঅ), **'-অহ**<**-হ**<**-থ'** (জাহ, করহ), '-তু<-তু <-ত্বম্ (পুচ্ছতু), '-**হি/হী**<-হি<-হি, <-ধি' (হোহি, জাহী)', '-**হু**<-**হু**<-**সু**<-স্ব' অথবা '-**হু** <-থস্' (জাহু, হোহু)। **মধ্য বাঙলায়**—বিভক্তিচিহ্নগুলো অনেকাংশে প্রাচীন বাঙলারই অনুরূপ। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে মধ্যযুগে '-অ' বিভক্তিটি ধাতুর অন্তস্বরের সঙ্গে সমীভূত হয়ে গেছে,—'*দেঅ>দে, *নেঅ>নে'। '-হি' বিভক্তিটি মধ্যবাঙলায় প্রায় নেই। '-হু' বিভক্তিটিও মধ্যযুগেই পরিত্যক্ত হয়েছিল। **আধুনিক বাঙলায়**—'-অ' এবং '-ও<-হ' দুটি বিভক্তি এবং 'o' শূন্য বিভক্তিই প্রচলিত আছে। সাধুভাষায় '-হ' একেবারে অপ্রচলিত নয় ('আপন পাঠেতে মন **করহ** নিবেশ')। বিভক্তি-শূন্য প্রাতিপদিকটিই মধ্যমপুরুষ তুচ্ছার্থক/অন্তরঙ্গ অনুজ্ঞায় ব্যবহৃত হয়—'যা, কর্, নে'।

'-অ, -উ, -হি'—এই তিন ক্রিয়াবিভক্তির সঙ্গে প্রাচীন যুগে সাধারণ নিষেধার্থক

'মা' যুক্ত হ'তো ('মা কর, মা হোহি, মা লেহু') ; 'ন' শব্দের সঙ্গে '-হ' যোগ করা হ'তো ('ন ভুলহ')।

২. **প্রথমপুরুষ ঃ প্রাচীন ও মধ্যযুগের** বাঙলায় বিভক্তি ছিল '-উ<-উ<-তু' (দউ, জাইউ)। মধ্যবর্তী স্তরেই এর সঙ্গে কখন কখন 'স্বার্থিক ক' প্রত্যয় যুক্ত হয়, **আধুনিক বাঙলায়** তা থেকে '-উক্,-ক্' প্রত্যয় সৃষ্টি হ'য়েছে (দিউক্, দিক্, যাউক্, যাক্)। মধ্যমপুরুষ ও প্রথমপুরুষ সম্ভ্রমাত্মক প্রত্যয় **মধ্য বাঙলায়** '-স্ত<-অন্ত' (দেস্ত), 'উন<-উ+ন্' (দিউন)। **আধুনিক বাঙলায়** এর রূপ '**-উন -ন্**' মধ্য বাঙলা থেকে সরাসরি নেওয়া হ'য়েছে (করুন, দিন্, যান্, থাকুন)।

(ই) নির্দেশক ও অনুজ্ঞাভাবে ভবিষ্যৎ—প্রাচীন বাঙলা থেকেই ভবিষ্যৎ নির্দেশক এবং অনুজ্ঞার পদ প্রায় একাকার ধারণ করে। আধুনিক কালে শুধু মৌলিক বা তিঙন্ত নির্দেশক ভবিষ্যৎ আর নেই, অনুজ্ঞায় ভবিষ্যৎও শুধু মধ্যমপুরুষে বর্তমান। '-হ<-স্যথ' (করিহ, জাইহ)। আধুনিক কালে '**-হ**>-ও, -য়ো' (করিও, করো, যাইও, যেয়ো)। মধ্যমপুরুষ তুচ্ছার্থে অনুজ্ঞাভাবে ভবিষ্যতের রূপ '**-ইস্-স্** <-হসি<-ষ্যাসি' (চলিস্, যাস্)। অনুনয় ভাবে বর্তমান ও ভবিষ্যতের পদে আধুনিক বাঙলায় আর কোন পার্থক্য না থাকলেও কদাচিৎ বিভিন্নতা দেখা যায়।—বর্তমান কালে 'তিনি **নিন**', ভবিষ্যতে 'তিনি যেন **নেন**'। বঙ্গালীতে এই পার্থক্য বর্তমান সম্ভ্রমার্থে—বর্তমানে 'আসেন' ভবিষ্যতে 'আইসেন'। মধ্যযুগে ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞায় '-লি>+হলি' (করিহলি, চলিহলি) ব্যবহৃত হ'তো।

(২) **কৃদন্তকাল** (Participle Tense)

সংস্কৃত নিষ্ঠা-আদি বিভিন্ন কৃৎ-প্রত্যয়-যোগে ক্রিয়ার বিভিন্নকালের ভাব প্রকাশ করা হ'তো, যদিও সে পদগুলো ব্যবহৃত হ'তো বিশেষণ পদরূপে। এই জাতীয় তিনটি প্রত্যয়—নিষ্ঠা, কৃত্য ও শতৃ এবং এদের সাহায্যে যথাক্রমে অতীত ('ক্ত' প্রত্যয় বা '-ত/-ইত'—নিষ্ঠা-যোগে), ভবিষ্যৎ (-'তব্য' – কৃত্য-যোগে) এবং নিত্যবৃত্ত ('-অন্ত' —শতৃ-যোগে) কাল প্রকাশ করা হ'তো। কৃৎ-প্রত্যয়যোগে উৎপন্ন পদ অর্থাৎ 'কৃদন্ত পদ' থেকে বাঙলায় এই তিনটি কালের রূপ উৎপন্ন হয়েছে বলে বাঙলায় এই তিনটি কালকে – (অ) নির্দেশক অতীত, (আ) নির্দেশক ভবিষ্যৎ ও (ই) নির্দেশক নিত্যবৃত্ত— —বা একযোগে 'কৃদন্ত কাল' বলে অভিহিত করা হয়। প্রাচীন বাঙলা এবং মধ্য-বাঙলার গোড়ার দিকে কৃদন্ত অতীত ও কৃদন্ত ভবিষ্যৎ শুধু কর্ম-ভাববাচ্যেই ব্যবহৃত হ'তো, পরবর্তীকালে কর্তৃবাচ্য এবং কর্মভাববাচ্যের প্রভেদ লুপ্ত হ'য়ে যাবার ফলে এগুলো শুধু কর্তৃবাচ্যেই ব্যবহৃত হ'তে থাকে।

(অ) কৃদন্ত অতীত (নির্দেশক ভাবে)

সংস্কৃতে অতীতকাল ছিল তিনটি লুঙ্, লঙ্ এবং লিট্ ; প্রাকৃতের স্তরেই সেগুলা কোথাও লোপ, কোথাও বা একীকৃত হ'য়েছে। তিঙন্ত বিভক্তির লোপের ফলে নোতুনভাবে অতীত-বাচক নিষ্ঠা প্রত্যয় (-ক্ত>-ত-হ-ইত)-যুক্ত পদের ব্যবহার শুরু হ'লো। প্রথমে অকর্মক ক্রিয়ায় কর্তৃবাচ্যেই এদের ব্যবহার সীমিত ছিল ; পরবর্তী কালে সংস্কৃত ও প্রাকৃতে কৃদন্ত পদের ব্যবহারের বিশিষ্ট রীতি দাঁড়ালো এরকম—অকর্মক ক্রিয়ার কর্তৃবাচ্যক কৃদন্ত অতীত কর্তার বিশেষণ রূপে এবং সকর্মক ক্রিয়ার কর্মবাচ্যক কৃদন্ত অতীত কর্মের বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হ'তো। প্রাচীন বাঙলা এবং মধ্য বাঙলার আদি স্তরেও এই রীতি বজায় ছিল ; তবে পাশাপাশি '-ল', '-ল্ল-' যুক্ত অতীতও ব্যবহৃত হ'তে আরম্ভ করেছিল অপভ্রংশের যুগ থেকেই এবং সম্ভবতঃ আরো আগে সংস্কৃত থেকেই। ফলতঃ কৃদন্ত অতীতের দুটি ধারা বাঙলায় প্রচলিত ছিল—১ একটি ছিল প্রাচীন ও মধ্যবাঙলায় সীমিত '-ল' প্রত্যয়হীন, ২. অপরটি '-ল' প্রত্যয়যুক্ত, যা বাঙলা ভাষায় তিনযুগেই বর্তমান এবং একে বাঙলা অতীতের বিশিষ্ট লক্ষণ ব'লে মানা হয়।

১. **'ল'-প্রত্যয়হীন অতীত** ঃ—সংস্কৃত অনিট্ ধাতুর (যাদের সঙ্গে 'ই'-কার-বিহীন প্রত্যয়-বিকরণ-আদি যুক্ত হয়—যেমন '-ত', '-সা' প্রভৃতি)উত্তর '-ক্ত>-ত' যুক্ত হ'বার পর তাব বাঙলা কৃদন্ত রূপ বাঙলায়ও অল্পই ব্যবহৃত হ'তো (কৃত>কিঅ, দৃষ্ট-ক>দিট্ঠঅ>দিঠা, পইঠা, 'কাহ্ন **ভইঅ** কপালী')। সংস্কৃত 'সেট্' ধাতুর (যাদের সঙ্গে 'ই'-কার যুক্ত প্রত্যয়-বিকরণ-আদি যুক্ত হ'তো. যেমন, '-ইত', -ইষ্য' প্রভৃতি) উত্তর '-ইত' প্রত্যয়-যুক্ত পদের বাঙলা কৃদন্তরূপে (চলিত>চলিঅ, বিকশিত>বিকসিউ)। উভয় প্রকার ক্রিয়াপ ই শ্বাসাহত (Stressed) হয়ে বাঙলায় বিশেষ রূপ লাভ করেছে (মিলিত>মিলিত্তা. তরিত>তরিত্তা, পরিনিবিত্তা)। 'ল-' প্রতয়বিহীন কৃদন্ত পদগুলো বিশেষণবৎ ব্যবহৃত হ'লেও লিঙ্গ-পুরুষ-বচন-ভেদে এদের রূপান্তর হয় না। এগুলি কর্তৃবাচ্যে কর্তার বিশেষণ-রূপে এবং কর্মবাচ্যে কর্মের বিশেষণ-ব্যবহৃত হ'তো।—'কমল **বিকসিউ**', কিন্তু 'জাহের বাণ চিহ্ন রূপ ণ **জাণী** (=যার বর্ণ চিহ্ন রূপ জ্ঞাত নয়)। -ইত>-ইঅ,-ইআ>-ই' যুক্ত অতীতকালের পদ মধ্য বাঙলাতেও বিশেষণরূপে রক্ষিত ছিল ('মুকুতা রতনে জড়ী'=জড়িতা)। এগুলোর অতীত অর্থেও বর্তমান ছিল।—'বাপু বসুল মোর নন্দঘরে জাণী', 'তোর বাঁশী আহ্মে নাহি **পাই**'(=পাইল)। আধুনিক বাঙলায় ভিন্ন ভাবে ব্যাখ্যা করা হ'লেও এ ধরনের রূপ অতীত-অর্থে এখনও ক্বচিৎ ব্যবহৃত হয়—'আমি যখন খবরটা **পাই** (=পাইলাম), তখন ও বাড়ি ছিল না'।

২. **ল-প্রত্যয়যুক্ত অতীত**—নিষ্ঠা প্রত্যয়যুক্ত সংস্কৃত ক্রিয়াপদগুলো প্রাকৃত মাধ্যমে বিবর্তিত হ'য়ে বাঙলায় একদিকে যেমন '-ইঅ'-রূপে ক্রিয়াপদের সঙ্গে ব্যবহৃত হ'তো, তেমনি অথবা তার চেয়েও বেশি সংখ্যায় 'ল'-যুক্ত হয়ে প্রাচীনকাল থেকেই ব্যবহৃত হ'তে আরম্ভ করলো এবং আধুনিক কালে শুধু '-ইল'-তেই বর্তমান রইলো। আধুনিক বাঙলায় অতীতকালে '-ইল' ব্যতীত আর চিহ্নই নেই। প্রাচীন বাঙলায় '-ইল' যুক্ত অতীতকালের পদগুলো অনেকক্ষেত্রেই বিশেষণের মতো লিঙ্গান্তরিত হ'তো। অকর্মক ক্রিয়ার কর্তা এবং সকর্মক ক্রিয়ার কর্ম স্ত্রীলিঙ্গ হ'লে ক্রিয়াপদটিও স্ত্রীলিঙ্গে পরিবর্তিত হ'তো। যথা—'আজি ভুসু বঙ্গালী **ভইলি**', '**লাগেলি** আগি', 'নিঅ ঘরণী চণ্ডালে* লেলী'। অবশ্য '-ইল'-যুক্ত পদ বিশুদ্ধ বিশেষণ রূপেও কখন কখন ব্যবহৃত হ'তো, যথা—'বেড়িল হাঁক', 'গেলী জাম'; একালেও এরূপ প্রয়োগ একেবারে অপ্রচলিত নয়, যেমন—'**গেল** জন্মে আমি অমুক ছিলাম'। মধ্য বাঙলার অবস্থাও প্রাচীন বাঙলার মতো—অর্থাৎ বিশেষণের মতো ক্রিয়ারও লিঙ্গান্তর হ'তো। যথা—'শচী **হলী** অচেতন', '**চলিলী** রাহী', 'কোপে* **গরজিলী** রাধা'; আবার '-ইল'-যুক্ত খাঁটি বিশেষণও ছিল, যেমন—'**পাকিল** দাড়ী', '**ভুখিল** বাঘ'।

অন্ত্যমধ্যযুগ থেকেই '-ইল'-যুক্ত পদগুলোর বিশেষণ ভাব অন্তর্হিত হ'তে আরম্ভ করে এবং আধুনিক কালে একেবারেই বিশুদ্ধ ক্রিয়ারূপে ব্যবহৃত হ'চ্ছে। এর রূপান্তর ঘটেছে শুধু পুরুষ-অনুযায়ী; লিঙ্গ-বচন-ভেদে এর কোন পরিবর্তন নেই। তবে অন্ত্যমধ্যযুগে এবং আধুনিক যুগে কবিতায় 'কহিল/কহিলা', 'গেল/গেলা' প্রভৃতির নির্বিশেষ প্রয়োগ থেকে অনুমিত হয়, কাব্য-প্রণেতাদের মাথায় ছিল না। প্রাচীন বাঙলার '-ইল' যুক্ত অতীত কালের কতকগুলো প্রয়োগ একালে প্রায় বর্জিত হয়েছে। যথা—আধুনিক 'মরিল' -স্থলে প্রাচীন 'মৈল', 'করিল'-স্থলে 'কৈল', 'বলিল'-স্থলে 'বুইল' প্রভৃতি।

প্রাচীন বাঙলায় পুরুষ বাচক বিভক্তিচিহ্নের ব্যবহার সীমিত, মধ্য বাঙলায় বিভক্তিচিহ্নের বৈচিত্র্য ছিল, আধুনিক বাঙলায় সুনির্দিষ্ট চিহ্নে স্থিতিলাভ করেছে। প্রত্যয়হীন পদে পুরুষবাচক বিভক্তিচিহ্নের প্রয়োগ হ'তো না, 'ল'-বিভক্তিযুক্ত পদগুলিতেই কালক্রমে বিভক্তিচিহ্ন যুক্ত হ'তে থাকে।

উত্তমপুরুষ—প্রাচীন যুগে সাধারণভাবে কৃদন্ত অতীতকালে উত্তমপুরুষে কোন বিভক্তিচিহ্ন যুক্ত হ'তো না। যথা—'মই দেখিল', তবে স্ত্রীলিঙ্গ হ'লে সেখানে স্ত্রী-প্রত্যয় যুক্ত হতো। ক্বচিৎ দু'চারটি ক্ষেত্রে '-এ' এবং '-এ*স'ু প্রত্যয় যুক্ত হয়েছে। যথা 'হাঁউ আছিলে*সু মোহে' বা 'হাঁউ আছিলে সু মোহে'। **মধ্যবাঙলায়** উত্তমপুরুষের

সাধারণ বিভক্তি '-ল এবং '-লা' ; ক্রমে এর সঙ্গে আরো বিভক্তি যুক্ত হওয়াতে ক্রিয়া-পদের বহুবিধ রূপ দাঁড়িয়ে যায় :—'**-লো, -লোঁ-লাহোঁ, লাও-লাউ-লাম-লাঙ**' ('জীলো, করিলো, আয়িলাহোঁ, করিলাও, করিলাউ, দিলাম, যাঙ') প্রভৃতি। **আধুনিক** কালে **উত্তমপুরুষের প্রধান** বিভক্তি '**-লাম**' (করিলাম, করলাম) বিভিন্ন উপভাষা ও কথ্যভাষায় এতদতিরিক্ত '-লেম,-লুম,-নু-লম' (করলেম, গেলুম, খেনু, দেখলম) প্রভৃতি।

মধ্যমপুরুষ :—কৃদন্ত অতীতে মধ্যমপুরুষের **প্রাচীন** বিভক্ত '-**এসি** '-এঁসি-(নিলেসি, আইলেঁসি)। **মধ্যবাঙলার** বিভক্তি '**-লা, লাহা,লে-** (করিলা, আছি-লাহা, এড়িলে)। এ ছাড়া তুচ্ছার্থক অন্তরঙ্গ বিভক্তি '**-লি**'। আধুনিক কালের প্রতিষ্ঠিত বিভক্তি '**-লা,-লে** (করিলা, করলা, গেলে, খাইলে)। তুচ্ছার্থক/অন্তরঙ্গ বিভক্তি '-লি' (গেলি, খাইলি, করলি, করিলি)।

প্রথমপুরুষ :—কৃদন্ত অতীত প্রথম পুরুষে সাধারণতঃ **প্রাচীনকালে** কোন বিভক্তি-চিহ্ন যুক্ত হ'তো না। তবে কোন কোন পদে '**-ল**'-স্থলে-'**লা**' বিভক্তির প্রয়োগ দেখা যায়—'চলিল, আইলা'। **মধ্যবাঙলায়ও** কোন বিভক্তিচিহ্ন যুক্ত হতো না, তবে কখন কখন '-ল' স্থলে '**-ল, '-লে,-লোঁ**' ব্যবহৃত হ'তো—'ছিল, গেলা, করিলে'। মধ্যযুগে অপর একটি বিভক্তির বিশেষ ব্যবহার পাওয়া যায়—'**-লান্ত-লান্তি**' (কহিলান্ত, গেলান্তি সাগরে, যান্তি)। **আধুনিক বাঙলায়** প্রথম পুরুষে **সাধারণতঃ** কোন বিভক্তি যুক্ত হয় না, তবে সকর্মক ক্রিয়ায় এবং কোন কোন উপভাষায় '-লে' বিভক্তি ব্যবহৃত হয়—'দিলে, খেলে'। মধ্যমপুরুষ ও প্রথমপুরুষে সম্ভ্রমাত্মক বিভক্তি '-লেন' (করিলেন, করলেন, দিলেন)।

(আ) **নির্দেশকভাবে কৃদন্ত ভবিষ্যৎ** (Participle Future)

সংস্কৃতে নির্দেশক ভবিষ্যৎ কাল বোঝাতে সাধারণ 'লৃট্' ক্রিয়াবিভক্তি যুক্ত হ'তো ; এছাড়াও 'লেট্' ধাতুতে আদেশ, ঔচিত্য, যোগ্যতা-আদি বোঝানোর জন্য ভবিষৎ-বাচক কৃদন্ত বিশেষণ (Participle) '-তব্য (-ইতব্য)' যুক্ত হ'তো। এই '-তব্য' থেকেই বাঙলায় ভবিষ্যৎ কালের প্রত্যয় '-ইব' উৎপন্ন হয়েছে। মূলতঃ এই '-তব্য' প্রত্যয় কর্ম-ভাববাচ্যেই ব্যবহৃত হ'তো এবং সকর্মক ক্রিয়ার ক্ষেত্রে এই কৃদন্ত পদটি উক্তকর্মের বিশেষণ রূপে প্রযুক্ত হ'তো ও যথাযথভাবে তার লিঙ্গ-পরিবর্তন ঘটতো। '*ময়েন (=ময়া) কর্তব্যম্ > *ময়ে*করিতব্বং > মঁই করিঅব্ব > মুই করিব'। প্রাচীন বাঙলাতেও সাধারণতঃ কর্ম-ভাববাচ্যেই '-ইব'-প্রত্যয় যুক্ত হ'তো এবং সকর্মক ক্রিয়ার ক্ষেত্রে কর্মটি স্ত্রীলিঙ্গ হ'তে কৃদন্ত ভবিষ্যৎটিও লিঙ্গান্তর গ্রহণ

করতো—'মই দিবি পিরিচ্ছা' (ময়া দাতব্য পৃচ্ছা)। তবে প্রাচীন কালেই কখন কখন কর্তৃবাচ্যেও '-ইব'-প্রত্যয় যুক্ত হ'তো এবং সেক্ষেত্রে কৃদন্ত ভবিষ্যৎটির সঙ্গে '-এ/এঁ' বিভক্তিচিহ্ন যোগ করা হ'তো—'জই তুমহে ভুসুকু অহেরি জাইবেঁ'।

চর্যাপদে ভবিষ্যৎ কালের সমস্ত পদই '-ইব-' যুক্ত এবং এটি বাঙলা ভাষার বৈশিষ্ট্য। চর্যাপদের ভাষা যে বাঙলা, এটি তারই একটি নিদর্শন। বাঙলা ভাষার বাইরে অপর মাগধী ভাষাসমূহে সাধারণতঃ '-অব' প্রত্যয় ব্যবহৃত হয়। মধ্যযুগে ব্রজবুলি পদে যে '-অব' প্রত্যয় ব্যবহৃত হ'য়েছে, তা প্রধানতঃ মৈথিলী ভাষার প্রভাব-বশতঃ। মধ্যযুগ থেকে '-ইব' বাঙলা ভাষায় কালবাচক প্রত্যয়রূপে ক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত হ'য়ে কর্তার অনুগামী হ'য়ে ওঠায় তার সঙ্গে পুরুষ-বাচক বিভক্তির যোগ অনিবার্য হ'য়ে ওঠে। আধুনিক কালেও এই রীতি বর্তমান রয়েছে।

১. **উত্তমপুরুষ ঃ—প্রাচীন যুগে** '-ইব'-প্রত্যয়যুক্ত কৃদন্ত ভবিষ্যতের পদে কোন বিভক্তিচিহ্ন যুক্ত হ'তো না। যথা—'তোএ সম করিব ম সাঙ্গ'। **মধ্যযুগে—'ইবওঁ, -ইবোঁ, -ইব, -ইমো** (<-ইব+ওঁ)' বিভক্তি উত্তমপুরুষে ব্যবহৃত হ'তো ('যাইব, করিবোঁ, বধওঁ, নিবেদিবোঁ)। **আধুনিক বাঙলায়** সাধুভাষায় এবং শিষ্ট চলিত ভাষায় উত্তমপুরুষে কোন বিভক্তিচিহ্ন যুক্ত হয় না, শুধু '-ইব' ব্যবহৃত হয়। কিন্তু বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষায় এর রকমফের দেখা যায়— -**'উমু. -মু, -আমু, বামু'** (করুম, খামু, যাইয়ামু, খাইবাম) প্রভৃতি। একটি বিভাষায় একটি লক্ষণীয় বিশিষ্ট প্রয়োগ—নঞর্থক বাক্যে ভবিষ্যৎ কালে '-তামু' বিভক্তির প্রয়োগ, যথা—'আমি যাইবাম কিন্তু খাইতাম না' (=আমি যাবো কিন্তু খাবো না)।

২. **মধ্যমপুরুষ ঃ—প্রাচীন বাঙলায়** মধ্যমপুরুষে সাধারণতঃ কোন বিভক্তিচিহ্ন যুক্ত হ'তো না—'তুমহে লোঅ হোইব'। **মধ্যযুগে '-ইবেঁ, -ইবেহেঁ' -ইবে, -ইবা'** বিভক্তি যোগ করা হতো। তুচ্ছার্থে **'-ইবি'** বিভক্তির ব্যবহার মধ্যযুগেই শুরু হয়েছিল —'আহ্মা ছাড়ী জাইবি কোনু পথে'। **আধুনিক বাংলায়** সাধারণ বিভক্তি **'-বে'**, তবে আঞ্চলিক বিভাষায় **'-বা'** বিভক্তিও ব্যবহৃত হয়। তুচ্ছার্থে **'-বি'** বিভক্তি যুক্ত হয়।

৩. **প্রথমপুরুষ ঃ—প্রাচীন বাঙলায়** প্রথমপুরুষে কৃদন্ত ভবিষ্যৎ কালে কোন বিভক্তিচিহ্ন যুক্ত হ'তো না—'কাহ্নু কহি গই করিব নিবাস'। **মধ্যযুগে** প্রচলিত বিভক্তি ছিল—**'-ইবে, -ইবেক, -ইব'**। সম্ভ্রমার্থে প্রথম পুরুষে এবং মধ্যমপুরুষে **'-ইবেন'** বিভক্তি ব্যবহৃত হ'তো, এর প্রাচীনতর রূপ **'-ইবেন্ত'** (করিবেন্ত) অন্ত্যমধ্য বাঙলায় ব্যবহৃত হয়েছে। **আধুনিক যুগে প্রথমপুরুষের** বিভক্তি সাধারণতঃ **মধ্যম-**

পুরুষেরই মতো '-বে', তবে আঞ্চলিক বিভাষায় '-ব/-বো' বিভক্তিও যুক্ত হয় ('রাম যাইবো না')। সম্ভ্রমার্থে মধ্যমপুরুষ ও প্রথমপুরুষের বিভক্তি '-বেন'।

(ই) নির্দেশকভাবে কৃদন্ত নিত্যবৃত্ত অতীত (Habitual Past) :— অতীতকালে নির্দিষ্ট কার্যসম্পাদনে কর্তার অভ্যস্ততা বোঝাতে 'নিত্যবৃত্ত অতীত' কালের ব্যবহার হয়। একালে যেভাবে নিত্যবৃত্ত অতীত একটি স্বাধীন কালরূপে বিবেচিত হয়ে থাকে, তদনুরূপে না হলেও বৈদিক কাল থেকেই সাপেক্ষকাল-রূপে 'শতৃ'-প্রত্যয়ের ব্যবহার ছিল। অনুমান করা যায় যে সংস্কৃত 'শতৃ'-প্রত্যয় (-অন্ত/-অয়ন্ত) থেকে প্রাকৃতের মধ্য দিয়ে 'ইত' প্রত্যয়টিই বাঙলা নিত্যবৃত্ত অতীতের রূপদান করেছে। সংস্কৃত, প্রাকৃত এবং অপভ্রংশে 'শতৃ' প্রত্যয়ের ব্যবহার ছিল, কিন্তু কখনও তা সমাপিকা ক্রিয়ার পূর্ণ মর্যাদা লাভ করেনি। প্রাচীন বাঙলাতেও '-এ/-এ*' বিভক্তির যোগে ভাবে সপ্তমীরূপে 'শতৃ' প্রত্যয়ের ব্যবহার পাওয়া যায়, কদাচিৎ দু' একটি স্থলে সমাপিকা ক্রিয়ার স্পষ্টতা লক্ষ্য করা যায়—'শান্তি ভণই পোহান্ত পহারা ('শান্তি ভনে, পোহায় / পোহাইল প্রহর)। সাপেক্ষ (conditional) অর্থেও প্রাচীন বাঙলায় শত্রন্ত পদের প্রয়োগ পাওয়া যায়,—'ঘর অচ্ছন্তে মা জাহ বনে' (=ঘর থাকিতে / থাকিলে বনে যেও'না)। বস্তুতঃ সমাপিকা ক্রিয়ার রূপটি পাওয়া যাচ্ছে না।

মধ্যযুগের বাঙলাতেই প্রথম শতৃ-প্রত্যয় জাত '-ইত' প্রত্যয়টি অতীতকাল এবং সমাপিকা ক্রিয়ারূপে ব্যবহৃত হয়েছে,—'জীয়ন্ত থাকিত যবে নান্দের নন্দনে। এতখনে অবসই হৈত দরশনে।' 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যে এরূপে নিত্যবৃত্ত পাওয়া গেলেও তার তত ব্যাপক ব্যবহার ছিল না, ভিন্নকালের সাহায্যেও নিত্যবৃত্তকালের প্রয়োজন মেটানো হতো—'আজি তুমি বলদেব তে কারণে সই। আর জন হইলে জম করণে পাঠাই।' এই যুগে কখন কখন অতীত-অর্থেও নিত্যবৃত্তের প্রয়োগ দেখা যায়—'কি না বিধি লিখিত (=লিখিল) কপালে।' নিত্যবৃত্ত কালের আর একটি বিচিত্র প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায় কোন কোন আধুনিক আঞ্চলিক বিভাষায়, সেখানে নঞর্থক ভবিষ্যৎ কালেও নিত্যবৃত্ত কালের প্রয়োগ ঘটে—'তোমার বাড়িতে যাইবাম কিন্তু **খাইতাম না**' (=খাব না)।

ডঃ সুকুমার সেন মনে করেন যে বাঙলায় নিত্যবৃত্ত কালের প্রত্যয় '-ইত' সম্ভবতঃ প্রত্যক্ষভাবে 'শতৃ' প্রত্যয় থেকে উদ্ভূত নয়, যদিও এর উপর শতৃ প্রত্যয়ের প্রভাব স্বীকার করতেই হয়। তাঁর অনুমান,—অতীতকালের '-ই' প্রত্যয়ের সঙ্গে স্বার্থিক 'ত' যোগে '-ইত' প্রত্যয় সিদ্ধ হয়েছে। 'ল'-কারান্ত অতীতকালের মতোই নিত্যবৃত্ত অতীতেও একই

ধরনের পুরুষবাচক বিভক্তি চিহ্ন যুক্ত হয়ে থাকে।—'করিলাম>করিতাম, করিলে> করিতে'; শুধু দুএকটি ক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রম ঘটে। যথা—সকর্মক ক্রিয়ার ক্ষেত্রে প্রথমপুরুষে '-এ' বিভক্তি হয় (দিলে, করলে), কিন্তু নিত্যবৃত্তে '-এ' যুক্ত হয় না; তুচ্ছার্থক মধ্যমপুরুষে অতীতকালে শুধু '-ই' বিভক্তি যুক্ত হয় (করলি, খেলি) কিন্তু নিত্যবৃত্তে যুক্ত হয় 'ইস্' ('করতিস্, খেতিস্')।

১. **উত্তমপুরুষ** :—মধ্যবাঙলায় উত্তমপুরুষে **'-তোঁ, তাঁহো, -ইত, -ইতু, -ইতাঙ্, -ইতাম'** বিভক্তি যোগ করা হতো; অনেক সময় 'ত' স্থলে 'থ'-ও পাওয়া যাচ্ছে। 'মো যদি **জানিতু**', 'আজ্ঞামাত্র তথাকারে **করিথ** গমন', **'চালাইথাঙ'**, 'পুষ্প **দিতাম** হরের চরণে'। **আধুনিক যুগের** বিভক্তি '-তাম্, -তুম, -তেম্' ('-যদি জানতেম্')।

২. **মধ্যমপুরুষ** :—নিত্যবৃত্ত অতীতে **মধ্যবাঙলার** বিভক্তি **'-তে, -ইতে, -ইতা ইতো'** ('যদি কার্য **থাকিথ* পাঠাতো** ভৃত্যগণে', **'জানিতা যে মহাজ্ঞান'**)। আধুনিক বাঙলায় একমাত্র বিভক্তি **'-তে'** এবং তুচ্ছার্থে **'-তিস্'**। কোন কোন উপভাষায় '-তে' স্থলে '-তা' বিভক্তি যুক্ত হয়।

৩. **প্রথমপুরুষ** :—**মধ্যযুগে** প্রথম পুরুষের একটিই বিভক্তি ছিল **'-ত'** ('যে ননী চুরি **করিত, খাইত** গালাগালি', 'ফুল্লরা বেচিত মাংস')। **সম্ভ্রমাত্মক মধ্যমপুরুষ** ও প্রথমপুরুষে বিভক্তি ছিল **'-তেন'** (আহার দিয়া বাতাস **দিতেন** মোরে)। **আধুনিক** বাঙলাতে প্রথম ব্যবহৃত নিত্যবৃত্তের বিভক্তি '-ত, -তো' এবং সম্ভ্রমাত্মক প্রথমপুরুষের বিভক্তি '-তেন' মধ্যযুগেরই অনুবৃত্তি, অতএব অনুরূপ।

(ঈ) **স্বার্থিক প্রত্যয়** (Pleonastic Suffix)

বাঙলা ভাষার বিভিন্ন কালেই কিছু কিছু 'স্বার্থিক প্রত্যয়' ক্রিয়াপদের সঙ্গে ব্যবহৃত হয়। **স্বার্থিক** প্রত্যয়ের যোগে ক্রিয়ার অর্থের কোন বৈলক্ষণ্য দেখা যায় না, এগুলো অন্ত্যাগম-রূপে ভাষায় ব্যবহৃত হয়।

১. **'ক'**—স্বার্থিক প্রত্যয়-সমূহের মধ্যে সর্বাধিক প্রচলিত প্রত্যয় **'ক'** (<**ক কঃ**) বাঙলা ভাষার তিন কালেই এবং নির্দেশক ও অনুজ্ঞা উভয় ভাবেই এটি ব্যবহৃত হয়। —নির্দেশক বর্তমান কালে—'কেহো এথাঁ নাহিক সহাএ'; অতীতকালে—**'চাহিলেক,** কহিলেক'; ভবিষ্যৎ কালে—'হইবেক, যাইবেক'। আধুনিক বাঙলা সাধুভাষায় এবং কোন কোন আঞ্চলিক উপভাষায় স্বার্থিক 'ক' প্রত্যয়ের ব্যবহার আছে।

অনুজ্ঞাভাবে '-ক' প্রত্যযের প্রয়োগ আধুনিক বাঙলায় প্রথম পুরুষে আবশ্যিক—দিউক / দিক্, যাক্, হোক্। প্রাচীন বাঙলায়—'আছুক অন্যের কাজ'।

২. **-খন -নে, -নি**—আধুনিক বাঙলার শিষ্ট চলিত ভাষায় ভবিষ্যৎ কালে **'-খন'**

(<ক্ষণ) প্রত্যয়টি ব্যবহৃত হ'য়ে থাকে—'যাব'খন, করবো'খন'। বঙ্গালী উপভাষায় '-খন >-নে' ব্যবহৃত হয়।—যাবা-নে, যামু-নে, যাইবাম-নে। এই স্বার্থিক প্রত্যয়টির অপর সম্ভাব্য উৎস 'এখন'/'অখন' হ'তে পারে।

৩. গে—আধুনিক বাঙলায় প্রাতিমুখ্য বোঝাতে '-গে' (<গিয়া) প্রত্যয়টি স্বার্থিক প্রত্যয়ের মত ক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত হ'য়ে থাকে। মধ্য বাঙলায় '-গিয়া'-রূপে ক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত হওয়াতে তখন যৌগিক ক্রিয়া-রূপেই বিবেচিত হ'তো। এই অসমাপিকা ক্রিয়াজাত প্রত্যয়টি সাধারণতঃ বর্তমান কালে অনুজ্ঞাভাবে ব্যবহৃত হ'লেও ('দেখগে') আঞ্চলিক বিভাষায় অবধারণে এবং সমস্ত পুরুষেই ব্যবহৃত হয়।—'দেখে আসিগে', থাকুগে', 'আমি গেলাম গিয়ে', 'আমি হলাম গে তোমার ঠাকুরদা' প্রভৃতি।

৪. র—প্রাকৃত ভাষায় পাদপূরণে '-র' যুক্ত হ'তো। আচার্য সুনীতিকুমারের মতে স্বার্থিক '-র' প্রত্যয়টির উদ্ভব ঘটেছে 'কর-' (<কৃ) ধাতু থেকে, আর ডঃ সুকুমার সেন মনে করেন যে প্রত্যয়টি 'পার' ধাতু থেকে উদ্ভূত হ'য়ে থাকতে পারে। আধুনিক সাধু এবং শিষ্ট ভাষায় এর প্রয়োগ নেই বল্লেই চলে। মধ্যযুগে নির্দেশকভাবে তিন কালে, অনুজ্ঞায় এবং অসমাপিকা ক্রিয়ার সঙ্গেও প্রত্যয়টি যুক্ত হ'তো—বর্তমান কাল—'সব কথা কহিআরোঁ তোহ্মারে'; অতীতকালে—'তুমি কহিলার স্বরূপ'; ভবিষ্যৎকালে—'দিবোঁর'; অনুজ্ঞায়—'হাসিয়া সুন্দরী রাধা দিয়ার বিদায়'; এবং অসমাপিকা ক্রিয়ায়—'ধূপের ধোঁয়া দিয়ারে' (দিয়া)।

৫. -লি—এই প্রত্যয়টি আদি মধ্য বাঙলায় ভবিষ্যৎ কালের অনুজ্ঞায় ব্যবহৃত হতো —'করিহলি' (=করিও), চলিহলি (=চলিও)। ডঃ সুকুমার সেন অনুমান করেন যে এই '-লি' আসলে '-হলি', এটি মূলত কৃদন্ত অতীত এবং '-হলি' ($\surd$ হওয়া) -যুক্ত ক্রিয়াপদ। কিন্তু ভবিষ্যৎকাল বোঝাতে জোড়া অতীতের ব্যবহার সন্দেহজনক।

৬. -সে—অভিমুখ্য বোঝাতে '-সে' (<এসে) প্রত্যয়টি আধুনিক বাঙলায় অনুজ্ঞা পদে ব্যবহৃত হয়।—'দেখসে' (=দেখ এসে)।

৭. -আ—প্রাচীন ও মধ্য বাঙলার কৃদন্ত অতীত ও ভবিষ্যৎকালে '-আ' (<-অক) প্রত্যয় প্রভূত পরিমাণে ব্যবহৃত হ'তো—'চলিলা, দেখিবা, খাইবা'। মধ্যযুগে এবং আধুনিক কালেও কবিতায় '-ল' -যুক্ত অতীত কালে যে '-আ' যুক্ত হয়, তা' স্বার্থিক প্রত্যয়ও হ'তে পারে।—'চতুর্দশ বর্ষ লাগি গেলা বনবাস'। আধুনিক বাঙলায় কোন কোন আঞ্চলিক উপভাষায় মধ্যম পুরুষে উক্ত দুই কালে এর বহুল ব্যবহার প্রচলিত আছে। -'তুমি দেখ্‌লা তো, এখন যাইবা না'; কোথাও কোথাও উত্তম পুরুষেও ব্যবহৃত হয়,—'আমি করবা-নে'।

(খ) যৌগিক কাল (Compound Tense)

বাঙলা ভাষার প্রাচীন যুগ থেকেই যৌগিক ক্রিয়ার ব্যবহার প্রচলিত ছিল ('গুণিয়া লেহু', ভান্তি ন বাসসি'—চর্যাপদ), কিন্তু যৌগিক কালের সৃষ্টি তখনও হয়নি। মধ্য-যুগের আদি পর্ব থেকেই 'আছ্'-ধাতুকে সমাপিকা ক্রিয়ারূপে এবং তৎপূর্বে অপর কোন ধাতুর অসমাপিকা রূপে (+ইয়া, +ইতে) ব্যবহার ক'রে যৌগিক ক্রিয়াপদ গঠনের বিশিষ্ট রীতি দাঁড়িয়ে যায়, এবং তা থেকেই 'যৌগিক কাল' সৃষ্ট হয়। 'রাখিআঁ ছিল', 'বসিয়া আছেন্ত', 'সুতিআঁ আছিলো'-জাতীয় যৌগিক ক্রিয়াপদগুলো আরও সন্নিকৃষ্ট হ'য়ে একপদীভূত হয় এবং সেরকম দৃষ্টান্তও 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'-এই বর্তমান,—'পাতিআছে, শুনিআছ, লইছে' প্রভৃতি। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে' '-ইতে'-যুক্ত যৌগিক ক্রিয়াপদ দুর্লভ ; তবে '-ইল' যুক্ত যৌগিক কালের পদ কয়েকটি পাওয়া যায়—'আলিছিল, ফুটিলছে, রহিলছে।'

যৌগিক ক্রিয়াপদগুলোই যে সন্নিকৃষ্ট হয়ে যৌগিক কালে পরিণত হয়েছে তার অন্যতম প্রমাণ—(১) এখনও যৌগিক কালের ক্রিয়াপদকে ভেঙ্গে মাঝখানে '-ই' বা '-ও' যোগ করা যায় ; যথা—'আমি তো করেছিলাম'-স্থলে অর্থান্তরের প্রয়োজনে বলি—'আমি তো **করে-ই-ছিলাম/করে-ও-ছিলাম'**। (২) আঞ্চলিক বিভাষায় কোন কোন যৌগিক কালের পদ যৌগিক ক্রিয়া দ্বারাই প্রকাশিত হয় ; যথা—'আমি **যাইতে আছি**/যাইত্যাছি/ যাইতাছি'। (৩) ভবিষ্যৎকালে 'আছ্'-ধাতু-স্থলে যখন 'থাক্-' ধাতু ব্যবহৃত হয় এবং পূর্ববর্ণের সঙ্গে সন্ধিবন্ধন সম্ভব নয়, তখন যৌগিক কাল স্পষ্টতঃ যৌগিক ক্রিয়ারূপেই বর্তমান রয়েছে ; যথা—'করিতে/করতে থাকিব/থাকতো, করে থাকবো' প্রভৃতি।

যৌগিক ক্রিয়ার সঙ্গে যৌগিক কালের সম্পর্কটি এবং পার্থক্যটিও খুবই স্পষ্ট। যৌগিক ক্রিয়াপদের প্রথম '-ইতে/-ইয়া' যুক্ত অসমাপিকা ক্রিয়া ও পরে যে কোন সমাপিকা ক্রিয়া ব্যবহৃত হয়, তবে পরেরটি 'আছ্', -ধাতু হ'লেই যৌগিক কালের সঙ্গে সম্পর্কটা বোঝানো যায়। 'পড়িয়া আছে' এবং 'পড়িয়াছে'—এই দু'টি রূপের মধ্যে প্রথমটি ক্রিয়াপদ, এখানে 'আছ্' ধাতুর অর্থই প্রাধান্য পেয়েছে এবং ক্রিয়াপদ দুটো পৃথক্ পৃথগ্‌ভাবে অবস্থান করছে। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে ক্রিয়াপদ দুটো মিলিত হয়ে একপদে পরিণত হ'য়েছে এবং 'পড়্' ধাতুর অর্থ প্রাধান্য পেয়েছে,—'আছ্' ধাতুর অর্থ গৌণ।

বাঙলায় যৌগিক কালের দুটি ধারা ঃ—(১) প্রথমাংশটি '-ইয়া'-যুক্ত অসমাপিকা এবং পরের অংশটি 'আছ্' ধাতুর সমাপিকার রূপ ; দু'য়ের যোগে যে পদ গঠিত হয় তার সাহায্যে **'সম্পন্ন কাল** বা **পুরাঘটিত কালে'র** বোধ জন্মায়। (২) প্রথমাংশটি

'-ইতে'-যুক্ত অসমাপিকা এবং পরের অংশটি 'আছ্' ধাতুর সমাপিকার রূপ। 'দু'য়ের যোগে যে পদ গঠিত হয়, তার সাহায্যে **'অসম্পন্ন কাল'** বা **'ঘটমান কালে'র** বোধ জন্মায়।

১· **সম্পন্ন কাল/পুরাঘটিত কাল ঃ**—বর্তমান, অতীত এবং ভবিষ্যৎ ভেদে সম্পন্ন কাল বা পুরাঘটিত কাল ত্রিবিধ। প্রতিটি ক্ষেত্রেই পদের পূর্বাংশে থাকে 'ইয়া' অসমাপিকা এবং অপরাংশ 'আছ্' ধাতুর বিভিন্ন কালের রূপ। সাধুভাষা ও শিষ্ট কথ্যভাষায় 'আছ্' ধাতুর 'আ'-লোপ পায় এবং 'আছ্' ধাতুর ব্যবহারের উপরই ক্রিয়ার কাল নির্ভর করে।—বর্তমান কাল—'করিয়া+আছে>করিয়াছে (>করেছে [শিষ্ট], কইর্যাছে>করছে [বঙ্গালী])। অতীতকাল—'খাইয়া+(আ) ছিল' >খাইয়াছিল (>খেয়েছিল [শিষ্ট], >খাইছিল [বঙ্গালী])'। ভবিষ্যৎকাল—'করিয়া+থাকিবে' >করিয়া থাকিবে (>ক'রে থাকবে)—ভবিষ্যৎকালের এই রূপটিকে কেউ কেউ যৌগিক কালের মর্যাদা না দিয়ে শুধু যৌগিক ক্রিয়ারূপেই অভিহিত করতে চান। এখানে যৌগিক ক্রিয়া অস্বীকার করা যায় না সত্য, কিন্তু যৌগিক কালটিকেও অস্বীকার করবার সার্থকতা বোঝা যায় না।

মধ্যযুগে এবং আধুনিক যুগের কোন কোন আঞ্চলিক বিভাষায় সম্পন্নকালে 'ইয়া-' স্থলে-'ইল' যুক্ত রূপের পরিচয় পাওয়া যায়। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'-এ 'ফুটিল্‌ছে, রহিল্‌ছে, আলিছিল' প্রভৃতি এবং আধুনিক আঞ্চলিক বিভাষায় 'গেল্‌ছে' (=গিয়াছে), 'গেলছিল' (=গিয়াছিল), 'হল্‌ছে' (=হইয়াছে) প্রভৃতি। কাল ও পুরুষ-ভেদে ক্রিয়াপদের যে রূপান্তর ঘটে, তা' 'আছ্' ধাতুর নির্দেশক অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ কালেরই অনুরূপ।

২· **অসম্পন্ন কাল / ঘটমান কাল ঃ**—সম্পন্ন কালের মতই অসম্পন্ন বা ঘটমান কালও বর্তমান, অতীত এবং ভবিষ্যৎ-ভেদে ত্রিধাবিভক্ত। এই কালে ক্রিয়াপদের পূর্বাংশ '-ইতে-' যুক্ত অসমাপিকা ক্রিয়া এবং শেষাংশে 'আছ্' ধাতুর সমাপিকা কালের রূপ যুক্ত হয়। 'আছ্' ধাতুর রূপের উপরই বর্তমান, অতীত বা ভবিষ্যৎ কাল নির্ভর করে। মধ্যবাঙলায় ঘটমানতা বোঝানোর জন্যে '-ইতে+আছ' প্রয়োগ আছে, তবে খুব অল্প। যথা—'কালিনীর তীরে বহে মন্দ পবনে। তোমাক চিন্তিত আছে নন্দের নন্দনে।'

বর্তমান কাল—'করিতে আছে>করিতেছে ('করছে [শিষ্ট], করতে আছে > 'করতাছে [বঙ্গালী])। অতীত কাল—'করিতে+(আ) ছিল>করিতেছিল ('করছিল [শিষ্ট], করতে আছিল্, করতাছিল্ [বঙ্গালী])। ভবিষ্যৎ কাল—'করিতে+ থাকিব>করিতে থাকিব ('করতে থাক্‌বো') [শিষ্ট])। ভবিষ্যৎ ঘটমান কালকেও অনেকেই যৌগিক কাল না বলে শুধু যৌগিক পদ বলে মনে করেন।

[সাত] ক্রিয়াপদের বিভিন্ন ভাব ও কালে রূপ-বৈচিত্র্য

প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা থেকে বিবর্তনের বিভিন্ন স্তরে ক্রিয়ারূপ তার বহু ঐশ্বর্য হারালেও আধুনিক বাঙলা পর্যায়ে এসে ভাব ও কালের বৈচিত্র্যে আবার 'তা' পূর্ণ মর্যাদায় অভিষিক্ত হ'য়েছে। বস্তুতঃ আধুনিক কালের বাঙলা ভাষা বর্তমান, অতীত এবং ভবিষ্যৎ ভেদে মূল ত্রিকালে বিভক্ত হ'লেও প্রতিটি কালের অভ্যন্তরেই এত বিচিত্র ব্যাবহারিক পার্থক্য অনুভূত হয় যে বাঙলা কালের অন্যূন ১৬টি বা ১৮টি রূপান্তর লক্ষ্য করা যায়।

(ক) ॥ বর্তমান কালের রূপ পাওয়া যায় অন্ততঃ সাতটি।

১. 'সাধারণ / অনির্দিষ্ট / নিত্য 'বর্তমান' (Simple Present / Present Indefinite) ঃ—'আমি করি', 'তোমরা যাও'। অতীত ঘটনা বা ঐতিহাসিক ঘটনাও 'নিত্য বর্তমান'-রূপে ব্যবহৃত হ'তে পারে।—'রামচন্দ্র অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন করেন।' 'সূর্য পূর্বদিকে উদিত হয়।'

২. 'ঘটমান বর্তমান' (Present Continuous) ঃ—যে ক্রিয়ার সমাপ্তি হয়নি, এখনো চলছে, তেমন ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়।—'আমি করছি'।

৩. 'পুরাঘটিত বর্তমান' (Present Perfect)—ক্রিয়াটি সমাপ্ত হ'লেও ফল এখনো চলছে।—'আমি করেছি'।

৪. 'নিত্যবৃত্ত বর্তমান' (Recurring Present) ঃ—ক্রিয়াটির পৌনঃপুনিক সম্পাদনে ব্যবহৃত হয়। এটিকে এখনো অনেকেই পৃথক্ কালের স্বীকৃতি দান করেন নি।—'আমি ক'রে থাকি।'

৫. 'ঘটমান নিত্যবৃত্ত বর্তমান' (Habitual Present Continuous) ঃ—এটিরও এখনো পূর্ণ স্বীকৃতি মেলেনি।—সে আসুক, ততক্ষণ আমি কাজটা 'করতে থাকি'।

৬. 'পুরাঘটিত ঘটমান বর্তমান' (Present Perfect Continuous)—এতদিন ধরে তো কাজটা আমিই 'ক'রে আসছি'।

৭. 'বর্তমান অনুজ্ঞা' (Present Imperative)—'তুমি যাও'।

(খ) ॥ অতীত কালেও বর্তমান কালের মতোই ক্রিয়াপদের সপ্তবিধ রূপান্তর লক্ষ্য করা যায়।

৮. 'সামান্য' / 'সদ্য অতীত' (Simple Past) ঃ—অনির্দিষ্টতা-সূচক অতীত কাল বোঝাতে ব্যবহৃত হয়।—'আমি করলুম / -লেম, লাম'।

৯. 'ঘটমান অতীত' (Past Continuous)—'আমি করছিলুম / -লেম,-লাম'।

১০· 'পুরাঘটিত অতীত' (Past Perfect) ঃ—বহু পূর্বে ঘটিত ক্রিয়ার কাল, যার ফল বিদ্যমান না-ও থাকতে পারে। 'একবার তো আমি করেছিলাম, এখন আর মনে নেই।'

১১· 'নিত্যবৃত্ত অতীত' (Habitual Past) ঃ—ক্রিয়ায় কর্তার অভ্যস্ততা ছিল—এই অর্থে ব্যবহৃত হয়।—'আমি করতুম্ / -তেম, -তাম্'।

১২· 'ঘটমান নিত্যবৃত্ত অতীত' (Habitual Past Continuous) ঃ—অতীতে যে ক্রিয়া অনেকক্ষণ ধরে চলতো। এটিকে অনেকেই পৃথক্ কালরূপ বলে স্বীকার করেন না।—'সে বলতে থাকতো, আমি ক'রে যেতে থাকতাম'।

১৩· 'পুরা নিত্যবৃত্ত অতীত' (Habitual Past Perfect) ঃ—এতে ক্রিয়া-সম্পাদনের সময় কর্তার অবস্থানের বা তার সম্ভাবনার ভাব প্রকাশিত হয় বলে একে 'পুরা সম্ভাব্য নিত্যবৃত্ত'ও বলা হয়।—'সে ক'রে থাকতো।'

১৪· 'পুরাঘটিত ঘটমান অতীত' (Past Perfect Continuous)—'সে ক'রে আসছিল।'

(গ) ॥ ভবিষ্যৎ কালে ক্রিয়ার রূপ পাওয়া যায় মাত্র চারটি ঃ

১৫· 'সাধারণ ভবিষ্যৎ' (Future Indefinite)—'আমি করবো'।

১৬· 'ঘটমান ভবিষ্যৎ' (Future Continuous)—'আমি করতে থাকবো'।

১৭· 'পুরাঘটিত ভবিষ্যৎ' (Future Perfect)—বাক্যের গঠনটি ভবিষ্যৎ কালের হলেও এর ক্রিয়াটি ঘটে অতীতে এবং তা-ও সংশয়পূর্ণ। কাজেই এটি আসলে, 'সম্ভাব্য অতীতকাল' মাত্র। 'হয়তো করে থাকবো মনে নেই।'

১৮· 'ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞা' (Future Imperative)—'তুমি যেয়ো'।

	সাধারণ/ সামান্য	ঘটমান	পুরা- ঘটিত	নিত্যবৃত্ত	ঘটমান নিত্যবৃত্ত	পুরাঘটিত নিত্যবৃত্ত	পুরাঘটিত ঘটমান	অনুজ্ঞা
বর্তমান	যাই, যাও, যা, যায়, যান।	যাচ্ছি, যাচ্ছ, যাচ্ছিস্, যাচ্ছে, যাচ্ছেন।	গিয়েছি, গিয়েছ গিয়েছে।	গিয়ে থাকি	যেতে থাকি		গিয়েছি আসছি	তুমি যাও
অতীত	গেলাম/ গেলুম/ গেলেম	যাচ্ছি-লাম/ -লুম/ -লেম	গিয়ে ছিলাম/ -ছিলুম/ -ছিলেম	যেতাম যেতুম/ যেতেম	যেতে থাকতাম	গিয়ে থাকতাম	গিয়েছিলাম আসছিলাম	
ভবিষ্যৎ	যাব/-বো	যেতে থাকবো	গিয়ে থাকবো					তুমি যেয়ো

বাঙ্‌লায় প্রচলিত ক্রিয়ার কাল ও ভাবের রূপ

'কর্‌'-ধাতু-অবলম্বনে

			উত্তম পুরুষ	মধ্যম পুরুষ সাধারণ	মধ্যম পুরুষ তুচ্ছার্থক/অন্তরঙ্গ	প্রথম পুরুষ	মধ্যম ও প্রথম সম্ভ্রমাত্মক
মৌলিক কাল	তিঙন্ত মৌলিক	বর্তমান নির্দেশক	করি	কর	করিস্‌	করে	করেন
		অনুজ্ঞা	—	কর	কর্‌	করুক	করুন
		ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞা	—	করিও ক'রো	করিবি করিস্‌	করিবে করবে	করিবেন করবেন
	কৃদন্ত মৌলিক	অতীত নির্দেশক	করিলাম কর্‌লাম	করিলে কর্‌লে	করিলি কর্‌লি	করিল কর্‌লো	করিলেন কর্‌লেন
		নিত্যবৃত্ত নির্দেশক	করিতাম কর্‌তাম	করিতে করতে	করিতিস্‌ কর্‌তিস্‌	করিত কর্‌তো	করিতেন কর্‌তেন
		ভবিষ্যৎ নির্দেশক	করিব করবো	করিবে করবো	করিবি কর্‌বে	করিবে কর্‌বে	করিবেন কর্‌বেন
যৌগিক কাল		ঘটমান বর্তমান	করিতেছি করছি	করিতেছ কর্‌ছো	করিতেছিস্‌ করছিস্‌	করিতেছে করছে	করিতেছেন করছেন
		পুরাঘটিত বর্তমান	করিয়াছি করেছি	করিয়াছ কবেছো	করিয়াছিস্‌ করেছিস্‌	করিয়াছে করেছে	করিয়াছেন করেছেন
		ঘটমান অতীত	করিতেছিলাম কর্‌ছিলাম	করিতেছিলে কর্‌ছিলে	করিতেছিলি কর্‌ছিলি	করিতেছিল কর্‌ছিল	করিতেছিলেন কর্‌ছিলেন
		পুরাঘটিত অতীত	করিয়াছিলাম করেছিলাম	করিয়াছিলে করেছিলে	করিয়াছিলি করেছিলি	করিয়াছিল করেছিল	করিয়াছিলেন করেছিলেন
		ঘটমান নিত্যবৃত্ত অতীত	করিতে থাকিতাম করতে থাকতাম	করিতে থাকিতে করতে থাকতো	করিতে থাকিতিস্‌ করতে থাকতিস্‌	করিতে থাকিত করতে থাকতো	করিতে থাকিতেন করতে থাকতেন
		পুরাঘটিত নিত্যবৃত্ত	করিয়া থাকিতাম করে থাকতাম	করিয়া থাকিতে করে থাকতে	করিয়া থাকিতিস্‌ করে থাকতিস্‌	করিয়া থাকিত করে থাকতো	করিয়া থাকিতেন করে থাকতেন

		উত্তম পুরুষ	মধ্যম পুরুষ সাধারণ	মধ্যম পুরুষ তুচ্ছার্থক/অন্তরঙ্গ	প্রথম পুরুষ	মধ্যম ও প্রথম সম্ভ্রমাত্মক
যৌগিক কাল	ঘটমান ভবিষ্যৎ	করিতে থাকিব করতে থাকবো	করিতে থাকিবে করতে থাকবে	করিতে থাকিবি করতে থাকবি	করিতে থাকিবে করতে থাকবে	করিতে থাকিবেন করতে থাকবেন
	পুরাঘটিত ভবিষ্যৎ	করিয়া থাকিব করে থাকবো	করিয়া থাকিবে করে থাকবে	করিয়া থাকিবি করে থাকবি	করিয়া থাকিবে করে থাকবে	করিয়া থাকিবেন করে থাকবেন
	নিত্যবৃত্ত বর্তমান	করিয়া থাকি করে থাকি	করিয়া থাক ক'রে থাক	করিয়া থাকিস্ ক'রে থাকিস্	করিয়া থাকে ক রে থাকে	করিয়া থাকেন ক রে থাকেন
	ঘটমান নিত্যবৃত্ত বর্তমান	করিতে থাকি করতে থাকি	করিতে থাক করতে থাক	করিতে থাকিস্ করতে থাকিস্	করিতে থাকে করতে থাকে	করিতে থাকেন করতে থাকেন
	পুরাঘটিত ঘটমান বর্তমান	করিয়া আসিতেছি করে আসছি	করিয়া আসিতেছ ক'রে আসছো	করিয়া আসিতেছিস্ ক'রে আসছিস্	করিয়া আসিতেছে ক'রে আসছে	করিয়া আসিতেছেন ক'রে আসছেন
	পুরাঘটিত ঘটমান অতীত	করিয়া আসিতেছিলাম ক'রে আসছিলাম	করিয়া আসিতেছিলে ক'রে আসছিলে	করিয়া আসিতেছিলি ক রে আস্‌ছিলি	করিয়া আসিতেছিল ক রে আস্‌ছিলে	করিয়া আসিতেছিলেন ক'রে আসছিলেন

বিংশ অধ্যায়

বাঙলা পদবিধি/বাক্যতত্ত্ব (SYNTAX)

আমাদের প্রথাগত ব্যাকরণ-অনুযায়ী অর্থাৎ গঠনগত এবং অর্থগত উভয় দিক্ বিচারে 'বাক্যে'র সংজ্ঞাটি এরূপ : "কোনও ভাষায় যে উক্তির সার্থকতা আছে, এবং গঠনের দিক হইতে যাহা স্বয়ংসম্পূর্ণ, সেইরূপ একক উক্তিকে ব্যাকরণে **বাক্য** (Sentence) বলা হয়।" (ডঃ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়)। আর একালের বর্ণনা-মূলক ভাষাবিজ্ঞানী L. Bloomfield 'বাক্য' সম্বন্ধে বলেন : 'an independent form, not included in any larger linguistic form.' অর্থাৎ ভাষার যে অবয়ব বা অঙ্গটি স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং যা অপর কোন বৃহত্তর অবয়ব বা অঙ্গের অংশ নয়, তাই হচ্ছে 'বাক্য'। অতএব বাক্য হ'লো ভাষা-প্রবাহের বৃহত্তম একক (unit)। ব্যাকরণ বা ভাষাবিজ্ঞানে বাক্য-সম্বন্ধীয় আলোচনাকে বলা হয় 'বাক্যতত্ত্ব' (Syntax)। বাক্যকে বিশ্লেষণ করলে আমরা দৃশ্যতঃ পাই কতকগুলি বিচ্ছিন্ন শব্দ (ব্যাকরণের ভাষায় 'পদ'), যেগুলি (বাংলা-ইংরেজি প্রভৃতি বিশ্লিষ্ট ভাষায়) অবস্থানগতভাবে পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কসূত্রে আবদ্ধ হ'য়ে বক্তার মনোভাব প্রকাশ করছে। অতএব বাক্যতত্ত্ব-আলোচনায় বাক্যে শব্দের অবস্থানগত প্রয়োগই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। শব্দ-বিষয়ক আলোচনা রূপতত্ত্ব (Morphology)-বিভাগের অন্তর্গত।

প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা তথা সংস্কৃত বহু শতাব্দীর বিবর্তনে মধ্যভারতীয় আর্যভাষা তথা প্রাকৃতের বিভিন্ন স্তর উত্তীর্ণ হ'য়ে আনুঃ দশম শতকের দিকে নব্য-ভারতীয় আর্যভাষা তথা বাঙলা, হিন্দী-আদি বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষায় পরিণতি লাভ করে। সংস্কৃত এবং প্রাকৃত ভাষার বিভিন্ন স্তরে গদ্যভাষা এবং পদ্যভাষা—দু'টিই সমান উৎকর্ষ লাভ করেছিল। সংস্কৃত গদ্য ও পদ্যে বাক্যে পদের অবস্থানগত কোন পার্থক্য ছিল না। সংস্কৃত বাক্যে শুধুমাত্র বিভক্তিযুক্ত শব্দ তথা পদই আশ্রয় পেতো; ফলতঃ ক্রিয়ার সঙ্গে কর্তা-আদি সম্পর্ক নিরূপণে কোন অসুবিধে হ'তো না, কারণ শব্দে বিভক্তিচিহ্ন দ্বারাই কারকের বোধ সৃষ্টি হ'তো। কাজেই ছন্দের প্রয়োজনে কিংবা ভিন্ন কারণে বাক্যে যে কোন পদকে খুশিমতো যে কোন স্থানে ব্যবহার করা যেতো। সংশ্লেষাত্মক সংস্কৃত ভাষার এই বৈশিষ্ট্য অনেকাংশে প্রাকৃত ভাষায়ও বর্তমান ছিল। প্রাকৃতে বিভক্তি সংখ্যা কমে গেলেও তেমন কোন অসুবিধে

হ'তো না, তবে বাক্যে পদের অবস্থান মোটামুটিভাবে নির্দিষ্ট হ'য়ে গিয়েছিল'। নব্য ভারতীয় আর্যভাষার যুগে, যেমন বাঙলায় প্রাচীন অধিকাংশ বিভক্তিচিহ্নই লোপ পেলো, নোতুন বিভক্তি চিহ্নও খুব বেশি তৈরি হয়নি, ফলে, বাক্যে বিভক্তিহীন শব্দ-ব্যবহারের স্বাধীনতা অনেকটা সংকুচিত হ'লো। অপর সকল বিশ্লেষাত্মক ভাষার মতোই বাঙলা ভাষায়ও বাক্যে পদের অবস্থান অনেকট সুনির্দিষ্ট হ'য়ে গেলো। বাক্যস্থ পদের অবস্থানের হেরফেরে অর্থপরিবর্তনের কিংবা অনর্থ ঘটবার সম্ভাবনা দেখা দিল।

বাঙলা ভাষার বয়স প্রায় হাজার বছর। এর মধ্যে খ্রীঃ দশম থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত বিস্তৃত আট শতাব্দীকাল শুধুই পদ্যের জলাভূমি, কাজেই এলোমেলো চলাফেরায় কোন অসুবিধে ছিল না। উনিশ শতকের আরম্ভ থেকেই গদ্যের ডাঙা জেগে উঠ'লো—অতএব পদক্ষেপের সবলতা ও সুনির্দিষ্টতার প্রয়োজন দেখা দিল। বাঙলা ভাষায় প্রাচীন যুগ ও মধ্যযুগে সব সাহিত্যই পদ্যে রচিত, এবং পৃথিবীর সব দেশের পদ্যকার তথা কবিরাই নিরঙ্কুশ। ছন্দ বজায় রাখবার প্রয়োজনে তাঁরা বাক্যে পদ-ব্যবহারের যথেচ্ছ স্বাধীনতা ভোগ ক'রে থাকেন, কাজেই বাঙলা বিশ্লেষাত্মক স্বল্পবিভক্তিক ভাষায় পরিণত হ'লেও পদ্যে পদবিন্যাসের কোন কঠোর নিয়ম তারা মেনে চলেন নি এবং তাতে অর্থগ্রহণেরও বিশেষ কোন অসুবিধে হ'তো না। যেমন—'রাবণে বধিল রাম লক্ষ্মণ সহায়'—পদ্যের এই বাক্যরীতিতে পরিবর্তন এনে—'বধিল রাবণে রাম সহায় লক্ষ্মণ' কিংবা 'লক্ষ্মণ সহায় রাম বধিল রাবণে' বা অপর কোন রকম পরিবর্তনেও অর্থ মূলতঃ বজায় থাকে। কিন্তু এর গদ্য রূপান্তর—'লক্ষ্মণকে সহায় ক'রে (করিয়া) রাম রাবণকে বধ করলেন (করিলেন)'—এর বিশেষ আর কোন পরিবর্তন চ'লে না।

প্রাচীন বাঙলার একমাত্র নিদর্শন চর্যাপদে যৌগিক বাক্য নেই ; সরল বাক্যে সাধারণতঃ প্রথমে কর্তা এবং শেষে ক্রিয়া ব্যবহৃত হ'তো, উভয়ের অন্তর্বর্তী স্থলে কর্ম-করণাদি বিভিন্ন কারকের স্থান ছিল। যথা—'কেহো কেহো তোহোরে বিরুআ বোলই' (কেহ কেহ তোমাকে বিরুআ বলে)। তবে বিভিন্ন কারক কিংবা বিশেষণ বা ক্রিয়া-বিশেষণ-আদি পদ কর্তার পূর্বেও ব্যবহৃত হ'তো। যথা—'রুখের তেন্তলী কুম্ভীরে খাঅ' (গাছের তেতুল কুমীরে খায়।) নঞর্থ অব্যয় 'ন', 'মা' সাধারণতঃ ক্রিয়ার পূর্বে ব্যবহৃত হ'তো—যথা, 'তরসন্তে (তরঙ্গন্তে) হরিণার খুর ন দীসঅ'। মধ্যযুগে বাঙলা ভাষায় বিস্তর গ্রন্থ রচিত হ'লেও তা' সবই ছিল পদ্যময়, কাজেই বাক্যে পদসংস্থাপনে কোন সুনির্দিষ্ট নীতির পরিচয় পাওয়া যায় না, মোটামুটিভাবে প্রাচীন যুগের রীতিই অনুসৃত হ'য়েছিল। তবে যৌগিক ক্রিয়াপদ, যৌগিক কাল, অসমাপিকা ক্রিয়া-আদির বহুল ব্যবহারের জন্য বাক্যে যথেষ্ট জটিলতার সৃষ্টি হ'য়েছিল।

উনবিংশ শতকের গোড়াতেই ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ স্থাপিত হ'বার পর প্রকৃতপক্ষে বাঙলা গদ্য সাহিত্যের উদ্ভব। ঐ সময় এবং তৎপূর্বেও বাঙলা গদ্য গ্রন্থ রচনায় য়ুরোপীয় পাদ্রীদের সক্রিয় অংশগ্রহণে এবং সমকালে ফার্সীই সরকারী ভাষারূপে পরিগণিত ছিল বলে বাঙলা গদ্যের গোড়ার দিকেই ফার্সী এবং ইংরেজি রীতির কিছু প্রভাব বাঙলাতেও পড়েছিল। এ জাতীয় রচনায় বিপর্যস্ত পদবিন্যাসরীতি একালের কানে শুধু অপরিচিত নয়, অর্থহীনও মনে হ'তে পারে। একটি মাত্র উদাহরণ—'জে কোন কেতাব না অদ্যাবধি প্রকাশ পাইয়াছে সিখাইতে তোমারদিগেরকে ইঙ্গরাজি কথা সহজে আর অনাআসে' ('সিক্ষ্যাগরু'-মিলার)। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিতবর্গ এর কথঞ্চিৎ সংস্কার-সাধনের পর রামমোহন ও সাময়িকপত্রের লেখকগণ বাঙলা গদ্য-রীতিকে একটা সুসমঞ্জস প্রতিষ্ঠা দান করেন। পরে বিদ্যাসাগরের রচনাতেই বাঙলা গদ্যের নিজস্ব ছন্দ এলো, এলো বাক্য-গঠনরীতির সুষম ভঙ্গি। বাঙলা গদ্যের সুচারু অনুশীলনের ফলে কালে কালে বাক্যে পদ স্থাপনের যে রীতি প্রচলিত হ'য়েছিল, তাকেই বাঙলা সাধু এবং শিষ্ট ভাষায় 'বাঙলা পদক্রম' বলে গ্রহণ করা হয়।

'বাংলা বাক্যে পদক্রম'ঃ—বাঙলা বাক্যতত্ত্বে 'পদক্রম'ই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয়। বিভক্তির সংখ্যাল্পতা এবং সুনির্দিষ্টতার অভাব-হেতু পদ সংস্থাপনা থেকেই ক্রিয়ার সঙ্গে বিভিন্ন পদের কারক-সম্বন্ধ নির্ণয় করতে হয়। পদক্রমের বিপর্যয়ে বাক্যের অভিপ্রেত অর্থের ব্যত্যয় ঘটতে পারে। তাই সাধারণভাবে বলা চলে, বাঙলা বাক্যে বিভিন্ন পদের অবস্থান মোটামুটিভাবে রীতিসিদ্ধ, তবে প্রচলিত রীতির ব্যতিক্রমও দুর্লক্ষ্য নয়। নিম্নে বাঙলা সাধু ও শিষ্ট ভাষার রীতিসিদ্ধ প্রয়োগ-অনুযায়ী প্রধান সূত্রগুলি প্রদত্ত হ'লো, প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে ব্যতিক্রমের উল্লেখ্য করা হ'লো।

১. বাক্যের দুইটি অংশ—উদ্দেশ্য ও বিধেয়। বাক্যের প্রথমে বসে উদ্দেশ্য এবং উদ্দেশ্যের প্রসারক উদ্দেশ্যেরও পূর্বে স্থান পায়। যথা—'আত্মীয়স্বজন-পরিবারবর্গ-সহ আমি গতকালই এখানে পেঁৗছেছি।' উদ্দেশ্য-প্রসারক বিশেষণ এবং সম্বন্ধ পদও সাধারণতঃ উদ্দেশ্যের পূর্বে বসে, তবে সম্বন্ধ পদ কচিৎ পরেও ব্যবহৃত হয়। যথা—'বাছা আমার কত দুঃখ পেয়েছে।' উদ্দেশ্যটি কখন কখন উহ্য থাকতে পারে। যথা—'খেয়ে উঠে আর (আমি) কিছুই দেখতে পেল্যুম না।'—এখানে ক্রিয়ার পুরুষ থেকেই কর্তাটি অনুমিত হয়।

২. বিধেয় অংশ উদ্দেশ্যের পর ব্যবহৃত হয়। সাধারণতঃ সমাপিকা ক্রিয়া বাক্যের সর্বশেষে অবস্থান করে, তবে নঞর্থক 'না' 'নাই'-এর স্থান ক্রিয়ারও পরে।—'অনেক

সন্ধান ক'রেও কিছুই তো দেখতে পেলাম না।' তবে বক্তার ইচ্ছা অনুযায়ী বিধেয় অংশ বিশেষত সমাপিকা ক্রিয়াপদটি কখন কখন কর্তার পূর্বেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে।—'দেখলাম তো আমি কত কিছুই, কিন্তু হ'লোটা কি শেষ পর্যন্ত।'

বাক্যে উদ্দেশ্য ও বিধেয় অংশের প্রসারককে বাদ দিয়ে প্রধান পদগুলি সম্বন্ধে বলা যায়, সাধারণতঃ বাক্যের পদক্রম পর পর এইভাবে সাজানো হয়; কর্তা, অসমাপিকা ক্রিয়া, করণ-অধিকরণ, গৌণকর্ম, মুখ্যকর্ম, ক্রিয়া ও নঞর্থ 'না / 'নাই'। আচার্য সুকুমার সেন বলেন ঃ "বাক্যের সর্বশেষ সমাপিকা ক্রিয়া—নঞর্থ না হইলে,—তাহার পূর্বে মুখ্য কর্ম, তাহার পূর্বে গৌণকর্ম, তাহার পূর্বে করণ অধিকরণ, তাহার পূর্বে অসমাপিকা (ও তদ্‌যুক্ত বাক্যাংশ), তাহার পূর্বে কর্তা। সমাপিকা ক্রিয়া বলিতে যুক্ত ও যৌগিক ক্রিয়া পদও ধরিতে হইবে।" বিধেয়ের প্রসারক এবং পূরকের স্থান ক্রিয়ার পূর্বে। তবে উক্ত প্রসারক দ্বারা যদি কোন প্রস্তাব উত্থাপিত বা অভিপ্রায় জ্ঞাপিত হয় তবে তা' উদ্দেশ্যের পূর্বেও ব্যবহৃত হ'তে পারে।—'তোমাদের সকলের মঙ্গলের জন্যই তো আমি কাজ ক'রে যাচ্ছি।' ক্রিয়াবিশেষণ প্রায়শঃ উদ্দেশ্যের পর ব্যবহৃত হ'লেও ঐরূপ বাক্যাংশ সাধারণতঃ উদ্দেশ্যের পূর্বেই বসে।—'কর্তৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হ'য়েই তিনি নানাবিধি-নিষেধ আরোপ করেন।' বিধেয় অর্থাৎ সমাপিকা ক্রিয়াটি কখন কখন উহ্য থাকতে পারে—'চরিত্রগর্বে গর্বিত পুরুষ দেবতার সমান।' কালবাচক ক্রিয়াবিশেষণ স্থানবাচক ক্রিয়াবিশেষণের পূর্বে বসে এবং উভয়ই উদ্দেশ্যেরও পূর্বে স্থান পেতে পারে।—'বিগত শতাব্দীতে কলকাতা নগরীতে অনেক ধনী বসবাস করতেন।'

৩. ক্রিয়ার পুরুষ কর্তার পুরুষের অনুরূপ হ'বে। বাক্যে অনেক কর্তা থাকলে উত্তমপুরুষের (অথবা উত্তমপুরুষের অভাবে মধ্যমপুরুষ) হবে প্রধান কর্তা এবং ক্রিয়া হ'বে তারই অনুগামী। এরূপ স্থলে উত্তম পুরুষ, তদভাবে মধ্যমপুরুষের কর্তাটি সর্বশেষ বসবে।—'রাম শ্যাম যদু মধু তুমি আমি সকলেই যাবো।'

৪. উদ্দেশ্য বা উদ্দেশ্যের প্রসারক-রূপে অনেক পদ ব্যবহৃত হ'লে শুধু শেষ পদের পূর্বেই সমুচ্চয়ার্থক বা বৈকল্পিক অব্যয় ব্যবহৃত হয়; তবে বহুপদ থাকলে কখন কখন এগুলিকে ক্ষুদ্র গুচ্ছে বন্ধ ক'রে প্রত্যেকটি অব্যয় দ্বারা যুক্ত হ'তে পারে।—'রাম, শ্যাম, যদু কিংবা মধু—যে কেউ কাজটি করতে পারে'; 'অর্থ ও প্রতিপত্তি, মান ও মর্যাদা, চারিত্র্য ও আভিজাত্য—কোন কিছুই তাঁকে এ বিপদ থেকে রক্ষা করতে পারলো না।'

৫. আশ্রিত খণ্ড বাক্যের স্থান মূল বাক্যের পূর্বে।—'যতই কর না কেন, ভবী ভোলবার নয়।'

৬· অনেকগুলি পদে একই শব্দ-বিভক্তি যোগের প্রয়োজন হ'লে সাধারণতঃ ঐ পদগুলিকে সমুচ্চয়ী অব্যয় দ্বারা যুক্ত ক'রে শেষ পদেই বিভক্তিচিহ্ন যোগ করা হয় (group inflection)।—'এটা রাম-শ্যাম-যদু-মধু কিংবা আমার কথা নয়।' তবে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে প্রতি পদেই বিভক্তিচিহ্ন যুক্ত হ'তে পারে।—'ভায়ের মায়ের এমন স্নেহ', 'চোখে মুখে কথা', 'আমার আর তোমার কাজ পৃথক্'।

৭· বাঙলা বাক্যে ক্রিয়াপদের কাল-গত সঙ্গতির অভাব রয়েছে। মূল বাক্যের ক্রিয়াপদের অনুসারী হ'বার কোন বাধ্য-বাধকতা বাঙলায় নেই। ইংরেজি বাক্যের সঙ্গে এখানে পার্থক্য সুস্পষ্ট।—'রাম তো বলে গেল ও বাড়ি থাক্‌বে না', 'তুমি বাড়ি এসে দেখবে, আঁধার হ'য়ে এলো।'

৮· পরোক্ষ উক্তিতেও পরিবর্তিত উক্তি মূল ক্রিয়াপদের কালকে অনুসরণ করে না, এখানেও ইংরেজির সঙ্গে পার্থক্য সুস্পষ্ট।—'রাম জানালো যে সে বাড়ি থাকবে না।'

৯· এক কর্তার অনেকগুলি সমাপিকা ক্রিয়াপদ থাক্‌লে সাধারণতঃ শেষ সমাপিকাটি বর্তমান রেখে অপরগুলিকে 'ইয়া'-যুক্ত অসমাপিকায় পরিণত করা হয়।—তুমি এখানে এসে দেখে শুনে কাজ কর্ম সেরে খেয়ে দেয়ে বিশ্রাম ক'রে তবে বাড়ি যেয়ো।'

১০· নঞর্থ 'না' সাধারণতঃ সমাপিকা ক্রিয়ার পর ও অসমাপিকা ক্রিয়ার পূর্বে বসে।—'তুমি কথাটা না শুনে এমন ক'রে চলে যেয়ো না।' সম্ভাবনা বা বিধি-ভাবে 'না' সমাপিকা ক্রিয়ার পূর্বে বসে।—'সে না দেয় তো আমিও দেবো না।'—বর্তমান কালের অনুজ্ঞা ভাবে 'না' ব্যবহৃত হয় না, এটি ভবিষ্যৎ কালের ক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত হয়। —'তুমি বসো কিন্তু শোবে না / শুয়ো না।' তবে নঞর্থ-ব্যতীত অন্য অর্থে (অনুরোধে) বর্তমান কালেও 'না' অনুজ্ঞায় ব্যবহৃত হয়।—'একবার দেখেই এসো না, ব্যাপারটা কী!' 'নাই'-যোগে বর্তমান কালের পদ অতীত কালের অর্থ প্রকাশ করে।—'দেখি নাই কভু, শুনি নাই কভু, এমন রাগিণী গাওয়া।' 'নাস্তি' অর্থে 'নাই' বর্তমানেও ব্যবহৃত হয়—'এতে আমার কোন ক্ষতি নাই।' ভবিষ্যৎ কালে ব্যবহৃত হয় না।

১২· নিত্যসম্বন্ধযুক্ত শব্দযুগলের মধ্যে একটি ব্যবহৃত হ'লে অপরটিও ব্যবহার করতে হয়, নতুবা বাক্য সম্পূর্ণ হয় না।—'যে সহে সে রহে।' 'যত মত তত পথ', 'যার কাজ তারেই সাজে, অন্য লোকে লাঠি বাজে।'

একবিংশতি অধ্যায়

বাঙলা ভাষার তিন যুগ

মধ্য ভারতীয় আর্যভাষা থেকে নব্য ভারতীয় আর্যভাষার উদ্ভব ঘটে আনুমানিক খ্রীঃ দশম শতকের দিকে। নব্যভারতীয় আর্যভাষার অন্যতম শাখারূপে বাঙলা ভাষারও আত্মপ্রকাশ ঘটে সম-সময়েই। কারো কারো মতে বাঙলা ভাষার জন্মকালকে আরো দুই শতাব্দী পিছনে সরিয়ে নেওয়া চলে, অর্থাৎ সে-মতে বাঙলা ভাষার উদ্ভবকাল খ্রীঃ অষ্টম শতাব্দী। তারপর সহস্রাব্দেরও অধিককাল নিরবচ্ছিন্ন গতিতে বাঙলা ভাষা এগিয়ে চলে ক্রম-বিবর্তনের পথ ধরে। এই সুদীর্ঘকালের অবকাশে অবশ্যই ভাষাদেহে নানা লক্ষণ-সমন্বিত বিভিন্ন স্তরচিহ্ন দেখা দিয়েছিল। তারই ভিত্তিতে বাঙলা ভাষার এই ক্রমপরিণতিকে তিনটি যুগে বিভক্ত করা হয়। (১) প্রাচীন যুগ বা আদিযুগ—খ্রীঃ অষ্টম/দশম শতক থেকে চতুর্দশ শতকের মধ্যবর্তীকাল (১৩৫০ খ্রীঃ) পর্যন্ত। (১ক) ক্রান্তিকাল—এর মধ্যে ১২০০ খ্রীঃ থেকে ১৩৫০ খ্রীঃ পর্যন্ত বিস্তৃত কালকে 'ক্রান্তি-কাল' বা 'যুগসন্ধিকাল'-রূপে গ্রহণ করা হয়। (২) মধ্যযুগ—খ্রীঃ ১৩৫০ অব্দ—১৮০০ খ্রীঃ। এই সুদীর্ঘ পর্বের মধ্যে একটা সময়ে (আ. ১৫০০ খ্রীঃ) ভাষা একটা মোড় নিয়েছিল বলে এই যুগটিকে (২ক) আদিমধ্যযুগ (১৩৫০ খ্রীঃ—১৫০০ খ্রীঃ) এবং (২খ) অন্ত্যমধ্যযুগ (১৫০০-১৮০০ খ্রীঃ)—এই দুই পর্বে বিভক্ত করা হয়। (২ গ) মধ্যযুগ ও আধুনিক যুগের অন্তর্বর্তী ১৭৬০ খ্রীঃ থেকে ১৮৫৮ খ্রীঃ পর্যন্ত প্রলম্বিত কালকে দ্বিতীয় 'ক্রান্তিকাল' বা 'যুগসন্ধিকাল'-রূপে গ্রহণ করা হয়। বাঙলা ভাষায় তৃতীয় যুগকে বলা হয় (৩) আধুনিক যুগ, তা শুধু ধরা হয় মোটামুটি ১৮০০ খ্রীঃ থেকে। এই যুগটিই বর্তমান কালে বিচিত্র ধারায় প্রবাহিত হ'য়ে চলছে।

[এক] বাঙলা ভাষার প্রাচীন যুগ/আদি যুগ

সাধারণভাবে খ্রীঃ দশম শতাব্দী থেকে বাঙলা ভাষার আদি যুগের শুরু বলে ধরা হয়। এই কালের ভাষার নিদর্শন পাওয়া যায় যে একমাত্র গ্রন্থ 'চর্যাপদে', সেই চর্যাপদের বিভিন্ন পদের যারা লেখক ছিলেন, তাঁদের কেউ কেউ দশম শতাব্দীর পূর্বেই, এমনকি অষ্টম শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন—কোন কোন মহলে এরকম দাবি উত্থাপিত হ'য়ে থাকে। এই দাবির প্রতি যোগ্য সম্মান দেখানোর জন্যই বাঙলা ভাষার উৎপত্তিকালকে খ্রীঃ অষ্টম শতাব্দীতে টেনে নিয়ে যাওয়া যায়। প্রাচীন যুগের বিস্তৃতি-

কাল চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগ অর্থাৎ ১৩৫০ খ্রী· পর্যন্ত। এর মধ্যে তুর্কী আক্রমণ এবং বাঙলা দেশে তাদের শাসন প্রতিষ্ঠা কালটিকে অর্থাৎ ১২০০ খ্রীঃ থেকে ১৩৫০ খ্রীঃ পর্যন্ত যুগসন্ধিকাল বা 'ক্রান্তিকাল' বলে আখ্যায়িত করা হয়। এই যুগে রচিত কোন সাহিত্য কিংবা ভাষাতাত্ত্বিক নিদর্শন আবিষ্কৃত না হওয়াতে কার্যতঃ প্রাচীন যুগের স্থিতিকালকে ৯৫০ খ্রীঃ—১২০০ খ্রীঃ রূপে চিহ্নিত করা হয়। এই ক্রান্তিকালটি ছিল বাঙালীর মানস-প্রস্তুতি কাল।

(ক) ॥ **প্রাচীন বাঙলার উপাদান** ঃ—আদিযুগের বাঙলা ভাষার নিদর্শন পাওয়া যায় এমন উপাদানসমূহের মধ্যে গ্রন্থ মাত্র একটিই—'চর্যাপদ' বা 'চর্যাগীতিকোষ'। চর্যাপদের ভাষাকে আদি বাঙলার নিদর্শনরূপে গ্রহণ করা হ'লেও স্থিরবিচারে একে বলা হয় 'প্রত্নবাঙলা' অর্থাৎ বাঙলা ভাষার জন্মলগ্নে এ ভাষা তৈরি হ'য়েছিল, ফলে যে অবহট্‌ঠের খোলস ছেড়ে এ ভাষা বেরিয়ে এলো, সেই অবহট্‌ঠেরও কিছু চিহ্ন এর দেহে বর্তমান রয়েছে। চর্যাপদ-ছাড়া অন্য যে সকল সূত্র থেকে আমরা আদি বাঙলার নিদর্শন পেয়ে থাকি তাদের মধ্যে আছে (১) ধর্মদাস-রচিত 'বিদগ্ধমুখমণ্ডন'-গ্রন্থে উদ্ধৃত অল্পসংখ্যক ছড়া এবং বিচ্ছিন্ন বাঙলা শব্দ [একটি শ্লোকে আছে—'ভোজন কৌতর বাচা হরিণামাংশকভাজা'—শ্লোকটি দ্ব্যর্থবোধক এবং শ্লেষঅলংকারের নিদর্শন, এর একটি অর্থে 'কৌতর' (কবুতর>কউতর, আঞ্চলিক বিভাষায় 'কইতর'); 'বাচা' (বাঙলার প্রসিদ্ধ মাছ), 'ভাজা'—প্রভৃতি শব্দকে বাঙলা ভাষার নিদর্শন বলেই গ্রহণ করা চলে], (২) 'সেকশুভোদয়া' গ্রন্থে সংকলিত কয়েকটি গান ও ছড়া, (৩) দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বন্দ্যঘটীয় সর্ব্বানন্দ-কৃত 'টীকাসর্বস্ব' ('অমরকোষের' ব্যাখ্যা) গ্রন্থে চার শতাধিক বাঙলা তদ্ভব ও দেশি শব্দের প্রয়োগ আছে; এদের মধ্যে আছে='অম্বাড় (আমড়া), উআরি (<উপকারিকা=কাছারি বাড়ি), ওসার (বস্ত্রের পরিসর), কালজা (কলিজা), খড়াকি (খিড়কি), খিরিসা (ঘন ক্ষীর), চিড়া, ঝাবু (ঝাউ), টের, তেলাকুচ, পগার, বাদিয়া, মাল (সাপের ওঝা), হাথইড়া (হাতুড়ে)' প্রভৃতি শব্দ; প্রাচীনকালে রচিত কোন কোন গ্রন্থ, তাম্রশাসন কিংবা ভূমিদানপত্রে কিছু কিছু গ্রামের নাম এবং বাঙলা শব্দের উল্লেখ পাওয়া যায়। গ্রাম-নামের মধ্যে আছে—'অম্বয়িল্লা (আমুলে), বাল্লহিট্টা (বালুটে), বেতড্ড (বেতড়), মোড়ালন্দী' (মুড়ুন্দী) প্রভৃতি; শব্দের মধ্যে আছে—'আঢ়া (ধানের মাপ), খাড়ি, খিল (আচষা জমি), জোল (নালা), নাল, বরজ' প্রভৃতি। এছাড়া 'অভিলষিতার্থচিন্তামণি' (১১২৯ খ্রীঃ)। 'মানসোল্লাস' নামক একটি সংস্কৃত কোষগ্রন্থের 'গীতবিনোদ' নামক অংশে প্রাপ্ত কয়েকটি পংক্তির ভাষাকে আচার্য সুনীতিকুমার প্রাচীন বাঙলা বলে মনে করেন ঃ—

"ছাংড়ু ছাংড়ু মই" জাইবো গোবিন্দসহ খেলণ…নারায়ণু জগহ-কেরু গোসাংৱী"
প্রভৃতি।

বাঙলা ভাষার আদিযুগের বৈশিষ্ট্য-নির্ণয় এবং লক্ষণ-বিচারে বস্তুতঃপক্ষে 'চর্যাপদ'ই আমাদের একমাত্র অবলম্বন। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী-কর্তৃক নেপাল রাজদরবার থেকে উদ্ধার করা প্রাচীন পুঁথি চর্যাপদে যে বাঙলা ভাষার আদিস্তরের নিদর্শন বর্তমান, আচার্য সুনীতিকুমার তা' নিঃসন্দিগ্ধভাবেই প্রমাণ করেছেন। চর্যাপদের ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে আচার্যদেবের অভিমতই সমর্থিত হয়ে থাকে। তবে এ প্রসঙ্গে স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, ঐ কালে সমগ্র ভারতে শৌরসেনী অবহট্‌ঠই ছিল শিষ্টজনসম্মত সাধুরীতির দেশীয় ভাষা ; অতএব তৎকালীন জানপদ ভাষা বাঙলা তখনো সম্পূর্ণভাবে অবহট্‌ঠের কুক্ষিমুক্ত হ'তে পারেনি। দ্বিতীয়তঃ, এই গড়ে উঠ্‌বার যুগে পূর্বাঞ্চলীয় ভাষাগুলোও সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য লাভ ক'রে উঠ্‌তে পারেনি অর্থাৎ অসমীয়া, ওড়িয়া ও মৈথিলি ভাষার সঙ্গে বাঙলা ভাষার তখনো ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বর্তমান ছিল। কাজেই চর্যাপদের ভাষায় প্রাগুক্ত আঞ্চলিক ভাষাসমূহের এবং অবহট্‌ঠের কিছু কিছু প্রভাব রয়েই গেছে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও ধ্বনি তত্ত্ব, পদ, ইডিয়ম্‌ বা বাগ্‌রীতি এবং প্রবচনের বিচারে চর্যাপদের ভাষাকে সুনির্দিষ্টভাবে বাঙলা ভাষারূপে গ্রহণ করা ছাড়া গত্যন্তর নেই।

(খ) ॥ চর্যার ভাষায় অপভ্রংশ-অবহট্‌ঠ লক্ষণ ঃ

শিস্‌ধ্বনি (শ/স) স্থলে 'হ' প্রবণতা—'দশ > দহ', ফলে স্ম > হঁ' হলো।—তস্মিন্‌ > তহিঁ।

নব্য ভারতীয় আর্যভাষায় যুগ্মব্যঞ্জন সরলীকৃত হয় ও তৎপূর্ববর্তী হ্রস্বস্বর পূরক-দীর্ঘতা লাভ করে। এটি এ যুগের ভাষার বিশেষ লক্ষণ। কিন্তু চর্যার ভাষায় অনেক সময় তার ব্যতিক্রম দেখা যায় এবং এটি অবহট্‌ঠ প্রভাবজাত। 'অচ্ছন্তে, দুট্‌ঠ, মিচ্ছা, পেম্ম, সংপুন্না' প্রভৃতি রয়ে গেছে।

শব্দরূপে অবহট্‌ঠের বিভক্তিচিহ্ন কোথাও কোথাও অক্ষুণ্ণ রয়েছে। কর্তায় '-ও' বিভক্তি (জো, সো), করণে '-ই/-ইঅ' বিভক্তি (ভক্তি সমাহিঅ), অপাদানে 'হু/হুঁ' বিভক্তি (গগনহু, খনহুঁ), সম্বন্ধ পদে '-হ' বিভক্তি (খনহ) এবং অধিকরণে '-হিঁ/-হি' বিভক্তি (দিবসহি)।

সর্বনামের কতকগুলি রূপও যথার্থ বাঙলা নয়। —'জো, সো, অইসন, কইসে, জিম,' প্রভৃতি।

ক্রিয়াবিভক্তির বিভিন্ন রূপেও অবহট্‌ঠ-প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। বর্তমান কালে

উত্তম পুরুষের বিভক্তি '-মি' (পুছমি), বর্তমান অনুজ্ঞা মধ্যম পুরুষে '-হি' (হোহি) বহুবচনে '-হু' (অচ্ছহু), অনুজ্ঞায় নিষেধার্থ 'মা' যোগ (মা হোহি)।

'-ই/-ইউ'-যুক্ত নিষ্ঠান্ত পদের অর্থাৎ বাঙলার নিজস্ব '-ল' প্রত্যয়বিহীন অতীতের ব্যাপক ব্যবহার। বিকসিউ, বাহিউ, গউ প্রভৃতি। '-ল' যুক্ত অতীতে বিশেষণসূচক স্ত্রী প্রত্যয়ের ব্যবহার।—'সোনে ভরিলী করুণা নাবী', 'লাগেলী আগি', 'এর'-যুক্ত সম্বন্ধ পদেরও স্ত্রীপ্রত্যয় গ্রহণ—'হাড়েরি মালী'।

চর্যাপদের ছন্দ অবহট্‌ঠ-সুলভ মাত্রাবৃত্ত (একালের পরিভাষায় প্রত্নমাত্রাবৃত্ত)-ধর্মী পাদাকুলক ছন্দ এবং অন্ত্যানুপ্রাসযুক্ত।

(গ) ॥ **প্রাচীন বাঙলা ভাষার বৈশিষ্ট্য ঃ**

চর্যাপদের ভাষার ব্যাকরণগত বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনা করলেই একদিকে যেমন বাঙলা ভাষার স্বরূপ লক্ষণগুলো স্পষ্ট হ'বে, অন্যদিকে তেমনি আদিস্তরের বাঙলা ভাষার বৈশিষ্ট্যও সুস্পষ্ট হ'য়ে উঠ্‌বে। এর জন্য ধ্বনিগত, রূপগত ও বাক্যগত—এই তিনদিক থেকেই এর ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ প্রয়োজন।

ধ্বনিগত বৈশিষ্ট্য ঃ—চর্যাপদের ভাষার ধ্বনিতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে এর নব্যভারতীয় আর্যভাষার প্রধান বৈশিষ্ট্যটি সুস্পষ্ট—সংস্কৃতের যুক্তব্যঞ্জন প্রাকৃতে যুগ্মব্যঞ্জনে পরিণত হ'য়েছিল ও তৎপূর্বস্বর হ্রস্ব হয়েছিল (কার্য > কজ্জ); নব্য ভারতীয় আর্যে তথা চর্যাপদে পাচ্ছি যুগ্ম ব্যঞ্জনের একক ব্যঞ্জনে পরিণতি এবং পূর্ববতী হ্রস্বস্বরের পরিপূরক দীর্ঘীকরণ (compensatory lengthening)—'ধর্ম>ধম্ম>ধাম', 'জন্ম >জম্ম>জাম', দর্পণ>দপ্পন>দাপন'। অবশ্য চর্যাপদে এর ব্যতিক্রমও রয়েছে, যথা—'মিথ্যা>মিচ্ছা>মিছা (চর্যায় 'মিচ্ছা', 'মিছে'—দুই-ই বর্তমান), 'আঁচ্ছিলে' এবং 'অছিলে' দু'টিই বর্তমান। চর্যাপদে পদান্তস্থিত স্বরধ্বনি বর্তমান ছিল, যথা—'ভণতি>ভণই', 'পুস্তিকা>পোত্থিআ>পোথী', বান্ধ, আশ' প্রভৃতি। পদান্তে ও পদমধ্যে স্বর-মধ্যবর্তী ব্যঞ্জনলোপের ফলে পাশাপাশি অবস্থিত 'উদ্‌বৃত্ত স্বর' (১) কখনও বর্তমান রয়েছে,—'সকল>সঅল', 'নূপুর>নেউর', 'সরোবর>সরোঅর', (২) কখনও একস্বরে পরিণত হয়েছে—'ছাড়িঅ>ছাড়ি', 'জাইউ>জাউ', অন্ধআর>অন্ধার', (৩) কখনও বা য়-শ্রুতি ও ব-শ্রুতির আগম ঘটেছে,—'নিকটে>নিঅডি>নিয়ড্ডি', 'ত্রিভুবন >তিহুঅণ>তিহুবণ', 'আবই, কবড়ী' প্রভৃতি। উচ্চারণে 'ন' এবং 'ণ'-র মধ্যে পার্থক্য বিলুপ্ত হ'য়েছিল, তাই বানানে কোন পার্থক্য নেই—'ণিঅ/নিঅ', 'নাবী/ণাবী'। চর্যাপদে শিস্ ধ্বনিগুলোর (শ ষ, স) যথেচ্ছ ব্যবহার থেকে অনুমিত হয় যে 'তালব্য ধ্বনি' তখনই প্রতিষ্ঠিত হ'য়ে গিয়েছিল,—'শূণ/সুন', 'মূষা/মুসা', 'ষহজে/সহজে'

প্রভৃতি। পদের আদিতে 'য' এখানকার মতোই 'জ'-ধ্বনিতে পরিণত হয়েছিল,' বানানে আদি 'য' প্রায় সর্বত্র 'জ' রূপ লাভ করেছে,—'জাই, জায়, জায়া'। হ্রস্ব এবং দীর্ঘ-স্বরের উচ্চারণ-পার্থক্যও মনে হয় সে যুগেই লোপ পেয়েছিল, তাই একটির স্থলে অপরটি নির্বিচারে ব্যবহৃত হ'তো—'দিসই/দীসঅ', 'শবরি/সবরী', 'জোই/জোঈ'। কিন্তু ছন্দে দীর্ঘস্বরের মূল্য অনেক সময় স্বীকৃতি পেয়েছে। শ্বাসাঘাত রীতিতে বাঙলার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আদি যুগেই ফুটে উঠ্‌তে আরম্ভ করেছে, তাই সর্বভারতীয় স্তরে যেখানে অনাদ্যস্বরে শ্বাসাঘাত, বাঙলায় সেখানে আদ্যস্বরে শ্বাসাঘাত রীতি প্রচলিত হ'তে আরম্ভ করেছে। তাই শব্দের আদ্যক্ষর অনেক সময়ই দীর্ঘ হ'তো,—'অলো/আলো', 'অকট/আকট', 'আণুতু (<অনুত্তর)'। অবশ্য এই 'আ'-কারের অপর একটি সম্ভাব্য কারণও রয়েছে। বর্তমান কালে বাঙলা ভাষায় 'অ'-কারের উচ্চারণ 'সংবৃত' (ɔ), কিন্তু সংস্কৃতে/প্রাকৃতে ছিল 'আ'-কারের হ্রস্বরূপ, আদিযুগের বাঙলাতেও হয়তো তার প্রভাব ছিল, তখনও 'অ'-কারের উচ্চারণ ছিল 'বিবৃত' (*a*)।

রূপগত বৈশিষ্ট্য ঃ—চর্যাপদের রূপতত্ত্ব বিচারে বাঙলার স্বরূপলক্ষণ স্পষ্টতরভাবে প্রতীয়মান হয়। নাম শব্দে ষষ্ঠী বিভক্তির চিহ্ন '-র', '-এর' ('হরিণার', 'রুখের') বাঙ্‌লা ভিন্ন অন্যত্র নেই। বাঙ্‌লার ভগিনীস্থানীয়া অসমীয়ায় '-র্', মগহী ও মৈথিলীতে '-কের্' এবং অন্যত্র '-ক' দিয়ে ষষ্ঠী বিভক্তির পদ গঠন করা হয়। অবশ্য চর্যাপদেও '-ক' বিভক্তি অপ্রচলিত নয়,—'ছান্দক বান্ধ'। কর্ম-সম্প্রদানের বিভক্তি '-রে' ('তোহোরে', 'করিণা করিণিরেঁ রিসঅ') শুধু বাঙলাতেই পাওয়া যায় (আধুনিক কালেও কবিতায় এবং আঞ্চলিক উপভাষায় বর্তমান), অন্যত্র '-কু,-কে, -ক্‌, -লা' প্রভৃতি বিভক্তি যুক্ত হয়। অবশ্য চর্যাপদেও '-ক' -কে' অপ্রাপ্য নয় (ঠাকুরক পরিণিবিত্তা', 'বাহবকে পারই')। অধিকরণ কারকে '-ত' বিভক্তি বাঙলার নিজস্ব ('টালত মোর ঘর', 'সাঙ্কমত চাড়িলেঁ'), অন্যত্র নেই। অসমীয়ায় '-ৎ', 'ওড়িয়ায় '-র', মগহী-মৈথিলি-ভোজপুরিয়ায় '-মেঁ'। করণকারকে '-তে, -তেঁ' (সুখদুঃখতেঁ') এবং অধিকরণে '-এ' বিভক্তিও ('ঘরে, চীএ') বাঙলার বিশিষ্টতাজ্ঞাপক। এগুলো ছাড়াও চর্যাপদে বিভিন্ন বিভক্তিচিহ্ন ঃ—কর্তায় '-এ, -এঁ' ('কাহ্নে গাইউ'), অপাদানে '-এ' ('জামে কাম'), '-হু' ('খণহু'), অধিকরণে '-ই' ('নিয়ড়ি'), '-হি' ('হিঅহি') প্রভৃতি। আধুনিক বাঙলার মত বিভক্তিহীনতা বা শূন্য বিভক্তির যোগও চর্যাপদে সুলভ ঃ কর্তায়—'সরহ ভণই', কর্মে—'গুরু পুচ্ছিঅ জাণ'; করণে—'বাঢ়ই সো তরু সুভাসুভ পাণী'; অপদান—'কণ্ঠ ন মেলই'; অধিকরণ—'গঅণ সমাঅ' প্রভৃতি।

বিভক্তি-স্থলে অনুসর্গের ব্যবহার বাঙলা ভাষার একটি বিশিষ্ট লক্ষণ—এটি আদি-

যুগেই সূচিত হয়েছিল।—'তোএ **সম**', 'ডোম্বীএর **সঙ্গে**', 'তোহোর **অন্তরে**', 'ত'ই **বিনু**', 'গঅণ মাঝে'। অসমাপিকা ক্রিয়াকেও আদিযুগেই অনুসর্গের মতো ব্যবহার করা হ'তো। '**দিআঁ** চণ্ডালী', 'দিঢ় **করিঅ**', ক'হি **গই**', 'কণ্ঠে **লইআ**' প্রভৃতি।

বাঙলা ভাষার অন্যতম বৈশিষ্ট্য, অতীত কালে নিষ্ঠান্ত '**-ইল**' প্রত্যয় এবং ভবিষ্যৎ-কালে কৃদন্ত '**-ইব**' প্রত্যয়ের ব্যবহার আদিযুগেই শুরু হয়েছিল—'দেখিল, সুতেলী, রুন্ধেলা, করিব, জাইবেঁ' প্রভৃতি। আধুনিক ওড়িয়া এবং অসমীয়াতে এদের ব্যবহার পাওয়া গেলেও প্রাচীনকালে রূপান্তর ছিল। 'ইআ'-যুক্ত অসমাপিকা বাঙলা ভাষার একটি বিশিষ্ট লক্ষণ, এটিও আদিযুগেই লভ্য ঃ—'আঁখি **বুজিঅ**', 'আইল গরাহক অপণে **বহিআ**'। এটি সমকালীন অপর আঞ্চলিক ভাষার অনুপস্থিত। '-ইলে', '-অন্তে'-যুক্ত অসমাপিকা ক্রিয়ার ব্যবহারও প্রাচীন যুগে পাওয়া যায়।—'রাতি ভইলে', 'সাঙ্কমত চঢ়িলে', 'জাগন্তে সুঘাড়ী', 'চিন্তা চিন্ততে'।

বহুবচন-জাত 'আহ্মে তুহ্মে' চর্যাপদে একবচন রূপেই ব্যবহৃত হয়েছে; আবার পাশাপাশি একবচনের রূপ 'হউঁ', 'তু' প্রভৃতিও বর্তমান ছিল।—'তুলো ডোম্বী হাঁউ কপালী', 'আমহে,সাণে দিঠা', 'জই তুহ্মে ভুসুকু অহেরি জাইবেঁ'।

অতীতকালের ক্রিয়াপদে এবং বিশেষণ-রূপে ব্যবহৃত সম্বন্ধ পদে বিশেষ্য-অনুযায়ী লিঙ্গ ব্যবহৃত হতো বাঙলা ভাষার আদিযুগে।—'লাগেলি আগি', 'কাহেরি শঙ্কা'। ষষ্ঠী বিভক্তি ছাড়া শব্দরূপের ক্ষেত্রে স্ত্রীলিঙ্গ-পুংলিঙ্গ ভেদ নেই—ক্লীবলিঙ্গের ব্যবহার আদিযুগে অনুপস্থিত। বহুবচন বোঝানোর জন্য বহুত্ব-বাচক শব্দ ('সঅল সহাব', 'পারগামি লোঅ', 'জোইনি জাল'), সংখ্যাবাচক শব্দ ('বতিস জোইনী', 'পঞ্চ বি ডাল'), কিংবা শব্দের দ্বিত্ব প্রয়োগ হ'তো—'উঁচা উঁচা পাবত', 'কেহো কেহো তোহরে বিরুআ বোলই'।

বাঙলা ভাষার আদিযুগে ক্রিয়ারূপে একবচন ও বহুবচনের পৃথক্ বিভক্তি চিহ্ন বর্তমান থাকলেও প্রয়োগে কোন বিধিবদ্ধ রীতি ছিল বলে মনে হয় না। মধ্যমপুরুষে একবচনের পদ বহুবচনে এবং বহুবচনের পদ একবচনে নির্বিশেষে ব্যবহৃত হয়েছে। প্রথমপুরুষে যে বহুবচনের পদ প্রচলিত ছিল ('চাহন্তি ভণন্তি হোন্তি'), সেগুলো সম্ভবতঃ সম্ভ্রমে ব্যবহৃত হ'তো। পুরুষ-ভেদে ক্রিয়াবিভক্তির পার্থক্য সেকালে বর্তমান ছিল।—উত্তম পুরুষে ঃ 'অচ্ছম, পিবমি, দেহুঁ', 'দেখিল, সুতেলি'; 'করিব, দিবি'। মধ্যমপুরুষে ঃ 'যাসি, অচ্ছহুঁ, অছিলেস, নিলেসি, হোইব'। প্রথমপুরুষে ঃ 'ভণই, খাঅ, চাহন্তি, বোলথি, আইল, ভইলা, রুন্ধেল, করিব, জাইবেঁ'।

আদিযুগে কাল ছিল তিনটি—বর্তমান, অতীত ও ভবিষ্যৎ; নিত্যবৃত্ত অতীত

ছিল না। নির্দেশক ও অনুজ্ঞা দু'টি ভাবই বর্তমান ছিল। যৌগিক কালের কোন দৃষ্টান্ত চর্যাপদে পাওয়া যায় না, তবে যৌগিক ক্রিয়াপদের ব্যবহার ছিল।—'গুণিয়া লেহুঁ, দিঢ় করিঅ, উঠি গেল, সড়ি পড়িয়া, ভান্তি ন বাসসি' প্রভৃতি।

প্রাচীন বাঙলায় বর্তমান, অতীত ও ভবিষ্যৎ—তিনকালেই কর্ম/ভাববাচ্যের বহুল প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়।—'হরিণার খুর ন দীসঅ' (<দৃশ্যতে), 'আঁখি বুজিঅ বাট জাইউ' (<*যায়তু=যায়তাম্); 'রাতি পোহাইলী' (<প্রভাতায়িতা); 'মই দিবি পিরিচ্ছা' (=ময়া পৃচ্ছা দাতব্যা)। যৌগিক কর্মবাচ্য বাঙলায় প্রথম আবির্ভূত হয় প্রাচীন যুগে।='ধরণ ন জাই', 'ভণ কইসে বোলবা যায়'।

বাঙলা ভাষার আদিযুগে, অন্ততঃ চর্যাপদে তৎসম শব্দ ব্যবহারে প্রাকৃত-অবহট্ঠ অপেক্ষা অধিকতর প্রবণতা দেখা যায়। প্রাকৃতে যেমন 'ণ' কিংবা 'স'-ই শুধু ব্যবহৃত হয়েছে, চর্যাপদে সংস্কৃত বানান বজায় রাখতে গিয়ে তৎস্থলে 'ন' এবং 'শ' ও 'ষ'-র ব্যবহারও যথেষ্ট দেখা যায়।—'অনুত্তর, চঞ্চল, কুণ্ডল, কুম্ভীর, বৈরী, পঞ্চ, তরঙ্গ, মাতঙ্গী' প্রভৃতি তৎসম শব্দ যেমন ব্যবহৃত হয়েছে, তেমনি অর্ধতৎসম শব্দ পাশাপাশি ব্যবহৃত হ'য়েছে।—অলক্খ/অলক্ষ, পুন্ন/পুণ্য' প্রভৃতি। চর্যায় ব্যবহৃত প্রবচনগুলোও নিশ্চিতভাবে বাঙলা ভাষার ঐতিহ্যবাহী—'অপণা মাঁসে হরিণা বৈরি', 'বর সুণ গোহালী কিম দুট্ঠ বলন্দে', 'হাড়িত ভাত নাহি নিতি আবেশী'।

এই সমস্ত লক্ষণ-বিচারে সুনিশ্চিতভাবেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা চলে যে চর্যাপদের ভাষা প্রাচীন বাঙলা ছাড়া কিছু নয়।

[দুই] বাঙলা ভাষার মধ্যযুগ

বাঙলা দেশে তুর্কী শাসন সুব্যবস্থিত হবার পর থেকেই সমাজ-জীবনে অনেকটা শৃঙ্খলা ফিরে আসে, বাঙলা সাহিত্যেও নোতুন প্রাণের জোয়ার দেখা দেয়। বস্তুতঃ এখান থেকেই শুরু হয় বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের মধ্যযুগ, ইংরেজ শাসনের পূর্ব পর্যন্ত এই কালের ব্যাপ্তি—সময়ের হিশাবে খ্রীঃ ১৩৫০ অব্দ থেকে মোটামুটি ১৮০০ খ্রীঃ পর্যন্ত। ইতিহাসের দিক্ থেকে মুঘল শাসনের পূর্ব পর্যন্ত এবং আমাদের সামাজিক জীবনে চৈতন্যদেবের আবির্ভাবকাল পর্যন্ত সাহিত্য যে ধারায় প্রবাহিত হ'য়েছিল, এই কাল থেকেই তার মধ্যে একটা বিরাট পরিবর্তন দেখা দেয়। এই হিশাবে মধ্যযুগকে দুই পর্বে ভাগ করা হয়:—(ক) আদিমধ্যযুগ বা চৈতন্যপূর্ব যুগ (১৩৫০ খ্রীঃ থেকে ১৫০০ খ্রীঃ) ও (খ) অন্ত্যমধ্যযুগ বা চৈতন্যোত্তর যুগ (১৫০০খ্রীঃ থেকে ১৮০০ খ্রীঃ)। এই পার্থক্য ছিল যেমন বিষয়গত, তেমনি ভাষাগতও বটে।

(ক) **আদিমধ্যযুগ/চৈতন্য-পূর্বযুগ** (১৩৫০ খ্রীঃ—১৫০০ খ্রী)

আদিমধ্যযুগের যে স্বল্পসংখ্যক রচনা একাল পর্যন্ত এসে পৌঁছেছে, তাদের ওপর বিভিন্ন কালের হস্তাবলেপ চিহ্ন এত সুপ্রচুর যে, ভাষার মধ্যে তাৎকালিক যুগলক্ষণগুলো প্রায় নিশ্চিহ্ন হ'য়ে গেছে। একমাত্র বড়ু চণ্ডীদাস-কৃত 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যটিই লোকলোচনের অন্তরালে থাকায় তার মধ্যে প্রাচীনত্বের লক্ষণ অনেকটা বর্তমান রয়েছে। এই কারণে বাঙলা ভাষার আদি-মধ্যযুগের ভাষা-অধ্যয়নে বস্তুত শ্রীকৃষ্ণকীর্তনকেই একমাত্র তথা প্রধান অবলম্বনরূপে গ্রহণ করা হয়। চর্যাপদের ভাষা ক্রমবিবর্তনসূত্রেই শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভাষায় রূপান্তরিত হয়েছে— আদিমধ্যযুগের আলোচনা-প্রসঙ্গে আমরা এই সত্যের মুখোমুখি হ'তে পারবো। [শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভাষায় ধলভূম অঞ্চলের আঞ্চলিক ভাষার সাদৃশ্য বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়,—অবশ্য এ থেকে এখনো কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় আসেনি।]

ধ্বনিগত বৈশিষ্ট্য ঃ—শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে পদের আদিস্থিত 'অ'-কারের প্রাচীন অর্থাৎ বিবৃত উচ্চারণও (*a*) বজায় ছিল মনে হয়, কারণ আদি 'অ' (ɔ) বহুস্থলেই 'আ'-রূপে লিখিত হ'য়েছে।—'আতি, আতিশয়, আকারণ, নান্দের' প্রভৃতি। পদের অন্ত্য 'অ' বজায় ছিল অর্থাৎ উচ্চারণ ছিল স্বরান্ত—দান ('দান্' নয়, দান্+অ), সন্তাপ, আলিঙ্গন' প্রভৃতি। পদান্তে 'কাহ্ন'-র সঙ্গে 'দান'-এর অন্ত্যমিল বজায় থেকেই এ সিদ্ধান্ত মেনে নিতে হয়। পদমধ্যস্থ 'অ'-কার কখন কখন একালের মতো 'ও'-কারবৎ উচ্চারিত হ'তো—কথোখন, নান্দোঘর' প্রভৃতি। উচ্চারণে হ্রস্ব-দীর্ঘ প্রভেদ ছিল না, তাই বানানো নির্বিচারে এদের ব্যবহার করা হয়েছে—'দুতি/দূতী', 'উজল/ঊজল'।—পাশাপাশি অবস্থিত দু'টি স্বরধ্বনির যৌগিক উচ্চারণ প্রতিষ্ঠিত হ'তে আরম্ভ করেছে আদিমধ্যযুগেই—আউলাইল বড়াই'। ব্যঞ্জন ধ্বনিতে 'ন' এবং 'ণ'-র কোন পার্থক্য ছিল না তবে মূর্ধন্য 'ণ' এবং মূর্ধন্য 'ল়' (=ḷ)-এর উচ্চারণ অন্ততঃ কিছুটাও বর্তমান ছিল বলেই মনে হয়, তাই 'ন, র, ড়, ল' প্রভৃতির ধ্বনি-সামঞ্জস্য লক্ষ্য করা যায়। যেমন, পদান্তে 'জাল'-এর সঙ্গে 'পোয়ার' (<প্রবাল) মেলানো হয়েছে। শব্দের আদি 'য' সর্বক্ষেত্রেই 'জ' উচ্চারিত হ'তো—অবশ্য বানানে যথেচ্ছাচারিতা আছে।—'ণাল / নাল; ণাম্বাইল/নাম্বাইল; জানি/যানি; জত/যত'। মহাপ্রাণ ধ্বনির উচ্চারণ শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে কখনো বর্তমান, কখনো লোপ পেয়েছে—এর মধ্যে কোন সুনির্দিষ্ট নিয়মের সন্ধান পাওয়া যায় না, তবে পরবর্তী 'হ'-ধ্বনির সহযোগে অল্পপ্রাণ ধ্বনির মহাপ্রাণীভবন এর একটা বিশিষ্ট লক্ষণ।—'কবহোঁ>কভোঁ, কতহো>কথো, একহোঁ>এখোঁ'। নাসিক্যীভবনের পরিচয় পাওয়া গেলেও তা' সাধারণ রীতিরূপে তখনো গৃহীত হয়নি, তাই দ্বিবিধ রূপই

প্রচলিত ছিল।—ভাঁগি/ভাঙ্গি; আঁচল/আঞ্চল, পাঁজি/পাঞ্জী, চাঁদ/ চন্দ/চান্দ, আঁব/ আম্ব, কাঁশ/কংস'।—উদ্বৃত্তস্বর কোথাও বর্তমান ছিল, কোথাও সংকুচিত হয়েছে, কোথাও তৎস্থলে বিভিন্ন শ্রুতিধ্বনির আগম ঘটেছে,—'পোআ/পো, পইসে/পসি, পাইএ/ পাই, তিঅজ/তিয়জ, ছাওআল/ছাওয়াল, নহুলী (<নবলী')। আদিমধ্যযুগে বাঙলা ভাষায় স্বরসঙ্গতি ভালোভাবেই দেখা দিয়েছে, যদিচ অপিনিহিতির দৃষ্টান্ত খুবই কম। —এখণী/এখুণী', তোলী/তুলি, লেখিলোঁ/লিখিলোঁ। আদিমধ্যযুগের ভাষায় অল্প কয়টি ফারসী শব্দের অনুপ্রবেশ লক্ষ্য করা যায়ঃ 'কামান, মজুরি, বাকী, মিনতি', প্রভৃতি। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে শব্দের আদি অক্ষরে শ্বাসাঘাত প্রায় অনিবার্য দেখা যায়।

রূপগত বৈশিষ্ট্য ঃ—আদিমধ্যযুগের বাঙলায় সর্বনাম পদের কর্তৃকারকে বহুবচন '-রা' বিভক্তির প্রয়োগ শুরু হ'য়ে গেছে, তবে সাধারণতঃ চর্যার মতোই সংখ্যাবাচক এবং বহুত্ব-বাচক শব্দের যোগই ছিল সাধারণ—'আহ্মারা, তোহ্মারা, তারা, তোহ্মেসব, আহ্মে-সহ্মে, গোপবধূজন, এসব চরিতে, বত্রিশ রাজলক্ষণ' প্রভৃতি। চর্যাপদে অপভ্রংশসুলভ যে সকল প্রাচীন বিভক্তি ছিল, (—৫মীতে '-হু/হুঁ,; ৭মীতে '-হি/হিঁ' প্রভৃতি), সেগুলো শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে লোপ পেয়েছে; অন্য সব বিভক্তি বর্তমান। সম্বন্ধ পদ বাদে অন্যত্র তির্যক বিভক্তি-'এ/-এঁ' ব্যবহৃত হয়েছে। এই যুগে অনুসর্গীয় বিভক্তির ব্যবহারও বৃদ্ধি পেয়েছে এবং নামবাচক ও অসমাপিকা অনুসর্গের সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটেছে—'কংসের **আগক**', 'কহ মোর **ঠাঁয়ী**', 'তনের **উপর**', সনে, হ'তে, থানে, করিআঁ, গিআঁ, দিআঁ, লাগিআঁ' প্রভৃতি।

অতীত কালে '-ল'-যুক্ত এবং '-ল'-বর্জিত—দ্বিবিধ রূপই প্রচলিত ছিল। এই যুগে অতীতকালে '-ইল' বিভক্তি এবং ভবিষ্যৎকালে '-ইব' বিভক্তি কর্তৃবাচ্যেও নিয়মিতভাবে প্রযুক্ত হ'তে থাকে। '-ইঅ'-বিকরণযুক্ত প্রাচীন কর্মভাববাচ্যের ব্যবহার ক্রমশঃ ক্ষীয়মাণ। নিত্যবৃত্তকাল পূর্ণ অতীত এবং সমাপিকা ক্রিয়ারূপে আদিমধ্যযুগেই প্রথম প্রতিষ্ঠা লাভ করে। যৌগিক ক্রিয়াপদের ব্যবহার শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে ঃ 'আনি দেহ, কহিআঁ দেহ, মুছিআ পেলায়িবোঁ, চাহি নেহ, ভয় না বাসসি, না বাসসি লাজ।' আভিমুখ্য বোঝাতে '-সিআ' (<আসিয়া) এবং প্রাতিমুখ্য বোঝাতে '-গিয়া' অসমাপিকার বিভক্তিরূপে প্রয়োগ বিশেষ লক্ষণীয়—'দেখ সিআঁ, আন গিআঁ'। বাঙলা ক্রিয়ায় কালবাচক একটি বিশিষ্ট লক্ষণ শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে পরিস্ফুট—এখানেই প্রথম 'যৌগিক কালের' প্রয়োগ পাওয়া যায়। '-ইআ'-যুক্ত সম্পন্ন কালের প্রয়োগই বিশেষভাবে পাওয়া যায়—'সুতিআঁ অছিলোঁ আহ্মে, শুনিআছ তোহ্মে, নিআঁছিস্ বাঁশী'। '-ইল'

যুক্ত যৌগিক কালেরও ব্যবহার বর্তমান,—'ফুটিলছে, রহিলছে'। '-ইতে'-যুক্ত অসম্পন্ন কালের প্রয়োগ খুব স্পষ্ট নয়।

প্রাণীবাচক শব্দের ক্ষেত্রে বিশেষণে এবং কৃদন্ত অতীত কালের ক্রিয়াপদে (সকর্মক-অকর্মক নির্বিশেষে) শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে স্ত্রীপ্রত্যয় যুক্ত হ'য়েছেঃ 'কোঁঅলী পাতলী বালী', 'বড়ায়ি চলিলী অনাপথে', 'উত্তরলী রাহী'।

(খ) **অন্ত্য-মধ্য/চৈতন্যোত্তর যুগ** (১৫০১ খ্রীঃ—১৮০০ খ্রীঃ)

চৈতন্যদেবের আবির্ভাব বাঙলা সাহিত্যে যে অনুপ্রেরণা সঞ্চার করেছিল, তার ফলে বাঙলা সাহিত্য যেন শতধারায় প্রবাহিত হ'তে আরম্ভ করে। ফলতঃ চৈতন্যোত্তর বা অন্ত্যমধ্যযুগে বিভিন্ন বিষয়ে এবং বাঙলার বিভিন্ন অঞ্চলে এত সাহিত্য রচিত হ'য়েছে যে ভাষাতাত্ত্বিক অধ্যয়নের জন্য কোন একটি গ্রন্থের ওপর নির্ভর করা নিষ্প্রয়োজন। এই যুগের আর একটি বিশেষ ঘটনা—বহু গ্রন্থেই আঞ্চলিকতার লক্ষণ সুস্পষ্ট। ১৭৫৭ খ্রীঃ পলাশীর যুদ্ধে সিরাজউদ্দৌল্লার পতনের পরই কার্যতঃ দেশের শাসনব্যবস্থায় বিরাট পরিবর্তন দেখা দেয়। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীই দেশের শাসনব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত করে ১৮৫৭ খ্রীঃ অনুষ্ঠিত সিপাহী বিদ্রোহ পর্যন্ত। এদিকে ১৭৬০ খ্রীঃ রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে বস্তুতঃ অন্ত্যমধ্যযুগের সমাপ্তি ঘটে। তারপর দীর্ঘ একশ বছর সাহিত্য-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এক যুগসন্ধিক্ষণ বলে চিহ্নিত হ'য়ে থাকে। এই সময়ে বাঙলা ভাষায় কোন উল্লেখযোগ্য সাহিত্য সৃষ্টি হয়নি। ১৮৫৮ খ্রীঃ রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্যজগতে প্রবেশ এবং ১৮৫৯ খ্রীঃ ঈশ্বর গুপ্তের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে যুগসন্ধিকালের পরিসমাপ্তি এবং নোতুন যুগের আবির্ভাব ঘটে। এদিকে ১৮০০ খ্রীঃ ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে বাঙলা ভাষায় গদ্যসাহিত্য রচনা শুরু হয়,—বস্তুতঃ এই কারণেই ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দকে বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে আধুনিক যুগের প্রারম্ভকাল বলে মনে করা হয়।

ধ্বনিগত বৈশিষ্ট্যঃ—অন্ত্যমধ্যযুগের বাঙলা ভাষায় 'অ'-এর সংবৃত ধ্বনি (ɔ) সম্পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। পদান্তস্থিত স্বরধ্বনির বিশেষতঃ 'অ'-কারের লোপ-প্রবণতা এ যুগের অপর একটি বিশিষ্ট লক্ষণঃ 'হাত > হাৎ, অগ্নি > অগ্গি > আগি > আগ্' প্রভৃতি। আদ্যক্ষরে শ্বাসাঘাতের জন্যই এই লোপ-প্রবণতা, এর প্রভাবে পদমধ্যবর্তী স্বরধ্বনিও অনেক সময় লোপ পেতো—'অম্নি', পাগল + আ > পাগ্লা'। এর ফলে বাঙলা ভাষার অপর একটি বিশিষ্টতা লক্ষণীয় হ'য়ে ওঠে—সেটি দ্ব্যক্ষরপ্রবণতা বা দ্বিমাত্রিকতা।—'গামোছা > গাম্ছা, ভগিনী > ভগ্নী, পানিতা > পান্তা'; যাইতেছি > যাচ্ছি'। পদমধ্যস্থ ও পদের অন্ত্যস্থিত 'অ'-র উচ্চারণ দুর্বল হ'য়ে যাওয়াতে এই 'অ'

অনেক সময় 'ও'-কারে পরিণত হ'য়েছে।—'পরোমাই, বারোমাস্যা, কথোক্ষণে, বড়ো, ভালো, পেতো' প্রভৃতি। অবশ্য এই 'ও' প্রবণতা অনেকসময়ই স্বরসঙ্গতির ফলও বটে, এই প্রবণতা অবশ্য অষ্টাদশ শতকের দিকেই বেশি ক'রে দেখা দিয়েছে। অন্ত্যমধ্যযুগের শেষদিকে বাঙলা ভাষায় একটি নোতুন ধ্বনিরও উদ্ভব ঘটে, সেটি, 'অ্যা' (ɛ/æ) ধ্বনি। সংবৃত 'অ' (ɔ) এবং 'অ্যা' (æ) উভয়ই নিম্নমধ্যাবস্থ স্বরধ্বনি—এই দুটিই সংস্কৃত, প্রাকৃত এবং বাংলার আদিস্তর ও অন্ত্যমধ্যস্তরে অনুপস্থিত ছিল। ভারতীয় অপর অনেক ভাষাতেই এখনো এদের বর্তমানতা নেই। শব্দের আদিতে, মধ্যে এবং অন্তে এই 'অ্যা'-কারের ব্যবহার থেকেই উক্ত ধ্বনিটির তাৎকালিক উদ্ভব অনুমান করা হয়—'দ্যায়, য্যান, ব্যাহার, ব্যাভার, কর‍্যাছি, ভাস্যা, হেস্যা' প্রভৃতি। উচ্চমধ্যাবস্থ 'এ' (e) এবং নিম্নাবস্থ 'আ' (a) ধ্বনির শিথিল উচ্চারণ থেকেই অন্তর্বর্তী এই 'অ্যা (æ/ɛ) ধ্বনির উদ্ভব হ'তে পারে। এছাড়া স্বরসঙ্গতি, অপিনিহিতির কারণে কিংব স্বতঃস্ফূর্তভাবেও 'অ্যা' আসতে পারে।

আদি-মধ্যযুগেই বাঙলা ভাষায় অপিনিহিতির প্রবণতা দেখা দিলেও অন্ত্যমধ্যযুগেই তার ব্যাপক প্রয়োগ লক্ষিত হয়। 'ই' এবং 'উ' ধ্বনির পূর্বাগম ছাড়াও 'ক্ষ', 'জ্ঞ' বা 'য'-ফলার পূর্বেও 'ই'-ধ্বনির আগমন ঘটতো—'আলি>আইল, সাধু>সাউধ, কইন্যা, বস্যা' প্রভৃতি। লক্ষণীয় এই যে, এই অন্ত্যমধ্যযুগেরই শেষ পর্বে, সম্ভবতঃ অষ্টাদশ শতকের শেষ পাদে বাঙলা ভাষায় অভিশ্রুতির উদ্ভব ঘটে। এই অভিশ্রুতি রাঢ়ী উপভাষার এবং তদাশ্রিত শিষ্ট চলিত ভাষার একটি বিশিষ্ট লক্ষণ।—'আসিয়া> আইস্যা>এসে', 'ষাটিয়ারা>ষেঠ্যারা>ষেটেরা', লইবে>লবে'। অভিশ্রুতির সঙ্গে স্বরসঙ্গতির সম্পর্ক অতিশয় ঘনিষ্ঠ। স্বরসঙ্গতির উদ্ভবও শ্রীকৃষ্ণকীর্তন থেকে, কিন্তু অন্ত্যমধ্যযুগের শেষ স্তরেই, বিশেষতঃ শিষ্ট চলিত ভাষার উপরই স্বরসঙ্গতির প্রবল প্রভাব দেখা যায়—'কাঁচলি>কাঁচুলি, বহিনী>বুহিনী, সমস্যা>সমিস্যা' প্রভৃতি। শ্রুতিধ্বনির—'য় (এ), ৱ (ও>ওআ, ওয়া)' এবং 'হ'-শ্রুতির প্রবলতা এ যুগে বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়।—'আঅর/আয়র/আওর, মাএ, ছাওাল/ছাওয়াল, অবণাগবণা, বাএ/বাহে, নউলি/নহুলি, শোয়া/শোওয়া' প্রভৃতি। ৱ-শ্রুতির সানুনাসিক রূপ পাওয়া যায়—'কুঙর/কোঙর (=কুমার), নঙান (=নয়ান)'। অন্ত্যমধ্যযুগে অর্ধতৎসম শব্দেরও প্রচুর ব্যবহার পাওয়া যায়।—অপ্সরী>অপছরি, ভর্ৎসন>ভর্ছন, আহ্বান>আওভান, প্রতিজ্ঞা>প্রতিগ্যা, পৃতিঙ্গা, জিজ্ঞাসে>জিঙ্গাসে, হৃদয়>রিদয়, ক্ষমা>খেমা, ব্যবহার>বেভার, বাদ্য>বাদ্দি' প্রভৃতি।

দক্ষিণ-পশ্চিম রাঢ় অঞ্চলের ঔপভাষিক লক্ষণও শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে বিধৃত : 'কাঁড়,

বড়াঞি, আঁচমন'। ঐকালের অন্যান্য গ্রন্থেও আঞ্চলিকতার লক্ষণ সুস্পষ্ট—'দাঁড়ায় > ডাঁড়াএ, দংশন > ডংশন, লুচি > নুচি, লুনী/নুনী, লাঙ্গুল > লেঙ্গুড়' প্রভৃতি। অন্ত্যমধ্যযুগের পূর্ববর্তী কালের তুলনায় যেমন তৎসম শব্দের ব্যবহার বেশি, তেমনি বিদেশি শব্দেরও অনুপ্রবেশ ঘটেছে যথেষ্ট। বিদেশি শব্দের মধ্যে আরবি-ফারসিরই প্রাধান্য—'বাজার, বরাবর, বিদায়'। কিছু পর্তুগীজ শব্দের ব্যবহারও লক্ষণীয়,—'আতা, আনারস, তামাক, পিপা, পেয়ারা'। সাদৃশ্যমূলক শব্দের সংমিশ্রণে 'জোড়কলম' শব্দসৃষ্টি শুরু হ'য়েছিল এ যুগেই—'আশ্চর্য + স্তম্ভিত > আশ্চম্বিত, বাজু + কেয়ূর > বেজুর, বৈভব + ভোগ > বৈভোগ'।

রূপগত বৈশিষ্ট্য ঃ—ষোড়শ শতকের কোন কোন গ্রন্থ-ব্যতীত সমগ্র অন্ত্য-মধ্যযুগে আর লিঙ্গবিধান রইলো না, অর্থাৎ কৃদন্ত ক্রিয়াপদে এবং বিশেষণে আর স্ত্রীপ্রত্যয় যুক্ত হ'তো না। পুরুষবাচক সর্বনামের বাইরেও যে কোন প্রাণীবাচক শব্দে বহুবচনে '-রা' প্রত্যয়যুক্ত হ'তে লাগলো—'বন্দ্যবংশে জন্ম স্বামী বাপেরা ঘোষাল', 'যুবতীরা কয়' প্রভৃতি। আর একটি বহুবচনের প্রত্যয় '-গুলা/গুলি' তুচ্ছার্থে বা সমূহার্থে ব্যবহৃত হ'তে থাকে—'মূলার সমান দন্তগুলা', 'কি কারণে দেবসভা বল এতগুলি।' 'সংস্কৃত' 'আদিক'-শব্দজাত অথবা ফারসি 'দিগর'-প্রভাবজাত '-দিগ/-দিগের', '-দি,-দের' বহুবচনাত্মক প্রত্যয়টি সপ্তদশ শতকে আবির্ভূত হয়। —'তাহাদিগে ধরিআঁ আনহ মোর ঠাঁই আমাদিগে সঙ্গে কর্যা'। কর্তৃকারকে বিভক্তিহীন পদ অথবা '-এ' বিভক্তিযুক্ত পদ, কর্মকারকে '-কে ('বীরকে লাগিল ব্যথা'), -রে, -ত/-তে-এ' বিভক্তি; করণকারকে '-এ' '-তে' ('মায়াতে মোহিত'), অপাদান কারকে '-ত/-তে' ('রাজাতে বিদায় মাঙ্গে', 'দূরত দেখিলে পুড়ে মন'), নোতুন বিভক্তি '-কারে' ('সভাকারে মাগিল বিদায়'), '-রে' ('বাঙালীরে কত ভাল পশ্চিমার ঘরে'), '-কে' ('ইহাকে অধিক তুমি জানিহ তাঁহার'), সম্বন্ধ পদে বাঙলার নিজস্ব বিভক্তি '-র' এবং অতিরিক্ত '-ক, -কের, -কার, '-কর' এবং অধিকরণ কারকে '-এ, -তে' এবং অতিরিক্ত 'রে, -কে/-কা ('কালুকা প্রভাতে, এথাকে আনহ'), '-ই' (জথিতথি), '-কারে' ('তথাকারে গিয়া')।

'-ইল' এবং '-ইব'-অন্ত ক্রিয়াপদ অন্ত্যমধ্যযুগে সম্পূর্ণভাবে কর্তৃবাচ্যে প্রযুক্ত হ'তে আরম্ভ করে। আদিমধ্যযুগে নিত্যবৃত্ত অতীতের ব্যবহার পাওয়া গেলেও সাধারণ বর্তমান দিয়েই ঐ কালের কাজ চালানো হ'তো; অন্ত্যমধ্যযুগে নিত্যবৃত্ত অতীতের ব্যাপক ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। '-ই' এবং '-ইতে' প্রত্যয়ান্ত যৌগিক কালের বিচ্ছিন্ন দৃষ্টান্ত শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তনে পাওয়া গেলেও অন্ত্যমধ্যযুগে ঘটমান কাল প্রভূত পরিমাণে

ব্যবহৃত হ'য়েছে। যৌগিক ক্রিয়ার ব্যবহারও এই যুগে পূর্বাপেক্ষা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলতঃ বহু তদ্ভব ধাতু অপ্রচলিত হ'য়ে গেছে: "পিয়ে>পান করে, জিনে>জয় করে, গোড়ায়>পশ্চাৎ পশ্চাৎ যায়, নেওটায়>ফিরে আসে, পুছে> জিজ্ঞাসা করে।" আধুনিক বাঙলার তুলনায়ও অন্ত্যমধ্যযুগে নামধাতু ব্যবহারের ব্যাপকতা ছিল বেশি; অনেক তৎসম শব্দও নামধাতুরূপে ব্যবহৃত হ'য়েছে,—'বাখানিয়াছে, নিন্দায়, আগুসরি, লাথাইয়া, অনুব্রজি, সান্ত্বাইব, প্রবর্তিতে'।

বৈষ্ণব কবিতায় ব্রজবুলির ব্যবহার আদিমধ্যযুগে (বিদ্যাপতি) দেখা দিলেও এ যুগে তার ব্যাপকতা লক্ষণীয়।

(গ) ব্রজবুলি

বিদ্যাপতি, গোবিন্দদাস-আদি বৈষ্ণবপদকর্তারা যে ভাষায় পদ রচনা ক'রে গেছেন, সে-ভাষা বাঙলা নয়,—'ব্রজবুলি' নামে একে অভিহিত করা হয়। এই 'ব্রজবুলি' নামটি আরোপ করা হ'য়েছে সম্ভবতঃ উনিশ শতকে। এই নামকরণের পিছনে একটি ভ্রান্ত ধারণা থাকা সম্ভব। রাধাকৃষ্ণের ব্রজলীলাকে অবলম্বন ক'রে যে পদগুলো রচনা করা হ'য়েছে, তার ভাষা বাঙলা না হওয়াতেই সম্ভবতঃ একটা লৌকিক বিশ্বাস দাঁড়িয়ে গিয়েছিল যে, তবে এটি ব্রজেরই ভাষা অর্থাৎ 'ব্রজবুলি'। বস্তুতঃ ব্রজ অর্থাৎ মথুরা অঞ্চলের ভাষা ছিল সেকালে 'ব্রজভাষা' (>ব্রজভাষা)—ব্রজবুলি থেকে তা' সর্বাংশে পৃথক্। এক্ষণে নামটির সার্থকতা বজায় রাখতে গিয়ে ব্যাখ্যা করা চলে,—ব্রজের লীলা বর্ণনা করা হয়েছে এই বুলিতে, তাই এর নাম 'ব্রজবুলি'। মূল শব্দটি সম্ভবতঃ ছিল 'ব্রজাওলি' অর্থাৎ 'ব্রজবিষয়ক'।

ব্রজবুলির প্রাচীনতম নিদর্শন পাওয়া যায় চতুর্দশ শতকে মিথিলার কবি উমাপতি ওঝার 'পারিজাতমঙ্গল' নামক গীতিনাট্যের পদগুলোতে। পরবর্তী শতকের কবি বিদ্যাপতিই ব্রজবুলি ভাষার শ্রেষ্ঠ রূপকার। মিথিলাতেই ব্রজবুলির উদ্ভব হ'লেও এর চর্চা হয়েছিল বাঙলাদেশেই সর্বাধিক, তবে উড়িষ্যা এবং আসামেও কিছুকাল এর চর্চা অব্যাহত ছিল। বাঙলাদেশে পঞ্চদশ শতকে কবি যশোরাজ খান প্রথম ব্রজবুলি ভাষায় পদ রচনা করেন। বাঙলাদেশে এ ধারার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি গোবিন্দদাস। উড়িষ্যায় পঞ্চদশ শতকে রামানন্দ, আসামে ষোড়শ শতকে আচার্য শঙ্করদেব ও মাধবদেব ব্রজবুলি ভাষায় সার্থক পদ রচনা ক'রে গেছেন। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে রবীন্দ্রনাথও প্রথম জীবনে এই ভাষাতেই 'ভানুসিংহের পদাবলী' রচনা করেন। রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ের বাইরে এই ভাষার ব্যবহার প্রায় দেখা যায় না। বাঙলা ভাষার মধ্যযুগে বিশেষতঃ চৈতন্যোত্তরকালে বৈষ্ণবপদ-রচনায় বাঙলা ভাষার সঙ্গে সমান্তরাল গতিতে ব্রজবুলির

চর্চা চলছিল ; তাই ভাষাটি বাঙলা না হ'লেও বাঙলা ভাষার ইতিহাসে এর অন্তর্ভুক্তি আবশ্যিক বিবেচিত হ'য়ে থাকে।

নামের দিক থেকে এর সঙ্গে ব্রজের সম্পর্ক, উৎপত্তির দিক থেকে এর সঙ্গে মিথিলার সম্পর্ক এবং প্রচার ও প্রসারের দিক থেকে এর সঙ্গে বাঙলায় সম্পর্ক—অথচ ভাষাগত দিক থেকে ব্রজবুলির সঙ্গে এদের কারও অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক নেই, যদিচ এদের কিছু না কিছু প্রভাব ব্রজবুলিতে পড়েছেই।

অর্বাচীন অপভ্রংশ বা অবহট্ট, যা এক সময় সমগ্র উত্তর ভারতের শিষ্ট সমাজে লৌকিক ভাষারূপে বহুল প্রচলিত ছিল, সেই ভাষারই একটা কৃত্রিম সাহিত্যিক রূপ এই 'ব্রজবুলি',—এটাকে কোন স্থাননিবন্ধ জানপদ ভাষা বলে অভিহিত করা চলে না। সেই কারণেই বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত থাকলেও এর মানগত বৈশিষ্ট্য সর্বত্র অক্ষুণ্ণ রয়েছে। ব্রজবুলির ভাষার সঙ্গে পূর্বভারতীয় ভাষাগুলোর অনেক সাদৃশ্য বর্তমান। এতে যেমন তৎসম শব্দের অবাধ প্রবেশ ঘটেছে, তেমনি অর্ধতৎসম ও তদ্ভব শব্দেরও সমান অধিকার রয়েছে। নিম্নে এই ভাষার প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলোর পরিচয় দেওয়া হ'লো।

ধ্বনিগত বৈশিষ্ট্য ঃ—ব্রজবুলিতে সাধারণভাবে স্বরধ্বনির হ্রস্বদীর্ঘ ভেদ মানা হ'লেও কঠোরভাবে কোথাও এই নীতি অনুসৃত হয়নি। মাত্রামূলক বা প্রত্নমাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত পদগুলোতে প্রয়োজনবোধে দীর্ঘ স্বরের হ্রস্ব উচ্চারণ-ও যথেষ্টই আছে। এমনকি হ্রস্বস্বরেরও ক্বচিৎ দীর্ঘ উচ্চারণ দেখা যায়।—'আষাঢ়>অখাঢ়, মাধাই>মধাই, যমুনা>যামুন, সুজন>সুজান'। শ্রুতিসুখকরত্ব এবং ছন্দের প্রয়োজনে মধ্যস্বরাগম বা স্বরভক্তির প্রবলতাও যথেষ্ট ছিল। 'হর্ষ>হরিখ, কীর্তি>কিরিতি, স্নেহ> সনেহ, লুব্ধ>লুবুধ।' যুগ্ম ব্যঞ্জন সরল হ'লেও পূর্বস্বর দীর্ঘ হয়নি (বাঙলায় যেমনটি হয়েছে)।—'উন্মত্ত>উমত, উচ্চ>উচ'। 'স'-যুক্ত ধ্বনির 'স' প্রায়শঃ লুপ্ত—'অষ্টমী>অটমী, নিশ্চয়>নিচয়, দুস্তর>দুতর'। মৈথিলির প্রভাবে 'ষ' ধ্বনি 'খ'য়ে পরিণত হয়েছে,—'দোষ>দোখ, প্রাবৃষ>পাউখ"। স্বরমধ্যগত মহাপ্রাণ ধ্বনি 'হ'-কারে পরিণত হয়েছে।—'মেঘ>মেহ, নাথ>নাহ'।

রূপগত বৈশিষ্ট্য ঃ—ব্রজবুলির শব্দরূপ অনেকাংশে বাঙলার মতো, তবে পার্থক্যও আছে।—কর্তায় ঃ 'শূন্য' বিভক্তি, -'এ' এবং ক্বচিৎ '-উ' বিভক্তি ('হরিগুণ সারু'); গৌণকর্ম-সম্প্রদানে ঃ 'শূন্য' বিভক্তি ('প্রণতি করু দেবী'); '-এ', '-ক/-কে/-কি' ('কহল লখিমীকে বাত'); করণে ঃ 'শূন্য' বিভক্তি, '-হি/-হি"' ('করহি নিবারত গোরী') ঃ অপাদানে ঃ 'শূন্য' বিভক্তি ('অরুণ বসন খসয়ে গাত'), '-তে/

-তে*, -হি/-হিঁ*, -সে*/-সোঁ' ('বনতে* গিরিধর ঘর আওয়ে') ; সম্বন্ধে ঃ—"-কা/-কি/ -কু/-কে/-কো/-কর/-করু/-কেরি' ('হরিকো নাম নিগমকু সার', 'নেতকরু চোলি') ; অধিকরণে ঃ 'শূন্য' বিভক্তি ('অলসে আঙ্গিনা শুতলি রাই'), '-হি/-হিঁ*/-হুঁ, -মি/-মে/ -ম' (মনহি ন ভাওব আন', 'কালিন্দী কূলমে')।

ব্রজবুলিতে সর্বনামের বহুবচনে বাঙলার প্রভাবে 'হামরা'-ছাড়া অপর কোন পদ পাওয়া যায় না। 'সব' বা বহুত্ববাচক শব্দসহায়তায় বহুবচন পদ সাধিত হ'তো ঃ 'হামসব, সখিসমাজ'। উত্তমপুরুষে একবচনে প্রধানতঃ 'হাম/মঞি/মো/মুঝে, মোই/ মোহে/মুঝে/হামাকু, মোহে/হমে, মো/মেরা/মঝু/মোহর/হামারি, মোহে'। মধ্যমপুরুষে —'তো/তুহুঁ, তোয়/তোহে, তোহে/তুয়া, তুহুঁক/তোহার/তেরি, তোহে/তোহারি ; প্রথম পুরুষে—'সো/সেহ/তহু, সোই/তাহে, তায়, তাক/তাকর, তাহে/তাসু/তছু'। স্থান-কাল-ইত্যাদি বোঝাতে সর্বনামজাত ক্রিয়াবিশেষণ ঃ 'ইথে, তথি, অব/অবহু, যাহা/যথি, যব, তব/তহি, কথি/কাহে, কিয়ে, কথিহুঁ, কব/কবহু, যৈছে/যৈছন, তৈছে/তৈছন, ঐছে/ঐছন, কৈছে/কৈছন' প্রভৃতি।

ব্রজবুলিতে কালের মধ্যে ,আছে মৌলিক ও শত্রন্ত বর্তমান, নিষ্ঠান্ত অতীত, কৃত্য-প্রত্যয়ান্ত ভবিষ্যৎ এবং বর্তমান ও ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞা। যৌগিক কালের কোন ব্যবহার নেই। বিভিন্ন পুরুষে ক্রিয়াবিভক্তির বৈচিত্র্য অসাধারণ, যথা বর্তমান কাল উত্তম-পুরুষের বিভক্তি '-হ*,-ওঁ,-ও,-উ,-ঙু', '-মো', '-ই, -ইএ,-অ' প্রভৃতি। লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য এই—বাঙলার মতই অতীতকালে '-ল' প্রত্যয়, ভবিষ্যৎ কালে '-ব' প্রত্যয় এবং অনুজ্ঞায় '-হ' বা '-উ' প্রত্যয়ের ব্যবহার। কর্মভাববাচ্যের ব্যবহারও মধ্যযুগে বাঙলার মতই— 'কিছু নাহি দীশই'। অর্ধতৎসম বা তৎসম শব্দকে ক্রিয়ারূপে ব্যবহারের (নামধাতুর) দৃষ্টান্তও যথেষ্ট—'উম্মত্ত->উনতায়লি, প্রলাপ->পরলাপসি, অনুমান->অনুমানল'।

অসমাপিকা ক্রিয়ার প্রত্যয় ঃ—'-ই' ('দেখি'), '-ইয়া' ('মাতিয়া'), '-অই' (নিরখই), '-অ' ('জান'), '-ইতে' ('করইতে'), '-অল+হি' ('শুনলহি'), '-অত +হি' ('শুনতহি*'), '-অত' ('চলত'), '-অইতে' (চলইতে') প্রভৃতি।

যৌগিক কাল না থাকলেও ব্রজবুলিতে যৌগিক ক্রিয়ার ব্যবহার যথেষ্টই।—'নেহ বাঢ়ায়লি, মান ধরলি, বাসই লাজ, জিউ বান্ধব, মান মানসি, সাধই দান' প্রভৃতি।

'ইমন্' প্রত্যয়ান্ত শব্দের বিশেষণরূপে প্রয়োগ ব্রজবুলির অন্যতম বৈশিষ্ট্য— 'চতুরিম বাণী', 'নীলম বাস', 'বঙ্কিম ভাঙ্গ'। '-অল'-অন্ত পদের বিশেষণ-রূপে প্রয়োগ মধ্যযুগের বাঙলার মতই—'ছুটল বাণ', 'মুরছলী গোরি'।

[তিন] বাঙলা ভাষার আধুনিক যুগ

অন্ত্যমধ্যযুগের বাঙলা ভাষাতেই কিছু কিছু আঞ্চলিক লক্ষণ প্রকট হ'য়েছিল, আধুনিক যুগে তাদের স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠিত হ'য়েছে [বিস্তৃত আলোচনার জন্য 'উপভাষা' অধ্যায় দ্রষ্টব্য]। তৎসত্ত্বেও মধ্যযুগের মূল সাহিত্যিক ভাষার উপর ভিত্তি ক'রে আধুনিক যে সর্ববঙ্গীয় সাধুরীতি প্রধানতঃ গদ্য ভাষায় অবলম্বিত হ'য়ে থাকে, সেই ভাষার বিশিষ্ট লক্ষণগুলোই নিম্নে প্রদত্ত হ'লো। অবশ্য এই রীতির পাশাপাশি প্রথমতঃ ক্ষীণভাবে, পরে প্রবলতরভাবে শিষ্টচলিত ভাষাও সাহিত্যে ব্যবহৃত হ'য়ে আসছে; এটি মূলতঃ রাঢ়ী ভাষা-আশ্রিত বলেই 'উপভাষা'-অধ্যায়ে এ বিষয়ে আলোচনা বিধেয়।

আধুনিক যুগের প্রধানতম বৈশিষ্ট্য—গদ্যভাষার বিকাশ এবং সাহিত্যে প্রায় একচ্ছত্র আধিপত্য। অন্ত্যমধ্যযুগে বিভিন্ন চিঠিপত্র, দলিল দস্তাবেজ কিংবা কড়চায় গদ্যের ব্যবহার পাওয়া গেলেও সে গদ্য সাহিত্যে ব্যবহৃত হয়নি অথবা ব্যবহারের যোগ্যতা অর্জন করেনি। ১৮০০ খ্রীঃ ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ স্থাপনের পর থেকেই বস্তুতঃ বাঙলা গদ্যভাষার সৃষ্টি এবং গদ্যভাষা যখন সর্বপ্রকার ভাবপ্রকাশের উপযোগী হ'য়ে ওঠে, তখন থেকেই মধ্যযুগীয় কাব্যধারার প্রায় বিলুপ্তি ঘটে এবং যুগোপযোগী নোতুন কাব্যধারার উদ্ভব ঘটে।

মধ্যবাঙলার আধারে স্থাপিত বলেই আধুনিক যুগের সাধুভাষায় মধ্যযুগোচিত কিছু কিছু লক্ষণ এখনও বর্তমান রয়েছে। ক্রিয়া পদের এবং সর্বনাম পদের পূর্ণরূপ আধুনিক যুগের সাধুভাষায় বর্তমান, অন্ত্যমধ্যযুগের শেষদিকে সাহিত্যের ভাষায় অনেক স্থলেই কথ্যভাষার মিশ্রণ ঘটতো, একালের সাধুভাষায় কথ্যভাষার মিশ্রণ বর্জিত হ'লো। লেখার ভাষা কথ্যভাষা থেকে স্বতন্ত্র হ'য়ে রইলো।

সাধুভাষার রীতিকেও প্রাচীন রীতি ও নব্যরীতি—দু'ধারায় বিভক্ত করা যায়। প্রাচীন রীতির বৈশিষ্ট্য নিম্নোক্তরূপ ঃ

শব্দরূপের বহুবচনে '-দিগ/-দে, -গুলি/-গুলা' প্রভৃতির সঙ্গে কারকোচিত বিভক্তি যুক্ত হতো। কখন কখন ষষ্ঠী বিভক্তিযুক্ত পদের সঙ্গে '-দিগ' ইত্যাদি যুক্ত হ'তো,— 'আমারদিগের, আমাদ্দের' (সম্ভবনহেতু), প্রভৃতি। অতীত ও ভবিষ্যৎ কালে প্রথম পুরুষের ক্রিয়াপদে স্বার্থিক '-ক' প্রত্যয় যুক্ত হ'তো,—'করিলেক, হইবেক' প্রভৃতি। নামধাতুর বহুল প্রয়োগ ছিল—'বধিলেন, জিজ্ঞাসিলেন, জিনিলা'। প্রধানতঃ মধ্যম-পুরুষে এবং ক্বচিৎ প্রথমপুরুষেও অতীতকালে '-আ' বিভক্তি যুক্ত হ'তো—'তুমি ডুবিলা, কোথা হতে আইলা, ব্রাহ্মণ কহিলা' প্রভৃতি। প্রেরণার্থক ধাতুর সাধারণরূপের

ব্যবহার একালেই শুরু হয়েছিল—'ফেলাইল ('ফেলিল'-স্থলে), 'খেলাইল ('খেলিল'-স্থলে)'। অভিশ্রুতি এবং স্বরসঙ্গতির অভাব—'নেকড়িয়া' (একালে 'নেকড়ে'), 'অকেজুয়া' (> অকেজো)।

সাধুরীতিতে মধ্যযুগোচিত অনেক লক্ষণই লুপ্ত হ'য়েছিল। যথা—'মোর, মোকে' প্রভৃতি কবিতা এবং আঞ্চলিক ভাষায় বর্তমান থাকলেও সাধুরীতিতে লোপ পেলো। 'যিঁহ, তিঁহ'-জাতীয় সর্বনাম-স্থলে আধুনিক যুগে 'যিনি, তিনি' রূপ ব্যবহৃত হয়। 'আছ্'-ধাতুর সংক্ষিপ্ত রূপের প্রচলন—'আছিল>ছিল'। অস্ত্যর্থক 'বট্' ধাতুর অপ্রচলন ; নাস্ত্যর্থক 'নহ্'-ব্যতীত অপর ধাতুর লোপ।

সাধুভাষার নব্যরীতিতে রাঢ়ী ভাষার আঞ্চলিক ধর্ম বিশেষভাবে ফুটে উঠেছে, তবে মৌখিক বা কথ্যভাষার অনুপ্রবেশ অবারিত নয়। সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদের হাতে গদ্য সাহিত্যের সৃষ্টি বলেই সাধুরীতিতে সংস্কৃতের প্রভাব দুর্লক্ষ্য নয়। বাঙলা গদ্যের উদ্ভব-পর্বে তথা ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের যুগেও ফার্সীই ছিল কোর্ট কাচারির ভাষা, তার চর্চা তখনো অব্যাহত, প্রভাবও কোন কোন ক্ষেত্রে বর্তমান ছিল। আবার এ যুগে ইংরেজীই উচ্চশিক্ষা এবং রাজকার্যের ভাষারূপে পরিণত হ'য়েছিল বলে ইংরেজী শব্দ, ইডিয়ম এবং বাক্যরীতিও বাঙলা ভাষাকে অনেকাংশে প্রভাবিত করেছে।

সংস্কৃত-প্রভাবিত রচনার নিদর্শন : "পুন্নাগনাগকেশরাগুরুভাণ্ডীরাশোক-শোভিত বনসুন্দরীগণবিলাসিতাত্যন্তমনোহর দ্বিরদাস্পদ নামে বন" (উইলিয়ম কেরী : 'ইতিহাসমালা')।

ফার্সীপ্রভাব : অসংখ্য শব্দের ব্যবহার ছাড়াও বহুবচনে '-ন' প্রত্যয় (মহাজনান) '-ত' (দলিলাত) ; 'ওগয়রহ' প্রত্যয় (>গয়রহ) ; গৌণকর্মে '-তক' প্রত্যয় (মহারাজতক নিবেদন) ; উপসর্গ 'ব' (বকলম),-বে' (বেদখল,) 'গিরি',-দার' প্রভৃতি প্রত্যয় ; সংযোজক অব্যয় 'ব' (>ও)।

ইংরেজি প্রভাবিত রচনার নিদর্শন : "জে কোন কেতাব না অদ্যাবধি প্রকাশ পাইয়াছে সিখাইতে তোমারদিগকে ইঙ্গরাজি কথা সহজে আর অনাআসে" (মিলার : 'সিক্ষ্যাগুরু')।

আধুনিক যুগের সাধুরীতির গদ্যে অপিনিহিতির কোন স্থান নেই। ফলতঃ অভিশ্রুতিও অনুপস্থিত। স্বরসঙ্গতির নিমিত্ত ধ্বনি-পরিবর্তনও যৎসামান্য দেখা দিয়েছে। যৌগিক ক্রিয়ার ব্যবহার ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেয়েছে। '-ইয়া' অসমাপিকার পরিবর্তে 'পূর্বক' 'করতঃ' বহু স্থলেই ব্যবহৃত হয়। একমাত্র সম্ভাবক ভাব ('সে না গেলে না যাবে')-ব্যতীত অন্যত্র নঞর্থক 'না' শব্দ সমাপিকা ক্রিয়ার পরে বসে।

'এবং'-এর সাহায্যে দুটি বাক্যের এবং 'ও' (ফারসী 'ৱ' জাত)-এর সাহায্যে দুটি পদের সংযোজন আধুনিক যুগে বৃদ্ধি পেয়েছে।

বাক্যে সাধারণতঃ প্রথমে কর্তা পরে কর্ম এবং সর্বশেষে সমাপিকা ক্রিয়া ব্যবহৃত হয়। '-ইয়া'-যুক্ত অসমাপিকা ক্রিয়ার সাহায্যে বহু সংক্ষিপ্ত সরল বাক্যকে একটিমাত্র যৌগিক বাক্যে পরিণত করা হয়।—'তুমি বাড়ি গিয়ে বিশ্রাম ক'রে খাওয়া দাওয়া সেরে পরে এসো।'

বিভিন্ন বিদেশি শব্দের বিশেষভাবে ইংরেজি শব্দের ব্যবহার ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে। আবার বিদেশি শব্দের অনুবাদ-রূপে এবং পারিভাষিক শব্দ-রূপে বহু নোতুন বাঙলা শব্দ (প্রধানত তৎসম-জাতীয়) সৃষ্ট হয়ে চলছে।

সাধুরীতিতে যৌগিক ক্রিয়ার ব্যবহার অত্যধিক বৃদ্ধি পেয়েছে। 'গিয়া' স্থলে 'গমন করিয়া', 'শুইলে' স্থলে 'শয়ন করিলে', 'খাইতে' স্থলে 'ভোজন করিতে' প্রভৃতি।

কর্তা সাধারণতঃ বিভক্তিহীন, '-এ' বিভক্তিযুক্ত অথবা নির্দেশক প্রত্যয়যুক্ত হয়। গৌণকর্ম-সম্প্রদানে '-কে' বিভক্তি; করণকারকে '-এ' বিভক্তি বা অনুসর্গ যুক্ত হয়। গমনার্থক বা অস্ত্যর্থক ক্রিয়া থাকলে অধিকরণ কারকে বিভক্তিচিহ্ন যুক্ত হয় না, অন্যত্র সাধারণতঃ '-এ' বিভক্তি। অপাদানকারকে অনুসর্গ যুক্ত হয়।

ক্রিয়ার ভাব দু'টি—নির্দেশক ও অনুজ্ঞা; কাল চারিটি—বর্তমান, অতীত, নিত্যবৃত্ত ও ভবিষ্যৎ। প্রত্যেকটির সাধারণ রূপ ছাড়াও পুরাঘটিত এবং ঘটমান রূপও বর্তমান।

মধ্যযুগের একমাত্র ছন্দ অক্ষরবৃত্ত ছাড়া আধুনিক যুগে মাত্রাবৃত্ত এবং স্বরবৃত্তের প্রচলন হয়; এদের ব্যবহার ক্রমবৃদ্ধির দিকে। রূপকল্প (pattern)-সৃষ্টিতেও বৈচিত্র্যের পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে।

দ্বাবিংশ অধ্যায়

বাঙলার উপভাষা

প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্যে সুস্পষ্টভাবে কোন আঞ্চলিক ভাষাধর্ম বলে কিছু গড়ে ওঠেনি বলেই মনে হয়। তৎসত্ত্বেও বিভিন্ন অঞ্চলে ভাষাস্রোত যে ভিন্ন ভিন্ন খাতে বইতে শুরু করেছিল, তার দৃষ্টান্ত অন্ত্যমধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্যে নিতান্ত দুর্লভ নয়। তবে বিভিন্ন রচনার ভাষাগত উপাদানের মধ্যে যে একটি সার্বভৌম সর্ব-বঙ্গীয় আদর্শের যোগসূত্র ছিল, প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্যে তারও পরিচয় বিধৃত। কালক্রমে আঞ্চলিক লক্ষণগুলো সুস্পষ্ট হ'য়ে উঠতে থাকে এবং বলতে গেলে আধুনিক কালেই বাঙলা ভাষায় আঞ্চলিক ধর্মের সুনিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া যায়। বঙ্গদেশের তথা বঙ্গভাষাভাষী অঞ্চলের আয়তন অতিবৃহৎ বলেই মৌখিক ভাষায় অঞ্চলভেদে বহু বিচিত্র রূপ পরিলক্ষিত হয়। আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যে গড়া 'ভাষাগুচ্ছ'কে উপভাষা বা dialect বলা হয়।

একই ভাষা ঐতিহাসিক কারণে স্থান-কাল-পাত্র-ভেদে একাধিক উপভাষায় যেমন রূপান্তরিত হয়, তেমনি কোন কোন উপভাষাও ঐতিহাসিক, রাষ্ট্রীয় বা সাংস্কৃতিক অথবা অপর বিশেষ কোন সুযোগ লাভ ক'রে একটি **'কেন্দ্রীয় উপভাষা'র** মর্যাদা লাভ করে। বিভিন্ন উপভাষা অঞ্চলের অধিবাসীরাও নিজেদের ব্যাবসায়িক, সাংস্কৃতিক বা জীবিকা-নির্বাহের প্রয়োজনে 'কেন্দ্রীয় উপভাষা অঞ্চলে'র সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে বাধ্য হয় বলে এই 'কেন্দ্রীয় উপভাষা'ই সমগ্র ভাষা পরিবারের 'আদর্শ কথ্যভাষা' (Standard Colloquial Language) বা 'চলিত ভাষা'-রূপে গৃহীত হয়। এমন কি, সাহিত্যে চলিত ভাষার দাবি প্রতিষ্ঠিত হ'লে এই 'আদর্শ কথ্যভাষা'ই তৎস্থলবর্তী হয়। বাঙলা ভাষাকে প্রেক্ষাপটে রেখে বিচার করলে দেখতে পাই, খ্রীঃ দশম শতকের পূর্বে এই পূর্বাঞ্চলে* মাগধী অবহট্‌ঠ-জাত' একটি নব্য ভারতীয় আর্যভাষার সৃষ্টি হ'য়েছিল; বাঙলা, আসাম এবং উড়িষ্যায় তারই বিভিন্ন ঔপভাষিক রূপ প্রচলিত ছিল। তারপর ক্রমে বাঙলা, ওড়িয়া এবং অসমীয়া স্বাতন্ত্র্য অর্জন ক'রে নিজেরাই এক একটি পরিপূর্ণ ভাষা হ'য়ে দাঁড়ায়। এটি অনুমানসিদ্ধ তত্ত্ব। পরবর্তী ঘটনা-পরম্পরা আমরা জানি। বাঙলা ভাষা অঞ্চলভেদে বিভিন্ন উপভাষায় পরিণত হ'য়েছে। তিনশত বৎসর পূর্বে দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গে ভাগীরথীর তীরে কলকাতা পত্তনের পর থেকে [illegible] থাকে। পূর্বভারতের ব্যবসা-বাণিজ্য, রাষ্ট্রনীতি ও শিক্ষা-

সংস্কৃতির কেন্দ্রস্থল হ'য়ে দাঁড়ায় কলকাতা। অতএব কলিকাতার তথা ভাগীরথীর সন্নিহিত অঞ্চলের ভাষা অর্থাৎ রাঢ়ী উপভাষা কালে কালে **'কেন্দ্রীয় উপভাষা'র** মর্যাদায় অভিষিক্ত হয়। শিষ্টজনের মুখে এই উপভাষাই কিছুটা মার্জিত হ'য়ে 'শিষ্ট কথ্যভাষা' 'বা' 'আদর্শ' কথ্যভাষা'-রূপে সাহিত্যে 'চলিত ভাষা'-রূপে ব্যবহৃত হ'চ্ছে। এই 'আদর্শ' কথ্যভাষা'র প্রভাব রাজনৈতিক সীমা এবং উপভাষা অঞ্চলেরও সীমা অতিক্রম ক'রে পূর্ববঙ্গেও (বর্তমানের স্বাধীন 'বাঙলাদেশে'ও) 'শিষ্টভাষা'র মর্যাদা লাভ করেছে।

বাঙলা ভাষার অন্তর্ভুক্ত উপভাষাসমূহের সংখ্যা নিয়ে পণ্ডিতমণ্ডলীতে প্রচুর মতভেদ দেখা যায়। সুদীর্ঘকাল পূর্বে স্যার জর্জ এব্রাহাম গ্রীয়ার্সন তাঁর বহুখণ্ডে বিভক্ত মহাগ্রন্থ Linguistic Survey of India-র পঞ্চম খণ্ডে বাঙলার আঞ্চলিক উপভাষা-বিভাষাসমূহের যে বিবরণ দিয়েছেন, তাদের সংখ্যা ন্যূনাধিক চল্লিশটি—যদিও গুচ্ছবদ্ধ করলে তাদের ৪/৫টিতে নিয়ে আসা যায়। গ্রীয়ার্সনের এই মহৎ উদ্যম সত্ত্বেও আজ পর্যন্ত বাঙলার যেমন কোন ঔপভাষিক ব্যাকরণ রচিত হয়নি, তেমনি এর পর হয়নি কোন ভাষাগত ভৌগোলিক জরীপও। ফলতঃ বাঙলার উপভাষাগুলো-সম্বন্ধে সর্বজনমান্য কোন সংখ্যায় পৌঁছানো সম্ভব নয়। কেউ কেউ যেমন 'রাঢ়ী-বঙালী-বরেন্দ্রী-কামরূপী'—এই চারটি মাত্র উপভাষার কথা বলেছেন, তেমনি আবার কেউ কেউ 'পাশ্চাত্ত্য বা গৌড়ী' এবং 'প্রাচ্য বা বঙ্গীয়' এই দুইটি প্রধান বিভাগ এবং তাদের অন্তর্ভুক্ত যথাক্রমে রাঢ়ী-ঝাড়খণ্ডী-বরেন্দ্রী-পশ্চিম কামরূপী-মধ্যপূর্বী এবং পূর্বদেশী, দক্ষিণপূর্বী, পশ্চিমা ও দক্ষিণ পশ্চিমা—এই আটটি ভাষাগুচ্ছের কথাও বলে থাকেন। নামে বা সংখ্যায় যত মতদ্বৈধই থাক না কেন, বাঙলা ভাষার যে দুটি উপভাষাই (রাঢ়ী ও বঙ্গালী) প্রধান এবং অপরগুলো যে তাদের কোন না কোন একটির নিকট-সম্পর্কিত একথা অস্বীকার করবার উপায় নেই। যাহোক, এ বিষয়ে ডঃ সুকুমার সেন-কৃত উপভাষা-বিভাগই সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হ'য়ে থাকে। তিনি স্থূল বিবেচনায় নিম্নোক্তক্রমে প্রধান উপভাষাগোষ্ঠীকে শ্রেণীবদ্ধ করেছেন:

(১) মধ্য-পশ্চিমবঙ্গের উপভাষা 'রাঢ়ী', (২) দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তের উপভাষা 'ঝাড়খণ্ডী', (৩) উত্তরবঙ্গের 'বরেন্দ্রী', (৪) পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ববঙ্গের 'বঙ্গালী' এবং (৫) উত্তর-পূর্ববঙ্গের 'কামরূপী'।
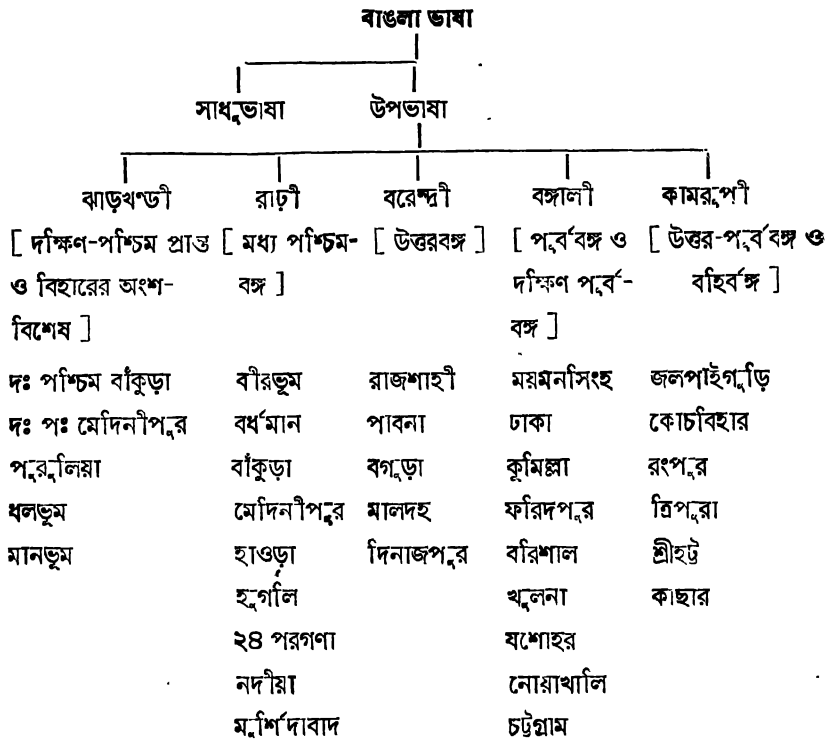
[এক] রাঢ়ী-উপভাষা / শিষ্ট কথ্য ভাষা

প্রধানতঃ হুগলী, হাওড়া, বর্ধমানের কতকাংশ এবং চব্বিশ পরগণা জেলাকে কেন্দ্র ক'রে প্রায় সমগ্র পশ্চিমবঙ্গই রাঢ়ী-উপভাষার অন্তর্ভুক্ত—বাদ শুধু পশ্চিমের প্রত্যন্ত এবং উত্তরবঙ্গ। এই রাঢ়ী-উপভাষারই একটা শিষ্ট মার্জিত রূপ সাহিত্যে 'চলিত ভাষা'রূপে প্রচলিত। সর্ববঙ্গীয় আদর্শ কথ্যভাষা (Standard Colloquial Bengali) বা 'প্রমিত ভাষা'ও এই রাঢ়ী উপভাষাকে ভিত্তি করেই তৈরি। সর্ববঙ্গে শিক্ষিত সমাজ ভিন্ন উপভাষা-অঞ্চলের লোকেরাও পারস্পরিক কথোপকথনে এই ভাষাই ব্যবহার করে থাকেন। এমন কি বর্তমানে বাঙলাদেশের শিষ্ট সমাজেও এই ভাষারূপই বিশেষভাবে প্রচলিত—সাহিত্যে, নাটকেও এই উপভাষারই একচ্ছত্র আধিপত্য। তবে লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য এই—খাঁটি রাঢ়ী উপভাষা, অর্থাৎ জানপদ ভাষা এবং প্রান্তিক অঞ্চলের উপভাষা কিন্তু এই 'শিষ্ট ভাষা' থেকে কিছুটা ভিন্নতর। ওটি প্রকৃতই জনপদের

ধ্বনিগত দিক থেকে রাঢ়ী উপভাষার বৈশিষ্ট্য ঃ

'অ'-স্থলে 'ও'-কার প্রবণতা রাঢ়ী উপভাষার অন্যতম বৈশিষ্ট্য ঃ—অতুল>ওতুল, অগ্নি>ওগ্নি, পাগল>পাগোল, মত>মতো, বড়>বড়ো।—প্রান্তিক বিভাষায় 'ও'-কার প্রবণতা অপেক্ষাকৃত অল্প।

নাসিক্যীভবন এবং স্বতোনাসিক্যীভবনের প্রাধান্য ঃ—চন্দ্র>চন্দ>চাঁদ, বংশ>বাঁশ পুস্তিকা>পোথিআ>পুথি>পুঁথি, ইষ্টক>ইট>ইঁট। প্রান্তিক বিভাষায় অধিকতর স্বতোনাসিক্যীভবন প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়।—চাঁ, হঁইছে।

অপিনিহিতি সম্পূর্ণ বর্জিত এবং তৎস্থলে অভিশ্রুতি এবং স্বরসঙ্গতির ক্রমবর্ধমান প্রয়োগ ঃ—আজি>আইজ>আজ, করিয়া>কইর্যা>ক'রে, দেশি>দিশি, নিরামিষ> নিরামিষ্যি। কোন কোন বিভাষায় অপিনিহিতির রেশ বর্তমান রয়েছে—হেঁটে> হেঁইটে, মেরে ধরে>মেইরে ধইরে। 'ই' এবং 'উ'-এর শিথিল উচ্চারণের ফলে তৎস্থলে 'এ' এবং 'ও'-কার প্রবণতা—শিকল>শেকল, ভিতর>ভেতর, উপর>ওপর।

পদের আদিতে শ্বাসাঘাতপ্রবণতা এবং তৎহেতু পদমধ্যবর্তী ও পদান্তস্থিত মহাপ্রাণ এবং ঘোষবর্ণের মৃদুতা—দুধ>'দুদ্, সাথে>'সাতে, লর্ড>'লাট, অবসর> 'অপ্সর। ক্বচিৎ অঘোষধ্বনি ঘোষধ্বনিতেও পরিবর্তিত হয়—উপকার>উবগার, শাক শাগ, ছাত>ছাদ। অন্যত্র ঘোষধ্বনি ও মহাপ্রাণ ধ্বনি রক্ষিত।

পদমধ্যস্থ 'হ'-কারের লোপপ্রবণতা—তাহার>তার, কহি>কই।

'ন' এবং 'ল' ধ্বনির বিপর্যয়—লাউ>নাউ, গুলো>গুনো, নৌকো>লৌকো, নয়>লয়।

দ্বিমাত্রিকতা এবং ব্যঞ্জনদ্বিত্ব—হইতেছে>হত্ছে>হচ্ছে, গামোছা>গামছা, সবাই>সব্বাই, কখনো>কক্খনো। প্রান্তিক বিভাষায়—হবে>হব্বে।

রূপগত বৈশিষ্ট্য ঃ—কর্তৃকারকের বহুবচনে '-গুলি' এবং তির্যককারকের বহুবচনে '-দের' বিভক্তির প্রয়োগ—ছেলেগুলো, পাখিদের।

গৌণকর্ম-সম্প্রদানে '-কে' ('আমাকে দাও'), অধিকরণ কারকে '-এ' এবং '-তে' বিভক্তির প্রয়োগ—'ঘরে যাও, বাড়িতে থেকো'। বিভিন্ন কারকে বিভক্তিস্থলে অনুসর্গের প্রয়োগ,—করণকারকে 'সঙ্গে' (বঙ্গালী-প্রভাবে 'সাথে'), 'দিয়ে' প্রভৃতি অপাদান-কারকে 'থেকে, হ'তে' প্রভৃতি।

সকর্মক ক্রিয়ার কর্তায় '-এ' বিভক্তির প্রয়োগ—'ছাগলে ঘাস খায়।' বর্তমান কালে উত্তমপুরুষ '-ই' (করি, খাই), মধ্যমপুরুষ '-অ,-ও' (কর, খাও), তুচ্ছার্থে 'ইস্' (করিস্, খাস্), প্রথমপুরুষে '-এ' (করে, খায়) এবং সম্ভ্রমাত্মক মধ্যম ও প্রথমপুরুষে

'-এন' (করেন, খান)। অতীতকালে উত্তমপুরুষে '-লুম, -লাম (বঙ্গালী-প্রভাব), -লেম' (করলুম, খেলাম, দিলেম), মধ্যমপুরুষে '-এ' (খেলে), তুচ্ছার্থে '-ই' (খেলি) প্রথমপুরুষে '-অ' (গেল), কিন্তু **সকর্মক ক্রিয়ার '-এ'** (**দিলে**), সম্ভ্রমার্থে '-এন' (দিলেন)। প্রান্তিক বিভাষায় 'গেনু, করনু' প্রভৃতিও চলে। কোথাও বা '-ল-' যুক্ত অতীত—'গেলছিল'। ভবিষ্যৎকালে প্রথম পুরুষে '-অ, -ও' (যাব, করবো), মধ্যমপুরুষ ও প্রথমপুরুষে '-বে' (তুমি/সে করবে), মধ্যমপুরুষ তুচ্ছার্থে '-বি' (করবি), সম্ভ্রমার্থে '-বেন' (দেবেন)।

'-ইতে'-অসমাপিকাযোগে যৌগিক অসম্পন্ন (ঘটমান) কাল এবং '-ইয়া' যোগে সম্পন্ন কালের পদ গঠন করা হয়।—করিতেছি>করছি, দেখিতেছিলে>দেখ্‌ছিলে ; করিয়াছি>করেছি, দেখিয়াছিল>দেখেছিল (স্বরসঙ্গতির ফলে এই পরিবর্তন সাধিত হয়েছে)।

আদর্শ কথ্যভাষায় 'লইয়া>নিয়ে' এবং 'যাইয়া>গিয়ে' ব্যবহৃত হয়।

[দুই] ঝাড়খণ্ডী উপভাষা

মেদিনীপুর জেলার কতকাংশে রাঢ়ী উপভাষা প্রচলিত, অপর অংশে এবং ধলভূম, মানভূম অঞ্চলে 'ঝাড়খণ্ডী' বা 'সুহ্মক উপভাষা' প্রচলিত। ঝাড়খণ্ডী উপভাষা বস্তুতঃ রাঢ়ী উপভাষারই কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত রূপ,—উভয় উপভাষায় যথেষ্ট সাদৃশ্য বর্তমান।

ধ্বনিগত বৈশিষ্ট্য ঃ—সানুনাসিক স্বরধ্বনির প্রাচুর্য এই উপভাষার অন্যতম বৈশিষ্ট্য —উঁট, হাঁতে, চাঁ হঁইছে।

পদান্তস্থিত '-ইয়া' -স্থলে '-অ্যা' এবং 'আ'-কারের পূর্বস্থিত 'ও'-কার স্থলে 'অ'-কার প্রবণতা বিশেষভাবে লক্ষণীয়।—করিয়া>কর্‌্যা, বোকা>বকা, রোগা>রগা।

অপিনিহিতি কোথাও সংরক্ষিত, কোথাও বা দুর্বল হ'য়েছে, কিন্তু লোপ পায়নি। —কালি>কাইল>কা‌ইল ; সাঁইঝ।

'র' এবং 'ন'-স্থলে 'ল'কার প্রবণতাও ঝাড়খণ্ডী উপভাষায় লক্ষ্য করা যায়। নাতিপুতিরা>লাতিপুঁতিলা, নয়>লয়, লোকেরা>লক্‌লা।

'হ'-যুক্ত ধ্বনি বা মহাপ্রাণিত ধ্বনির বাহুল্য—আমাকে>হামাক, যাও> ঝাউ, পতাকা>ফৎকা।

রূপগত বৈশিষ্ট্য ঃ—বহুবচনে ওড়িয়া ভাষার প্রভাব-জাত '-মন্‌/-মেন্‌' প্রত্যয়ের ব্যবহার—তাঁদের>তারমন্‌কার।

কর্মে ও সম্প্রদানকারকে '-কে' বিভক্তি ঃ বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে তাদর্থ্যে অর্থাৎ উদ্দেশ্য বুঝাতেও সম্প্রদানকারকে '-কে' বিভক্তির প্রয়োগ—'জলের জন্য গেছে>জলকে

গেল্‌ছে ; ঘরকে চল’। অপাদানকারকে ‘-উ’ বিভক্তি এবং ‘-লে’ ও ‘-ঠে’ অনুসর্গীয় প্রত্যয় ব্যবহৃত হয়।—ঘর থেকে>ঘর লে, ঘর ঠে।

অধিকরণকারকে ‘-কে’ বিভক্তির প্রয়োগ—রাইতকে জাড়াবে।

প্রচলিত সর্বনাম পদ ছাড়াও অতিরিক্ত ‘মুই, হামরা, মোনে’ প্রভৃতি ব্যবহৃত হয়।। অতীত ও ভবিষ্যৎ কালের ক্রিয়ার সঙ্গে স্বার্থিক ‘-ক’ প্রত্যয়ের বহুল ব্যবহার—‘করলেক, হবেক’। বর্তমান কালে মধ্যমপুরুষে ‘-উ’ বিভক্তি (‘তু চলু’), এবং অতীত কালে উত্তমপুরুষে ‘-ই’ বিভক্তি (‘আমি জাতোছিলি’)।

নামধাতুর ব্যবহারে বাহুল্য লক্ষ্য করা যায়—‘জলটা গঁধাচেছ’ (=গন্ধ করছে), ‘মাথাটা দুখাচেছ’ (দুঃখ দিচেছ অর্থাৎ ব্যথা করছে)।

অস্ত্যর্থক ‘বট্‌’ ধাতুর ব্যবহার, ‘আছ্‌’ ধাতুর স্থলেও—‘ইটা মিছা কথা বঠে ; করিয়াছে>করিবঠে’।

যৌগিক প্রযোজক ক্রিয়ার ব্যবহার এই উপভাষার একটি বৈশিষ্ট্য—উঠা করানো (উঠানো), আনা করানো (আনানো)।

নঞর্থ উপসর্গ ক্রিয়ার পূর্বে বসে—নাই যাব, নাই হয়।

[তিন] বরেন্দ্রী উপভাষা

এক সময় বরেন্দ্রী উপভাষার সঙ্গে রাঢ়ী উপভাষার বিশেষ কোন পার্থক্য ছিল না। পরে বঙ্গালীর প্রভাবে বরেন্দ্রী উপভাষা বিশিষ্টতা লাভ করে। উত্তর বাঙলার প্রাচীন বরেন্দ্রভূমিতে অর্থাৎ মালদহ, দিনাজপুর, রাজশাহী, বগুড়া এবং পাবনা জেলায় এই উপভাষা প্রচলিত।

ধ্বনিগত বৈশিষ্ট্য :—বরেন্দ্রী উপভাষায় মোটামুটি মূল ধ্বনি বজায় আছে, তবে কোন কোন-স্থলে পরিবর্তনও দেখা যায়।—স্বরধ্বনি প্রায় অপরিবর্তিত থাক্‌লেও ‘-অ্যা’ ধ্বনিরও আগম ঘটেছে।—অ্যাক, দ্যান।

পদের আদিস্থিতমহাপ্রাণ ও ঘোষধ্বনি প্রায় অবিকৃত থাক্‌লেও পদান্তে মৃদুতা এসে গেছে, ‘হ’-কারের ক্ষেত্রেও একই অবস্থা।

পদের আদিতে ‘র’-এর লোপ ও আগম এই উপভাষার একটি বিশিষ্ট লক্ষণ—রামবাবুর আমবাগান>আমবাবুর রামবাগান ; রাস্তা>আস্তা, ইন্দুর>র‍্যান্দুরা।

চ-বর্গের তালব্য উচ্চারণ রক্ষিত হ’লেও ‘জ’ অনেক সময় উষ্ম ‘জ়’ (=z) বা ‘ঝ়’-এ পরিণত হ’য়েছে।

স্বরধ্বনির অনুনাসিকতা বজায় আছে—চাঁদ, কাঁটা।

শ্বাসাঘাতের কোন নির্দিষ্ট স্থান নেই।

রূপগত বৈশিষ্ট্য ঃ—বহুবচনের বিভক্তি '-গুলি, -গিলা' এবং তির্যককারকের বহুবচনের বিভক্তি 'দের'। গৌণকর্মে '-কে' এবং '-ক্' বিভক্তি (হামাক্ দাও'), অধিকরণ কারকে '-ৎ' বিভক্তি—'ঘরৎ যাও'।

উত্তমপুরুষের বিভক্তিতে বঙ্গালী প্রভাব পড়েছে, ভবিষ্যৎ কালে '-ম,-মু (যাম, যামু) এবং অতীতকালের 'লাম' (-'লুম' স্থলে)।

[চার] বঙ্গালী উপভাষা

বঙ্গালী উপভাষা এত বিস্তৃত অঞ্চলে প্রচলিত এবং তার মধ্যে বৈচিত্র্য এত বেশী যে এদের একটি মাত্র উপভাষায় গুচ্ছবদ্ধ করলে এর স্বরূপ নির্ণীত হ'বে না। এদের অন্তত দুটি গুচ্ছে বিভক্ত করতেই হয়; এক গুচ্ছে পড়ে—ঢাকা, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, বরিশাল, খুলনা, যশোর, নদীয়ার অংশবিশেষ ও পশ্চিম শ্রীহট্ট; অপর অংশে পড়ে—নোয়াখালি, চট্টগ্রাম, ত্রিপুরা, কাছার ও পূর্ব শ্রীহট্ট। তা সত্ত্বেও কিছু কিছু বিভ্রান্তির অবকাশ থেকে যায়। যথাস্থান কিছু কিছু ব্যতিক্রমের নিদর্শন দেওয়া হচ্ছে।

ধ্বনিগত বৈশিষ্ট্য ঃ—বঙ্গালীর স্বরধ্বনিতে প্রাচীনত্ব অনেকটা রক্ষিত—'অ'-স্থানে 'ও'-কার প্রবণতা নেই। তবে '-ও'-কার স্থানে 'উ'-কার (ভোর > ভুর, চোর > চুর) এবং 'এ'-কার স্থানে 'অ্যা'-কার উচ্চারিত হয়—দেশ > দ্যাশ, মেঘ > ম্যাঘ। প্রকৃতপক্ষে বঙ্গালী ভাষায় উচ্চারণ 'এ'-ও (e) নয়, রাঢ়ী উপভাষার 'অ্যা'-ও (æ) নয়, উভয়ের মাঝামাঝি একটা উচ্চারণ (ɛ) যা লিখে দেখানোর উপায় নেই। এটির উচ্চারণস্থান 'æ' এর চেয়ে একটু উপরে এবং উচ্চারণকালে মুখবিবর অপেক্ষাকৃত সংবৃত থাকে।

মধ্যবাঙলায় যে অপিনিহিতি দেখা দিয়েছিল, তা' বঙ্গালী ভাষায় এখনো পরিপূর্ণভাবে বিরাজমান—আজি > আইজ, কালি > কাইল, হাঁটিয়া > হাইট্যা। যুক্ত ব্যঞ্জনের পূর্বে, বিশেষতঃ ক্ষ, হ্ম, য-ফলা প্রভৃতির পূর্বে 'ই'-ধ্বনির আগম ঘটে—রাক্ষস > রাইক্‌খস, ব্রাহ্ম > ব্রাইহ্ম, কার্য > কাইর্জ, অধ্যক্ষ > অইদ্ধক্ষ। অভিশ্রুতি এখন পর্যন্ত অদৃষ্ট, স্বরসঙ্গতির পরিমাণও খুব কম। কোন কোন ক্ষেত্রে স্বরবৈষম্য লক্ষিত হয়, যেমন 'টাকা' > 'ট্যাকা'।

সানুনাসিক স্বরধ্বনির একান্ত অভাব; আবার কোন কোন স্থলে পূর্ণ অনুনাসিক ধ্বনিটি বর্তমান থাকে, কিন্তু পূর্ববর্তী স্বরকে সানুনাসিক করে না। চন্দ্র > চন্দ > চান, চাদ, কণ্টক > কাটা, পঞ্চ > পাচ, হংস > হাস। (কিন্তু চট্টগ্রামী উপভাষায় সানুনাসিক ধ্বনির প্রবলতা লক্ষ্য করা যায়—আমি > আঁই।)

ঘোষবৎ মহাপ্রাণ বর্ণ অর্থাৎ বর্গের চতুর্থ বর্ণ (ঘ, ঝ, ঢ, ধ, ভ) কণ্ঠনালীয় স্পর্শযুক্ত তৃতীয় ধ্বনিতে অর্থাৎ 'অবরুদ্ধ ধ্বনিতে' (যথাক্রমে গ', জ', দ', ড', ব'-ধ্বনিতে) পরিণত

হয়।—ভাত>ব'াত, ঘা>গা', ধান>দা'ন। 'হ' কারও তার মহাপ্রাণত্ব হারিয়ে কণ্ঠনালীয় ধ্বনিতে পরিণত হয়।—হাতি>আ'ত্তি, হাট্>আ'ঠ্।

তালব্যবর্ণ অর্থাৎ চ বর্গীয় ঘৃষ্টধ্বনি (affricate) পুরো উষ্মধ্বনিতে (fricative) রূপান্তরিত—চ>ৎস (ts), ছ>স (s), জ>জ় (dz), ঝ>ঝ় (z)। 'ক, খ, গ, প, ফ'-ধ্বনিও কিঞ্চিৎ উষ্মতাপ্রাপ্ত হয়।—কাগজ>কাগজ, কালীপুজো>খালিফুজা।

'ট, ঠ' কখন কখন 'ড' ধ্বনিতে (কেটা>কেডা, মাঠে>মাডে) এবং 'ড়, ঢ়' সর্বদা 'র' ধ্বনিতে পরিবর্তিত—বাড়ি>বারি, আষাঢ়>আশার।

'শ, ষ, স' কখন কখন 'হ'-কারে পরিণত এবং পূর্ণ উচ্চারিত হয়।—সকলে> হগলে, শিয়াল>হিআল, সে>হে।

শ্বাসাঘাতের কোন নির্দিষ্ট স্থান নেই; অনেক সময় শ্বাসাঘাত (stress accent) থাকে না, তবে স্বরাঘাত (pitch accent, intonation) থাকে।

রূপগত বৈশিষ্ট্য :—সকর্মক-অকর্মক-নির্বিশেষে সর্বপ্রকার ক্রিয়ার কর্তাতেই '-এ' বিভক্তি যুক্ত হ'তে পারে।—'বাবায় আইছে, দাদায় কইলো'। গৌণকর্মে ও সম্প্রদানে '-রে' বিভক্তি—'আমারে কও, ল্যাংড়ারে ভিক্ষা দেও'। করণকারকে '-এ' বিভক্তি ছাড়াও 'দিয়া, সাথে, লগে' প্রভৃতি অনুসর্গের ব্যবহার; অপাদানে—'থে, -থন, -থিক্যা, -অ'তি (<হইতে)' প্রভৃতি অনুসর্গ বা অনুসর্গীয় বিভক্তি যুক্ত হয়; অধিকরণকারকের বিভক্তি '-এ' এবং '-ৎ'—বাড়িৎ যাও', 'ঘরিৎ কয়ডা বাজে'।

বহুবচনের প্রত্যয় '-রা', '-গুলাইন', তির্যককারকে বহুবচনে '-গো' বা '-রা' প্রত্যয় যোগ ক'রে পরে বিভক্তিচিহ্ন ব্যবহার করতে হয়।—'তাগোরে, আমরার, তোমাগোর'। কোন কোন বিভাষায় একবচনে নির্দেশক প্রত্যয় '-ডা' (<-টা) এবং বহুবচনে '-ডি' (<টি) ব্যবহৃত হয়, এ এক বিচিত্র ব্যবহার—'গরুডিরে (—গরু-গুলোকে) লইয়া যাও, ছাগলডা (=ছাগলটা) থাউক'।

অতীতকালে উত্তমপুরুষের বিভক্তি '-লাম', মধ্যমপুরুষে '-লা', '-তুচ্ছার্থে '-লি' প্রথমপুরুষে '-লো / -ল্' এবং সম্ভ্রমার্থে '-লাইন' '-লেন'। বর্তমান কালে উত্তমপুরুষে '-ই', মধ্যমপুরুষে '-অ / -ও', তুচ্ছার্থে '-ইস', প্রথমপুরুষে '-এ' সম্ভ্রমার্থে '-(উ) ইন্'। ভবিষ্যৎ কালে উত্তমপুরুষে '-আম, -বাম, -মু, -উম্', মধ্যমপুরুষে 'বা', তুচ্ছার্থে 'বে', প্রথমপুরুষে '-ব / বো', সম্ভ্রমার্থে '-বাইন' 'বেন'। নঞর্থক ভবিষ্যৎকালে কোন কোন বিভাষায় একটি বিচিত্র প্রয়োগ দেখা যায়—উত্তমপুরুষে ভবিষ্যৎকালে বাক্যটি নঞর্থক হ'লে ক্রিয়াপদটি ভবিষ্যৎকালের পরিবর্তে নিত্যবৃত্ত অতীতের রূপ ধারণ করে।—'আমি তোমার বারিৎ

যাইবাম / যাইতাম পারি (যাব / যেতে পারি) কিন্তু খাইতাম না। ('=খাব না)।'

যৌগিক সম্পন্নকালের পদের গঠনে '-ইয়া>ই>O' অসমাপিকা ক্রিয়ার সঙ্গে '-আছ্' ধাতুর রূপ যুক্ত হয়—'করিয়াছি>করিছি>করছি-'; অসম্পন্ন কালের পদ-গঠনে সাধুভাষার মতো '-ইতে' অসমাপিকা ব্যবহৃত হয়—'করিতেছি>করতে আছি>করতাছি, করত্যাছি'।

তুমর্থক '-ইতে' প্রত্যয়স্থলে বঙ্গালী উপভাষার বিভিন্ন বিভাষায় বিচিত্র ব্যবহার দেখা যায়। '-ইতে'-যুক্ত অসমাপিকা ক্রিয়াটির পুরুষ-অনুযায়ী রূপের পরিবর্তন হয় না বলে পদটি অব্যয়-রূপে বিবেচিত হয়; কিন্তু বঙ্গালীর কোন কোন বিভাষায় পুরুষ-অনুযায়ী এর রূপের পরিবর্তন হয়।—'আমি যেতে চাইতাম>আমি যাইতাম্ চাইতাম্', 'তুমি যেতে চাইতে>তুমি যাইতা চাইতা', 'সে যেতে চাইতো>সে যাইতো চাইতো'—অর্থাৎ সমাপিকা ক্রিয়াটির অনুরূপ রূপ ধারণ করে অসমাপিকা ক্রিয়াটিও। আবার কোথাও কোথাও '-ইতে'-স্থলে '-ইবার' প্রত্যয় ব্যবহৃত হয়। 'আমি যেতে চাই> আমি যাইবার চাই'। '-আ'-প্রত্যয়ান্ত ভাব-বচনের স্থলে '-অন্/-ওন্' প্রত্যয়ান্ত ভাব-বচনের ব্যবহারও কোন কোন' বিভাষার বিশিষ্ট লক্ষণ।—'কাজটা করা যায়>কাজটা করণ যায়', 'তোমার যাওয়া চাই>তোমার যাওন চাই'।

চট্টগ্রামের বিভাষার প্রথম পুরুষ সর্বনামের স্ত্রীলিঙ্গের রূপ—'তেই, তাই, হেতি', নোয়াখালিতে 'হেতি', পূর্ব ময়মনসিংহের মেয়েলি ভাষায় 'তাই'/ চট্টগ্রামী ভাষায়, অপর একটি বিশিষ্ট লক্ষণ—নঞর্থক বাক্যে 'ন' (<না) ব্যবহৃত হয় ক্রিয়ার পূর্বে—'আমি পারবো না>আঁই ন পাইরগম্'।

[পাঁচ] কামরূপী উপভাষা

কামরূপী উপভাষা বঙ্গালী ও বরেন্দ্রীর মাঝামাঝি, তবে বরেন্দ্রীর সঙ্গেই সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর। জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, রংপুর, দিনাজপুরের কতকাংশ এবং পূর্ণিয়া ও দার্জিলিং-এর কতকাংশে কামরূপী উপভাষা প্রচলিত।

ধ্বনিগত বৈশিষ্ট্যঃ—এই উপভাষায় পদের আদিতে ঘোষবৎ মহাপ্রাণ বর্তমান, অন্যত্র তৃতীয় বর্ণে পরিণত। তালব্যবর্ণ অর্থাৎ চ-বর্গীয় ধ্বনিগুলো উষ্মীভূত হ'য়ে যায় (জ>জ়, z)। 'শ, ষ, স' প্রায়শঃ বঙ্গালীর মত 'হ'-কারে পরিণত হয় এবং 'ড়'-ও 'র'-কারে পরিণত হয়। পদের আদি 'র' অনেক সময় লোপ পায়—'রাতি<আতি'। 'ল'-স্থলে 'ন' এবং 'ন'-স্থলে কখনো 'ল' ব্যবহৃত হয়—'লাউ>নাউ, লাঙল>নাঙল;

সিনান > সিলান'। পদের আদি 'অ' শ্বাসাঘাতের দরুণ কখন কখন 'আ' হয়।— অসুখ > আসুখ, অতি > আতি।

রূপগত বৈশিষ্ট্যঃ—তির্যক কারকের বহুবচনের বিভক্তি '-গুলা' কর্মকারকের '-ক'—'মোক্ দিয়া দাও'; অপাদানকারকে অনুসর্গ 'থাকি', করণকারকে 'দিয়া' এবং অধিকরণ কারকে '-ৎ' বিভক্তি।

অন্যান্য সর্বনামের সঙ্গে 'মুই, মো'-প্রভৃতিও ব্যবহৃত হয়।

ভবিষ্যৎ কালে উত্তমপুরুষের বিভক্তি '-ম/মু'-মধ্যমপুরুষের বিভক্তি (অতীতেও) -'উ' (করলু, করবু)।

নঞর্থক বাক্যে ক্রিয়াপদের পূর্বে 'ন' ব্যবহৃত হয়—'-না লেখিমু'।

[ছয়] উপভাষা ও শিষ্ট কথ্যভাষা তথা 'প্রমিত বাঙলা'

উদ্ভবঃ—দেশকালোচিত পরিবর্তনের ফলে কোন ভাষা বিভিন্ন উপভাষায় পরিণতি লাভ করতে পারে। বাঙলা ভাষার আলোচনায় আমরা তার রাঢ়ী-ঝাড়খণ্ডী-বরেন্দ্রী-বঙ্গালী-কামরূপী এই পঞ্চ-উপভাষিক রূপের সন্ধান পেয়েছি। তাহ'লে পাচ্ছি, বাঙলার পাঁচটি উপভাষা। এখন যদি প্রশ্ন ওঠে—এদের মধ্যে কিংবা এদের বহির্ভূত প্রধান বাঙলা ভাষা কোন্‌টি? তখন হয় আমাদের মৌনী সাজতে হ'বে, নতুবা অঙ্গুলি সংকেত করতে হ'বে একালের মৃতপ্রায় সাধুভাষার দিকে।—না, কোনটাই এর সদুত্তর নয়। অনেকে হয়তো প্রলুব্ধ হ'বেন, রাঢ়ী উপভাষার শিরেই বাঙলা ভাষার মুকুট-টা পরিয়ে দিতে। কিন্তু এটি হ'বে একান্তই অনৈতিহাসিক সিদ্ধান্ত, কারণ, যথার্থ রাঢ়ী উপভাষা-ব্যবহারকারীর সংখ্যা কোনক্রমেই সমগ্র বঙ্গভাষাভাষীর কুড়ি শতাংশের অধিক হ'তে পারে না। অতএব বৃহত্তর জনসমষ্টি এই অসঙ্গত দাবি অবশ্যই মেনে নেবে না। তাহ'লে উক্ত প্রশ্নের কোন উত্তর কি নেই? উত্তর অবশ্যই আছে এবং সেটি প্রধানতঃ এই রাঢ়ী উপভাষারই আধারে গড়ে-ওঠা একটা মার্জিত শিষ্ট কথ্যভাষারূপ, যাকে আমরা সাধারণভাবে বলি 'চলিত ভাষা' বা 'শিষ্ট কথ্যভাষা' বা 'প্রমিত বাঙলা' (Standard Colloquial Bengali)।

হাজার বছরের বাঙলা ভাষা-সাহিত্যের ইতিহাসে এই 'প্রমিত বাঙলা' যথার্থ প্রতিষ্ঠা পেয়েছে কিন্তু বিশ শতকের দ্বিতীয় দশক থেকে। তখন বিশেষ কিছু ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের সযত্ন প্রয়াসেই যদিও 'চলিত / প্রমিত ভাষা' প্রসার লাভ ক'রে থাকে, কিন্তু এর গঠন-প্রক্রিয়ার সঙ্গে কোন ব্যক্তিগত বা প্রাতিষ্ঠানিক প্রচেষ্টা জড়িত ছিল না। বস্তুতঃ ভাষাকে এমনভাবে গড়েও তোলা যায় না। দীর্ঘকালের ব্যবধানে বিবর্তনের পথে ভাষা

আপন স্বভাবেই গড়ে ওঠে, তবে তার প্রচার-প্রসারে ব্যক্তির সহায়তা প্রয়োজন। শিষ্ট কথ্য বাঙলার ক্ষেত্রেও এর অন্যথা ঘটেনি। তবে এই প্রসঙ্গে একটি কথা মনে রাখা প্রয়োজন—সাহিত্য যখন কোন কথ্যভাষাকে আশ্রয় করে রচিত হয়, তখন তার খানিকটা মার্জনা ও সংস্কারের এবং কিছুটা প্রসাধনের প্রয়োজন। শুধুই সাদা-মাটা কথ্যভাষায় কোন বিশেষ উদ্দেশ্য-সাধক কিছু কাজ করা গেলেও তাকে কোন ক্রমেই সর্বার্থসাধক বলা যায় না। এইজন্য কথ্যভাষার একটা শিষ্টরূপ, তার একটা প্রমিতরূপ (standard form) মেনে নিতেই হয়। সাহিত্যের প্রারম্ভকাল থেকেই পৃথিবীর সর্বকালে সর্বদেশে এই ব্যবস্থাই চলে আসছে। বাঙলা ভাষার ক্ষেত্রেও আমরা অনুরূপ ব্যাপারই দেখতে পাই।

বিকাশ ঃ—বাঙলা গদ্য সাহিত্যের ইতিহাসকে যদি তার বিকাশ-অনুযায়ী বিভিন্ন পর্বে বিভক্ত করা যায় তবে আদিপর্বের তথা উন্মেষ পর্বের বিস্তার ধরা যায় রামমোহন রায়ের আবির্ভাব-কাল অবধি অর্থাৎ ১৮১৫ খ্রীঃ পর্যন্ত। এই পর্বের মধ্যে উল্লেখযোগ্য রচনা মানোএল-দ্য-আসাম্পশাঁও-রচিত 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ' (১৭৩৪ খ্রীঃ), দোম আন্তোনিও-রচিত 'ব্রাহ্মণ-রোমান ক্যাথলিক সংবাদ' (১৭৩৫খ্রী), হালহেড-এর ইংরেজি ভাষায় রচিত বাঙলা ব্যাকরণে কিছু সমকালীন বাঙলার নিদর্শন, কয়েকজন ইংরেজ-কর্তৃক বিভিন্ন আইনের বাঙলা অনুবাদ এবং ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের উইলিয়ম কেরী-কর্তৃক রচিত/সংকলিত/সম্পাদিত/সংশোধিত কয়েকটি গ্রন্থ ও বিভিন্ন পণ্ডিত-মুন্সী-রচিত কয়েক পাঠ্যপুস্তক।

বাঙলা গদ্যের প্রথম পর্বের ভাষারীতি গড়ে উঠেছিল প্রধানতঃ মধ্যযুগের বাঙলা কাব্যভাষারই পদ-সন্নিবেশে কিঞ্চিৎ পরিবর্তন ঘটিয়ে। কাব্যভাষা যেমন সাধুরীতি-আশ্রিত ছিল, তেমনি অনেক ক্ষেত্রেই তা আঞ্চলিকতার প্রভাবযুক্তও ছিল। এ বিষয়ে একালের বিশিষ্ট ভাষাবিজ্ঞানী অধ্যাপক ডঃ পরেশচন্দ্র মজুমদার বলেন ঃ "বাঙলা গদ্যে দ্বিতীয় রীতির আবির্ভাব ঘটলো সর্বপ্রথম আঠারো শতকের শেষার্ধে। এ-রীতি হল বাঙলা ভাষার আঞ্চলিক রূপ-আশ্রিত। এর আগে কাব্যসাহিত্যের অন্দরমহলে ভাষার শিষ্ট ও আঞ্চলিক ধর্মের স্বাগতি নিরঙ্কুশভাবে অবাধ ছিল। তাই মধ্য বাঙলা-আশ্রিত সাধু আদর্শের উপর রাঢ়ী অথবা বরেন্দ্রী বা বঙ্গালী আবরণী মোটেই অস্বাভাবিক ছিল না। সেই সূত্র ধরেই রাঢ়ী আঞ্চলিকতার মৌখিক কথ্যধর্ম মাণিক-রাম, বিপ্রদাস প্রমুখ লেখকদের রচনায় অনুপ্রবিষ্ট হয়ে চলেছিল।"

সমকালীন বাঙলা গদ্যে কিন্তু রাঢ়ী উপভাষার বিশেষ প্রভাব লক্ষ্য করা যায় না, কিন্তু পূর্ববঙ্গে বসে মানোএল-দ্য-আসাম্পশাও' এবং দোম আন্তোনিও তাঁদের যে

গ্রন্থদ্বয় রচনা করেছেন, তাতে কিন্তু স্থানীয় ঔপভাষিক বাগ্‌রীতি অনেকখানিই প্রভাব বিস্তার করেছে। এ জাতীয় রাঢ়ী ঔপভাষিক প্রভাবের পরিচয় পাওয়া যায় আরো পরবর্তীকালে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের কোন কোন লেখকের রচনায় এবং অবশ্যই এঁদের মধ্যমণি স্বয়ং উইলিয়ম কেরী। কলেজের পণ্ডিতমুন্সীগণ বাঙলা গদ্যের গঠন-পর্বেই পণ্ডিতীরীতি অবলম্বনে সচেষ্ট হ'লেও এঁদেরই অন্যতম রামরাম বসু কিন্তু অনুভব করেছিলেন যে 'ইংলণ্ডীয় মহাশয়েরা তাহারা এদেশীয় চলন ভাষা অবগত নহিলে রাজক্রিয়াক্ষম হইতে পারেন না'—অর্থাৎ 'চলন ভাষা' বা কথ্যভাষার উপযোগিতা বুঝে তিনি তার প্রয়োগও করেছিলেন।

পূর্বোক্ত আলোচনায় আমরা শিষ্টভাষায় সাহিত্য রচনায়ও ঔপভাষিক বাগ্‌রীতি ব্যবহারের প্রবণতাটুকু লক্ষ্য করেছি। এরই প্রেক্ষাপটে একালের শিষ্ট কথ্যভাষা তথা প্রমিত ভাষায় রচিত সাহিত্যে বিভিন্ন ঔপভাষিক প্রভাবের পরিচয় নিতে চেষ্টা করা হ'চ্ছে। বাঙলা গদ্যে সচেতন সাহিত্য রচনা শুরু হ'য়েছিল পণ্ডিতী সাধুভাষাকে আশ্রয় ক'রেই এবং ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিতমুন্সীগণ, রামমোহন রায়, অক্ষয়-কুমার দত্ত, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং একালের রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, তারাশঙ্কর প্রভৃতি সেই সাধু গদ্যরীতিকে যে একটা সুসংহত ও শিল্প-সুষমামণ্ডিত রূপদান করতে সক্ষম হ'য়েছিলেন, তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। তারপর বিশ শতকের দ্বিতীয় শতকে প্রমথনাথ চৌধুরী তথা বীরবলের প্রবর্তনায় ও তাঁর 'সবুজপত্র' পত্রিকা প্রকাশের মাধ্যমে এবং প্রধানতঃ রবীন্দ্রনাথের সক্রিয় সহযোগিতায়ই বাঙলা গদ্যসাহিত্য যথার্থ-অর্থে 'শিষ্ট কথ্যভাষা' তথা 'চলিত ভাষা' বা 'প্রমিত ভাষা'র (Standard Colloquial Language) আশ্রয়ভূমি হ'য়ে দাঁড়ায়। তারপর থেকে বস্তুতঃ চলছে তারই জয়যাত্রা।

ইতোমধ্যে উন্মেষ পর্বের পরবর্তী পর্বের অবস্থাটা একটু বুঝে নেওয়া যেতে পারে। ১৮১৫ খ্রীঃ রামমোহন স্থায়িভাবে কলকাতায় বসবাস আরম্ভ করবার পর থেকেই বিভিন্ন প্রয়োজনে তাঁকে বিস্তর লেখালেখির কাজ করতে হ'চ্ছিল। বলা বাহুল্য, তাঁর রচিত গদ্যগ্রন্থগুলি সাধুভাষায়ই রচিত হ'লেও প্রায় সমকালেই যখন সংবাদপত্র প্রকাশ এবং তার মাধ্যমে সংবাদ প্রচার ও বিভিন্ন বিতর্কমূলক আলোচনার প্রয়োজন দেখা দিল, তখনই কিন্তু ভাষাকে পণ্ডিতি খোলস ছেড়ে সর্বসাধারণের বোধ্য সহজ কথ্যভাষার কাছাকাছি চলে আসতে হ'য়েছিল। সংবাদপত্রের ভাষাতে অনেক সময়ই আঞ্চলিক লক্ষণ দেখা দিয়েছে। এরপর উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টারূপে উল্লেখ করা চলে—প্যারীচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরের দুলাল', কালীপ্রসন্ন সিংহের 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা',

রবীন্দ্রনাথের 'য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র' এবং বিবেকানন্দের কিছু রচনা। প্যারীচাঁদের নিজের বিচার মতো 'বাঙ্গালার প্রচলিত ভাষাতে' রচিত তাঁর গ্রন্থের ভাষা বঙ্কিমচন্দ্রের মতে 'দরিদ্র, দুর্বল এবং অপরিমার্জিত', এবং কালীপ্রসন্নের 'হুতুমী-ভাষা' ছিল 'অসুন্দর, অশ্লীল, পবিত্রতাশূন্য'—মধুসূদনের মতে 'মেছুনীদের ভাষা'। বিবেকানন্দের রচনার ভাষা খাস্-কলকাত্তাই ভদ্রশ্রেণীর কথ্যরীতি-আশ্রিত এবং রবীন্দ্রনাথের ভাষা ছিল কলকাতার শিষ্ট সমাজের ভাষা।

'সবুজপত্রে'র মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যে যে চলিত/প্রমিত ভাষা ব্যবহার করতে আরম্ভ করেন, বস্তুতঃ এই ভাষারীতিটিই একালের সাহিত্যে ব্যবহৃত শিষ্ট কথ্যভাষার আদর্শ। এখন প্রশ্ন হ'লো—এই সাহিত্যিক ভাষাটির মূলভিত্তি কী? এটি কি একান্তভাবেই কোন অঞ্চলের কথ্যভাষা অথবা এটিও একটি সাহিত্যিক ভাষা? যদি কথ্যভাষাই হ'য়ে থাকে, তবে কোন্ অঞ্চলের? অথবা যদি সাহিত্যিক ভাষা হয়, তবে কীভাবে এটি উৎপন্ন হয়েছে?

দ্বিরীতি-তত্ত্ব ঃ—একালের বর্ণনাত্মক ভাষাবিজ্ঞানের (Descriptive Linguistics) একজন অগ্রণী পুরুষ চার্লস্ এ. ফারগুসন্ তার *Diglossia* (১৯৭১) গ্রন্থে স্বীকার করেছেন যে অনেক ভাষা-অঞ্চলে ভাষাগত পরিস্থিতির কারণে কোন ভাষার দু'টি রূপ বা রীতি স্বীকৃত হ'য়ে থাকে—তাদের একটি ব্যবহৃত হয় সাহিত্যে, লেখায় এবং বিদ্বৎসমাজের বক্তৃতা-আলোচনা প্রভৃতিতে, অপরটি ব্যবহৃত হয় দৈনন্দিন জীবনের কথোপকথনে ও সামাজিক যোগাযোগে—ভাষার এই ব্যবহারকে বলা হয় '**দ্বি-রীতি তত্ত্ব**' বা '**দ্বিভাষিক রীতি**' (**Diglossia**)। বাঙলা সাধুভাষা ও কথ্যভাষার ক্ষেত্রে এই তত্ত্বটি যথার্থ হ'লেও 'শিষ্ট কথ্যভাষা'/'প্রমিত ভাষা' ও কথ্য উপভাষার ক্ষেত্রে এটিকে পরিপূর্ণভাবে গ্রহণ করা যায় না। কারণ, শিষ্ট সমাজের দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত কথ্যভাষার সঙ্গে 'শিষ্ট কথ্যভাষা/'চলিত ভাষা'/'প্রমিত ভাষা'র ব্যবধান খুব বেশি নয়। বরং একটু শিথিলভাবে বলা চলে যে সাহিত্যের প্রমিত ভাষা এবং বাঙলার একটি বিশেষ অঞ্চলের শিষ্টজনের কথ্যভাষার তথা উপভাষায় পার্থক্য প্রায় নেই।

দক্ষিণ দেশী ঃ—বিশেষ কোন গবেষণা না ক'রেই বলা চলে যে এই প্রমিত বা চলিত ভাষাটি মোটামুটিভাবে কলকাতা অঞ্চলের ভাষা। কিন্তু ভাষাবিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে বিচার করলে বলতে হয়, নিষ্পত্তিটি এত সহজ নয়। খাস, কলকাত্তাই ভাষার নিদর্শন রয়েছে 'হুতুমী ভাষা'য়, যাকে 'অসুন্দর, অশ্লীল, পবিত্রতাশূন্য' বলে শিষ্টজন প্রত্যাখ্যান করেছেন। অবশ্য রবীন্দ্রনাথ বলেন ঃ "কলিকাতা অঞ্চলের উচ্চারণকেই আদর্শ

সংক্ষিপ্তসার।" এবং আরও বলেন: "বর্তমানকালে কলিকাতা ছাড়া বাংলাদেশের অপরাপর বিভাগের উচ্চারণকে প্রাদেশিক বলিয়া গণ্য করাই সঙ্গত।" এ বিষয়ে ভিন্ন মত পোষণ করেন শিষ্ট কথ্যভাষার প্রধানতম প্রবক্তা প্রমথনাথ চৌধুরী। তিনি মনে করেন যে, 'নদীয়া, শান্তিপুর প্রভৃতি স্থান, ভাগীরথীর উভয়কূল এবং বর্ধমান ও বীরভুম জেলার পূর্ব ও দক্ষিণাংশ'—যাদের ভাষাকে তিনি 'দক্ষিণদেশী' নামে অভিহিত করেছেন, সেটিই আদর্শ ভাষারূপে গ্রহণ করার যোগ্য। তাঁর নিজের কথায়, "সকল দোষগুণ বিচার করে মোটের উপর দক্ষিণ দেশী ভাষাই উচ্চারণ হিসেবে যে বঙ্গদেশে সর্বশ্রেষ্ঠ ডায়ালেক্ট এ বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নেই।" প্রায় শতাধিক বৎসর পূর্বে পণ্ডিত শরৎচন্দ্র শাস্ত্রীও মন্তব্য করেছিলেন, "শৈশব হইতে শুনিয়া আসিতেছি, নবদ্বীপ ও তৎসন্নিহিত স্থানের প্রচলিত ভাষাই বিশুদ্ধ বাঙ্গলা ভাষা। কলিকাতা রাজধানী হইলেও এখানে কোন নির্দিষ্ট ভাষা নাই।" এ সমস্ত ছাড়াও আরও বহু সুধীজনের মতামত বিচারে আমরা দেখতে পাই, যে অঞ্চলের ভাষাটিকে আদর্শ শিষ্ট ভাষা তথা প্রমিত ভাষার আশ্রয়ভূমি-রূপে মর্যাদা দেওয়া হয়েছে, ভাষাবিজ্ঞানের বিচারে এটি 'রাঢ়ী উপভাষা'। এখন বিচার ক'রে দেখা যেতে পারে, আমাদের শিষ্ট কথ্য-ভাষার উপর রাঢ়ী উপভাষা কিংবা অপর কোন উপভাষার প্রভাব কতোটা।

একটা সাধারণ সত্য এই, সাধারণতঃ রাজধানী অঞ্চলের ভাষাই কালে শিষ্টভাষার মান্যতা লাভ করে। আমাদের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। নবদ্বীপ এককালে গৌড়-বঙ্গের রাজধানীর মর্যাদা লাভ করেছিল—এরূপ সম্ভাবনার কথা স্বীকার করা চলে। তারপর দীর্ঘকালের কুয়াশা সব আচ্ছন্ন ক'রে রেখেছিল। আবার পাঁচশত বৎসর পূর্বে চৈতন্যদেবের সমকালেই দেখতে পাচ্ছি শিক্ষা-সংস্কৃতির পীঠস্থান-রূপে গণ্য নবদ্বীপ পূর্ববঙ্গের অধিবাসীদের দ্বারা উপনিবিষ্ট—সম্ভবতঃ বাঙলার সাংস্কৃতিক রাজধানী রূপেই এটি গণ্য হতো। বিগত দু'শো বছর ধ'রেই তো কলকাতা বাঙালীর রাজনীতি, ব্যবসা-বাণিজ্য, শিক্ষা-দীক্ষা এবং অর্থাগমের কেন্দ্রস্থলরূপে বর্তমান। সেইসূত্রে রাজনীতি, ব্যবসা-বাণিজ্য, শিক্ষা-দীক্ষা এবং অর্থাগমের কেন্দ্রস্থল-রূপে এবং পুণ্য গঙ্গাতীরে বাস-কামনায় বিভিন্ন অঞ্চলের নানা আঞ্চলিক ভাষা-ভাষী জনগোষ্ঠীর গমনাগমনে এই অঞ্চলের ভাষা যেমন শিষ্ট সমাজে ব্যাপকভাবে প্রচার লাভ ক'রেছে, তেমনি অপরাপর উপভাষা দ্বারা ন্যূনাধিক প্রভাবিতও হ'য়েছে। ফলতঃ এই অঞ্চলের অর্থাৎ তথাকথিত 'দক্ষিণ দেশী' রাঢ়ীউপভাষাই বাঙলার 'কেন্দ্রীয় উপভাষা'র (Central Dialect) মর্যাদা লাভ করে। কালে যখন সাধুভাষার প্রভাব-বহির্ভূত ভাষায় সাহিত্য রচনাপ্রচেষ্টা দেখা দিল, তখন এই কেন্দ্রীয় উপভাষাই একটা শিষ্ট

মার্জিত রূপে উপস্থাপিত হ'লো। কাজেই যথার্থভাবে বলতে গেলে বলতে হয়, 'শিষ্ট কথ্যভাষা' / 'চলিত ভাষা'/'প্রমিত ভাষা'র মূলে আছে বাঙলার 'কেন্দ্রীয় উপভাষা', যেটি তৈরি হ'য়েছে মূলতঃ রাঢ়ীভাষাকে ভিত্তি করে, কিন্তু দীর্ঘকাল ধরে তা ভিন্ন ভাষা দ্বারা যেমন প্রভাবিত হ'চ্ছে তেমনি আবার পরিশোধিতও হ'চ্ছে।

ঔপভাষিক প্রভাবঃ—(রাঢ়ী) রাঢ়ী উপভাষার প্রধান প্রধান লক্ষণ শিষ্ট কথ্যভাষায়ও বিদ্যমান। 'অ'-কার-স্থলে 'ও'-কার প্রবণতা, অভিশ্রুতি ও স্বরসঙ্গতির বহুলতা, স্থানভেদে 'এ'-কার ও 'অ্যা'-কারের ব্যবহার, 'ড়, ঢ়'-এর যথাযথ উচ্চারণ, সাধারণভাবে মহাপ্রাণধ্বনির বর্তমানতা ও পদান্তে অল্পপ্রাণীভবন, নাসিক্যীভবন-প্রবণতা প্রভৃতি ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যসমূহ প্রমিত ভাষায়ও অক্ষুণ্ণ রয়েছে। বিভিন্ন কারকে বিভক্তিচিহ্ন-ব্যবহারেও চলিত ভাষা রাঢ়ী উপভাষারই অনুগামী। কর্তায় 'শূন্য' বিভক্তি, তবে ক্রিয়াটি সকর্মক হ'লে কর্তায় '-এ' বিভক্তি, কর্মে '-কে' বিভক্তি, করণে '-এ' বিভক্তি ও 'দ্বারা, দিয়ে' প্রভৃতি অনুসর্গের ব্যবহার, অপাদানে 'হ'তে, থেকে' প্রভৃতি অনুসর্গের ব্যবহার, সম্বন্ধ পদে '-র, -এর, -কের' বিভক্তি এবং অধিকরণ কারকে '-এ, -তে, -য়' বিভক্তির প্রয়োগ। ধাতু বিভক্তিসমূহের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য—বর্তমান কালে উত্তমপুরুষে '-ই', মধ্যমপুরুষে '-অ' তুচ্ছার্থে '-ইস', প্রথম পুরুষে '-এ' বিভক্তি। সামান্য অতীতে উঃ পুঃ '-লুম্, '-লাম' '-লেম্' ; ম পু '-এ', প্র পু অকর্মক ক্রিয়াপদে '-ল', সকর্মক ক্রিয়ায় '-লে'। ভবিষ্যৎ-কালে উঃ পুঃ '-ব,-বো', ম পুঃ '-বে' তুচ্ছার্থে '-বি', প্রথমপুরুষ '-বে' সম্ভ্রমার্থে '-বেন'। যৌগিক ক্রিয়াপদে পদমধ্যবর্তী '-ইতে' লোপ (করিতেছি>করছি) এবং '-ইয়া'-স্থলে '-এ' হয় (করিয়াছি>করেছি), তবে উপভাষায় যে পরিমাণ বিশিষ্টার্থক বাগ্‌রীতি ব্যবহৃত হয়, শিষ্টভাষায় তত হয় না।

রাঢ়ী উপভাষা-ভিত্তিক কেন্দ্রীয় উপভাষাকে প্রধান অবলম্বনরূপে গ্রহণ ক'রে শিষ্ট কথ্যভাষারীতি গ'ড়ে উঠলেও তা' যে অনন্য-শরণ ছিল না, তা' নয় ; নানা কারণেই তা' বিভিন্ন কালে অপর উপভাষার সহায়তা গ্রহণ করেছে। "The literary language have all the pan-Bengali characteristics, but sometimes it leans to one dialect and sometimes to another, although its basic is Gaudiya or Typical Central Bengali." (O.D.B.L.—pp.141)—উক্তিটিতে যে 'pan-Bengali' বা সার্বভৌম সর্ববঙ্গীয় ভাষার কথা বলা হয়েছে, বস্তুতঃ তা' হ'লো বাঙলা সাধুভাষা, যার সঙ্গে 'চলিত ভাষা' বা 'শিষ্ট কথ্যভাষা'র পার্থক্য বিশেষ নেই। যেটি প্রধান পার্থক্য, সেটি ধাতু-বিভক্তিতে তথা ক্রিয়াপদগুলিতে। এর ক্রিয়ারূপগুলি রাঢ়ী

উপভাষার অনুসারী কিন্তু দুটি সর্বাংশে এক নয়। একদিকে যেমন এতে পূর্ববঙ্গীয় প্রভাবের পরিচয় রয়েছে, তেমনি রয়েছে কিছু কিছু ঔপভাষিক লক্ষণ পরিহার ক'রে পরিশোধিত হবার প্রচেষ্টাও। যেমন, অতীতকালের প্রথমপুরুষে রাঢ়ী উপভাষার রূপ '-ইলুম, -ইলু, -ইলোঁ, -নু' প্রভৃতি; কিন্তু বঙ্গালী ভাষার প্রভাবে প্রমিত ভাষায় নোতুন যুক্ত হলো—'ইলাম, -ইলেম' এবং বর্জিত হ'লো '-ইলু,-ইলোঁ,-নু' প্রভৃতি। "...the Vanga form <-ilām> has been adopted in the sādhu bhāsā and ilām >ilem>has been super-imposed on most dialect, including even the West Central (i.e. Standard) Colloquial Dialect" (*Ibid*)। রাঢ়ী সকর্মক ক্রিয়ার অতীতকালের প্রথমপুরুষের রূপ '-ইলে' বঙ্গালী প্রভাবে '-ইল'—এই বিকল্প রূপও স্বীকার ক'রে নিয়েছে। সাধুভাষার 'আসিল' শব্দের রাঢ়ীতে 'এলো' রূপটি বঙ্গালী প্রভাবজাত ('আইল>এলো') হওয়া সম্ভব। করণের রাঢ়ী অনুসর্গ 'সঙ্গে'কে প্রায় স্থানচ্যুত করতে চলেছে বঙ্গালী 'সাথে' অনুসর্গটি। পদাদ্য প্রস্বর এখনও পুরুষানুক্রমে রাঢ়ী উপভাষীদের মুখে শোনা গেলেও সর্ববঙ্গীয় শিষ্টভাষীরা আর তার বশ নন।

সার্বভৌম সাধুভাষার এবং বঙ্গালী বরেন্দ্রী ভাষার প্রভাবে খাঁটি রাঢ়ী ঔপভাষিক লক্ষণ শিষ্টভাষা থেকে বহুল পরিমাণে বর্জিতও হ'য়েছে। উপভাষায় যে পরিমাণ অর্ধতৎসম ব্যবহৃত হয়, তাদের অধিকাংশই প্রমিত ভাষায় প্রবেশাধিকার পায়নি। যেমন আহিংকে (<আকাঙ্ক্ষা), অলবড্ডে (<অল্পবৃদ্ধ ?), উচ্ছুগ্যু (<উৎসর্গ), ছেরেদ্দা (<শ্রদ্ধা), নিঘিন্নে (<নিঘৃণ)' প্রভৃতি। রাঢ়ী উপভাষায় কখন কখন অপিনিহিতির প্রভাব অনুভূত হয় ('দেইখে চলা', ভেঁইড়ে থাকা'), শিষ্ট কথ্যভাষায় তা' স্বীকৃত নয়। রাঢ়ীর অপর একটি ঔপভাষিক প্রবণতা—সংবৃত ধ্বনির অর্ধসংবৃত উচ্চারণ; সাম্প্রতিক শিষ্টভাষায় সেই প্রবণতা ক্রমশঃ লোপ পাচ্ছে। যেমন. 'জেবন (<জীবন) ভেতর (<ভিতর), কেত্তন (<কীর্তন), ওপোর (<উপর), ছেল (<ছিল)' শিষ্ট কথ্যভাষায় চলে না। এছাড়াও 'বে (<বিয়ে), ভেয়ের (<ভাইয়ের), শ্যাল (<শিয়াল)' প্রভৃতি স্বরের অতিসঙ্কোচনও শিষ্টভাষায় পরিহার করা হয়। পদের আদিতে এ'-স্থলে 'অ্যা' প্রবণতাও প্রমিত ভাষায় অনেক সংযত হ'য়েছে। বর্তমান শতকের প্রথম যুগেও পদান্তে স্বরসংযুক্ত মহাপ্রাণ ধ্বনি কোন কোন ক্ষেত্রে অল্পপ্রাণে পরিণত হ'তো (যেমন—'গ্যাচে, যাচ্চে'), এখন শিষ্টভাষায় মহাপ্রাণের পুনরাবির্ভাব ঘটেছে। 'ল' ও 'ন' ধ্বনিদ্বয়ের বিপর্যয় রাঢ়ী উপভাষার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হ'লেও চলিত ভাষায় তা' বর্জিত হয়।—'নেবু, নুচি, নেপ'-স্থলে এখন 'লেবু, লুচি, লেপ'ই ব্যবহৃত হয়।—

যুক্ত অনুনাসিক ধ্বনির নাসিক্যীভবনেরও একটা প্রবণতা দেখা যায় ঔপভাষিক লক্ষণে, শিষ্ট কথ্যভাষায় তা' পরিত্যক্ত, যেমন—'হিঁদু (<হিন্দু), সোঁদোর (<সুন্দর) প্রভৃতি। পদমধ্যস্থ '-ম'-স্থলে 'ব' ব্যবহার উপভাষায় প্রচলিত থাকলেও শিষ্ট-ভাষায় তা' অচল।—'আঁব (<আম), তাঁবা (<তামা)'-প্রভৃতি।

তালিকা এখানেই সম্পূর্ণ নয়। শুধু দেখানোর চেষ্টা করা হলো যে রাঢ়ী উপভাষা কিংবা কোন একক উপভাষাই 'স্বীকৃত/শিষ্ট কথ্য বাঙলা' বা 'চলিত ভাষা' বা 'প্রমিত ভাষা' (Standard Colloquial Bengali)-রূপে গড়ে উঠেনি ; তবে এটিই তার প্রধান ভিত্তিভূমি—এর উপর সর্ববঙ্গীয় সাধুভাষা এবং অপরাপর উপভাষার প্রভাবও যথেষ্ট রয়েছে।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

সাহিত্যের ভাষা

[এক] সাধুভাষা ও চলিত ভাষা

পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই সাহিত্যের ভাষা এবং লোকপ্রচলিত ভাষার মধ্যে কিছু-না-কিছু ইতর-বিশেষ লক্ষ্য করা যায়। আর্যেরা ভারত-আগমনকালে কথোপকথনে যে ভাষা ব্যবহার করতেন, তারি কিছু সংস্কারসাধন ক'রে তাঁরা বৈদিক সাহিত্য রচনা করেছিলেন। কিছুকাল পর বেদভাষার সঙ্গে লোকপ্রচলিত ভাষার পার্থক্য যখন দুস্তর হ'য়ে উঠ্‌লো, তখনি আবার লোকভাষার সংস্কার সাধন ক'রে সাহিত্যের ভাষা তৈরি হ'লো, সংস্কৃত। বুদ্ধদেবের নির্দেশে তাঁর অনুগামীগণ জনগণের ভাষায় যে পালিসাহিত্যসমূহ রচনা করলেন, একালের ভাষা-বিজ্ঞানিগণ বিশ্লেষণ ক'রে দেখেছেন যে এ ভাষাও কিছুটা সংস্কার-কৃত চলিত ভাষা। বাঙলা ভাষার উদ্ভবপর্বেও দেখছি —পাশাপাশি দুটি ভাষাই সাহিত্যে চল্‌ছে ; একটি শিষ্টজনসম্মত অবহট্‌ঠ বা সাধু ভাষা যাতে রচিত হ'য়েছে 'দোহা' এবং অপরটি লোকপ্রচলিত বা চলিত ভাষা বাঙলা —'চর্যাপদে'র ভাষা, হয়তো যে-আকারে আমরা এটি পেয়েছি, তাতেও কিছু সংস্কারের ছোঁয়া লেগেছে।

প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্যে গদ্যভাষার সাহিত্যিক নিদর্শন পাওয়া না গেলেও বাঙলা গদ্যের প্রবণতাটুকু অনুভব করা যায়। লক্ষ্য করা যায়—কাব্যে ব্যবহৃত মধ্যযুগের বাঙলা থেকেই আধুনিক সাধুভাষার ক্রমিক উত্তরণ ঘটেছে। এই মধ্য বাঙলা-আশ্রিত সাধু আদর্শের উপর শুধু আঞ্চলিক রাঢ়ী উপভাষারই একাধিপত্য ছিল না, ছিল বরেন্দ্রী এবং বঙ্গালীরও প্রভাব। প্রারম্ভিক উনিশ শতকে সংস্কৃত আদর্শে বাঙলা সাধুভাষায় পণ্ডিতী রীতি আরোপিত হ'লো। সাধুভাষায় দেখা দিল—সংস্কৃতসুলভ সমাসবাহুল্য, ব্যাকরণগত প্রক্ষেপ অথবা জটিল বাক্যপ্রয়োগ এবং তৎসহ তৎসম ও আভিধানিক শব্দবাহুল্য। লক্ষ্য করা যায় যে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই এই চরমপন্থী গদ্যধারার পাশাপাশি সাধু আদর্শের একটা নোতুন মানদণ্ডও গড়ে উঠছিল। বাঙলা সাধুভাষার এই বিকাশপর্বে বাঙলা গদ্যরীতিতেও ঘট্‌লো আমূল পরিবর্তন, যুগান্তকারী বিপ্লব। ভাষা-শিল্পী বিদ্যাসাগরের রচনায় এই সাধুভাষা বিশেষ প্রাঞ্জলতা ও শিল্পসম্মত রূপ লাভ করলো। এরি পাশাপাশি একেবারেই কথ্যভাষায়

তার অশিষ্টতা-সহ রচিত হ'লো অপর এক গদ্যভাষার সাহিত্য—যে ভাষাকে বলা হয় 'আলালী ভাষা' বা 'হুতোমী ভাষা'। এ ভাষার প্রাণ থাকলেও সমাজে এ মান পেলো না। বিদ্যাসাগরী আর আলালী ভাষার মধ্যপথ গ্রহণ ক'রে বঙ্কিমচন্দ্র সুললিত সুষমামণ্ডিত সাধুভাষাকেই করলেন প্রতিষ্ঠিত।

রবীন্দ্রনাথ গোড়ার দিকে এই সাধুভাষাকেই তাঁর গদ্য রচনার বাহনরূপে গ্রহণ করলেও পরের দিকে তাঁর মনোভাবের পরিবর্তন ঘটেছিল। তিনি বলেন, "······বাঙলা বাক্যাধিপেরও আছে দুই রাণী—একটাকে আদর ক'রে নাম দেওয়া হয়েছে সাধুভাষা, আর একটাকে কথ্যভাষা; কেউ বলে চল্‌তি ভাষা; আমার কোন কোন লেখায় আমি বলেছি প্রাকৃত বাঙলা। সাধুভাষা মাজাঘষা, সংস্কৃত ব্যাকরণ অভিধান থেকে ধার-করা অলংকারে সাজিয়ে তোলা। চল্‌তি ভাষার আটপৌরে সাজ নিজের চরকায় কাটা সুতো দিয়ে বোনা।"

সাধুভাষা ও চলিত ভাষার পার্থক্য ঃ—সাধুভাষাকে মুখের ভাষার কাছাকাছি আনার প্রবণতা থেকে সৃষ্টি হ'লো চলিত ভাষা। এখানে কথাটা স্পষ্ট হওয়া আবশ্যক। সাহিত্যে ব্যবহৃত চলিত ভাষা আর মুখের ভাষা কখনও এক হয় না—মুখের ভাষা অঞ্চলভেদে বহু রূপান্তর লাভ করে। তারি কোন একটাকে ভিত্তি ক'রেই রচিত এবং শিক্ষিত মার্জিত সংস্কৃতিসম্পন্ন শিষ্টজনের অনুমোদিত চলিত ভাষাই সাহিত্যে ব্যবহৃত হ'য়ে থাকে। এই শিষ্টজনসম্মত চলিত ভাষা বা Standard Colloquial Language-কে 'প্রমিত ভাষা' বা 'স্বীকৃত কথ্যভাষা'ও বলা হ'য়ে থাকে। যাহোক্ আধুনিক বাঙলা ভাষায় এখন লেখার ভাষাতে দুটি ছাঁদ প্রচলিত আছে—একটি ছাঁদের নাম 'সাধুভাষা' এবং দ্বিতীয়টির নাম 'চলিত ভাষা'। মুখের ভাষার সঙ্গে সাধুভাষার ব্যবধান অনেক বেশি, পক্ষান্তরে চলিত ভাষার ব্যবধান স্বল্পতর।

মূলতঃ সংস্কৃতকে আদর্শ ক'রে সাধুভাষার সৃষ্টি হয়েছিল বলেই সাধুভাষায় সংস্কৃতের প্রভাব অধিকতর। এর পরিচয় পাওয়া যায় প্রথমতঃ তৎসম ও আভিধানিক শব্দের আধিক্যে, দ্বিতীয়তঃ সমাসবাহুল্যে, তৃতীয়তঃ কথাভাষার ও উপভাষার শব্দ-বর্জনে এবং চতুর্থতঃ কিছু কিছু ইডিয়াম-অনুসরণে। সাধুভাষার এই যে লক্ষণ-গুলির কথা এখানে উল্লেখ করা হ'লো, এগুলো কালক্রমে ক্ষয়িত হ'তে হ'তে শরৎচন্দ্রের হাতে প্রায় চলিত ভাষার পর্যায়ে এসে দাঁড়ায়। তখন কেবল খোলসটাই থাকে সাধুভাষার। প্রবাদ-প্রবচন ও ইডিয়ম অর্থাৎ বিশিষ্টার্থক পদগুচ্ছ-ব্যবহারের ক্ষেত্রে চলিত ভাষার সমৃদ্ধি অনেক বেশি, কারণ এজাতীয় অনেক প্রয়োগই সাধুভাষায় খাপ খায় না।

সাধুভাষায় তির্যক কারকের বহুবচনে শব্দের সঙ্গে-'দিগ'-প্রত্যয় যোগ ক'রে তার সঙ্গে বিভক্তি যোগ করা হয়, চলিত ভাষায় সাধারণতঃ '-দিগ-' স্থলে '-দে-' ব্যবহৃত হয়— 'আমাদিগকে>আমাদের'। সাধুভাষায় অতীত ও ভবিষ্যৎ কালে অনেক সময় স্বার্থিক '-ক' প্রত্যয় যুক্ত হ'তো—'হইলেক, হইবেক'। চলিত ভাষায় তা বর্জিত হ'য়েছে। অসমাপিকা '-ইয়া, -ইতে, -ইলে' প্রভৃতি বিভক্তি সাধু ভাষায় যুক্ত হয়, চলিত ভাষায় ধ্বনি-পরিবর্তনের ফলে এরা সংক্ষিপ্তায়তন হয়েছে।—করিতে>করতে, করিয়া>ক'রে, করিলে>করলে।

সাধুভাষার সঙ্গে চলিত ভাষার প্রধান পার্থক্য ক্রিয়া ও সর্বনাম পদে। সাধুভাষায় এদের প্রাচীন পূর্ণ রূপটি ব্যবহৃত হয়, পক্ষান্তরে ভাষা বিবর্তনের ফলে কালক্রমে এদের যে সংক্ষিপ্ত রূপ কথ্যভাষায় পরিণতি লাভ করেছে, চলিত ভাষা সেই রূপ-গুলোকেই গ্রহণ করেছে। মধ্যযুগীয় এবং পূর্বাঞ্চলীয় ভাষার বৈশিষ্ট্য অপিনিহিতি চলিত ভাষায় একেবারে বর্জিত হ'য়েছে। অভিশ্রুতি ও স্বরসঙ্গীতি চলিত ভাষার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। সাধুভাষায় অপিনিহিতি-পূর্ব যুগের ভাষারূপ ব্যবহৃত হয়।

	সাধুভাষায় ব্যবহৃত পূর্ণ রূপ	চলিত ভাষায় ব্যবহৃত সংক্ষিপ্ত রূপ
(ক্রিয়াপদের)		
	করিতেছি————	করছি, কচ্ছি
	করিতেছিলাম————	করছিলাম, কচ্ছিলাম
	করিয়াছি ————	করেছি
	করিয়াছিলাম————	করেছিলাম
	করিলাম————	করলাম, কললাম
	করিতে ————	করতে
	করিয়া————	ক'রে
	করিলে————	করলে
(সর্বনাম পদের)		
	তাহা————	তা', ওটা
	তাহার————	তার
	তাহাদিগের ————	তাদের
	যাহাদিগকে————	যাদের
	ইহা ————	এ/এটা

(অন্যান্য ক্ষেত্রে)

শ্রবণ করিয়া ———— শুনে

লম্ফ প্রদান .... লাফানো

তোমা দ্বারা/কর্তৃক ———— তোমাকে দিয়ে

ইহা অপেক্ষা———— এর চেয়ে

সাধুভাষার রূপ	মধ্যযুগীয়/(অপিনিহিত) পূর্বাঞ্চলীয় রূপ	চলিত ভাষার অভিশ্রুতি-জাত রূপ
হাটিয়া	হাইট্যা	হেটে
হাটুয়া	হাউট্যা	হেটো
আজি/আজ	আইজ	আজ
করিয়া	কইর‍্যা	ক'রে
		স্বরসঙ্গতি-জাত রূপ
দেশি		দিশি
বিলাতি		বিলিতি

দ্ব্যক্ষরপ্রবণতা চলিত ভাষায় অতিশয় প্রবল বলে সাধুভাষায় শব্দগুলো চলিত ভাষায় রূপান্তরিত হ'য়েছে—করিব>করবো ; গামোছা>গামছা, যাইতেছি>যাচ্ছি। পদ-মধ্যস্থ 'হ'-কারের লোপপ্রবণতাও চলিত ভাষার অপর এক বৈশিষ্ট্য, তারি ফলে—'তাহার>তার, কহিতেছি>কইছি, সিপাহি>সিপাই, ফলাহার>ফলার প্রভৃতি। ধ্বনিপরিবর্তনের আরও কতকগুলো রীতি চলিত ভাষায় প্রচলিত থাকায় সাধুভাষায় ব্যবহৃত শব্দের সঙ্গে তার পার্থক্য সৃষ্টি হয়েছে ;—স্বরভক্তির ফলে—মিত্র>মিত্তির, শ্রী>ছিরি, স্নান>সিনান, নাওয়া, চান ; সমীভবন-প্রবণতার ফলে—এতদিন>অ্যাদ্দিন, তর্ক>তক্কো, গল্প>গপ্পো ; য়-শ্রুতির ফলে—মা+এ>মায়ে, ভাই+এ>ভাইয়ে ; স্বরাগমের ফলে—স্কুল>ইস্কুল, স্পর্ধা>আস্পর্ধা, স্টেশন>ইস্টিশন ; বর্ণদ্বিত্বের ফলে—বড়>বড্ড, ছোট>ছোট্ট, সকাল>সক্কাল, কখনো>কক্‌খনো। চলিত ভাষায় অর্ধতৎসম শব্দের বহুল ব্যবহার, কিন্তু সাধুভাষায় তা বর্জনীয়।

সাধুভাষায় যৌগিক ক্রিয়াপদের ব্যবহার অপেক্ষাকৃত অনেক বেশি, চলিত ভাষায় তা' যথাসম্ভব বর্জন করা হয়।—ভোজন করিয়া→খেয়ে, শয়ন করিলে→শু'লে, গ্রহণ করিতে→নিতে।

বিভক্তি-স্থলে ব্যবহৃত অনুসর্গের ক্ষেত্রেও সাধু ও চলিত রীতিতে পার্থক্য রয়েছে।

সাধুরীতির 'দ্বারা/কর্তৃক, অভ্যন্তরে, হইতে'—স্থলে চলিত রীতির 'সঙ্গে, দিয়ে, ভেতর, থেকে'।

সাধুভাষায় বাক্যে পদক্রম-বিন্যাসরীতি যে-রকম কঠোরভাবে অনুসৃত হয়, চলিত ভাষায় ততোটা কঠোরতা মানা হয় না।—'সীতা রামের সহিত বনে গমন করিলেন'→ 'সীতা রামের সঙ্গে বনে গেলেন।'

চলিত ভাষার অপর বৈশিষ্ট্যগুলোর মধ্যে আছে—প্রাচীন শব্দ ও রীতির বর্জন; তদ্ভব, অর্ধতৎসম, দেশি ও বিদেশি শব্দের প্রয়োগবাহুল্য এবং বৈয়াকরণিক ও পদ-স্থাপনরীতির সরলতা সম্পাদন।

উপযোগিত-বিচার ঃ—সাহিত্যের ভাষারূপে সাধুভাষা প্রতিষ্ঠিত হবার কালে সাধুভাষায় ও চলিত ভাষার কিছু কিছু পদ ও বাক্যরীতি গৃহীত হয়েছিল—ক্রিয়াপদের ও সর্বনাম পদের ব্যবহারে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। অর্থাৎ সাধুভাষা ও চলিত ভাষার মিশ্রণ প্রথম যুগে প্রচলিত ছিল; পরবর্তীকালে চলিত ভাষার পদ একেবারে বর্জিত হয়। যাঁরা সাধুভাষার সপক্ষতা করেন, তাঁরা বলেন—ভাষার গ্রাম্যতাদোষ বর্জনে সাহিত্য ভদ্র হ'য়ে ওঠে, অতএব সাহিত্যে ভাষার প্রসাধিত রূপ অর্থাৎ সাধুভাষাই প্রশস্ত; সংস্কৃতানুগ সাধুভাষা প্রাদেশিকতা-মুক্ত তথা সর্বজনবোধ্য হবে; চলিত ভাষার আঞ্চলিকতাহেতু তা' সর্বত্র সহজবোধ্য না-ও হ'তে পারে। আবার সাধুভাষার শব্দ যেমন অভিধানে সুলভ, তেমনি তার অর্থান্তর ঘটবারও আশঙ্কা থাকে না। তা ছাড়া সাধুভাষা গভীর ও গম্ভীর ভাবদ্যোতক অথচ সাহিত্য-শিল্পসম্মত। এই সমস্ত কারণে সাধুভাষারই সাহিত্যের বাহন হওয়া সঙ্গত। পক্ষান্তরে চলিত ভাষার পক্ষপাতীরা মনে করেন—চলিত ভাষামাত্রই যে গ্রাম্যতাদুষ্ট তা' বলা চলে না; বিশিষ্ট বক্তাদের স্মরণীয় বক্তৃতাই তার প্রমাণ। সাধুভাষা যে সর্বত্রবোধ্য হ'বে, এ যুক্তিও অচল, কারণ তাহলে একসময় সংস্কৃতের পাশাপাশি পালি-প্রাকৃত চলতো না। অপিচ অহিন্দুর কাছে তৎসমশব্দবহুল সাধুভাষা কঠিনতর বলেই মনে হবে। আঞ্চলিক শব্দ ও অর্থের ব্যবধান বহু ব্যবহারে ক্রমশঃ কমে আসবে। এ ছাড়া সাহিত্যকে কোনক্রমেই এখন আর শুধু বিশিষ্টদের গণ্ডীতে সীমাবদ্ধ রাখা চলবে না, জনগণের মধ্যে তাকে ছড়িয়ে দিতে হ'বে। অতএব চলিত ভাষার ব্যবহার ছাড়া সাহিত্যের দ্বার কখনও অবারিত হ'বে না।

যুক্তিতর্ক দ্বারা সাহিত্যের ভাষাপ্রশ্নের মীমাংসা করা যায় না। বঙ্কিমচন্দ্র বলেছিলেন বিষয়-অনুযায়ী সাহিত্যের ভাষা নির্ধারিত হওয়া সঙ্গত। আসলে, যে ভাষায় যার পক্ষে মনোভাব প্রকাশ সহজ, সেই ভাষাই সাহিত্যের ভাষা হ'বে। বাঙলা ভাষার নিয়ত পরীক্ষা-নিরীক্ষার বিবর্তিত পরিণতিতে এখন সাধুভাষা সরল হ'তে হ'তে এবং চলিত

ভাষা প্রসাধিত হ'তে হ'তে এমন এক স্থানে এসে দাঁড়িয়েছে, যেখানে ক্রিয়া ও সর্বনাম পদের ব্যবহার ছাড়া অন্যত্র এদের মধ্যবর্তী পার্থক্য প্রায় বিলুপ্ত হ'য়ে গেছে—বস্তুতঃ, ভাষার এইটিই সার্থকতম পরিণতি।

[দুই] স্বীকৃত/শিষ্ট কথ্য বাঙলা (Standard Colloquial Bengali)

প্রাগ্-আধুনিক কালের বাঙলা সাহিত্য ছিল একান্তভাবে পদ্যময়, কাজেই মৌখিক ভাষার সঙ্গে তার সম্পর্ক ছিল দূরতর, কারণ পদের ভাষা স্বভাবতঃই কৃত্রিম। সেকালে গদ্যের আটপৌরে মুখের ভাষা কেমন ছিল, তা জানবার কোন উপায় নেই। তবে সেকালের পদ্যে সর্বনাম ও ক্রিয়ারূপের যে পরিচয় পাওয়া যায়, তা থেকেই যে আধুনিক কালের গদ্যভাষার কাঠামো তৈরি হয়েছে তা নিঃসন্দেহে বলা যায়। মধ্যযুগের কথ্যভাষায় যে অপিনিহিতি দেখা দিয়েছিল, তার পূর্ববর্তী রূপটিই সাধারণভাবে তৎকালীন বাঙলা পদ্যে এবং একালের সাধুভাষায় দেখা যায়। অপিনিহিতি, স্বরসঙ্গতি এবং অন্যান্য ধ্বনিতাত্ত্বিক পরিবর্তনের ফলে কালক্রমে সারা বাঙলায় যে বহুতর উপভাষা গড়ে ওঠে তাদের মধ্যে ঋদ্ধ ও আদরণীয় বিশেষ একটি আধারের ওপরই সাহিত্যিক সাধুভাষা দাঁড়িয়ে আছে। তৎসম শব্দের প্রাচুর্যে, গুরুগম্ভীর শব্দসমষ্টির সমারোহ এবং ক্রিয়ারূপ ও সর্বনাম রূপের পূর্ণতার ঐশ্বর্য নিয়ে এই সাধুভাষা সুদীর্ঘকাল—বিদ্যাসাগর থেকে আরম্ভ ক'রে শরৎচন্দ্র পর্যন্ত সকল সাহিত্যিকের দ্বারাই আদৃত হ'য়ে এসেছে। এই ভাষাকেই 'সাধুভাষা' অর্থাৎ 'প্রমিত ভাষা'-নামে (High Bengali / Standard Literary Bengali) নামে অভিহিত করা হয়। এরই পাশে আধুনিক কালে আর একটি সাহিত্যিক ভাষা গড়ে উঠেছে। এ ভাষা কলকাতার তথ্য ভাগীরথীর উভয় তীরবর্তী শিষ্টজনের মুখের ভাষা। সেই মুখের ভাষা কিঞ্চিৎ সংস্কারের আধারে বিধৃত হ'য়ে 'চলিত ভাষা' বা 'স্বীকৃত কথ্যভাষা'রূপে (Standard Colloquial Bengali) পরিচিত। সাধারণ মৌখিক কথ্যভাষার সঙ্গে এর পার্থক্যের কথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন। প্রসঙ্গক্রমে একথাও উল্লেখযোগ্য যে মুখের ভাষা কখনও সাহিত্যে প্রযুক্ত হ'তে পারে না—সাহিত্যে প্রয়োগ করতে গেলে একটু মাজা-ঘষা, একটু সংস্কার অবশ্যই ক'রে নিতে হয়। খাঁটি মুখের ভাষা 'আলালী ভাষা' বা 'হুতোমী ভাষা'কে মধুসূদন 'মেছুনীদের ভাষা' বলে অভিহিত করেছিলেন। যাহোক, শিক্ষা-সংস্কৃতির, ব্যবসায়-বাণিজ্যের এবং রাজনীতির কেন্দ্ররূপে এবং সাহিত্যচর্চার পীঠস্থান-রূপে ভাগীরথী-তীরবর্তী অঞ্চল মধ্যযুগ থেকেই যে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে, তারি ফলে

এ অঞ্চলের ভাষা সারা বাঙলার সমগ্র জনগণের ওপর প্রভাব বিস্তার করে এসেছে। তা' ছাড়া এ অঞ্চলের মৌখিক ভাষায় যে শ্বাসাঘাতের সৌষ্ঠব এবং শ্রুতিমধুর টান রয়েছে, তা' বাঙলার অন্যত্র নেই। অধিকন্তু এ ভাষার শব্দসমষ্টিতে স্বরসঙ্গতি এবং ক্রিয়ারূপে ও শব্দরূপে অভিশ্রুতি এ ভাষাকে যে অনন্যতা দান করেছে, তারি ফলে এই চলিত ভাষা সাহিত্যের ভাষারূপে সার্বজনীন স্বীকৃতি লাভ করেছে। শিক্ষিত, মার্জিতরুচি ও সংস্কৃতিসম্পন্ন সজ্জনগণের অনুমোদিত বলে এই চলিত ভাষাকে 'নবরূপের সাধুভাষা' বললেও অবিচার হয় না।

প্রধানতঃ সংস্কৃত ব্যাকরণের ওপর নির্ভরশীল সাধুভাষা বিবর্তিত হ'তে হ'তে সহজ সরল হ'য়ে উঠেছে, তার এই সরলীকরণের মূলে অবশ্যই চলিত ভাষার প্রভাব ছিল। বঙ্কিমচন্দ্রই প্রথম সাধুভাষার ওজস্বিতার সঙ্গে চলিত ভাষার গতিকে সমন্বিত করে বাঙলা ভাষাকে এক সর্বজনবোধ্য রূপদান করলেন। সাধুভাষার এই রূপান্তরে চলিত ভাষাও পেল এক শিল্পসম্মত রূপ। আবিষ্কৃত হ'লো চলিত ভাষারও এক ছন্দোস্পন্দ, দ্রুতগতি এবং সুষ্ঠুভাবে মনোভাব প্রকাশের ক্ষমতা। ফলে সাহিত্যে এর আদর বেড়ে গেল। সর্বপ্রথম এই চলিত ভাষা যুক্ত হ'তো নাটকে ও কথাসাহিত্যের সংলাপে। তারপর গল্প-উপন্যাসের স্তর উত্তীর্ণ হ'য়ে প্রবন্ধ সাহিত্য পর্যন্ত যাবতীয় সাহিত্যিক রচনারই বাহন হ'য়ে উঠলো এই চলিত ভাষা। প্রমথ চৌধুরী এবং স্বামী বিবেকানন্দ চলিত ভাষাকে সাহিত্যিক মর্যাদা দান করলেন, রবীন্দ্রনাথও পরবর্তীকালে এই ভাষার পৃষ্ঠপোষকতায় এগিয়ে এলেন। ফলে, কিছুকাল পূর্বেও অন্ততঃ প্রবন্ধ রচনার ভাষা যেখানে ছিল সাধু, এখন আর তাও নেই—বলতে গেলে, চলিত ভাষাই এক্ষণে সাহিত্যে সর্বব্যাপকতা লাভ করেছে।

সাধুভাষা ও স্বীকৃত কথ্য তথা চলিত ভাষার প্রধান পার্থক্যসূত্রগুলো নিম্নোক্তক্রমে নির্দেশ করা চলে—সাধুভাষায় তৎসম শব্দের আধিক্য, পক্ষান্তরে চলিত ভাষায় তৎসম শব্দের প্রয়োগ অপেক্ষাকৃত কম। সাধুভাষায় অর্ধতৎসম শব্দের ব্যবহার একেবারেই চলে না, কিন্তু চলিত ভাষায় তার অবাধ প্রবেশ। সাধুভাষায় ক্রিয়াপদের পূর্ণরূপ ব্যবহৃত হয়; মধ্যযুগের সর্ববঙ্গীয় ভাষার এবং বর্তমানে বঙ্গালী উপভাষায় সেই পদের অপিনিহিত রূপটির প্রচলন দেখা যায়; পক্ষান্তরে চলিত ভাষায় অপিনিহিত শব্দের অভিশ্রুতি বিহিত হ'য়েছে এবং তার সঙ্গে যুক্ত হ'য়েছে স্বরসঙ্গতি ও সমীভবন। ফলে—'করিতেছি>কইরত্যাছি>করতেছি>করছি, কচ্ছি; করিব>কইরব>করবো', বলিয়া>বইল্যা>বলে, হইতেছে>হতছে>হচ্ছে' প্রভৃতি। সাধুভাষায় সর্বনাম পদেরও পূর্ণরূপ ব্যবহৃত হ'তো, চলিত ভাষায় তৎস্থলে তার

সংক্ষিপ্ত রূপ ব্যবহৃত হয়,—'তাহাদিগের>তাদের, কাহার>কার', প্রভৃতি। এছাড়াও চলিত ভাষায় স্বরধ্বনিতে কিছু বড় রকমের পরিবর্তন দেখা দিয়েছে।—এ ভাষায় প্রথমে অন্ত্যস্বর লোপ হ'লো, পরে মধ্যস্বর লোপ—দুয়ে মিলে এলো দ্বিমাত্রিকতা।—'পাগল>পাগল্+আ>পাগ্‌লা, গামোছা>গাম্‌ছা, কতদূর>কদ্দূর'। সমাসবাহুল্য সাধু-ভাষার অপর বিশিষ্ট লক্ষণ; কথ্যভাষায় সমাস-ব্যবহার নিষিদ্ধ না হ'লেও তৎস্থলে কথ্য ইডিয়ম বা বাগ্‌ধারার প্রতিই ঝোঁক বেশি। চলতি ভাষার বাচনভঙ্গি এবং বাক্যরীতিও পৃথক্। সাধুভাষায় বহু-ভাষণ প্রশংসিত, পক্ষান্তরে চলিত ভাষায় মিতভাষণই সমাদৃত। সাধুভাষার ওপর কোন আঞ্চলিক প্রভাব পড়বার সম্ভাবনা কম; কিন্তু চলিত ভাষা বস্তুতঃ নিজেই পশ্চিমবঙ্গীয় 'উপভাষা তথা রাঢ়ী উপভাষার আধারে গঠিত, এর ওপর বর্তমানে বঙ্গালী উপভাষারও যথেষ্ট প্রভাবের পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে।

নানাদিক থেকেই সাধুভাষার সঙ্গে চলিত ভাষার পার্থক্যের কথা বলা হ'লেও, বস্তুতঃ উভয় ভাষায় একটি বাদে অপর কোন লক্ষণই কঠোরভাবে মেনে চলা হয় না। এক ভাষার লক্ষণ অপর ভাষায় হামেশাই পাওয়া যাচ্ছে, একটি মাত্র লক্ষণই শুধু উভয় ভাষার সীমা নির্ধারণ করছে। সেটি হ'লো—ক্রিয়ারূপের ব্যবহার। সাধুভাষায় ক্রিয়াপদের পূর্ণরূপ ব্যবহৃত হয়, চলিত ভাষায় ব্যবহৃত হয় তার সংক্ষিপ্ত রূপ। অপর লক্ষণগুলো অনেকটাই নমনীয়।

চলিত ভাষাও সাহিত্যের ভাষা—মৌখিক কথ্যভাষার সঙ্গে এর পার্থক্যের কথা আগেই বলা হয়েছে। এই চলিত ভাষার মধ্যে দু'টি রীতির সন্ধান পাওয়া যায়। এক রীতিতে তৎসম পদের বহুলতা এবং এতে শুধু ক্রিয়াপদ ও সর্বনামেই সংক্ষিপ্ততা বর্তমান। অপর সমস্ত দিকে এটি সাধুরীতির খুবই কাছাকাছি। অপরটি মুখের ভাষার অনেকটা কাছাকাছি, তৎসম শব্দের ব্যবহার কম এবং সাধুরীতি থেকে অনেকটা দূরে অবস্থিত। চলিত ভাষার প্রথম সার্থক ব্যবহারক ও প্রবক্তা বীরবল বা প্রমথ চৌধুরীর রচনা থেকেই চলতি ভাষার উভয়বিধ রচনারীতির নিদর্শন উদ্ধার করা যাচ্ছে:

"ভাষার সঙ্গে ধর্মের সম্পর্ক যে অতি ঘনিষ্ঠ, এ সত্য সকলের নিকট সুস্পষ্ট না হলেও নিঃসন্দেহ। মানুষের মনের বাইরে ভাষা নেই, এবং ভাষার বাইরেও মন নেই। ভাষা ও মন হচ্ছে একই বস্তুর অন্তর ও বাহির। সুতরাং ধর্মমত ভাষান্তরিত হলে রূপান্তরিত হতে বাধ্য।" (বাংলার ভবিষ্যৎ)

"হুজুর, আমি তন্তরমন্তর কিছুই জানিনে, তবে আমার যা ছিল তা এদের কারও ছিল না। সে জিনিস হচ্ছে চোখ। আমি অন্যের চোখের ঘোরাফেরা দেখেই বুঝতুম

যে, তার হাতের লাঠি সড়কির মার কোন্ দিক্ থেকে আসবে। কিন্তু আমার চোখ দেখে এরা কিছুই বুঝতে পারতো না—শুধু মার খেতো।' (মন্ত্রশক্তি)

[তিন] কাব্যভাষা

কালগতভাবে বাঙলা ভাষার শ্রেণীবিভাজনে আমরা বাঙলা ভাষার তিনটি স্তর পেয়েছি। প্রথম দুটি স্তরে অর্থাৎ আদিস্তর এবং মধ্যস্তরে বাঙলা ভাষার স্বরূপ-বিশ্লেষণের জন্য আমাদের একান্তভাবেই কাব্যসাহিত্যের উপর নির্ভর করতে হয়। উক্ত দুই স্তরে গদ্য-সাহিত্যের সৃষ্টিই হয়নি। মধ্যস্তরের শেষদিকে কিছু কিছু গদ্যের নিদর্শন পাওয়া গেলেও তাদের কোনক্রমেই সাহিত্যপদবাচ্য বলে আখ্যা দেওয়া যায় না। তা' ছাড়া, ঐ কালে রচিত চিঠিপত্র, দলিল-দস্তাবেজে যে ভাষায় পরিচয় পাওয়া যায়, তার উপর নির্ভর ক'রে ভাষা-বিষয়ক আলোচনা সম্ভবপর নয়। একে তো এদের মধ্যে ভাষাগত অশুদ্ধির সীমা নেই, দ্বিতীয়তঃ ঐ জাতীয় অধিকাংশ রচনাই আঞ্চলিকতাদুষ্ট। বাঙলা ভাষার আধুনিক স্তরে ছাপাখানার প্রতিষ্ঠা এবং গদ্য সাহিত্যের উদ্ভবের ফলে আমরা সমকালপ্রচলিত ভাষার একটা আদর্শ (Standard) রূপের সন্ধান পেয়েছি। তাকে অবলম্বন ক'রে আমরা বাঙলা সাহিত্যে প্রচলিত সাধুরীতির এবং সমকালীন মৌখিক ভাষাকে অবলম্বন ক'রে বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষার ও শিষ্ট কথ্যভাষারীতির বিষয়ে অবহিত হ'বার সুযোগ পেয়েছি। ফলতঃ ভাষাবিদ্যা-বিষয়ক গ্রন্থে বাঙলা সাধুভাষা, চলিত ভাষা এবং বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষার বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা যোগ্য মর্যাদা লাভ করেছে। কিন্তু যে কাব্যভাষা অবলম্বন ক'রে আমরা প্রথম দুই স্তরের বাঙলা ভাষা-বিষয়ে অবহিত হ'য়েছি, আধুনিক স্তরে কিন্তু আমরা সেই কাব্যভাষাকে সম্পূর্ণই উপেক্ষা করে থাকি; অথচ আধুনিক কালের কাব্যসাহিত্য প্রাচীন ও মধ্য-যুগের কাব্যসাহিত্য অপেক্ষা অনেক সমৃদ্ধ ও বৈচিত্র্যপূর্ণ। এই বিবেচনায় ভাষাতাত্ত্বিক আলোচনার ক্ষেত্রে আধুনিক স্তরের কাব্যভাষারও যথাযোগ্য মর্যাদা পাওয়া উচিত।

কাব্যভাষার ক্ষেত্রে 'আধুনিক' শব্দটি প্রয়োগ করা অসুবিধাজনক। গদ্যরচনার ক্ষেত্রে প্রায় সমকালীন বিদ্যাসাগর-বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথে যে পার্থক্য দেখা যায়, কাব্যের ক্ষেত্রে কিন্তু কয়েক শতাব্দীর মধ্যেও ততটা পার্থক্য সৃষ্টি হয় নি। কারণ, পৃথিবীর প্রায় সব ভাষাতেই কাব্যভাষায় বহু প্রাচীন শব্দ এবং রূপ বজায় থেকে যায়। প্রাচীন-কাল থেকেই কবিতার ধারা ভাষায় স্থিরীকৃত হ'য়ে যায় বলেই কবিতার ভাষা গদ্যভাষার মতো সমকালোচিত পরিবর্তন লাভ করতে পারে না। ফলতঃ কবিতায় এমন বহু শব্দ ব্যবহৃত হয় যেগুলো সমকালীন কথ্যভাষায় কিংবা গদ্যভাষায় হয়তো অপ্রচলিতই

র'য়ে গেছে। বাঙলা কাব্যে ব্যবহৃত এরূপ শব্দ অনেক।—'অমিয়া, আছিল, উয়ে (উদিত হয়), উর (অবতীর্ণ), চিত জিনে (জয় করে), ঝি, ঝিয়ারি, ঝুরে (কাঁদে), তিতিল (ভিজিল), দেউটি, দিঠি, নিঠুর, নেহারি, নিদয়, নারিব, নেউটিল (ফিরে এলো), 'পর (উপর), পুছিল, পিয়াস, বুলে (ঘোরে), বয়ান (বদন), বাহুড়িল (ফিরে এলো), ভণে, রাতা/রাতুল (রক্তবর্ণ), সায়র, হেদে, হেরি, হিয়া' প্রভৃতি।

অনেক তৎসম শব্দ ও যুক্তব্যঞ্জনবহুল শব্দ শ্রুতিকটুত্ব এবং / অথবা দুরুচ্চার্য বিধায় উচ্চারণসৌকর্যের নিমিত্ত স্বরভক্তির সহায়তায় বিশ্লিষ্টরূপে কাব্যভাষায় লিখিত ও উচ্চারিত হ'য়ে থাকে। যথা—

'তোমার পতাকা যারে দাও, তারে বহিবারে দাও **শকতি**।'

'আধ **জনম**' 'তোহারি **বিশোয়াসা**' 'পাইল **রতন**', 'কানুর **পীরিতি**'।

কর্ম-সম্প্রদানে গদ্যভাষায় '-কে' বিভক্তি ব্যবহৃত হ'লেও কাব্যভাষায় তৎস্থলে '-রে' এবং '-**এ**' বিভক্তিরই বহুল প্রয়োগ লক্ষিত হয়ে থাকে। যথা—

'আমি তো **তোমারে** চাহিনু জীবনে
তুমি **অভাগারে** চেয়েছো।'
'কোন **বীরবরে** বরি, সেনাপতি-পদে',
'হেন **পাত্রে** কন্যা দেহ দান।'

ছন্দের প্রয়োজন অথবা শ্রুতিসুখকরত্বের জন্য অনেক ব্যাকরণদুষ্ট পদও কাব্য-ভাষায় ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যথা—

'**সুকেশিনী** শিরোশোভা কেশের ছেদনে
ক্ষুব্ধা নহে,'
'কহিলা **বারুণী** সতী।'
'নাচিছে নর্তক, গাইছে **গায়কী**।'

বিশেষ্য এবং সর্বনামের সঙ্গে কতকগুলি বিশেষ শব্দ-বিভক্তি বা অনুসর্গ কাব্যভাষায় ব্যবহৃত হয়, গদ্যে কিংবা সাধুভাষায় যাদের ব্যবহার নেই। যথা—

'কভু বা প্রভুর **সনে**', 'জগতের **মাঝে** তুমি', 'কিসের **তরে**', 'যাহার **লাগিয়া**', 'তোমার **সাথে**' ('সাথে' শব্দটি সাধু গদ্যেও ব্যবহৃত হয় না, এটি আঞ্চলিক শব্দ), 'কানুর **বিহনে**', 'তই **বিনু**'।

'মোর, মম, তব, মোরা, তথি, হেন' প্রভৃতি কিছু কিছু সর্বনাম শব্দ শুধু কাব্য-ভাষাতেই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যথা—

'তব কাছে এই **মোর** শেষ নিবেদন'

'**মোরা** নাচি ফ‌ুলে ফ‌ুলে',

'**হেন** ভাগ্য কবে হ'বে।'

ছন্দ ও মিলের প্রয়োজনে ক্রিয়াপদের অনুজ্ঞা ভাবে '-হ' যোগ কাব্যভাষার অপর বিশিষ্ট লক্ষণ। যথা—

'সকল দীনতা মোর **করহ** ছেদন।'

'**দেখহ** সুন্দর, কন্যা **দেহ** দান'।

বিশেষ্য ও বিশেষণকে ক্রিয়ারূপে ব্যবহার অর্থাৎ নামধাতুর ব্যবহার কাব্যভাষায় অবারিত। যথা—'**নীরবিলা** তরুরাজ', 'চাহে **প্রতিবিধিৎসিতে**', '**নিমন্ত্রিলা** জনে জনে', '**ধ্বনিল** আকাশে'।

ঘটমান বর্তমান কালে অনেক সময় পদমধ্যবর্তী বিভক্তির অংশ '-তে' লোপ পায়। যথা—'গগনে **শোভিছে** তারা', 'কি **ভাবিছ** মনে', '**যাইছে** ভাসিয়া কত ফুল'।

অতীতকালে উত্তমপুরুষের ক্রিয়াপদে '-লুম'-স্থলে '-নু'-র প্রয়োগ কাব্যভাষায় যথেষ্ট ব্যবহৃত হয়। যথা—

'**কেলিনু** শৈবালে ভুলি কমল কানন।'

'**হেরিনু** সুন্দর এক যুবক রতন।'

'কি **করিনু**।'

অতীতকালে মধ্যমপুরুষ ও নামপুরুষের ক্রিয়াপদে '-লে ও '-ল' -স্থলে অনেক সময় '-লা' ব্যবহৃত হয়। যথা—

'**নীরবিলা** তরুরাজ', '**পাঠাইলা** তারে তুমি'।

কখন কখন কবিতায় ছন্দ-রক্ষাহেতু 'করিল', 'মরিল'-প্রভৃতি স্থলে 'হৈল', 'কৈল' 'মৈল' প্রভৃতি ব্যবহৃত হয়। যথা—

'মৈল রাজা দশানন, কি হ'বে উপায়।'

'-ইয়া'-অন্ত অসমাপিকা ক্রিয়ায় অনেক সময় পদান্তিক '-য়া' লোপ পায়। যথা—

'বিকশি' উঠিছে দন্ত।'

'হাসি' কহে বিভীষণ।'

'অবতরি' এসো মাগো কবিতা আসরে।'

সাধু ও চলিত রীতির মিশ্রণ, যা' গদ্যভাষায় একান্তভাবে নিষিদ্ধ, কাব্যভাষায় কিন্তু তার প্রয়োগ অবারিত। প্রধানতঃ ছন্দের প্রয়োজনেই এই মিশ্রণকে মেনে নেওয়া হয়। যথা—

'আর কতদূরে **নিয়ে যাবে** মোরে সে সুন্দরী,

বল কোন্ পারে ভিড়িবে তোমার সোনার তরী।'

'শাম্‌লা আঁটিয়া নিত্য
তুমি কর ডেপ্‌টিত্ব,
একা পড়ে মোর চিত্ত করে ছট্‌ফট্।'

'অতএব ত্বরা ক'রে
উত্তর করিবা মোরে'

'তোমারে হেরিয়া তারা, হ'তেছে ব্যাকুল।'

'এত কহি ঋষিপদে করিয়া প্রণতি
গেলা চলি সত্যকাম। ঘন অন্ধকার
বনবীথি দিয়া, পদব্রজে হ'য়ে পার
ক্ষীণ স্বচ্ছ শান্ত সরস্বতী।'

গদ্যভাষার বাক্য গঠনে কর্তা-কর্ম-ক্রিয়ার অবস্থান-বিষয়ে যে রীতি প্রচলিত আছে, কাব্যভাষায় তার বৈকল্য ঘটে থাকে—

'কহি তোরে আমি, শোনরে অবোধ',—

(সাধারণ নিয়ম—প্রথমে কর্তা, পরে কর্ম এবং সর্বশেষে ক্রিয়া ব্যবহৃত হয়, এখানে প্রথমে ক্রিয়া, পরে কর্ম এবং সর্বশেষে কর্তা ব্যবহৃত হয়েছে)।

'উত্তরিলা বীরদর্পে রৌদ্র দাশরথি।'

'চলিলা পশ্চিমদ্বারে কেশব বাসনা।'

'গাহিছে কাশীনাথ নবীন যুবা
ধ্বনিতে সভাগৃহ ঢাকি।'

গদ্যভাষায় নঞর্থক 'না' ক্রিয়াপদের পরে বসে, কথ্যভাষায় তার ব্যতিক্রম ঘট্‌তে পারে।

'আমি না করিব কাজ, না শুনিব বাণী।'

'একটি কথার লাগি তিনটি রজনী জাগি একটুও নাহি মিলে সাড়া।'

একটি অতিশয় প্রচলিত বচন—'নিরঙ্কুশাঃ হি কবয়ঃ'—অর্থাৎ কবিরা নিরঙ্কুশ, কোনই শাসন মানেন না। কবি-কল্পনার বল্গাহীন গতির জন্যই বাক্যটি সৃষ্টি, কিন্তু কবিরা যে ব্যাকরণ বা ভাষারীতির শাসনও মানেন না, তার অনেক প্রমাণ ইতঃপূর্বে দেওয়া হয়েছে। কাব্যভাষার যে সকল বৈশিষ্ট্যের কথা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, তাদের অনেকগুলোই কিন্তু যুগপৎ ব্যবহৃত হ'তে পারে। ছন্দ, মিল, সুশ্রাব্যতা-আদির

প্রয়োজনে কবিরা সত্যই নিরঙ্কুশ হ'য়ে ওঠেন। অনেক সময় কাব্য-দোষ দুরন্বয় এবং দুরান্বয়ও বহু কবিতায় লক্ষ্য করা যায়।

'যাদঃপতিরোধ যথা চলোর্মি-আঘাতে'—এখানে ব্যঞ্জনবাহুল্যের জন্য শ্রুতিকটুতা দোষের সৃষ্টি হয়েছে।

'গুণবতী ভাই আমার মন কেমন করে।'

'চাতকিনী কুতুকিনী ঘন দরশনে।'

উপরের দৃষ্টান্তসহ দুটিতে চ্যুত-সংস্কৃতি বা ব্যাকরণগত দোষ বর্তমান।

'ঈশাক্ষের উষবুর্দে মারা গেল মার।
নাকেতে নির্জরগণ করে হাহাকার॥'

—শিবের বাণে কামদেবের মৃত্যু হ'লে স্বর্গে দেবতাদের মধ্যে হাহাকার পড়ে গেল।—শ্লোকটিতে অপ্রচলিত শব্দের আধিক্যহেতু নিহতার্থতা দোষের সৃষ্টি হ'লো। এরূপ আর একটি দৃষ্টান্ত (অপ্রচলিত অর্থের প্রয়োগ) ঃ—

'তোমার গোরসে (=বচনে) গো (=স্বর্গ) পাইব করতলে।'

অপ্রযুক্ততা দোষের দৃষ্টান্ত ঃ

'বর্করাট্-করজাল-চকাশিত শৈল শাল',

'মলম্বাপ্রতিম রুচি উচ্চ তরুদলে।'

সাহিত্যে অলংকার-ব্যবহারের উপযোগিতা সর্বজন-স্বীকৃত হ'লেও এইসব অলংকারের বিশেষতঃ শব্দালংকারের ব্যবহার কবিতায়ই বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। যথা—

'মধুমাসে মলয় মারুত মন্দমন্দ।
মালতীর মধুকর পিয়ে মকরন্দ॥'

—এখানে 'ম' অনুপ্রাস লক্ষণীয়। একটি দোষও আছে, সেটি দুরান্বয়। 'মালতীর মধুকর' কোন অর্থ হয় না, বাক্যটি হবে 'মালতীর মকরন্দ'।

'কুসুমের বাস ছেড়ে কুসুমের বাস
বায়ুভরে করে এসে নাসিকায় বাস॥'

এখানে বহু-অর্থে ব্যবহৃত 'বাস' শব্দটির একাধিক ব্যবহারে যমক অলংকার হ'লো।

শব্দভাণ্ডার

যে কোন ভাষার প্রধান সম্পদ নিহিত তার শব্দভাণ্ডারের মধ্যে। কাজেই যে ভাষার শব্দ-সম্ভার যত বেশি, সেই ভাষা তত বেশি সমৃদ্ধ বলে বিবেচিত হ'য়ে থাকে। যে কোন ভাষায় শুধু শব্দজ্ঞানের সাহায্যেই কাজ-চালানো-গোছের মনোভাব প্রকাশ করা সম্ভবপর। আর শব্দরাশি যে শুধু ভাবপ্রকাশেরই উপাদান, তা নয়—এ যেন এক বাতায়ন, যার মধ্য দিয়ে এক একটা জাতির আচার, আচরণ, গতিবিধি, সভ্যতা ও সংস্কার—এক কথায় তার প্রাণরহস্যের সন্ধান পাওয়া যায়। পৃথিবীর সর্বাগ্রগণ্য ভাষা ইংরেজিতে সাড়ে পাঁচ লক্ষের উপর শব্দ আছে। জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের বাঙলা অভিধানে শব্দসংখ্যা লক্ষাধিক—অবশ্য এ সংগ্রহও একান্তই অসম্পূর্ণ, মোট বাঙলা শব্দের সংখ্যা এর দ্বিগুণ হওয়াই সম্ভব। অথচ একজন সাধারণ অশিক্ষিত ব্যক্তির জীবনযাত্রা নির্বাহের পক্ষে ৫০০-৮০০ শব্দই যথেষ্ট বিবেচিত হয়। বাইবেলের নোতুন পুস্তকে (New Testament) ব্যবহৃত শব্দসংখ্যা ৪৮০০, প্রাচীন পুস্তকে (Old Testament) ৫৬৪২, মিল্টনে ৮০০০ ; কিন্তু শেক্‌সপীয়র ব্যবহার করেছেন ১৫০০০ শব্দ। আবার একালের সুবক্তা চার্চিলের ব্যবহৃত শব্দসংখ্যা নাকি ৩০০০০-এর অধিক। এ থেকে প্রমাণিত হচ্ছে—সভ্যতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের ব্যবহৃত শব্দসংখ্যাও ক্রম-বর্ধমান।

প্রত্যেক ভাষার প্রধান অবলম্বন উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত রিক্‌থ—তারপর একদিকে যেমন নবসৃষ্ট শব্দের সাহায্যে এবং অন্য ভাষা থেকে ঋণ নিয়ে তার শব্দ সম্ভার বাড়িয়ে চলে, তেমনি কখন কখন অপ্রয়োজনে, কখন বা কোন অজ্ঞাত কারণে অনেক শব্দ ভাষা থেকে লুপ্ত হয়ে যায়। প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষা তথা সংস্কৃত থেকে মধ্যভারতীয় আর্যভাষা তথা প্রাকৃত-অবহট্টের মধ্য দিয়ে বাঙলা ভাষা জন্মলাভ করেছে,—অতএব সংস্কৃত থেকে প্রাকৃত-মাধ্যমে বিবর্তিত শব্দগুলোই বাঙলা ভাষার নিজস্ব সম্পদ—এগুলোর পারিভাষিক নাম 'তদ্ভব শব্দ'। তদ্ভব শব্দের মতোই সমান গুরুত্ব ও মর্যাদার আসন রয়েছে সংস্কৃত বা 'তৎসম' শব্দেরও। প্রয়োজনে আমরা যে কোন সংস্কৃত শব্দকে ভাষার অঙ্গীভূত করে নিই—বস্তুতঃ যে কোন তৎসম শব্দকেই আমরা বাঙলা শব্দ বলেও মনে করি। তবে পরিবর্তনশীল সমাজের সঙ্গে তাল রাখতে গিয়ে আমরা অনেক

সময় কোন কোন প্রাচীন শব্দকে বর্জনও করে থাকি। যেমন প্রাচীন ভারতের যজ্ঞ-ব্যবস্থা পরবর্তীকালে লোপ পাওয়াতে তৎসম্পর্কিত অনেক শব্দও লোপ পেয়ে গেছে।
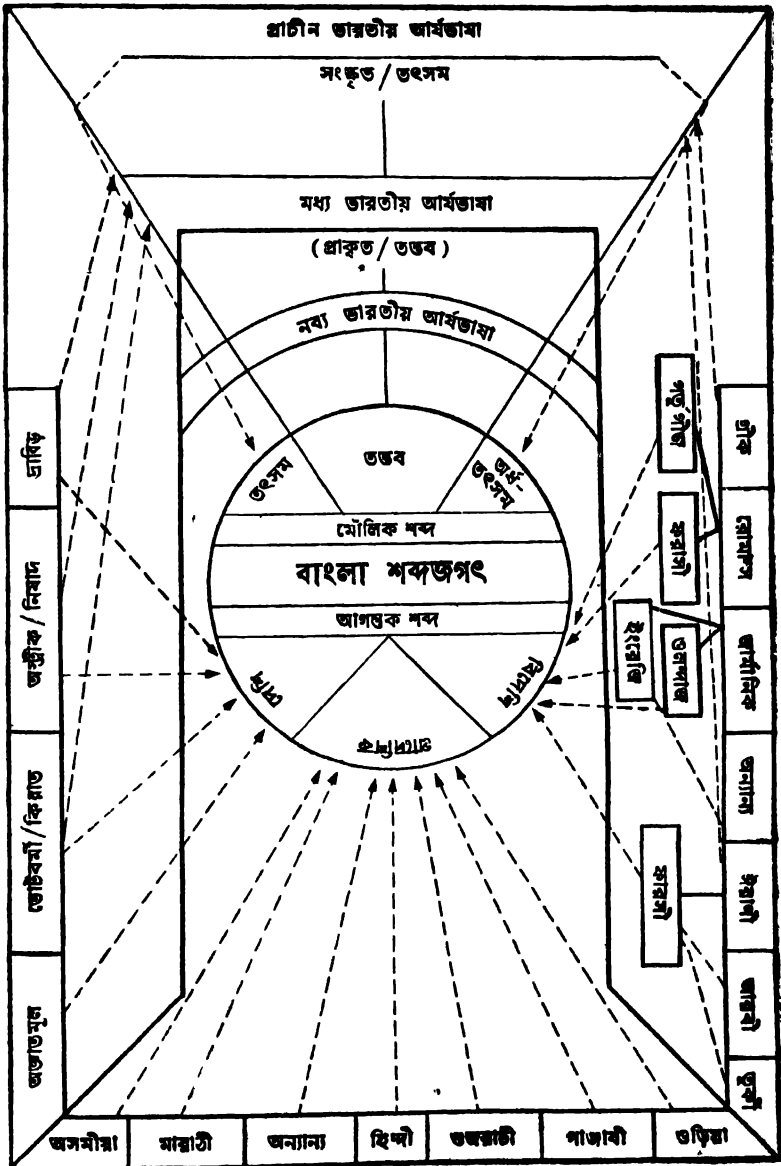
যথা—সুব্রহ্মণ্য, ন্যঙ্খ, যজ্বা, যাযজূক, স্থাণ্ডিল, আবসথিক, অহীন, সণ্ডায্য, সুত্যা

প্রভৃতি। বাঙ্‌লা দেশে মুসলমানদের আগমনের পর আরবী-ফার্সী শব্দের প্রবলতাহেতু আমরা কিছু কিছু খাঁটি বাঙ্‌লা শব্দ বা তদ্ভব শব্দকেও বর্জন করেছি। যেমন,—উদ্যান > 'উজ্জানি'-স্থলে ফারসী 'বাগান-বাগিচা', মধ্যা > 'মাজা'-স্থলে 'কোমর', 'বুহিত্র > বুহিত'-স্থলে 'জাহাজ', কক্ষতল > 'কাখতল' স্থলে 'বগল' প্রভৃতি।

এইভাবেই গ্রহণ বর্জনের মধ্য দিয়ে কোন একটা দেশের শব্দ-সম্পদ গড়ে ওঠে এবং কালক্রমে তার ভাণ্ডার পুষ্ট হতে থাকে। প্রাচীন ভারতে সংস্কৃত ভাষাও নানা দেশি ও বিদেশি শব্দ আত্মসাৎ করে তাদের নিজস্ব ব্যাকরণ-শৃঙ্খলে আবদ্ধ করেছিল। প্রাকৃত বৈয়াকরণরাই সর্বপ্রথম শব্দের শ্রেণীবিন্যাস করেছিলেন, কিন্তু প্রাগুক্ত দেশি-বিদেশি শব্দগুলোকে স্বরূপে চিনে উঠতে পারেননি। তাঁরাই প্রথম সংস্কৃত শব্দগুলোকে 'তৎসম', প্রাকৃত শব্দগুলোকে 'তদ্ভব' এবং অপর সমস্ত শব্দকে 'দেশী' আখ্যায় শ্রেণীবদ্ধ করেছিলেন। 'দেশী' বলতে তাঁরা অজ্ঞাতমূল অনার্য ভাষা থেকে আগত শব্দকেই বুঝেছিলেন, কিন্তু এদেরই মধ্যে ছিল কিছু তৎসম আর তদ্ভব শব্দ—তাদের ঐ বৈয়াকরণরা চিনে উঠতে পারেননি।

একালের শব্দশাস্ত্রিগণ বাঙলা শব্দসম্ভারকে দুটি প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত করে থাকেন—(ক) মৌলিক শব্দ, (খ) আগন্তুক/কৃতঋণ শব্দ। তদ্ভব, তৎসম ও অর্ধ-তৎসম শব্দগুলো মৌলিক পর্যায়ভুক্ত এবং দেশি, বিদেশি ও প্রাদেশিক শব্দ আগন্তুক পর্যায়ভুক্ত।

বাংলা 'শব্দ-ভাণ্ডার'-বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে 'পরিভাষা' বা 'পারিভাষিক শব্দ' (Technical terms) সম্বন্ধে কিছু বলে নেওয়া প্রয়োজন। জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে এ-জাতীয় শব্দ-সংখ্যা ক্রমবর্ধমান গতিতে ভাষার ভাণ্ডারকে স্ফীততর ক'রে তুলছে। জাতি-বিচারে এদের কোনটি 'মৌলিক', কোনটি বা 'আগন্তুক'। আবার সূক্ষ্মবিচারে তৎসম, ইংরেজি প্রভৃতি যেমন রয়েছে, তেমনি অনেক রয়েছে নবোদ্ভূত শব্দ, যাদের কোন শ্রেণীভুক্ত করা সহজ নয়। বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ, তাই অধ্যায়-শেষে এ বিষয়ে পৃথক্ আলোচনার অবকাশ রইলো।

[এক] মৌলিক শব্দ

প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা থেকে ক্রমবিবর্তিত হয়ে বাঙলা ভাষার উদ্ভব ঘটেছে বলেই উক্ত ভাষা অর্থাৎ সংস্কৃত ভাষার সঙ্গে সম্পর্কিত যে কোন শব্দ 'মৌলিক শব্দ' বলে অভিহিত হ'য়ে থাকে। যে শব্দগুলো সংস্কৃত থেকে প্রাকৃত মাধ্যমে বিবর্তিত হয়ে বাঙলায় এসেছে, তাদের বলা হয় (১) 'তদ্ভব শব্দ'; যে শব্দগুলো সংস্কৃত থেকে সরাসরি অবিকৃত বানানে বাঙলায় গৃহীত হ'য়েছে তাদের বলা হয় (২) 'তৎসম শব্দ';

(৩) আর যে শব্দগুলো সংস্কৃত থেকেই সরাসরি বাঙলায় এসেছে বিকৃতভাবে, তাদের বলা হয় 'অর্ধতৎসম/ভগ্ন তৎসম শব্দ'। মৌলিক শব্দ বলতে এই তিনটি শ্রেণীকেই বুঝিয়ে থাকে।

(১) **তদ্ভব (Tad-bhava) শব্দ** ঃ বাংলার নিজস্ব শব্দ 'তদ্ভব'—এগুলো প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা অর্থাৎ সংস্কৃত থেকে মধ্যভারতীয় আর্যভাষা অর্থাৎ প্রাকৃতের মাধ্যমে ধারাবাহিক পরিবর্তন লাভ করে বাঙলায় রূপায়িত হয়েছে। শুধু সংস্কৃত শব্দই যে প্রাকৃতমাধ্যমে বাঙলায় রূপায়িত হয়েছে, তা' নয়, অন্যান্য অনেক অসম্পৃক্ত গোষ্ঠীর ভাষা অথবা সগোত্রজ ইন্দো-য়ুরোপীয় গোষ্ঠীর শাখান্তর ভাষা থেকেও তা' সংস্কৃত-মাধ্যমে বিবর্তিত হ'য়ে বাঙলা ভাষায় গৃহীত হ'য়েছে।

সংস্কৃতমূল থেকে প্রাকৃতের মধ্য দিয়ে আগত ঃ—অক্ষবাটক > অক্‌খআড়অ > আখড়া, দুহিতা > ধিআ > ঝি, মৃত্তিকা > মটিআ > মাটি, সন্ধ্যা > সঞ্ঝা > সাঁঝ, খাদ্য > খজ্জ > খাজা, অর্ধ তৃতীয় > অড্‌ঢইইঅ > আড়াই, পিতৃস্বসৃকা > পিউসসুসিআ > পিসি।

প্রাচীন গ্রীক থেকে সংস্কৃত-মাধ্যমে আগত ঃ দ্রাখ্‌মে > দ্রম্য > দাম, স্যুরিংস্ > সুরুঙ্গা > সুড়ঙ্গ, সেমিদালিস্ > সমিতা > সিমুই।

প্রাচীন পারসিক থেকে সংস্কৃত-মাধ্যমে আগত ঃ কর্শ > কর্ষাপণ > কাহন, পরস্তা > পুস্তক > পুঁথি, মোচক > মোচিক > মুচি।

প্রাচীন দ্রাবিড় থেকে সংস্কৃত-মাধ্যমে আগত ঃ গুররমু > ঘোটক > ঘোড়া, পিল্লৈ > পিল্লিক > পিলে, কালু > খল্ল > খাল।

প্রাচীন অস্ট্রীক থেকে সংস্কৃত-মাধ্যমে আগত ঃ পতঙ্গ > ফড়িং, উদুম্বর > ডুমুর, ডিম্ব > ডিম।

উপভাষায় প্রচলিত তদ্ভব শব্দ ঃ শিষ্ট কথ্যভাষায় প্রচলিত তদ্ভব শব্দগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রে সাধুভাষায়ও ব্যবহৃত হয়। কিন্তু বিভিন্ন আঞ্চলিক উপভাষা ও বিভাষায় প্রচলিত অসংখ্য খাঁটি তদ্ভব ও কিছু অর্ধতৎসম শব্দ যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও চিরকাল অবহেলিত হ'য়ে আসছে। ফলতঃ বাঙলা শব্দভাণ্ডার অকারণে তার প্রাপ্য সমৃদ্ধি থেকে বঞ্চিত হ'য়ে রয়েছে। এ জাতীয় শব্দগুলির মধ্যে রয়েছে ঃ—আইছাল, আইশটাল (<আমিষতাল = এ'টোকাঁটা ফেলবার আস্তাকুঁড়), আজিমা (<আর্যিকা-মাতা = মাতামহী), আলুম্বা, আলধুনা (<অলন্ধুম = ঝুল), উবার (<উর্ধ্বাগার = উচ্চ মাচা), উরস (<উদ্দংশ = ছারপোকা), খাড় (<খণ্ড = গুড়), গান্দা (<গন্ধ = পচাবাসি অর্থে গন্ধযুক্ত), ছেপ (<ক্ষেপ = থুতু), জাম্বুরা (<জম্বীর

=বাতাবী লেবু), জেওয়াস (<জ্যেষ্ঠশাস=বড়শ্যালিকা), দোনা (<দ্রোণ / < দোহন=দোহনপাত্র), ননাস (<ননদশাস=বড় ননদ), নায়র (<জ্ঞাতিগৃহ= কুটুম্বিনী), পতাপর (<প্রভাত প্রহর), প্যাকনা (<ব্যাখ্যানা=বাজে আব্দার), বরই (<বদরী=কুল), বয়রা (<বধির ঃ কানে কালা), ভোগাচানি (<*বুভুক্ষাচ্ছন্ন= অতিশয় ক্ষুধাপীড়িত), মাইচ্যা (<মঞ্চিকা=চেয়ার), মোচ (<শ্মশ্রু), লেঞ্জুয়া (<লঞ্জ+উয়া=ভাম), শিঙ্গারা (<শৃঙ্গাটক=পানিফল), হাচান (<সঞ্চান= বাজপাখি), হালট (<হলবর্ত্ম=মেঠোপথ), হাঞ্জুর (<সম্+√যুজ্+√কৃ= একত্রীভূত ক'রে)।

(২) **তৎসম (Tatsama) শব্দ** ঃ তদ্ভব শব্দগুলোই বাঙলার মূল শব্দভাণ্ডার গড়ে তুললেও কালে কালে তৎসম শব্দের ব্যবহার-প্রবণতা তদ্ভবকে ছাড়িয়ে গেছে। তৎসম শব্দের অনুপ্রবেশ বাঙলা ভাষার আদিস্তরেই শুরু হ'য়েছিল। চর্যাপদের মোট ২০০০ শব্দের মধ্যে প্রকৃত তৎসম শব্দ মাত্র ১০০, অর্থাৎ শতকরা ৫ টি মাত্র; শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে তৎসম শব্দের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে শতকরা ১২·৫। উনিশ শতকে পাণ্ডিতী প্রভাবের ফলে, বিশেষতঃ সাধু গদ্যে এর পরিমাণ দাঁড়ায় ৫২ শতাংশ। উচ্চতর জীবন-সম্পর্কিত ধ্যান-ধারণা, জ্ঞান-বিজ্ঞান আদি বিষয়-বৈচিত্র্য প্রকাশে সংস্কৃত শব্দসম্পদ বাঙলার পক্ষে অপরিহার্য হ'য়ে উঠেছে; বিশেষতঃ সংস্কৃত ব্যাকরণের কল্যাণে সংস্কৃত শব্দের ব্যুৎপত্তি সুনির্দিষ্ট থাকায় নোতুন শব্দ-গঠন-পদ্ধতিও বাঙলায় সহজসাধ্য প্রক্রিয়া বলে গ্রাহ্য হয়ে উঠেছে। [এই অনুচ্ছেদে ১০০টি শব্দ আছে, তার মধ্যে ১টি বিদেশি, ২৫টি তদ্ভব, ১টি মিশ্র এবং অবশিষ্ট ৭৩টি শব্দই তৎসম।]

যে সকল শব্দ সংস্কৃত থেকে অপরিবর্তিতভাবে বাঙলায় গৃহীত হ'য়েছে সে-গুলোকে বলা চলে 'প্রকৃত তৎসম'।—পিতা, অন্ন, ভূমি। বাঙলা ভাষায় এমন অনেক তৎসম শব্দ ব্যবহৃত হয়, যেগুলো বানানে সংস্কৃত হ'লেও উচ্চারণের দিক থেকে প্রাকৃত বা বিকৃত, এগুলোও তৎসম-পর্যায়ভুক্ত; কিন্তু এদের উচ্চারণ-বিকৃতি লক্ষ্য ক'রে কেউ কেউ এদের 'বিকৃত তৎসম' আখ্যা দিয়ে থাকেন।—কৃষ্ণ (ক্রিশ্‌নে), সহ্য (শোজ্‌ঝ), জ্ঞান (গ্যাঁন) প্রভৃতি। কথ্য সংস্কৃতে প্রয়োগ ছিল অথচ ব্যাকরণ-অভিধানে সমর্থন নেই, এমন কিছু কিছু শব্দের সন্ধান পাওয়া যায়, এদের বলা চলে 'অসিদ্ধ তৎসম'।—'অন্ধল, কৃষাণ, নবল' প্রভৃতি। সাধু এবং চলিত বাঙলায় তৎসম ও তদ্ভব —উভয় রূপেই প্রতীয়মান হয় অথচ ধ্বনিপরিবর্তন-সূত্রে এদের কোন পরিবর্তন প্রত্যাশিত নয়, এমন সব শব্দকে 'প্রতীয়মান তৎসম' শব্দ বলা চলে।—'জল, রস, দশ, বন' প্রভৃতি।

এদের নামের ক্ষেত্রে 'তৎসম' শব্দটির পূর্বে বিভিন্ন বিশেষণ যুক্ত হ'লেও সাধারণ-ভাবে পূর্বোক্ত যাবতীয় শব্দকেই 'তৎসম' রূপে অভিহিত করা হয়। একালে জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসারহেতু এবং পারিভাষিক প্রয়োজনে বহু নোতুন শব্দ সৃষ্ট হ'চ্ছে, সেগুলি সংস্কৃত ব্যাকরণ মতে সিদ্ধ। এ জাতীয় পারিভাষিক অথবা নবসৃষ্ট শব্দ, কখনো বা 'অনূদিত ঋণ' (translation lone-word) শব্দগুলোকেও 'তৎসম'-রূপে স্বীকার না করবার কোন হেতু নেই।—'বিশ্ববিদ্যালয়, শীর্ষ সম্মেলন, গলবন্ধ, অধ্যাদেশ, অনুদান, অর্পিনিহিতি, অভিশ্রুতি' প্রভৃতি।

(৩) **অর্ধ তৎসম / ভগ্ন তৎসম (Semi-Tatsama) শব্দ ঃ** যে সকল শব্দ সংস্কৃত ভাষা থেকে সরাসরি বাঙলা ভাষায় গ্রহণ করা হ'য়েছে, অথচ শব্দগুলো কালোচিত বিকৃতি প্রাপ্ত হয়েছে, তেমন শব্দগুলোকে 'অর্ধ তৎসম শব্দ' বা 'ভগ্ন তৎসম' (Semi-Tatsama) শব্দ বলা হয়।—কৃষ্ণ>কেষ্ট, গৃহিণী>গিন্নি, চন্দ্র>চন্দর, নিমন্ত্রণ> নেমন্তন্ন, কৃপণ কেপ্পন, বিশ্রী>বিচ্ছিরি।

তদ্ভব এবং অর্ধতৎসম—উভয়ই সংস্কৃত থেকে আগত এবং কালোচিত বিকৃতিপ্রাপ্ত, পার্থক্য এই - তদ্ভব শব্দগুলো প্রাকৃত স্তরেই বিকৃত হ'য়েছিল, তারপর আরও বিকৃতি নিয়ে বাঙলায় আসে, কিন্তু অর্ধতৎসম শব্দ সংস্কৃত থেকে অবিকৃতভাবে বাঙলায় আসবার পর বিকৃতি প্রাপ্ত হয়েছে ; তদ্ভব শব্দ, প্রাকৃত মাধ্যমে আগত, অর্ধতৎসম সরাসরি সংস্কৃত থেকে বাঙলায় প্রাপ্ত। একই শব্দের দ্বিবিধ রূপও বাঙলায় যথেষ্ট প্রচলিত আছে।—(বন্ধনীর মধ্যে তদ্ভব রূপ)—কৃষ্ণ>কেষ্ট (কানু), গৃহিণী> গিন্নি (ঘরণী), চন্দ্র>চন্দর (চাঁদ), বৈদ্য>বদ্দি (বেজ), রাত্রি>রাত্তির (রাতি)। তৎসম শব্দ থেকে সরাসরি উৎপন্ন শব্দগুলি অর্ধতৎসম।

অনেক সময় একই শব্দের একই গোত্রজাত কিংবা পৃথক্ গোত্রজ একাধিক রূপ একই অর্থে অথবা ভিন্নার্থে প্রচলিত আছে।—শ্রদ্ধা>ছেদ্দা, সাধ ; কক্ষ>কাঁখ, কাছ ; ক্ষার>ছার, খার ; ঘটিকা>ঘড়ি, ঘটি। প্রাচীন পারশিক ভাষা ছিল প্রাচীন ভারতীয় ভাষার সহোদরাস্থানীয়া, উভয় ভাষায় শব্দসাদৃশ্যও ছিল বিস্তর। মূলতঃ একই ভাষার দ্বিবিধ রূপ বাঙলা ভাষায়ও প্রচলিত আছে।—(প্রথমটি ভারতীয়, দ্বিতীয়টি ফারসি)— মিত্র, মিহির ; চিত্র, চেহারা ; বাহু, বাজু ; নমস্, নমাজ ; স্বধা, খোদা ; রোচস্, রোজ ; দেব, দেও।

বাঙলা সাধু ভাষায় অর্ধ তৎসম শব্দের ব্যবহার প্রায় নিষিদ্ধ হলেও কথ্যভাষায়, বিশেষতঃ নারীজনোচিত ভাষায় এর বহুল ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়।—ধাষ্টামো,

পেল্লায়, বোষ্টম, গেরাজ্জি, সোমত্ত, আদিখ্যেতা, হতচ্ছেদ্দা, সোয়ামী, হেনস্থা, ধন্যি, হাপিত্যেশ (<হতপ্রত্যাশা), জগাখিচুড়ি (<যজ্ঞ কৃশরিকা), ছছল-বছল (স্বচ্ছল-বৎসল) প্রভৃতি।

[দুই] আগন্তুক/কৃতঋণ (Borrowed) শব্দ

বাঙলা ভাষায় গৃহীত যে সকল শব্দ সংস্কৃত থেকে সরাসরি অথবা প্রাকৃত মাধ্যমে গ্রহণ করা হ'য়েছে, তদতিরিক্ত সমস্ত শব্দকেই 'আগন্তুক শব্দ' কিংবা 'কৃতঋণ শব্দ' বলে অভিহিত করা হয়। আর্য ভাষা-বহির্ভূত অথবা ভিন্ন গোত্রজ আর্যভাষা (গ্রীক, পারশিক)-থেকে যে সকল শব্দ সংস্কৃতে গৃহীত হ'বার পর কালোচিত পরিবর্তন সহ বাঙলা ভাষায় স্থান পেয়েছে, তাদের আর আগন্তুক বলা হয় না ; সেগুলি তৎসম (কম্বল, ময়ূর) কিংবা তদ্ভব (ঘোড়া, পুঁথি, ডিম) শব্দরূপেই বাঙলায় বিবেচিত হ'য়ে থাকে। ঐ সকল ভাষা থেকে যে সকল শব্দ সরাসরি বাঙলা ভাষায় গৃহীত হ'য়েছে, তাদেরই শুধু 'আগন্তুক শব্দ' বলা হয়। বাঙলায় তিন জাতীয় শব্দ এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত—(১) দেশি (২) বিদেশি, (৩) প্রাদেশিক।

(১) **দেশি (Desi) শব্দ ঃ** ভারতের অধিবাসীদের একটা বৃহদংশ কোন আর্য-ভাষায় কথা বলে না ; আর্যদের পূর্বেই তারা ভারতে এসেছিল নিজেদের ভাষা নিয়ে—এদের মধ্যে প্রধান দু'টি গোষ্ঠী 'দ্রাবিড়' এবং 'নিষাদ' বা 'অস্ট্রীক' গোষ্ঠী। এদের ভাষা থেকে যে সকল শব্দ আমরা বিভিন্ন ভারতীয় আর্যভাষায় গ্রহণ করেছি, তাদেরই বলা হয় 'দেশি শব্দ'। পূর্বে এ ধরনের শব্দের উৎপত্তি জানা না থাকায় এদের 'অজ্ঞাতমূল' শব্দরূপে বিবেচনা করা হ'তো ; কিন্তু বর্তমানে ভাষাতাত্ত্বিক গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে, এদের অধিকাংশই 'অনার্যমূল' তথা 'প্রাগার্যমূল', কিছু বা এখনো অজ্ঞাতমূল। অতি প্রাচীনকালেই এ সমস্ত ভাষা থেকে অনেক শব্দ সংস্কৃত ভাষায় গৃহীত হ'য়ে তৎসম শব্দের মর্যাদা লাভ করেছে। এ ছাড়াও অনেক শব্দই সরাসরি ঐ সমস্ত ভাষা থেকে বাঙলা ভাষায় স্থান পেয়েছে, এগুলোই প্রকৃত দেশি শব্দ।

দ্রাবিড় ভাষা থেকে সরাসরি আগত ঃ ইড্‌লি, চেট্টি, চুরুট, আকাল, দোসা, তামিল।

অস্ট্রীক/নিষাদ ভাষা থেকে সরাসরি আগত ঃ উচ্ছে, ঝিঙা, খোকা, খড়, ডিঙ্গা, ঢেঁকি, মুড়ি, চুলা, ঠোঙা, তোতলা, খুঁটি, ঢেঙ্গা, ঢিল, ডোঙ্গা।

পূর্বকথিত দ্রাবিড়-অস্ট্রীক ব্যতীত অপর একটি অনার্য ভাষাগোষ্ঠীও প্রাচীন ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে বসতি স্থাপন করেছিল, তবে এরা সম্ভবতঃ আর্যদের পরে

আসে—এদের বলা হয় 'কিরাত বা ভোট-বর্মী গোষ্ঠী'। এই গোষ্ঠীরও কিছু কিছু শব্দ সংস্কৃতে তৎসম শব্দরূপে গৃহীত হয়,—'সিন্দুর (সিঁদুর=তদ্ভব শব্দ), কীচক ম্লেচ্ছ, তসর' প্রভৃতি। ভোট-বর্মী ভাষা থেকে সরাসরি দেশি শব্দরূপে বাঙলায় এসেছে—লুঙ্গী, ফুঙ্গী, লামা, এ্যাম্পি প্রভৃতি।

(২) **বিদেশি (Foreign/Bideshi) শব্দ** ঃ আগন্তুক শ্রেণীর অপর একটি প্রধান শাখায় আছে বিদেশি শব্দ। বিদেশি শব্দ নানা জাতীয়। প্রাচীন গ্রীক ও পারশিক ভাষার কিছু শব্দ প্রাচীন কালেই সংস্কৃত ভাষার অঙ্গীভূত হয়েছিল, তাদের কোন কোনটির তদ্ভবরূপও বাঙলায় প্রচলিত আছে। প্রায় হাজার বছর আগে তুর্কী-মুঘল-জাতীয় মুসলমানেরা ভারতে আসে, তাদের সঙ্গে আসে ফারসি ভাষা এবং ফারসি মাধ্যমে বহু আরবী ও অল্প কিছু তুর্কী শব্দ। দীর্ঘ ব্যবহারে এদের অনেকগুলোই বাঙলা ভাষার দেহে এমনভাবে মিশে গেছে যে, এদের আর বিদেশি বলে চেনবার উপায় নেই। এদের কিছু কিছু শব্দ আমাদের দৈনন্দিন জীবনে এমন ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে যে এদের বাদ দিলে আমাদের বহু ভাবই অকথিত থেকে যাবে।

ফারসি শব্দ ঃ—হাওয়া, রোজ, হপ্তা, উকিল, জমি, মজুর, আন্দাজ, জাহাজ, পেয়ালা, খুব, জোর, দুরবীন, সিন্দুক প্রভৃতি।

আরবী শব্দ (ফারসি মাধ্যমে) ঃ আইন, আক্কেল, কেচ্ছা, কিতাব, জেলা, কলম, তাজ্জব, বিদায়, নিক্তি, কচলানো, মোক্ষম প্রভৃতি।

তুর্কীশব্দ (ফারসি মাধ্যমে) ঃ চাকু, তকমা, বাহাদুর, চিঠি, বোচকা, আলখাল্লা, কাঁচি, কুলী, উর্দু, মুচলেকা, বিবি, বেগম, উজবুগ, গালিচা, দারোগা প্রভৃতি।

কিছু কিছু ফারসি উপসর্গ-প্রত্যয়ও বাঙলা ভাষার সমৃদ্ধি সাধন করেছে।

উপসর্গ ঃ—'গর-, ফি-, বে-' প্রভৃতি

প্রত্যয় ঃ— -আনা,-গিরি, -দার প্রভৃতি।

আড়াই হাজারের উপর ফারসি ও ফারসি-মাধ্যমে আগত আরবী ও তুর্কী শব্দ বাঙলা শব্দভাণ্ডারের একটা বৃহৎ অংশ জুড়ে আছে।

ইন্দো-য়ুরোপীয় গোষ্ঠীর অনেক শব্দই বিদেশি শব্দরূপে কালক্রমে বাঙলা ভাষার শ্রীবৃদ্ধি সাধন বরেছে। কালের দিক থেকে এদের মধ্যে প্রথম বোধ হয় পর্তুগীজ ভাষা। নোতুন বস্তুর কিংবা নবসংস্কৃতির পরিচায়ক শব্দই এদের মধ্যে প্রধান। এরকম বেশ কিছু শব্দ বাঙলা ভাষার ধ্বনিপ্রকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্যবিধান করে বাঙলায় কিছুটা পরিবর্তিতরূপে এমনভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে যে অনেক সময় এদের বিদেশি বলে

চেনাই যায় না। এদের মধ্যে আছে—আতা, আনারস (ananas), আল্‌পিন (alfinete) আলমারি (armario), কেরানি, চাবি (chave), কপি (couve), আলকাতরা (alcatrão), তোয়ালে (toalha), জানালা (janella), কাবার (acabar), তিজেল (tigela), বোতল (botelha), বালতি (bulde), কামরা (camara), ইস্ত্রি (estiror) বেহালা (viola), পাঁউ (রুটি) (rão), পেঁপে (papain), ফিতা (fita), মিস্ত্রি (mistri), গামলা (gamlha), সাবান (sabão) প্রভৃতি।

তাস খেলার অল্প কয়টা শব্দ ওলন্দাজ ভাষা থেকে এসেছে। এদের মধ্যে আছে—রুহিতন (ruiten), হরতন (harten), ইস্কাবন (schopen), তুরুপ (troef) (তাস খেলার 'চিরুতন' শব্দটি কিন্তু দেশোদ্ভব শব্দ); এ ছাড়া আছে—পিস্‌পাস্‌ (pœspas) ইস্‌ক্রুপ (schroef), বোম (boom), (=গাড়ির দণ্ড)।

ফরাসীরাও এদেশে উপনিবেশ স্থাপন করায় কয়েকটি ফরাসী শব্দ বাঙলায় এসে গেছে। এদের মধ্যে আছে—আংরেজ (anglais), কার্তুজ (cartouche), কুপন (coupon), রেস্তোরাঁ (restaurant), কাফে, রেনেশাঁস (renaissance), প্রলিটারিয়েট, বুর্জোয়া (bourgeois), কু-দে-তা (coup-de-tat), এলিট, আঁতাত (entete), ম্যাটিনি, বিস্কুট প্রভৃতি।

দীর্ঘকাল ইংরেজ শাসনে থাকবার ফলে এবং ইংরেজি ভাষাকেই উচ্চশিক্ষার মাধ্যমরূপে গ্রহণ করবার ফলে অপর কোন বিদেশি ভাষা অপেক্ষা ইংরেজি ভাষার প্রভাবই যে সর্বাধিক হবে, এটাই স্বাভাবিক। শাসন-সংক্রান্ত ব্যাপারে নোতুন বস্তুর আগমনে এবং নোতুন ভাবধারা, শিক্ষা-সংস্কৃতি ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসারের ফলে ঐ জাতীয় বিভিন্ন শব্দের সমারোহ দেখা যায় বাঙ্‌লা ভাষায়।—অফিস, আর্দালী, কোর্ট, জজ, শমন, কাপ, ডিস, সাইকেল, টেলিফোন, স্কুল, কলেজ সিনেমা প্রভৃতি।

ইংরেজি শব্দগুলো বাঙলায় এসেছে প্রধানতঃ দু'ভাবে। কতক অবিকৃত রূপে—লেক্‌চার, কার্পেট, হকি, চেয়ার, ট্রে। কতক ইংরেজি শব্দ বাঙ্‌লা ধ্বনিপ্রকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করতে গিয়ে এমনভাবে পরিবর্তিত হয়েছে যে এদের ইংরেজি বলে চেনাই যায় না, এদের 'ইংরেজি তদ্ভব' শব্দ বলে অভিহিত করলে মন্দ হয় না। লাট (Lord), কার (Cord), লণ্ঠন (Lantern), সান্ত্রী (Sentry), জাঁদরেল (General), রোঁদ (Round), মেম (Madam), ডাক্তার (Doctor), কৌঁসুলি (Counsel) প্রভৃতি। কিছু ইংরেজি শব্দ বাঙলায় উপসর্গ রূপেও ব্যবহৃত হয়। 'হেড' পণ্ডিত', 'হাফ' হাতা, 'ফুল' হাতা প্রভৃতি।

এগুলো ছাড়াও অনেক বিদেশি ভাষার শব্দ ইংরেজি মাধ্যমে বাঙলায় এসেছে।

এদের মধ্যে আছে—রুশ ভাষার 'স্পুটনিক, ভদ্‌কা', জার্মান 'নাৎসি', ইতালীয় 'ম্যাজেণ্টা', 'ফ্যাসিস্ত', দক্ষিণ আফ্রিকার 'জেব্রা', অস্ট্রেলিয়ার 'ক্যাঙ্গারু', চীনা ভাষার 'চা, লিচু' জাপানী 'হারাকিরি, রিক্সা, জুজুৎসু', মালয়ী ভাষার 'গুদাম' প্রভৃতি।

(ক) **অনূদিত ঋণ** (Translated loan) **ইংরেজি-প্রভাবিত নবসৃষ্ট শব্দ**ঃ বেশ কিছু ইংরেজি শব্দকে বাঙলায় অনুবাদ করে ব্যবহার করা হয়, এদের বলা চলে 'অনূদিত ঋণ' (translated loan)। এই শব্দগুলোর অনেকগুলোই আকারে তৎসম, কিন্তু সংস্কৃত ব্যাকরণে-অভিধানে এদের স্থান নেই, কারণ এগুলো একালেই সৃষ্ট হয়েছে। আবার এদের অনেকগুলিই পারিভাষিক শব্দ (technical words)-রূপেও বিবেচ্য। বিশ্ববিদ্যালয় (University), অনুদান (grant), অধ্যাদেশ (Ordinance), পাদপ্রদীপ (Foot-light), মাতৃভূমি (Motherland), সংবাদপত্র (Newspaper), স্বর্ণযুগ (Golden age), সুবর্ণ সুযোগ (Golden opportunity), উড়ালপুল (Fly over), সান্ধ্য আইন (Curfew), সিংহভাগ (Lion's share), শীর্ষ সম্মেলন (Summit conference), উত্তমাশা অন্তরীপ (Cape of Good Hope) প্রভৃতি। তদ্ভব আকৃতিতেও কিছু কিছু শব্দ নেওয়া হ'য়েছে—'সাঁজোয়া গাড়ি (Armoured car), কাঁদানে গ্যাস (Tear gas), লাল ফিতার বাঁধন (Red tapism), ঝরনা কলম (Fountain pen), হাতঘড়ি (Wristwatch), বাতিঘর (light house)' প্রভৃতি।

(৩) **প্রাদেশিক শব্দ**ঃ বাঙলা ভাষার মতই প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা থেকে মধ্যভারতীয় আর্যভাষা মাধ্যমে উদ্ভূত ভারতীয় বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষার কিছু কিছু শব্দও বাঙলা ভাষায় গৃহীত হয়েছে। এগুলোও আগন্তুক বা কৃতঋণ শব্দের অন্তর্ভুক্ত। হিন্দী থেকে—কুত্তা, পানি, মিঠাই, কালোয়াতি, আভিছোড়ো, লাগাতার, বন্ধু, কচুরি, ঝাণ্ডা, সমঝোতা, খতম, জলদি, বদলা প্রভৃতি। গুজরাটি থেকে—হরতাল (< হড়তাল = হাটে তালা), গরবা, খাদি, তকলি প্রভৃতি। মারাঠী থেকে—বর্গীর, পাটীল। পাঞ্জাবী থেকে—শিখ, চাহিদা প্রভৃতি।

[তিন] পরিভাষা (Technical Terms)

কোন বস্তু, বিষয় বা ভাবের পরিচায়ক অনন্যার্থবোধক শব্দ বা প্রতিশব্দকে 'পরিভাষা' বা 'পারিভাষিক শব্দ' (Technical term) বলা হয়। এই পারিভাষিক শব্দের ব্যুৎপত্তিগত কিংবা প্রয়োগ-গত অর্থ ভিন্ন প্রকার হলেও যখন কোন 'পরিভাষা'-রূপে এর প্রয়োগ করা হয়, তখন শুধু তার নির্দিষ্ট অর্থটিই বোঝাবে, অপর কোন

অর্থ নয়। যেমন 'পদ' শব্দের নানাবিধ অর্থ এবং প্রয়োগ আছে, কিন্তু যখন তাকে ব্যাকরণে পরিভাষারূপে ব্যবহার করা হয়, তখন শুধু 'বাক্যে ব্যবহারোপযোগী বিভক্তি-যুক্ত শব্দকে'ই বোঝাবে, অপর কিছুকেই নয়। রসায়ন বিজ্ঞানে যে মৌল বস্তুটির পরমাণু অংক (Atomic number) ১ এবং পরমাণুভার (Atomic weight) ১·০০৮, তার পারিভাষিক নাম 'হাইড্রোজেন' (Hydrogen) এবং রাসায়নিক চিহ্ন 'H' —এই মৌলবস্তুটি শুধু এই পারিভাষিক নামেই পরিচিত হ'বে এবং এই নামটি দ্বারা অপর কোন বস্তুকেই বোঝাবে না। যথার্থ পরিভাষা এরূপ হওয়াই আবশ্যক।

সভ্যতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানের জগৎ এবং ভাবের জগতে বিস্তর উন্নতি সাধিত হ'য়ে চলছে এবং সেই নিত্য নোতুন বস্তু, বিষয় ও ভাব আবিষ্কৃত হ'চ্ছে। তাদের পরিচিতির জন্য যথোপযুক্ত সংজ্ঞা বা অভিধার প্রয়োজন। একই বস্তুকে যদি বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন নামে অভিহিত করে, তবে বস্তুর পরিচিতি নিয়ে অচিরেই সমস্যার উদ্ভব ঘট্‌বে। এইজন্যই বস্তুটির এমন একটি পরিচায়ক নাম আবশ্যক, যা অপর সকলেও মেনে নেবে। এইভাবেই বিভিন্ন পারিভাষিক শব্দ বা পরিভাষা সৃষ্টি হ'য়ে থাকে। সাধারণতঃ বস্তু বা ভাবের প্রথম যিনি স্রষ্টা বা আবিষ্কর্তা তিনিই তার একটা যোগ্য নাম নির্বাচন ক'রে থাকেন, কখনো বা পরবর্তীকালের কোন সুধী ব্যক্তি কিংবা সংসদ্‌ বা পর্ষদ্‌ সেই বস্তু বা ভাবের একটা যথোচিত পারিভাষিক নাম স্থির করেন, যা' অপর সকলে মেনে নিতে পারে। কখনো কখনো, সম্ভবপর ক্ষেত্রে বিষয় বা ভাবের নামের সঙ্গে তার অর্থগত সাদৃশ্য থাকতে পারে অর্থাৎ ব্যুৎপত্তি বিচারেও পরিভাষাটি সার্থকনামা হ'তে পারে, আবার অনেক সময় ব্যুৎপত্তিগত অর্থের সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নাও থাকতে পারে। যেমন—'Thermometer' যন্ত্রের সাহায্যে দেহের তাপ মাপা হয়। শব্দটির মধ্যে দুটো ভাগ—'Thermos'—অর্থ 'তাপ' (মূল অর্থ অবশ্য ঘর্ম) এবং 'meter'—অর্থ 'মাপক' অর্থাৎ যার সাহায্যে মাপা যায়। কাজেই 'Thermometer' পারিভাষিক শব্দটির দ্বারা বস্তুটির স্বরূপও মোটামুটি বোঝা যায়। বাঙলা পরিভাষা 'তাপমানযন্ত্র' সম্বন্ধেও একই কথা প্রযোজ্য, কিন্তু একটা বৈদ্যুতিক আলোর বাল্‌বের (bulb) শক্তি যখন বলা হয় ১০০ watt/wattage, তখন এই 'ওয়াট' বা 'ওয়াটেজ' বল্লে ব্যুৎপত্তিগতভাবে তার কোন গুণ বা ধর্ম প্রকাশ পায় না ; কারণ watt শব্দটি গ্রহণ করা হয়েছে এঁর আবিষ্কর্তা Watt-এর নাম থেকে। তেমনি (<Volta, Ohm, Ampere, Farad প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকের নামকে স্মরণীয় করে রাখবার জন্যই তাদের আবিষ্কৃত বস্তুকে voltage, ohm, ampere, farad প্রভৃতি পারিভাষিক নাম দান করা হ'য়েছে।

বাঙলা ভাষার ক্ষেত্রে পরিভাষার একটা স্বতন্ত্র সমস্যা রয়েছে। বাঙলায় প্রকৃতপক্ষে 'পারিভাষিক শব্দ' নয়, 'পারিভাষিক প্রতিশব্দ' সৃষ্টিই হ'লো যথার্থ বিষয়। কারণ, একালে জ্ঞান-বিজ্ঞানে প্রাগ্রসর জাতি বল্‌তে পাশ্চাত্ত্য জগতেরই একাধিপত্য। জ্ঞান-বিজ্ঞানের জগৎ কিংবা ভাবের জগৎ—সর্বত্রই তারা উত্তমর্ণ; তাদের আহৃত জ্ঞান-বিজ্ঞান-ভাবের বিষয়কে আমরা অধমর্ণ-রূপেই গ্রহণ করছি। কিন্তু নিত্যনোতুন আবিষ্ক্রিয়াকে তারা তাদের ভাষায় যেভাবে স্বচ্ছন্দে প্রকাশ ক'রে যাচ্ছেন, তাদের বাঙলায় ভাষান্তরিত করতে গিয়ে আমরা কিন্তু অনুরূপ স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করিনে, কারণ আমাদের ভাষায় তদনুরূপ ভাবপ্রকাশের উপযোগী যথেষ্ট শব্দসম্পদ নেই। অর্থাৎ পাশ্চাত্ত্যের বিভিন্ন ভাষায়, বিশেষতঃ ইংরেজি ভাষায় নব্যাবিষ্কৃত বিষয়, বস্তু বা ভাবের যে পরিভাষা (Technical term) সৃষ্টি করা হয়েছে, সেই পরিভাষার যথার্থ প্রতিশব্দই আমাদের বিড়ম্বনার কারণ।

পরিভাষা-বিষয়ে ভাবনা-চিন্তা শুরু হ'য়েছিল আমাদের দেশে বিগত শতাব্দীতেই। প্রথমেই এ বিষয়টি নিয়ে যাঁরা প্রত্যক্ষভাবে ভাবনা-চিন্তা করেছেন, তেমন কোন কোন মনীষীদের কয়েকটি অভিমত উল্লেখ করছি। আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ১৩০১ বঙ্গাব্দের (১৮৯৪ খ্রীঃ) 'সাহিত্য পরিষৎ' পত্রিকায় 'পরিভাষা'-বিষয়ক অনেকগুলি প্রবন্ধ রচনা করেছেন। 'বৈজ্ঞানিক পরিভাষা' নামক প্রবন্ধে বলেন: "ইংরেজী শব্দের অনুবাদ বা রূপান্তরদান না করিয়া উহাদিগকে অবিকল গ্রহণ করিতে পারা যায় কিনা, এইকথা প্রথমে বিবেচ্য। সর্বত্র এই ব্যাপার সাধ্য হইলে পরিভাষা-প্রণয়নে চিন্তা করিবার কিছু থাকিত না। কিন্তু সর্বত্র ইহা সাধ্য নহে, কর্তব্যও নহে।...ইংরেজী শিল্পের ও ইংরেজী বিজ্ঞানের বিস্তারের সহিত অনেক ইংরেজী শব্দ আমাদের দেশে লোকমুখে প্রচলিত হইয়া গিয়াছে ও ভাষার মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। টেবিল চেয়ার...প্রভৃতি নিত্যব্যবহার্য বস্তুর মত, কোর্ট আপীল পুলিস প্রভৃতি বিলাত হইতে আমদানি পদার্থের মত,...মিনিট, সেকেণ্ড, ডিগ্রি প্রভৃতি ইংরেজী শব্দ এখন আমাদের আত্মীয় হইয়া পড়িয়াছে। ইহাদের সবগুলি এখনও আমাদের মাতৃভাষার সহিত সম্পূর্ণভাবে মিশিয়া যায় নাই; কালে মিশিয়া যাইবে।...তবে সর্বত্র ঋণ গ্রহণে প্রয়োজন নাই। আমাদের প্রাচীন সংস্কৃত ভাষা রত্নগর্ভা। ঐ অনন্ত আকর হইতে যথেচ্ছ পরিমাণে চিরদিন ধরিয়া রত্ন সংগ্রহ করিলেও এই ভাণ্ডার শূন্য হইবার নয়।...সুতরাং আমরা নিশ্চিন্তভাবে দ্বিধাহীন হইয়া সংস্কৃত শব্দ গ্রহণ করিয়া বিজ্ঞানের ভাষা পুষ্ট করিতে পারি। কিন্তু এইখানে আর একটি কথা আছে। বিশুদ্ধ সংস্কৃতের পাশে খাঁটি প্রচলিত বাঙ্গালা কখন কখন আসিয়া দাঁড়ায়। সেই খাঁটি চলিত বাঙ্গালার দাবি কতক-

পরিমাণে আমাদিগকে রক্ষা করিতেই হইবে।" কিঞ্চিৎ পরবর্তীকালে ১৯১৫ খ্রীঃ বয়োজ্যেষ্ঠ মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কিন্তু পরিভাষার ব্যাপারে আরও উদার মতবাদের পরিচয় দিয়েছেন। তিনি বলেছেন ঃ "আমি বলি, যাহা চল্‌তি- সকলে বুঝে—তাহাই চালাও, যাহা চল্‌তি নয় তাহাকে আনিও না। যাহা চলতি তাহা ইংরেজীই হউক, পারসীই হউক, সংস্কৃতই হউক—চলুক। তাহাকে বদলাইয়া শুদ্ধ সংস্কৃত করিবার দরকার নাই।" মহামহোপাধ্যায় আরো বলেন ঃ "এখন সোজা বাংলায়, সোজা কথায় ঃ—নূতন জিনিসের নাম দেওয়া ও নূতন ভাব প্রকাশ করিবার চেষ্টা করা উচিত, নহিলে কতকগুলো দাঁত ভাঙ্গা কটকটে শব্দ তৈয়ার করিয়া লইলে ভাষার সঙ্গে তাহা খাপ খাইবে না।- যে দিকেই হউক, ভাষা লইয়া স্বেচ্ছাচারিতা করাটা ঠিক নয়।"

উপর্যুক্ত মনীষীরা যখন উক্ত মতামত প্রকাশ করেছেন, তখন ভারত ছিল পরাধীন, আমাদের সামগ্রিক শিক্ষা-ব্যবস্থার মাধ্যমই ছিল ইংরেজি ভাষা। কাজেই জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোচনা প্রধানতঃ ইংরেজি ভাষাতেই সম্পন্ন হ'তো, তাই পরিভাষা-সমস্যাটা তখনো খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। তৎসত্ত্বেও কোন কোন মনীষী বিষয়টি নিয়ে যথেষ্ট মনস্কতার পরিচয় দিয়েছেন। এক্ষণে বাঙলাই আমাদের শিক্ষার মাধ্যম বলে পরিভাষা-বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হ'চ্ছে। বিজ্ঞান-শিক্ষার উচ্চতম পর্যায়েও যিনি বাঙলা ভাষাকেই শিক্ষার মাধ্যম বলে মেনে আস্‌ছিলেন, তেমন একজন বিজ্ঞানাচার্যের অভিমত উদ্ধার করা হ'চ্ছে। আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু বলেন ঃ "গত দেড়শো বছর ধরে পরিভাষা রচনার চেষ্টা কম হয় নি। সেই মূলধন নিয়েই আপাততঃ কাজে লাগা যেতে পারে। তাছাড়া পরিভাষার উপর যতটা গুরুত্ব আরোপ করা হয় তার আদৌ কোন যুক্তি আছে কিনা ভেবে দেখা দরকার। পরিভাষা অনেকটা ধাতুর মত। তার ব্যুৎপত্তিগত অর্থের চেয়ে ব্যবহারিক অর্থই অধিক গণ্য। আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রয়োগবিদ্যা সম্পর্কে আমাদের জ্ঞানের অনেকাংশ পাশ্চাত্ত্য দেশ থেকে নেওয়া। তারা বৈজ্ঞানিক তথ্য, যন্ত্র বা ধারণাকে যে নামে চিহ্নিত করেছে, সেই তথ্য, যন্ত্র বা ধারণাকে আমরা সেই নাম সমেত গ্রহণ করেছি। সেই নামের প্রতিশব্দ সন্ধান করা অনেকটা টেলিফোনকে দূরভাষ যন্ত্র বলার মতই বাতুলতা। অপরের কাছ থেকে নেওয়া জিনিস অপরের দেওয়া নামেই ব্যবহার করা বাঞ্ছনীয়। বাংলা ভাষায় বিভিন্ন বিদ্যায় ও বৃত্তির নিয়মিত চর্চার ফলে বাংলা পরিভাষা যথাকালে দেখা দেবে। ততদিন পর্যন্ত ইংরেজী পরিভাষাকে অন্ত্যজ জ্ঞান করার কোন কারণ নেই। শেষ পর্যন্ত প্রচলিত ইংরেজী পরিভাষা যদি বাংলায় সাজবদল করে তাতে বাংলারই লাভ। কোন ভাষাই চারিদিকে

স্বাধীন ভারতে উচ্চতম শিক্ষা পর্যায়ে যখন মাতৃভাষাই শিক্ষার মাধ্যম-রূপে অঙ্গীকৃত হ'লো, তখন পুস্তক রচনার ক্ষেত্রে বাস্তব অবস্থার ক্ষেত্রে নানা গুণগত পরিবর্তন সাধিত হবার প্রয়োজনও দেখা দিল। পরিভাষা, বিশেষতঃ বৈজ্ঞানিক পরিভাষা-বিষয়টি নিয়ে সর্বভারতীয় বিদ্বৎ-মণ্ডলীই নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন হ'লেন। ফলে, স্থানীয় অর্থাৎ আঞ্চলিকভাবে যেমন, তেমনি কেন্দ্রীয়ভাবেও পরিভাষা সমস্যা-সমাধানে অনেকেই কৃতপ্রযত্ন হ'য়ে উঠ্‌লেন। তাত্ত্বিকভাবে এ বিষয়ে যিনি যতই সহজ সমাধানের কথা বলুন না কেন, বাস্তবে এর নানা দিক্ পর্যবেক্ষণের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। সমগ্র ভারতীয় আর্যভাষাগুলি একই মূল থেকে উৎপন্ন বলে পরিভাষার পরস্পর-বোধ্যতার প্রসঙ্গটি আর অবান্তর মনে হ'লো না। অতএব সংস্কৃতের দ্বারস্থ হওয়াই যে একমাত্র সমাধানের পথ, এ বিষয়ে আর কারো দ্বিধা রইলো না। অবশ্য সকল নিয়মেরই ব্যতিক্রম থাকে, এইক্ষেত্রেও ব্যতিক্রমকে স্বীকার করে নেওয়া হ'য়েছে। কোন কোন ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক পরিভাষাকেই যেমন যথাযথভাবে গ্রহণ করা হ'য়েছে, তেমনি সুবিধে মতো প্রচলিত আরবী-ফার্সী বা দেশি অথবা আঞ্চলিক ভাষার চলিত্ শব্দকেও মেনে নেওয়া হ'য়েছে।

১৮৩৪ খ্রীঃ শ্রীরামপুর কলেজের জন স্যাক্ Principles of Chemistry-র যে গৌড়ীয় সংস্করণ প্রকাশ করেন, তাতে রসায়ন শাস্ত্রের বাঙলা ভাষায় আলোচনা ছাড়াও পরিভাষা নির্দেশ করার চেষ্টা ছিল। বাঙলা পরিভাষা-রচনার সচেতন প্রচেষ্টার এটিই সম্ভবতঃ প্রথমতম নিদর্শন। ১৮৭৭ খ্রীঃ মনীষী রাজেন্দ্রলাল মিত্র রচনা করেন 'A Scheme for Rendering of European Scientific Terms into the Vernacular of India'—ভারতবাসীদের পক্ষ থেকে এ বিষয়ে একটি উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ। এরপর 'সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা' এ বিষয়ে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেন এবং ১৩০১ বঙ্গাব্দ (১৮৯৪ খ্রীঃ) থেকে দীর্ঘকাল যাবৎ পত্রিকা-পৃষ্ঠায় পরিভাষা-সঙ্কলন প্রকাশিত হ'তে থাকে। পরিষৎ কর্তৃপক্ষ ১৩১৩ বঙ্গাব্দে ভাষা বিজ্ঞান সমিতি, পরিভাষা সমিতি এবং শব্দ সমিতির একীকরণ সাধন ক'রে এক কেন্দ্রীয় সমিতি গঠন ক'রে তাদের হাতে পরিভাষা রচনা ও সঙ্কলনের দায়িত্ব অর্পণ করেন। ফলতঃ বিভিন্ন বিষয়ে বহু পরিভাষা সঙ্কলিত হয়। সমকালে অপরাপর সাময়িক পত্র, সমিতি এবং ব্যক্তিবিশেষও এ বিষয়ে উদ্যোগ নিয়েছিলেন। এই ভাবে দীর্ঘকালের প্রচেষ্টায় বাঙলা পরিভাষা-সঙ্কলনের কাজ এগিয়ে যেতে থাকে। স্বাধীনতা লাভের পর পশ্চিমবঙ্গ সরকারও এ বিষয়ে উদ্যোগী হ'য়ে বিশিষ্ট পণ্ডিত ব্যক্তি এবং বুদ্ধিজীবীদের নিয়ে একটি 'পরিভাষা সংসদ্' গঠন ক'রে দেন এবং এই সংসদ ১৯৪৮ খ্রীঃ 'সরকারী কার্যে ব্যবহার্য পরিভাষা' (১ম স্তবক) প্রকাশ করেন।

পরিভাষা-প্রণয়নে এই সংসদ যে মূলনীতি অবলম্বন করেছিলেন, কার্যত দেখা যায়, অনুরূপ-উদ্দেশ্যে গঠিত অপরাপর সংসদও—যেমন, অন্যান্য প্রাদেশিক সরকার-কর্তৃক কিংবা কেন্দ্রীয় সরকার-কর্তৃক গঠিত সংসদও মূলতঃ একই নীতি অনুসরণ করেছেন।—(১) পরিভাষা-রূপে গৃহীত শব্দগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সংস্কৃত-তৎসম শব্দ। এর স্বপক্ষে বড় যুক্তি এই—অপরেরা যদি এগুলি গ্রহণ না-ও করেন, তবে অন্ততঃ এগুলি তাদের নিকট বোধগম্য বিবেচিত হ'বে। দ্বিতীয় যুক্তি এই—সংস্কৃত ভাষার অসাধারণ সৃজনী-ক্ষমতা—যা বাঙলা, হিন্দী-আদি ভাষার নেই; যেমন, 'কৃ' ধাতুর সহায়তায় 'করণ করণিক, অধিকরণ, অধিকার, আধিকারিক, মহাকরণ অধিকর্তা' এবং এ জাতীয় আরও অসংখ্য শব্দ-রচনা সম্ভবপর। অপর প্রধান যুক্তি—সংস্কৃত পরিভাষা বাঙলা ভাষার সঙ্গে একেবারে খাপ খেয়ে যায়, কারণ অর্ধেকের বেশি বাঙলা শব্দই সংস্কৃত বা তৎসম, গুরু গম্ভীর আলোচনায় শতকরা হিশেব আরও বেশি। এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, ১৯৭০ খ্রীঃ বাঙলাদেশে (তখন ছিল পূর্ব পাকিস্থান) বাঙলা একাডেমী থেকে যে 'পরিভাষা কোষ' প্রকাশিত হয়, সেখানেও পরিভাষারূপে গ্রহণ করা হ'য়েছে সংস্কৃত শব্দ; আরবী বা ফারসী শব্দ প্রায় নেই বল্লেই চলে। (২) পরিভাষা-প্রণয়নের দ্বিতীয় নীতি হ'লোঃ বহু প্রচলিত বাঙলা শব্দ যথেষ্ট যুক্তিসঙ্গত কারণ না থাকলে বর্জন করা হয়নি; (৩) তৃতীয় নীতিটি এইঃ পরিভাষার সংক্ষিপ্ততা ও উচ্চারণ সৌকর্যের প্রতি দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। মোটামুটি এই আদর্শ সামনে রেখেই প্রথম পর্যায়ে পরিভাষা-প্রণয়ন এবং সঙ্কলনের কাজ এগিয়ে চলছিল।

যে কোন পরিভাষা-সঙ্কলককেই পরিভাষার উপযোগী শব্দ-নির্বাচন-বিষয়ে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়। এ বিষয়ে দীর্ঘকাল পূর্বে মনীষী আচার্য রামেন্দ্র-সুন্দর কয়েকটি নির্দেশ দান করেছিলেন। তিনি পারিভাষিকত্বের কয়টি লক্ষণ উল্লেখ করেছেনঃ "১। প্রত্যেক শব্দ একটি মাত্র অর্থে ব্যবহৃত হইবে; তাহার দ্বিতীয় অর্থ থাকিবে না। ২। এক অর্থে একটি মাত্র শব্দ প্রযুক্ত হইবে; দুই শব্দ একার্থবাচী হইবে না। ৩। প্রত্যেক শব্দ তাহার নির্দিষ্ট অর্থে সর্বদা প্রযুক্ত হইবে।"

শব্দ-বাছাই ব্যাপারে আচার্য ত্রিবেদী যথেষ্ট উদার মানসিকতারও পরিচয় দিয়েছেন। তিনি বলেনঃ "নূতন শব্দ সংকলনের সময় ব্যবহারে সুবিধা ও উপযোগিতার দিকে দৃষ্টি রাখা হয়। ব্যাকরণের দিকে ও ব্যুৎপত্তির দিকে তীক্ষ্ম দৃষ্টি রাখিতে গেলে কাজের ব্যাঘাত হয়। অনেক সময় অভিধান ছাড়া শব্দ সৃষ্টি করিতে হয়, অথবা আভিধানিক শব্দকে সুবিধামত কাটিয়া ছাঁটিয়া গ্রহণ করা হইয়া থাকে। ভাষা মূলে

সংকেতমাত্র, ইহা মনে রাখিলে এই বিষয়ে আপত্তির কোন সঙ্গত কারণ থাকিবে না। ব্যাকরণ শাস্ত্রে লট্ লোট্ লঙ্ লুঙ্ প্রভৃতি পারিভাষিক শব্দের দৃষ্টান্ত থাকিতে দৃষ্টান্তের অভাব হইবে না।"

একালে প্রধানতঃ বৈজ্ঞানিক পরিভাষাই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলে মনে হ'লেও অপরাপর নানা শাস্ত্র তথা বিষয়েই পরিভাষার প্রয়োজন চিরকাল অনুভূত হ'য়ে আসছে। প্রাচীন ভারতবর্ষে ব্যাকরণ, জ্যোতির্বিদ্যা, গণিত-আদির প্রয়োজনে যে অসংখ্য পরিভাষা সৃষ্টি করা হয়েছিল, আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর সুপ্রাচীন ব্রাহ্মণ গ্রন্থ থেকে আরম্ভ করে অপরাপর শাস্ত্রগ্রন্থ, চরক-সুশ্রুত-আদি বৈদ্যকশাস্ত্র, পাণিনীয় ব্যাকরণ, কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র প্রভৃতি গ্রন্থের অসংখ্য দৃষ্টান্ত আহরণ করেছেন, যেগুলি আমাদের একালের বিজ্ঞান-আদি গ্রন্থেও ব্যবহারের উপযোগী। তাদের মধ্যে এমন শব্দ আছে যেখানে শব্দ এবং অর্থের অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক বিদ্যমান, আবার এমন শব্দও আছে, যেগুলি অর্থহীন কতকগুলি সংকেতমাত্র—পাণিনির ব্যাকরণের সূত্রগুলিই ঐরূপ। প্রাচীন ভারতীয় আর্যগণ যে প্রয়োজনে ভিন্ন ভাষা থেকেও পরিভাষা গ্রহণে অকৃপণ ছিলেন, তারও দৃষ্টান্তের অভাব নেই। সংস্কৃত জ্যোতিষ শাস্ত্রে এরূপ প্রচুর গ্রীক শব্দ এখনো বর্তমান রয়েছে—'হেলি' (Helios), 'কোন' (kronos), 'আস্ফুজিৎ' (Aphredite), 'হোরা' (hora), 'কেন্দ্র' (kentron), 'আপোক্লিম' (apoklim), 'জামিত্র' (diametros) প্রভৃতি। লক্ষণীয় এই—এখানে কিছু শব্দ যেমন যথাযথভাবে গৃহীত হ'য়েছে তেমনি কিছু শব্দ সামান্য পরিবর্তন সহ গৃহীত হ'য়েছে—দেশীয় ভাষার সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধানের জন্য এর উপযোগিতা রয়েছে।

একালে প্রধানতঃ বৈজ্ঞানিক পরিভাষা ও সরকারী কার্যে ব্যবহৃত পরিভাষা-রূপে যে সকল শব্দ গ্রহণ করা হ'চ্ছে, তাদের একাংশ যথাযথ-রূপে কিংবা সামান্য ধ্বনি-পরিবর্তন রূপে গৃহীত হয়। যেমন—ডিগ্রি (degree), মিনিট (minute), বোল্টু (bolt), টেবিল (table), অক্সিজেন (oxygen) প্রভৃতি। কতকগুলি শব্দের প্রতিশব্দ প্রচলিত ভাষা থেকেই গ্রহণ করা হয়েছে। যেমন—'বস্তু (mass), পরকলা (lens), হাওয়া (wind), কাজ (work), টান (tension)' প্রভৃতি। বাংলায় সাম্প্রতিক কালে সাংবাদিকগণও আকস্মিক প্রয়োজনে দ্রুত কিছু অর্থবোধক পরিভাষা তৈরি ক'রে নেন, ক্রমে সেগুলিই ভাষায় প্রচলিত হয়ে যাচ্ছে—'সান্ধ্য আইন' (curfew), 'উড়ালপুল' (fly over), 'কাঁদানে গ্যাস' (tear gas), 'যানজট' (traffic jam) প্রভৃতি। তবে পরিভাষা-রূপে সর্বাধিক পরিচিত শব্দগুলি প্রায় সবই সংস্কৃত বা তৎসম শব্দ। এদের মধ্যে কিছু আছে প্রচলিত শব্দ সহযোগে তৈরি নবসৃষ্ট শব্দ, যেমন—'বিশ্ববিদ্যালয়'

(University), 'দূরবীক্ষণ' (Telescope), 'সমধ্বনিরেখা' (Isophone), 'স্বরসঙ্গীত' (vowel harmony), 'নিদানবিদ্যা' (Actiology) প্রভৃতি। প্রয়োজনে একেবারে যে নোতুন শব্দ সৃষ্টি হয়নি, তা' নয়। যেমন—'অপিনিহিতি' (Epenthesis), 'অভিশ্রুতি' (Umlaut), 'অপশ্রুতি' (Ablaut) প্রভৃতি। তবে অপর বিরাট সংখ্যক শব্দই প্রচলিত অথবা প্রাচীনতর গ্রন্থে প্রাপ্ত, একালে পরিভাষা রূপে প্রয়োগ করা হচ্ছে।—'অনুদান' (grant), 'অবর' (under), 'বরিষ্ঠ' (senior), 'আরক্ষা' (police) 'অধ্যাদেশ' (ordinance), 'আয়োগ' (commission), 'যোজনা' (planning), নভশ্চর/মহাকাশচারী' (Astronaut)।

পরিভাষা-সংকলনের ব্যাপারে যে নির্দেশিকা সরকারী বাঙলা পরিভাষা উপসমিতি ৯/৮/৮৫ তাং প্রচার করেছিলেন সেই নির্দেশনামাটি নিম্নে প্রদত্ত হলো।

"**সিদ্ধান্ত :** নিম্নলিখিত সূত্রগুলি মনে রেখে পরিভাষা সংকলন করা হবে।

১। পরিভাষা যথাযথ, সহজবোধ্য ও সংক্ষিপ্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

২। প্রচলিত ও প্রতিষ্ঠিত শব্দ বিদেশী হ'লেও যুক্তিসঙ্গত কারণ ছাড়া বর্জন না করা।

৩। পরিভাষায় গৃহীত শব্দ বাঙলাভাষা স্বভাবের বিরোধী যাতে না হয়।

৪। পরিভাষা নিয়ে পূর্বেকার সমস্ত উদ্যোগ যথাযোগ্যভাবে বিবেচনা।

৫। প্রশাসন ও বিদ্যাচর্চার বিভিন্ন ক্ষেত্রে গণিত, ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান, প্রযুক্তিবিদ্যা প্রভৃতি বিষয়ে অভিজ্ঞ উপযুক্ত ব্যক্তিদের পরিভাষা-সংকলনে পরামর্শ গ্রহণ।

৬। পরিভাষা নির্মাণকালে হিন্দি ও অন্যান্য ভারতীয় ভাষায় নির্মিত পরিভাষাও প্রয়োজনে বিবেচনা।"

[চার] বর্ণচোরা শব্দ

বাঙলা ভাষায় এমন কিছু কিছু শব্দ ব্যবহৃত হয়, সেগুলোকে আপাতদৃষ্টিতে যে-গুচ্ছের অন্তর্গত বলে বোধ হয়, সেগুলো আসলে সে গুচ্ছের অন্তর্ভুক্ত নয়, এরূপ শব্দকে 'বর্ণচোরা' শব্দ বলে অভিহিত করা হয়। তৎসম শব্দ অথচ তৎসম বলে মনে হয় না এরূপ—'ছাগল, পাগল, ঘোর, ঘাস, সকল' প্রভৃতি। নিম্নোক্ত শব্দগুলোকে তৎসম বলে মনে হয়। অথচ এ গুলো 'ভুয়া শব্দ ' (Ghost words)—প্রোথিত, (প্রতিমা) নিরঞ্জন, অষ্টকুষ্ঠী, অকাট্য, গয়ং গচ্ছ, আবাহন।' 'আরতি' তদ্ভব (<আরাত্রিক), 'মোক্ষম' আরবী (মোহকম্) ; লাউ (<অলাবু), 'ইঁদুর' (<উন্দুরু), 'সরিষা' (<সর্ষপ) প্রভৃতি শব্দ মূলতঃ অস্ট্রীক ভাষা থেকেই নেওয়া হয়েছে। তেমনি 'পল্লী,

বিল্ব, ময়ূর, কজ্জল'-আদি শব্দ মূলতঃ দ্রাবিড়। মূল অস্ট্রীক (নিষাদ) ও দ্রাবিড় শব্দগুলির প্রথমে সংস্কৃতায়ন ক'রে তৎসম ক'রে নেওয়া হ'য়েছে। পরে এদের আবার তদ্ভব রূপও সৃষ্টি হ'য়েছে। পর্তুগীজ ভাষার নিম্নোক্ত শব্দগুলো তদ্ভব বলে ভুল হয়—'আতা, নোনা, কেদারা, চাবি, পরাত, পেঁপে' প্রভৃতি।

ফারসীর মাধ্যমে প্রচুর আরবী এবং তুর্কী শব্দও বাঙলা ভাষায় মিশে গেছে এমন-ভাবে যে এদের বিদেশি বলে চেনাই মুস্কিল। তুর্কী শব্দ : বাবা, দাদা, খোকা (<কোকা ; সংস্কৃত 'স্তোক' শব্দের সঙ্গেও সম্পর্ক থাকতে পারে), কাঁচি (<কোয়ামচি), কাঁচি (<কাঁইচি)। আরবী শব্দ :—জ্বালাতন (জালা-ওয়াতন), দৌড় (<দোয়ার), মানা (মান=নিষেধ), মনকষাকষি (<মানাকোয়াশা=ঝগড়া), বেদে (<বাদিয়া, 'বেদুইন'-এর সঙ্গে সম্পর্কিত), বিদায় (<ওয়াদা ; কিন্তু শব্দটি 'আদায়, প্রদায়'-এর সঙ্গে অর্বাচীন সংস্কৃতেও ঢুকে গেছে), মিনতি (<মিন্নৎ+বাং নতি), সন, খাশি।

ফারসি শব্দ :—গোলমাল (<ফা' ঘুল + আ' মাল=গণ্ডলিকাপ্রবাহজনিত বিশৃঙ্খলা), আলু, ধস্তাধস্তি (দস্ত-ওয়া-দস্ত=হস্তাহস্তী), টা, টি, একরোখা (<রুখ, মুখ); আচার, আয়না, আস্তে (<আহিস্তা), মারপ্যাঁচ (<মার=সাপ, পেচ=প্যাঁচ), বন্দী, বারবার (সং—বারংবার), সাজ-সরঞ্জাম, সেপায়া (<তে=তিন), সেতার, সর্দি, শক্ত, সবুজ, লাল, সরগরম, কাস্তে, খোসা, গলা, গেরো, মরিচ, জুতা, চাকর, চাঁদা, চাপাটি, চাবুক, চালাক, চাদর, পেঁয়াজ, রেষারেষি, (<রেশ্=ক্ষোভ)।

ইংরেজি 'সান্ত্রী (sentry), লম্ফ (lamp), লণ্ঠন (lantern)' প্রভৃতিও এমন-ভাবে চেহারা পাল্টেছে যে এদের বিদেশি বলে কল্পনাই করা যায় না।

বাঙলা ভাষায় এরূপ বহু দেশি-বিদেশি শব্দ এমন রূপান্তর লাভ করেছে যে, এদের আর মূলের সন্ধান পাওয়া যায় না। এরূপ বহু বর্ণচোরা শব্দই বাঙলা শব্দ-ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করে তুলেছে।

পরিশিষ্ট

প্রথম অধ্যায়

বাঙলা শব্দের মূলানুসন্ধান/ব্যুৎপত্তি-নির্ধারণ
Etymological and Grammatical notes

বাঙলা শব্দভাণ্ডারের মূল ভিত্তি গঠন করেছে তদ্ভব শব্দ এবং এই তদ্ভব শব্দগুলোকেই খাঁটি বাংলা শব্দ বলে অভিহিত করা হয়। বাঙলা শব্দভাণ্ডারে তদ্ভব ছাড়া আছে তৎসম, অর্ধতৎসম, দেশি ও বিদেশি শব্দ। তৎসম শব্দের মূল সন্ধান করতে হ'লে সংস্কৃত ব্যাকরণের দ্বারস্থ হওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। সাধারণতঃ একটা একাক্ষর ধাতুমূলের সঙ্গে কৃৎপ্রত্যয়, তদ্ধিত প্রত্যয়, উপসর্গ-আদির যোগে এক একটা তৎসম শব্দ গঠিত হয়, এগুলো বাঙলা ব্যাকরণ বা ভাষাতত্ত্বের আওতায় আসে না। অর্ধতৎসম শব্দগুলো সংস্কৃত শব্দের বিকৃতিতে উৎপন্ন, অতএব এদের মূলে আছে কোন-না-কোন তৎসম শব্দ। অধিকাংশ দেশি শব্দই দ্রাবিড় বা অস্ট্রীক/নিষাদ ভাষা থেকে আগত, কিছু শব্দের মূলের সন্ধান পাওয়া যায়, তবে এজাতীয় অধিকাংশ শব্দই অজ্ঞাতমূল। বিদেশি শব্দগুলো কোন-না-কোন বিদেশি ভাষা থেকে সরাসরি অথবা অপর কোন ভাষার মাধ্যমে আগত, এদের কতক অবিকৃত ভাবে বর্তমান রয়েছে, কতক বিকৃতি লাভ করেছে; তবে এরূপ সব শব্দেরই মূলের সন্ধান পাওয়া যায়। বাকি রইলো খাঁটি বাঙলা শব্দ 'তদ্ভব'। তদ্ভব শব্দগুলো তৎসম শব্দ থেকে বিবর্তনের মধ্য দিয়ে উৎপন্ন হয়েছে। অতএব তদ্ভব শব্দের মূলে আছে তৎসম শব্দ এবং এ দু'য়ের মাঝে আছে এক বা একাধিক স্তর, যেখানে শব্দটি ক্রম-বিবর্তিত রূপে বর্তমান। এই মধ্যবর্তী স্তরটি প্রধানতঃ প্রাকৃতের স্তর। কোন কোন অন্তর্বর্তী স্তরটি প্রাচীন বাঙলা বা মধ্যযুগের বাঙলা হওয়াও বিচিত্র নয়।

সংস্কৃত বা প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা প্রাকৃত ভাষায় রূপান্তরিত হয়েছে কারো খেয়াল-খুশিমতো নয়, এর মধ্যে বেশ কয়টি সুনির্দিষ্ট ভাষাতাত্ত্বিক নিয়ম খুঁজে পাওয়া যায়। আবার প্রাকৃত ভাষা থেকে বাঙলা ভাষার উদ্ভবের মূলেও কতকগুলো নিয়মের কার্যকারিতা লক্ষ্য করা যায়। প্রধান নিয়ম অল্পকয়টি হ'লেও মোট নিয়মের সংখ্যা কম নয়, অধিকন্তু নিয়মের ব্যতিক্রমও আছে যথেষ্ট। সমস্ত বাঙলা তদ্ভব শব্দের মূল খুঁজতে গেলে সব নিয়মই জানতে হয়। (বিশেষ আলোচনার জন্য 'ধ্বনি-বিচার' ঃ

পঞ্চদশ অধ্যায়'টি দ্রষ্টব্য।) তবে প্রধান নিয়মগুলো জানা থাকলেই অধিকাংশ তদ্ভব শব্দের ব্যুৎপত্তি নির্দেশ করা সম্ভবপর। নিম্নে প্রধান নিয়মগুলো সূত্রাকারে প্রদত্ত হ'লো। পুনরুক্তি দোষ নিবারণ এবং স্থান-সংক্ষেপের জন্য শব্দের ব্যুৎপত্তি-প্রদর্শনকালে নিয়মের উল্লেখ না ক'রে শুধু সূত্রের উল্লেখ করা হয়েছে এখানে, ঐ ক্ষেত্রে, ব্যাখ্যাকালে সূত্রানুযায়ী নিয়মের উল্লেখ প্রয়োজন। বলা বাহুল্য, ভাষার ধ্বনিতাত্ত্বিক পরিবর্তনে নিম্নোক্ত নিয়মগুলো প্রধান কয়টি মাত্র—এর বাইরেও অনেক আছে। সেগুলো আর এখানে উল্লেখিত হ'লো না।

তৎসম শব্দ কী ভাবে ক্রমবিবর্তিত হ'য়ে বাঙলা তদ্ভব শব্দে রূপান্তরিত হয়েছে, নিম্নোক্ত দৃষ্টান্তগুলোতে প্রথমে তার নিয়ম এবং পরে তা' বিশ্লেষণ করে দেখানো হলো।

১। সংস্কৃত 'ঋ, ৯, ঐ, ঔ'-কার প্রাকৃতে বর্জিত হ'য়েছিল এবং তৎস্থলে অপর কোন ধ্বনি ব্যবহৃত হ'তো ঃ বাঙলা ভাষায় সাধারণতঃ প্রাকৃত ধ্বনিই অব্যাহত রয়েছে। যথা—ঘৃত>ঘিঅ>ঘি ; তৈল>তেল্ল>তেল ; সৌভাগ্য>সোহগ্গ>সোহাগ।

২। পদের আদি যুক্ত ব্যঞ্জন প্রাকৃতে বিশ্লিষ্ট হ'য়েছে কিংবা একক ব্যঞ্জনে পরিণত হ'য়েছে ; বাঙলায়ও প্রাকৃত ধ্বনি বজায় রয়েছে। যথা—ব্রাহ্মণ>বাম্ভণ> বামুন ; স্নাপিত>নাহাপিত>নাপিত ; স্নান>সিনান।

৩। স্বরমধ্যবর্তী একক অল্পপ্রাণ ব্যঞ্জন প্রাকৃতে লোপ পেয়েছে ; বাঙলায়ও তাই রয়েছে (উদ্বৃত্ত স্বরের ব্যবহার-বিষয়ে পরে বলা হ'চ্ছে)। যথা—অমৃত>অমিঅ >অমিয়, সাগর>সাঅর>সায়র ; হৃদয়>হিঅঅ>হিআ>হিয়া।

৪। স্বরমধ্যবর্তী একক মহাপ্রাণ বর্ণ প্রাকৃতে 'হ'-কারে পরিণত হয়েছে ; বাঙলায় এই 'হ'-ও লোপ পেয়েছে। যথা—সখী>সহী>সই ; মধু>মহু>মউ ; প্রভু> পহু।

৫। স্বর-মধ্যবর্তী যুক্ত ব্যঞ্জন প্রাকৃতে যুগ্ম ব্যঞ্জনে পরিণত হয়েছে অর্থাৎ সমীভূত হয়েছে এবং পূর্ববর্তী দীর্ঘস্বর হ্রস্ব হয়েছে ; বাঙলায় যুগ্ম ব্যঞ্জন একক ব্যঞ্জনে পরিণত হ'য়েছে এবং পূর্ববর্তী হ্রস্ব স্বর আবার দীর্ঘ হয়েছে—এটি পূরক-জনিত দীর্ঘতা (compensatory lengthening)। যথা—কার্য>কজ্জ>কাজ ; খাদ্যক>খজ্জঅ>খাজা ; কক্ষ>কক্খ>কাখ, কাঁখ ; তাম্র>তম্ব>তামা, তাঁবা।

৬। উদ্বৃত্ত স্বর (ব্যঞ্জনধ্বনি লোপের ফলে যে স্বরধ্বনি অবশিষ্ট থাকে—'ঘৃত> ঘিঅ'—এখানে 'ত্' লোপ পাওয়ায় '-অ' থাক্‌লো, এটাই উদ্বৃত্ত স্বর) বাঙলায় কখনও লোপ পেয়েছে, কখনও অপর স্বরের সঙ্গে মিশে গেছে, কোথাও বা দুই বা ততোধিক

স্বরের মিশ্রণ ঘটেছে। যথা—ঘৃত>ঘিঅ>ঘি, পুস্তিকা>পোত্থিআ>পুঁথি ; হৃদয় >হিঅঅ>হিয়া।

৭। দুই স্বরধ্বনি পাশাপাশি বর্তমান থাকলে অনেক সময় তার মধ্যে শ্রুতিধ্বনির (য়-শ্রুতি বা ব-শ্রুতি) আগম ঘটেছে। যথা—সাগর>সাঅর>সায়র ; শ্বশুর>শুঅর শুওর ; পা+আ>পাআ>পাওয়া (পাবা)।

৮। সংস্কৃত শব্দের শেষে অনেক সময় স্বার্থে 'ক' প্রত্যয় ব্যবহৃত হয় ; প্রাকৃতে তার 'অ' অবশিষ্ট থাকতো। বাঙলায় পূর্ববর্তী 'অ'-এর সঙ্গে মিশে 'স্বার্থে-আ' প্রত্যয় যুক্ত হয় বহুক্ষেত্রেই।—ঘোড়া, পাঁঠা, হাঁসা, কাকা, জেঠা।—এখানে বাঙলায় 'স্বার্থিক-আ প্রত্যয়' ব্যবহৃত হ'য়েছে, বলা যেতে পারে।

৯। স্বাভাবিক ধ্বনি পরিবর্তন সূত্রগুলো অনেক ক্ষেত্রে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে থাকে,—এদের মধ্যে প্রধান—স্বরসঙ্গতি, অপিনিহিতি, অভিশ্রুতি, স্বরাগম, স্বরলোপ, স্বতোনাসিক্যীভবন, মূর্ধন্যীভবন প্রভৃতি।

১০। প্রাকৃতে তিনটি শিস্‌ধ্বনির মধ্যে প্রায় সর্বত্র শুধু 'স' ব্যবহৃত হতো। তবে মাগধী প্রাকৃতে সবই 'শ' হ'তো, বাঙলায়ও এই ধারাটি বর্তমান রয়েছে।

১১। 'ট'-স্থলে অনেক সময় 'ডা/ড়' ব্যবহৃত হয়।

দৃষ্টান্ত ও বিশ্লেষণ ঃ

অকুমারী। কুমারী>অকুমারী, আকুমারী (আদিস্বরাগম হেতু)।

অপরূপ। অপূর্ব>অপূরুব (স্বরভক্তিহেতু)>অপরূপ (লোকনিরুক্তি-হেতু)।

অমিয়। অমৃত>অমিঅ (প্রাকৃতে ঋ-কারহীনতা এবং স্বরমধ্যবর্তী অল্পপ্রাণ-বর্ণের লোপহেতু)>অমিয় (য়-শ্রুতির ফলে)।

আইচ। আদিত্য>আইচ্চ (প্রাকৃতে স্বরমধ্যস্থ অল্পপ্রাণবর্ণের লোপ-হেতু 'দি'-স্থলে 'ই' এবং যুক্ত ব্যঞ্জনের যুগ্ম ব্যঞ্জনে পরিণতি এবং তালব্যীভবন হেতু 'ত্য'-স্থলে 'চ্চ')>আইচ (বাঙলায় যুগ্ম ব্যঞ্জনের সরলতা-হেতু)।

আইবুড়ো। অব্যূঢ়>আইবূঢ় (য-ফলা থাকায় অপিনিহিতি অর্থাৎ পূর্বে-'ই'-আগম)>আইবুড়ো (শ্বাসাঘাতহেতু 'অ'-স্থলে 'আ' এবং 'ঢ়'-স্থলে 'ড়',—'স্বরসঙ্গতি'র ফলে 'ড়'-স্থলে 'ড়ো')।

আউল। আকুল>আউল (স্বরমধ্যস্থ অল্পপ্রাণবর্ণের লোপ-হেতু)।

আউশ। আবৃষ>আবুষ (প্রাকৃতে ঋকারহীনতাহেতু)>আউশ (স্বরমধ্যস্থ অল্পপ্রাণ বর্ণের লোপহেতু। অথবা—আশু>আউশ (বর্ণবিপর্যয়হেতু)।

আখড়া। অক্ষবাট>অকখআড় (যুক্ত ব্যঞ্জন-ক্ষ-প্রাকৃতে যুগ্ম ব্যঞ্জন ক্‌খ-এ

পরিণত, স্বরমধ্যস্থ অল্পপ্রাণ-ব-এর লোপ,-'ট' স্থলে তৃতীয় বর্ণ-'ড়')>আখড়া (বাঙলায় যুগ্ম ব্যঞ্জন-ক্‌খ-একক ব্যঞ্জন-খ-এ পরিণত এবং পূর্বস্বরের দীর্ঘীভবন, পদান্তে স্বার্থে'-আ' প্রত্যয় যোগ)

আগল/আগর। অর্গল>অগ্গল। (যুক্তব্যঞ্জনের যুগ্মব্যঞ্জনে পরিণতি)> আগল, র (সরলীভবন এবং পূর্বস্বরের দীর্ঘীভবন); 'র-ল'-এর অভেদ-হেতু 'ল'-স্থানে '-র'।

আগাপাসতলা। আগাপাছ+তলা>আগাপাস্‌তলা (স-কারীভবন, দন্ত্যধ্বনির প্রভাবে)।

আচাভুয়া। অত্যদ্ভুত>অচ্চব্‌ভুঅ (যুক্ত ব্যঞ্জনের যুগ্মব্যঞ্জনে পরিণতি ও তালব্যীভবন এবং স্বরমধ্যবর্তী 'ত'-র লোপহেতু)>আচাভুয়া (যুগ্মব্যঞ্জনের সরলীভবন, পূর্বস্বরের দীর্ঘীভবন, য়-শ্রুতি এবং পদান্তে স্বার্থে 'আ' প্রত্যয়)।

আজ। অদ্য>অজ্জ (সমীভবন ও তালব্যীভবন)>আজ (যুগ্ম-ব্যঞ্জনের সরলীভবন ও পূর্বস্বরের পূরক দীর্ঘতা)।

আজিমা/আইমা। আর্যিকামাতা>অজ্জিআমাআ (যুক্তব্যঞ্জনের যুগ্মব্যঞ্জনে পরিণতি, পূর্ববর্তী দীর্ঘস্বরের হ্রস্বীভবন-হেতু 'আ-'স্থলে 'অ', স্বরমধ্যবর্তী অল্প-প্রাণবর্ণের লোপ)>আজিমা (যুগ্মব্যঞ্জনের সরলীভবন ও তৎপূর্বস্বরের দীর্ঘীভবন, উদ্বৃত্তস্বর '-আ'-এর লোপ)। আর্যিকামাতা>অয়িআমাআ>আইমা।

আঠার। অষ্টাদশ>অট্‌ঠারহ (যুক্তব্যঞ্জনের যুগ্মব্যঞ্জনে পরিণতি, দ>ড>র, শ>হ)>আঠারঅ (যুগ্মব্যঞ্জনের সরলীভবন ও পূর্ববর্তী হ্রস্ব স্বরের দীর্ঘীভবন, বাঙলায় মহাপ্রাণ 'হ'-এর লোপ)>আঠার (উদ্বৃত্তস্বরের লোপ)।

আড়। অর্ধ>অড্‌ঢ (যুক্তব্যঞ্জনের যুগ্মব্যঞ্জনে পরিণতি ও মূর্ধন্যীভবন)> আঢ় (যুগ্মব্যঞ্জনের সরলীভবন ও পূর্বস্বরের দীর্ঘীভবন)>আড় (আদিস্বরে প্রস্বর পড়ায় বাঙলায় পদমধ্যস্থ 'ঢ়'-এর 'ড়'-এ পরিণতি)।

আড়াই। অর্ধতৃতীয়>অড্‌ঢ-ইইঅ (যুক্তব্যঞ্জনের যুগ্মব্যঞ্জনে পরিণতি, মূর্ধন্যী-ভবন, স্বরমধ্যবর্তী অল্পপ্রাণবর্ণের লোপ)>আড়াই (যুগ্ম ব্যঞ্জনের সরলীভবন ও পূর্বস্বরের দীর্ঘীভবন, শেষ দুটি উদ্বৃত্ত স্বরের লোপ এবং পদমধ্যে 'ড, ঢ'-এর 'ড়'-এ পরিণতি)।

আদিখ্যেতা। আধিক্যতা>আদিখ্যতা (মহাপ্রাণ 'হ'-এর বিপর্যয়)>আদিখ্যেতা (স্বরসঙ্গতি)। 'আধিক্য' বিশেষ্য পদ, তার সঙ্গে '-তা' যুক্ত হ'য়ে 'আধিক্যতা' ব্যাকরণ-মতে অসিদ্ধ, ভুল প্রয়োগ।

আন্নাকালী। 'আর-না-কালী'—এই বাক্যটি কথ্যভাষায় সমীভবন-সূত্রে 'আন্নাকালী' হ'য়ে 'বাক্যশব্দ' হ'য়েছে। এর অর্থগত পরিবর্তনও হ'য়েছে কারণ একটি সাধারণ প্রার্থনা 'ব্যক্তিনাম' হ'য়ে গেছে।

আনারস। অনানস (পর্তুগীজ annanas)>আনারস (বিষমীভবন এবং লোক-নিরুক্তি-হেতু পরিচিত শব্দ-সাদৃশ্য)।

আপন। আত্মন্>অপ্পন (ঔষ্ঠ্যধ্বনি-'ম'-এর প্রভাবে 'ত্ম'>ঔষ্ঠ্য) 'প্প'—অন্যোন্য সমীভবন)>আপন (যুগ্মব্যঞ্জনের সরলতা ও পূর্বস্বরের পূরক দীর্ঘতা)।

আমড়া। আম্রাতক>অম্বাড়অ (যুক্তব্যঞ্জনের যুগ্মব্যঞ্জনে পরিণতি ও পূর্ববর্তী দীর্ঘস্বরের হ্রস্বীভবন, 'র'-এর প্রভাবে 'ত'-এর মূর্ধন্যীভবন, ত>ট>ড এবং স্বরমধ্যবর্তী 'ক'-এর লোপ)>আমড়া (যুগ্মব্যঞ্জনের সরলীভবন ও পূর্বস্বরের দীর্ঘীভবন, আদিস্বরে শ্বাসাঘাত-হেতু দ্ব্যক্ষরপ্রবণতা 'মা'-স্থলে 'ম', উদ্বৃত্তস্বর সন্ধিসূত্রে 'আ')।

আমি। *অস্মে>অহ্মে (যুক্তব্যঞ্জনের যুগ্মব্যঞ্জনে পরিণতি)>অম্হে (বর্ণ বিপর্যয়)>আমে, আমি (যুক্ত ব্যঞ্জনের সরলীভবন ও পূর্বস্বরের দীর্ঘীভবন; স্বরসঙ্গীত)।

আয়ি, আই। আর্যিকা>অয়্যিআ (যুক্ত ব্যঞ্জনের যুগ্মব্যঞ্জনে পরিণতি ও পূর্ব-স্বরের হ্রস্বীভবন, স্বরমধ্যস্থ অল্পপ্রাণবর্ণের লোপ)>আয়ি (যুগ্মব্যঞ্জনের সরলীভবন, পূর্বস্বরের দীর্ঘীভবন ও উদ্বৃত্তস্বরের লোপ) >আই ('য়'-লোপ)।

আর। অপর>অঅর (স্বরমধ্যস্থ অল্পপ্রাণবর্ণের লোপ)>আর (উদ্বৃত্তস্বর সন্ধিসূত্রে 'আ')।

আরশি। আদর্শিকা>আঅরশিআ (পদমধ্যস্থ অল্পপ্রাণবর্ণের লোপ)>আরশি (উদ্বৃত্ত স্বরের লোপ)।

আলতা। অলক্তক>অলত্তঅ (সমীভবন ও অল্পপ্রাণবর্ণের লোপ)>আলতা (যুগ্মব্যঞ্জনের সরলীভবন, পূর্বস্বরের পূরক দীর্ঘতা ও উদ্বৃত্তস্বরের সন্ধিবন্ধন)।

আলমারি। (পর্তুগীজ armario) আরমারিও>আলমারি (বিষমীভবন—দুটি 'র'-এর একটি 'ল' হ'লো)। বিদেশি শব্দ।

আসে। আবিশতি>আইসই (স্বরমধ্যস্থ অল্পপ্রাণবর্ণের লোপ)>আইসে (পদান্তরের উদ্বৃত্তস্বর সন্ধিসূত্রে—অ+ই>এ পরিণতি)>আসে (অভিশ্রুতি অথবা স্বরলোপ)।

আস্তাবল। (ইংরেজি stable) স্ট্যাবল>স্তাবল (বাঙলা উচ্চারণে)>আস্তাবল (আদিতে স্বরাগম)।

আস্পর্ধা। স্পর্ধা>আস্পর্ধা (আদিতে স্বরাগম)।

আঁইষ/আঁষ। আমিষ>আঁইষ (নাসিক্যীভবন)>আঁষ (অভিশ্রুতি বা স্বর-লোপ)।

আঁক্‌শি। অঙ্কুশিকা>অঙ্কুশিআ (অল্পপ্রাণধ্বনির লোপ)>আঁকুশিআ (নাসিক্যীভবন ও পূর্বস্বরের পূরক দীর্ঘতা)>আঁকুশি (উদ্বৃত্তস্বরের লোপ)>আঁকশি (আদি শ্বাসাঘাত-হেতু মধ্যস্বরের লোপ) / অথবা আকর্ষী>আকশ্‌শি (যুক্ত-ব্যঞ্জনের যুগ্মব্যঞ্জনে পরিণতি)>আক্‌শি (যুগ্মব্যঞ্জনের সরলীভবন ও দ্ব্যক্ষরপ্রবণতা) >আঁকশি (স্বতোনাসিক্যীভবন)।

আঁকাড়া। অকৃষ্ট>অকড্‌ঢিঅ (ঋ-কারের লোপ, যুক্তব্যঞ্জনের যুগ্মব্যঞ্জনে পরিণতি+স্বার্থে 'ইঅ' প্রত্যয়)>আকাঢ়া (যুগ্মব্যঞ্জনের সরলীভবন ও পূর্বস্বরের দীর্ঘীভবন, স্বরসঙ্গতি)>আঁকাড়া (স্বতোনাসিক্যীভবন-হেতু 'আ'-স্থলে 'আঁ' এবং অল্পপ্রাণীভবন-হেতু 'ঢ়'-স্থলে 'ড়'।

আঁটি/আঁঠি। অস্থি>অট্‌ঠি (স্বতোমূর্ধন্যীভবন ও যুক্তব্যঞ্জনের যুগ্মব্যঞ্জনে পরিণতি)>আঠি (যুগ্মব্যঞ্জনের সরলীভবন ও পূর্বস্বরের দীর্ঘতা)>আঁটি, আঁঠি (স্বতোনাসিক্যীভবন।)

আঁশ। অংশু>আঁশু (নাসিক্যীভবন ও পূর্বস্বরের পূরকদীর্ঘতা)>আঁশ (অন্ত্যস্বর লোপ)।

ইস্কাপন/ইস্কাবন। Schopen—স্কোপেন ওলন্দাজ ভাষার শব্দ; আদিস্বরাগম ঘটিয়ে তাকে ইস্কাপন করা হ'য়েছে। ঘোষীভবনের ফলে 'প'-স্থলে 'ব'।

ইঁট। ইষ্টক>ইট্‌ঠঅ (যুক্তব্যঞ্জনের যুগ্মব্যঞ্জনে পরিণতি এবং স্বরমধ্যবর্তী 'ক'-এর লোপ)>ইট (যুগ্মব্যঞ্জনের সরলীভবন ও উদ্বৃত্তস্বরের লোপ)>ইঁট (স্বতো-নাসিক্যীভবন)।

ইঁদারা। ইন্দ্রাগার>ইন্দাআর (যুক্তব্যঞ্জনের যুগ্মব্যঞ্জনে পরিণতি ও পদমধ্যস্থ অল্পপ্রাণ 'গ'-এর লোপ)>ইন্দার (উদ্বৃত্তস্বরের লোপ)>ইন্দারা (পদান্তে স্বার্থিক 'আ' প্রত্যয়)>ইঁদারা (নাসিক্যীভবন)।

উই। উপদিকা>উঅইআ (স্বরমধ্যস্থ অল্পপ্রাণবর্ণের লোপ)>উইআ (উদ্বৃত্ত 'অ'-এর লোপ)>উই (পদান্তে উদ্বৃত্তস্বরের লোপ)।

উজানি। উদ্যানিকা>উজ্জানিআ (যুক্তব্যঞ্জনের যুগ্মব্যঞ্জনে পরিণতি ও তালব্যীভবন)>উজানি (যুগ্মব্যঞ্জনের সরলীভবন ও উদ্বৃত্তস্বর লোপ)।

উথলায়। উৎস্থলয়তি>উত্থলঅই (যুক্তব্যঞ্জনের যুগ্মব্যঞ্জনে পরিণতি, স্বরমধ্যস্থ

অল্পপ্রাণ বর্ণের লোপ)>উথলই (যুগ্মব্যঞ্জনের সরলীভবন, উদ্বৃত্তস্বরের লোপ)> উৎলায়।

উনুন। উদধ্মান>উম্ধান (সমাক্ষর লোপ), উন্হান>উনান>উনুন। অথবা উষ্ণাপন>উন্হাবন (ষ-স্থলে 'হ' এবং 'প'-এর ঘোষীভবন)>উন্হাঅন (অল্পপ্রাণ বর্ণের লোপ)>উনান (যুক্তব্যঞ্জনের সরলীভবন)>উনুন (স্বরসঙ্গতি)।

উপজে। উৎপদ্যতে>উপ্পজ্জই (যুক্তব্যঞ্জনের যুগ্মব্যঞ্জনে পরিণতি, অল্পপ্রাণ 'ত'-এর লোপ)>উপজই (যুগ্মব্যঞ্জনের সরলীভবন)>উপজে (পদান্তে উদ্বৃত্তস্বরের সন্ধি)।

উবু। ঊর্ধ্ব>উব্ভ (যুক্তব্যঞ্জনের যুগ্মব্যঞ্জনে পরিণতি)>উভ (যুগ্মব্যঞ্জনের সরলীভবন)>উভু (স্বরসঙ্গতি)>উবু (অল্পপ্রাণীভবন)।

উয়ারি। উপকারিকা>উঅআরিআ (অল্পপ্রাণবর্ণের লোপ) উআরি (উদ্বৃত্ত-স্বরের সন্ধি ও পদান্তে লোপ)>উয়ারি (য়-শ্রুতি)।

এগার। একাদশ>এগ্গারহ (ঘোষীভবন ও তৎসহ ব্যঞ্জনদ্বিত্ব, দ>র=রকারীভবন, শ>হ=হ-কারীভবন) >এগারহ > (যুগ্মব্যঞ্জনের সরলীভবন > এগার (হ-লোপ)।

এয়ো। অবিধবা>অইহআ (অল্পপ্রাণবর্ণের লোপ ও মহাপ্রাণবর্ণের 'হ'-কারে পরিণতি)>আইও ('হ'-কারের লোপ এবং উদ্বৃত্তস্বরের লোপ, শ্বাসাঘাত-হেতু আদ্য 'অ'>আ)>এয়ো (উদ্বৃত্তস্বরের সন্ধি, য়-শ্রুতি)

এলো। আকুলায়িত>আউলাইঅ (অল্পপ্রাণবর্ণের লোপ)>আউলা (পদান্তে উদ্বৃত্ত স্বর লোপ)>এলো (অভিশ্রুতি ও স্বরসঙ্গতি)।

ওঝা (ঝা / রোজা)। উপাধ্যায়>উঅজ্ঝাঅ (যুক্তব্যঞ্জনের যুগ্মব্যঞ্জনে পরিণতি ও তালব্যীভবন, অল্পপ্রাণবর্ণের লোপ)>ওঝা (উদ্বৃত্তস্বরের লোপ, স্বরসঙ্গতি-হেতু 'উ'>ও)। আদিস্বর লোপ-হেতু 'ওঝা>ঝা' / আদিতে 'র' আগম-হেতু 'ওঝা> রোঝা>রোজা' (আদিস্বরে শ্বাসাঘাত হেতু অন্ত্যে মহাপ্রাণ ধ্বনির অল্পপ্রাণীভবন)।

ওম। উষ্ম>উম্হ (ষ-স্থলে 'হ')>ওম (যুক্তব্যঞ্জনের সরলীভবন, স্বরসঙ্গতি)।

কনে। (১) কন্যা>কইন্যা (অপিনিহিতি)>কইনে (স্বরসঙ্গতি)>কনে (অভিশ্রুতি)।—এই স্থলে অর্থপরিবর্তন লক্ষণীয়। 'কন্যা'র ব্যুৎপত্তিগত অর্থ— 'কাম্যা'>দুহিতা, কুমারী (অর্থসঙ্কোচ-হেতু)>নববধূ (অর্থসঙ্কোচ)।

(২) কনীয়ান্ / কনিষ্ঠা>কনে (দুই বা ততোধিকের মধ্যে ছোট (=কনে আঙুল)। 'কনে বৌ' যেমন 'কন্যা বধূ' অর্থে প্রচলিত, তেমনি 'ছোট বৌ' অর্থেও প্রচলিত।

কদমা। কদম্ব>কদম্ম (সূত্র ৫)>কদম (সূত্র ৫)>কদমা (সাদৃশ্যে+'আ' প্রত্যয়)।

কনুই। কফোণি>কহোণি (সূত্র ৪)>কনহোই (বর্ণ বিপর্যয়)>কনুই (সূত্র ৪)

করচা/কড়চা। কটকৃত>কড়কচ্চ (ঘোষীভবন -ট>ড, ঋ-কার লোপ, যুক্ত-ব্যঞ্জনের যুগ্মব্যঞ্জনে পরিণতি)>কড়আচ (অল্পপ্রাণ বর্ণের লোপ, যুগ্মব্যঞ্জনের সরলীভবন ও পূর্বস্বরের দীর্ঘীভবন)>কড়চা/করচা (আ-কারের স্থান বিপর্যয়, ড়-স্থলে 'র')

কলা। কদলক>কঅলঅ>কলা (প্রথম উদ্বৃত্ত স্বরটি লোপ পেলো, পরেরটি পূর্বস্বরের সঙ্গে সন্ধিতে 'আ' হলো)—মূল শব্দটি অস্ট্রীক (নিষাদ) ভাষার।

কষ্টি। কর্ষপট্টিকা>কসসবট্টিঅ (সূত্র ৫, অঘোষবর্ণের ঘোষীভবন-প>ব, সূত্র ৩)>কসুটিঅ (যুগ্মব্যঞ্জনের সরলীভবন)>কষ্টি (পদান্তে উদ্বৃত্ত স্বরের লোপ)

কাছারি। কৃত্যবাটিকা>কচ্ছআড়িআ (ঋ লোপ, যুক্তব্যঞ্জনের যুগ্মব্যঞ্জনে পরিণতি ও তালব্যীভবন, অল্পপ্রাণবর্ণের লোপ, অঘোষবর্ণের ঘোষীভবন)>কাছাড়ি (যুগ্মব্যঞ্জনের সরলীভবন ও পূর্ববর্তী হ্রস্ব-স্বরের দীর্ঘীভবন, উদ্বৃত্ত স্বরের সন্ধি, পদান্তে উদ্বৃত্ত স্বর লোপ)।

কানি। (১) কর্ণিকা (খণ্ড অর্থে)>কন্নিআ (সমীভবন ও অল্পপ্রাণ-বর্ণ লোপ)>কনি (যুগ্মব্যঞ্জনের সরলীভবন ও উদ্বৃত্তস্বরের লোপ)।—'ছেঁড়া কাপড়' অর্থে ব্যবহৃত। (২) তুর্কীভাষার কনাৎ (শিবিরের পর্দা)>কানাৎ>কানি।

কানু। কৃষ্ণ>কণ্‌হ (ষ-স্থলে 'হ' এবং 'ঞ' স্থলে 'ণ'—বর্ণবিপর্যয়)>কাহ্ন (বর্ণবিপর্যয়)>কান (যুক্তব্যঞ্জনের সরলীভবন)>কানু (স্বার্থে বা আদরে '+উ' প্রত্যয়)।

কামার। কর্মকার>কম্মআর (যুক্তব্যঞ্জন যুগ্ম হলো, অল্পপ্রাণবর্ণ লোপ পেলো) >কামার (যুগ্মব্যঞ্জনের সরলীভবন ও পূর্বস্বরের দীর্ঘতা, উদ্বৃত্ত স্বরের সন্ধি)।

কিনে। ক্রীণাতি>কীণই (পদের আদি যুক্তব্যঞ্জনের সরলীভবন, অল্পপ্রাণ বর্ণের লোপ)>কিনে (পদান্তে উদ্বৃত্ত স্বরের সন্ধি)।

কাহন। কার্ষাপণ (সংস্কৃতায়িত প্রাচীন পারশিক শব্দ)>কাহাবন (র-লোপ, 'ষ'-এর 'হ'-এ পরিণতি, প>ব>ঘোষীভবন) কাহন (আদিস্বরে শ্বাসাঘাতহেতু মধ্যস্বরের হ্রস্বতা ও অল্পপ্রাণবর্ণের লোপ, পরে উদ্বৃত্তস্বরেরও লোপ)।

কুমার/কুমোর। কুম্ভকার > কুম্ভআর (অল্পপ্রাণবর্ণের লোপ) > কুম্ভার (উদ্বৃত্তস্বরের আভ্যন্তর সন্ধি>কুমার (আদিস্বরে শ্বাসাঘাত-হেতু মধ্যবর্তী যুক্তব্যঞ্জনের সরলীভবন)>কুমোর (স্বরসঙ্গীত)।

কুলুপ। আরবী 'কুফ্‌ল্‌' শব্দটি বর্ণবিপর্যয়ের ফলে 'কুল্‌ফ্‌', স্বরসঙ্গতির ফলে 'কুলুফ্‌', আদিস্বরের শ্বাসাঘাতের ফলে 'কুলুপ'।

কেওড়া। কেতকট>কেঅঅড (অল্পপ্রাণবর্ণের লোপ এবং অঘোষবর্ণের ঘোষীভবন—ট>ড)>কেওড়া (উদ্বৃত্ত স্বরের সন্ধি ও ব-শ্রুতি, পদান্তে স্বার্থিক 'আ' প্রত্যয়)।

কেন। *কীদৃশন>কিদসন (ঋ-লোপ)>কইসন>(অল্পপ্রাণবর্ণের লোপ)> কইহন ('স'-স্থলে 'হ')>কেহ্ন>কেন (যুক্তব্যঞ্জনের সরলীভবন)।

কেয়া। কেতক>কেঅঅ (অল্পপ্রাণ বর্ণের লোপ)>কেআ (উদ্বৃত্তস্বরের সন্ধি) >কেয়া (য়-শ্রুতি)।

কোঙার। কুমার>*কুম্বার ('ব'-আগম)>কুঁবার (নাসিক্যীভবন)>কুঙার (অল্পপ্রাণবর্ণের লোপ)>কোঙার (স্বরসঙ্গতি)।

খই। খদিকা>খইআ (অল্পপ্রাণ বর্ণের লোপ)>খই (পদান্তে উদ্বৃত্ত স্বরের লোপ)।

খড়ি। *খটিক>খড়িঅ (অঘোষবর্ণের ঘোষীভবন ও অল্পপ্রাণবর্ণের লোপ)> খড়ি (পদান্তে উদ্বৃত্তস্বরের লোপ)। অথবা—শব্দটি 'দেশি' অথবা অজ্ঞাতমূল হওয়াও সম্ভব।

খাজা। খাদ্যক>খজ্জঅ (যুক্তব্যঞ্জনের সমীভবন-তালব্যীভবন ও পূর্ববর্তী দীর্ঘস্বরের হ্রস্বীভবন, অল্পপ্রাণবর্ণের লোপ)>খাজা (যুগ্মব্যঞ্জনের সরলীভবন ও পূর্ববর্তী হ্রস্ব-স্বরের দীর্ঘীভবন, উদ্বৃত্তস্বরের সন্ধি)।

খাট। খট্ট (দেশি শব্দ, সংস্কৃতায়িত)>খাট (যুগ্মব্যঞ্জনের সরলীভবন ও পূর্ববর্তী হ্রস্বস্বরের দীর্ঘীভবন)।

খাম / থাম—স্তম্ভ>থম্ব, খম্ভ (আদি যুক্তব্যঞ্জনের সরলীভবন)>থাম, খাম (যুগ্মব্যঞ্জনের সরলীভবন ও পূর্ববর্তী হ্রস্বস্বরের দীর্ঘীভবন)।

খামার। স্কম্ভাগার>খম্ভাআর (আদি যুক্তব্যঞ্জনের সরলীভবন, অল্পপ্রাণবর্ণের লোপ)>খামার (যুগ্মব্যঞ্জনের সরলীভবন ও পূর্ববর্তী হ্রস্বস্বরের দীর্ঘীভবন, উদ্বৃত্ত-স্বরের সন্ধি):

খায়। খাদতি>খাঅই (স্বরমধ্যস্থ অল্পপ্রাণ বর্ণের লোপ)>খা-ই (পদমধ্যস্থ উদ্বৃত্তস্বরের সন্ধি)>খায় (য়-শ্রুতি)।

খারিফ। ফার্সী 'খরীফ'—শব্দজ, শব্দের অর্থ 'হেমন্তকাল', বাংলার হৈমন্তিক শস্য।

খুড়া। ক্ষুদ্রতাত>খুড্ডআঅ (পদের আদি যুক্ত ব্যঞ্জনের সরলীভবন, যুক্ত ব্যঞ্জনের যুগ্মব্যঞ্জনে পরিণতি, র-এর প্রভাবে মূর্ধন্যীভবন, অল্পপ্রাণবর্ণের লোপ)>

খুড়আ (যুগ্মব্যঞ্জনের সরলীভবন, পদান্তে উদ্বৃত্তস্বরের লোপ)>খুড়া (উদ্বৃত্তস্বরের সন্ধি)।

খুদ। ক্ষুদ্র>খুদ্দ (পদের আদি যুক্তব্যঞ্জনের সরলীভবন ও পদমধ্যস্থ যুক্ত ব্যঞ্জনের সমীভবন)>খুদ (যুগ্মব্যঞ্জনের সরলীভবন)।

খেয়া। ক্ষেপ>খেঅ (পদের আদি যুক্তব্যঞ্জনের সরলীভবন, অল্পপ্রাণবর্ণের লোপ)>খেয়া (য়-শ্রুতি+স্বার্থে 'আ' প্রত্যয়)।

খাঁড়/খান। খণ্ড>খাঁড় (যুক্তব্যঞ্জনের সরলীভবন, পূর্বস্বরের দীর্ঘীভবন, নাসিক্যীভবন)। খণ্ড>খন্ন (যুগ্মীভবন)>খান (সরলীভবন ও পূর্বস্বরের দীর্ঘীভবন)।

[* **দ্রষ্টব্য** : নিম্নে যেখানে সূত্রসংখ্যা প্রদত্ত হ'য়েছে, সেই সমস্ত ক্ষেত্রে তৎ-সংখ্যক সূত্রটি লিখতে হ'বে, সংখ্যা নয়। যে স্থলে নির্দেশ নেই, সেই স্থলেও সূত্র নির্দেশ করতে হ'বে।]

গইঠা। গোবিষ্ঠা>গোইট্‌ঠা (সূত্র ৩·৫)>গোইঠা, গইঠা (সূত্র ৫)।

গা। গাত্র>গত্ত>গাত>গাঅ>গা।

গাং। গঙ্গা>গাঙ্গ, গাং (স্বরবিপর্যয়)। অর্থবিস্তারও ঘটেছে।

গাছ। গচ্ছ>গাছ (সূত্র ৫)।

গাজন। গর্জন>গজ্জন (সূত্র ৫)>গাজন (সূত্র ৫)।

গাঁ। গ্রাম>গাম (আদি যুক্তব্যঞ্জনের সরলীভবন)>গাঁব>গাঁও (অল্পপ্রাণ-বর্ণের লোপ ও তৎস্থলে 'ও')>গাঁ (উদ্বৃত্তস্বর লোপ)।

গাঁট/গাঁইট। গ্রন্থি>গণ্ঠি (আদি যুক্তব্যঞ্জনের সরলীভবন, মূর্ধন্যীভবন)> গাঁঠি (নাসিক্যীভবন ও ফলতঃ পূর্বস্বরের পূরক দীর্ঘতা)>গাঁইট (অপিনিহিতি) >গাঁট (অভিশ্রুতি)।

গাধা। গর্দভ>গদ্দহ (যুক্তব্যঞ্জনের সমীভবন ও মহাপ্রাণবর্ণের 'হ'-রূপ)> গাদহ (যুগ্মব্যঞ্জনের সরলতা ও পূর্ববর্তী হ্রস্বস্বরের পূরকদীর্ঘতা)>গাধা ('হ'-যোগে মহাপ্রাণীভবন+স্বার্থিক আ)

গারদ। (ইংরেজি Guard) গার্ড>গারদ (যুক্তব্যঞ্জন বিশ্লিষ্ট হ'লো এবং 'ড'-স্থলে 'দ'-বি-মূর্ধন্যীভবন হ'লো)। এখানে অর্থপরিবর্তনও লক্ষণীয়। গার্ড= পাহারা, কিন্তু বাংলায় গারদ=কয়েদখানা।

গিন্নি। গৃহিণী>গিরহিণী (সূত্র ১)>গিরণী (হ-লোপ)>গিন্নি (সূত্র ৫)।

গুয়া। গুবাক>গুআঅ (সূত্র ৩)>গুআ (সূত্র ৬)>গুয়া (সূত্র ৬)।

গেল। গতঃ>গঅ (সূত্র ৩)+ইল (অতীতকালের বিভক্তি)=গইল (উদ্বৃত্ত-স্বর লোপ)>গেল (উদ্বৃত্ত স্বরের সন্ধি)।

গোরু। গোরূপ>গোরুঅ (সূত্র ৩)>গোরু (পদান্তে উদ্বৃত্ত স্বরের লোপ)।

গঁুই। গোমিক>গোমিঅ (সূত্র ৩)<গোঁমিঅ (নাসিক্যীভবন)>গঁুইঅ (সূত্র ৩)>গঁুই (সূত্র ৬)।

গোয়াড়ি। গোপবাটিকা>(গোঅআড়িয়া (অল্পপ্রাণবর্ণের লোপ, ট>ড)> গোআড়ি (উদ্বৃত্তস্বরের সন্ধি ও পদান্তে লোপ)>গোয়াড়ি (য়-শ্রুতি)।

গোঁয়ার। গ্রামনর>গমার (সূত্র ১)>গোঁআর (নাসিক্যীভবন)>গোঁয়ার (য়-শ্রুতি)।

গোঁসাই। গোস্বামি>গোস্‌সামি>গোসাঁই।

ঘড়েল। ঘটিকাপাল>ঘড়িআআল (অল্পপ্রাণবর্ণের লোপ ও ট>ড)>ঘড়ি-আল (উদ্বৃত্তস্বরের সন্ধি)>ঘড়েল (অপিনিহিতি 'ঘইড়াল' ও পরে অভিশ্রুতি ও স্বরসঙ্গতি)। এখানে অর্থাপকর্ষও লক্ষণীয়।

ঘর। গৃহ>গরহ (সূত্র ৯)>ঘর (মহাপ্রাণ 'হ'-য়ের বিপর্যাস)।

ঘঁুটে। ঘূণ্টিক>ঘঁুটিঅ (নাসিক্যীভবন, সূত্র ৩)>ঘঁুটে (স্বরসঙ্গতি, পদান্তে উদ্বৃত্তস্বর লোপ।

চশমা। ফাঃ চশম্ =চক্ষু+(সাদৃশ্যে) 'আ' প্রত্যয়।

চার। চত্বারি>চত্তারি>চাতারি>চাআরি>চারি>চাইর>চার।

চাঁদ। চন্দ্র>চন্দ>চাঁদ।

চিঁড়ে। চিপিটক>চিইড়অ (সূত্র ৩, ১১)>চিড়া (সূত্র ৬)>চিড়ে (স্বর-সঙ্গতি)>চিঁড়ে (স্বতোনাসিক্যীভবন)।

চিরতা। চিরতিক্ত>চিরইত্ত (সূত্র ৩, ৫)>চিরতা (সূত্র ৫, ৬)+স্বার্থিক 'আ' প্রত্যয়।

চুল। চূড়া>চুলা ('ড়-স্থলে ল')>চুল (আদিস্বরে শ্বাসাঘাত-হেতু অন্ত্য 'অ' লোপ)।

চুয়ান্ন। চতুঃপঞ্চাশৎ>চউপন্নাশ (সূত্র ৩)>চউআন্ন>চুয়ান্ন।

চৌকা। চতুষ্ক>চউক্ক (অল্পপ্রাণবর্ণের লোপ ও যুক্তব্যঞ্জনের সমীভবন)> চউকা, চৌকা (যুগ্মব্যঞ্জনের সমীভবন ও'+আ' স্বার্থিক প্রত্যয়)।

ছা। শাব>ছাঅ ('শ'-স্থলে 'ছ', সূত্র ৩)>ছা (সূত্র ৬)।

ছাতিম। সপ্তপর্ণ>সত্তবন্ন (সূত্র ৫)>ছাতিম। *ছত্রিম>ছত্তিম (সূত্র ৫)> ছাতিম (৫)।

ছাতু। শক্তু>শত্তু। ('শ'-স্থলে 'ছ' সূত্র (৫)>ছাতু (৫)।

ছিনা। ক্ষীণক>ছিনঅ ('ক্ষ'-স্থলে 'ছ', সূত্র ৩)>ছিনা (৬)।

ছুতার। সূত্রধর>ছুত্তহর ('স'-স্থলে 'ছ' সূত্র ৫, ৪)>ছুতঅর (৫, ৪)> ছুতার (৬)।

ছেনি। ছেদনিকা>ছেঅনিআ (৩)>ছেনি (৬)।

ছেরাদ্দ। শ্রাদ্ধ>ছেরাদ্দ (অর্ধতৎসম, উচ্চারণবিকৃতিহেতু)।

ছেলে। শাবক>ছাঅআ (৩) +আল=ছাওয়াল+ইক+আ (স্বার্থে)> ছাওয়ালিয়া>ছালিয়া>ছাইলা (অপিনিহিতি)>ছেলে (অভিশ্রুতি)।

জহর। জতুগৃহ>জউঘর>জউহর>জহর (উদ্বৃত্তস্বরের লোপ)। এর অর্থ পরিবর্তনও লক্ষণীয়।

জাউ। যবাগূ>জআউ (সূত্র ৩)>জাউ (সূত্র ৬)।—অর্থপরিবর্তনও লক্ষণীয়।

জাঁদরেল। (ইংরেজি General) জেনারেল>জান্‌রেল (উচ্চারণ-বিকৃতিহেতু) *জান্দরেল (-দ-আগম, যেমন 'বানর>বান্দর>বাঁদর')>জাঁদরেল (নাসিক্যীভবন)। অর্থপরিবর্তনও লক্ষণীয়।

জুয়া। দ্যূতক>জূঅঅ (আদি যুক্তব্যঞ্জনের একক স্বরে পরিণতি ও তালব্যী-ভবন, সূত্র ৩)>জুয়া (৬)>জুআ (য়-শ্রুতি)।

জেঠা। জ্যেষ্ঠতাত>জেট্‌ঠ আঅ (সূত্র ৫, ৩)>জেঠা (৬)।

জেদালো। জেদ+তেজালো—দুটি শব্দের অংশবিশেষ নিয়ে তৈরি 'জোড়কলম' শব্দ।

জোকার। জয়ভার, জয়কার>জঅকার (সূত্র)>জোকার (স্বরসঙ্গতি)।

জোহার। জয়হার>জঅহার (সূত্র ৩)>জোহার (স্বরসঙ্গতি)।

জাঁতি। যন্ত্র>জন্ত (সূত্র ৫) জাঁত (সূত্র ৫, নাসিক্যীভবন)+ই (হ্রস্বার্থে)।

জোঁক। জলৌক>জোক। পদমধ্যস্থ ব্যঞ্জনলোপ ও স্বরের বিপর্যয়>জোঁক (স্বতোনাসিক্যীভবন)।

ঝরে। ক্ষরতি<ঝরই ('ক্ষ'-স্থলে 'ঝ' সূত্র ৩)>ঝরে (সূত্র ৬)।

ঝামা। ক্ষাম>ঝাম ('ক্ষ'-স্থলে 'ঝ')+আ (স্বার্থে)।

ঝি। দুহিতা>ধিতা (মহাপ্রাণবর্ণের বিপর্যাস)>ধিআ (সূত্র ৩)>ঝিআ (তালব্যীভবন)>ঝি (৬)।

ঝিঙ্গে। অজ্ঞাতমূল দেশি শব্দ।

ঝাঁঝ। ঝঞ্ঝা>ঝাঁঝ (সূত্র ৫)।

ঝোঁপ। ক্ষুম্প>ঝুম্প (তালব্যীভবন ও আদি যুক্তব্যঞ্জনের সরলীভবন)> ঝোঁপ (নাসিক্যীভবন)।

টাকা। টঙ্কা>টাকা (সূত্র ৫, বিনাসিক্যীভবন) / তন্‌খা (ফাঃ শব্দ)>টংকা (মূর্ধন্যীভবন)>টাকা।

টেরা/তেরছা। তির্যক>তেরিচ্ছ>তেরছা, টেরা (মূর্ধন্যীভবন)।

ঠাকুর। তিগির (তুর্কী শব্দ)>ঠক্কুর (সংস্কৃতায়িত রূপ)>ঠাকুর (সূত্র ৫)।

ঠাঁই। স্থামিন্>ঠাবি (পদের আদি-যুক্তব্যঞ্জনের সরলীভবন ও স্বতোমূর্ধন্যী-ভবন। পদান্ত ব্যঞ্জনের লোপ)>ঠাঁই (নাসিক্যীভবন)।

ঠোঁট। ওষ্ঠ>ওট্‌ঠ (সমীভবন)>ওঠ (সরলীভবন)>ঠোট (আদিতে সমধ্বনি ঠ-এর আগম)>ঠোঁট (স্বতোনাসিক্যীভবন)।

ঠিকানা। স্থিত>ঠিঅ (আদি-যুক্তব্যঞ্জনের সরলীভবন ও স্বতোমূর্ধন্যীভবন) >ঠিক (উদ্বৃত্ত স্বরলোপ, +স্বার্থে 'ক' প্রত্যয়)>ঠিকানা (+আনা 'অন্ত্যার্থে')।

ডাইয়া। দংশিকা>ডাঁহিআ (মূর্ধন্যীভবন, সূত্র ৩)>ডাইআ (সূত্র ৪)>ডাইয়া (য়-শ্রুতি)—অর্থ: অতিশয় শীত।

ডাইল। দ্বিদল>দিঅল>ড়াইল (মূর্ধন্যীভবন)। দারিত>দারিঅ>দাইর> ডাইল ('র' ও 'ল'-এর অভেদ হেতু)।

ডান। (১) দক্ষিণ>ডাখিন (মূর্ধন্যীভবন, যুক্তব্যঞ্জনের সরলতা)>ডাহিন (সূত্র ৪)>ডাইন (সূত্র ৪)>ডান (উদ্বৃত্তস্বর লোপ)। (২) ডাকিনী>ডাইনি (সূত্র ৩) >ডান (সূত্র ৬)।

ডানপিটে। ডাকিনী-পিণ্ট>ডাইনি পিট্‌ঠ (সূত্র ৩, ৫)>ডানপিটে।

ডুমুর। উদুম্বর>ডুম্বর (আদিস্বর লোপ, স্বতোমূর্ধন্যীভবন) ডুম্বুর (স্বরসঙ্গতি)>ডুমুর (সূত্র ৫)।

ডাঁশা। দংশক>ডংশঅ (স্বতোমূর্ধন্যীভবন, সূত্র ৫)>ডাঁশা (ন্যাসিক্যীভবন)।

তিন। ত্রীণি>তিন্নি>তিনি>তিন।

তিসি। অতসী>তিসি (আদিস্বরলোপ, স্বরসঙ্গতি)।

তেজ। তৃতীয়>তিইজ্জ (সূত্র ১, ৩, ৫)>তেজ (সূত্র ৬, ৫)। যথা—তেজবর।

তেরচা। তির্যক>তেরিচ্ছ>তেরচা।

তেহাই। ত্রিভাগিক>তিহাইঅ (আদি যুক্তব্যঞ্জনের সরলীভবন, মহাপ্রাণবর্ণের 'হ'-কারে পরিণতি ও অল্পপ্রাণ বর্ণের লোপ)>তেহাই (স্বরসঙ্গতি ও পদান্তে উদ্বৃত্ত স্বরের লোপ)।

থই। স্থিতি>থিই (পদের আদি যুক্তব্যঞ্জনের সরলতা ও অল্পপ্রাণবর্ণের লোপ) >থই (সমধ্বনি লোপ)।

থরে। স্তরেণ>থরেণ>থরেঁ>থরে।

থাম। স্তম্ভ>থম্ভ>থম্ম>থাম।

দলুই। দলপতি>দলবই>দলঅই>দলই, দলুই।

দাম। দ্রাখ্‌মে (গ্রীক শব্দ)>দ্রম্য (সং)>দম্ম>দাম।

দুই। দ্বি>দুৱি>দুই।

দেউটি। দীপবর্তিকা>দীঅঅট্টিআ>দীঅটি>দেউটি। দীপবর্তিকা>দীঅ-বত্তিআ>দীয়াবাতি।

দেউল। দেবকুল>দেঅউল>দেউল।

দেউলে। দেবকুলিক > দেঅউলিঅ > দেউলিয়া > দেউলে। অর্থপরিবর্তন লক্ষণীয়।

দেড়। দ্ব্যর্ধ (দ্বি+অর্ধ)>দিঅড্ড>দেড়।

দেরখো। দীপবৃক্ষ>দীঅরুক্‌খ>দীঅরখু ('উ'-কারের বিপর্যাস)>দেরখো।

দেরাজ। (ইংরেজি drawers) ড্রআরজ্‌>দেরাজ (লোকব্যুৎপত্তিহেতু অপরিচিত বিদেশি শব্দ পরিচিত 'দরজা' শব্দের সাদৃশ্যে বাঙলা ভাষায় স্বাঙ্গীকৃত (naturalised loan word) ঋণ শব্দ-রূপে পরিণত হ'য়েছে।)

দেহার। দেবগৃহ>দেবঘর>দেঅহর>দেহার, দেহরা।

দোজ। দ্বিতীয়>দুঅজ্জ>দোজ (বর)।

দাঁত। দন্ত>দাঁত।

নরুন। নখহরণী>নহহরণী>নঅঅরনি>নরনি>নরুইন>নরুন।

নাইয়র। জ্ঞাতিগৃহ>ঞ্যাতিঘর>নাইহর>নাইঅর>নাইয়র।

নাছ। রথ্যা>রচ্ছা>লচ্ছা>লাছ>নাছ। অর্থপরিবর্তন বিশেষ লক্ষণীয়।

নাতি। নপ্তৃক>নত্তিঅ>নাতিঅ>নাতি।

নাপিত। স্নাপিত>ণ্হাপিত>নাপিত।

নিছনি। নির্মঞ্ছনী>নিম্মচ্ছনী>নিছনী।

*নিক্ষিপণী>নিচ্ছিঅনী>নিছনী।

নিরঞ্জন। এটি ভুয়া শব্দ; 'নীরাজনা' এবং 'নিমজ্জন' শব্দ দুটি মিলিতভাবে শব্দটির সৃষ্টি করতে পারে অথবা 'নীরমজ্জন'>'নিরঞ্জন' হ'তে পারে।

নিশ্চুপ। নিশ্চল+চুপ—দু'য়ের মিলনে জোড়কলম শব্দ।

নেওটা। স্নেহবৃত্ত>ণেহবট্ট>নেহঅট্ট>নেওটা।

নেহ। স্নেহ>সিণেহ>নেহ।

পড়শি। প্রতিবেশী>পাড়িএশি>পড়শি।

পড়ে। পততি>পড়ই (স্বতোমূর্ধন্যীভবন)>পড়ে।

পঠতি>পঢ়ই>পঢ়ে>পড়ে।

পনেরো। পঞ্চদশ>পন্নরস>পন্নরহ>পনরঅ>পনেরো।

পয়লা। প্রথম>পধম+ইল্ল (আদি যুক্তব্যঞ্জনের সরলীভবন, ঘোষীভবন)> (মহাপ্রাণ ধ্বনির 'হ'-কারে পরিণতি+স্বার্থে 'আ')>পহেলা, পয়লা (স্বরসঙ্গতি)।

পশে। প্রবিশতি>পবিসই>পইসই>পশে।

পাখালে। প্রক্ষালয়তি>পক্‌খালেতি>পক্‌খালেই>পাখালে।

পাথর। প্রস্তর>পত্থর>পাথর।

পান। পর্ণ>পন্ন>পান।

পালকি। পর্যঙ্কিকা>পল্লঙ্কিকা>পালংক, পালকি।

পালা। পর্যায়>*পর্‌রঅ (সমীভবন)>পল্লঅ>'র'-স্থলে 'ল' আগম)> পালা (সরলীভবন ও পূর্বস্বরের পূরক দীর্ঘতা, উদ্বৃত্ত স্বরের সন্ধি)।

পিসি। পিতৃস্বসৃকা>পিতুসস্‌সিআ>পিউসিআ>পিউসি>পিসি।

পিসে। পিতৃস্বসৃকা-পতি>পিউসিআবই>পিউসাই>পিসাই>পিসে।

পীলা। প্লীহা>পীলহা (বিপর্যাস)>পীলা।

পিতল>পিঅল+স্বার্থে 'আ'>পীলা।

পুছে। পৃচ্ছতি>পুচ্ছদি>পুচ্ছই>পুছই>পুছে।

পেঁপে। পর্তুগীজ 'পাপাইয়া>পাপিয়া>পাইপা>পেপে>পেঁপে (স্বতো-নাসিক্যীভবন)।

পৈঠা। প্রতিষ্ঠা>পইট্‌ঠা (আদি যুক্তব্যঞ্জনের সরলীভবন, অল্পপ্রাণবর্ণের লোপ, যুক্তব্যঞ্জনের সমীভবন)>পইঠা, পৈঠা (সরলীভবন)।

পৈতা। পবিত্রা>পইত্তা>পইতা, পৈতা।

উপবীত>পবীত (আদিস্বর লোপ)>পইত>+স্বার্থে 'আ' পইতা, পৈতা।

পো। পোত>পোঅ>পো।

পুত্র>পুত্ত>পুত>পুঅ>পো।

পোলা। পোতক>পোডঅ>পোলঅ>পোলা।

পোহায়। প্রভাতি>পোহাই>পোহায়।

পাঁচন। প্রাজন>পাজন>পাচন>পাঁচন।

পুঁথি। পুস্তিকা>পুত্থিআ>পুথি>পুঁথি।

ফাক / ফাঁক—ফক্কিকা>ফক্কিআ>ফাকি, ফাঁকি।

ফাগ। ফল্গু>ফগ্গু>ফাগু>ফাউগ>ফাগ।

ফাতনা। ফলকপত্র>ফলঅপত্ত>ফলা+পাতা=ফতা+না>ফাতনা।

ফিরিঙ্গি। (পর্তুগীজ শব্দ) ফ্রাঙ্ক (আধুনিক ফ্রান্স)>ফেরান্‌গ (আরবদের মুখে)>ফেরাঙ্গী (পর্তুগীজ)>ফিরিঙ্গী (য়ুরোপীয়)।

ফেউ। ফেরু>ফেউ।

বটে। বর্ততে>বট্টই>বটই (যুগ্মব্যঞ্জনের পূর্বস্বর দীর্ঘ হ'লো না—এটি ব্যতিক্রম)>বটে।

বসে। উপবিশতি>উবইসই>বইসই (আদিস্বর লোপ)>বইসে>বসে।

বহেড়া। বিভীতক>বিহিটঅ (স্বতোমূর্ধন্যীভবন)>বিহিডঅ (ট>ড)> বিহিডা>বহেড়া।

বাইশ। দ্বাবিংশতি>বাবীশ>বাইশ (এখানে উদ্বৃত্তস্বর সন্ধি হ'লো না বা লোপ পেলো না)।

বাগ। বল্গা>রগ্গা>বাগ।

বাছুর। বৎসরূপ>বচ্ছরূঅ>বাছুরঅ (স্বরবর্ণের বিপর্যয়)>বাছুর।

বাট। বর্ত্ম>বট্ট>বাট।

বাড়ে। বর্ধতে>বড্‌ঢই (মূর্ধন্যীভবন)>বাঢ়ই>বাড়ে।

বাপ। বপ্র>বপ্প>বাপ।

বাবা। বাবা—তুর্কী শব্দ 'শ্রদ্ধেয়' অর্থবোধক, তার সঙ্গে যুক্ত হ'য়েছে প্রাকৃত বপ্প>বাপ।

বারো। দ্বাদশ>দুবাদশ>বাডশ (স্বতোমূর্ধন্যীভবন)>বারহ>বার, বারো।

বালাই। আরবী 'বলা' অর্থ বিপদ+আই। অথবা, 'বালকের অহিত' অর্থে 'বাল+আই>বালাই। (বালাহিত>বালাহিঅ>বালাই)।

বাসর। বাসগৃহ>বাসঘর>বাসহর>বাসর। অর্থ পরিবর্তন লক্ষণীয়।

বাহান্ন। দ্বাপঞ্চাশৎ>বাবন্নাহ (আদি যুক্তব্যঞ্জনের সরলীভবন, প>ব=ঘোষী-ভবন, ঞ্চ>ন্ন=সমীভবন, শ>হ, 'ৎ' অন্ত্যব্যঞ্জন লোপ)>বায়ান্ন (অল্পপ্রাণধ্বনির লোপ ও য়-শ্রুতি, 'হ' লোপ)>বাহান্ন ('হ'-শ্রুতি)।

বিজলি। বিদ্যুৎ>বিজ্জু (পদান্তে ব্যঞ্জন লোপ)>বিজু+স্বার্থে লি> বিজুলি, বিজলি।

বিট্‌লে। বিট (ধূর্ত)+ল (স্বার্থে)। তৎসহ ইংরেজি 'বীট্‌ল্‌' (Beetle) শব্দের ধ্বনিসাদৃশ্য ও অর্থসাদৃশ্য (গোবরে পোকা>বোকা, বদমাস) যুক্ত হওয়াতে 'সঙ্কর শব্দ'-রূপে পরিগণিত হ'তে পারে।

বিয়ে। বিবাহ>বিভা (মহাপ্রাণীভবন)>বিহা (মহাপ্রাণবর্ণের 'হ'-কারে পরিণতি)>বিআ ('হ'-লোপ)>বিয়া (য়-শ্রুতি)>বিয়ে (স্বরসঙ্গতি)। অর্থ পরিবর্তন লক্ষণীয়।

বেগুন। বাতিঙ্গন>বাইঙ্গন>বাইগন>বেগুন।

বেঙ্‌। ব্যাঙ্গ>বঙ্গ>বেঙ্গ>বেঙ্‌।

বোচকা। তুর্কী শব্দ-বোগচা/বোক্‌চা>বোচ্‌কা (বর্ণবিপর্যয়)।

বোন্‌। ভগিনী>বঘিনী (মহাপ্রাণের বিপর্যাস)>বহিনী>বহিন>বইন>বোন।

বোনাই। ভগিনীপতি>বহিনীঅই>বহিনাই>বোনাই।

বোল। মুকুল>মউল (সমধ্বনি লোপ)>মৌল, বৌল>বোল।

বৌ। বধূ>বহু>বউ, বৌ।

বৌরি। বধূটিকা>বহুড়িআ>বউড়ি>বৌরি।

বাঁদর। বানর>বান্দর (দ-শ্রুতি)>বাঁদর (নাসিক্যীভবন)।

ভাই। ভ্রাতৃক>ভাইঅ>ভাই।

ভাজ। ভ্রাতৃজায়া>ভাইজাআ>ভাইজা>ভাউজ>ভাজ।

ভাত। ভক্ত>ভত্ত>ভাত। অর্থ পরিবর্তন লক্ষণীয়।

ভাপ। বাষ্প>বপ্‌ফ>ভাপ (মহাপ্রাণের বিপর্যাস)।

ভাল। ভদ্রক>ভল্লঅ>ভাল।

ভুখ। বুভুক্ষা>ভুক্‌খা>ভুখ্‌, ভুক।

মড়া। মৃতক>মটঅ>মড়অ>মড়া।

ময়দা। সেমিদালিস (গ্রীক শব্দ)>সমিতা (সংস্কৃতায়িত)>মীদা>ময়দা।

মা। মাতা>মাআ>মা।

মাইতি। *মহন্তিক>মহন্তিঅ>মাহিতী>মাইতি।

মাইরি। পর্তুগীজরা Maria (যীশুর মাতা Mary) নামে শপথ গ্রহণ করতো, Maria>মাইরি। বা—By Mary>মাইরি।

মাছ। মৎস্য>মচ্ছ>মাছ।

মাছি। মক্ষিকা>মচ্ছিআ (তালব্যীভবন ও সমীভবন)>মাছি।

মাটি। মৃত্তিকা>মট্টিআ (মূর্ধন্যীভবন)>মাটি ॥

মাসি। মাতৃস্বসৃকা>মাতুসস্‌সিআ>মাউসিআ>মাউসি>মাসি।

মিছা। মিথ্যা>মিচ্ছা (সমীভবন ও তালব্যীভবন)>মিছা।

মিনতি। আরবী 'মিন্নৎ'+বাং 'বিনতি'—জোড়কলম শব্দ।

মুই। *ময়েন>ময়ে*>মুঁই>মুই।

ময়া>ময়ে>মুই।

মেজো। মধ্যক>মজ্ঝঅ (তালব্যীভবন ও সমীভবন)>মাঝ+উয়া=মাঝুয়া>মাউজা (অপিনিহিতি)>মেজো (স্বরসঙ্গতি ও অভিশ্রুতি)।

মেয়ে। মাতৃকা>মাইআ>মেইআ>মেয়ে।

মোছ। শ্মশ্রু>মচ্ছু (আদি যুক্তব্যঞ্জনের সরলীভবন, অন্যোন্য সমীভবন)>মোছ।

মৌরি। মধুরিকা>মহুরিআ>মউরি>মৌরি।

ম্যাড়াপ। ফারসী 'মেহ্‌রাব'>মেরাপ>ম্যাড়াপ।

মণ্ডপ>মাঁড়প>ম্যাড়াপ।

রাখাল। রক্ষপাল>রক্‌খআল>রাখোয়াল>রাখাল।

রাশ। রশ্মি>রস্‌সি>রাসি>রাইশ>রাশ।

রিঠা। অরিষ্ট>অরিট্‌ঠ>অরিঠ+আ>রিঠা (আদিস্বর লোপ)।

রেঁড়ি। এরণ্ড>রেণ্ড+ঈ>রেঁড়ি। (ঐ)

রোজা। উপাধ্যায়>উঅজ্ঝাঅ>ওঝা>রোজা। (আদিতে 'র'-আগম)

রোঁ। রোম>রোঁ।

রোঁদ। ইংরাজি Round শব্দটি ফরাসী উচ্চারণে 'রোঁদ'। চৌকি বা পাহারা দেবার জন্য নিয়মিত পথ পরিক্রমা অর্থে ব্যবহৃত হয়, কৃতঋণ শব্দ।

লাউ। অলাবু>অলাউ>লাউ (আদিস্বর লোপ)

শকরন্দ। শর্করাকন্দ>শক্করঅন্দ>শকরন্দ। (সমাক্ষর লোপ)

শান। পাষাণ>শান।

শাশুড়ি। শ্বশ্রূ>সস্‌সু>সাসু>শাশ+উড়ি>শাশুড়ি।

শাসমল। সহস্রমল্ল>সহস্‌সমল্ল>সাসমল>শাসমল।

শিখ। শিষ্য>সিক্‌খ>শিখ।

শী। সিংহ>সীহ>সী, শী।

শুখা। শুষ্কক>শুক্‌খঅ>শুখা।

শেল। শলা>সেল্ল>শেল।

শোল। শকুল>সউল>শোল।

শাঁকাল্। শঙ্খ>শাঁখ>শাঁক+আল্>শাঁকাল্।

ষোল। ষোড়শ>ষোলহ>ষোল।

সজারু। শল্যকরূপ>সজ্জঅরুঅ>সজারু।

সাউ। সাধু>সাহু>সাউ।

সিঙ্গি। শৃঙ্গী>সিঙ্গি।

সিঙ্গাড়া। শৃঙ্গাটক>সিঙ্গাড়অ>সিঙ্গাড়া। (অর্থ পরিবর্তন লক্ষণীয়)

সেকরা। সিক্কা (ফারসী)>সেক্য (সংস্কৃতায়িত)+কার>সেক্কআর>স্েকারা >সেকরা, স্যাকরা।

সেজ। শয্যা>সেজ্জা>সেজ, শেজ।

সেয়ানা। সজ্ঞান>সঞ্ঞ্ঞান>সেয়ান+আ>সেয়ানা।

সোহাগ। সৌভাগ্য>সোহগ্গ>সোহাগ।

সঁপে। সমর্পয়তি>সমপ্পেদি>সবঁপ্পেই>সঁপে।

সাঁকো। সংক্রম>সক্কম, সক্কব>সাঁকম, সাঁকব>সাঁকো।

সাঁঝ। সন্ধ্যা>সম্‌ঝা>সাঁঝ।

সাঁড়াশি। সংদংশিকা>সণ্ডংসিআ>সাঁড়াশি।

সাঁতরা। সামন্তরাজ>সাঁৱন্তরাঅ>সাঁৱন্তরা>সাঁতরা।

সিঁথি। সীমন্তিকা>সীঁবন্তিঅ>সিঁথি, সিঁতি।

হাওর। সাগর>সাঅর>হাওর (ৱ-শ্রুতি)।

হাত। হস্ত>হত্থ>হাত (আদিস্বরে শ্বাসাঘাত)।

হাল্‌কা। লঘুক>লহুক>হলুক্ক (বর্ণবিপর্যয়)>হাল্কা।

হিয়া। হৃদয়>হিঅঅ>হিআ>হিয়া।

হেঁট। অধস্তাৎ>অহেট্‌ঠ>হেট্টা>হেট্>হেঁট।

হেঁটো। হাঁটু+উয়া>হাঁটুয়া>হাঁউট্য>হেঁটো।

———

(পরিশিষ্ট)

দ্বিতীয় অধ্যায় ॥ আন্তর্জাতিক লিপি ॥
(International Script)

'নানান দেশের নানান ভাষা', আব পৃথিবীব বহু ভাষারই রয়েছে নিজস্ব লিপিমালা (script)। যেমন দূবকে নিকট কববার জন্য, তেমনি পবকেও আপন করবার জন্যই লিপির উদ্ভব। যত দিন যাচ্ছে, ততোই দূবকে নিকট কববার, পরকে আপন করবার প্রয়োজন মানুষ অনুভব কবছে বেশি ক'রে, আর তারই ফলে পরস্পরের ভাষার বোধগম্যতাব এবং লিপির বোধগম্যতার উপর গুরুত্ব আবোপ কবা হয়েছে। কিন্তু মানুষের ক্ষমতা তো সীমাবদ্ধ, তাই কোন মানুষের পক্ষেই সকল মানুষের ভাষা কিংবা লিপি বুঝে ওঠা কিংবা শিক্ষালাভ কবা সম্ভবপব নয়। অতএব বুদ্ধিমান মানুষকে এমন কোন উপায় সৃষ্টি করতে হ'চ্ছে, যার ফলে, ইচ্ছে থাকলে এবং চেষ্টা করলে যে কেউ অপরের কথা কিংবা লেখা বুঝতে পারে। এবং এর সহজতম উপায় হ'লো—এমন কোন কৃত্রিম ভাষা সৃষ্টি কবা—যে ভাষা একটা সার্বজনীন ভাষাব (universal language) মর্যাদা লাভ করবে এবং এমন কোন লিপি-পদ্ধতি আবিষ্কার করা, যার সাহায্যে পৃথিবীর যে কোন ভাষা লিপিবদ্ধ করাই সম্ভবপর। মানুষের এই প্রচেষ্টার ফলেই 'ভোলাপ্যুক', 'এস্‌পেবান্তো' প্রভৃতি বিশ্বভাষাব সৃষ্টি হয়েছে। এবং অনুরূপ চেষ্টাব ফলেই লিপিব ব্যাপাবেও একাধিক আন্তর্জাতিক পদ্ধতির সৃষ্টি সম্ভবপব হযেছে। এদেব মধ্যে প্রধান একটি 'বোমকলিপি' (Roman script), এবং প্রধানতমটি 'আন্তর্জাতিক ধ্বনির্লিপি' (International Phonetic script)—এটিও অবশ্য বোমকলিপি-ভিত্তিকই।

এক ॥ রোমক লিপি (Roman Scripts/Alphabets)

সমগ্র উত্তব ভারতের ভাষা সমূহ (কাশ্মীরী-বাদে) একই মূলভাষা সংস্কৃত থেকে ক্রমবিবর্তনেব মধ্য দিয়ে উদ্ভূত হ্যেছে এবং দক্ষিণ ভারতীয় ভাষাগুলিও সংস্কৃত দ্বারা বহুল পরিমাণে প্রভাবিত হয়েছে; আবাব উত্তব ও দক্ষিণ ভাবতীয় যাবতীয় ভাষাই (সিন্ধী-বাদে) ব্রাহ্মী অক্ষরেরই ক্রমবিবর্তিত রূপের সাহায্যে প্রকাশিত হয়। তৎসত্ত্বেও প্রত্যেক ভাষার নিজস্ব যে লিপিমালা রযেছে তা পবস্পব থেকে পৃথক। পক্ষান্তবে যুরোপীয় ভাষাগুলি প্রধান চারটি মূল থেকে উৎপন্ন—আধুনিক গ্রীক ভাষা—প্রাচীন গ্রীক থেকে, আধুনিক ইতালীয়, ফবাসী, স্পেনীয় প্রভৃতি ভাষা—প্রাচীন লাতিন থেকে, আধুনিক জার্মান, ইংবেজি, ডাচ্, ওলন্দাজ প্রভৃতি ভাষা—প্রাচীন টিউটোনিক/জার্মানিক ভাষা থেকে, আধুনিক ওয়েল্‌স্-এব ভাষা—প্রাচীন কেল্টিক থেকে উৎপন্ন হয়েছে। অথচ লিপিব ব্যাপারে সকল ভাষাই প্রধানতঃ বোমক লিপি ব্যবহার কবে। ফলে যুবোপেব বিভিন্ন দেশের অধিবাসীবা জাতিগত কিংবা ভাষাগত কারণে পৃথক্ হওয়া-সত্ত্বেও তাদেব মধ্যে পারস্পরিক বোধগম্যতার ভাবটি তাই সহজ। ভাবতের বিভিন্ন প্রদেশ তথা রাজ্যেব অধিবাসীরা একই দেশ, জাতি বা রাষ্ট্রেব অধীন হওযা-সত্ত্বেও তাদেব মধ্যে এই লিপিগত কারণেই জাতীয় সংহতি গড়ে উঠতে পারে না। ভাষাগত ঐক্য সৃষ্টি কবা বাস্তবে সম্ভব নয়, কিন্তু লিপিগত ঐক্যও যে জাতীয় জীবনে অনেক সমস্যা সমাধানে সক্ষম, মনীষিগণ বহু পূর্ব থেকেই এ কথা চিন্তা কবে আসছেন।

ইংরেজ শাসনাধীন ভাবতবর্ষে সামরিক বাহিনীতে যে সকল সৈনিক নিযুক্ত হতেন, তারা বিভিন্ন প্রদেশ থেকেই সংগৃহীত হতেন। ফলতঃ সৈনিকদলে ছিল বহুভাষিতার সমস্যা। বিশেষতঃ, সাধারণ সৈনিকরা হতেন অল্পশিক্ষিত ব্যক্তি। কালে তাবা এক প্রকাব 'বাজাবী হিন্দী' বপ্ত করতে পারলেও লেখাব সমস্যার এজাতীয় কোন সহজ সমাধান ছিল না। দূরদর্শী শাসক সম্প্রদায় তখন তাদেব মধ্যে 'রোমক লিপি' (Roman Script) ব্যবহারের নির্দেশ দিয়ে এই জটিল সমস্যারও গ্রন্থিমোচন করেছিলেন। এর ফলে সৈনিকদেব নিজেদেব মধ্যেও ভাবের আদানপ্রদান সহজতর হ'য়ে এসেছিল।

বহু ভাষা ও বহু লিপিব দেশ ভাবতবর্ষে সাধাবণ ভাষা ও সাধাবণ লিপির (common language and common script) সমস্যাটি অঙ্গাঙ্গীভূত নয় বলেই ভাষাব প্রসঙ্গে সাধারণের মধ্যে যেমন

বাদ-বিতণ্ডা এবং বিদ্বজ্জনের মধ্যেও আলোড়ন দেখা দিয়েছে, লিপির প্রসঙ্গে তেমন কিছু হয়নি। স্বাধীনতালাভের পর সরকারীভাবে এ বিষয়ে একটা নীতি গৃহীত হলেও এটা কোন বিদ্বজ্জন-সম্মত সিদ্ধান্ত নয়। কারণ, কোন ভাষাবিজ্ঞানী কিংবা লিপিবিজ্ঞানীই কোন দিক থেকে নাগরী কিংবা আরবী লিপিকে সামগ্রিক ভাবে ভারতীয় লিপি বলে মেনে নিতে পারেন না, যেহেতু, এ দুটির কোনটিই ধ্বনিবিজ্ঞানসম্মত লিপি নয়। এ বিষয়ে আমরা বিশ্ববরেণ্য ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের বিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টিভঙ্গির উপর পরিপূর্ণ ভাবেই নির্ভর করতে পারি।

বহু পূর্ব থেকেই আচার্য সুনীতিকুমার সমগ্র ভারতীয় লিপিরূপে রোমকলিপি ব্যবহারের উপযোগিতার কথা বলে আসছেন। এ বিষয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়-প্রকাশিত 'Journal of the Department of Letters', 1935-এ তাঁর রচনা 'A Roman Alphabet for India' এবং পরবর্তী বহু প্রবন্ধে-নিবন্ধে অতিশয় মূল্যবান তথ্য পরিবেশিত হয়েছে।—সমগ্র ভারতে এক ও অভিন্ন লিপি প্রচলনের মধ্য দিয়ে শুধু যে জাতীয় সংহতি এবং জাতীয় মনোভাবের পরিপোষকতামাত্রই প্রকাশিত হবে, তা নয়, এর পেছনে রয়েছে যথেষ্ট বিজ্ঞান-সম্মত মনোভাব এবং বাস্তবতার সমর্থন। সমগ্র উত্তর ভারতের প্রায় সমস্ত ভাষারই মূল শব্দভাণ্ডার গঠন করেছে সংস্কৃত বা 'তৎসম শব্দ', সংস্কৃত থেকে বিবর্তিতরূপে জাত 'তদ্ভব শব্দ' এবং বিকৃতরূপে জাত 'অর্ধতৎসম শব্দ'। বাংলা ভাষার শব্দভাণ্ডারে এ জাতীয় মোট শব্দসংখ্যা নব্বই শতাংশের কম হবে না, অপরাপর ভাষায়ও ন্যূনাধিক এ রকম হওয়াই সম্ভবপর। কাজেই ভারতের সব ভাষাই যদি রোমক অক্ষরে লিখিত হয়, তবে যে কোন ভারতীয়ই অপর ভাষা-পাঠেও তার মর্ম গ্রহণ করতে পারবে, কারণ ভাষায়-ভাষায় শব্দগত পার্থক্য খুব বেশি নয়।—আমাদের ভারতীয় ভাষাসমূহের ব্যাকরণে সন্নিবিষ্ট বর্ণমালা পৃথিবীতে সর্বাধিক বিজ্ঞানসম্মত এবং সুশৃঙ্খলভাবে বিন্যস্ত হলেও ভারতীয় লিপিমালা ততটা বিজ্ঞানসম্মত নয়। প্রতিটি বর্ণ (letter) যদি এক একটি বিশেষ ধ্বনিরই সঙ্কেতচিহ্ন হয়, তবেই তাকে বিজ্ঞানসম্মত বলা চলে। কিন্তু ভারতীয় ব্যঞ্জনবর্ণে দুটি করে ধ্বনি থাকে—একটি ব্যঞ্জন ও একটি স্বরধ্বনি। যেমন 'ক' = ক্+অ। আবার স্বরবর্ণগুলি প্রত্যেকেই এক একটি ধ্বনির সঙ্কেতচিহ্ন হলেও লিখবার সময় তাদের আকৃতির নানারকম পরিবর্তন ঘটে। যেমন 'উ' ধ্বনি অপর বর্ণের সঙ্গে যুক্ত হলে নানাপ্রকার রূপ ধারণ করে—'ক্+উ' = কু, 'র্+উ' = রু, 'শ্+উ' = শু প্রভৃতি। ফলে অকারণ জটিলতার সৃষ্টি হয়। রোমক অক্ষর একান্তভাবে ধ্বনিভিত্তিক বলেই প্রতিটি ব্যঞ্জনধ্বনি ও প্রতিটি স্বরধ্বনি পৃথকভাবে নির্দিষ্ট রয়েছে। এক সঙ্গে শব্দ লিখিত হলেও এদের আকৃতিগত কোন পরিবর্তন ঘটে না এবং এরা পরস্পর বিচ্ছিন্নই থেকে যায়। কাজেই পৃথক বর্ণরূপে এদের সহজেই চিহ্নিত করা যায়।—'রোমক—Romak'-শব্দে যে ৫টি ধ্বনি আছে, তা' বাংলা লেখা থেকে খুঁজে পাওয়া কষ্টকর, কিন্তু রোমক অক্ষরে প্রত্যেকটি স্বতন্ত্র মহিমায় দেদীপ্যমান।—রোমক অক্ষরে লেখার অপর একটি বড় সুবিধা এই—সব কয়টি বর্ণ লিখতে বাঁ দিক থেকে কলম ডান দিকে এগোয়, কখনো আর বাঁ দিকে ফেরে না। ফলে ঐ ভাষায় লিখতে গেলে কখনো কলম তোলার প্রয়োজন হয় না, লেখার গতি হয় দ্রুততর। 'a' থেকে 'z' পর্যন্ত ক্রমিক অক্ষরগুলি একটানা লিখে যাওয়া চলে। কিন্তু বাংলায় বহু অক্ষরই বামাবর্ত এবং প্যাঁচানো; বিশেষতঃ যুক্তাক্ষর লেখায় প্রচুর কসরতের প্রয়োজন—দ্রুত লেখা অসম্ভব। রোমক লিপিতে তাই সময়ের অপচয়ও অনেকটা নিবারিত হয়। এছাড়াও রোমক লিপিতে কোন যুক্তাক্ষর না থাকায় সামান্য কয়টি মাত্র বর্ণের সাহায্যেই যাবতীয় ধ্বনি প্রকাশ করা যায় বলে মুদ্রণযন্ত্র, টাইপ-রাইটার, টেলিপ্রিন্টার, টেলেক্স, টেলিগ্রাম-আদিতে এর সর্বাধিক ব্যবহারোপযোগিতা দীর্ঘকাল যাবৎ প্রমাণিত। এই কারণেই, পৃথিবীর বহু ভাষায়ই আদিতে নিজস্ব লিপি ব্যবহৃত হলেও পরবর্তী কালে তারা রোমক লিপিকেই নিজস্ব লিপি-রূপে গ্রহণ করে নিয়েছে,—এর বিশেষ উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত তুর্কী ভাষা ও মালয়েশিয়ার ভাষা।

ইংরেজি ভাষায় ব্যবহৃত যে ২৬টি রোমক বর্ণের সঙ্গে আমরা পরিচিত, তাদের সাহায্যে পৃথিবীর সব ভাষার যাবতীয় ধ্বনি প্রকাশ করা সম্ভবপর নয় বলে য়ুরোপে জার্মান, ফরাসী, গ্রীক, রুশ—আদি ভাষায় প্রয়োজন মতো আরো কয়েকটি বর্ণ যোগ করা হয়েছে। কিন্তু তাতে ভাষার জটিলতা বৃদ্ধি পায় বলে, লিপিবিজ্ঞানী মনীষীরা প্রধানতঃ এই ২৬টি বর্ণকেই 'সঙ্কেতিত' অর্থাৎ 'সূচকচিহ্ন যুক্ত' ক'রে যে

'রোমকলিপি' (Roman Alphabets with Diacritical Marks) ব্যবহার করে থাকেন, দীর্ঘকাল যাবৎ ঐটি 'আন্তর্জাতিক লিপি' (International Script) রূপে সুধীসমাজে স্বীকৃতি লাভ ক'রে আসছে। আমাদের বাংলা, হিন্দী, সংস্কৃত আদি ভাষা রোমকলিপির সাহায্যে লিখতে গেলে একদিকে যেমন কতকগুলি বর্ণ অপ্রয়োজনীয় মনে হ'বে (f, q, x, z), তেমনি আমাদের অনেকগুলি ধ্বনিপ্রকাশক (ঙ, ট-বর্গ, শ, ঁ, ঃ প্রভৃতি) বর্ণেরও সেখানে অভাব দেখা যাবে। কিন্তু, সঙ্কেতিত রোমকলিপিতে (Roman Alphabets with Diacritical Marks) সেই অভাব মোচন করা হয়েছে। এর সাহায্যে মোটামুটিভাবে পৃথিবীর প্রায় সব ভাষাই লিপিবদ্ধ করা সম্ভবপর।—নিম্নে বাংলা ভাষার পক্ষে প্রয়োজনীয় সূচকচিহ্নযুক্ত রোমকলিপির পরিচয় দেওয়া হলো ঃ

অ-a আ-ā	ই-i ঈ-ī	উ-u ঊ-ū	ঋ-ṛ	
এ-e/ē	ঐ-oi/ai	ও-o/ō	ঔ-ou/au	
ক-k	খ-kh	গ-g	ঘ-gh	ঙ-n
চ-c	ছ-ch	জ-j	ঝ-jh	ঞ-ñ
ট-t	ঠ-th	ড-ḍ	ঢ-ḍh	ণ-ṇ
ত-t	থ-th	দ-d	ধ-dh	ন-n
প-p	ফ-ph	ব-b	ভ-bh	ম-m
য-y/j	র-r	ল-l	ব-b/v/w	শ-ś
ষ-s	স-s	হ-h	ং-n/ṃ	ঃ-h/ḥ
ঁ-~	ড়-ḍ/ṛ	ঢ়-ḍh/ṛh		

রোমকলিপিতে যখন কোন বাংলা শব্দ বা বাক্য লিপ্যন্তরিত হ'য়ে থাকে, তখন সাধারণতঃ তার প্রতিবর্ণীকরণই (transliteration) সাধিত হয় অর্থাৎ তার বানানের যাথাযথ্য বজায় রাখা হয়, উচ্চারণের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া হয় না। যেমন—'ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর'—'Īśwar candra Vidyāsāgar'। কেহ কেহ উচ্চারণেও যথার্থতা আনবার জন্য আরো কিছু সূচকচিহ্ন ব্যবহার করে থাকেন। আচার্য সুনীতিকুমার রবীন্দ্রনাথের একটা কবিতার দুটি পঙ্‌ক্তির রোমানীকরণ করেছেন নিম্নোক্তক্রমে ঃ

'গান গেয়ে তরী বেয়ে কে আসে পারে।
দেখে যেন মনে হয়—চিনি উহারে॥'
"gānå gēyē tåri bēyē kē āsē pārē;
dēkhē jēnå månē håy—cini uhārē"

লক্ষণীয় যে, এখানে 'অ'-এর সংস্কৃত উচ্চারণ বোঝানোর জন্য তদুপরি বিন্দুচিহ্ন দেওয়া হয়েছে এবং পদান্তে অনুচ্চারিত 'অ'-টিকেও কর্তিতরূপে দেখানো হয়েছে।

এই সূচকচিহ্নযুক্ত রোমকলিপি ব্যবহারের পক্ষে একটি বড় বাস্তব অসুবিধে হ'লো এই, সাধারণ মুদ্রণাগারে অর্থাৎ প্রেসে এ জাতীয় মুদ্রণাক্ষর দুর্লভ, ফলে গ্রন্থ বা সংবাদপত্রাদি মুদ্রণেও এর সহায়তা আশা করা যায় না। তা ছাড়া টাইপ-রাইটার প্রভৃতি যন্ত্রেও এর ব্যবহারোপযোগিতা সন্দেহজনক। আচার্য সুনীতিকুমার বাংলা হিন্দী সংস্কৃত-আদি ভারতীয় ভাষাসমূহ এবং আরবী-ফারসী শব্দসমূহও যাতে ইংরেজি লিপিমালা এবং প্রচলিত চিহ্নগুলির সাহায্যে লেখা যায়, তার একটা হদিশ দিয়েছিলেন বহুদিন আগেই। তিনি "Indo Aryan & Hindi' গ্রন্থের 'An Indo-Roman Alphabet প্রবন্ধে বলেন ঃ

"The necessity for the very cumbersome 'capped' and 'dotted' letters can be removed by the employment of a number of moveable 'indicators' sūcaka-cinha, niśānē-e.'alāmat. Thus, to denote vowel-length, the colon or two dots [:] may be used: the cerebrals may be indicated by means of an

inverted comma facing right [']; the palatal quality by an accent mark [ ]; and nasalisation, by an Italic [*n*] after the nasalised vowel. The single dot on the top of the line [·] can be used for other purposes. There will be no capital letters, an asterisk mark [*] before a word indicating that it is a proper name (or adjective from a proper name)....."

অর্থাৎ তাঁর মূল বক্তব্য—সঙ্কেতিত রোমকলিপির উর্ধ্বাধঃ রেখা বা বিন্দুচিহ্ন বর্জন করেও প্রচলিত চিহ্নগুলি দ্বারা ভারতীয় ভাষাসমূহ লেখা সম্ভবপর। মূল পার্থক্য এই—'আ ঈ' প্রভৃতি—'a : i : ' ; মূর্ধন্যধ্বনি উর্ধ্বকমাযুক্ত—ট ঠ ণ ষ '-t', t'h, n', s'; তালব্যধ্বনি প্রস্বরচিহ্নযুক্ত—ঞ, শ—n'. s'; চন্দ্রবিন্দুযুক্ত স্বরেব পূর্বে বক্ররেখা যুক্ত হবে অথবা পরে ইতালিক '<u>n</u>' যুক্ত হবে—আঁ-'~a :/a:<u>n</u>'। এছাড়া সুনীতিবাবু বলেছেন যে অক্ষবগুলি সাজাতে হবে বাংলাব মতো স্বরবর্ণ, ব্যঞ্জনবর্ণে ক্রমানুসাবে এবং পডতেও হবে বাংলাব মতো করেই। যেমন 'g' = গ ('জি' নয়), 'h' = হ ('এইচ' নয়)। সুনীতিকুমার উক্ত গ্রন্থে তাঁর নির্দেশিত উপায় অবলম্বনে বেদমন্ত্র, সাহিত্যিক হিন্দী, উর্দু ও বাজাবী হিন্দীকে যথাযথভাবে প্রচুব দৃষ্টান্ত সহ প্রযোগ করেছেন। ববীন্দ্রনাথেব 'চিত্ত যেথা ভয়শূন্য উচ্চ যেথা শির'—পঙ্‌ক্তিটির সাধু হিন্দী ভাষায রোমক লিপ্যন্তর .

'jaha:<u>n</u> citta bhay-śu.nya hai. jaha:<u>n</u> mastak ucca rahta: hai'। বাংলা ভাষার রোমক লিপ্যন্তব হতে পারে—

'citta yetha. bhay-śunya ucca yetha. śir'।—অবশ্যই এটি বানান-অনুসাবী।

দুই ॥ আন্তর্জাতিক ধ্বনিলিপি (International Phonetic Alphabets/I.P.A)

মূলতঃ ধ্বনিব বাহক-রূপেই লিপিব আবির্ভাব ঘটলেও কালে কালে ধ্বনিতে যে বৈচিত্র্য সৃষ্টি হয়, লিপি সেই সব বৈচিত্র্যকে যথাযথভাবে বহন ক'রে উঠতে পারে না। ধ্বনিব বৈচিত্র্য সৃষ্টি বা প্রকাশ যত সহজ, লিপিতে তদনুরূপ পরিবর্তন আনা সহজসাধ্য নয়, কাবণ লিপিব স্থিতিশীলতা বা জডতাধর্মই এ বিষয়ে প্রধান প্রতিবন্ধক। যে কোন ভাষায প্রথম যখন লিপিব সৃষ্টি হয, তখন লিপিতে আর ধ্বনিতে থাকে পরিপূর্ণ সঙ্গতি, কালে কালে প্রাকৃতিক কারণেই ধ্বনিব বৈচিত্র্য ও জটিলতা বৃদ্ধি পেতে থাকে, লিপিরও হয়তো আকৃতিগত পবিবর্তন ঘটে, কিন্তু কোন গুণগত পরিবর্তন ঘটে না।—একালের ধ্বনিবিজ্ঞানীবা ধ্বনিব সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ কবতে গিযে ধ্বনির যথাযথ রূপাযণেব অর্থাৎ লিপির সমস্যায পড়েছেন। ধ্বনিব বৈচিত্র্য প্রকাশের জন্য প্রচলিত লিপিব সামর্থ্য বিচাব করেই তাঁবা তার সমাধানে সচেষ্ট হলেন। প্রাথমিক পর্যাযে তাঁরা প্রত্যেকেই নিজেদেব জ্ঞানবুদ্ধি-অনুযায়ী ভিন্ন 'সূচকচিহ্ন' (Indicator) বা বর্ণ (letter) ব্যবহার কবে প্রযোজন সাধন করতেন। তাতে বৈজ্ঞানিক বিচাবে কোন ত্রুটি না ঘটলেও ব্যবহারিক কারণে নানা অসুবিধাব সৃষ্টি হয়েছে। একই ধ্বনি প্রকাশের জন্য বিভিন্ন গ্রন্থে যদি ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ বা সঙ্কেতচিহ্ন ব্যবহাব করা হয, তবে পাঠকদের নিশ্চিতই সংশয়ে পড়তে হয়। এই অসুবিধা দূরীকরণেব উদ্দেশ্যেই সূচকচিহ্ন-যুক্ত সার্বজনীন বোমক লিপিব ব্যবহাব শুরু হয়েছিল।

সাধারণভাবে সঙ্কেতিত রোমকলিপির সাহায্যে পৃথিবীর অনেক ভাষার লিখিত রূপের প্রতিবর্ণীকরণ সম্ভবপর হলেও বোমকলিপির সহায়তায যাবতীয় ধ্বনি-বৈচিত্র্য প্রকাশ সম্ভব নয়, তা' ছাড়া যথার্থ ধ্বনিতাত্ত্বিক লিপি রূপাযণও রোমকলিপির সাহায্যে সম্ভবপর নয়। অধিকন্তু বোমকলিপির উপরে নীচে বা পাশে যে সকল সূচক চিহ্ন দিতে হয, তাতে অযথা লিপিতে জটিলতারও সৃষ্টি হয। এই সমস্ত অসুবিধা নিরসনের উদ্দেশ্যেই ১৮৮৮ খ্রীঃ যে 'আন্তর্জাতিক ধ্বনি সংস্থা' (L' Association Phonetique Internationale) গঠিত হয়, তাদের প্রবর্তনায় সৃষ্ট হয় 'আন্তর্জাতিক ধ্বনিবর্ণমালা' (International Phonetic Alphabet)। এব প্রধান উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বলা হয়েছে: "One of the original objectives of this organisation was the creation of an alphabet which would have a distinctive symbol for every sound in human speech, and which would supplant the chaos of notations, then in use, by one internationally

recognised standard." প্রথমারম্ভের পর, যেমন যেমন ধ্বনিতত্ত্বের গবেষণার ফলে নতুন নতুন প্রয়োজন দেখা দিয়েছে, তেমনভাবে তার সঙ্গে তাল রেখে নতুন নতুন বর্ণও যোজনা করা হয়েছে। প্রক্রিয়াটি এখনো চলছে।—এই আন্তর্জাতিক ধ্বনিলিপি গ্রহণ করবার ফলে কোন বর্ণের সঙ্গে আর সূচকচিহ্ন যোগ করাব প্রয়োজন রইলো না। যদি সূচক-চিহ্ন বর্জনকে সংস্থা একটি মূল নীতিহিশেবেই গ্রহণ করেছিল, তৎসত্ত্বেও ধ্বনির সংখ্যা কালে এত বৃদ্ধি পায় যে কিছু কিছু সূচকচিহ্ন শেষ পর্যন্ত মেনে নিতে হয়েছে।

আমেবিকাব ধ্বনিবিজ্ঞানীরা—যারা প্রধানতঃ 'আমেরিন্দ ভাষা' (আমেরিকান্ ইন্ডিয়ান্ অর্থাৎ রেড্ ইন্ডিয়ান্‌দের ভাষা) নিয়েই প্রধানত গবেষণা করে থাকেন , তাঁরা আন্তর্জাতিক ধ্বনিলিপির নীতির দিকে ততটা দৃষ্টি না দিয়ে প্রধানতঃ ব্যবহারিক সুবিধার প্রতি লক্ষ্য রেখে বিভিন্ন সঙ্কেতচিহ্ন ব্যবহার করেন। বিশেষতঃ তাঁবা 'ধ্বনিলিপি' (Phonetic transcription) অপেক্ষাও 'ধ্বনিতা-লিপি'র (Phonemic transcription) উপব সমধিক গুরুত্ব আরোপ করে থাকেন। ফলতঃ তাঁদের ব্যবহৃত লিপি সর্বাংশে আন্তর্জাতিক ধ্বনিলিপির অনুরূপ নয়। অবশ্য এর প্রয়োজনীয়তার উপরও তাঁরা তেমন গুরুত্ব আরোপ কবেন না। গ্লীসন এই সঙ্কেত-চিহ্ন ব্যবহারে ভিন্নতা-বিষয়ক সমস্যা-সম্বন্ধে বলেন : "From a purely scientific point of view this problem is trivial. Symbols can be assigned arbitrarily. Some linguists have certainly exploited this liberty too freely." যাহোক্, দেখা যায় ব্রিটিশ ধ্বনিবিজ্ঞানী এবং তাদের অনুসারীরা, বিশেষতঃ Daniel Jones, John Samuel Kenyon, Charles Kenneth Thomas ও Ida C. Ward-এর মতো প্রধান ধ্বনিবিজ্ঞানীবাও প্রধানতঃ পূর্বোক্ত আন্তর্জাতিক ধ্বনিলিপিই অনুসরণ ক'রে থাকেন। তবে আন্তর্জাতিক ধ্বনিলিপি কোন অপরিবর্তনীয় ব্যাপার নয়। বস্তুতঃ ধ্বনিবিজ্ঞানীগণ পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষার ধ্বনি এবং ধ্বনিতা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে যে সকল নতুন বা অপরিজ্ঞাত ধ্বনির সম্মুখীন হচ্ছেন, তাদেরও একটা ক'বে রূপ দিতে হচ্ছে, ফলতঃ ধ্বনিলিপিব সংখ্যা যেমন কালে কালে বৃদ্ধি পাচ্ছে, তেমনি কোন কোন ক্ষেত্রে তাদেব আকারগত রূপান্তরও সাধিত হচ্ছে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, যে-কোন ভাষার বিশেষ বিশেষ ধ্বনিব ক্ষেত্রে অঞ্চলভেদে বিলক্ষণ বৈষম্যের সৃষ্টি হযে থাকে। ধ্বনিতাত্ত্বিক রূপায়ণে এই ধ্বনি-বৈষম্যও যথাযথ মর্যাদা-লাভের যোগ্য। নিম্নে একটি দৃষ্টান্ত প্রদত্ত হলো।

'চ' [c] একটি ধ্বনি—ব্যাকরণ/ধ্বনিবিজ্ঞানেব ভাষায় এটি 'অঘোষ তালব্য স্পৃষ্ট অল্পপ্রাণ' ধ্বনি (unvoiced and unaspirated palatal stop)—বৈদিক যুগে এর উচ্চাবণ বর্তমান ছিল (অনেকটা -'ক্য' 'ky'-এব অনুরূপ)। সংস্কৃত এবং আধুনিক বাঙলায় এটি 'তালব্য ঘৃষ্ট' (palatal affricate) হয়ে দাঁড়িযেছে, ফলে আন্তর্জাতিক ধ্বনিলিপিতে এর রূপ [ç]; আবার পূর্ববঙ্গীয় আঞ্চলিক ভাষায় এটি 'দন্ত্য'/'দন্তমূলীয় ঘৃষ্ট' (dental/alveolar affricate) রূপ লাভ করেছে, ফলে এর আন্তর্জাতিক ধ্বনিরূপলিপি—[t͡s]; ইংরেজিতে এর উচ্চারণ 'উর্ধ্বদন্তমূলীয তালব্য ঘৃষ্ট' (Supra-alveolar and palatal affricate), আন্তর্জাতিক রূপ [ʧ]।

মার্কিন ধ্বনিবিজ্ঞানীদের একটি ধারা 'আন্তর্জাতিক ধ্বনিলিপি' (International Phonetic Alphabets) অপেক্ষা 'আন্তর্জাতিক ধ্বনিতালিপিই' সমধিক পছন্দ করে থাকেন। তাঁরা দুটি লিপিকেই স্বীকৃতি দান করেন—'ধ্বনিলিপি'কে (Phonetic transcription) তাঁরা বলেন 'সূক্ষ্মলিপ্যন্তর' (Narrow Transcription) এবং 'ধ্বনিতালিপি'কে (Phonemic transcription) বলেন 'স্থূল লিপ্যন্তর' (Broad Transcription)। ধ্বনিলিপি বা সূক্ষ্ম লিপ্যন্তরের সহায়তায় ধ্বনির যথাযথ রূপ অর্থাৎ পরিবেশগত অথবা অপর কোন কারণে যে ধ্বনিগত কিছু বৈষম্য সৃষ্টি হয়, সেটিও প্রতিফলিত হয়। সহজভাষায় বলা যায়, কোন কোন ধ্বনির যে একাধিক ধ্বনিতা (Phoneme)-হেতু রূপান্তর ঘটে ধ্বনিলিপি/সূক্ষ্ম লিপ্যন্তরে সেই রূপান্তরটুকু দেখিয়ে দিতে হয়। কিন্তু 'ধ্বনিতালিপি'/'স্থূল লিপ্যন্তরে' ধ্বনিতা-সহ মূলধ্বনির একটিমাত্র রূপই ব্যবহৃত হবে। যেমন—'ইংরেজি 'cat' শব্দটির ধ্বনিতালিপি হবে /kæt/, কিন্তু এর যথার্থ উচ্চারণ ইংরেজিতে 'খ্যাট্' এবং এইরূপটি ধরা পড়ে ধ্বনিলিপিতে [kʰæt]।

inverted comma facing right [']; the palatal quality by an accent mark [ ]; and nasalisation, by an Italic [*n*] after the nasalised vowel. The single dot on the top of the line [·] can be used for other purposes. There will be no capital letters, an asterisk mark [*] before a word indicating that it is a proper name (or adjective from a proper name)....."

অর্থাৎ তাঁর মূল বক্তব্য—সঙ্কেতিত রোমকলিপির ঊর্ধ্বাধঃ রেখা বা বিন্দুচিহ্ন বর্জন করেও প্রচলিত চিহ্নগুলি দ্বারা ভারতীয় ভাষাসমূহ লেখা সম্ভবপর। মূল পার্থক্য এই—'আ ঈ' প্রভৃতি—'a : ı : ' ; মূর্ধন্যধ্বনি ঊর্ধ্বকমাযুক্ত—ট ঠ ণ ষ '-t', t'h, n', s'; তালব্যধ্বনি প্রস্বরচিহ্নযুক্ত—ঞ, শ—n'. s'; চন্দ্রবিন্দুযুক্ত স্বরের পূর্বে বক্ররেখা যুক্ত হবে অথবা পরে ইতালিক '**n**' যুক্ত হবে—আঁ-'~a :/a:n'। এছাড়া সুনীতিবাবু বলেছেন যে অক্ষরগুলি সাজাতে হবে বাংলার মতো স্বরবর্ণ, ব্যঞ্জনবর্ণে ক্রমানুসারে এবং পড়তেও হবে বাংলার মতো করেই। যেমন 'g' = গ ('জি' নয়), 'h' = হ ('এইচ' নয়)। সুনীতিকুমার উক্ত গ্রন্থে তাঁর নির্দেশিত উপায় অবলম্বনে বেদমন্ত্র, সাহিত্যিক হিন্দী, উর্দু ও বাজারী হিন্দীকে যথাযথভাবে প্রচুর দৃষ্টান্ত সহ প্রয়োগ করেছেন। রবীন্দ্রনাথের 'চিত্ত যেথা ভয়শূন্য উচ্চ যেথা শির'—পঙ্‌ক্তিটির সাধু হিন্দী ভাষায় রোমক লিপ্যন্তর

'jaha:n citta bhay-śu:nya haı. jaha·n mastak ucca rahta: haı'। বাংলা ভাষার রোমক লিপ্যন্তর হতে পারে—

'citta yetha· bhay-śunya ucca yetha. śır'।—অবশ্যই এটি বানান-অনুসারী।

দুই ॥ আন্তর্জাতিক ধ্বনিলিপি (International Phonetic Alphabets/I.P.A)

মূলতঃ ধ্বনির বাহক-রূপেই লিপির আবির্ভাব ঘটলেও কালে কালে ধ্বনিতে যে বৈচিত্র্য সৃষ্টি হয়, লিপি সেই সব বৈচিত্র্যকে যথাযথভাবে বহন ক'রে উঠতে পারে না। ধ্বনির বৈচিত্র্য সৃষ্টি বা প্রকাশ যত সহজ, লিপিতে তদনুরূপ পরিবর্তন আনা সহজসাধ্য নয়, কারণ লিপির স্থিতিশীলতা বা জড়তাধর্মই এ বিষয়ে প্রধান প্রতিবন্ধক। যে কোন ভাষায় প্রথম যখন লিপির সৃষ্টি হয়, তখন লিপিতে আর ধ্বনিতে থাকে পরিপূর্ণ সঙ্গতি; কালে কালে প্রাকৃতিক কারণেই ধ্বনির বৈচিত্র্য ও জটিলতা বৃদ্ধি পেতে থাকে, লিপিরও হয়তো আকৃতিগত পরিবর্তন ঘটে, কিন্তু কোন গুণগত পরিবর্তন ঘটে না।—একালের ধ্বনিবিজ্ঞানীরা ধ্বনির সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করতে গিয়ে ধ্বনির যথাযথ রূপায়ণের অর্থাৎ লিপির সমস্যায় পড়েছেন। ধ্বনির বৈচিত্র্য প্রকাশের জন্য প্রচলিত লিপির সামর্থ্য বিচার করেই তাঁরা তার সমাধানে সচেষ্ট হলেন। প্রাথমিক পর্যায়ে তাঁরা প্রত্যেকেই নিজেদের জ্ঞানবুদ্ধি-অনুযায়ী ভিন্ন 'সূচকচিহ্ন' (Indicator) বা বর্ণ (letter) ব্যবহার করে প্রয়োজন সাধন করতেন। তাতে বৈজ্ঞানিক বিচারে কোন ত্রুটি না ঘটলেও ব্যবহারিক কারণে নানা অসুবিধার সৃষ্টি হয়েছে। একই ধ্বনি প্রকাশের জন্য বিভিন্ন গ্রন্থে যদি ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ বা সঙ্কেতচিহ্ন ব্যবহার করা হয়, তবে পাঠকদের নিশ্চিতই সংশয়ে পড়তে হয়। এই অসুবিধা দূরীকরণের উদ্দেশ্যেই সূচকচিহ্ন-যুক্ত সার্বজনীন রোমক লিপির ব্যবহার শুরু হয়েছিল।

সাধারণভাবে সঙ্কেতিত রোমকলিপির সাহায্যে পৃথিবীর অনেক ভাষার লিখিত রূপের প্রতিবর্ণীকরণ সম্ভবপর হলেও রোমকলিপির সহায়তায় যাবতীয় ধ্বনি-বৈচিত্র্য প্রকাশ সম্ভব নয়, তা' ছাড়া যথার্থ ধ্বনিতাত্ত্বিক লিপি রূপায়ণও রোমকলিপির সাহায্যে সম্ভবপর নয়। অধিকন্তু রোমকলিপির উপরে নীচে বা পাশে যে সকল সূচক চিহ্ন দিতে হয়, তাতে অযথা লিপিতে জটিলতারও সৃষ্টি হয়। এই সমস্ত অসুবিধা নিরসনের উদ্দেশ্যেই ১৮৮৮ খ্রীঃ যে 'আন্তর্জাতিক ধ্বনি সংস্থা' (L' Association Phonetique Internationale) গঠিত হয়, তাদের প্রবর্তনায় সৃষ্ট হয় 'আন্তর্জাতিক ধ্বনিবর্ণমালা' (International Phonetic Alphabet)। এর প্রধান উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বলা হয়েছে: "One of the original objectives of this organisation was the creation of an alphabet which would have a distinctive symbol for every sound in human speech, and which would supplant the chaos of notations, then in use, by one internationally

recognised standard." প্রথমারম্ভের পর, যেমন যেমন ধ্বনিতত্ত্বের গবেষণার ফলে নতুন নতুন প্রয়োজন দেখা দিয়েছে, তেমনভাবে তার সঙ্গে তাল রেখে নতুন নতুন বর্ণও যোজনা করা হয়েছে। প্রক্রিয়াটি এখনো চলছে।—এই আন্তর্জাতিক ধ্বনিলিপি গ্রহণ করবার ফলে কোন বর্ণের সঙ্গে আর সূচকচিহ্ন যোগ করার প্রয়োজন রইলো না। যদি সূচক-চিহ্ন বর্জনকে সংস্থা একটি মূল নীতিহিশেবেই গ্রহণ করেছিল, তৎসত্ত্বেও ধ্বনির সংখ্যা কালে এত বৃদ্ধি পায় যে কিছু কিছু সূচকচিহ্ন শেষ পর্যন্ত মেনে নিতে হয়েছে।

আমেবিকার ধ্বনিবিজ্ঞানীরা—যাবা প্রধানতঃ 'আমেরিন্দ ভাষা' (আমেরিকান্ ইন্ডিয়ান্ অর্থাৎ রেড্ ইন্ডিয়ান্দের ভাষা)নিযেই প্রধানত গবেষণা করে থাকেন , তাঁরা আন্তর্জাতিক ধ্বনিলিপির নীতির দিকে ততটা দৃষ্টি না দিয়ে প্রধানতঃ ব্যবহারিক সুবিধার প্রতি লক্ষ্য রেখে বিভিন্ন সঙ্কেতচিহ্ন ব্যবহার করেন। বিশেষতঃ তাঁরা 'ধ্বনিলিপি' (Phonetic transcription) অপেক্ষাও 'ধ্বনিতা-লিপি'র(Phonemic transcription) উপর সমধিক গুরুত্ব আরোপ করে থাকেন। ফলতঃ তাঁদের ব্যবহৃত লিপি সর্বাংশে আন্তর্জাতিক ধ্বনিলিপির অনুরূপ নয়। অবশ্য এর প্রয়োজনীয়তাব উপরও তাঁরা তেমন গুরুত্ব আরোপ কবেন না। গ্লীসন এই সঙ্কেত-চিহ্ন ব্যবহারে ভিন্নতা-বিষয়ক সমস্যা-সম্বন্ধে বলেন : "From a purely scientific point of view this problem is trivial. Symbols can be assigned arbitrarily. Some linguists have certainly exploited this liberty too freely." যাহোক্, দেখা যায় ব্রিটিশ ধ্বনিবিজ্ঞানী এবং তাদের অনুসারীরা, বিশেষতঃ Daniel Jones, John Samuel Kenyon, Charles Kenneth Thomas ও Ida C. Ward-এব মতো প্রধান ধ্বনিবিজ্ঞানীরাও প্রধানতঃ পূর্বোক্ত আন্তর্জাতিক ধ্বনিলিপিই অনুসবণ ক'রে থাকেন। তবে আন্তর্জাতিক ধ্বনিলিপি কোন অপরিবর্তনীয় ব্যাপার নয়। বস্তুতঃ ধ্বনিবিজ্ঞানীগণ পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষার ধ্বনি এবং ধ্বনিতা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে যে সকল নতুন বা অপরিজ্ঞাত ধ্বনির সম্মুখীন হচ্ছেন, তাদেরও একটা ক'বে রূপ দিতে হচ্ছে, ফলতঃ ধ্বনিলিপির সংখ্যা যেমন কালে কালে বৃদ্ধি পাচ্ছে, তেমনি কোন কোন ক্ষেত্রে তাদের আকারগত রূপান্তরও সাধিত হচ্ছে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, যে-কোন ভাষার বিশেষ বিশেষ ধ্বনিব ক্ষেত্রে অঞ্চলভেদে বিলক্ষণ বৈষম্যের সৃষ্টি হযে থাকে। ধ্বনিতাত্ত্বিক রূপায়ণে এই ধ্বনি-বৈষম্যও যথাযথ মর্যাদা-লাভের যোগ্য। নিম্নে একটি দৃষ্টান্ত প্রদত্ত হলো।

'চ' [c] একটি ধ্বনি—ব্যাকরণ/ধ্বনিবিজ্ঞানের ভাষায় এটি 'অঘোষ তালব্য স্পৃষ্ট অল্পপ্রাণ' ধ্বনি (unvoiced and unaspirated palatal stop)—বৈদিক যুগে এর উচ্চাবণ বর্তমান ছিল (অনেকটা -'ক্য' 'ky'-এর অনুরূপ)। সংস্কৃত এবং আধুনিক বাঙলায় এটি 'তালব্য ঘৃষ্ট' (palatal affricate) হয়ে দাঁড়িয়েছে, ফলে আন্তর্জাতিক ধ্বনিলিপিতে এর রূপ [ʧ]; আবার পূর্ববঙ্গীয় আঞ্চলিক ভাষায় এটি 'দন্ত্য'/'দন্তমূলীয় ঘৃষ্ট' (dental/alveolar affricate) রূপ লাভ করেছে, ফলে এর আন্তর্জাতিক ধ্বনিরূপলিপি—[t͡s], ইংরেজিতে এর উচ্চারণ 'ঊর্ধ্বদন্তমূলীয় তালব্য ঘৃষ্ট' (Supra-alveolar and palatal affricate), আন্তর্জাতিক রূপ [t͡ʃ]।

মার্কিন ধ্বনিবিজ্ঞানীদের একটি ধারা 'আন্তর্জাতিক ধ্বনিলিপি' (International Phonetic Alphabets) অপেক্ষা 'আন্তর্জাতিক ধ্বনিতালিপিই' সমধিক পছন্দ করে থাকেন। তাঁরা দুটি লিপিকেই স্বীকৃতি দান করেন—'ধ্বনিলিপি'কে (Phonetic transcription) তাঁরা বলেন 'সূক্ষ্মলিপ্যন্তর' (Narrow Transcription) এবং 'ধ্বনিতালিপি'কে (Phonemic transcription) বলেন 'স্থূল লিপ্যন্তব' (Broad Transcription)। ধ্বনিলিপি বা সূক্ষ্ম লিপ্যন্তরের সহায়তায় ধ্বনির যথাযথ রূপ অর্থাৎ পরিবেশগত অথবা অপর কোন কারণে যে ধ্বনিগত কিছু বৈষম্য সৃষ্টি হয়, সেটিও প্রতিফলিত হয়। সহজভাষায় বলা যায়, কোন কোন ধ্বনির যে একাধিক ধ্বনিতা (Phoneme)-হেতু রূপান্তর ঘটে ধ্বনিলিপি/সূক্ষ্ম লিপ্যন্তরে সেই রূপান্তরটুকু দেখিয়ে দিতে হয়। কিন্তু 'ধ্বনিতালিপি'/'স্থূল লিপ্যন্তরে' ধ্বনিতা-সহ মূলধ্বনির একটিমাত্র রূপই ব্যবহৃত হবে। যেমন—'ইংরেজি 'cat' শব্দটির ধ্বনিতালিপি হবে /kæt/, কিন্তু এর যথার্থ উচ্চারণ ইংরেজিতে 'খ্যাট্' এবং এইরূপটি ধরা পড়ে ধ্বনিলিপিতে [kʰæt]।

উপর্যুক্ত দৃষ্টান্তটি থেকে দেখা গেল, ধ্বনিতালিপি অপেক্ষা ধ্বনিলিপিতে জটিলতা বাড়ে। অতএব সঙ্গত কারণেই প্রশ্ন হতে পারে, কোন্‌টি গ্রহণযোগ্য? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে হলে আর একটি প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড়াতে হয়। প্রশ্নটি এই ঃ আমরা আন্তর্জাতিক ধ্বনিলিপি (অথবা ধ্বনিতালিপি) ব্যবহার করি কেন? নিশ্চয়ই এটি স্বভাষা-ভাষীদের প্রযোজনের দিকে তাকিয়ে ততটা নয়, যতটা ভিন্নভাষাভাষী তথা ভিন্ন লিপি ব্যবহারকারীর প্রয়োজনেব তাগিদে। স্বভাষাভাষী আমার ভাষার ধ্বনিতা বা স্বনিম (phoneme)-বিষয়ে অবহিত বলেই তিনি ধ্বনিতা-লিপি-ব্যবহারে অসুবিধে বোধ না-ও করতে পারেন। যেমন, তিনি 'শীল' এবং 'শ্লীল' (স=স্লীল) শব্দদ্বয়েব উচ্চারণে যে 'শ'-এব ধ্বনিগত বৈচিত্র্য দেখা যায়, তা' জানেন, অতএব /ʃil/ এবং /ʃlil/—এই দুই ক্ষেত্রে যে ʃ-এর উচ্চারণগত পার্থক্য রয়েছে (প্রথম ক্ষেত্রে =শ, দ্বিতীয় ক্ষেত্রে = স),. সেটা উচ্চাবণে বজায রাখতে পারবেন। কিন্তু একজন ভিন্ন ভাষা-ভাষী, যিনি বাঙলা ভাষার ধ্বনি-প্রকৃতি-বিষযে অবহিত নন. তিনি কি দ্বিতীয় স্থলেও 'ʃ'-কে শ'-রূপে উচ্চারণ করবেন না? এমন কি স্বভাষাভাষীর পক্ষেও এমনতবো ভ্রান্তি অসম্ভব নয়! /bæʃto/ = 'ব্যস্ত' তো একজন পূর্ববঙ্গীয়ের মুখে 'ব্যাশ্ তো'—সম্পূর্ণ ভিন্নার্থক শব্দগুচ্ছ হয়ে দাঁড়াতে পারে। ইংরেজি /kæt/ শতকরা ৯৯ জনেব মুখেই 'ক্যাট' হয়ে দাঁড়ায়, প্রকৃত ইংবেজি উচ্চারণটি ('খ্যাট্') ক্বচিৎ-ই শোনা যায। কিন্তু এই সমস্ত ক্ষেত্রে যদি ধ্বনিলিপি (Phonetic script) ব্যবহৃত হয, তবে যে কোন ব্যক্তির মুখেই যথার্থ উচ্চারণটি শোনা যাবে। যেমন [ʃil] = শীল, [slil] = স্লীল (শ্লীল), [bæsto] = ব্যাস্তো, [kʰæt] = খ্যাট্। আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'Origin and Development of Bengali Language' নামক মহাগ্রন্থেব ৩য খণ্ডে আন্তর্জাতিক ধ্বনিলিপি (International Phonetic Alphabets) ব্যবহাব করেই বৈদিক থেকে আধুনিক বাঙলা পর্যন্ত—সর্বস্তরের ধ্বনিব রূপাযণ প্রদর্শন করেছেন। তিনি রবীন্দ্রনাথের 'সোনার তরী' কবিতার দুটি পঙ্‌ক্তির যে ধ্বনিলিপি রচনা করেছেন, নিম্নে তা' দেখানো হলো।

> 'গান গেযে তবী বেয়ে কে আসে পাবে!
> দেখে যেন মনে হয—চিনি উহারে॥
> [gan geẽe tori beẽe ke aʃe pare,
> dekhe ʒæno mone ɦɔẽ, cʃini uɦare]

লিপ্যন্তরীকরণের কয়েকটি নিয়ম ঃ

১· প্রতিটি তাৎপর্যপূর্ণ ধ্বনিব জন্য একটিমাত্র সঙ্কেতচিহ্ন তথা বর্ণই ব্যবহার্য।

২· প্রতিটি সঙ্কেতচিহ্ন তথা বর্ণেব সাহায্যে একটি মাত্র ধ্বনির দ্যোতনা হবে।

৩· 'আন্তর্জাতিক ধ্বনিলিপি' (International Phonetic Script) সবসময়ই বন্ধনীচিহ্ন [ ] দ্বারা সীমাবদ্ধ থাকবে।—লিপি—[lipi]।

৪· 'আন্তর্জাতিক ধ্বনিতালিপি (International Phonemic Script) সর্বদাই দুটি তির্যক রেখার '/ /' ভিতর থাকবে।—লিপি—/lipi/।

৫· স্বরের দীর্ঘতা বোঝানোর জন্য স্বরবর্ণের পর দ্বিবিন্দু অর্থাৎ 'কোলন' চিহ্ন (ঃ) যুক্ত হবে।—'দীন তারিণীতারা'—[di:nɔ]

৬· সানুনাসিক ধ্বনি বোঝাতে স্বরবর্ণের মাথায 'বক্রচিহ্ন' (~) যুক্ত হবে।—বাঁশ—[bãʃ]

৭· অবরুদ্ধ ধ্বনি (Recursive/Implosive) বোঝাতে ব্যঞ্জন ধ্বনিটির মাথার পাশে একটা 'ইলেকচিহ্ন' বা উর্ধ্বকমা যোগ করতে হয়।—(পূর্ববঙ্গীয় উচ্চারণে ভাত =) বা'ত—/b'at/।

৮· ঘৃষ্টধ্বনির রূপান্তরের দ্বিব্যঞ্জন উর্ধ্ববেষ্টনীসহ ব্যবহৃত হবে—["Affricates are normally represented by groups of two consonants (ts, tʃ. dʒ, etc.)..."]—চেয়ে—[cʃeẽe]। চ, জ—[cʃ, ʒʒ]।

৯· যৌগিক স্বরধ্বনিব জন্য দুটি স্বরবর্ণ তলবেষ্টনী দ্বাবা যুক্ত হ'বে,—ঐ– [ɔi, oi]।

১০· বড় হাতের অক্ষর (capital letter) কখনো ব্যবহৃত হবে না।

১১· নামবাচক বিশেষ্যের (Proper noun) পূর্বে একটি তাবকাচিহ্ন '*' দিতে হবে। (কলকাতা-*[kolkata]।

১২· বিশেষ প্রয়োজনে কোন ধ্বনিকে প্রস্বরিত করবার জন্য অর্থাৎ শ্বাসাঘাত বোঝানোর জন্য দলের (syllable) পূর্বে উর্ধ্বদণ্ডচিহ্ন ব্যবহার করতে হয়।—শব—[ʃɔb], কিন্তু সব—[ˈʃɔb], 'পড়া' (to fall)—[ˈpɔɖɑ], কিন্তু 'পড়া' (to read) [pɔˈɖɑ]।

১৩· আন্তর্জাতিক ধ্বনিলিপি হবে একেবারে উচ্চারণ-ভিত্তিক, মোটেই বানান-অনুযায়ী নয়,—এ বিষয়ে সতর্ক থাকা একান্ত প্রয়োজন।

	বাঙলা লিপি	আন্তর্জাতিক ধ্বনিলিপি
১· বাংলা মৌলিক স্বরবর্ণ—	অ, আ, ই, উ, এ, অ্যা, ও।	[ɔ, ɑ, ı, u, e, æ/(ɛ), o]
২· যৌগিক স্বরবর্ণ—	ঐ, ঔ।	[ɔı/oı, ɔu/ ou]
৩· জিহ্বামূলীয় স্পৃষ্ট ব্যঞ্জন—	ক, খ, গ, ঘ, ঙ।	[k, kh, g, gɦ, ŋ]
৪ তালব্য স্পৃষ্ট "	চ, ছ, জ, ঝ, ঞ।	[c, ch, ɟ, ɟɦ, ɲ]
৫· তালব্য ঘৃষ্ট "	চ, ছ, জ, ঝ, ঞ (ন)	[cʃ, cʃh, ɟʒ, ɟʒɦ, n]
৬ দন্তমূলীয় ঘৃষ্ট "	চ, ছ, জ, ঝ	[ts, s, dz, dzɦ]
৭ প্রতিবেষ্টিত (মূর্ধন্য) স্পৃষ্ট "	ট, ঠ, ড, ঢ, ণ (=ন)	[ʈ, ʈh, ɖ, ɖɦ, ɳ(n)]
৮· দন্ত্য ও দন্তমূলীয় স্পৃষ্ট "	ত, থ, দ, ধ, ন	[t, th, d, dɦ, n]
৯· ওষ্ঠ্য স্পৃষ্ট "	প, ফ, ব, ভ, ম	[p, ph, b, bɦ, m]
১০ অর্ধস্বর ও অর্ধব্যঞ্জন—	য(=জ)/ (=য), র, ল, ব (=ব/ও অ)	[ɟʒ/ĕ, ɹ, l, b/ŏ]
১১· উষ্মধ্বনি—	শ, ষ(=শ), স(=শ/স), হ	[ʃ, ʃ, ʃ/s, ɦ]
১২· অযোগবাহ বর্ণ—	ং ঃ ঁ	[ŋ, ḥ, ~]

[বিভিন্ন প্রকার আন্তর্জাতিক ধ্বনিলিপির প্রচলন থাকলেও দীর্ঘ ঐতিহ্যলালিত লণ্ডন গোষ্ঠীর ধ্বনিতাত্ত্বিকদের দ্বারা অনুমোদিত লিপিই এখানে গৃহীত হয়েছে। এই লিপি মাঝে মাঝেই সংশোধিত হয়। এখানে ১৯৭৯ খ্রীষ্টাব্দে সংশোধিত রূপ পর্যন্ত পর্যালোচিত হয়েছে। কিন্তু শেষোক্ত তালিকায় বাঙলা ভাষার যাবতীয় ধ্বনি অপ্রাপ্য-বিধায় পূর্ব পূর্ব সংস্করণের লিপিও গৃহীত হয়েছে। বাঙলা উচ্চারণ বিষয়ে যেখানেই সংশয় দেখা দিয়েছে, সেখানেই আচার্য সুনীতিকুমারের নির্দেশ অনুসরণ করা হয়েছে।]

টীকা ঃ—উপর্যুক্ত সারণীর কিছু ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ প্রয়োজন। "১" সং পঙ্‌ক্তিতে স্বরবর্ণে যে 'আ' [ɑ] ব্যবহৃত হয়েছে, এটি পশ্চাৎ স্বরধ্বনি বা কণ্ঠ্যধ্বনির সঙ্কেতচিহ্ন—সংস্কৃত এবং অপর সমস্ত ভারতীয় ভাষায় সাধারণতঃ 'কণ্ঠ্য আ' ধ্বনিই ব্যবহৃত হয়। অপর মৌলিক স্বরধ্বনি (a) আঞ্চলিক বাঙলায় কখন কখন ব্যবহৃত হয়।—'অ্যা-'র দুটি রূপ [æ, ɛ]—প্রথমটি পশ্চিমবঙ্গে ব্যবহৃত হয়, উচ্চারণ অপেক্ষাকৃত বিবৃত, পরেরটি পূর্ববঙ্গে ব্যবহৃত হয়, উচ্চারণ অপেক্ষাকৃত সংবৃত।—'গ'-এর প্রতিবর্ণ সাধারণতঃ [g]-রূপে লিখিত হলেও I.P.A-র যথার্থ নির্দেশ কিন্তু এটি [ɡ]। —'৪' সং তালব্য স্পৃষ্ট 'চ' বর্গ বৈদিক যুগে উচ্চারিত হতো, বর্তমানে এর উচ্চারণ লুপ্ত। '৫' সং তালব্য ঘৃষ্ট 'চ' বর্গই এখন সংস্কৃত এবং বাঙলায় প্রচলিত। এটি ঘৃষ্ট ধ্বনি বলেই দ্বিব্যঞ্জনের সহায়তা ছাড়া লেখা সম্ভবপর নয়। '৬' সং দন্তমূলীয় ঘৃষ্ট পূর্ববঙ্গীয় উচ্চারণ। '৭' সং প্রতিবেষ্টিত ধ্বনি প্রাচীন রীতি অনুযায়ী এখনো অনেকে [ṭ, ḍ] ইত্যাদি-রূপে লিখে থাকেন। '১১' সং 'স', এমন কি 'শ'-ও যখন দন্ত্যধ্বনির সঙ্গে যুক্তভাবে উচ্চারিত হয়, তখন তা' [ʃ] হয়ে যায়। ওটি না লিখলে উচ্চারণে বিভ্রান্তি ঘটবে।

বাঙলায 'ঈ, ঊ'—এই দুটি দীর্ঘ স্বর নামে থাকলেও কার্যতঃ 'ই, উ' থেকে অভিন্ন নয় বলেই এদেব জন্য কোন পৃথক্ ধ্বনি নেই—হ্রস্বধ্বনির সাহায্যেই এদের কাজ হয়। যদি দীর্ঘ উচ্চারণ হয়, তবে দ্বিবিন্দু [ঃ] চিহ্ন দিতে হবে। 'ঋ' = রি = [ri] —কাজেই পৃথক্ চিহ্ন নিষ্প্রয়োজন। 'ড়, ঢ়'-কে [ṛ, ṛɦ] অথবা [ḍ, ḍɦ] রূপে লেখা যায়।

বাঙলা লিপিকে আন্তর্জাতিক ধ্বনিলিপিতে (I.P.A) রূপান্তরিত করতে হলে প্রথমেই পূর্ব-প্রদত্ত নিয়মাবলী সতর্কভাবে অনুধাবন করতে হবে। অতঃপব বাঙলা ভাষা তথা বাঙলা লিপিতে লেখা কথাগুলি যথাযথ উচ্চারণসহ পাঠ কবতে হ'বে। এখানেই বিশেষ সতর্কতা আবশ্যক। কাবণ বাঙলা লিপিতে এবং উচ্চারণে অনেক সময়ই পার্থক্য থাকে। যেমন—'সবিশেষ'—এব যথাযথ উচ্চারণ হলো 'শোবিশেশ'—বানানে তিনটি উষ্মবর্ণ (শ, ষ, স) বর্তমান থাকলেও উচ্চারণে শুধুই একটি—'শ'। তারপর আবার শব্দের আদি ব্যঞ্জনটি 'অ'-যুক্ত হলেও উচ্চাবণে এলো 'ও'।

বানান-অনুযায়ী বোমকলিপিতে <sabıseṣa>
উচ্চারণ " I.P.A- [ʃɔbiʃeʃ]।

'অ'-কার এবং 'এ'-কাবেব উচ্চাবণ-বিষয়েই বিশেষ সতর্কতা প্রয়োজন। কারণ 'অ'-কাব বাঙলায আদিতে মধ্যে ও অন্ত্যে প্রধানতঃ স্বরসঙ্গতি-হেতু প্রায়ই 'ও'-কারে পরিণত হয়,—বাঙলা লিপিতে সেটি দেখানো না হলেও ধ্বনিলিপিতে ওটি দেখাতে হয়। শব্দেব মধ্যে এবং অন্ত্যে 'অ'-কাব আদি শ্বাসাঘাত/দ্ব্যক্ষরপ্রবণতা-হেতু লোপ পায়। পদের আদি 'এ'-কারও প্রধানতঃ স্ববসঙ্গতির কারণে 'অ্যা'-কারে পরিণত হয়, ধ্বনিলিপিতে এটিও দেখাতে হয। এ ছাডা দীর্ঘস্বরেব উচ্চাবণ বাঙলায় হ্রস্ব হয।

স্ববধ্বনির মতো ব্যঞ্জনধ্বনিতেও এ জাতীয অনেক পার্থক্য লক্ষ্য কবা যায়।—শব্দেব আদিতে সাধাবণতঃ 'ড, ঢ' থাকলেও শব্দের মধ্যে বা শেষে এগুলি 'ড়, ঢ়' হয়ে যায়। 'ণ' সর্বত্র 'ন' হয। 'ঞ'-ব উচ্চারণ 'ন্'। 'ঙ্' এবং 'ং' অভিন্ন। শব্দের আদিতে 'য' হযে যায 'জ' এবং শব্দেব মধ্যে বা শেষে 'য'। অন্তঃস্থ ব -এব সর্বত্রই বর্গীয ব হয়ে যায, শুধু যুক্তাক্ষর বাদে। বিভিন্ন বর্ণেব যুক্তাক্ষর উচ্চাবণে প্রায়ই সমীভৃত হযে যুগ্মব্যঞ্জন-রূপে উচ্চারিত হয়।—পক্ব>পক্ক, তথ্য>তত্থ, অদ্য>অদ্দ, অশ্ব>অশ্‌শ, সহ্য>সজ্ঝ প্রভৃতি।

যথার্থ উচ্চারণ-বিষয়ে কোন বিধিবদ্ধ নীতি-নির্দেশ না থাকায় এ বিষয়ে শিক্ষার্থীদেব যথেষ্ট অসুবিধার সম্মুখীন হওয়া সম্ভব। তবে সাধাবণভাবে এই বলা যায, ইংরেজি ভাষার ক্ষেত্রে দক্ষিণ ইংলন্ডের ভাষাকে আদর্শ ভাষারূপে গ্রহণ ক'বে, সেই ভাষার উচ্চাবণকেই যেমন 'Received Pronunciation' বা R.P. বলে গ্রহণ করা হয়েছে, আমাদেরও তেমনি কলকাতার শিক্ষিত অধিবাসীব মুখের উচ্চারণকেই শিষ্ট কথ্যভাষাব (Standard colloquial language) আদর্শরূপ বা R.P. বলে গ্রহণ করতে হবে।

ধ্বনিলিপি-লিখনে প্রথম শিক্ষার্থীদের নিম্নোক্ত ক্রমে অগ্রসর হওয়া উচিত।

প্রথমেই লেখার বিষয়টি যথাযথ উচ্চারণ-অনুযায়ী লিখে তার বর্ণ-বিশ্লেষণ করে ক্রমপর্যায-অনুসারে I.P.A. বসাতে হবে। যেমন—

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর = ইশ্‌শর্ চন্দ্রো' বিদ্দাশাগোর্ (উচ্চারণ-অনুযায়ী)। = ই·শ্·শ্·অ·ব্ চ·অ·ন্·দ্·র্·ও ব্·ই·দ্·দ্·আ·শ্ আ·গ্·ও·র্ (বর্ণ-বিশ্লেষণ)। *[iʃʃɔr cɔndro biddaʃagor] (I.P.A-তে প্রতিবর্ণীকরণ)

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর = রোবিন্দ্রোনাথ্ ঠাকুর্
= র্·ও·ব্·ই·ন্·দ্·ব্·ও ন্·আ·থ্·ঠ্·আ·ক্·উ·র্
*[robindro nath ṭhakur]

আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় = আচার্জো শুনিতিকুমার চট্টোপাদ্ধায় = আ·চ্·আ·র্·জ্·ও শ·উ·ন্·ই·ত্·ই· ক·উ·ম্·আ·র্ চ·অ·ট্·ট্·ও·প্·আ·দ্·ধ্·আ·য়্
*[acʃarjo ʃuniti kumar cʃattopaddɦaě]

নিম্নপ্রদত্ত অনুশীলনীতে প্রথমে বাঙলা লিপি, পরে আন্তর্জাতিক ধ্বনিলিপি (I.P.A) এবং সর্বশেষ রোমকলিপির রূপান্তর দেখানো হলো।

১·

'পরেব বিরুদ্ধে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিবার যে চেষ্টা তাহাই পোলিটিক্যাল উন্নতির ভিত্তি। য়ুরোপীয় সভ্যতা যে ঐক্যকে আশ্রয় করিয়াছে তাহা বিবোধমূলক; ভাবতবর্ষীয় সভ্যতা যে ঐক্যকে আশ্রয় করিযাছে তাহা মিলনমূলক।'

[pɔrer biruddɦe apanɔke protiʃṭhitɔ kɔribɔr ʒʒe ĉʃéʃta taɦai politikæl unnɔtir bɦitti. *iuropio ʃɔbbɦcta ʒe ɔikkɔkc asrɔĕ kɔriac͡ʃhe taɦa birodʰmulak; *bharɔtbɔrʃio ʃobbhɔta ʒe ɔikkɔke asrɔĕ kɔriac͡ʃe taɦa milɔnmulɔk.]

<Parer biruddhe āpanāke pratiṣṭhita karibār ye ceṣṭā tāhāi poliṭikal unnatir bhitti. Europīya sabhyatā ye aikyake āśraya kariāche tāhā birodhmūlak; Bhāratbarṣīya sabhyatā ye aikyake āśraye kariāche tāhā milanmūlak.>

২·

'সাহিত্যে মানুষের আত্মপবিচযের হাজার হাজার ঝরনা বয়ে চলেছে—কোনোটা পঙ্কিল, কোনোটা স্বচ্ছ, কোনোটা ক্ষীণ, পরিপূর্ণ প্রায়। কোনোটা মানুষের মরবাব সমযেব লক্ষণ জানায়, কোনোটা জানায় তার নব জাগরণের।'

[ʃaɦitte manuʃer āttɔpɔric͡ʃɔĕer ɦaʒʒar ɦaʒar ʒʒɦɔrna boĕe c͡ʃɔleche— konota pɔnkil, konota ʃac͡ʃc͡ʃha, konoṭa khinɔ, konoṭa pɔripurnɔpraĕ konota manuʃer morbar ʃomoĕer lokkhan ʒʒanaĕ, konoṭa ʒʒanaĕ tar nabɔ ʒʒagɔrɔn .]

<Sāhitye mānuṣer ātmaparicayer hāzār hāzār jharnā baye caleche—konoṭā paṅkil, konoṭā swaccha, konoṭā kṣina, paripūrṇaprāya, konoṭā mānuṣer marbār samayer lakṣaṇ jāṇāy tār naba jāgaraner >

৩·

'সূর্যাস্তেব মুহূর্তে পশ্চিম-আকাশ যেখানে বঙের ঐশ্বর্য পাগলেব মতো দুই হাতে বিনা প্রযোজনে ছড়িযে দিচ্ছে সেও যেমন আশ্চর্য, পূর্ব-আকাশে যেখানে শান্তি এবং সংযম সেখানেও বঙের পেলবতা, কোমল, অপরিমেয গভীবতা তেমনি আশ্চর্য।

[ʃurʒʒaster muɦurte paʃĉʃim-akaʃ ʒʒekhane raŋer ɔiʃʃarʒʒo pagɔler mɔto dui ɦate bina prɔ(o)ĕoʒʒɔne c͡ʃharie dic͡ʃc͡ʃhe ʃeo ʒʒemon aʃc͡ʃcrʒʒo, purbɔ akaʃe ʒʒekhane ʃanti ebɔŋ ʃaŋʒʒɔm ʃekhaneo raŋer pelɔbɔta komɔlɔta, aparimeĕa gabɦirɔta temni aʃc͡ʃarʒʒo]

<Sūryāster muhūrte paścim-ākāś yekhāne raṅer aiśwarya pāgaler mato dui hāte binā prayojane chaḍiye diecche se-o yeman āścarya, pūrba-ākāśe yekhāne śānti ebaṅ sanjam sekhāneo raṅer pelabatā, komalatā, aparimeya gabhiratā temni āścarya>

৪·

'তখন পণ্ডিতেবা এক হাতে কলম, এক হাতে সড়কি লইযা, এমনি কাণ্ড কবিল, যাকে বলে শিক্ষা, কামারেব পসাব বাড়িয়া কামাব গিন্নিব গায়ে সোনা-দানা চড়িল এবং কোতোযালের হুঁশিযাবি দেখিয়া বাজা তাকে শিবোপা দিলেন।'

[takhon pɔnditera æk ɦate kɔlɔm, æk ɦate ʃɔrki lɔia eman: kando korilo, ʒʒake bɔle ʃikkha. kamarer pɔʃar baria kamar-ginnir gaĕe ʃonadana aiilo ebɔŋ kotoaler ɦũʃiʃari dekhia raʒʒa take ʃiropa dilen.]

<Takhan panḍiterā ek hāte kalam, ek hāte saḍkı laiyā, emani kānḍa karıla, yākc bale śıkṣā. kāmārer pasār bāḍıyā kāmār-gınnir gāye sonā-dānā caḍila eban kotowāler hūśıārı dekhıyā Rājā tāke śıropā dilen.>

৫·

'বীবাঙ্গনা কাব্যে মধুসূদন অমিত্রাক্ষব ছন্দোধারাকে মহাকাব্যেব সুদূর পর্বতচূড়া থেকে নামিয়ে মানবজীবনের সহজ অথচ মর্যাদাময আবেগ-অনুভূতির উচ্চ মালভূমিব মধ্য দিয়ে প্রবাহিত করেছেন। পুরাণের নায়িকাবা এই কাব্যে আধুনিক রোম্যান্টিক নায়িকা হয়ে দেখা দিয়েছেন।"

[*bıraŋgɔna kabbe *modɦuʃudon *ɔmıtrakkhor ĉʃhɔndodɦarake mɔɦakabber ʃudur pɔrbɔt"ĉʃuṛa theke namıe manaḅɟ͡ʒibɔner ʃɔhɔɟ͡ʒ ɔthɔĉʃɔ morɟ͡ʒadamɔĕ abeg-onubɦutır uĉʃĉʃɔ mālbɦumır madɦɦɔ dıe probaɦitạ koıeĉʃhen. *puraner naĕıkara eı kabbe adɦunık romæntik naĕıkạ ɦaĕe dækha dıeĉʃhen.]

৬·

'কাপড-চোপড়েব বালাই খুব ছিল না—এক জোড়া জুতায বছর চালাতে হ'ত। দাদাব জুতো ছোট ভাইযেবা পরত, ছেলেদেব জন্য ছাতাব পাট ছিল না—যেন তেন প্রকাবেণ স্লেট মাথায দিযে জল বাঁচিযে ইস্কুলে যেতুম বর্ষাকালে।'

[kapɔ̇r-ĉʃopɔṛer balạı khub ĉʃhılona—æk ɟ͡ʒora ɟ͡ʒutaĕ bɔĉʃhar ĉʃalate ɦoto. dadar ɟ͡ʒuto ĉʃhotɔ bɦaıera porto, ĉʃheleder ɟ͡ʒɔnno ĉʃhatar pat ĉʃhılo na—ɟ͡ʒenɔ tena prɔkarenɔ slet mathaĕ dıĕ ɟ͡ʒɔl bāĉʃıe ıskule ɟ͡ʒetum bɔrʃakale]

৭·

'সেই বাযুহীন আলোহীন মহাগহ্বর হইতে উঠিবাব মই খুঁজিযা না পাইযা আবাব সে ধুপ কবিযা বিছানায পডিযা গেল, সংসারের লুকোচুবি খেলায যেখানে কাহাকেও খুঁজিযা পাওযা যায না সেইখানে অন্তর্হিত হইল।'

[ʃeı baĕuɦın, alohın mɔɦagɔbbɦɔr ɦɔite uthıbar moı khūɟ͡ʒıa na paıa abar ʃe dɦup korıa bıĉʃhanaĕ pɔrıa gælo. ʃaŋʃarer lukoĉʃurı khelaĕ ɟ͡ʒekhane kaɦakeo khūɟ͡ʒia paŏa ɟ͡ʒaĕ na ɔntɔrhıto ɦɔılo.]

৮·

আজ অর্ধনিশায় কেওড়াতলা মহাশ্মশানে ভারতীয় শিল্প-সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ প্রতীক সত্যজিৎ বাযেব মবদেহ চিতাগ্নিতে ভস্মীভূত হয়ে গেল।'

[aɟ͡ʒ ɔrdɦanıʃaĕ *kæoṛɔtala mɔɦaʃāʃane *bɦarɔtıo ʃilpɔ-ʃɔŋʃkritıı ʃreʃthɔ protık *ʃɔttɔɟ͡ʒit raĕer mɔrɔdēɦɔ ĉʃıtagnıte bɦaʃʃibɦutɔ ɦoĕe gælo] .

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	পংক্তি	আছে	হ'বে
৭	নীচের দিক থেকে ৫	'র'	'-র'
৯	৫	এককালিক	ঐককালিক
৯	২৭	অস্ট্যাধ্যায়ীকে	অষ্টাধ্যায়ীকে
২৫	১৭	…তাকে প্রত্যয়-'felu' প্রত্যয়টিকে…	…তাকে প্রত্যয়-'fela করা এবং প্রত্যয়টিকে…
৩৫	২৭	এতএব	অতএব
৪৬	১৯	গোস্ঠী	গোষ্ঠী
৪৮	১১	ভাষা-মাদাগাস্কার	ভাষা মাদাগাস্কার
৫০	১৩	শপ্তদশ	সপ্তদশ
৫৪	১৯	এর পরে নিম্নোক্ত শীর্ষনামটি যোগ হ'বে : **[দুই] ইন্দো-য়ুরোপীয় ভাষার ধ্বনিসংস্থান ও ব্যাকরণ**	
৫৫	৩	পশ্চাৎ কন্ঠ্য কন্ঠ্য	পশ্চাৎ কণ্ঠ্য / কণ্ঠ্য,
	"	n	n/n
	৫	দন্ত্যমূলীয়	দন্তমূলীয়
	১৭	শেষে যোগ হবে :	(সন্ধিস্বর ছিল না) ।
	১৮	" :	(চন্দ্রবিন্দুর ব্যবহার ছিল না)
	২১	" :	(মধ্যপ্রত্যয় ছিল না) ।
৫৬	৩	এর পর নিম্নোক্ত শীর্ষনামটি যোগ হবে : [তিন] **ইন্দো-য়ুরোপীয় ভাষায় ধ্বনি-পরিবর্তন**	
৫৭	১১	*স্পৃষ্ঠ্য	*স্পৃষ্ট
৫৯	৭	ভ>ন্ন	ভ>ব
	১২	খ>গ	ঘ>গ
	১৫	n হ'লো	th হলো
	২২	কথা ছিল, কিন্তু	কথা ছিল (ক>খ) কিন্তু
৬০	৫	গ্রীক শেফক (<*কেফক)	গ্রীক পেফক (<*ফেফক)

পৃষ্ঠা	পংক্তি	আছে	হ'বে
৬৩	৮	এর পর নিম্নোক্ত শীর্ষনামটি যুক্ত হ'বে ; (অ) 'কেন্তুম্ ভাষাগোষ্ঠী'	
৭০	১৩	পতের>সং	পতর>সং
	২২	ধ্বনির পর পর	ধ্বনির পর
৮০	৫	লৌকিক ধ্রুপদী	লৌকিক / ধ্রুপদী
৮০	২৬	জাতির	জাতি
৮৯	১৫	ব্যঞ্জন	ব্যঞ্জন
৮৯	২২	কাশ্মীর>কস্মীর	কাশ্মীর>কশ্মীর
	২৬	উদক>ওক	উদক>দক
৯১	শেষ	অন্তঃস্থ ব	অন্তঃস্থ ব
৯২	৯	কয্যাণ>কল্যাণ	কল্যাণ>কয্যাণ
৯৩	১৩	দৈব দিনে	দেবদিনে
৯৬	২৬	কথা—	কথা বলেছেন—
	২৯	অর্ধমাগধী	অর্ধমাগধী ;
৯৮	২৮	উষ্মীভূত	উষ্মীভূত
৯৯	২৩	স্ন	স্ম
১০৮	১৬	নিষ্পন্ন	সম্পন্ন
১০৯	১৯	জ-কাবের	জ-কারের
১৩১	১৭	(Quipe)	(Quipe) বা 'কুইপে'
১৩৩	১৮	Craphemic	Graphemic
	২০	(Graphemic)	(Grapheme)
১৩৯	১৭	স্পষ্ট	স্পষ্ট হ'য়ে
১৪৮	১০	তাড়ত ধ্বনি	তাড়িত ধ্বনি
১৫০	১৯	সম্মুখ স্বরধ্বনির উচ্চারণ কালে	সম্মুখ স্বরধ্বনির (ই, এ, অ্যা, আ') উচ্চারণ কালে
		ওষ্ঠদ্বয়	ওষ্ঠদ্বয়ের
১৫১	১৭	হিজ্বার	জিহ্বার
১৬২	১৪	শব্দযোটকের	শব্দযোটকের (minimal Pairs)

পৃষ্ঠা	পংক্তি	আছে	হবে
১৬৪	৩	বৈশিষ্ট্য	বৈশিষ্ট্যও যে
১৬৮	২৩	সুনীতি কুকার	সুনীতিকুমার
১৭৩	১৪	ব্যাজ>Badge	ব্যাজ (Badge)>
১৭৯	২০	ছয়	হয়
	২২	অশল	অশ্‌শ
১৮৪	১১	সাদৃশ্য	সদৃশ
১৮৬	৬	উবটুন-উদ্বটন	উদ্বটন>উবটন
১৮৮	১৩	'স্তোতবাক্য'	'স্তোভবাক্য'
১৮৯	২৮	বলেন	বলে
১৯০	৮	ডো নট কেয়ার	ডোণ্টুকেয়ার
২০০	১৯	(৪)	[চার]
২১১	২৯	অপকৃষ্ঠ	অপকৃষ্ট
২১৫	২৯	অন্যঅম	অন্যতম
২৩২	২	নিরুক্তিকার	নিরুক্তকার
২৪১	১	Stinthal	Steinthal
২৪২	৯	(এর পরে শীর্ষনাম	'প্রাচ্যবিদ্যা-চর্চা'
২৪৬	২৯	সৃজনমূলক ব্যাকরণ' ।	সৃজনমূলক ব্যাকরণ'
২৫৪	৮	Omlaut	Umlaut
২৫৮	২৮	আর্থ	আর্য
২৭২	১৫	লোগ>লোগ্‌	লোগ>লোগ৹
২৮১	১৩	হ'লও	হ'লেও
২৮২	১	(গৌড়ী অপভ্রংশের	গৌড়ী প্রাকৃতের
২৮৯	২	এই অ-কারটিকে	এই আ-কারটিকে
	৩	কাল (>কল্য)	কাল (<কল্য)
	১৫	একবার দিন্নতো	'একবার' 'দিন্‌ তো
২৯০	১৩	(æɛ)	(æ/ɛ)
	২১	(*a:*)	(*a : i*)
	২২	(এই পংক্তির নীচে যুক্ত হবে নিম্নোক্ত অংশ):	

ও—এটির ইন্দো-ঈরানী উচ্চারণ ছিল 'অউ'; সংস্কৃতে 'ও' দীর্ঘস্বর, বাঙলায় সাধারণভাবে হ্রস্বস্বর, তবে পরে হলন্ত বর্ণ থাকলে দীর্ঘ উচ্চারিত হয়। পূর্ব বাঙলায় 'ও' কারের 'উ'-কার উচ্চারণ-প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়।

ঔ—এটিও মূলত যৌগিক স্বর। সংস্কৃত উচ্চারণ 'আউ' থেকে বাঙলায় 'অউ' এবং 'ওউ'।

সন্ধিস্বর—বাঙলায় যে তেরটি স্বরবর্ণের বিবরণ দেওয়া হ'লো এদের মধ্যে মৌলিক স্বর সাতটি—অ (ɔ) আ (a) ই (i) উ (u) এ (e) অ্যা (æ/ɛ) ও (o)। এদের পারস্পরিক সমবায়ের ফলে অনেকগুলি সন্ধিস্বরও বাঙলায় প্রচলিত আছে। এদের মধ্যে **দ্বিস্বরধ্বনির** (Dipthong) সংখ্যা অন্ততঃ ২৫টি, কিন্তু শুধু 'অই'/'ওই'-এর জন্য 'ঐ' এবং 'অউ' / 'ওউ'-এর জন্য 'ঔ'—এই দুটির জন্যই পৃথক বর্ণ নির্দিষ্ট আছে। এছাড়া অপরগুলিকে দু'টি স্বরবর্ণ পাশাপাশি লিখে একই প্রচেষ্টায় উচ্চারণ করতে হয়; যথা—'অএ, অআ, অই/ওই, অউ, অও, আউ, আও, আই, আএ, আও, ইআ, ইউ, ইএ, ইও, উআ, উই, উএ, উও, এআ, এই, এউ, এও, অ্যাএ, অ্যাও, ওআ, ওই, ওউ। খেয়াল রাখতে হ'বে, উচ্চারণ যদি বিশ্লিষ্ট হয়, তবে সন্ধিস্বর হয় না, যেমন—'দাও'—এখানে 'আও' একটিমাত্র প্রচেষ্টায় উচ্চারিত, অতএব, সন্ধিস্বর, কিন্তু 'দিও'—এখানে 'ই+উ' পৃথক্ পৃথক বিশ্লিষ্টভাবে উচ্চারিত হয় বলে সন্ধিস্বর হ'লো না।

ত্রিস্বরধ্বনি (Tripthong)—বাঙলায় ত্রিস্বরধ্বনির সংখ্যাও অনেক।—অইও, আইও, ইএই, উআও, এইও, আইআ, ওএই।

চতুঃস্বরধ্বনি (Tetrapthong)—অআইও, আওআএ, এওআই।

পঞ্চস্বরধ্বনি (Pentapthong)—আওআইও।

সানুনাসিকস্বর (Nasal Vowels)—স্বরবর্ণের উচ্চারণ কালে নিঃশ্বাস-বায়ু মুখ-বিবর দিয়ে বহির্গত হ'বার কালে যদি যুগপৎ, নাসিকাদ্বার দিয়েও বহির্গত হয়, তবে স্বরধ্বনি 'সানুনাসিক (Nasalised) হ'য়ে থাকে। বাঙলায় ঁ (চন্দ্রবিন্দু)-র সাহায্যে সানুনাসিক স্বর প্রকাশ করা হয়। সাধারণতঃ নাসিক্যযুক্ত ধ্বনি একক ধ্বনিতে পরিণত হ'বার কালে পূর্ববর্তী স্বরধ্বনিকে সানুনাসিক ক'রে তোলে। যথা, শঙ্খ > শাঁখ, দন্ত > দাঁত, সন্ধ্যা > সাঁঝ। অকারণেও অথবা সাদৃশ্যবশতঃ কোন কোন স্বরের নাসিক্যীভবন হয়—ইষ্টক > ইঁট, পুস্তিকা > পুঁথি। শব্দের অন্ত্যাস্থিত নাসিক্যধ্বনি আদিস্বরে শ্বাসাঘাত-হেতু কখন কখন আদিস্বরেই সঞ্চালিত হয়। যথা;—গোস্বামী > গোসাই > গোঁসাই, সংক্রম > সংকম > সাঁকো > সাকোঁ।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	আছে	হবে
২৯৩	১৬	দন্তধ্বান	দন্ত্যধ্বনি
	১৯	ওষ্ঠধ্বনি	ওষ্ঠ্যধ্বনি
২৯৪	১	(য় = a)	(য় = c
	২০	দন্তোষ্ঠবর্ণ	দন্তোষ্ঠ্য বর্ণ
	২২	'বর্গীর ব'	'বর্গীয় ব'
২৯৫	৯	শোবিশেষ	শোবিশেশ
২৯৭	৫	(বিশেষতঃ 'পূর্বগ্রাচ্যা'	(বিশেষতঃ 'পূর্বীপ্রাচ্যা'),
২৯৮	৪	সন্নিকৃষ্ট	সন্নিকৃষ্ট
৩০৩	৮	আধুতিক	আধুনিক
৩০৪	২১	উচ্চাবস্থ	উচ্চাবস্থ
৩০৭	২৫	কবুবী	কবরী
৩১১	৯	রোঁচে	রোচে
৩১৫	১৭	দুদ > দুদ	দুধ > দুদ
৩১৭	৩০	যায়	য / য়
৩১৮	১৫	অন্য	অন্যত্র
৩২৫	১০	বুঝতে	বুঝাতে
৩২৬	১৯	কৃৎ-প্রতয়ের	কৃৎ-প্রত্যয়ের
৩২৭	২৯	মহাগর	মহাগার
৩২৮	৯	ঘঁড়েল	ঘড়েল
৩২৯	৩	মাধয়	মাধঅ
৩৩৪	৩০	সমাজ	সমাস
৩৩৬	২৯	দশ-হাঁত	দশ-হাতি
৩৫৪	২০	স্ত্রীণির	স্ত্রীণির
৩৫৬	৯	সাপ্তপঞ্চাশ	সাত পঞ্চাশ
	২৮	নিবানই	নিরানই
৩৬৫	২৪	উৎপতিত্ত অসম্বব	উৎপত্তিও অসম্ভব
৩৭৬	৭	আই / আ	আহ / আ
	১৭	স্ত্রলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
৩৭৮	৮	(মেয়ের)	(মেয়ের)

পৃষ্ঠা	পংক্তি	আছে	হ'বে
৩৮২	১৮	বংগলা	বংগা'
৩৮৪	১১	গেলাভি	গেলান্তি
৩৮৬	২৪	রুহ'	'কহ'
৩৯৪	৩	সুখান ভালত…রাত্র	সুখান ডালত…রাএ
৪০১	৬	'আ-'নাই	'আস্'-নাই
৪১১	৮	মম্	মম
৪১৪	৪	-ন্তু>-ত-হ-ইত	-ন্তু>-ত>-ইত্ত
৪৪২	৬	অন্ত্যমধ্যস্তরে	আদিমধ্যস্তরে
৪৪৪	১৬	'ব্রজভাষা'	'ব্রজভাখা'
৪৮৪	৭	হলবর্ণ	হলাবর্ণ
৪৯৫	২২	পরিবর্তন রূপে	পরিবর্তন সহ
৫০২	১১	সন্ধিসূত্র	সন্ধিসূত্রে
৫০৭	১৮	পাঁব	গাঁব
৫০৮	৪	<গোঁবিঅ	>গোঁবিঅ
৫০৯	৩	শত্রু।	শত্রু
	২৭	ক্ষরতি<	ক্ষরতি>
৫১১	২২	এ্যাতিঘর	এ্যাতিঘর
৫১২	২০	পৃচ্ছতি	পৃচ্ছতি
৫২১	৪	যদি সূচক চিহ্ন	যদিও সূচক চিহ্ন
৫২৩	১৯	=ব/ও অ	=ব/ওঅ